ভারতের সাধক

(সুলভ সংস্করণ)

৪র্থ খণ্ড

১৩৭০ সালের রবীন্দ্রপুরস্কার-প্রাপ্ত মহান্ জীবনী-গ্রন্থ

শঙ্করনাথ রায়

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-৯



প্রথম সংস্করণ (সু-৪) ১৩৯৪

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মূল্য ৫০·০০

সূচীপত্র

সাধু নাগমহাশয়

শ্রীরামকৃষ্ণের দুই পার্ষদ, বিবেকানন্দ ও নাগমহাশয় সম্বন্ধে কবিবর গিরিশ ঘোষ দুইটি চমৎকার উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। এ উপমার মধ্য দিয়া এই দুই মহাপুরুষের সাধনসত্তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে। গিরিশ বলিয়াছেন, "নরেনকে আর নাগ-মশাইকে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে পড়েছেন। নরেনকে যতই তিনি কষে বাঁধেন, ততই বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়িতে কুলোয় না। শেষটায় নরেন এত বড় হলো যে মায়া তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। নাগমশাইকেও মহামায়া বাঁধতে গেলেন। কিন্তু যতই তিনি বাঁধেন, নাগমশাই ততই সরু হয়ে যান। ক্রমে এমন সরু হন যে মহামায়ার জাল গলিয়ে অবলীলায় বেরিয়ে পড়েন।"

অধ্যাত্মক্ষেত্রের বীর যোদ্ধা, রামকৃষ্ণ-প্রতিভূ স্বামীজী ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত। তাঁহার জীবন তথ্য অনেকেরই অবিদিত নয়। কিন্তু ভক্তপ্রবর দুর্গাচরণ নাগ আজীবন ছিলেন আত্মগোপন প্রবাসী, তাই তাঁহার পুণ্যজীবনের কথা জানিবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয় নাই। মহামায়ার মায়ার জাল এড়াইবার সাথে সাথে নাগমশাই আশে-পাশের মানুষের দৃষ্টিকেও ফাঁকি দিয়া গিয়াছেন। দৈন্যময় ভক্তির তিনি ছিলেন মূর্ত বিগ্রহ। অপূর্ব ভক্তিবলে নিজেকে যেমন করিয়া তোলেন রামকৃষ্ণময়, তেমনি সর্ব-জীবে সর্বভূতে দেখিতে থাকেন রামকৃষ্ণসত্তার পুণ্যময় প্রকাশ। বিবাহিত জীবনের ত্যাগে ও সংযমে, গার্হস্থ্য জীবনের পুণ্যময়তায় তাঁহার জীবন হইয়া উঠে দিব্য মহিমায় ভরপুর। স্বামী বিবেকানন্দকে তাই একদিন ভাবগদ্গদ কণ্ঠে বলিতে শুনা গিয়াছিল, "পৃথিবীর এত দেশ দেখে এলাম, কিন্তু নাগমশাইর মতো মহাপুরুষ একজনও চোখে পড়লো না।"

পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জের কাছেই দেওভোগ গ্রাম। এই গ্রামে, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে আগস্ট দুর্গাচরণ ভূমিষ্ঠ হন। পিতা দীনদয়ালের অবস্থা মোটেই সচ্ছল নয়। কলিকাতায় কুমারটুলির পালচৌধুরীদের গদিতে থাকিয়া সামান্য কাজ করেন। পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী দেশে বাস করিয়া পুত্র দুর্গাচরণ ও কন্যা সারদাকে কোনোমতে মানুষ করিতে থাকেন।

দুর্গাচরণের বয়স তখন আট বৎসর। রোগজীর্ণ দেহ নিয়া জননী হঠাৎ একদিন লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। বালক পুত্র ও কন্যার লালন পালনের সমস্ত কিছু ভার পড়ে পিসীমা ভগবতী দেবীর উপর। পিসীমার স্নেহ যত্নকে অবলম্বন করিয়া দুর্গা-চরণের প্রথম জীবন গড়িয়া উঠে।

পিতা দীনদয়াল ছিলেন বড় ধর্মভীরু ও নির্লোভ। সামান্য কর্মচারী হইলেও পালচৌধুরীরা তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন, ঘরের লোকের মতো ভাবিয়া বিশ্বাসও কম করিতেন না।

দীনদয়ালের ধর্মবুদ্ধি ও লোভহীনতার নানা কাহিনী রহিয়াছে। সে-বার পাল-

চৌধুরীদের এক নৌকা ভর্তি নুনের চালান নারায়ণগঞ্জ যাইতেছে। দূর নৌকাপথে বিপদ যথেষ্ট, বিশ্বাসী কর্মচারী না হইলে চলে না। তাই দীনদয়ালকেই এ কাজের ভার দেওয়া হইল।

সুন্দরবনের মধ্য দিয়া নৌকা চলিতেছে। ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া উঠে। কাছে দুই চারটি বসতি দেখিয়া নৌকা এক জায়গায় নোঙর করা হয় এবং দীনদয়াল সারা রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতে থাকেন। অতি প্রত্যূষে নিচে নামিয়া তিনি শৌচে গিয়াছেন, মাটি হাতড়াইতে গিয়া হঠাৎ কি একটা শক্ত ভারি বস্তু আঙুলে ঠেকিল। খুঁড়িয়া দেখেন প্রকাণ্ড একটা ঘড়া, সোনার মোহরে উহা পূর্ণ।

দীনদয়াল ত্রস্তেব্যস্তে নৌকায় ছুটিয়া আসিলেন। মাঝিদের কহিলেন, "ওরে, শিগ্‌গীর নৌকা ছেড়ে দে, এখানে যেন বিপদের আভাস পাচ্ছি!" তৎক্ষণাৎ নৌকা ভাসানো হইল, আর মোহরের ঘড়া হইতে দূরে আসিয়া তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পরে এ কাহিনীর উল্লেখ করিয়া বন্ধুদের বলিয়াছিলেন, "কবে কোন ব্রাহ্মণ এ ঘড়ার মোহর পুঁতে রেখেছে কি না কে জানে? শেষটার কি ব্রহ্মস্ব অপহরণের পাপ মাথায় নেবো? পাছে নিজেরই অজ্ঞাতে মনে লোভ আসে, এগুলো গ্রহণ করতে ইচ্ছে হয়, তাই ছুটে পালিয়ে এলাম।"

এমনি সততা ও ধর্মপরায়ণতার প্রতিমূর্তি ছিলেন নাগমশায়ের পিতা।

নারায়ণগঞ্জের বাংলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর বেশী পড়ানো হয় না। এ পড়া বালক দুর্গাচরণের শেষ হইল। এবার সমস্যা—কোথায় তিনি পড়িবেন? কাছাকাছি স্কুল কোথাও নাই। বালক পিতাকে ধরিয়া বসিল কলিকাতায় সে পড়িতে যাইবে। কিন্তু দীনদয়াল রাজী হন না। তাঁহার যে আয় তাহাতে নিজের খরচ চালাইয়া পুত্রকে পড়ানো সম্ভব নয়।

দুর্গাচরণ কিন্তু হটিবার পাত্র নন, লেখাপড়ায় ঝোঁক তখন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। স্থির করিলেন, দশ মাইল দূরে ঢাকায় গিয়া পড়িবেন। কাজটি বালকের পক্ষে নিতান্ত সহজ নয়। যাতায়াতে দুইবেলা প্রায় বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। পিসীমার নয়নাশ্রু, সঙ্গীসাথীদের বারণ, কোনো কিছুই সেদিন তাহাকে সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ঢাকা নর্মাল স্কুলে ভর্তি হইয়া একান্ত নিষ্ঠায় তিনি পড়াশুনা শুরু করিয়া দিলেন।

শীতাতপ, ঝড়বৃষ্টি মাথার উপর দিয়া যায়, দৃঢ়চিত্ত বালকের ভ্রূক্ষেপ নাই, হাঁটিয়া একাকী নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে যোগ দিতে থাকে। এই অধ্যয়নস্পৃহা ও শ্রমনিষ্ঠা দেখিয়া একটি শিক্ষকের বড় দয়া হয়। দুর্গাচরণকে ডাকিয়া বলেন, "বাছা, কষ্ট ক'রে দূর পথে যাতায়াত না ক'রে তুমি আমার বাসায়ই এসে থাকো। যা হয় কষ্ট ক'রে আমার চলে যাবে।"

এ প্রস্তাবে বালক কিন্তু রাজী হয় নাই। নিত্যকার পথশ্রান্তিকে গুরুত্ব না দিয়া অবলীলায় কহিল, "রোজ এই কয় মাইল হাঁটতে আমার তেমন কষ্ট হয় না। আপনি সেজন্য ভাববেন না।"

দুর্গাচরণ ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করিল। পিসীমা তাহার বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাতৃহীন দুর্গাচরণের লালন পালনের ভার তাঁহারই উপর। এবার তাহাকে সংসারজীবনে ব্রতী করিতে পারিলে তবে তাঁহার স্বস্তি। উদ্যোগী হইয়া তিনি

তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। এগারো বৎসর বয়স্কা কন্যা প্রসন্নকুমারীকে বধূরূপে ঘরে আনা হইল।

বিবাহের কয়েকমাস পরের কথা। নাগমশাই কলিকাতায় ডাক্তারী পড়িতে আসিয়াছেন। এখানে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে তিনি প্রায় দেড় বৎসর অধ্যয়ন করেন। কিন্তু নানা ঘটনার আবর্তে পড়িয়া এই ডাক্তারী পড়া তাঁহাকে ছাড়িতে হয়।

অতঃপর প্রসিদ্ধ ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ীর অধীনে থাকিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিতে থাকেন।

বিবাহের পর নাগমশাইকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হয়। ইহার পর দুই তিনবার তিনি বাড়ি গিয়াছেন, কিন্তু এযাবৎ স্ত্রীর সাথে আলাপ পরিচয় কিছু হয় নাই। সংসারজীবনের উপরে, দাম্পত্য সম্বন্ধের উপর, এক সহজাত বীতরাগ নিয়াই যেন তিনি জন্মিয়াছেন। নববধূর সান্নিধ্যে আসিলেই নাগমশাই বড় ভীত হইয়া পড়েন। বিশেষত রাত্রি ঘনাইয়া আসিলেই তাঁহার মনে আসে এক আতঙ্ক। স্ত্রীর সহিত কি করিয়া রাত্রি যাপন করিবেন, ইহাই হইয়া উঠে বড় সমস্যা। সঙ্গে সঙ্গে এক ফন্দী বাহির করিয়া বাড়ির সংলগ্ন এক উঁচু গাছে তর্‌তর্‌ করিয়া তিনি চড়িয়া বসেন। জানাইয়া দেন এখানেই রাত কাটাইবেন।

পিসীমাকে এবার আগাইয়া আসিতে হয়। চীৎকার ও অনুনয়-বিনয়ের পর অবশেষে তাঁহাকে বলিতে হয়, "আচ্ছা, তোকে বৌর কাছে থাকতে হবে না, আমার ঘরেই তুই শুয়ে থাক্‌বি, এবার নেমে আয়।"

নিজের মনকে পিসীমা প্রবোধ দেন, 'দুর্গাচরণের এ ছেলেমানুষী বেশীদিন আর থাকবে না, কিছুকাল পরে স্ত্রীর সঙ্গে ভাব হবেই।'

নাগমশাইর এ সমস্যা কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে হঠাৎ সরল হইয়া যায়। কলিকাতায় একদিন সংবাদ আসে, নববধূ আর ইহজগতে নাই, আকস্মিকভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া সে পরলোকগমন করিয়াছে। নাগমশাই হাঁফ ছাড়িলেন। যাক্‌ সংসারবন্ধন হইতে এবার তবে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

হাতে ছোট একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স। তরুণ ডাক্তার নাগমশাই পরম উৎসাহে গরীব দুঃখীদের চিকিৎসা করিয়া বেড়ান। ভিজিটের কথা দূরে থাকুক, প্রায়ই নিজব্যয়ে ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি বাড়ি ফিরেন। দরিদ্রের সেবা ও পরোপকারের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে।

ডাক্তারীতে এ সময়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি কম হইতেছে না। দুঃস্থ ও অসহায় পাড়া-পড়শীর দল একান্তভাবে তাঁহারই আশ্রয় নিতে থাকে। ডাক্তারের উপর বিশ্বাস তাহাদের অপরিসীম। নূতন হইলে কি হয়, ধীর মস্তিষ্কে বিবেচনার সহিত যে ঔষধ তিনি দেন অচিরে কার্যকরী হইয়া উঠে। ডাঃ ভাদুড়ীরেও এ সময়ে তাঁহার প্রাক্তন ছাত্র নাগ-মশাইর ঔষধ নির্বাচন ও চিকিৎসা নৈপুণ্যের অজস্র প্রশাংসা করিতে শুনা যাইত।

নাগমশাইর ব্যবহারিক জীবনে এ সময়ে চলিতে থাকে চিকিৎসার মাধ্যমে এই সেবা-ধর্ম আর তাঁহার অন্তর্জীবনে শুরু হয় অধ্যাত্মসাধনার তীব্র ব্যাকুলতা।

হাটখোলার দত্তবংশের সুরেশ তাঁহার এক বিশিষ্ট বন্ধু। বাসার অতি নিকটেই সে

থাকে। জীবনাদর্শের দিক দিয়া সুরেশ তখন ব্রাহ্মভাবাপন্ন। অথচ নাগমশাই রক্ষণশীল, হিন্দু দেবদ্বিজে ভক্তি তাঁহার অচল অটল। দুই বন্ধুতে যখনি দেখা হয়, তখনি শুরু হয় নানা বিচার বিতর্ক। সুরেশের নিন্দা সমালোচনার উত্তরে এক একদিন নাগমশাই উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "দ্যাখো, তুমি যতই যা বল, আমাদের বেদপুরাণ তন্ত্রমন্ত্র এসব মিথ্যে নয়। তোমার ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলে, আসলে তা হচ্ছে সাধনার চরম কথা— কিন্তু সাধনভজনের ভেতর দিয়ে না গেলে মহামায়ার কৃপা না পেলে, সে জ্ঞান কি ক'রে হবে? ব্রহ্মজ্ঞান কি মুখের কথা? মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার সাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে?"

নাগমশাইর অন্তরে এ সময়ে আসিয়াছে এক তীব্র ব্যাকুলতা। ঈশ্বরীয় কথা ও জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কথায় এখন প্রায়ই তিনি মত্ত হইয়া উঠেন। শাস্ত্র পাঠের উৎসাহও এ সঙ্গে তাঁহাকে পাইয়া বসে। শাস্ত্র গ্রন্থ-সমূহের বঙ্গানুবাদ আনাইয়া পরম উৎসাহে তিনি সেগুলি আয়ত্ত করিতে থাকেন।

কিন্তু প্রাণের আর্তি যায় কই? শাস্ত্রপাঠে ও ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা শ্রবণে তো প্রকৃত শান্তি মিলে নাই। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিলেই নাগমশাই রোজ কাশীমিত্রের শ্মশানঘাটে গিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করেন। চিতার আগুনে শবদেহ জ্বলিয়া ভস্মীভূত হয়, ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে মিলাইয়া যায়—নাগমশাই উদাসনেত্রে সেদিকে চাহিয়া থাকেন, নশ্বর জীবনের তুচ্ছতা উপলব্ধি করিয়া বেদনায় হন মুহ্যমান। এ অনিত্য সংসারে নিত্য ও শাশ্বত বস্তুর সন্ধান তিনি কোথায় পাইবেন? কে তাঁহাকে কৃপা করিবেন? ভাবিতে ভাবিতে গণ্ড বাহিয়া কেবলি ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা।

কাশীমিত্রের ঘাটে সেদিন এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সাথে নাগমশায়ের পরিচয় ঘটে। এই সন্ন্যাসীর নির্দেশে অমাবস্যার নিশীথে তিনি শ্মশানে বসিয়া জপ-ধ্যান শুরু করিয়া দেন।

পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া দীনদয়াল বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। স্থির করিলেন, তাড়াতাড়ি তাহাকে সংসারবন্ধনে বাঁধিতে হইবে, নতুবা সাধুসন্ন্যাসীর পিছনে ঘোরার বাতিক বন্ধ হইবে না। দেশে পত্র লিখিয়া কন্যা ও জামাতার সাহায্যে দুর্গাচরণের বিবাহের কথাও তিনি পাকা করিয়া ফেলিলেন।

পুত্র কিন্তু একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। কিছুতেই তিনি আর বিবাহ করিবেন না। মিনতি করিয়া কহিলেন, বিবাহিত জীবনের উপর তাঁহার কোনো আকর্ষণ নাই, ধর্মপথের তাহা এক বড় অন্তরায়। তাছাড়া নূতন বধূ আসিয়া পিতার যে পরিচর্যা করিবে, দুর্গাচরণ তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী সেবা-যত্নে তাঁহাকে রাখিবেন।

দীনদয়াল বড় মুষড়িয়া পড়িলেন। কন্যাপক্ষকে তিনি কথা দিয়াছেন, শেষকালে তাহাকে এভাবে সত্যভ্রষ্ট হইতে হইবে? তাছাড়া, দুর্গাচরণ যে তাঁহার একমাত্র পুত্র। সে বিবাহ না করিলে বংশরক্ষাও যে হইবে না।

প্রচণ্ড বাদানুবাদের পরও দুর্গাচরণের মত পরিবর্তিত হইল না। পিতা এবার মনোদুঃখে ঘরে বসিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এ করুণ দৃশ্যটি দুর্গাচরণের চোখে সেদিন পড়িল, অন্তরে উঠিল প্রবল আলোড়ন। এ সংসারে পিতার মতো আপনার জন তাঁহার আর কেউ নাই। অপার স্নেহ মমতায় পুত্রকে তিনি এতকাল ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। এই পিতার সন্তোষ বিধানই যে তাঁহার সব চাইতে বড় ধর্ম।

মুহূর্ত মধ্যে দুর্গাচরণ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন, পিতাকে কহিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন।

পাত্রী তাঁহার গ্রামেরই। শুভদিনে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল।

রোগীর চিকিৎসা, জপতপ ও ভগবৎ প্রসঙ্গ প্রভৃতি নিয়া কলিকাতায় নাগমশাইর দিন কাটিয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল, দেশে তাঁহার পিসীমা মৃত্যু শয্যায় শায়িত। এই পিসীমা তাঁহার মাতৃস্থানীয়া, মাতার মৃত্যুর পর হইতে ইহারই আদরযত্নে তিনি মানুষ হইয়াছেন। তাই সংবাদ পাওয়া মাত্র ব্যগ্রভাবে দেওভোগে ছুটিয়া গেলেন।

পিসীমার মৃত্যু এবারে দুর্গাচরণের জীবনে আনিয়া দেয় এক চরম নির্বেদের অবস্থা। দিনের পর দিন তিনি ভাবিতে থাকেন, এ নশ্বর জীবনের মূল্য কি? এই স্নেহ মায়ামমতাই বা কতক্ষণ স্থায়ী? ভঙ্গুর জীবনের উপর এবার আসিয়া গেল তাঁহার এক প্রবল বিতৃষ্ণা। মৃত্যুর ওপারে যে আলোক, যে অমৃত চির-বর্তমান, তাহারই জন্য অন্তরে জাগিয়া উঠিল পরম আকাঙ্ক্ষা।

পিতার সেবার জন্য, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নাগমশাইকে চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে হয়। কিন্তু যেভাবে চলিলে প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি কই? ডাক্তারের বেশভূষায় কোনো আড়ম্বর নাই, রোগীদের জন্য বসিবার একটিও ঘর নাই। চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি তাঁহার আজকাল হইয়াছে, দূর দূরান্ত হইতে তাই রোগীবাড়ির আহ্বান আসে। নিতান্ত সাধারণ বেশে ঔষধের ব্যাগটি হাতে নিয়া পদব্রজেই নাগমশাই রোগী দেখিতে বাহির হইয়া পড়েন।

দীনদয়ালের ইচ্ছা ডাক্তার পুত্রের বেশভূষাটা ভাল হোক, ইহার ফলে উপার্জন বাড়িবে। একদিন নিজেই তাঁহার জন্য দামী জামা-কাপড় ইত্যাদি কিনিয়া আনিলেন। পুত্রকে কিন্তু এগুলি পরানো গেল না। তিনি বরং বলিয়া দিলেন, "পোশাক পরিচ্ছদের জন্য অপব্যয় না ক'রে এ টাকা গরীব দুঃখীর সেবায় লাগালে সত্যকার ভালো কাজ হোত।"

আসলে জনসেবা হিসাবে যে ডাক্তারী ব্যবসায় শুরু করিয়াছে, আর্থিক উন্নতি তাহার কাছে আশা করা বৃথা। রোগী দেখিবার সময় নাগমশাই লক্ষ্য করেন, রোগীর গায়ে আবশ্যকীয় গরম জামাকাপড় কিছু নাই, শীতে সে কাঁপিতেছে। অমনি নিজের ভাগলপুরী খেসটি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া তিনি বাড়ি ফিরেন।

তিনি যে জানেন, শুধু ঔষধে রোগ সারে না, উপযুক্ত পথ্যাদি দরকার। তাই গরীব রোগীর পথ্যের ব্যবস্থাও সেবাব্রত ডাক্তারকে মাঝে মাঝে করিতে হয়।

সে-বার এক সংকটাপন্ন রোগীকে দেখানোর জন্য দুর্গাচরণকে কল দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন, রোগীকে ঠাণ্ডার মধ্যে মাটিতে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। অমনি মনে পড়িয়া যায়, তাঁহার নিজের গৃহে তক্তপোশ রহিয়াছে। ছুটিয়া আসিয়া রোগীর বাড়িতে ঐ তক্তপোশ স্থানান্তরিত করেন, তারপর শুরু হয় তাহার চিকিৎসা। ডাক্তারকে ইতিমধ্যে সবাই চিনিয়া নিয়াছে। চতুর লোকেরা চিনিয়াছে আরো বেশী, অনেক সময়ই তাহারা চিকিৎসা করানোর পর পারিশ্রমিক দেয় না। দুর্গাচরণেরও অভ্যাস নয় ভিজিটের জন্য পীড়াপীড়ি করা। ফলে আর্থিক দিক দিয়া

তাঁহাকে হইতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। চিকিৎসক হিসাবে যেখানে তাঁহার আয় হওয়া উচিত তিন চারিশত টাকা সেখানে ঘরে আসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা।

একদল চতুর লোক ডাক্তার দুর্গাচরণ নাগের সহৃদয়তা এবং পরোপকার বৃত্তির খোঁজ রাখে। রোগীর কল্ হইতে ফিরিবার সময় ইহারা তাঁহার বাড়িতে অপেক্ষা করে। দুঃখ দুর্দশার কথা বলিয়া, নানা কাঁদুনি গাহিয়া নাগমশাইর নিকট হইতে ইহারা টাকাকড়ি ধার নেয়। বলা বাহুল্য, এ টাকা তাহাদের পরিশোধ আর কখনো করিতে দেখা যায় না।

পুত্রের চিকিৎসা ব্যবসায়ের এ ধরন দেখিয়া দীনদয়াল বড় হতাশ হন। বুঝিয়া নেন, সাংসারিক উন্নতি তাঁহার কোনোদিনই হইবে না, আর পিতার বৈষয়িক কাজেও সে কখনো আসিবে না।

চিকিৎসক হিসাবে নাগমশাইর আজকাল নামডাক হইয়াছে। তাই পালবাবুরা তাঁহাকেই নিজেদের গৃহ চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। সে-বার তাঁহাদের গৃহের একটি সঙ্কটাপন্ন কলেরা রোগীর চিকিৎসায় নাগমশাইর ডাক পড়ে। ধীরতা, সাহস ও বিচক্ষণতার সহিত তিনি এ রোগীর চিকিৎসা করিতে থাকেন। পালবাবুরা ভীত হইয়া প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ ভাদুড়ীকেও কল্ দেন। রোগীর ঔষধ নির্বাচন নির্ভুল বলিয়া ডাঃ ভাদুড়ী মত প্রকাশ করেন, আর দুর্গাচরণের উপরই এ চিকিৎসার ভার দিয়া তিনি চলিয়া যান।

এই রোগী সারিয়া উঠিল। পালবাবুরা দুর্গাচরণের এই চিকিৎসা-নৈপুণ্যে বড় সন্তুষ্ট হইলেন। এবার ডাক্তারকে ভিজিট ও পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করা দরকার। একটি রূপার কৌটায় প্রচুর পরিমাণ অর্থ ভিজিট বাবদ রাখিয়া নাগমশাইয়ের সম্মুখে ধরা হইল। কিন্তু এ অর্থ তিনি কোনোমতেই নিতে রাজী নন। সরলভাবে কহিলেন, "ওষুধের দাম ও আমার ভিজিট বিশ টাকার বেশী কখনো হতে পারে না, আপনারা এত টাকা আমায় কেন দিচ্ছেন?"

অগত্যা ঐ বিশ টাকাই তাঁহাকে দেওয়া হইল। বাকীটা কর্মচারী দীনদয়ালের নামে পুজার সাহায্যবাবদ তাঁহারা খরচ লিখিয়া রাখিলেন।

ঘটনাটি শুনিয়া দীনদয়াল তো ক্রোধে অগ্নিশর্মা। পুত্রকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "তুই নির্বোধ, তাই নিজের প্রাপ্য টাকাটাও বুঝে নিতে পারিসনে। ও টাকা কেন এমন ক'রে ফেরত দিলি?"

নাগমশাই দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আপনি চিরকাল আমায় শিখিয়েছেন ধর্মপথে থাকতে। এখন আবার উল্টো বলছেন কেন? আমার ন্যায্য পাওনা থেকে বেশী নিয়ে কি অধর্ম করবো? যাক, আপনি যেন বাকী টাকাটা স্পর্শ করবেন না।"

"বেশ তাই হবে। কিন্তু এভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় তোর আর কতদিন চলবে শুনি?"

"না চলে, নাই চলবে। তাই বলে মিথ্যাচার আমি করতে পারবো না। ভগবান্ হচ্ছেন সত্যস্বরূপ। এ মিথ্যাচারে তাঁকে হারাতে হবে। প্রাণ থাকতে তা পারবো না।"

বৈরাগী পুত্রের কথাবার্তা শুনিয়া দীনদয়াল হতবাক্ হইয়া যান।

ইহার পর শ্বশুর ও পতির সেবা-যত্নের জন্য দুর্গাচরণের পত্নী কলিকাতায় আসেন।

অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক সেবার মধ্যদিয়া শ্বশুরকে তিনি সুখী করিলেন, কিন্তু স্বামীর মন কোনোমতেই আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। চিকিৎসা, পরোপকার ও নিজের ধ্যানজপের শেষে যেটুকু সময় দুর্গাচরণ পান, সেটুকু শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ভগবৎ প্রসঙ্গে তিনি অতিবাহিত করেন। আর নববধূর সহিত তাঁহার ব্যবধানটি থাকে আগেরই মতো। দাম্পত্য জীবনের কোনো চাঞ্চল্য কোনো তরঙ্গাভিঘাতই দৃষ্টিগোচর হয় না।

নাগমশাইর জীবনে এবার দুর্বার বেগে আসিতে থাকে ত্যাগ বৈরাগ্য আর মুমুক্ষার আকাঙ্ক্ষা। কেবলই ভাবিতে থাকেন, 'পরোপকার ও সেবাব্রত তো কতই করিলেন। কিন্তু কই, জীবনে পরম শান্তি তো মিলিল না? ঈশ্বর দর্শন তো আজ অবধি হইল না? এই ক্ষণস্থায়ী সংসারজীবনে ও দাম্পত্য সুখে তাহার কি প্রয়োজন? মুক্তির পথ কোথায়? কোথায়ই বা মুক্তিদাতা দীক্ষা-গুরু?'

দীক্ষা গ্রহণের জন্য নাগমশাইর হৃদয়ে আসিয়াছে তীব্র ব্যাকুলতা ও আর্তি। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে রোজ তিনি গঙ্গাতীরে গিয়া বসিয়া থাকেন। ঘাটে ঘাটে সদাই দেখা যায় সাধু-সন্ন্যাসী ও মহাত্মাদের আনাগোনা। নাগমশাইর মনে আশা জাগে—হয়তো কোনো এক শুভলগ্নে ইহাদের কাহারো কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িবে, প্রার্থিত দীক্ষা পাইয়া তিনি ধন্য হইবেন।

কুমারটুলি ঘাটে সেদিন তিনি বিষাদখিন্ন হৃদয়ে বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলেন, একটি নৌকা আসিয়া তীরে ভিড়িল। সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহাদের কুলগুরু বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য এ নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিতেছেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের পদধূলি নিয়া নাগমশাই তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তর হইল, "বাবা, তোমার কাছেই যে ছুটে এলাম। মহামায়ার প্রত্যাদেশ পেয়েছি, তোমায় দীক্ষা দিতে হবে। তাইতো কোনো সংবাদ না দিয়েই তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম।"

নাগমশাইর দুই চোখ তখন পুলকাশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছে। বুঝিলেন তাহার আকুতি জগজ্জননীর কানে পৌঁছিয়াছে। তাই তিনি কৌল সাধক বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্যকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন।

সানন্দে তিনি এই কুলগুরুর কাছে সস্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

মন্ত্র প্রাপ্তির পর একান্ত নিষ্ঠায় তিনি শুরু করেন সাধনভজন। এক একদিন জপ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। একবার গঙ্গাতীরে ধ্যানতন্ময় অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জোয়ারের জল তাঁহাকে ভাসাইয়া নিয়া যায়, সংবিৎ পাইবার পর অতি কষ্টে সাঁতরাইয়া তিনি তীরে উপনীত হন।

স্ত্রীকে নাগমশাই প্রায়ই বুঝান, "ওগো, একটা কথা সর্বদা মনে রাখবে, কায়িক সম্বন্ধ বা মায়ার সম্বন্ধ কখনও চিরস্থায়ী হয় না। ভগবান্‌কে ভালোবাসার ভেতরেই রয়েছে নরজন্মের সার্থকতা, এতেই পাওয়া যায় প্রকৃত মুক্তি। আমার এ হাড়মাসের খাঁচাটার আকর্ষণে নিজেকে জড়িও না। মা জগজ্জননীকে ডাকো, তাঁর শরণাপন্ন হও, ইহকাল পরকাল দুইয়েরই কল্যাণ হবে।"

পিতা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাই নাগমশাই তাঁহাকে অবসর নেওয়াইয়া দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার সেবার জন্য পত্নীরেও সঙ্গে যাইতে হইল। দীনদয়ালের কুঠের কাজ দেখাশুনার ভার নাগমশাই নিজেই গ্রহণ করিলেন।

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তখন কলিকাতায় ছড়াইতেছে, নাগমশাই একদিন বন্ধু সুরেশের সহিত ঠাকুরকে দেখিতে গেলেন।

চৈত্র মাসের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। চারিদিকে সেদিন যেন অগ্নিবর্ষণ শুরু হইয়াছে। বেলা দুইটায় উভয়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুরের কক্ষের সম্মুখে এক শ্মশ্রুধারী সাধক তখন দণ্ডায়মান। নাগমশাই সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করিলেন, "দেখুন, এখানে একটি সাধু থাকেন শুনেছি। তিনি কোথায়?"

উত্তর হইল, "তিনি তো এখানে নেই। আজ চন্দননগরে চলে গিয়েছেন। তোমরা বরং আর একদিন এসো।"

পথশ্রমে অবসন্নপ্রায় দুই বন্ধুর মুখে তখন কথা সরিতেছে না। হতাশ হইয়া উভয়ে ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, দ্বারের আড়াল হইতে হাতছানি দিয়া কে একজন গোপনে তাঁহাদের ডাকিতেছেন। নাগমশাইর দৃঢ় ধারণা হইল, ইনিই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যগ্রভাবে তিনি ও সুরেশ কক্ষমধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

পরে উভয়ে জানিলেন, যে শ্মশ্রুধারী সাধকটি মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদের সরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার নাম প্রতাপ হাজরা। দীর্ঘদিন ঠাকুরের কক্ষের পাশে বাস করিয়াও তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নয়, সুযোগ পাইলেই ঠাকুরের তরুণ দর্শনার্থীদের তিনি বিভ্রান্ত করিতেন, তাহাদের মনে ধোঁকা লাগাইয়া দিতেন।

সর্বজ্ঞ ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু সেদিন শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত নাগমশাইকে চিনিতে একটুও ভুল করে নাই। তাঁহার গোপন হাতছানিটি এক অযাচিত কৃপার মতোই নাগমশাইর জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

ঠাকুরের দর্শন পাইয়া নাগমশাইর আনন্দের অবধি রহিল না। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কক্ষের একপাশে গিয়া বসিলেন।

ঠাকুর সস্নেহে নাগমশাই ও সুরেশের নাম-ধাম পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন, "সংসারে থাকিবে ঠিক যেন পাঁকাল মাছের মতো।"

বিদায়ের সময় স্নেহভরে নাগমশাইকে কহিলেন, "আর একদিন এসো।"

যাইতে যাইতে নাগমশাই ভাবিতে থাকেন, কই ঠাকুর তো কৃপা করিয়া একবারও চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন না! অথচ এই চরণের জন্য যে তাঁহার লোভের অন্ত নাই।

পরের দিন নাগমশাই আসা মাত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-তন্ময় হইয়া পড়িলেন, তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো, তুমি না ডাক্তার? একবার দেখ দেখি আমার পায়ে কি হয়েছে।"

নাগমশাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া উত্তর দিলেন, "কই পায়ে তো কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।"

"ওগো, আরো একটু ভাল ক'রে দেখনা কি হয়েছে!"

মুহূর্তমধ্যে নাগমশাইর অন্তরে চিন্তার রশ্মি খেলিয়া গেল। এতো অন্তর্যামী ঠাকুরের ছল ছাড়া আর কিছু নয়। ভক্তের মনের ক্ষোভটি এক মুহূর্তে তিনি জানিয়া নিয়াছেন। তাই কৃপা করিয়া মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলেন। চরণ স্পর্শের অধিকার এভাবে দিয়া তাঁহাকে ধন্য করিলেন।

ঠাকুবেব কবুণাব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই নাগমশাই বলিতেন, "তাঁব কাছে কোনো কিছু চাইবাব দবকাব হতো না। মনেব ভাব বুঝে তৎক্ষণাৎ তিনি তা পূবণ কবতেন। ভগবান্ শ্রীবামকৃষ্ণ হচ্ছেন কল্পতবু। যে যা তাঁব কাছে প্রার্থনা কবেছে, তাই সে তখনি লাভ কবেছে।"

কিছুদিন পবেব কথা। শ্রীবামকৃষ্ণ সেদিন নিজেব দেহটিব দিকে অঙ্গুলি প্রসাবিত কবিষা নাগমশাইকে কহিলেন, "হ্যাঁগা, তোমাব একে কি বোধ হয ?"

পবম ভক্ত যুক্তকবে বলিযা উঠিলেন, "ঠাকুব, আব আমায বলতে হবে না। আমি আপনাবই কৃপায জানতে পেবেছি—আপনি সেই !"

কথা কযটি শোনামাত্র দিব্য ভাবে ঠাকুব উদ্দীপিত হইযা উঠেন, ভাবাবিষ্ট হইযা নাগমশাইব বক্ষে তিনি চবণ স্থাপন কবেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তেব হৃদযে জাগিযা উঠে অনুভূতি। নাগমশাই দেখেন, সমস্ত বিশ্বচবাচব হইযা উঠিযাছে চিন্ময, স্বর্গীয জ্যোতি সেখানে ওতপ্রোত।[১]

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীবামকৃষ্ণেব কক্ষে নাগমশাই একদিন বসিযা বহিযাছেন। এমন সময নবেন্দ্রনাথ (উত্তবকালেব স্বামী বিবেকানন্দ) সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেদিন তিনি অদ্বৈতভাবে ভাবিত ও উদ্দীপিত। অস্ফুট স্ববে কেবল বলিতেছেন, "চিদানন্দ বূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।"

শ্রীবামকৃষ্ণ নাগমশাইব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কবিষা নবেন্দ্রকে কহিলেন, "এই দ্যাখো, এরই বযেছে ঠিক ঠিক দীনতা, এতটুকুও ভান এতে নেই।"

ঠাকুবেব কথা মানিযা নিযা নবেন্দ্র উত্তব দিলেন, "তা আপনি যখন বলছেন, তা হবে।"

নাগমশাই ও নবেন্দ্রনাথ উভযেব মধ্যে আলাপ শুবু হইল। নাগমশাই শ্রদ্ধাভক্তি পথেব পথিক, কহিলেন, "সকলি তাঁব ইচ্ছেব হচ্ছে, আমবা নিমিত্ত মাত্র ছাড়া আব কি বলুন।"

নবেন্দ্রনাথ তাহা মানিবেন না। উত্তবে কহিলেন, "মশাই, তিনি, তাঁব এসব বুঝিনে। সবই আমি—আমিই পবমাত্মা—আনন্দময জ্ঞানময, সর্বশক্তিমান্। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আমাবই ভেতবে ডুবছে ভাসছে।"

"মশাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তো দূবেব কথা, আপনাব কি সাধ্য যে একটা চুলও সোজা কবেন ? তাঁব ইচ্ছে না হলে গাছেব পাতাটাও নড়ে চড়ে না।"

নবেন্দ্রনাথ সেই অদ্বৈত ভাবেবই অনুসবণে বলিযা চলিযাছেন, "আমি ইচ্ছা কবলে চন্দ্র সূর্যেব গতি বোধ হয—আমাব ইচ্ছায এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রেব মতো চালিত হচ্ছে।"

তক্তাপোশটিব উপবে বসিযা ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্ণ উভযেব কথা শুনিতেছিলেন। এবাব সস্নেহ হাসি হাসিযা নাগমশাইকে বলিলেন, "কি জানো, নবেন হচ্ছে খাপখোলা তবোযাল—ওব ওকথা শোভা পায বটে। তা নবেন এমন বলতে পাবে।"

নাগমশাইব কাছে ঠাকুবেব কথা চবম কথা। ইহাব পব আব আলোচনা, তর্ক বা

১ সাধু নাগমশাই : শবৎচন্দ্র চক্রবর্তী

বিচার আর চলে না। নরেন্দ্রনাথের চরণে শির ঠেকাইয়া তিনি নীরব হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইল, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান লীলা-পার্ষদ, তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার বা তর্ক করার অবকাশ নাই।

একবার জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, সত্যকার কোনো মহাপুরুষ নাগমশাই দেখিয়াছেন কিনা? তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দেন, "হ্যাঁ। সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছি, আর দর্শন করেছি তাঁর সর্বপ্রধান পার্ষদ—শিবাবতার স্বামীজীকে।"

নাগমশাই শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসিবার পর কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়াছে। সেদিন তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন—ঈশ্বরীয় কথায় তিনি রত। এক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন, "দ্যাখো, ডাক্তার উকীল মোক্তার দালাল এদের ঠিক ঠিক ধর্মলাভ হওয়া বড় কঠিন।"

প্রসঙ্গক্রমে আরো কহিলেন, "এতটুকু ওষুধে মন পড়ে থাকবে, তা'হলে কি ক'রে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হতে পারবে?"

কথাকয়টি নাগমশাইর প্রাণে বড় বাজিল। সত্যই তো। তিনি নিজের অভিজ্ঞতায়ও আজকাল দেখিতেছেন, ধ্যান-ধারণার সময় রোগীদের মূর্তি আসিয়া মনের কোণে ভিড় জমায়, সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে। ঠাকুর ঠিকই বলিয়াছেন, যে বৃত্তি বা ব্যবহারিক কর্ম ঈশ্বর লাভের বিঘ্নস্বরূপ তাহা দিয়া তাঁহার কাজ নাই। আজ হইতেই এসব ত্যাগ করিবেন।

গৃহে ফিরিবার পর সেইদিনই ডাক্তারির বই, যন্ত্রপাতি ও ঔষধ ইত্যাদি সব কিছু গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া আসিলেন।

কাজকর্মের দিক হইতে মুক্ত হইয়া এবার আরো দৃঢ় একনিষ্ঠা নিয়া তিনি সাধন-ভজন করিয়া যাইতে থাকেন। বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে বড় তীব্র হইয়া উঠে। মনে মনে স্থির করেন, এ সংসারে আর থাকা নয়, চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন।

ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি সংসার ত্যাগের অনুমতি নিতেই গিয়াছেন। কক্ষমধ্যে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে শুনিলেন, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "তা সংসার আশ্রমে দোষ কি? তাঁতে মন রাখলেই হয়। গৃহস্থাশ্রম কেমন জানো? এ যেন কেল্লার ভেতর থেকে লড়াই করা।"

এবার নাগমশাইর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "ওগো, তুমি জনকের মতো গৃহস্থাশ্রমে থাকবে। তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে।"

ঠাকুরের এই আদেশ মুহূর্তমধ্যে নাগমশাইর মর্মে গিয়া বিদ্ধ হইল।

বৈরাগ্যের আগুন সেদিন তাঁহার সর্ব সত্তায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অন্তর্জ্বালায় তিনি সদা অস্থির, কিন্তু উপায় তো কিছু নাই। ঠাকুরের এ আদেশ যে অলঙ্ঘনীয়!

ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা এখন হইতে বহুগুণ বর্ধিত হয়, নাগমশাই উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন। সংসারজীবনের কোনো কাজকর্ম আর তাঁহার দ্বারা হইবার নয়।

এই সময়ে নাগমশাইকে কিছুদিনের জন্য একবার স্বগ্রাম দেওভোগে আসিতে হয়। পত্নী স্বামীর অবস্থা দেখিয়াই বুঝিলেন, ঈশ্বরের জন্য তিনি পাগল হইয়া উঠিয়াছেন, সংসারের কোনো বন্ধনই আর তাঁহাকে বাঁধিতে সক্ষম নয়। নাগমশাই নিজেও স্পষ্টভাবে

বলিয়া দিলেন, রামকৃষ্ণ চরণে যে মন প্রাণ একবার সমর্পণ করিয়াছেন সংসারের কোনো কাজেই আর তাহা আসিবে না।

সেদিন তিনি চুপচাপ বারান্দায় বসিয়া আছেন। গৃহের পাশের জমিটাতে জন্মিয়াছে একটি সতেজ লাউগাছ। প্রতিবেশীদের একটি গরু এই গাছটার দিকে বার বার ঝুঁকিতেছে, কিন্তু দড়িটা খাটো করিয়া বাঁধা, তাই উহার নাগাল পাইতেছে না। এই দৃশ্যটি দেখিয়া নাগমশাইর হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি গরুর খুঁটাটি উপড়াইয়া দিয়া সস্নেহে কহিলেন, "খাও মা, খাও, এগিয়ে গিয়ে খাও।"

বৃদ্ধ পিতা দীনদয়াল নিকটেই ছিলেন। পুত্রের এই কাণ্ড দেখিয়া রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "নিজে তো কিছু উপার্জন করিসনে, তার ওপর আবার রয়েছে ওসব অনিষ্ট করার ঝোঁক। ডাক্তারিটা তো ছেড়ে দিয়ে বসলি, এবার খাবি কি ক'রে বল্‌তো?"

নাগমশাই উত্তরে কহিলেন, "ভগবান্ যা হোক একভাবে চালিয়ে নেবেনই। আপনি এ বয়সে সাংসারিক এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।"

"ওরে, চলবে যে কিভাবে, তাতো বুঝতেই পারছি। এবার ন্যাংটো থাকবি আর ব্যাঙ ধরে খাবি।"

অতঃপর দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। নাগমশাই পিতার কথার কোনো জবাব দিলেন না, মুহূর্তমধ্যে নিজের পরিহিত বস্ত্রটি খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গ হইলেন। গৃহের অঙ্গনের এক কোণে একটি ব্যাঙ পড়িয়া ছিল। এটিকে মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে পিতাকে কহিলেন, "আপনার যাতে সত্য রক্ষা হয়, এজন্য দুটো আজ্ঞাই আমি পালন করলাম। এবার মিনতি করে বলছি, আপনি সংসারের চিন্তা করবেন না। বয়স হয়েছে, এবার থেকে বসে বসে কেবল ভগবানের নাম করুন।"

পুত্রের এই অদ্ভুত আচরণে দীনদয়াল বড় ঘাবড়াইয়া গেলেন। সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি দিয়া তিনি বুঝিয়া নেন 'ভগবান্ ভগবান্' করিয়া পুত্র এবার একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে। শঙ্কিত কণ্ঠে পুত্রবধূকে ডাকিয়া কহেন, "দ্যাখো, তোমরা ওর সঙ্গে এখন থেকে বুঝে-সুঝে চলো। ওর বিরুদ্ধাচরণ কখনো ক'রো না।"

কলিকাতায় ফিরিবার পর নাগমশাই সেদিন ব্যস্তসমস্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণোপান্তে বসিয়া সখেদে কহিলেন, "তাঁর ওপর নির্ভর হলো কই। এখনো তো নিজের চেষ্টা রয়েই গিয়েছে?"

ঠাকুর নিজের দেহটি দেখাইয়া কহিলেন, "ভয় নেই, এখানকার টান থাকলে সব ঠিক ঠিক হয়ে যাবে।"

আরেক দিন ঠাকুর তাঁহার এই বৈরাগ্যবান্ ভক্তকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "দ্যাখো, তুমি গৃহেই থেকো। যেনতেন ক'রে মোটা ভাত কাপড়ে চলে যাবে।"

ঘরসংসারের উপর, বিষয়-আশয়ের উপর নাগমশাইর রহিয়াছে সহজাত বিতৃষ্ণা। ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু, গৃহে থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়ই বা কি ক'রে?"

"ওগো, আমি বলছি, সত্য সত্যই বলছি, ঘরে থাকলে তোমার কোনো দোষ হবে না। তোমায় দেখে লোকে অবাক্ হবে।"

"কি ক'রে গৃহস্থাশ্রমে দিন কাটবে।"

"তোমার কোনো কর্মে লিপ্ত হতে হবে না। কেবল সাধুসঙ্গ করবে।"

"ঠাকুর, আমি যে হাঁদা লোক, সত্যিকারের সাধু চিনবো কি ক'রে?"

"তোমার সাধু খুঁজতে হবে না। যথার্থ সাধুরা নিজে এসে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। এজন্য ভেবো না।"

পিতা দীনদয়ালের রোজগার ছিল মহাজন পালচৌধুরীদের কুতের কাজে। তিনি অবসর নিয়া গ্রামে যাইবার পর নাগমশাই কিছুদিন একাজ দেখাশুনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বর লাভের জন্য তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন, একাজ চালানোর মতো মনোবৃত্তি মোটেই নাই। ভাগ্যক্রমে রণজিৎ নামে একটি তরুণ কর্মী পাওয়া যায়। নাগমশাইর কাজ সুষ্ঠুভাবে সে-ই চলাইয়া নিতে থাকে।

এবার মনে মনে ঠিক করিলেন, ঐ কাজ রণজিৎকেই ছাড়িয়া দিবেন। যদি সে দয়া করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে কিছু দেয় ভাল, নতুবা ইহা নিয়া আর মাথা ঘামাইবেন না।

মনিব পালচৌধুরীর মধ্যস্থতায় স্থির হইল, কুতের কাজ হইতে যে আয় হইবে তাহার অর্ধেকটা নাগমশাই পাইবেন। ইহার ফলে তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের কোনো অসুবিধা হইবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের কানে এ নূতন বন্দোবস্তের কথা উঠিল। নাগমশাইর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে জানিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঠাকুর কহিলেন, "তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে।"

আহার বিহারের দিক দিয়া নাগমশাই ছিলেন, কৃচ্ছ্রব্রতী। সারা দিনের শেষে দুই গ্রাস আহার্য মুখে পুরিয়া তিনি উঠিয়া পড়িতেন। কেহ এ সম্পর্কে অনুযোগ দিলে কহিতেন, "যতদিন দেহ আছে কিছু টেক্স দিতেই হবে, তাই দিচ্ছি। বেশী খেলে বা ভালো কিছু খেলে জিহ্বার যে সুখেচ্ছা হবে।"

এই সদা সতর্ক সাধক নিজের ত্রুটি বিচ্যুতিকে কোনোদিন এতটুকুও ক্ষমা করেন নাই। কোনোক্রমে কাহারো উপর হয়তো নাগমশাই রুষ্ট হইয়াছেন, মুখ দিয়া হঠাৎ অশ্রদ্ধাসূচক কথা বাহির হইয়াছে। আর রক্ষা নাই। নিজ দেহকে তিনি নিষ্ঠুরভাবে শাসন না করিয়া ছাড়িবেন না। সে-বার এক ব্যক্তি সম্বন্ধে নিন্দাত্মক ভাষা অতর্কিতে তিনি ব্যবহার করিয়া ফেলেন। ইহার শাস্তিস্বরূপ তখনি একখণ্ড পাথর তুলিয়া নিয়া নিজ মস্তকে প্রহার করিতে থাকেন। ফলে মস্তক ফাটিয়া এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে নাগমশাই নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে উত্তর দিলেন, "বেশ হয়েছে, যে যেমন পাজি, তেমন শাস্তি তো তার দরকার।"

নাগমশাইর আর এক অভ্যাস, দেহ-মনকে বশ রাখার জন্য মাঝে মাঝে তিনি নিরম্বু উপবাস করিতেন। সে-বার কয়েকদিন উপবাসের পর তিনি সবেমাত্র রান্নার যোগাড় করিতেছেন এমন সময় তাঁহার বন্ধু সুরেশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কোনো কারণে এই বন্ধুটির প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব তাঁহার মনে জাগ্রত হয়। তখন অস্ফুটস্বরে নাগমশাই বলিয়া উঠিলেন, "হায়, এখনো আমার মনের ময়লা কাটলো না, অন্যায় মনোবৃত্তি দূর হলো না।" প্রায়শ্চিত্ত সাধনে তাঁহার এক মুহূর্তও দেরি হয় না। ভাতের হাঁড়িটি অবলীলায় ভাঙিয়া ফেলিলেন। সেদিনও তাঁহাকে উপবাসে কাটাইতে হইল।

গিরিশ ঘোষকে তাই নাগমশাই সম্পর্কে বলিতে শুনা যাইত, "অহং শালাকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে নাগমশাই তার মাথা ভেঙে ফেলে দিয়েছেন, তার আর মাথা তোল্‌বার যো আছে কোথায় ?"

ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের নরদেহের লীলা এবার আসিয়াছে শেষ পর্যায়ে। কাশীপুরে গোপালবাবুর বাগানবাড়িতে দুশ্চিকিৎস্য ক্যান্সার রোগে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া আছেন। ভক্তপ্রবর নাগমশাই বুঝিয়াছেন, ঠাকুরের লীলাসংবরণের দিনটি আসন্ন। কিন্তু তাঁহার মন যে এ দুর্দৈবকে স্বীকার করিয়া নিতে চায় না। একান্ত নিষ্ঠায় নিজের সবকিছু তিনি ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। সেই প্রাণপ্রভু ঠাকুর এবার যদি অপ্রকট হন্‌ তবে ভক্ত নাগমশাইর জীবন ধারণে কি লাভ ? তাছাড়া, এই রোগযন্ত্রণা ভোগের দৃশ্যও যে তাঁহার পক্ষে দুঃসহ।

নাগমশাই বলিয়াছেন, "ঠাকুরের রোগের যাতনা দেখা দূরের কথা, স্মরণ করতেও হৃৎপিন্ড যেন ফেটে যেত। ঠাকুর স্বেচ্ছায় নিজ শরীরে এ রোগ রেখে দিলেন, আমরাও কোনোমতে তাঁর যন্ত্রণার লাঘব করতে পারলাম না। তাই তাঁর কাছে না গিয়ে নীরবে ঘরের ভেতরেই বসে রইলাম। শুধু মাঝে মাঝে তাঁকে গিয়ে দর্শন ক'রে আসতাম।"

বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ সেদিন নাগমশাই ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছেন। ঠাকুরের ক্যান্সারের ঘায়ে তখন তীব্র বেদনা। ভক্ত নাগমশাইকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাগো, তুমি এসেছো ? এসো, আরো এগিয়ে এসে আমার গা ঘেঁষে বসো। তোমার শান্ত শীতল দেহ স্পর্শ করলে আমার জ্বালা যন্ত্রণা কমবে।"

কথা কয়টি বলিয়াই ঠাকুর এই পরম ভক্তকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন, ভাবাবেশে বহুক্ষণ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিলেন।

আর একদিনের কথা রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুর নাগমশাইকে সংবাদ দিয়া নিকটে ডাকাইয়া আনিয়াছেন। নাগমশাই কক্ষে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওগো, তুমি এসেছো ? এই দ্যাখোনা, ডাক্তার কবিরাজেরা তো সব হার মেনে গিয়েছে। তুমি কি কিছু ঝাড়ফুঁক জানো ? জানো তো দ্যাখো দিকি যদি কিছু উপকার করতে পারো।"

মুহূর্তমধ্যে মহাভক্ত নাগমশাইর চোখ দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ঠাকুরের এ তীব্র যন্ত্রণা, এ দুঃসাধ্য ক্যান্সার দূরীভূত করা তো তাঁহার পক্ষে অসাধ্য নয়। ঠাকুরের জীবন জ্যোতির আলো যে প্রতিফলিত তাঁহার সাধনসত্তায়, তাহারই শক্তিতে তিনি শক্তিমান্‌ !

ভাবাবিষ্ট নাগমশাই বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, জানি, আপনার কৃপায় সব আমি জানি। এখনি আমি এ রোগ সারিয়ে দিচ্ছি।"

উপস্থিত ভক্ত শিষ্যেরা সবিস্ময়ে তাকাইয়া আছেন। নাগমশাই শয্যার পাশে আগাইয়া আসিতেই ঠাকুর বুঝিলেন, যে সংকল্প ভক্ত হৃদয়কে আজ উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে তাহা অমোঘ। তাই তাড়াতাড়ি তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া একাজ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তারপর অস্ফুট স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ওগো, জানি, তা তুমি পারো, এ রোগ তুমি সারাতে পারো।"

লীলা সংবরণের কয়েক দিন আগের কথা। অন্যান্য ভক্তের সহিত নাগমশাইও সেদিন উপস্থিত। ঠাকুর নিম্নস্বরে কহিতেছেন "এ সময়ে কি আমলকী পাওয়া যায়? মুখটা বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে। আমলকী চিবুতে পারলে ভালো হতো।"

এসময়ে আমলকী জন্মে না। ভক্তেরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন। একজন বলিয়া বসিলেন, "এ সময়ে এ ফল আর কোথা থেকে সংগ্রহ করা যাবে?"

ভক্ত নাগমশাইর মনে চিন্তা খেলিয়া গেল—ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়া আমলকীর কথা যখন বাহির হইয়াছে, এবস্তু অবশ্য কোথাও না কোথাও মিলিবে।

নিঃশব্দে তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তারপর শুরু হইল গ্রামে গ্রামে বনে বাদাড়ে আমলকীর জন্য অবিরাম অন্বেষণ। আহার নিদ্রা ভুলিয়া এই কাজেই তিনি দিনরাত ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

তিন দিনের দিন পরিশ্রম তাঁহার সফল হইল, আমলকী সংগ্রহ করিয়া তিনি কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর বালকের মতো আনন্দমুখর হইয়া উঠিলেন, "আহা, এ অসময়ে এমন চমৎকার আমলকী। তুমি কোথা থেকে যোগাড় করলে গো।"

এই তিনটি দিন নাগমশাইর খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয় নাই। তাড়াতাড়ি নিচতলার নিয়া গিয়া তাহাকে ভোজনে বসানো হইল। সেদিন ছিল একাদশীর উপবাস, নাগমশাই তাই আহার্য স্পর্শ করিতে রাজী নন। অবশেষে ঠাকুর ঐ অন্নব্যঞ্জন মুখে ঠেকাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলে তবে নাগমশাই উহা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করিলেন। বিষাদখিন্ন নাগমশাই এবার কলিকাতা বাস উঠাইয়া চলিয়া গেলেন স্বগ্রাম দেওভোগে। অন্য কোথাও বাস করার প্রস্তাব কেহ দিলে দৃঢ়স্বরে কহিতেন, "ঠাকুর, আমায় গৃহে থাকতে বলে গিয়েছেন। তাঁর বাক্য এক চুল লঙ্ঘন করি, এমন সাধ্য আমার কই?"

এই গৃহাশ্রমে অবস্থান করিলেও মাঝে মাঝে তাঁহার গুরুধাম কলিকাতায়ও তিনি আসিতেন। রামকৃষ্ণ-ভক্তদের সহিত পরমানন্দে কিছুদিন কাটাইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেন স্বস্থানে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হইবার পর নাগমশাই ভাবিলেন, দেওভোগের প্রান্তে একটা কুটীর বাঁধিয়া তিনি নিভৃতে বাস করিবেন। কিন্তু ইহার প্রয়োজন হইল না। পত্নী কোনোদিনই তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের অন্তরায় হন নাই। স্বামীর মনোভাব টের পাইয়া আগে হইতেই তিনি আশ্বাস দিলেন, "দ্যাখো, নিজের দেহ-সুখের জন্য কোনো দিনই আমি তোমায় বিরক্ত করি নি, ভবিষ্যতেও কখনো করবো না। তবে এ পৃথক বাসের দরকার কি?"

সাধ্বী জীবনসঙ্গিনীর এ কথায় তিনি আশ্বস্ত হন, গৃহে থাকিয়া গৃহস্থ সন্ন্যাসী-রূপেই দীর্ঘ দিন করেন অতিবাহিত।

নাগমশাইর স্ত্রী স্বামীর পুণ্যময় জীবন ও তাঁহার দেহ-সংযম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তাঁর শরীরে কী মনে কোনো রকম মানবীয় বিকার বা পরিবর্তন কখনো দেখা যায় নি। 'জয় রামকৃষ্ণ' ব'লে জৈবভাবের মাথায় লাথি মেরে তিনি চলে গিয়েছেন। আগুনের ভেতরে তিনি বাস করেছেন বটে, কিন্তু এক দিনের তরে তার শরীর দগ্ধ হয় নি।"

পিতা দীনদয়াল পুত্রের এই তীব্র বৈরাগ্যনিষ্ঠা ও বিষয়-বিতৃষ্ণা কোনোদিনই পছন্দ করিতেন না। একবার খুব তিরস্কার করার পর নাগমশাই উত্তেজিত স্বরে উত্তর দেন, "আমার আবার খাওয়া পরার জন্য চিন্তা কি? গাছে পাতা রয়েছে প্রচুর তাই খেয়ে দিন কাটাবো। আর আমি জীবনে কোনোদিন স্ত্রীসঙ্গ করিনি, মাতৃগর্ভ থেকে যেমন পড়েছিলাম, এখনো তেমনি আছি—কাপড়-চোপড় পরবার আমার দরকার নেই।"

কামিনী ও কাঞ্চন উভয় বস্তুতেই এই রামকৃষ্ণময় ভক্তের ছিল সমান বিতৃষ্ণা।

সে-বার নারায়ণগঞ্জে পালবাবুদের এক আত্মীয় বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়, ক্রমে রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়া উঠে। ইঁহারা নাগমশাইর চিকিৎসা নৈপুণ্যের কথা জানিতেন। তাঁহাকে ডাকা হইল এবং তাঁহার ঔষধে রোগী বাঁচিয়া উঠিল। পালদের কর্তাবাবুর কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। স্বয়ং দেওভোগে আসিয়া নাগমশাইকে বহু সাধুবাদ করিলেন এবং পারিতোষিক স্বরূপ তিনশত টাকা তাঁহাকে দিতে চাহিলেন, কিন্তু কাহার সাধ্য চিকিৎসককে এ টাকা গ্রহণে সম্মত করায়? অবশেষে বেশী পীড়াপীড়ি করা হইতে থাকিলে নাগমশাই ক্রন্দন শুরু করিলেন। কহিলেন, "হায় ঠাকুর! কেন তুমি আমায় চিকিৎসকের এ হীন বৃত্তি শিখিয়েছিলে, তাতেই তো অর্থের প্রলোভন নিয়ে এরা বার বার চেপে ধরছে, আর আমার এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে।"

তাঁহার এ অদ্ভুত অনাসক্তি দেখিয়া বৃদ্ধ পালমহাশয় সেদিন বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি কখনো মানুষ নও!"

কলিকাতার চিকিৎসক জীবনে নাগমশাই সে-বার এক কাণ্ড করিয়া বসেন। পালচৌধুরীদের এক রোগীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ফরিদপুরের ভোজেশ্বরে যাইতে হয়। রোগী আরোগ্য লাভ করার পর তিনি কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন। গদির বাবুরা এসময়ে তাঁহাকে একটি নূতন কম্বল ও পাথেয় বাবদ আটটি টাকা দিয়া দেন।

স্টীমার তীরে ভিড়িতেছে। নাগমশাই টিকিট কিনিতে যাইবেন এমন সময় এক ভিখারিণী কয়েকটি শিশুসন্তানসহ সম্মুখে উপস্থিত। দুঃখিনীর কান্না ও কাতরোক্তি শুনিয়া তিনি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না, হাতের সব কয়টি টাকা ও কম্বলটি তাহাকে দিয়া কহিলেন, "মা, এই নিয়ে তুমি সন্তানগুলোকে বাঁচাও, নিজের প্রাণ রক্ষা করো।"

প্রাণভরা আশীর্বাদ জানাইয়া ভিখারিণী চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে স্টীমার ছাড়িয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণ স্টেশনে বিশ্রাম করার পর নাগমশাই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। এখান হইতে হাঁটিয়াই কলিকাতায় যাইবেন। পথ দীর্ঘ—হাতে রহিয়াছে মাত্র সাত আনা পয়সা। তা হোক্, তবুও তো ভিখারিণী আর তার ছেলেমেয়ের কয়েকদিন বাঁচার ব্যবস্থা করা গেল।

এই পদযাত্রার কাহিনী বড় বিচিত্র। পথে যেদিন দেবস্থান পড়ে ও প্রসাদ মিলে সেদিন খাওয়া হয়। বড় নদী নালা সম্মুখে পড়িলে খেয়ানৌকা যোগে তিনি পার হন, আর সেগুলি অপরিসর হইলে সাঁতরাইয়া পার হন। এমনি কষ্টের মধ্য দিয়া

ঊনত্রিশ দিন পরে নাগমশাই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। রোগীদর্শনের পর এমন পদযাত্রার অভিজ্ঞতা হয়তো খুব কম চিকিৎসকের ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে।

সদ্‌গুরুর আদেশে নাগমশাই সারা জীবন গৃহেই অতিবাহিত করিয়া যান, আর আপন ত্যাগবৈরাগ্য ও সাধনার বলে এই গৃহ পরিবেশকে তিনি করিয়া তোলেন পরম পুণ্যময়। গার্হস্থ্য ধর্মের এক মহনীয় রূপ ফুটিয়া উঠে এই শিবের গৃহী মহাপুরুষের জীবনে।

নাগমশাইর সাধননিষ্ঠার খ্যাতি এ সময়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে মাঝে মাঝে তাঁহার গৃহে ভক্ত দর্শনার্থীরা আসিয়া জুটিত। এই সব অতিথিদের সেবা পরিচর্যার সুযোগ পাইলে সাধু নাগমশাইর উৎসাহের সীমা থাকিত না। তাঁহার দৃষ্টিতে এই অভ্যাগতেরা ছিলেন নারায়ণস্বরূপ।

ইঁহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি কহিতেন, "জান্‌বে, এ সকলই ঠাকুরের লীলা। ঠাকুর লীলা-শরীরে এক ছিলেন, এবার তিনিই আবার নানা মূর্তিতে আমার কৃপা করতে আসছেন অতিথিরূপে।"

নাগমশাই এক পুরাতন শূলব্যথাতে ভুগিতেন। সেদিন বড় তীব্র ব্যথা শুরু হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে তিনি অজ্ঞান হইয়াও পড়িতেছেন। এসময়ে হঠাৎ সাত-আটজন ভক্ত অতিথি আসিয়া উপস্থিত। অথচ ঘরে একমুঠি চাল নাই, এতগুলি লোকের খাবার কি করিয়া যোগাড় হইবে? অগত্যা এই অসুস্থ শরীর নিয়াই নাগমশাইকে বাজারে যাইতে হইল। তিনি নিজে না গেলে দোকান হইতে চাল-ডাল ধারে পাইবার কোনো উপায় নাই।

জিনিসপত্র ক্রয়ের পর নাগমশাই বোঝাটি মাথায় তুলিয়া নিলেন। অপরকে দিয়া কখনো তিনি নিজের মোট বহনের কাজ করান না, ইহা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু গৃহে অতিথি নারায়ণ উপস্থিত। সেবায় বড় বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। তাই অসুস্থ শরীরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি মোট বহন করিয়া চলিলেন।

শূলে বেদনায় শরীর বড় দুর্বল। বার বার মাথার বোঝা নামাইয়া বিশ্রাম করিতে হইয়াছে। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া অভ্যাগতদের কাছে যুক্তকরে কহিতে লাগিলেন, "হায়, হায়। আপনাদের চরণে অপরাধী হলাম। সেবার কাজে দেরি হয়ে গেল।"

শুধু নাগমশাইর নয়, এ ধরনের সেবানিষ্ঠা তাঁহার স্ত্রীর মধ্যেও দেখা যাইত। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ হয়তো অতিথিদের আগমন হইয়াছে। অমনি এই সেবাব্রতী মহিলা একটি ডালা হাতে করিয়া প্রতিবেশীদের বাড়িতে আতপ চাল ধার করিতে ছুটিলেন। কেহ ইহাতে আপত্তি উঠাইলে নাগমশাই প্রবোধ দিতেন, "দ্যাখো, এ সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের দয়া। এর ভেতর দিয়ে আমাদের দুজনেরই পরীক্ষা হচ্ছে।"

তখন ঘোর বর্ষাকাল। সারা দিন রাত ব্যাপিয়া অঝোরে বৃষ্টি ঝরিতেছে। রাত্রিতে নাগমশাইর গৃহে দুইটি অতিথি দর্শন দিলেন। খাওয়া-দাওয়া তো একপ্রকার মিটিয়া গেল, এবার গোল বাধিল শয়নের ব্যবস্থা নিয়া। চারখানি ঘরের তিনখানিই অব্যবহার্য, চাল দিয়া অবিরল ধারে জল পড়িয়াছে। শুধু একটিমাত্র ঘর বাসোপযোগী, বর্তমানে সেইটিই নাগমশাইর শয়নগৃহ।

ভক্তপ্রবর পত্নীকে ডাকিয়া কহিলেন, "দ্যাখো, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য! এই

দুর্যোগের রাতেও অতিথি সেবার সুযোগ আমরা পেয়ে গিয়েছি। অতিথি নারায়ণের সেবার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে পারবে না। এসো আজ আমরা ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে ঠাকুরের নামজপ করতে করতে রাতটা কাটিয়ে দিই।"

পতি পত্নী এইভাবেই সারা রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

ভৃত্য বা ঘরামী নিযুক্ত করা নাগমশাই কোনো দিনই পছন্দ করিতেন না। কেহ তাঁহার দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কষ্ট করিবে, ইহা ছিল তাঁহার কাছে অসহ্য। সেবার একটি ঘরের চাল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সংস্কার না করিলে আর চলে না। নাগমশাই সেদিন কোথাও বাহিরে গিয়াছেন, পত্নী এ সুযোগে এক ঘরামীকে ডাকিয়া আনিলেন। চালের সংস্কার কার্য চলিতেছে, এমন সময় নাগমশাই গৃহে ফিরিলেন। ঘরামীকে চালের উপরে কর্মরত দেখিয়াই তো তাঁহার চক্ষুস্থির। সকাতরে কহিতে থাকেন, চাল থেকে নেমে এসো বাবা। দয়া ক'রে নেমে এসো।

পারিশ্রমিকের আশায় ঘরামী কাজ শুরু করিয়াছে, তাহা সে ত্যাগ করিবে কেন?

অবশেষে নাগমশাইর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন, "হায় ঠাকুর, কেন তুমি আমায় এ গৃহস্থাশ্রমে থাকতে বলে গিয়েছো। আমার দুঃখের জন্য একজন মানুষ খাট্‌বে, আর আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখবো? ধিক্ আমার এই সংসারে!"

ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া ঘরামীকে এবার নামিতে হইল। নাগমশাই ব্যস্তভাবে তাহার সেবা পরিচর্যায় রত হইলেন। সযতনে তাহাকে তামাক-সেবন করানো হইল, নিজ-হাতে পাখার হাওয়া দিয়া তাহার শ্রম অপনোদন করিলেন। অতঃপর মজুরির টাকাটি নিয়া তবে সে বেচারা সেদিন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

সেবাব্রতী, নিরীহ পরম শান্ত ভক্ত বলিয়া সবাই নাগমশাইকে জানে। আবার এই নাগমশাইরই ব্যক্তিসত্তায় একদিন ফুটিয়া উঠিত অকুতোভয় তেজোদৃপ্ত যোদ্ধার রূপ। আদর্শ ও ইষ্ট সম্পর্কে যেখানে ঘটে মতের সংঘাত, সেখানেই আত্মপ্রকাশ করে তাঁহার অনমনীয় দৃঢ়তা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো একমুহূর্তে তিনি জ্বলিয়া উঠেন।

সেদিন কি এক কাজে নাগমশাই তাঁহার শ্বশুরগৃহে গিয়াছেন। তখন সেখানে এক বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত। ভদ্রলোকটি কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দাবাদ শুরু করিয়া দিলেন। গুরুনিন্দা শুনিবামাত্র নাগমশাইয়ের ক্রোধের সীমা রহিল না। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "এখানে বসে ঠাকুরের নিন্দা চলবে না মশাই, আপনি এখনি এখান থেকে বেরিয়ে যান।"

ভদ্রলোকটি বড় দাম্ভিক। এ কথা কানে না তুলিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গালাগালি শুরু করিয়া দিলেন।

এবার নাগমশাইর আর ধৈর্য রহিল না। হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "বেরোও শালা এখান থেকে।" সঙ্গে সঙ্গে চলিল ভদ্রলোকটির পৃষ্ঠে জুতা-প্রহার।

নিন্দুকটি এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। অনেকের সম্মুখে এভাবে অপমানিত হইয়া ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন। শাসাইয়া গেলেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে তুমি কেমন সাধু আর কি ক'রেই বা তুমি এ গ্রামে থাকো!"

বাড়ি ফিরিয়া আসার পর নাগমশাই দুঃখে ও অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। গুরু

শ্রীবামকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য কবিযা কহিলেন, "হায, ঠাকুব! কেন তুমি এসব লোককে আমাব সামনে নিযে আসো, আব বসে বসে তোমাব নিন্দা আমায শুনতে হয়। তোমাব আজ্ঞায সংসাব-আশ্রমে থাকতে গিযে একি দুর্দৈব আমায ভুগতে হচ্ছে।"

ভক্তেব এ আর্তি ব্যর্থ হয নাই। কযেক দিন পবে সেই নিন্দুক ব্যক্তিটি নতশিবে নাগমশাইযেব গৃহে আসিয়া উপস্থিত। অনুশোচনায হৃদয তাঁহাব দগ্ধ হইতেছে, সজল নয়নে বাব বাব তিনি ক্ষমা ভিক্ষা কবিতে লাগিলেন।

এই ঘটনাটিব কথা গিবিশ ঘোষ মহাশযেব কানে গিযাছিল। নাগমশাই সে-বাব কলিকাতায আসিলে গিবিশবাবু হাসিযা প্রশ্ন কবিলেন, "আচ্ছা, আপনি তো জুতো কোনোদিন পবেন না, তা হ'লে লোকটিকে মাববাব সময জুতো পেলেন কোথায ?"

নাগমশাই সহজ কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "কেন ? তাব জুতো দিযেই যে সেদিন তাকে মাবলাম।"

দেওভোগেব আশেপাশে জলাভূমিতে বুনো হাঁস ও নানা জাতীয় পাখি বাস কবে। নাবাযণগঞ্জেব পাটকলেব সাহেববা মাঝে মাঝে এগুলি শিকাব কবিতে আসে।

সেবাব দুটি সাহেব এজন্য আসিযা উপস্থিত। তাহাদেব বন্দুকেব শব্দ শুনিযা অহিংসাব্রতী নাগমশাইব অন্তব বেদনার্ত হইযা উঠিল। শিকাবীদেব সম্মুখে তিনি ছুটিযা গেলেন, কবজোড়ে মিনতি জানাইলেন, "আপনাবা নিবস্ত হোন। শুধু শুধু এ নিবীহ প্রাণীগুলোকে হত্যা কববেন না।"

বুক্ষ আকৃতি ও মলিন বেশভূষা দেখিয়া নাগমশাইকে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ মনে কবা কঠিন। তাছাড়া, তাঁহাব কথাব অর্থও বিদেশীবা বুঝিতে পাবিতেছে না। অবজ্ঞাব হাসি হাসিযা আবাব তাঁহাবা বন্দুকে গুলি ভবিল।

এবাব নাগমশাইব পক্ষে আব ধৈর্য ধাবণ কবা সম্ভব নয। তর্জনী তুলিযা উত্তেজিত স্ববে বলিলেন, "না, এবকম অধর্ম এখানে আপনাবা কবতে পাববেন না।"

সাহেববা তাঁহাকে আমল দিতে চাহে না, একটা পাগলেব কথায এ আমোদ তাহাবা ছাড়িযা যাইবে কেন ? শিকাবেব প্রতি লক্ষ্য কবিযা আবাব তাহাবা বন্দুক তুলিল। নাগমশাই মুহূর্ত মধ্যে সিংহবিক্রমে তাহাদেব উপব ঝাঁপাইযা পড়িলেন। স্বভাবতই তিনি ধীব স্থিব, ক্ষীণ কলেবব। কিন্তু এ সময়ে তাঁহাব দেহে অকস্মাৎ সঞ্চারিত হইল প্রচণ্ড শক্তি। অবলীলায সাহেব দুটিকে পবাস্ত কবিযা বন্দুক ছিনাইযা নিযা তিনি গৃহে ফিবিযা আসিলেন।

শিকাবী ইংবেজ দুইটিব পক্ষে এ ধবনেব অপমান হজম কবা শক্ত। ফিবিযা আসিয়া তাহাবা স্থিব কবিল নাগমশাইকে চিবদিনেব মতো শিক্ষা দিযা তবে ছাড়িবে, অবিলম্বে তাহাব নামে ফৌজদাবী মোকদ্দমা বুজু কবিবে।

ইতিমধ্যে ঐ পাটকলেবই এক কর্মচাবীব হাত দিযা নাগমশাই বন্দুক দুইটি পাঠাইযা দেন। নাগমশাই একজন অসামান্য সাধু—অহিংসাকে তিনি পবম ধর্ম বলিযা মনে কবেন, এসব কথা শোনাব পব সাহেববা নবম হইযা পড়ে, তাঁহাব প্রতি কি জানি কেন তাঁহাদেব বড শ্রদ্ধাব সঞ্চাব হয। বলা বাহুল্য, অতঃপব এ ব্যাপাব আব বেশী-দূব গড়ায না।

সর্বজীবে সর্বভূতে নাগমশাই তাঁহার পরম প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিতেন। প্রায়ই তাঁহাকে দেখা যাইত চারিদিকে হাত জোড় করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিতেছেন। এক-বার এক অন্তরঙ্গ ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "প্রায় সময় আপনি এমন হাত জোড় ক'রে থাকেন কেন, বলুন তো ?"

ভক্তপ্রবর উত্তর দিলেন, "কি করবো বলুন, ভূতে ভূতে যে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।"

নাগমশাইর পত্নী বড় প্রতিপ্রাণা। এই পতিই ছিলেন তাঁহার ধ্যেয়, ইষ্ট এবং তাঁহার ছবিটির পূজা প্রতিদিন সম্পন্ন না করিয়া এই ধর্মপ্রাণা মহিলা জ করিতেন না। একবার মহাষ্টমী পূজার দিন তাঁহার ইচ্ছা হয়, নাগমশা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার অর্চনা করিবেন।

নাগমশাই ঘরের মধ্যে কিছুটা অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময় পত্নী স্বামীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিয়া প্রণাম করিলেন।

নাগমশাই শান্ত স্বরে শুধু বলিয়া উঠিলেন, "যাকে আমি পূজা করি, তার সেবা পূজা নেওয়া কি ঠিক ?"

অর্থাৎ, জগন্মাতার প্রকাশ রূপেই যে তিনি স্ত্রীকে দেখিয়া আসিতেছেন, তাঁহার পূজা তাই কি করিয়া নিবেন ?

একবার একটি ভক্ত নাগমশাইকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন নাগমশাইর পত্নী গৃহকর্মে রত, স্বামীর এবং গৃহের অভ্যাগতদের সেবা ও যত্নের জন্য তিনি সদা তৎপর। নবাগত ভক্তটির অন্তরে সন্দেহের ছায়াপাত হইল। ভাবিলেন এ আবার কেমন সাধু ? সংসারকে অসার জ্ঞান করিয়া যে চলিতেছে, তাঁহার আবার ভার্যা নিয়া বাস করা কেন ?

এই চিন্তার তরঙ্গ অন্তর্যামী নাগমশাইর দৃষ্টি এড়ায় নাই। তখনি তিনি উত্তরে কহিলেন, "কেন, কেন ? এতে দোষ কোথায় ? মা অন্নপূর্ণা যে স্বয়ং এ গৃহে বাস ক'রে আমাদের অন্নের যোগাড় ক'রে দিচ্ছেন !"

ভদ্রলোক তো অবাক্ ! নাগমশাইর পত্নী সম্বন্ধে প্রশ্নটি আলোড়িত হইয়াছে তাঁহার মনে, মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলেন নাই। অথচ সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ অন্তস্তলের চিন্তাকে টানিয়া বাহির করিয়া সর্বসমক্ষে তাহার উত্তর দিয়া দিলেন। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় তিনি নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রাণী মাত্রেরই উপর নাগমশাইর ঈশ্বর ভাব, আর নারী মাত্রকেই তিনি দেখেন জগজ্জননীর প্রতীকরূপে। পত্নীকে তিনি চিরকালই যে এই দৃষ্টিতেই দেখিতে অভ্যস্ত।

সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন—ইহা তাঁহার জীবনে ছিল এক উপলব্ধ পরম সত্য। তাই দেখা যাইত, মশা মাছি গায়ে বসিলে তিনি সেগুলি তাড়াইতে পারিতেন না। গৃহ-অঙ্গনস্থিত কোনো গাছের পাতা কেহ ছিঁড়িলে তাঁহার বুকে বাজিত সুতীব্র ব্যথা। সকাতরে বলিয়া উঠিতেন, "আহা, আহা, এমন ক'রে ছিঁড়ো না। জানো এদের ব্যথা বেদনা বোধ রয়েছে আমাদেরই মতো।"

সেবার এক ভক্তের চোখে পড়িল—নাগমশাইর পূজামণ্ডপের বেড়াটিতে অজস্র উই-পোকা বাসা বাঁধিতেছে। শেষে কি সারা ঘর নষ্ট হইবে ? তখনি তিনি একটা বাঁশ দিয়া এই বেড়াটির ওপর সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন। উই-এর বাসা

ঝরিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু উইপোকাও এ সময়ে নিরাশ্রয় হইয়া ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িল।

এ দৃশ্য নাগমশাইর কাছে দুঃসহ। অশ্রুসজল চোখে বিলাপ করিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, "হায় হায়, এ কি অনর্থ আপনি করলেন? এতকাল এরা এই বেড়ার ভেতরে ঘর দোর তৈরি ক'রে বসবাস করছিলো, এবার সে আশ্রয়টুকুও রইল না। বড় অন্যায় করেছেন, বড় অধর্ম করেছেন।"

ভক্তটি নির্বাক ও অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিলেন।

এবার উইপোকাগুলির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাগমশাই করজোড়ে কহিতে লাগিলেন, "আপনারা আবার বাসা তৈরি করুন, আর কোনো ভয় নেই।"

মানুষের ভাষা বুঝুক আর না বুঝুক ভক্তের হৃদয়-আকুতি বুঝিতে বাল্মীকদের ভুল হয় নাই। ক্ষণপরেই আবার সদলবলে আসিয়া তাহারা মণ্ডপের এই বেড়াটি অধিকার করে। বলা বাহুল্য অচিরে উই-এর আক্রমণে ঘরটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

নাগমশাইর বাড়ির পাশেই রহিয়াছে এক পুষ্করিণী। সেদিন একটি জেলে সেখান হইতে এক চুপড়ি মাছ ধরিয়া নিয়া নাগমশাইর বাড়িতে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। সদ্য ধরা হইয়াছে তাই অধিকাংশই তখনো জ্যান্ত।

এগুলির দিকে তাকাইতেই নাগমশাইর হৃদয় গলিয়া গেল। তখনই ঐ এক চুপড়ি মাছ তিনি কিনিয়া ফেলিলেন। তারপর যে পুকুর হইতে এগুলি ধরা হইয়াছিল তাহারই গর্ভে দিলেন বিসর্জন।

ধীবর তো নাগমশাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্। মৎস্য বিক্রয়ের জন্য অতঃপর এবাড়িতে আর কোনোদিন সে আসে নাই।

সে-বার কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ শুরু হইয়াছে। মৃত্যুর সংখ্যা কেবলি চলিয়াছে বৃদ্ধির দিকে। আতঙ্কে বহু লোক শহর ছাড়িয়া এ সময়ে পলাইতে থাকে। পালবাবুরাও কলিকাতা ত্যাগ করিলেন এবং নিজেদের ঘরবাড়ি দেখাশুনার ভার রাখিয়া গেলেন নাগমশাইর উপর।

কয়েক দিনের মধ্যেই গদির একটি মুহুরি প্লেগে আক্রান্ত হয়। এ রোগের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা সেবাপরিচর্যার। সহজে রোগীকে কেহ স্পর্শ করিতে চায় না। নাগমশাই নিজেই প্রাণপণে লোকটির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রোগীর অবস্থা ক্রমেই বড় খারাপ হইয়া পড়িতেছে। এবার সে নাগমশাইকে ধরিয়া বসিল, তাহাকে অবিলম্বে যেন গঙ্গাতীরে নিয়া যাওয়া হয়, সেখানেই সে তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে চায়।

কিন্তু গঙ্গাতীরে তাহাকে অপসারণ করা সহজ নয়, প্লেগ রোগীর ঘরের কাছেও কেহ যে ঘেঁষিতে চাহে না। এ অবস্থায় তাহার দেহ বহন করিবে কে?

কোনো লোক পাওয়া যাইতেছে না, অগত্যা নাগমশাইকে একলাই এই প্লেগ রোগীকে বহন করিয়া নিতে হইল। গঙ্গাতীরে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নাগমশাইর কোলে শুইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। বহু কষ্টে লোক যোগাড় করিয়া মৃত ব্যক্তির সৎকার শেষে নাগমশাই ঘরে ফিরিয়া আসেন।

নাগমশাইর সঙ্গে গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের বড় সম্প্রীতি ছিল। রামকৃষ্ণ-নিষ্ঠ এই দুই ভক্তবীরের মিলনে আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিত।

সেদিন সাধু নাগমশাই গিরিশের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। পরম সমাদরে তখনি তাঁহাকে দোতলার বৈঠকখানায় নিয়া যাওয়া হইল। আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গিরিশের মজলিশে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন।

নাগমশাই শয্যা ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন, উহাতে শয়ন করা দূরের কথা উপবেশনও করেন না। ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের দিকে আর গেলেন না, নিতান্ত দীনভাবে মেজেতে বসিয়া পড়িলেন।

তিনি যে এক উচ্চ স্তরের সাধুপুরুষ ইহা অনেকেরই জানা আছে। সবাই সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ফরাসে বসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, পীড়াপীড়িও শুরু হইল।

গিরিশ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে এই সমাদরের বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। কহিলেন, "থাক্, থাক্, ওঁকে আপনারা আর বিরক্ত করবেন না। উনি যেখানে যে ভাবে বসে সুখী হন, সেই ভাবেই বসুন।"

গিরিশ এবার অনুরোধ জানাইলেন, "নাগমশাই, আজ বড় সৌভাগ্য আপনার মতো লোক দয়া ক'রে এসেছেন। এবার ঠাকুরের কথা কিছু বলুন, সে অমৃত বাণী পান ক'রে আমরা কৃতার্থ হই।"

নাগমশাই দৈন্যের প্রতিমূর্তি। করজোড়ে সজলনয়নে কহিলেন, "আমি মূর্খ দুরাচার, তাঁকে চিনতে পারলাম কই? আপনারা কৃপা করুন যাতে ঠাকুরের পাদপদ্মে সত্যকার ভক্তি জন্মে, জীবন সফল হয়।"

উপস্থিত সবাই এই পরম ভক্তের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন। দৈন্য ও আত্ম-বিলুপ্তির এই মূর্ত বিগ্রহের সান্নিধ্যে বসিয়া নিজেদের অহংবোধও যেন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ সৃষ্টি এই ভক্তবীরের সম্মুখে বসিয়া গিরিশের দুই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি কহিতে লাগিলেন, "তা নইলে কি আর ঠাকুর বলে মানি? যাঁর কৃপাগুণে মানুষের এমন অবস্থা হয়, তাকে কি ভগবান্ না ব'লে থাকা যায়।"

আর একদিনের কথা। নাগমশাই গিরিশের গৃহে আসিয়াছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে। এ সময়ে নিরঞ্জনানন্দ নাগমশাইকে কহিলেন, "মশাই, ঠাকুর বলতেন, নিজেকে দীনহীন মনে করলে মানুষ দীনহীনই হয়ে যায়— আপনি দিনরাত অমন ক'রে আপনাকে দীনহীন মনে করেন কেন?"

নাগমশাই হাত জোড় করিয়া করুণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "সে কি কথা। নিজের চোখে নিরন্তর দেখছি, আমি অতি হীন, অতি অধম, কি ক'রে আমি নিজেকে শিব মনে করবো। আপনি ও কথা বলতে পারেন। আপনারা ঠাকুরের ভক্ত। কিন্তু আমার ও'রকম ভক্তি হলো কই? আপনাদের কৃপা হলে, ঠাকুরের কৃপা হলে আমি যে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো।"

কি অপূর্ব আর্তি ও দৈন্য এই মহাভক্তের বাক্যে আর বাচনভঙ্গীতে। নিরভিমান-তার কি অপরূপ প্রকাশ তাঁহার ব্যক্তিসত্তায়। উপস্থিত সবাই মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরবে বেশ কিছুকাল বসিয়া রহিলেন, বাদ-বিতর্কের ভাষা কাহারও মুখে যোগাইল না।

এই দিনকার ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া গিরিশচন্দ্র উত্তরকালে কহিতেন, "ঠিক ঠিক

দীনতা হ'লে, ঠিক ঠিক অহংবুদ্ধির উচ্ছেদ হ'লে, মানুষের নাগমশাইর মতো অবস্থা হয়। এ সব মহাপুরুষের পাদস্পর্শে ধরণী পবিত্র হয়।"

সে-বারে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে মা সারদামণিকে তিনি দর্শন করিতে যান্। পরম ভক্তের এই মাতৃ-মিলনের মধুর দৃশ্যটি নাগমশাইর চরিতকার শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী বড় সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

"কুমারটুলির বাসায় গিয়া দেখিলাম নাগমশাই মায়ের জন্য কিছু উৎকৃষ্ট সন্দেশ ও একখানি লাল নরুন পেড়ে কাপড় কিনিয়া, যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে বালকের ন্যায় মা মা করিতেছেন। কুমারটুলি হইতে আহিরী-টোলায় আমরা একখানি চল্‌তি নৌকায় উঠিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে বেলুড়ে পৌঁছিলাম। ঘাটে পৌঁছিয়াই নাগমশাই বাতাহত কদলী পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। জয় মা, জয় মা—বলিতে বলিতে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বামী প্রেমানন্দ দূর হইতে নাগমশাইকে দেখিতে পাইয়া মাকে সংবাদ দিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা উপরে উঠিবামাত্র তিনি নাগমশাইকে ধরিয়া ধরিয়া মায়ের নিকট লইয়া গেলেন।

"প্রায় আধঘণ্টা পরে তাহারা মায়ের নিকট হইতে বাহিরে আসেন। তখনও নাগ-মহাশয় ভাবের ঘোরে বলিতেছেন, 'বাপের চেয়ে মা দয়াল। বাপের চেয়ে মা দয়াল!' স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, 'আহা! আজ নাগমশায়ের উপর মা কি কৃপাই করিয়াছেন।' নাগমশায়ের সন্দেশ মা নিজ হাতে তুলিয়া খাইয়া স্বহস্তে তাঁহাকে প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন, তারপর পান দিলেন! কিছুক্ষণ পরে আমরা বিদায় লইলাম।"

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর ধর্মসভায় আলোড়ন তুলিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভক্ত শরৎচন্দ্র নাগমশাইর কাছে যাতায়াত করেন শুনিয়া স্বামীজী তাহাকে ডাকাইলেন, কহিলেন, "বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতা, মধুকর ত্বং খলু কৃতী।" অর্থাৎ আমরা তত্ত্ব অন্বেষণের পেছনে ঘুরে মরছি, কিন্তু মধুকর তুমিই হচ্ছো প্রকৃত কৃতী—তুমিই পান করেছ মধুরস। স্বামীজীর এই মধুকর হইতেছেন রামকৃষ্ণরসে রসায়িত প্রাণ ভক্তপ্রবর নাগমশাই।

সে-বার নাগমশাই বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। দর্শন মাত্রেই ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীজীকে প্রণাম! কোনোমতেই তাঁহাকে ঠেকানো সম্ভব হইল না।

স্বামীজীর শরীর তখন বড় অসুস্থ। নাগমশাই তাই তাঁহার জন্য বড় শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রেমভরে কহিলেন, "ঠাকুর বলতেন, আপনি হচ্ছেন মোহরের বাক্স। ঠাকুরের কথা তো মিথ্যে হতে পারে না। সত্যিই তো মোহরের বাক্স। এক-বার দেহের দিকে দৃষ্টি দিন, আপনার দেহের রক্ষায় দেশের কল্যাণ হবে, জগতের কল্যাণ হবে।"

নব-প্রবর্তিত মঠ মিশন প্রভৃতি সংগঠনকর্ম শুরু করা সঙ্গত হইয়াছে কিনা, প্রবীণ ভক্তের কাছে স্বামীজী তাহা যাচাই করিয়া নিতে চান। নাগমশাইকে এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন।

উত্তর হইল, "ঠাকুরের ইচ্ছায় এসব কাজ হচ্ছে। এতে মঙ্গল হবে, মঙ্গল হবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের বড় ইচ্ছা নাগমশাই বেলুড় মঠে আসিয়া বাস করেন, তাঁহার পূত চরিত্রের সান্নিধ্যে থাকিয়া মঠের সন্ন্যাসীরা প্রেরণা ও উদ্দীপনা পাইবে।

নাগমশাই জানাইলেন, "কি করি, কেমন ক'রে ঠাকুরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করি? তিনি যে আমায় গৃহেই থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন!"

স্বামীজী সমবেত সন্ন্যাসীদের কহিলেন, "ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের যে এমন উচ্চ অবস্থা হতে পারে, তা একমাত্র নাগমশাইকে দেখে বুঝতে পারা যায়। কি ত্যাগে, কি ইন্দ্রিয় সংযমে, ইনি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

স্বামীজীকে একথাও একবার বলিতে শুনা গিয়েছিল, 'পৃথিবীর এত দেশ ঘুরে এলাম, কোথাও নাগমশাইর মতো মহাপুরুষ চোখে পড়লো না।"

পূর্ববঙ্গে সফরে যাওয়ার আগে স্বামী বিবেকানন্দ নাগমশাইর এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "ও দেশে গিয়ে আর বক্তৃতা করবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন নেই। যে দেশ নাগমশাইর চন্দ্রালোকে আলোকিত, সেখানে আমি গিয়ে আর বেশী কি বলবো।"

ভক্তটি বলিয়া উঠেন, "কিন্তু স্বামীজী, তিনি তো অতি গুপ্তভাবে ছিলেন, সাধারণের কাছে তেমন কিছু বলেন নি!"

"ওরে, মুখে নাই বা কিছু বললেন। নাগমশাইর মতো মহাপুরুষদের চিন্তা তরঙ্গে দেশের চিন্তাস্রোতের গতি ফিরে যায়।"

ত্যাগ বৈরাগ্য আর শুচিতায় ভরা ছিল সাধু নাগমশাইর জীবন। নিঃশব্দে নিভৃতে তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। আত্মগোপন প্রয়াসী এই গৃহীসন্ন্যাসী তাই কোনোদিনই নিজের চতুষ্পার্শ্বে ভক্ত ও শিষ্যের ভিড় রাখিতে চান নাই।

কিন্তু ফুল ফুটিয়াছে—মধুলোভী ভ্রমরকে ঠেকানো যায় কই? তাই সাধু নাগমশাইর পদপ্রান্তে ধীরে ধীরে সমবেত হইতে থাকে একদল পুণ্যলোভী, মুক্তিকামী ভক্ত। সংখ্যা তাঁহাদের বেশী নয়, কিন্তু আন্তরিকতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার দিক দিয়া তাঁহাদের তুলনা বিরল। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত, "নাগমশাই তাঁর সাধক ভক্তদের ওপর স্নেহময়ী জননীর মতো সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।"

সাধু নাগমশাইর ভক্ত প্রীতির নানা কাহিনী ছড়ানো রহিয়াছে। নিম্নোক্ত ঘটনাটি ভগিনী নিবেদিতার 'মাস্টার অ্যাজ আই স হিম্' গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে:

সেবার ঢাকাস্থিত একটি ভক্ত নাগমশাইকে দর্শন করার জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। তখন বর্ষাকাল। বিশেষ করিয়া সেদিন দেখা দেয় ঘোর দুর্যোগ।

সন্ধ্যাকালে নারায়ণগঞ্জে পেঁৗছিয়া দেখেন, ঘাটে একটি নৌকাও নাই। সারাদিন অশ্রান্তভাবে বৃষ্টি পড়িয়াছে। বাত্যা বিক্ষোভও কম নাই। মাঝিরা ভয়ে নৌকা নিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িয়াছে। ভক্তটি বড় বিপদে পড়িলেন। এই অন্ধকার দুর্যোগময় রাত্রিতে নৌকা ছাড়া দেওভোগ গ্রামে কি করিয়া যাইবেন? চারিদিক জলে জলময় হইয়া গিয়াছে। তবে উপায়?

সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিতে দেরী হইল না। সাধু নাগমশাইকে স্মরণ করিয়া এই ভক্তটি জলে ঝাঁপ দিলেন। সাঁতরাইয়া সারা পথ অতিক্রম করিয়া যখন নাগমশায়ের গৃহে পেঁৗছিলেন তাঁহার দেহ তখন ক্লান্তিতে অসাড়। এত রাত্রে এ ভাবে ভক্তটিকে আসিতে দেখিয়া নাগমশাই হায় হায় করিয়া উঠিলেন। বিচলিত হইয়া কহিলেন,

"এই অন্ধকারে, বর্ষার এই দুর্যোগে কি এমন ক'রে আসতে আছে? তাছাড়া, এই বন্যার সময় কত সাপ বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়? কেন একাজ আপনি করেছেন?"

ভক্তটি সজলনয়নে উত্তর দেন, "আপনাকে আজ একটিবার দর্শন করবার বড় তীব্র ইচ্ছে হয়েছিল। তাই এ কাজ না ক'রে আমার উপায় ছিল না।"

রাত্রি যথেষ্ট হইয়াছে। এবার ভক্ত অতিথির জন্য কিছু রন্ধন করা প্রয়োজন। গৃহকর্ত্রী জানাইলেন, ঘরে একটুকরো শুকনো কাঠও নেই, কি ক'রে ভাত রাঁধবো?"

এ দুর্যোগময় রাতে কোথায় যাইবেন? কেই-বা জ্বালানী কাঠ দিবার জন্য দুয়ার খুলিবে? অগত্যা নাগমশাই কুঠার দিয়া একটি ঘরের খুঁটি কাটিতে শুরু করিলেন।

ভক্তটি ছুটিয়া গিয়া নাগমশাইকে থামাইতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। নাগমশাইর পত্নী তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলে উত্তর হইল, "যারা প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে সাপের মুখে সাঁতার কেটে আমায় দেখতে আসেন, তাদের জন্য আমি কি সামান্য একটা ঘরের মায়া ছাড়তে পারিনে! প্রাণ দিয়েও যদি আমি এদের উপকার করতে পারি, তবে আমার এ দেহ সার্থক হয়।"

বলা বাহুল্য, কাঠের এই খুঁটি কাটিয়া সেদিনকার অতিথি সেবার কাজে লাগানো হয়, ঘরটিও অল্পকাল মধ্যে হুমড়ি খাইয়া পড়ে।

প্রিয়জনদের কল্যাণের জন্য নাগমশাইকে মাঝে মাঝে অলৌকিক শক্তিও প্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছে।

এক নতুন ভক্ত কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করে। নাগমশাইর সঙ্গে সবে পরিচয় হইয়াছে। আর এ পরিচয় তাঁহার হৃদয়ে জ্বালিয়া দিয়াছে মুমুক্ষার আগুন। দিন-রাত কেবলি সে ভাবিতে থাকে কবে আবার নাগমশাইর দর্শন পাইবে, মহাপুরুষের শ্রীমুখের অমৃতবাণী শুনিয়া প্রাণ তৃপ্ত করিবে।

অবশেষে একদিন আর সে ধৈর্য ধরিতে পারিল না। এমন মহাপুরুষকে পাইয়াও সে তাঁহার চরণতলে চিরতরে আশ্রয় নিতে পারে নাই—বরং পাইয়া তাঁহাকে হারাইয়াছে। তবে এ ছার প্রাণ রাখিয়া আর লাভ কি? ভক্তটি স্থির করিল, ছাদ হইতে পড়িয়া সে আত্মহত্যা করিবে!

ছাদের আলিসার কাছে দাঁড়াইয়া যেই সে ঝাঁপ দিতে যাইবে অমনি শুনিল কে যেন স্পষ্ট স্বরে তাহাকে বলিতেছে, "অযথা ভেবো না, শান্ত হও। আগামী কালই নাগমশাইর সাথে তোমার দেখা হবে।"

এ কাহার দৈববাণী? যুবক ভক্তের সর্বদেহে জাগিয়া উঠিল এক অপূর্ব শিহরণ। মনের বিক্ষোভ ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া গেল।

পরদিন ভোরবেলায় নাগমশাইর দর্শন ঠিকই পাওয়া গেল। ছাত্রাবাসের দোর-গোড়ায় দাঁড়াইয়া ভক্তটিকে তিনি ডাকিতেছিলেন। হাতে তাঁহার একটি ক্ষুদ্র পুঁটলী, সবেমাত্র দেশ হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

শান্ত কণ্ঠে মহাপুরুষ কহিলেন, "আপনি কি সব করতে যাচ্ছেন ভেবে ভেবে মন বড় খারাপ হলো। তাই তো হঠাৎ কলকাতায় চলে আসতে হয়েছে। ভয় কি? ভাবনাই বা কিসের? যখন ঠাকুরের রাজ্যে এসে পড়েছেন, তখন আর ভাবনা নেই। জেনে রাখবেন আত্মনাশ এক মহাপাপ।"

ভক্তটির মুখ দিয়া একটি কথাও সরিতেছে না, এই অন্তর্যামী সাধকের সম্মুখে তিনি চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়াইয়া আছেন।

নাগমশাই আবার তাঁহাকে সাহস ও আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "এতদিন ছিলেন খালে বিলে, এবার এসে পড়লেন সমুদ্রে।" অর্থাৎ ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপা-সমুদ্রে সে আসিয়া পড়িয়াছে, অমৃত সাগরে ভাসিয়া বেড়ানোর সৌভাগ্য তাহার। তবে আবার কিসের ভয় ?

আশ্রয়ার্থী বহু ভক্তের জীবন নাগমশাইর পবিত্র স্পর্শে দিনের পর দিন রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কৃপাঘন দিব্য দৃষ্টি বহু আর্তের আধি-ব্যাধি দূর করিয়াছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে এই আত্মগোপনপ্রয়াসী মহাপুরুষ তাঁহার অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া ঘটাইয়াছেন নীরবে, প্রচ্ছন্নভাবে।

সিদ্ধপুরুষ নাগমশাইর অলৌকিক লীলার প্রকাশ একবার কিন্তু প্রকটরূপেই দেখা গিয়াছিল। ইহা ঘটিয়াছিল দেওভোগ গ্রামে। পিতৃসেবার তীব্র আবেগ সেদিন মহাপুরুষের মনের ইচ্ছাটিকে উদগ্র করিয়া তোলে, এক বিস্ময়কর অপ্রাকৃত দৃশ্য বহু-জনসমক্ষে সেদিন উন্মোচিত হয়।

নাগমশাই তখন বাস করেন কলিকাতায়, আর বৃদ্ধ পিতা থাকেন গ্রামের বাড়িতে দেওভোগে। সে-বার আসিয়াছে পুণ্যময় অর্ধোদয় যোগ। লক্ষ লক্ষ লোক ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে স্নানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। এই পবিত্র যোগের কয়েক-দিন আগে নাগমশাই স্বগ্রামে গিয়া উপস্থিত। শুনিয়াছেন পিতার শরীর বড় অসুস্থ।

বৃদ্ধ দীনদয়াল কিন্তু এসময়ে পুত্রকে গ্রামে আসিতে দেখিয়া বড় রুষ্ট হইলেন। কহিলেন, "দ্যাখ্‌, এই অর্ধোদয় যোগে কত লোকে টাকা-কড়ি ব্যয় ক'রে আর সর্বস্বান্ত হয়ে কলকাতায় যাচ্ছে গঙ্গাস্নান করতে। আর তুই এ সময়ে গঙ্গাতীর ত্যাগ ক'রে এলি ? তোর ধর্মকর্মের মর্ম আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এখনো তো তিন-চার দিন বাকী আছে। আমায় একবার কলকাতায় গঙ্গা তীরে নিয়ে যাবি ? শেষ কালের পুণ্য করতে দিবি ?"

পুত্র ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "যদি কারো সত্যিকার ভক্তি থাকে, ভাগীরথী ঘরে এসেই দর্শন দেন—তাকে আর কোথাও ছুটে যেতে হয় না।"

গঙ্গাস্নানের দিন দেওভোগে এক অপূর্ব অলৌকিক কাণ্ড ঘটিল। নাগমশাইর গৃহে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে। ঠিক অর্ধোদয় যোগের সময় অঙ্গনের অগ্নিকোণে দেখা গেল এক উচ্ছলিত জলপ্রবাহ। ভূগর্ভ ভেদ করিয়া কলকল শব্দে উহা উপরে উঠিতেছে, সারা প্রাঙ্গণ ভাসাইয়া ফেলিতেছে। কৌতূহলী জনতার মধ্যে তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল।

নাগমশাই গৃহ মধ্যে কি এক কাজে ব্যাপৃত কলরব শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। ভক্ত হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল তীব্র ভাবোন্মাদনা, "মা ! পতিত পাবনী মা-ভাগীরথী !' বলিয়া হুঙ্কার দিয়া সাষ্টাঙ্গে এ জলধারার সম্মুখে তিনি প্রণত হইলেন। পুণ্যতোয়া গঙ্গার জয়ধ্বনিতে সেদিন নাগমশাইর অঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠে। দলে দলে পুণ্যার্থী নরনারীরা এই জলে স্নান করিয়া কৃতার্থ হয়। এই পবিত্র জলস্পর্শে কাহারো কাহারো দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি এ সময় নিরাময় হয়। শত শত লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রবাহিত এই উৎসধারা ঘণ্টাখানেক পরে থামিয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ এই অলৌকিক ঘটনাটির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "সে আর এমন কি কথা ? এমন মহাপুরুষের ইচ্ছায় সব কিছু সম্ভব হয়। এঁদের ইচ্ছা অমোঘ, এ ইচ্ছাশক্তিতে জীব উদ্ধার পেয়ে যায়।"

অপ্রাকৃত দর্শন, অলৌকিক শক্তি অর্জন ইত্যাদির দিকে ভক্তেরা যাহাতে বেশী না ঝুঁকে ইহাই নাগমশাই চাহিতেন। এজন্য তাঁহার সতর্ক দৃষ্টির অভাব ছিল না। সাধনার মূল তত্ত্বটির দিকেই প্রধানত ভক্তদের চিন্তাধারাকে তিনি কেন্দ্রীভূত করিতে চাহিতেন। বলিতেন, গাছের তলায় জেগে বসে থাকার মতো সাধনার দ্বারা আপনাকে সদাই জাগ্রত রাখতে হয়। কিন্তু ফল রয়েছে তাঁর হাতে। তিনি নিজে কৃপা ক'রে ফল দিলে তবে জীব তার অধিকারী হয়, নতুবা নয়। দেখা যায়—কেউ বা ঘুমিয়ে আছে, ভগবান্ দয়া ক'রে হয়তো তার মুখে ফল ফেলে দিলেন, তাকে আর কোনো কিছু সাধনভজন করতে হয় না। এসব সাধক কৃপাসিদ্ধ হয়। ভগবান্ যতদিন না কৃপা করেন, ততদিন কেউ তার স্বরূপ বুঝতে সমর্থ হয় না। তিনি কল্পতরু – যে যা চায়, নিশ্চয় তাকে তা দান করেন। কিন্তু যাতে জীবকে বার বার জন্ম মৃত্যুর পথে যেতে হয় এমন বাসনা কখনো করা জীবের উচিত নয়।

"ভগবানের পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধা জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। তবেই জীব সংসার বন্ধন ছিন্ন ক'রে ভগবৎ কৃপায় মুক্ত হয়ে যেতে পারে। সংসারের যে কোনো বিষয়ে বাসনা ত্যাগ করা যায়, তা থেকে জীবের কল্যাণ সাধনা আসবেই। কিন্তু যিনি ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তবৎ প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন তাঁর ত্রিতাপ জ্বালা অন্তে দূরে হয়ে যায়।"

সাধু নাগমশাইর এ সব কথার পশ্চাতে ছিল তাঁহার জীবনের সূক্ষ্মতর দিব্য অনুভূতি, আর তাঁহার উপলব্ধ সত্য। মা জগজ্জননীর অসীম কৃপা ছিল এই মহা-সাধকের উপর, মাতৃসাধনার সিদ্ধি তাঁহার হইয়াছিল করতলগত।

এক ভক্ত সে-বার নাগমশাইর পত্নীর কাছে বসিয়া মহাপুরুষের সাধনজীবনের কাহিনী শুনিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে নাগমশাইর পত্নী বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, ওঁর সাধনভজনের কথা কি বলছো। উনি ইচ্ছে ক'রে যে দেবদেবীকে ডাকেন, তাঁরা তৎক্ষণাৎ ওঁকে দর্শন দেন। উনি নিজেই যে একথা কতদিন আমায় বলেছেন।"

নাগমশাই দেবদেবীর উপর বড় ভক্তিমান্। হৃদয়ে একবার ভাবাবেগ উপস্থিত হইলেই মা-মা বলিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠেন। দেবদেবীর সাথে ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় অস্ফুট স্বরে কথাবার্তাও তাঁহাকে বলিতে শুনা যায়। ভক্ত শরৎচন্দ্র তাই একদিন মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তবে কি নাগমশাই শুধু দেবতাসিদ্ধ ! তিনি ব্রহ্মজ্ঞ নহেন। এই ভাবনার পরবর্তী অভিজ্ঞতার এক মনোজ্ঞ বর্ণনা তিনি দিয়াছেন -"আমি এরূপ ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে তিনি কখন সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, তিনি রান্নাঘরের পশ্চাতে আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছেন। তখন তাঁহার পূর্ণ ভাবাবেগ—বলিলেন, 'মা কি আমার এই খড়ে মাটিতে আবদ্ধ ! তিনি যে অনন্ত সচ্চিদানন্দময়ী। মা যে আমার মহাবিদ্যা স্বরূপিণী।' বলিতে বলিতে তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে সে সমাধি ভঙ্গ হয়। পরে মাতা ঠাকুরাণীকে আমি একথা জানাইলে তিনি বলিয়াছেন, "বাবা, তুমি তো তার এ অবস্থা

আজ নূতন দেখলে। এক এক দিন দুই তিন প্রহরেও তাঁহার চেতনা হয় না। এক এক দিন আমার মনে হয়, তিনি দেহ ছাড়িয়া বুঝিবা চলিয়া গেলেন।

সাধনা ও সিদ্ধির পথ বাহিয়া মহাসাধকের নরজীবন এবার ধীরে ধীরে শেষ অঙ্কের দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

১৩০৬ সালের শীতঋতু। মহাসাধক নাগমশাই তাঁহার শেষ শয্যায় শায়িত। জীর্ণ দেহের প্রাকার টুটিবার এবার আর বেশী দেরি নাই। নিকটে উপবিষ্ট ভক্তটিকে একদিন ডাকিয়া কহিলেন, একবার পঞ্জিকাটা দেখুন দেখি। সামনে যাত্রার ভাল দিন কবে!

পঞ্জিকা দেখিয়া বলা হইল, "আজ্ঞে ১৩ই পৌষ ১০টার পর যাত্রার বেশ দিন রয়েছে।"

"আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে ঐ দিনই মহাযাত্রা করবো।"

সেবক ভক্তটি আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নাগমশাইর সাধ্বী পত্নী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "আর কেন কাঁদছো বাবা। উনি কিছুতেই এ শরীর আর রাখবেন না। ওঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। দেহত্যাগ করুন। দেখে আমরা আনন্দিত হবো।"

নির্দিষ্ট দিন ও লগ্নটি আসিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রপটটির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বীরভক্ত চিরতরে নরদেহ ত্যাগ করিলেন। মহাপ্রয়াণের পূর্বক্ষণে ওষ্ঠদ্বয় একবার কিছুটা নড়িয়া উঠে। অস্ফুট স্বরে শেষ বাণীটি উচ্চারিত হয় কৃপা, কৃপা—নিজগুণে কৃপা।'

পরমহংস দয়ালদাস বাবা

অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের কথা। এই সময়ে শুধু পাঞ্জাবেই নয়, সারা উত্তর ভারতে প্রচারিত ছিল ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মা পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। পাতিয়ালা জেলার বসেরা গ্রামের আশ্রমটি ছিল তাঁহার নিভৃত সাধনকেন্দ্র। এই কেন্দ্রটিতে অল্প সংখ্যক অন্তরঙ্গ মুমুক্ষু শিষ্য নিয়া তিনি বাস করিতেন, সাধনপথের দিতেন দিগ্‌দর্শন। আবার মাঝে মাঝে মণ্ডলীসহ বাহির হইতেন তীর্থ পরিক্রমায়। যে গ্রামে, যে শহরে এই সদানন্দময় মুক্ত পুরুষ আবির্ভূত হইতেন, দেখা দিত বিরাট জনসংঘট্ট, সাধু-সন্ত ও ভক্ত গৃহস্থেরা দলে দলে ভিড় করিত তাঁহার চরণতলে। পুণ্য-লোভী দাতা ও শেঠেরা সোৎসাহে ভাণ্ডারা লাগাইত তাঁহার ছাউনিতে। তীর্থ পরিক্রমার শেষে আবার নিজ গ্রামের আশ্রমটিতে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরদাস-বাবা রত হইতেন নিভৃত সাধনায়।

বসেরার মঠপ্রাঙ্গণে সেদিন তিনি শিষ্য পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্ত জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসজী নানা তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে চলিতেছে মৃদু মধুর হাস্য পরিহাস।

এমন সময়ে একটি বালক সাধু সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বয়স তাহার প্রায় বারো বৎসর। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, তীক্ষ্ণ নাসা, বুদ্ধির দীপ্তিতে চোখ দুটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। পরনে রহিয়াছে গৈরিক বহির্বাস। নগ্নপদ দুইটিতে জমিয়াছে প্রচুর পথের ধূলা। দেখিলেই মনে হয় বহু দূরের পথ অতিক্রম করিয়া সে আসিয়াছে।

আগন্তুক বালক প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই ঠাকুরদাস-বাবার নয়ন দুটি কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠে। স্মিত হাস্যে বলিয়া উঠেন, "আরে, এ দেখছি আমাদের ছোটেলালজী। তারপর, কি মনে ক'রে? তোমাদের বাড়ির সবাইর কুশল তো?"

মঠের ভক্ত ও সেবকেরা এতক্ষণে বুঝিয়া নিয়াছেন, এই বালক পরমহংস-বাবার পূর্ব পরিচিত। কিন্তু এত অল্প বয়সে গৈরিক নিয়া সে সাধু হইয়াছে? সবাই বড় কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছেন।

বালক করজোড়ে উত্তর দেয়, "বাবা, আমি এসেছি আপনারই কাছে। আপনার কাছে আশ্রয় নিতে। আমি সাধু হবো। সাধু হয়ে ভগবান্ লাভ করবো, এজন্য আমি ব্যাকুল হয়েছি। আপনি আমায় কৃপা করুন।"

"তা ছোটেলালজী, তুমি তো দেখছি আগে থেকেই গৈরিক প'রে ফেলেছো, সাধু তো তুমি ব'নেই গেছো।

বালক বড় সপ্রতিভ। শান্তস্বরে, স্পষ্ট ভাষায় সে উত্তর দেয়, "না—মহারাজ। এটা আমার লোক দেখানো বেশ। আমার মাতাজী বললেন,—'আমাদের কপিয়াল গাঁও থেকে বসেরা যে অনেক দূর, ক'দিনের পথ পায়ে হেঁটে যাবি সে ক'দিন তোকে খেতে দেবে কে? তবে কি অনাহারে মরবি?'

"আমি বললাম, তোমার কোনো ভয় নেই, একটা গৈরিক কাপড় জড়িয়ে আমি চলে যাবো, ভালো গৃহস্থেরা দু টুকরো শুকনো রুটি আমায় দেবেই। তাই আমার এ বেশ।"

"হো-হো-হো"—অট্টহাসিতে ফাটিয়া পড়েন ঠাকুরদাস বাবা। বলেন, "তুমি চতুর ছেলে, মাথায় ভাল ফন্দী এঁটেছিলে। কিন্তু ছোটেলালজী ভগবান্ লাভ করবে বলে তো পথে বেরিয়েছো। ভগবান্ কিন্তু বড় চতুর, ধরতে গেলেই পালিয়ে যান, হাতের মুঠো যত শক্তই করো, ফস্‌কে যান। তাঁর সাথে এঁটে উঠতে পারবে কি ?—কৌতুকের সুর ফুটিয়া উঠে ঠাকুরদাস-বাবার কথা কয়টিতে।

"মহারাজ, সবার কাছে শুনি, আপনার মতো মহাত্মারা সেই ভগবান্‌কে বশে রাখার কৌশলটি জানেন। আমি সে কৌশল আপনার কাছেই শিখে নেবো। প্রাণপাত ক'রে তা শিখবো।"

এবার গম্ভীর হইয়া উঠেন ঠাকুরদাস-বাবা। প্রশান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "উত্তম কথা, অতি উত্তম কথা, ছোটেলালজী। কিন্তু তোমার বাবা মায়ের সম্মতি এতে আছে তো ? সব আমায় খুলে বলো।"

"মহারাজ, মাপ করবেন, এতক্ষণ কথায় কথায় আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমার বাবা আপনার চরণে প্রণাম জানিয়ে একটা চিঠি দিয়েছেন। এই যে সেটি।"

পরমহংসজীর নির্দেশে একজন সেবক চিঠিটি সেখানে পাঠ করিলেন। মর্ম এইরূপ ঃ

বাবা মহারাজ, আপনার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। অতঃপর সমাচার এই, অনেক-দিন যাবৎ আপনার দর্শন না পাইয়া আমরা মনঃকষ্টে দিন যাপন করিতেছি। আমার কনিষ্ঠ পুত্র ছোটেলালকে আপনি জানেন। বয়সে সে বালক, কিন্তু আর সে এখন গৃহে থাকিতে চায় না, সাধু হইবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। প্রতি বৎসর গ্রামে বহু সাধুসন্তের সমাগম হয়। ছোটেলাল তাঁদের জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তাঁহাদের ধুনির কাঠ সংগ্রহ করে, চাপাটি তৈরী করিয়া দেয়, নানাভাবে তাঁহাদের সেবা করে। আপনার সেবার সুযোগ পাইয়াও সেবার সে অনুগৃহীত হইয়াছে। সাধু-সঙ্গ ও সাধু সেবার ফলে ভগবান্ প্রাপ্তির অভিলাষ তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। স্থির করিয়াছে, সংসার সে ত্যাগ করিবে, সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিবে।

আমাদের আরো কয়েকটি জোয়ান ছেলে আছে। তাহারা আমার ক্ষেতের কাজ করে, বিষয়-কর্মে সাহায্য করে। আমি এবং ছোটেলালের মা তাই পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি, একটি পুত্রকে প্রভু শিবজীর সেবায় নিয়োগ করিব, সন্ন্যাসী হইতে দিব। ছোটেলাল এই অল্প বয়সে ভগবানের জন্য পাগল। দিনরাত সাধুর পিছনে ঘোরে আর গ্রামের শিবমন্দিরে গিয়া ধ্যান-ভজন করে। আমার ছেলেদের মধ্যে সেই-ই সাধু হওয়ার যোগ্য। তাই আমরা তাহাকে এজন্য অনুমতি দিতেছি। তাছাড়া সাধু যদি হইতেই হয় সে আপনার মতো কৃপালু মহাত্মার মঠে থাকিয়াই সাধুর জীবনযাপন করুক। তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিব।

আপনার শ্রীমুখে শুনেছি, একটি ছেলে সন্ন্যাসী হইয়া মুক্তি লাভ করিলে তাহার কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থ হয়, পৃথিবী পুণ্যবতী হয়। আশীর্বাদ করুন তাই যেন হয়। আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—শ্রীচরণাশ্রিত…

ঠাকুরদাস-বাবা প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "তথাস্তু। যাও বেটা, আর বিলম্ব না ক'রে এখনি স্নান সমাপন ক'রে এসো, আর বেশ ত্যাগ ক'রে মঠের গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ করো আমার হাত থেকে।

তারপর প্রবীণ শিষ্যদের দিকে তাকাইয়া আদেশ দিলেন, "আজ অতি শুভ দিন। পুণ্যলগ্নও সমাগত। তোমরা ছোটেলালের জন্য বিরজাহোমের সব ব্যবস্থা করো। আজই আমি তাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দেবো।"

জনৈক সেবক আর কালবিলম্ব না করিয়া ছোটেলালকে নিয়া মঠের অভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

প্রবীণ শিষ্যদের মধ্যে শোনা গেল মৃদু গুঞ্জন, তাইতো, এত তাড়াহুড়া করিয়া গুরু মহারাজ তো কখনো কাহাকেও সন্ন্যাস দেন নাই। তাছাড়া, এত অল্প বয়স্ক বালকের সরাসরি সন্ন্যাস-দীক্ষা ? গুরুজী তো ব্রহ্মচর্যের প্রস্তুতির উপর সদাই গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু কই এ ক্ষেত্রে তো তাহার কোনো প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তুলিতেছেন না ?

অন্তর্যামী পরমহংসজী প্রবীণ শিষ্যদের মনোভাব মুহূর্তে বুঝিয়া নিলেন। সহাস্যে কহিলেন, "ছোটেলাল আজ এই মঠে আত্মসমর্পণ করতে আসবে—এ আমি জানতাম। তাই প্রাঙ্গণে বসে তার প্রতীক্ষা করছিলাম। দু'বছর আগে আমি একটা সাধু জমায়েৎ নিয়ে ওদের গ্রামে গিয়েছিলাম। ছোটেলাল আমার সেবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তখনি দেখলাম, ওর মস্তকের চারিদিকে রয়েছে একটা সূক্ষ্ম জ্যোতির বেষ্টনী। বুঝলাম, শিগ্‌গীরই মুমুক্ষার আগুন জ্বলে উঠবে ওর জীবনে, চিরতরে গৃহত্যাগ করে গ্রহণ করবে সন্ন্যাসজীবন।"

জনৈক শিষ্য মৃদু স্বরে প্রশ্ন করেন, কিন্তু গুরু মহারাজ, সাধারণভাবে আমরা দেখে আসছি, আগে সাধকের ব্রহ্মচর্যের প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তবে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেওয়া হয়। এর বেলায় দেখছি ভিন্নরূপ ব্যবস্থা।"

পরমহংসজী উত্তর দিলেন, বেটা সমর্থ গুরু শিষ্যের জন্য ব্যবস্থাপত্র দেয় তার বিগত তিন জন্মের সুকৃতি বিচার ক'রে। তাছাড়া এ জন্মের তীব্র বৈরাগ্য, তীব্র মুমুক্ষার কথাও তো বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। জান তো, শ্রুতি বলেছেন যদহরেব বিরজেত তদহরেব প্রব্রজেৎ, অর্থাৎ যেদিনই সাধকের সত্যকার তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হবে, সেদিনই গুরু তাঁকে দেবেন সন্ন্যাস। এতে তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন, বয়স, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষের প্রশ্ন ওঠে না। তবে সর্বদা মনে রাখবে, এই মুমুক্ষার তীব্রতা যাচাই করার অধিকারী হচ্ছেন সমর্থ গুরু।"

সেইদিনই বিরজাহোম সম্পন্ন করিয়া ছোটেলাল সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করেন পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবার কাছে। নব নামকরণ হয়—দয়ালদাস। উত্তরকালে দয়ালদাস পরিণত হন এক সার্থকনামা সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে। তাঁহার যোগবিভূতি ও ব্রহ্ম-জ্ঞানের খ্যাতি বিস্তারিত হয় দিগ্‌বিদিকে। সমকালীন ভারতের বহু উচ্চকোটির সাধক, মনীষী শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্ম প্রচারকেরা তাঁহার পরমাশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হন।

দয়ালদাসের আশ্রম জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসর অতিবাহিত হয় কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া। রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতেই তাহাকে শয্যা ত্যাগ করিতে

হইত, নিয়মিত ধ্যান-জপের পর শুরু হইত বৃদ্ধ গুরু মহারাজের শাস্ত্র অধ্যাপনা ও বেদান্তের ব্যাখ্যান। ইহার শেষে দয়ালদাসকে লাগিতে হইত আশ্রমের কাজে। দূরের কূপ হইতে বৃহৎ ভাণ্ডে জল টানিয়া আনা, গরুমহিষের সেবা আর পরিচর্যা করা ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। আশ্রমবাসী ও অভ্যাগতদের জন্য যাহারা রসুই করিত ও বাসন মাজিত তাহাদের কাজেও দয়ালদাসকে অনেক সময় সাহায্য করিতে হইত। দিন রাতে অবসর বা বিশ্রামের সুযোগ খুব কমই ছিল। এত দৌড় ঝাঁপ ও খাটুনির পর আহার মিলিত কয়েক টুকরো শুষ্ক রুটি আর এক হাতা সিদ্ধ সব্জি।

রাত্রে নিদ্রার সময়ও গুরুজীর শ্যেন দৃষ্টির কবল হইতে নিস্তার ছিল না। দুই তিন ঘণ্টা নিদ্রার পরই একটা মোটা লাঠি হাতে নিয়া তিনি চীৎকার শুরু করিতেন, "ওরে তোদের ভোজন ও নিদ্রায় যদি এত অনুরাগ তবে শুধু শুধু ঘরের আরাম ছেড়ে এখানে কেন এসেছিস। উঠে পড় তামস নিদ্রা ছেড়ে।"

শিষ্যেরা উঠিয়া জপ ধ্যানে বসিয়া গেলে, তবেই ঠাকুরদাস-বাবা শান্ত হইতেন। নিজের কুঠরীতে গিয়া হইতেন ধ্যানস্থ। প্রাতঃকালে বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যান শুরু হইত আশ্রমের প্রাঙ্গণে। এই শাস্ত্রচর্চার মণ্ডলীতে, বয়সে ছোট হইলেও দয়ালদাস ছিলেন অনন্যসাধারণ। বিধিদত্ত প্রতিভা নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন, তাই যে কোনো জটিল তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। গুরুমহারাজ তাই দিনের পর দিন তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন অধ্যাত্মশাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়ার জন্য।

তরুণ জীবনের এই কঠোর দিনচর্যা সম্বন্ধে উত্তরকালে দয়ালদাস-বাবা কহিতেন, "আমার গুরু সত্যই কৃপালু ছিলেন। সারাদিন হাড়ভাঙা মেহনত আমায় করাতেন বটে, কিন্তু দেখতাম আড়ালে গিয়েই গোপনে মুছে ফেলতেন নিজের চোখের জল। বুঝতাম, কঠোর হয়ে তিনি শাসন করতেন আমার ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য, কিন্তু হৃদয় তাঁর ব্যথাতুর হয়ে উঠতো। আমরা যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলাম তাঁর। ঐ জওয়ান বয়সে গুরুজী যদি কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যাস না করাতেন, তবে কি দেহবুদ্ধি যেতো? ত্যাগ বৈরাগ্য কোনদিন আসতো? চিত্তের মল কি দূরীভূত হতো? অভীষ্ট কি আর সিদ্ধ হতো? ভাগ্যগুণে এমন দয়াল গুরুর দাস হয়েছিলাম বলেই তো আজ আমি তোমাদের দয়ালদাস-বাবা।"

তরুণ শিষ্য এই কঠোর জীবনে অভ্যস্ত হইবার পর গুরু মহারাজ কহিলেন, "দয়ালদাস, এবার তোমায় হঠযোগ, লয়যোগ প্রভৃতি আয়ত্ত করতে হবে। বেটা, ব্রহ্মসাধন একটা মস্ত বড় লড়াই—এজন্য চাই মজবুত দেহ, আর সুসংযত ও কেন্দ্রীভূত মন। পরপর্যায়ে রাজযোগ সাধনার ভেতর দিয়ে তোমায় যেতে হবে। বেটা, যা পারো তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, এই শরীর আজকাল জীর্ণ হয়ে এসেছে। এটাকে আর বেশী দিন আমি ধরে রাখবো না।"

একাদিক্রমে পনের বৎসর এই আশ্রমে দয়ালদাস বাস করেন। সিদ্ধ গুরুজীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া গোপনে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলেন তাঁহার যোগসাধনা। এই সময়ে উচ্চতর যোগবিভূতির নানা প্রকাশ দেখা যায় তাঁহার সাধনজীবনে।

কিন্তু গুরু ঠাকুরদাস-বাবা তাঁহার সতর্ক প্রহরা দিয়া শিষ্যকে সদাই ঘিরিয়া রাখিতেন, তাঁহার যোগশক্তিকে করিতেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। উচ্চতর অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি ঘটিলেই শিষ্যকে গুরু কহিতেন, "দয়ালদাস, পরমাত্মার কৃপায়

তোমার নানা দর্শনাদি ঘটছে, কিন্তু এই নিয়ে কখনো মত্ত হয়ে উঠো না, প্রতিষ্ঠার দিকে কখনো পা বাড়িয়ো না। সদাই স্মরণ রাখবে, প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা। বৎস, একমনে দৃঢ় পদক্ষেপে আত্মজ্ঞানের সাধনায় এগিয়ে যাও। পরাজ্ঞান যেদিন তোমার সাধনসত্তায় ফুটে উঠবে, এই মানবজীবন হবে উঠবে সার্থক।"

বৃদ্ধ গুরু মহারাজ ধীরে ধীরে এবার আসিয়া পড়েন নরজীবনের প্রান্তসীমায়। বিদায় ক্ষণের প্রাক্কালে শোকাকুল শিষ্য ও সেবকেরা সবাই তাঁহার রোগশয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়ান। স্থিতধী মহাপুরুষ একে একে সবাইকে জানান তাঁহার অন্তরের আশীর্বাদ আর বিদায় সম্ভাষণ।

প্রিয় শিষ্য দয়ালদাসের দিকে তাকাইয়া গুরু কহিলেন, "বেটা দয়ালদাস, পরমাত্মার কৃপায় অভীষ্ট তোমার অচিরেই পূর্ণ হবে। আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হবে তোমার সাধনসত্তায়। তোমায় প্রথম দর্শনের দিনেই আমি জেনেছিলাম, তুমি লোকগুরু হবে। লোকমঙ্গলের জন্য জীবন ধারণ করবে। তাই তোমার তপস্যাময় জীবনকে এত সতর্কতা দিয়ে আমি ঘিরে রেখেছিলাম।

শোকার্ত দয়ালদাস ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবা আশ্বাস জানাইয়া কহিলেন, "বৎস, শেষ বিদায়ের আগে জানাই তোমায় আমার আশীর্বাদ। ঋদ্ধি সিদ্ধি চিরদিন থাকুক তোমার করায়ত্ত। অন্নহীনে অন্নদান আর মুমুক্ষুকে মুক্তিদান, হোক তোমার জীবনব্রত।"

একটু থামিয়া গুরুমহারাজ আবার কহিলেন, "কলিকালে মানুষ অন্নগত প্রাণ। জীবনের বেশীর ভাগ সময় অন্ন সংগ্রহের চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়। ধীর স্থির হয়ে বসে যোগাভ্যাস করার সময় তাদের নেই। তাদের মধ্যে বেদান্তের পরমতত্ত্ব তুমি প্রচার করো, নিত্যানিত্য বস্তু-বিচারের কথা নূতন ক'রে জাগিয়ে তোল।"

গুরু মহারাজের মহাপ্রয়াণ শেলের মতো দয়ালদাসের বুকে বাজিল। শেষ কৃত্যের পর কয়েকটা দিন চলিয়া গেল শোকার্ত অবস্থায়। তার পর দয়ালদাস আহ্বান করিলেন আশ্রমের শিষ্য সেবক এবং বাহিরের ভক্ত গৃহস্থদের। কহিলেন, "গুরু মহারাজের দেহান্তের একটা বড় কাজ বাকী রয়ে গিয়েছে। তাঁর স্মৃতিপূজার জন্য এবার আমাদের একটা বৃহৎ ভাণ্ডারা অনুষ্ঠান এখানে করতে হবে। তাতে আমন্ত্রণ জানাতে হবে এ অঞ্চলের গরীব দুঃখী মানুষ আর সাধু সন্তদের।"

প্রবীণ শিষ্যেরা চমকিয়া উঠেন। কহেন, "দয়ালদাস, তোমার প্রস্তাব অবশ্যই অতিশয় সাধু। কিন্তু ভাই, বড় রকমের ভাণ্ডারা দেবার সাধ্য আমাদের কই? তুমি তো জানোই, আশ্রমে সঞ্চিত কোনো অর্থ নেই। যত্র আয় তত্র ব্যয়। আশেপাশের গৃহস্থ লোকেরা কেউ তেমন ধনবান্ নয় যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবে। দূর-দূরান্তের ভক্তেরা কে কি সাহায্য দেবে বুঝতে পারছিনে। এই অবস্থায় সাধ্য অনুযায়ী কাজ করাই কি ভালো নয়? ছোটখাটো একটা ভাণ্ডারা দিয়েই কাজ শেষ করা যাক্ কি বলো?"

দয়ালদাস উত্তরে প্রত্যয় ভরা কণ্ঠে বলেন, "গুরুজী তাঁর নরদেহ ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁকে আমরা মোটেই হারাই নি, কোনোদিন হারাবোও না। তাঁর ভাণ্ডারা

বিরাটভাবেই করতে হবে, অর্থ ও দ্রব্যাদির ব্যবস্থা তিনিই করবেন। আপনারা এই পবিত্র কাজে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হোন।"

বয়সে নবীন হইলেও দয়ালদাসের প্রতি সতীর্থেরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। অবশেষে তাঁহার সিদ্ধান্তই সবাই মানিয়া নেন। সোৎসাহে এবার কাজকর্ম শুরু হইয়া যায়।

বিভিন্ন মঠ মণ্ডলী আখড়ায় এবং হাটে বাজারে ঘোষিত হয় পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবার ভাণ্ডারার কথা। কোথা দিয়া কি ঘটিয়া যায়, দূর দূরান্ত হইতে উপস্থিত হইতে থাকেন শেঠ, সওদাগর ও ধনী গৃহস্থ ভক্তেরা। অকাতরে সবাই বাবার কাজে অর্থ দান করেন। সংগৃহীত হয় বিপুল পরিমাণ ঘৃত, চিনি, আটা, সুজি ইত্যাদি। অল্প সময়ের ব্যবধানে ক্ষুদ্র বসেরা গ্রামের আশ্রমে, অনুষ্ঠিত হয় এক রাজকীয় ভাণ্ডারা, দশ বারো হাজার দরিদ্রনারায়ণ ও সাধুসন্ন্যাসী সেদিন সেখানে ভোজন গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। পরমহংস ঠাকুরদাস-বাবার জয়ধ্বনিতে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠে।

সংকল্প করা কাজ শেষ হইয়াছে। দয়ালদাস এবার সতীর্থ ও আশ্রম ভক্তদের জানাইয়া দেন, আশ্রমে আর তিনি অবস্থান করিবেন না, শেষ পর্যায়ের তপস্যার জন্য আত্মগোপন করিবেন হিমালয়ে।

তরুণ সাধক দয়ালদাসজীর জনপ্রিয়তা অসাধারণ, সবাই তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরেন, বার বার অনুরোধ জানাইতে থাকেন বসেরায় থাকার জন্য। কেহ কেহ বলিয়া উঠেন, "গুরুজী গত হইয়াছেন, এখন তাঁর আশ্রমটির রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে তার পুণ্যস্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা—এটাই তো আপনার প্রধান কর্তব্য।"

উত্তরে দয়ালদাস বলেন, "আমার গুরু মহারাজ বিষয়ী মোহান্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্বত্যাগী শিবকল্প মহাত্মা। তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর শিষ্যদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তো নিভৃত তপস্যার পথে আমি বেরিয়ে পড়েছি। আপনারা প্রার্থনা করুন গুরুর যে আশীর্বাদ আমি পেয়েছি তা যেন সফল হয়ে ওঠে আমার জীবনে।"

সাতাশ বৎসর বয়সে এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া দয়ালদাস বহির্গত হন, আসন গ্রহণ করেন হিমালয়ের এক সিদ্ধপীঠে। এখানে প্রায় দশ বৎসর তাঁহার অতিবাহিত হয় চরম কৃচ্ছ্রব্রত আর আত্মিক সাধনায়। তারপর গুরুকৃপায় হন তিনি সিদ্ধকাম। আত্মজ্ঞান মহাসাধকরূপে, ঋদ্ধি-সিদ্ধির অধিকারী শক্তিধর মহাপুরুষরূপে, অচিরে সন্ন্যাসী সমাজে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

দয়ালদাসের অন্তরে চিরজাগরূক রহিয়াছে তাঁহার কৃপালু গুরুমহারাজের আদেশ। তিনি বলিয়াছেন, বুভুক্ষুকে অন্ন দাও, আর মুমুক্ষুকে দাও মুক্তির আলো। এই আদেশই চিরদিন করিবেন তিনি শিরোধার্য। আর এই আদেশ সম্যক্‌রূপে পালন করিতে হইলে, কোনো মঠ-মন্দির বা স্থায়ী সাধনকেন্দ্রে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এখন হইতে ত্যাগব্রতী সাধুদের মণ্ডলী নিয়া তীর্থে তীর্থে পরিব্রাজন করিবেন জনতার মাঝে থাকিয়াই সাধন করিবেন গুরু উপদিষ্ট পরম কল্যাণ।

অতঃপর অল্পকাল মধ্যে সন্ন্যাসী দয়ালদাসের ঋদ্ধি-সিদ্ধির খ্যাতি সাধুসমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। হরিদ্বারের বিশিষ্ট মোহান্ত ও সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে পরমহংস ও সিদ্ধাবধূত আখ্যায় ভূষিত করেন।

কি কুম্ভমেলায়, কি হিমালয়ের গহন তীর্থে কি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-নর্মদা-কাবেরীর পবিত্র কূলে, যেখানেই তিনি সাধু জমায়েৎ নিয়া উপস্থিত হন, দলে দলে, ভক্ত নরনারী, রাজা উজীর শেঠ, লুটায় তাঁহার চরণতলে। তাঁহার বৈরাগ্যময় মূর্তি জ্ঞান প্রোজ্জ্বল নয়নদ্বয় একবার যে দর্শন করে, অমৃতময় স্নেহবচন একবার যে শ্রবণ করে, মোহিত হইয়া যায়,—এক অমোঘ, অনির্দেশ্য আকর্ষণের বশে করে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ। যেখানেই দয়ালদাস-বাবার অধিষ্ঠান হয়, বহিয়া যায় ভাণ্ডারার স্রোত আর ধর্ম উপদেশ। শাস্ত্রালাপ ও ভজন কীর্তনে চারিদিক মুখর হইয়া উঠে, জনজীবনে জাগিয়া উঠে বিপুল আধ্যাত্মিক উজ্জীবন।

গঙ্গা-যমুনা নর্মদার তীরে তীরে, সারা ভারতের তীর্থে তীর্থে যেখানেই পরমহংস দয়ালদাস-বাবা উপস্থিত হন, তাঁহার সঙ্গে দেখা যায় এক বিরাট সাধু জমায়েৎ, গৃহস্থ ভক্তেরাও সমবেত হয় দলে দলে, এই সিদ্ধ মহাপুরুষকে ঘিরিয়া ভগবৎ আনন্দের স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

গুরু ঠাকুরদাসজীর আশীর্বাদ এ সময় হইতে পরিপূর্ণরূপে দয়ালদাস-বাবার আচার্য জীবনে রূপায়িত হইয়া উঠে। ঋদ্ধি ও সিদ্ধির এক মহিমময় বিগ্রহরূপে দেশের দিকে দিকে তিনি কীর্তিত হইয়া উঠেন।

দয়ালদাস-বাবার অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য, শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপজী লিখিয়াছেন,[১] —তিনি নামেও যেমন দয়াল ছিলেন, কার্যেও তিনি তেমনি দয়াল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিকট কোনো দীন দুঃখী গমন করিলে তিনি তাহাকে ভোজন না করাইয়া যাইতে দিতেন না। কৌপীন কমণ্ডলু মাত্র সম্বল লইয়া অবধূত দয়ালদাস আগন্তুক অভুক্ত ব্যক্তিমাত্রকেই অন্ন দিতেছেন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতে লাগিল। গৃহস্থ সকল তাঁহার বৈরাগ্য ও বদান্যতায় বিমুগ্ধ হইয়া সাধু ও দরিদ্র সেবার জন্য আটা, ঘৃত, মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাঠাইতে লাগিল। তিনিও দুই হাতে দান করিয়া আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যান সেইখানেই অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার এইরূপ উন্মুক্ত হইতে লাগিল। দলে দলে সাধুসন্ন্যাসী তাঁহার অনুবর্তী হইতে লাগিলেন। পরিচিত অপরিচিত বোধ নাই, সাধু অসাধু, গৃহস্থ সন্ন্যাসী বিচার নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র দেখা নাই, স্ত্রী-পুরুষ লক্ষ্য নাই, যে অভুক্ত সে-ই ভোজন করিবে যেখানে স্বামী দয়ালদাস সেইখানেই মা অন্নপূর্ণার এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান।

"স্বামী দয়ালদাস এক তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে যাইতেছেন। শত শত সহস্র সহস্র সাধু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। দেখি'লে আশ্চর্য বোধ হইত। স্বামীজীর সঙ্গে বৈরাগী, বৈষ্ণব, রামাইৎ, উদাসী, সন্ন্যাসী, পরমহংস, অবধূত সম্প্রদায় নির্বিশেষে সাধু ও যতিগণ প্রেমের ভাবে একত্রিত হইয়া একসূত্রে মণি, মুক্তা প্রবাল আদি গ্রথিত মালার ন্যায় সুশোভিত থাকিতেন। তিনি সকলকেই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, এইজন্য কেহই তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে চাহিত না।

"তিনি সহস্র সহস্র সাধুসন্ন্যাসীর নেতা হইয়াও কখন আপনাকে প্রধান মনে করিতেন না। মোহান্তদিগের মতো তাঁহার স্বতন্ত্র গদি বা আসন থাকিত না। তিনি তৃণাসন

---

১ সিদ্ধাবধূত দয়ালদাস স্বামী : স্বামী পূর্ণানন্দ স্বরূপ

বা বাল্কাসন বড় ভালবাসিতেন। কেহ তাঁহার স্তুতিবাদ করিলে তাহাকে নিবৃত্ত করিতেন ও ভক্তিসহ ভগবানের স্তুতি করিতে বলিতেন। রাজা, উজীর, শেঠ, সাহুকার, সর্দার, স্ত্রী-পুরুষ যে তাঁহার একবার দর্শন পাইয়াছে, সেই তাঁহার সেবা না করিয়া, তাঁহার অশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই।"

সে-বার দয়ালদাস-বাবা একটি বিরাট জমায়েতের প্রধানরূপে গঙ্গাসাগর তীর্থে যাইতেছেন। বিহারের পথে আসিবার সময় তিনি মুঙ্গেরে কণ্টহারিণী ঘাটে আসিয়া ছাউনি ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে শহরের বহু নরনারী জড়ো হইল তাঁহার মণ্ডলীর সম্মুখে। শেঠ ও মহাজনেরাও ভক্তিভরে আগাইয়া আসিলেন সাধুদের সেবার জন্য।

পৌষ মাস তখন শেষ হইতে চলিয়াছে। বিহারের প্রচণ্ড শীতে দয়ালদাসজী ও তাঁহার সাধু শিষ্যেরা নদীর চড়ায় উন্মুক্ত আকাশের নিচে পরমানন্দে ধুনি জ্বালাইয়াছেন, আসন পাতিয়া বসিয়াছেন।

একজন গৃহস্থ ভক্ত প্রশ্ন করেন, "বাবা, এই দুঃসহ শীতের রাত্রে ঘরের ভেতরে থেকেই আমরা কাঁপতে থাকি। প্রচণ্ড হিমের মধ্যে আপনাদের নিদ্রা হয় কি করে?"

দয়ালদাসজী উত্তর দেন, "নিদ্রা না হলেই বা অসুবিধা কি? সাধুদের একমাত্র কাজ ভগবৎ ভজন। শীতের দাপটে রাত্রে যেদিন নিদ্রা না হয়, আমরা ধ্যান জপ ও ভজন শুরু ক'রে দিই। এ নিয়ে তোমরা ব্যস্ত হয়ো না।" অতঃপর তিনি সোৎসাহে বেদান্তের তত্ত্ব আলোচনায় মত্ত হইয়া পড়িলেন।

সেদিন শীতের রাত্রে হঠাৎ খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়া যায়। দলের কয়েকটি সাধু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিতে থাকেন, "তাই তো! ধুনির কাঠ সংগ্রহের কি উপায় হবে? শুকনো কাঠ পাওয়া তো অসম্ভব।"

দয়ালদাস-বাবা হাসিয়া কহিলেন, "দ্যাখো, সাধুদের বোঝা বইবেন ভগবান্। তোমরা এজন্য এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তোমাদের ভোজনের জন্য, পুরী মালপোয়া তৈরির জন্য ধনী শেঠেরা এগিয়ে এসেছেন। কত আটা, ঘি, চিনি জড়ো করেছেন। তেমনি ভগবদ্ ভক্ত দরিদ্র লোকেরাও তোমাদের সেবার জন্য রয়েছে উৎকণ্ঠিত! একটু সবুর করো, একজন কাঠুরে এক বোঝা শুকনো কাঠ নিয়ে আসছে। বত খুশী ধুনি জ্বালাও, আর সারা রাত ধ্যানজপ করো।"

সত্যিই তাই। ঝড় বাদল কিছুক্ষণ হয় থামিয়া গিয়াছে। এই অবসরে এক ব্যক্তি মাথায় একটি বৃহৎ কাঠের বোঝা নিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বোঝা নামাইয়া যুক্ত করে নিবেদন করে, "বাবা আমি অতি দরিদ্র, ছা-পোষা লোক। বন থেকে কাঠ কেটে আমি তা বিক্রি ক'রে কোনোমতে দিন গুজরান হয়। ঘরে কিছু শুকনো কাঠ ছিল, আপনাদের সেবার জন্য নিয়ে এলাম।"

বাবার নির্দেশে এই কাঠওলাকে পরিতোষ সহকারে পুরী মালপোয়া ভোজন করাইয়া বিদায় দেওয়া হইল।

আর একদিনের কথা। গভীর রাত্রে দয়ালদাস-বাবার ধুনির সম্মুখে শহরের একদল ভক্ত দর্শনার্থী যুক্ত করে বসিয়া আছে। বাবার মুখে বেদান্তের বৈরাগ্য অভ্যাস ও নিত্যানিত্য বিচার সম্পর্কে উপদেশ শুনিতেছে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে জনৈক হিন্দুস্থানী ভক্ত এই কয়দিনেই বাবার বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। লোকটি শুদ্ধসত্ত্ব ও

ধর্মপ্রাণ, সাধনার এক উত্তম আধার। তাই তাহার উপর পড়িয়াছে দয়ালদাজীর বিশেষ কৃপা। কিন্তু রাত্রি গভীর হওয়ায় এই ভক্তটি হঠাৎ বাড়ি ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, বিদায় গ্রহণের জন্য বাবার অনুমতি সে প্রার্থনা করে।

বাবা তন্ময় হইয়া এসময়ে একটি তত্ত্ব উপদেশ দিতেছিলেন। ভক্তটির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আরে, তুমি দেখছি ঘরে গিয়ে রসুই করার জন্য ব্যস্ত হয়েছো। ভগবৎ কথা শুনছো এখানে, তাই ভগবান্‌ই তোমার সে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। ঘরে ফিরেই দেখবে, ভোজনের সব তৈরী।"

ভক্তটির ঘরে দ্বিতীয় কেহ নাই, নিজের আহার্য রোজ নিজ হাতেই তাহাকে প্রস্তুত করিতে হয়। যাই হোক বাবার এই কথায় সে নিরস্ত হয়। ধর্মালোচনা পূর্ববৎ শ্রবণ করিতে থাকে।

মধ্য রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া ভক্তটি দেখে, হঠাৎ একজন আত্মীয় তাহার গৃহে অতিথি হইয়াছে, এবং গৃহস্বামীর দেরি দেখিয়া নিজেই রুটি সব্‌জি তৈরি করিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

অল্প কয়েকদিন যাবৎ দয়ালদাস-বাবা মুঙ্গেরে এই নদীর ঘাটে অবস্থান করিতেছেন। ইহারই মধ্যে এই অঞ্চলের চারিদিকে তাঁহার যোগবিভূতির খ্যাতি, কৃপা-লীলার নানা কাহিনী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সাধু জমায়েতের তিনিই হইতেছেন মধ্যমণি, তাই সাধুসন্ন্যাসী ও মুমুক্ষু গৃহস্থেরা সবাই জড়ো হইতেছে তাঁহার ছাউনিতে। সংসারের তাপে ক্লিষ্ট, আর্ত ভক্তেরাও আসিতেছে তাহাদের নানা সমস্যা নিয়া।

শহরের এক বিশিষ্ট বাঙালী ভদ্রলোক সেদিন বাবার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এক পরমাত্মীয় দূরদেশে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। চিঠি আসিয়াছে, যে কোনো মুহূর্তে শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ করিতে পারেন। ভদ্রলোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে কাতর স্বরে কহেন, "বাবা, এ সঙ্কটে ডাক্তার কব্‌রেজদের কিছু করবার নেই। আপনার মতো যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাত্মারাই শুধু এমন মৃতকল্প রোগীকে বাঁচাতে পারেন। আপনার চরণে আমি শরণ নিচ্ছি। যা হয় আপনি করুন।"

দয়ালদাসজী প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "বেটা, তুমি শান্ত হও—কেঁদো না। কেঁদে কোনো ফল হবে না। তোমার আত্মীয়টি আর বেঁচে নেই, ঘণ্টাখানেক আগে তার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে।"

ভদ্রলোকটি এই শোক সংবাদের আঘাতে একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন। পরমহংস দয়ালদাসজী স্নেহপূর্ণ স্বরে তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন, "বেটা, দুঃখের আঘাত, মৃত্যুর আঘাত, সব মানুষের জীবনে আসবেই আসবে। তোমার এই দেহ, তোমার প্রিয়তম নিকট আত্মীয়দের দেহ—এ সবই অনিত্য, প্রপঞ্চ। যা অনিত্য তার ধ্বংস তো এক সময়ে হবেই, এজন্য আমাদের আগে থেকেই তৈরি থাকা উচিত। এ সংসারে সবই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। কেবল ভগবান্‌ই নিত্য। তাই তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে সে সম্বন্ধে কখনো ছেদ পড়ে না। বৈরাগ্য অবলম্বন করো, চিত্তের মল অপসারণ করো। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার ক'রে, সৎ-চিৎ আনন্দময় পরমপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো। তা হলে আর বিচ্ছেদের দুঃখ শোক ভোগ করতে হবে না।" এইভাবে শোকমগ্ন ভক্তটিকে প্রবোধিত করিয়া বাবা তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে অবস্থান করার কালেই দয়ালদাস-বাবার দর্শন লাভ

করেন তরুণ সাধনার্থী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। উত্তরকালে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে সমগ্র ভারতে তিনি প্রখ্যাত হন, এ দেশের অদ্বিতীয় ধর্মবক্তারূপে লাভ করেন বিপুল প্রতিষ্ঠা। তাঁহার 'ধর্ম-প্রচারক' পত্রিকা, ব্যাপক ধর্মান্দোলন, অসামান্য বাগ্মিতা, অগণিত হরিসভার স্থাপনা এবং কাশীর ধর্মকেন্দ্র যোগেশ্বরী মঠ সারা দেশে যোগায় বিপুল আত্মিক প্রেরণা। কাশীর স্বামী আনন্দপ্রকাশ, প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক পরমহংস বালানন্দ স্বামী শশধর তর্কচূড়ামণি, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতির সহযোগিতায় সনাতন ধর্মের উজ্জীবনের জন্য কৃষ্ণানন্দ যে অবদান রাখিয়া যান, আজো তাহার স্মৃতি দেশের জনমনে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

গঙ্গার ঘাটে ধুনি জ্বালাইয়া দয়ালদাস-বাবা সেদিন ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। কিছু সংখ্যক ভক্ত সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ নিঃশব্দে বসিয়া আছেন বাবার ধ্যান ভঙ্গের প্রতীক্ষায়। এমন সময়ে সাধু জমায়েতে ঘুরিতে ঘুরিতে মুমুক্ষু কৃষ্ণপ্রসন্ন সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

কৃষ্ণপ্রসন্নের বয়স তখন মাত্র বিশ বৎসর। এই তরুণ বয়সেই ভগবৎ দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। এযাবৎ কত সাধু মণ্ডলীতে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, কত মহাত্মার শরণ নিতে গিয়াছেন প্রাণের উৎকণ্ঠা নিয়া, কিন্তু বহুবাঞ্ছিত গুরুর সন্ধান আজো তাঁহার মিলে নাই। দীর্ঘ বপু, নিমীলিত নয়ন, ধ্যাননিবিষ্ট দয়ালদাস-বাবার দিকে চোখ পড়িতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অন্তরাত্মা হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, 'ওরে, এই মহাত্মাই যে তোর পরমাশ্রয়, এঁরই চরণে কর্ আত্মসমর্পণ।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন বিহ্বলভাবে নীরবে ধুনির পাশে বসিয়া পড়িলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিতেই দয়ালদাস-বাবা চক্ষু উন্মীলন করিলেন। গৌরকান্তি উজ্জ্বল নয়ন তরুণ দর্শনার্থী কৃষ্ণপ্রসন্নের দিকে করিলেন প্রসন্ন দৃষ্টিপাত। কি যেন এক অমোঘ আকর্ষণ রহিয়াছে পরমহংস দয়ালদাস-বাবার আয়ত নয়ন দুটিতে, ভক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন চিরতরে বাঁধা পড়িয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ নানা ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা চলিল, তারপর দর্শনার্থীরা উঠিয়া গেলে কৃষ্ণপ্রসন্ন মহাত্মার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। আর্ত স্বরে কহিলেন, "বাবা, ঈশ্বরপ্রাপ্তির সংকল্প নিয়ে পাগলের মতো আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি আমায় আশ্রয় দিন, সন্ন্যাসের দীক্ষা দিন, আর আশীর্বাদ করুন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য।'

অন্তর্যামী দয়ালদাস-বাবা জানিতেন, মুমুক্ষু কৃষ্ণপ্রসন্ন এই গঙ্গার ঘাটেই করিবেন তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ। এই নবীন সাধকের প্রতীক্ষায়ই যে এ কয়টি দিন তিনি মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়াছেন।

বাবার সম্মতি পাওয়া গেল। কৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁহার কৃপায় গ্রহণ করিলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত সন্ন্যাস, নব নামকরণ হইল—শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

ইহার অব্যবহিত পরেই, দয়ালদাস-বাবা ডেরা-ডাণ্ডা উঠাইয়া তাঁহার সাধুমণ্ডলী নিয়া, রওনা দিলেন মহাতীর্থ গঙ্গাসাগরের দিকে।

গঙ্গাসাগর দর্শনের পর উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের নানা তীর্থ ও পীঠস্থানে দয়ালদাসজী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। সব সময়েই তাঁহার মণ্ডলীর সঙ্গে আসিয়া জুটে নানা সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসী, গড়িয়া উঠে এক বৃহৎ জমায়েত। এই জমায়েত নিয়াই

পরমানন্দে তিনি সর্বত্র গতায়াত করেন। যেখানেই যান গৃহস্থ জনসাধারণকে দান করেন বেদান্তের উপদেশ—দান ধ্যান, ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন।

একবার জমায়েত নিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দয়ালদাসজী উপস্থিত হন কাপিয়াল গ্রামে, তাঁহার জন্মভূমিতে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর সন্ন্যাসীদের একবার পূর্বাশ্রমের জন্মভূমি ও পিতামাতাকে দর্শন করিয়া আসিতে হয়। এই উদ্দেশ্যেই কাপিয়াল গ্রামে সেদিন তাঁহার আগমন। এ সময়ে সঙ্গে রহিয়াছে শতাধিক সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী। এই সাধু জমায়েতের আগমনে সারা গ্রামে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। ধনী বণিক এবং সাধারণ গৃহস্থেরা সবাই মিলিয়া এই সাধুদের সেবায় তৎপর হইয়া উঠেন।

নিজের পূর্বাশ্রমের গৃহে উপনীত হইলেন দয়ালদাস। বৃদ্ধ পিতা ইতিপূর্বে পরলোকে গমন করিয়াছেন। জননীও এখন বৃদ্ধা, চলৎশক্তি রহিত। দয়ালদাস ভক্তিভরে জননীকে প্রণাম নিবেদন করেন, প্রকাশ করেন আত্মপরিচয়।

এতদিনের পরে পুত্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে, বৃদ্ধা জননীর তাই আনন্দের অবধি নাই। "মেরে ছোটেলাল, মেরে ছোটেলাল" বলিয়া পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে ছোট বালক জ্ঞানে তিনি কত আদর করিতেছেন, কপোল বাহিয়া ঝরিতেছে পুলকাশ্রু।

জননীর গৃহের প্রাঙ্গণে সেদিন এক বড় সভার আয়োজন হয়। গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, শীর্ষস্থানীয় সমাজ নেতারা, সবাই আন্তরিক অভিনন্দন জানান তাঁহাদের গ্রামের পরম গৌরব পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে।

সমাজের মুখপাত্রেরা এই সভায় দয়ালদাস মহারাজকে বলেন, "আমাদের শাস্ত্র মহাপুরুষদের উদ্দেশ্য ক'রে বলেছেন

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎসুখসাগরেঽস্মিন্
লীনং পরেব্রহ্মণি তস্যচেতঃ।

"আপনার সিদ্ধি সমুজ্জ্বল জীবনও তাই আপনার বংশকে পবিত্র করেছে, আপনার জননীকে কৃতার্থা করেছে, আর বসুন্ধরাকে করেছে পুণ্যবতী। আমরাও আপনার স্বজন ও বান্ধব হিসেবে হয়েছি এই পুণ্যের ভাগী।"

দয়ালদাস-বাবাও এই উপলক্ষে সমবেত জনতার কাছে নিবেদন করেন, "আপনারা আজ আমার সম্বন্ধে যা কিছু উল্লেখ করলেন, তার মূলে রয়েছেন আমার জনক ও জননী। এঁদের পুণ্যফলেই বহুবাঞ্ছিত সন্ন্যাসজীবন আমি লাভ করতে পেরেছি, আর পেয়েছি সমর্থ গুরুর আশ্রয়। জীবন আমার কৃতার্থ হয়েছে। আজ যাঁরা আমায় স্নেহ ভালবাসা জানাতে এসেছেন, তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য—আপনারা সংসারে রয়েছেন। এখানে মাত্র দুটো লেনদেনের দিকে সতত দৃষ্টি রাখুন। সদাই নিতে হবে ভগবানের নাম, আর অন্নহীনকে করতে হবে অন্নদান। সতত স্মরণ রাখুন, ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভেতর দিয়েই পাওয়া যায় সত্যকার ভোগসুখ, ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভেতর দিয়েই আসে ভগবানে অনুরাগ। সংসারের সব বস্তুই অসার, অনিত্য। তা হারিয়ে গেলেই আমরা দুঃখ শোকে অধীর হয়ে উঠি। একমাত্র সারবস্তু ও নিত্যবস্তু, যা

কখনো হারায় না, তা হচ্ছেন ভগবান্। এই ভগবানে অনুরাগ এলে তা কখনো নষ্ট হয় না। আর এই ভগবান্‌কে লাভ করলে সেই সম্ভোগ হয়ে থাকে অক্ষয়, অব্যয়। ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে একদিন ছুটে বেরিয়েছিলেম বলেই তো আজ আমি চরম ও পরম সম্ভোগ খুঁজে পেয়েছি। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং, এই বোধ নিয়ে জীবন হয়েছে মধুময়। আপনারা তাই নিত্যকার জীবনে ত্যাগ বৈরাগ্যের বোধকেই জাগ্রত করে তুলুন।"

মাতৃভূমি ও মাতার দর্শন সমাপনান্তে দয়ালদাস-বাবা জমায়েত সহ আবার বাহির হইয়া পড়েন তাঁহার চিরাচরিত পরিব্রাজনে।

১২৮৬ সালের কথা। হরিদ্বারে সে-বার মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হইতেছে। পরমহংস দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলী মেলাপ্রাঙ্গণে এক বিরাট সত্র খুলিয়া বসিয়াছে। সাধু মহাত্মা, ভক্ত দর্শনার্থী ও অন্ন-প্রার্থী দীন দুঃখীর ভিড়ে সারা অঞ্চলটি গমগম করিতেছে।

শিষ্য কৃষ্ণানন্দ স্বামীও এসময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। উদ্দেশ্য, মেলায় সমাগত সাধু মহাত্মাদের পবিত্র সান্নিধ্যলাভ।

গুরু মহারাজের ছাউনিতে আসিয়া, রাজসূয়ের মতো দানযজ্ঞের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তো কৃষ্ণানন্দের চক্ষুস্থির। প্রায় এক সহস্র সন্ন্যাসী অবধূত ও পরমহংস সেখানে অবস্থান করিতেছেন। একদিকে অবিরাম চলিয়াছে শাস্ত্রালাপ ও ধ্যান ভজন, আর একদিকে সাধু সন্ন্যাসী ও কাঙালীদের ভোজন পর্ব—দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে চারিদিক সরগম।

কৃষ্ণানন্দ বিস্মিত হইয়া কেবলি ভাবিতেছেন, এই রাজসূয় যজ্ঞের ব্যয় সংকুলান হয় কি ভাবে? গুরুদেব দয়ালদাস-বাবা তো একটি মুদ্রাও স্পর্শ করেন না, যাচ্ঞা করেন না কোনো কিছুই। অযাচক ও অনিকেত সর্বত্যাগী মহাপুরুষ তিনি। তবে কাহারা বহন করিতেছে এই বিপুল ব্যয়ভার? অবশ্য, একথা ঠিক, কল্পতরুর মূলে যিনি সদাই বাস করেন, তাঁহার আর কোনো কিছুর অভাব কি? তবে এই অভাব কিভাবে কোন্ অলৌকিক পন্থায় মোচন হইতেছে, সেই প্রশ্নটিই বার বার উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে তাঁহার মনে।

করজোড়ে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে। এই বিরাট যজ্ঞের ব্যবস্থা কিভাবে চলছে, কে করছে, বলুন তো?"

দয়ালদাসজী সহাস্যে উত্তর দেন, "দেখো বেটা—ভজন কর্‌না মেরা কাম, ভোজন দেনা মালিক্‌কা কাম। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছেন, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ মানুষ প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তার সৃষ্ট জীবকে, আশ্রিতকে ভুলে থাকতে পারেন? এমনকি যে নাস্তিক, যে ভগবান্ বিরোধী, তার আহারও যোগাচ্ছেন ভগবান্। কাজেই এখানে যা কিছু দেখতে পাচ্ছো, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু তো নেই।"

গুরু মহারাজ মুখে যাহাই বলুন না কেন, কৃষ্ণানন্দ কিন্তু বুঝিয়া নিয়াছেন—এসবই তাঁহার নিজেরই ঋদ্ধি-সিদ্ধির ফলশ্রুতি।

দয়ালদাসজী সেদিন কহিলেন, "বেটা কৃষ্ণানন্দ, যদি পরমাত্মার কৃপা চাও, অরূপের রূপ দর্শন করতে চাও, সর্বদা মনকে অন্তর্বৃত্তিশীল করো, ডুবে যাও ধ্যান সমাধির গভীরে।"

আর একদিন কৃষ্ণানন্দকে গুরুজী নিকটে ডাকিলেন, স্নেহভরে নানা-সাধন-উপদেশ দানের পর কহিলেন, "বেটা, গঙ্গার ওপারে, পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করছেন এক প্রাচীন আত্মজ্ঞানী মহাত্মা। তোমার সঙ্গে আমার এক চেলাকে দিচ্ছি, সে তোমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাবে। এই মহাত্মার আশীর্বাদ অমোঘ। তুমি আজই তাঁকে প্রণাম নিবেদন ক'রে এসো।"

শিবকল্প মহাপুরুষ নিভৃত গুহায় স্থাণুবৎ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া তিনি জানাইলেন তাঁহার আশীর্বাদ। কিছুক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "দেখো বাচ্চা, মানুষেরা বলে থাকে, চক্ষু উন্মীলন করলেই বস্তু দেখা যায়। আমি বলবো—এটা তাদের ভ্রম। আসল কথাটা কি জানো? যখন আমরা মাতৃগর্ভে থাকি, তখন দুই চোখ মুদিত থাকে, আসল বস্তুর দর্শন তখনই মিলে। জন্ম হবার পর যখন আমরা চোখ মেলে চাই, তখন দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়ায় যত অবস্তু, অর্থাৎ, মায়াময় অনিত্য জগৎ প্রপঞ্চ। মাতৃগর্ভে যে বস্তুকে, যে অরূপকে, যে পরম সত্যকে দেখছিলাম, তা তখন হয় অন্তর্হিত। ভাগ্যগুণে সদ্‌গুরু তোমার মিলেছে, তাঁর কাছ থেকে মায়াবন্ধন কাটাবার কৌশল শিখছো, এবার তাই প্রয়োগ করো তোমার জীবনে। চক্ষু মুদিত করো আর অন্তরের অন্তস্তলে নিমজ্জিত হও। সেখানেই মিলবে পরম ধন, হবে আত্মসাক্ষাৎকার।"

মহাত্মা নয়ন নিমীলিত করিলেন, মগ্ন হইলেন গভীর ধ্যানে। নীরবে এই শিবস্বরূপ মহাসাধকের চরণে প্রণাম জানাইয়া কৃষ্ণানন্দ গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সারা দেহ মন প্রাণ তাঁহার দিব্য অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, অন্তরে জাগিয়াছে পরম প্রশান্তি। মেলার ছাউনিতে ফিরিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে গুরুজীর কাছে বিবৃত করেন মহাত্মার উপদেশ ও বাণীর কথা এবং তাঁহার নিজের আত্মিক উপলব্ধির কথা।

কুম্ভমেলায় ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে সাধু-সন্তেরা যেমন আসিয়া জুটিয়াছেন, তেমনি ভিড় জমাইয়াছে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ নরনারী। সবাই পুণ্যস্নান সমাপন করে, আর দলে দলে উপস্থিত হয় উচ্চকোটির সাধু-মহাত্মাদের তাঁবু ও ছাউনিতে। সেদিন একদল ভক্ত গৃহস্থ দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে আসিয়া হাজির। বাবার শ্রীমুখের দুই চারিটি কথা না শুনিয়া তাহারা সেখান হইতে উঠিবে না।

বৈরাগ্য ও নিত্যানিত্য বস্তু বিচার আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান সোপান—এ কথাটি নানাভাবে নানা সময়ে দয়ালদাসজী তাঁহার ভক্ত দর্শনার্থীদের এ যাবৎ বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহার ঐসব উপদেশ ও বাণী সংকলন করিয়া শিষ্যেরা 'বিচার-সাগর' নামক একটি হিন্দি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে উল্লেখিত দুই চারিটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া দয়ালদাসজী কহিলেন, "আজকাল একটা কথা শুনা যায়,—জনকের মতো যোগ ভোগ দুই-ই করো। এসব শূন্যগর্ভ বচনে কোনো ফলোদয় হয় না। জনক হওয়া মানে দেহাত্মবোধশূন্য হওয়া। সে যে কঠোর সাধনসাপেক্ষ। একটি কথা তোমরা সদাই স্মরণ রেখো, দেহসম্বন্ধই হচ্ছে মানুষের জন্ম, মরণ, ভোগ, রোগ প্রভৃতি দুঃখের কারণ। দেহসংযোগ থেকেই বার বার উৎপত্তি হচ্ছে তার বাসনা এবং এই দেহসম্বন্ধ থেকেই বৃদ্ধি পাচ্ছে স্ত্রী-পুত্র কন্যার প্রতি মমত্ব বুদ্ধি। ফলে চারিদিকের মায়ার বন্ধনে সে জড়িয়ে পড়ছে। এই দেহের প্রতি অনাস্থাভাব জাগিয়ে তোল, তা হলে দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পদার্থের উপরই স্বাভাবিকভাবে বিরাগ এসে পড়বে,

বন্ধন খসে পড়তে থাকবে। বিচারশীল হও, আর ধ্যান মননের অভ্যাস দ্বারা মনকে ক'রে তোল অন্তর্মুখীন। তার ফলে, এই দেহটি সম্বন্ধে মনে হবে—এটি ইহজীবনের এক অস্থায়ী আবাস ছাড়া আর কিছু নয়। এই চিন্তা জাগলে দেহের প্রতি মমত্ব হ্রাস পায়, সঙ্গে সঙ্গে এই দেহসংশ্লিষ্ট বিত্তবিভব, স্ত্রী ও বিলাস উপকরণের বাসনাও শিথিল হয়ে পড়ে।

"আগেকার দিনে আমাদের দেশে ছিল চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা। ব্রহ্মচারী জীবনে বিষয়সংস্রব থেকে মানুষ দূরে থাকতো, সংযম ও ত্যাগ বৈরাগ্যে অভ্যস্ত হতো। তারপর গার্হস্থ্য জীবনের জন্য ছিল দান, যজ্ঞ ও দম বা ইন্দ্রিয় সংযমের ব্যবস্থা। এ সবের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে ভোগাসক্তি কমে আসতো, হতো বৈরাগ্যের উদয়। তারপর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি হলে সংসার ছেড়ে দিয়ে আরণ্যক জীবন তারা যাপন করতো, তারপর কেউ কেউ গ্রহণ করতো সন্ন্যাস। আজকাল মানুষের জীবনে এই চতুরাশ্রমের প্রস্তুতি দেখা যায় না। যৌবন থেকে বার্ধক্য অবধি সবাই ভোগসুখে মত্ত থাকে। তার ফলে ভোগ সামর্থ্য চলে গেলেও ভোগাসক্তি দূর হয় না।

"যুগের হাওয়া যত উল্টেই যাক, ঋষি ঋণ, দেব ঋণ আর পিতৃ ঋণ শোধ না ক'রে কিন্তু কারুর মুক্তির সম্ভাবনা নেই। গুরু সেবা, শাস্ত্রাভ্যাস, আত্মসংযম ও বীর্যধারণ ক'রে ঋষিদের সন্তুষ্ট করতে হবে। দেবতাদের প্রসন্ন করতে হবে দান, ব্রত ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা। আর ভোগাসক্তি বর্জন ক'রে ধর্মধৃত জীবন যাপন ক'রে, সুপুত্র উৎপাদন ক'রে শোধ দিতে হবে পিতৃপুরুষের ঋণ।"

অতঃপর দয়ালদাসজী সমবেত সাধু-সন্ত এবং গৃহস্থ ভক্ত সবাইকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "সৎ-চিৎ আনন্দময় আত্মা থেকে আমরা সবাই জন্মেছি, আত্মাতে বিধৃত রয়েছে আমাদের এই জীবন। আবার সেই আত্মাতেই আমরা সবাই ফিরে যাবো, লীন হয়ে যাবো। এই আত্মাই আমাদের প্রিয়তম বস্তু। শ্রুতির কথা সদাই করবে স্মরণ মনন অনুধ্যান—'তদেতৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরম্ যদয়মাত্মা।—আত্মা পুত্র থেকে প্রিয়, ধন থেকেও প্রিয়তর এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। এই আত্মার সাক্ষাৎকারই তোমাদের জীবনের পরম কাম্য হয়ে উঠুক, এই আশীর্বাদ আমি সবাইকে করছি।"

সমাগত ভক্ত দর্শনার্থীরা মহাত্মার এই স্নেহপূর্ণ ভাষণে উদ্দীপিত হইয়া উঠে, মেলাপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া বার বার উঠিতে থাকে জয়ধ্বনি—'জয় বাবা দয়ালদাস মহারাজ কি জয়।'

হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় আসিয়া শিষ্যপ্রবর শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী পরমানন্দে সদ্‌গুরুর সঙ্গ করিতেছেন, গ্রহণ করিতেছেন সাধনপথের বহুতর নিগূঢ় নির্দেশ। মুঙ্গের হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন দুইটি সাধু এবং অন্নদা নামে এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। শহরের একটি ভিন্ন আস্তানায় তাঁহারা তিনজন অবস্থান করিতেছেন। সেদিন মেলা-ক্ষেত্রে সাধুদের ছাউনিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ অন্নদাবাবু ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পরও তাঁহার কোনো সন্ধান মিলিল না। লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ে কোথায় তিনি তলাইয়া গেলেন। দুই দিন ঘোর দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল। অন্নদাবাবু কোথায় আছেন, আশ্রয় ও আহার জুটিতেছে কিনা তাছাড়া তিনি বাঁচিয়াই আছেন কিনা, তাহাই বা কে বলিবে? অনন্যোপায় হইয়া

কৃষ্ণানন্দ ভাবিলেন, গুরু মহারাজ অন্তর্যামী, তাঁহার কাছেই এ বিপদের কথা বলিবেন, বন্ধুটির সন্ধান জানিয়া নিবেন।

কিন্তু দয়ালদাস-বাবার দর্শন লাভের পর কৃষ্ণানন্দ এ প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিতে পারিলেন না। বহুতর ধর্মপ্রসঙ্গ সেখানে চলিতেছে। তিনি ভাবিলেন, —'আমার কি ভ্রান্ত বুদ্ধি, গুরু মহারাজের কাছে এসে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করবো, জীবন সমস্যার সমাধান জেনে নেব, তা নয়, কে কোথায় হারিয়ে গেছে তা নিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছি।' এবার তাই শান্ত মনে ধর্মালাপে নিবিষ্ট হইলেন।

এমন সময়ে হঠাৎ কৃষ্ণানন্দের মনে পড়িল অতীতের একটি ঘটনা। সে-বার গুরুদেব মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছেন। সে সময়ে কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়েন, তাঁহার একমাত্র পুত্র কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরিয়া না পাইলে তিনি আর প্রাণে বাঁচিবেন না। গুরুদেবের প্রাণ গলিয়া গেল, আর্ত ভদ্রলোকটিকে হারানো পুত্রের সন্ধান তখনি বলিয়া দিলেন। কিছুকাল পরেই পিতা পুত্রের মিলন ঘটিল।

শ্রীকৃষ্ণানন্দের মনে চিন্তার ঝলক খেলিয়া যায়, 'অচেনা এক দর্শনার্থীকে কৃপালু গুরুজী তাঁর নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সংবাদ জানিয়ে দিলেন। আর আমি তাঁর প্রিয় শিষ্য —আমার অন্তরের দুঃখ কি তিনি বুঝবেন না? গুরুজী অন্তর্যামী এবং মহা শক্তির মহাত্মা। অন্নদাবাবুর জন্য আমি যে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছি, তা নিশ্চয়ই তিনি উপলব্ধি করছেন। একটা কিছু তিনি করবেনই।

এমন সময়ে দয়ালদাস-বাবা হঠাৎ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "বেটা, তুমি কোন্ পথ দিয়ে আমার ছাউনিতে এসেছো? এবার ফিরবেই বা কোন্ পথে?"

"বাবা, কনখলের পথ ঘুরে সাধুদের মণ্ডলী দেখতে দেখতে আমি এসেছি। সেই পথেই বাসার ফিরবো বলে ভাবছি।"—নিবেদন করেন কৃষ্ণানন্দ।

"না বেটা, তুমি ও পথ দিয়ে যেয়ো না। সামনের নৌসেতু পার হয়ে, ভীমগড়া দিয়ে চলে যাও।"

"বাবা, ও পথটা আমি চিনিনে। তাই ভাবছি—'

"না-না, বেটা ঐ পথেই তুমি অবশ্য যাবে। পথ না চিনলে কি আসে যায়? একটু জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে নিও।"

গুরু মহারাজের এই আদেশ কৃষ্ণানন্দ শিরোধার্য করিলেন, ভীমগড়ার পথ ঘুরিয়াই চলিলেন নিজ বাসস্থানের দিকে। কিছুটা পথ অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, বন্ধু অন্নদা উদ্‌ভ্রান্তের মতো পথের পাশে বসিয়া আছেন। শরীর তাঁহার অসুস্থ ছিল, তারপর লোকের ভিড়ের চাপে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যান। এই দুইদিন অবর্ণনীয় কষ্টে তাঁহার কাটিয়াছে। কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে দেখা মাত্র ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরেন, সন্তর্পণে তাঁহাকে বাসায় নিয়া গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এবার বুঝিলেন, বিপন্ন অন্নদাকে উদ্ধার করার জন্যই অন্তর্যামী গুরুদেব ভীমগড়ার পথ সম্পর্কে এত জেদ করিতে-ছিলেন।

দয়ালদাস-বাবার আশ্রয় নিবার পর হইতে অনেক ছোটখাটো ব্যাপারেও কৃষ্ণানন্দ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। বাবাও এই নবীন তপস্বীকে সদ্‌গুরু মহিমা উপলব্ধি করানোর জন্য মাঝে মাঝে প্রয়োগ করিতেন নিজের অলৌকিক শক্তি।

কুম্ভমেলা তখন ভাঙিয়া গিয়াছে, সাধু-সন্ন্যাসী ও যাত্রীরা সবাই দলে দলে হরিদ্বার ত্যাগ করিতেছেন। তখনকার দিনে হরিদ্বার অবধি ট্রেন হয় নাই। গরু, ঘোড়া বা উটের গাড়ি নিয়া সাহারাণপুরে গিয়া যাত্রীরা ট্রেন ধরিত। শ্রীকৃষ্ণানন্দ ও তাঁহার সহযাত্রীরা যানবাহন কেন্দ্রে আসিয়া দেখিলেন, সব গাড়ি ভাড়া হইয়া গিয়াছে। একখানিও অবশিষ্ট নাই। অথচ সেইদিনই রওনা না হইলে কোনো কোনো সহযাত্রীকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইবে।

বৈশাখের মধ্যাহ্ন। চারিদিকে প্রচণ্ড রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে। এ সময়ে পদব্রজে সাহারাণপুরে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। সঙ্গীরা সবাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন।

অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণানন্দ স্মরণ করিলেন গুরু মহারাজকে। ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, জীবনের যেকোনো সমস্যার জন্যই যে শ্রীগুরুর কৃপার উপর তিনি নির্ভর করিয়া আছেন। অচিরে দয়ালদাস-বাবার প্রেমঘন মূর্তিটি তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল, দুশ্চিন্তার মেঘ এক নিমেষে কোথায় উড়িয়া গেল। সঙ্গীদের আশ্বাস দিয়া তিনি কহিলেন, "আপনারা সাহারাণপুর যাওয়া নিয়ে আর ভাববেন না। অচিরে এ বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পাবো।"

সহযাত্রীরা তাঁহার কথা শুনিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন, এমন সময়ে এক অপরিচিত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কৃষ্ণানন্দকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কোথায়ই বা যাবেন, বলুন তো?"

উত্তর হইল, "মুঙ্গের থেকে এসেছি, যেতে চাই সাহারাণপুরে। কিন্তু কোনো গাড়ি আমরা যোগাড় করতে পারি নি।"

"তাই নাকি? আচ্ছা, আপনারা নিশ্চিত হয়ে বিশ্রাম করুন। বিকেল চারটায় আমি গাড়ি নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য।"

যথা সময়ে ভদ্রলোকটি একটি ঘোড়ার গাড়ি যোগাড় করিয়া সেখানে উপস্থিত হন, কৃষ্ণানন্দ ও তাঁহার সঙ্গীদের অতি যত্ন সহকারে তাহাতে তুলিয়া দিয়া রওনা করেন সাহারাণপুরের পথে।

কোথা হইতে কেন এই অপরিচিত পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আবির্ভূত হইলেন, কেনই বা গ্রীষ্মের গরমে ছুটাছুটি করিয়া গাড়ি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, তাহা রহস্যময়।

কৃষ্ণানন্দ কিন্তু উপলব্ধি করিলেন, কৃপালু গুরু মহারাজের অদৃশ্য হস্তটি সঞ্চালিত হইয়াছে এই আগন্তুকের মধ্য দিয়া, নির্ভরশীল শিষ্যকে তিনিই আজিকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রধান তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া সে-বার কৃষ্ণানন্দ বিহারের ত্রিহুত অঞ্চলে ফিরিয়া যাইতেছেন। বাড় নামক স্টেশনে তাঁহাকে গাড়ি বদলাইতে হইবে। এ কয়দিন দীর্ঘ রেলপথ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, শরীর বড় ক্লান্ত। ইতি-মধ্যে কখন হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে দেখিলেন, ট্রেনটি ধীরে ধীরে একটি স্টেশন ত্যাগ করিতেছে। সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, এটি বাড় স্টেশন এবং ত্রিহুত অঞ্চলে যাইতে হইলে এখানেই গাড়ি বদল করিতে হয়।

কৃষ্ণানন্দ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কণ্ঠ হইতে অস্ফুট স্বরে নির্গত হইল, "হায় গুরুদেব, একি বিপদে আমি পড়লাম। বদল না করতে পারলে অনেক ঘুরে আবার এ পথে আমায় ফিরতে হবে, অনেক কিছু জরুরী কাজ হয়ে যাবে বানচাল।"

কি আশ্চর্য। সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল এঞ্জিনের একটা ভয়ঙ্কর শব্দ, এবং গাড়িটিও ধীরে ধীরে থামিয়া গেল। তখন অবধি কিন্তু উহা প্ল্যাটফরমের সীমানা ত্যাগ করে নাই। এই সুযোগে কৃষ্ণানন্দ মালপত্র নিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন। গার্ড ও ড্রাইভারদের মধ্যে ততক্ষণে ছুটাছুটি শুরু হইয়া গিয়াছে। কয়েক মিনিট পরে এঞ্জিন ঠিক করিয়া নিয়া গাড়িটি আবার ধাবিত হয় গন্তব্য পথে। কৃষ্ণানন্দ বুঝিলেন, গাড়ির ইঞ্জিন বিকল হওয়ার পশ্চাতে রহিয়াছে তাঁহার গুরু মহারাজের করুণালীলা। শিষ্যের ক্লেশ নিবারণের জন্যই যোগবিভূতি আজ এই সময়ে তিনি প্রকটিত করিলেন। তাছাড়া, এই ঘটনার মধ্য দিয়া শিষ্যের হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত করিয়া দিলেন তাঁহার আশ্রিত বাৎসল্যের স্বরূপটি।

কয়েক বৎসর পরের কথা। পরমহংস দয়ালদাস-বাবা সে-বার তাঁহার মণ্ডলী নিয়া পদব্রজে দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রধান তীর্থ তিরুপতিতে চলিয়াছেন বালাজী বিগ্রহ দর্শনের জন্য। তাঁহার ঋদ্ধি সিদ্ধির প্রসিদ্ধি ইতিমধ্যেই সাধু ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়াছে। তাই অপর সম্প্রদায়ের বহু সাধুও তাঁহার সঙ্গ নিয়াছেন। ফলে পরমহংসজী একটি বড় জমায়েত নিয়াই পথ চলিতেছেন।

সেদিন কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা দিল এক বিস্তৃত বনাঞ্চল। লোকালয় এদিকে খুব বেশী নাই। দয়ালদাস-বাবা সঙ্গীদের ডাকিয়া কহিলেন, "এখানকার গ্রামের লোকেরা সজ্জন, সাধুদের জন্য তাঁহারা ভাণ্ডারা দিয়াছে। তোমরা সবাই আজ ভাল ক'রে ভোজন সেরে নাও। আগামী কাল অন্ন মিলবে না।"

ঠিক তাহাই ঘটিল। পরদিন গহন অরণ্য পথে কোনো জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ মিলিল না। সারা দিনের পথ চলার পর সাধুরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ক্ষুৎপিপাসায়ও সবাই কাতর। তাঁহাদের মলিন মুখ দেখিয়া দয়ালদাসজী তাঁহার ধ্যানাসনে গিয়া বসিলেন। ব্রহ্মলীন গুরুদেব ঠাকুরদাস মহারাজকে মনে মনে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন, "বাবা, এতবড় একটা সাধু জমায়েত আমার সঙ্গে আজ চলছে, অথচ আহার্য সংগ্রহের কোনো সম্ভাবনা নেই। এরা সবাই যে আমার উপরই নির্ভর ক'রে আছে। তুমি কৃপা ক'রে এর একটা বিহিত করো।"

সঙ্গে সঙ্গে দয়ালদাসজীর মানসপটে ভাসিয়া উঠিল একটি বিরাট বৃক্ষ, উহার শাখায় থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে সুস্বাদু ফল।

আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া তিনি সেবক শিষ্যদের বললেন, "তোমরা আশেপাশে শিগগীর একটু তল্লাসী চালাও তো। আজ বৃক্ষই হবেন আমাদের ভোজনদাতা। দ্যাখো কোথাও কোনো বৃক্ষে সুপক্ক ফল রয়েছে কিনা।"

খোঁজাখুঁজি তখনই শুরু হইয়া গেল এবং কিঞ্চিৎ দূরে সন্ধান মিলিল একটি বৃহৎ আম্রবৃক্ষের, সত্যই অজস্র সংখ্যক পাকা ফল উহাতে ঝুলিয়া রহিয়াছে। সঙ্গীরা ঐসব আম্র ভোজন করিয়াই সেদিন ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করিলেন।

সাধুরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, এই আম্র ফলিয়াছে নিতান্ত অসময়ে। তাছাড়া,

এই বিরাট বনে একটি ছাড়া আর কোনো আম্রবৃক্ষ বর্তমান নাই। সকলেই বুঝিয়া নিলেন, ইহা পরমহংস দয়ালদাসজীর যোগবিভূতিরই এক নিদর্শন।

পরমহংস দায়ালদাস-বাবা তাঁহার জমায়েৎ নিয়া কয়েকটি তীর্থ ঘুরিয়াছেন। এবার রওনা হইয়াছেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে। পদব্রজে সবাই চলিয়াছেন। একটি দীর্ঘ প্রান্তর অতিক্রম করার পর সূর্য অস্তমিত হইল। নিকটে কোথাও গৃহস্থদের গ্রাম নাই যেখানে আশ্রয় নেওয়া যাইবে। পথে কেবলি পড়িতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আর কণ্টক ও প্রস্তরময় দুর্গম পথ। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারময় রাত্রি তদুপরে আকাশ ব্যাপিয়া শুরু হইয়াছে মেঘের ঘনঘটা। জমায়েতের সাধুরা অতি কষ্টে দুর্গম পথ দিয়া চলিয়াছেন, কাঁটা ও প্রস্তরের ঘায়ে অনেকেরই পা হইয়াছে ক্ষত বিক্ষত। অন্ধকার গাঢ় হওয়ায় পথের নিশানা বার বার ভুল হইতেছে, সাধুরা মাঝে মাঝে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আরও বিপদে পড়িতেছেন। এই ঘোর বিপদে সবাই দয়ালদাস-বাবার কাছে মিনতি জানাইতে থাকেন, "বাবা, আপনার আশ্রয়ে থেকেও একি সঙ্কটে আজ আমরা পড়েছি? একেই দেহ পথশ্রমে অবসন্ন। তার ওপর ঘন অন্ধকারময় রাত্রিতে শোনা যাচ্ছে মেঘের গর্জন। আপনি আমাদের প্রতি একটু দৃষ্টি দিন।"

"তোমরা সাধু, সব ভার পরমাত্মায় ন্যস্ত করেছো। তোমরা বিপদের মুখে এমন অধীর হবে কেন? পরমাত্মাকে ডাকো, কৃপা তিনি অবশ্যই করবেন।"—নির্বিকার চিত্তে প্রশান্ত কণ্ঠে দয়ালদাসজী কথা কয়টি বলিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই দেখা দিল বিপদভঞ্জন পরমপ্রভুর কৃপা-সঙ্কেত।

"অকস্মাৎ সাধুগণ দেখিতে পাইলেন সম্মুখে একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল, এবং প্রায় সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইল, যেন একজন স্থূল কলেবর উলঙ্গ পুরুষ হস্তে প্রদীপ্ত মশাল লইয়া নাচিতে নাচিতে মণ্ডলীর অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন, আর একজন কৃষ্ণবর্ণা বিবসনা নারী তাঁহারই তালে তালে নাচিতে নাচিতে তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। সাধুগণ আলো দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন, ঐ আলোকের ছটায় পথ দেখিয়া মশালধারীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। প্রায় দুই ক্রোশ এই আলোকের ছটায় সাধুগণ অক্লেশে গমন করিলেন। তাহার পর অকস্মাৎ আলোটি নিবিয়া গেল। যিনি কৃপা করিয়া আলো দেখাইতেছিলেন, তাঁহাকে আর দেখা গেল না। দিগম্বরী নারীও কোথায় গেলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

"সাধুগণ দেখিলেন, তাঁহারা একটি গ্রামের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তথায় থাকিবার আশ্রয় পাইলেন, অমনি মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

"নির্বিঘ্নে সাধুগণ গ্রামে পৌঁছিয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ,—আলো ধরিয়া আসিল কে?

"স্বামীজী বলিলেন, 'তোমরা কি চিনিতে পার নাই? সাধুগণ কাতর হইয়া ডাকিলে যিনি অভয় দান করিয়া থাকেন, ভক্ত ডাকিলে যিনি ভক্তের দুঃখ দূর না করিয়া থাকিতে পারেন না, এ যে সেই হরপার্বতী। সাধুদিগের হৃদয় ভক্তের সংসার অতুল কৃপার পরিচয় পাইয়া প্রেমে পুলকিত হইল[১]।'

---

১ সিদ্ধাবধূত দয়ালদাস স্বামী : শ্রীমৎ আনন্দ স্বরূপ

পাঞ্জাব প্রদেশে ছিল পরমহংস দয়ালদাসজীর গুরু-স্থল এবং জন্মস্থান। তাই স্বাভাবিকভাবে বহু পাঞ্জাবী সাধক তাঁহার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মণ্ডলীতে আসিয়া আশ্রয় নিত, সন্ন্যাসদীক্ষা নিত তাঁহার নিকট হইতে।

মণ্ডলী সঙ্গে নিয়া দয়ালদাস মহারাজ সেবার কিছুদিনের জন্য লাহোরে অবস্থান করিতেছেন। জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষুদের সঙ্গে নানা প্রশ্নোত্তর চলিতেছে। নবাগত সন্ন্যাসী কহিলেন, "বাবা, আমরা শুনেছি, আপনি আপনার গুরুর কাছে যোগসাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন আবার বেদান্তের আত্মতত্ত্বও হয়েছে পরিজ্ঞাত। আজকাল তো আপনি বেদান্ততত্ত্বের শিক্ষাই বেশী দিয়ে থাকেন। সাধনপথের আমরা নূতন পথিক। কৃপা ক'রে আমাদের বলুন, কোন্ পথ আমরা অনুসরণ ক'রবো।"

বাবা উত্তরে কহিলেন, "আমার ওপর আমার গুরুর কৃপা ছিল অপরিমেয়। তিনি সর্ব সাধনায় পারঙ্গম ছিলেন, সর্ব দর্শনে ছিল তাঁর অসামান্য অধিকার। বালক-কালে যোগসাধনা ও যোগসিদ্ধির উপর আমার প্রবণতা দেখে, সেই পথেই আমায় করেছিলেন তিনি সিদ্ধকাম। তারপর বেদান্তের আত্মজ্ঞানের পরম পথটি আমায় তিনি প্রদর্শন করেন, তাঁর কৃপায় জীবন আমার ধন্য হয়। আমি নিজে সাধনার সব পথ অনুসরণ করেছি, অনেক কৃচ্ছ্র, অনেক তপস্যা করেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলছি, আজকের দিনের মানুষের পক্ষে যোগসাধনার পথ বড় কঠিন। বরং সংযম ও ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে থেকে তারা চিত্তের মল অপসারণ করুক, নিত্য অনিত্য বস্তুর বিচার ক'রে আত্মাকে উপলব্ধি করুক। তাই হবে তাদের বর্তমান জীবনযাত্রার পক্ষে অনুকূল সাধনা। এই জন্যই সর্বসাধারণের কাছে বেদান্তের উপদেশই আমি দিই।"

নবীন সন্ন্যাসীদের অনুরোধে বাবা বেদান্তের কয়েকটি মূলতত্ত্ব এ সময়ে বিশ্লেষণ করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া কহিলেন, "কিন্তু বেটা, তোমরা গৃহস্থ নও, সন্ন্যাসী। মোক্ষের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে পথে বেরিয়েছো। একটা কথা মনে রেখো। শুধু বেদান্ত শ্রবণে আত্মসাক্ষাৎকার ত্বরান্বিত হবে না। এজন্য চাই নিত্য অভ্যাস, নিত্য নিদিধ্যাসন। জানতো, বিবেক চূড়ামণি বলেছেন,

শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি
নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্বিকল্পকম্ ॥

—বেদান্ত শ্রবণ অপেক্ষা মনে মনে বেদান্তসিদ্ধান্তের চিন্তন করার ফল শতগুণ বেশী, তা অপেক্ষা লক্ষগুণ ফলপ্রদ হচ্ছে আত্মার নিদিধ্যাসন অভ্যাস করা, পরমাত্মায় প্রলীন হয়ে নির্বিকল্প সমাধিতে চলে যাওয়ার ফল হচ্ছে অনন্তগুণ।

"অপরোক্ষানুভূতি-তেও রয়েছে সেই একই কথা।—প্রতিনিয়ত নিদিধ্যাসনের অভ্যাস ব্যতীত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না। অতএব মুমুক্ষু পুরুষকে আত্মকল্যাণের জন্য সদাই রত থাকতে হবে ব্রহ্মধ্যানরূপ নিদিধ্যাসনে।"

তত্ত্ব প্রসঙ্গ শেষ হইলে জনৈক সেবক জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা আপনি কাল বলে-ছিলেন, এখানকার ডেরা ডাণ্ডা এবার ওঠাতে হবে—এ সম্বন্ধে আর তো কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন না।"

দয়ালদাসজী উত্তর দেন, "হাঁ বেটা, এবার আমরা চলার পথে। কিন্তু দুটি

লোকের জন্য যে আমায় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তাই তো, তারা যে এখনো এসে পৌঁছলো না।"

"কাদের আসবার কথা মহারাজ? কোনো পুরোনো ভক্ত?" সেবকটি স্বাভাবিক ঔৎসুক্য নিয়া প্রশ্ন করে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্মুখীন হইয়া যান দয়ালদাস-বাবা। আপন মনে নিম্নস্বরে কহিতে থাকেন, "আহা, বেটা, কতদূর থেকে ছুটে আসছে। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পা দুটো হয়েছে, ক্ষত বিক্ষত। হ্যাঁ প্রাণে যখন বৈরাগ্যের আগুন জ্বলে, মানুষ তখন এমনি ব্যাকুলতা নিয়েই এগিয়ে আসে।"

উপস্থিত শিষ্য ও সেবকেরা বাবাকে চাপিয়া ধরিলে আসল কথাটি এবার ভাঙিয়া বলিলেন, "লাহোর থেকে অনেক দূরের পথ, সতানা গ্রাম থেকে আসছে মুন্না সাহুকার। এ শরীরের দর্শন আগে সে কখনো পায় নি, মন তার উতল হয়ে উঠেছে বেশ কিছুদিন ধরে। স্বপ্নে দেখেছে, এখান থেকেই পাবে সে তার সন্ন্যাসদীক্ষা। তাই জীবন পণ ক'রে সে ধাবিত হয়েছে। এমন বৈরাগ্যের উদয় যার হয়েছে, তাকে ঠেকানো কঠিন। তাই তো এখানে অপেক্ষা করছি।"

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দয়ালদাস-বাবার তাঁবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় সেই বৈরাগ্যবান্ মানুষটি, কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়ে তাঁহার চরণ-তলে। বার বার নিবেদন করে নিজের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

সেই দিনই এক শুভ লগ্নে দয়ালদাসজী এই নবাগত মুমুক্ষুকে দান করেন সন্ন্যাস-দীক্ষা। নব নামকরণ করেন—দয়ানন্দ স্বামী। গুরুর নির্দেশে বৈরাগ্যময় তপস্যা শুরু করিয়া দয়ানন্দজী উত্তরকালে পরিণত হন এক সার্থকনামা সাধকে। কাশীতে দীর্ঘদিন তিনি অবস্থান করেন, তারপর দয়ালদাস-বাবার প্রিয় শিষ্য ও মণ্ডলী-নেতা স্বামী আনন্দপ্রকাশজীর সঙ্গে থাকিয়া উত্তরভারতের নানা তীর্থে গুরুর ঈপ্সিত কর্ম অন্নদানব্রতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

অন্তর্যামী মহাপুরুষ দয়ালদাস-বাবা অপর যে লোকটির জন্য লাহোরে সেদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবার সেও আসিয়া উপস্থিত হয়। লোকটি জাতিতে জাঠ, বাড়ি লাহোরের অনতিদূরে গোছীগাঁও-এ। দেশে তাহার চাষবাসের ভাল খামার আছে, বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন লোক। কিন্তু একমাত্র কন্যাটিকে নিয়া এই জাঠ জোতদার বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কন্যাটি উন্মাদ রোগগ্রস্তা, ডাক্তার কবিরাজ ডাকাইয়া দীর্ঘদিন তাহার চিকিৎসা করানো হইয়াছে, কোনো ফল হয় নাই। গোছীগাঁও-এর বহু লোক সম্প্রতি পরমহংস দয়ালদাস-বাবাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। তাহাদের মুখে বাবার যোগবিভূতির খ্যাতি শুনিয়াছে এই জাঠ। তাই উন্মাদ কন্যার রোগমুক্তির প্রার্থনা নিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে।

দয়ালদাসজীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত ভক্তটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, "বাবা, কন্যাটি ছাড়া সংসারে আর আমার আপন বলতে কেউ নেই। আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে কয়েক বৎসর যাবৎ। শুধু এই কন্যাটিকে অবলম্বন ক'রে আমি দিন গুজরান করছি। আজ ক' বৎসর হলো সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। এখন সব চিকিৎসার বাইরে। আপনি কৃপা ক'রে তাকে রোগমুক্ত করুন সেই সঙ্গে আমার প্রাণও রক্ষা করুন।"

দয়ালদাসজীর চোখ দুটিও অশ্রু ছলছল হইয়া উঠিয়াছে। স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, "বেটা, তোমার জন্যই যে আমি আজ এখানে অপেক্ষা করছি। আমার তো এর আগেই লাহোর ছেড়ে যাবার কথা ছিল। ওঠো, এবার শান্ত হয়ে বসো, আর কেঁদো না। তোমার কন্যা আমার অপরিচিতা নয়। তাঁর পূর্ব জন্মের খবর আমি রাখি। আসলে উন্মাদ রোগে সে ভুগছে না। তোমার ডাক্তার কবরেজরা ভুল করেছে, অসুস্থতার কারণ ধরতে পারে নি।"

"সে কি মহারাজ! তাহলে—"

"হাঁ, বেটা, তোমার কন্যা হয়ে যে জন্মগ্রহণ করেছে, পূর্ব জন্মে সে ছিল যোগভ্রষ্টা সাধিকা। এ জন্মের গোড়াতেই তার পূর্ব স্মৃতির কিছুটা উদয় হয়েছে, পূর্বের যোগ-সিদ্ধির অনুভূতিও স্ফুরিত হবার অবকাশ খুঁজছে। তোমার কন্যা উন্মাদ নয়, সে ভুগছে যোগজ ব্যাধিতে। আমি আশীর্বাদ করছি, আজ থেকে সে ভাল হয়ে উঠবে, খুঁজে পাবে সে নিজ সাধনার ভিত্তিভূমি।"

আর্ত জাঠ ভক্তটির হৃদয় হইতে পাষাণ ভার নামিয়া যায়। করজোড়ে সে নিবেদন করে, "মহারাজ, আপনার অসীম কৃপার কথা এতদিন লোকমুখে শুনে এসেছি, এবার তা নিজে অনুভব ক'রে ধন্য হলাম। মহারাজ আর একটু কৃপা এ অধমকে করুন। আপনার চরণামৃত আমায় দিন, গোছীগাঁও-এ ফিরে গিয়ে আমার কন্যাকে তা পান করাবো।"

"বেটা, তার কোনো আবশ্যক নেই। তবে একটা কাজ তুমি করবে। তোমার গৃহে একটি ছোট শিবমন্দির তৈরি ক'রে দাও, তোমার কন্যা শিব বিগ্রহের পুজো ও জপধ্যান নিয়ে থাকুক। আমি আবার আশীর্বাদ করছি। তাঁর পূর্ব জন্মের সাধনা এবার সার্থক হয়ে উঠুক, মোক্ষের পথে সে এগিয়ে যাক্।"

ভক্ত জাঠটি আনন্দে বাবার এই নির্দেশ মানিয়া নেয়। তারপর বহু কাকুতি মিনতির পরে দয়ালদাস মহারাজের চরণামৃত সে সংগ্রহ করে, রওনা হয় স্বগ্রামের দিকে।

"অন্নদানে বাবা দয়ালদাসের ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল। অন্নাদি প্রস্তুত হইলে তিনি শুধু একবার সেই সমস্ত দ্রব্য দর্শন করিতেন ও সদ্‌গুরুর কৃপা প্রার্থনাপূর্বক সাধু দিগকে পরিবেশন করিবার অনুমতি দিতেন। জানা নাই, শুনা নাই, অনাহূত, রবাহূত, কত লোকই যে ভোজন করিতে বসিত তাহার সীমা নাই। কিন্তু কখনও কোনো দিনও স্বামী দয়ালদাসের ভাণ্ডারে অন্নের ন্যূনতা হয় নাই। একবার হৃষীকেশে সাধু ভোজনকালে যতগুলি সাধুর অন্ন প্রস্তুত ছিল, তদতিরিক্ত অন্যূন আট শত সাধু উপস্থিত হইলেও সেই অন্নেই সকলের পরিপূর্তি হইয়াছিল, বরং কিছু অন্ন উদ্বৃত্তও ছিল।

"তিনি যে তীর্থে বা যেখানে যাইতেন, তাঁহার নাম শুনিলেন দোকানদারগণ তাঁহার মণ্ডলীর জন্য যত দ্রব্য আবশ্যক হইত সমস্তই সরবরাহ করিত। মূল্য কে দিবে, দোকানদার তাহা কখনও জিজ্ঞাসা করিত না। কোনো চিঠি নাই, পত্র নাই, স্বামী দয়ালদাসের নাম শুনিলেই দোকানদার দ্রব্য দিতে কুণ্ঠিত হইত না। তিন হাজার চার হাজার টাকার সামগ্রী দিল, তবু দোকানদার টাকার তাগিদ করিত না। তাহারা জানিত, স্বামীজী সেই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্বেই কেহ না কেহ সেই টাকা পরিশোধ

করিবেই করিবে। বস্তুত তাহাই ঘটিত। তজ্জন্য স্বামীজীকে বা দোকানদারকে কোনো চিন্তাই করিতে হইত না।

'১২৯৭ সালের হরিদ্বার কুম্ভমেলার শেষে যখন স্বামীজীর মণ্ডলীর স্থানান্তরে যাওয়া স্থির হইল, তখন মণ্ডলীর একজন সাধু আসিয়া বলিলেন যে, দোকানদার প্রায় সাত-আট হাজার টাকার সামগ্রী যোগাইয়াছে, ভক্তগণ প্রায়ই তাহা পরিশোধ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও আটশত টাকা তাহার বাকী আছে।

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন,—তজ্জন্য তুমি উদ্বেগ করিও না, এ ঋণ পরিশোধ করিয়া তুমি দুইশত উদ্বৃত্ত দেখিতে পাইবে। সাধু নীরব রহিলেন।

অন্তর্যামী সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা হইবে কেন? তাহার পরদিন কোথা হইতে একজন ধনাঢ্য ভক্ত আসিয়া স্বামীজীর চরণে এক হাজার টাকার ভেট দিয়া প্রণাম করিলেন, সকল লোকে দেখিয়া অবাক্ হইল। দোকানদারের আটশত টাকা পরিশোধ হইয়া সাধুদের জন্য দুইশত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল।"[১]

পরমহংস দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলীতে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখার প্রথা নাই। যত্র আয় তত্র ব্যয়। সেবকেরা জানাইলেন, "বাবা, এই উদ্বৃত্ত দুইশত টাকা নিয়ে কি করা হবে, আপনি নির্দেশ দিন।"

ভিন্ন মণ্ডলীর কয়েকটি প্রবীণ ও নবীন সন্ন্যাসী দূর দেশ হইতে মেলায় আসিয়াছেন, আশ্রয় নিয়াছেন দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে। দয়ালদাসজী তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের কাছে ডাকাইলেন, শিষ্যদের আদেশ দিলেন, "উদ্বৃত্ত টাকা সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এই সাধুদের ট্রেনভাড়া ও-থেকে দিয়ে দাও। তারপরে যে কটি টাকা বাঁচবে, তা দিয়ে ওদের দু'একটি শাস্ত্রগ্রন্থ আর বহির্বাস কিনে দাও, সব ল্যাঠা চুকে যাক্।"

রাজপুতানা আলোয়ারের প্রসিদ্ধ মোহান্ত বাবা ভগবান্‌দাসজী এক সময়ে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া দয়ালদাসজীর জমায়েতের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। সে বার কুরুক্ষেত্রে এক বিরাট ধর্মমেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। দয়ালদাসজীও সেখানে তাঁহার মণ্ডলী ও আশ্রিত সাধু সন্ন্যাসী নিয়া উপস্থিত।

সাধু, দর্শনার্থী ভক্ত ও কাঙালীদের ভোজনের ঢালাও ব্যবস্থা। রোজ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে অন্নদান করা হইতেছে। এই সময়ে ভাণ্ডারার সব ভার ছিল বাবা ভগবান্‌দাসজীর উপর। মেলা শেষ হইয়া গেলে দেখা গেল, ধনী শেঠ ও দর্শনার্থীদের প্রদত্ত সব টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে এবং দোকানদারদের প্রাপ্য টাকা সবটা তখনও শোধ করা যায় নাই। দুই হাজার টাকার উপর দেনা রহিয়া গিয়াছে। অথচ দুই একদিনের মধ্যে তাঁবু ভাঙিয়া দেওয়া হইবে।

ভগবান্‌দাসজী ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাই দয়ালদাসজীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "মহারাজ, আমাদের সবাইকে তো এবার এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু দোকান বাকীর টাকার তো কোনো ব্যবস্থা নেই। কি উপায় হবে?"

"টাকাটা এখানে ব্যয় করা হয়েছে কেন? সাধুদের জন্যই তো?"

---

১ সিদ্ধাবধূত দয়ালদাস স্বামী : শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আমি তো আমার বেটা বেটীর বিবের জৌলুসে খরচ করি নি? তুমি এতো দুশ্চিন্তায় পড়েছো কেন? সদ্গুরু সব সময়েই এ সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন, প্রতিদিন তা প্রত্যক্ষও করছো। তবে এই চিত্তচাঞ্চল্য কেন?"

দুই দিন পরেই দেখা গেল, এক সিন্ধী বণিক কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত। দয়ালদাস-বাবা এখনো মেলা-ক্ষেত্রে রহিয়াছেন শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই শেঠ দুই হাজার টাকার একটা পুঁটলী বাবা মহারাজের চরণতলে রাখিয়া দিলেন।

তৎক্ষণাৎ দয়ালদাস-বাবা ভাণ্ডারার ভারপ্রাপ্ত কর্মী ভগবান্‌দাসজীকে ডাকাইয়া আনিলেন। সহাস্যে তাঁহাকে কহিলেন, "এই নাও বেটা, সদ্গুরু কৃপা ক'রে এই টাকা আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন। দোকানদারদের প্রাপ্য টাকা এখনি পরিশোধ ক'রে দাও। তারপর আমিও মণ্ডলী নিয়ে অন্যত্র রওনা হই।"

এই কুম্ভমেলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী, প্রবীণ সাধক, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ধর্মপ্রচারক পত্রিকায় লিখেন ঃ

"এই মহামেলায় রাজা রাজেন্দ্রবর্গের প্রতাপ অপেক্ষাও সন্ন্যাসী সাধুগণের প্রভাব প্রবল বলিয়া বোধ হইল। আখড়াধারী মোহান্তগণের সাজসজ্জা প্রধান প্রধান রাজা-দিগের অপেক্ষা অধিক জাঁকজমকের। হাতী, ঘোড়া, উট, নাগারা, দামামা, তুরী, ভেরী প্রভৃতির তুমুল ব্যাপার, এবং প্রত্যেক আখড়ায় সহস্র সহস্র সাধু, গৃহস্থ অভ্যাগতের অবিরত অন্নদান দর্শনে আমাদের হৃদয় উৎসাহ ও উল্লাসযুক্ত হইল। নাগা, আলেখিয়া দঙ্গলী, অঘোরী, ঊর্দ্ধবাহু, নখী, ঠারেশ্বরী, পঞ্চতপা, মৌনব্রতী, পরশরাম, কড়ালিঙ্গী, ফরারী, অন্তঘড়, গুদড়, সুখড়, রুখড়, ভুখড়, কুখড়, উখড়, ঘররড়ী, স্বর্ভঙ্গী, দশনামী-সন্ন্যাসী, দাদুপন্থী, নানকপন্থী, কবিরপন্থী, অবধূত, ব্রহ্মচারী, হংস, পরমহংস, খাকী, জটাধারী, কাণফাটা যোগী আদি কত শ্রেণীর কত সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী যে আসিয়া-ছিলেন তাহা বলিতে পারি না। দেখিয়া প্রাণ জুড়াইল, হৃদয় শীতল হইল। চক্ষু সফল ও মানবজন্ম পবিত্র হইল।

"এই মহা মহার্ঘ মেলায় যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই যেন ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা ও ভক্তির ফোয়ারা ছুটিতেছে দেখিতে পাই। এই মেলা প্রাণ ভরিয়া দেখিলে সংসারের লীলাখেলা আর ভাল লাগে না, জীবের বৃথা মান অভিমান যেন কোথায় পলায়ন করে।

"এবারে হরিদ্বারে স্নান করিতে আসিয়া আর একটি অলভ্য লাভ হইল। কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয়ের সুযোগ্য দীক্ষাগুরু শ্রীমদবধূত দয়ালদাস স্বামীজী মহারাজের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। তিনি সমস্ত জনতার প্রান্তবর্তী নির্মল সৈকতভূমিতে, তৃণাচ্ছাদিত কুটিরে আসন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত শত শত পরমহংস অবধূত ভিন্ন ভিন্ন কুটিরে আসন করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কায়া, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রসন্ন বদন দর্শনে এবং গম্ভীর প্রেমাবেশপূর্ণ সম্ভাষণে হৃদয় মন পরিতৃপ্ত হইল বহুদিনের পর তিনি তাঁহার দিগ্দেশ বিখ্যাত সুযোগ্য শিষ্য কুমার পরিব্রাজককে (শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী) পাইয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন,

এবং বহু শাস্ত্রবেত্তা অন্যান্য সুশিক্ষিত সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলীর সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন।

"স্বামীজীর মণ্ডলীতে আমরা কয়েকদিন পরিব্রাজক মহাশয়ের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গমন করিয়াছিলাম। যখনই যাই, তখনই দেখি কত কত শেঠ, সাহুকার, সর্দার, সাধু, সন্ন্যাসী, মোহান্ত, ত্যাগী, সংযোগী, স্ত্রী-পুরুষ তাঁহাকে অনবরত দর্শন ও প্রণাম করিতেছে। তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সিদ্ধি, তাঁহার সদয় ভাব দর্শন করিয়া শত শত শির তাঁহার চরণে অবলুণ্ঠিত হইতেছে এবং ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য হইলাম যে যিনি কাহারও বাটীতে গমন করেন না, তাঁহার আশ্রমে প্রত্যহ অন্যূন চারি সহস্র সাধু সন্ন্যাসী গৃহস্থ, উদাসী, দুঃখী, কাঙ্গাল, আগন্তুক, অভ্যাগত, পুরী মালপোয়া মোহনভোগ অন্নব্যঞ্জনাদি তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিতেছে। দুই বেলা দুই প্রহর হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাঁহার অন্নসত্রের দ্বার উন্মুক্ত। কিছু বলিতে হয় না, কে যেন কোথা হইতে অর্থ ও সামগ্রী আয়োজন করিয়া দিতেছে। তাঁহার জ্ঞানগম্ভীর ও প্রেমপূর্ণ বাণী যিনি একবার শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি প্রাণ মন খুলিয়া তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারেন না। ধন্য তাঁহার তপঃশক্তি, ধন্য তাঁহার ভগবদ্ভক্তি। যখনই যাই তখনই দেখি তাঁহার দরবারে হয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা না হয় ভগবদ্ভজন, সংকীর্তন না হয় সদ্বার্তালাপ হইতেছে। মুহূর্তমাত্র তথায় সময় অপব্যয়িত হয় না।"

১৩০০ সালের ভাদ্র মাস। দয়ালদাস মহারাজ এই সময়ে কয়েকদিনের জন্য বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সঙ্গে তাঁহার রহিয়াছে প্রায় তিনশত সাধুর এক বিরাট দল। অসি ঘাটের নিকটে এক আম্রকুঞ্জে তাঁবু খাটানো হইয়াছে। তাঁহার দর্শনের জন্য ভিড় করিয়াছে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী। কেহ তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া অর্থ দিতেছে, কেহ দিতেছে বস্ত্র, ফলমূল ও মিষ্ট দ্রব্যাদি। ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ দয়ালদাসজী তৎক্ষণাৎ এই সব ভেটদ্রব্য বিতরণ করিয়া দিতেছেন সাধু সন্ন্যাসী ও দীনদুঃখীদের মধ্যে।

এই সঙ্গে সমাগত সাধু সজ্জন ও গৃহস্থদের দিতেছেন তিনি শাস্ত্রের উপদেশ। বার বার কহিতেছেন, "দুঃখের চিরনিবৃত্তি যদি চাও, সত্যকার আনন্দ যদি লাভ করতে চাও, তবে অনিত্য বস্তু ত্যাগ করো, ভোগসুখকে দাও দূরে সরিয়ে। সদাই স্মরণে রাখো 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই পরম তত্ত্ব। তুমি সেই সৎ-চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নও। বাসনা আর মায়া মমতার ফলে চিত্তে তোমার মল জমে গিয়েছে। ত্যাগ বৈরাগ্যের সাধনা ক'রে, নিত্য অনিত্য বস্তুর বিচার ক'রে এই মলকে দূরীভূত করো, পরম চৈতন্যময় আত্মসূর্য ভাস্বর হয়ে উঠবেন তোমার সাধনসত্তায়।"

ভক্ত দর্শনার্থীরা বিস্মিত হইয়া দেখে পরমহংস দয়ালদাস-বাবার ছাউনিতে শুধু তাঁহার অনুগামী শিষ্যেরাই নয়, অপর সম্প্রদায়ের সাধুরাও পরম আনন্দে ও শান্তিতে বসবাস করিতেছেন। ভিন্ন সম্প্রদায়ের এই সব সাধু সন্ন্যাসীরা দয়ালদাসজীর ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার দিব্য সঙ্গ লাভের জন্য তাঁহারা এত ব্যাকুল। দয়ালদাসজীও এই সাধুদের ভালবাসেন নিজের মণ্ডলীর শিষ্য ভক্তদের মতো।

দয়ালদাস-বাবার স্বনামধন্য বাঙালী শিষ্য কৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্থায়ী বাসস্থান

বারাণসীতেই। আরাধ্য গুরুদেবের আগমনে তাঁহার আনন্দের অবধি নাই। প্রতিদিনই অসিঘাটের বাগানে তিনি গুরুদেবের চরণ দর্শন করেন, তাঁহার শ্রীমুখে বেদান্তের তত্ত্বালোচনা শ্রবণ করিয়া ধন্য হন। কৃষ্ণানন্দের প্রতিষ্ঠিত যোগেশ্বরী মন্দিরের তখন খুব সুনাম। বহু ভক্ত ও সাধনার্থী সেখানে যাতায়াত করে, সাধক ও ধর্মবক্তা কৃষ্ণানন্দের উপদেশ লাভ করিয়া অধ্যাত্ম-জীবন গঠন করিতে প্রয়াসী হয়। নিজের মণ্ডলীসহ দয়ালদাসজী একদিন যোগেশ্বরী মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিতে যান, কৃষ্ণানন্দের অনুরোধে সমাগত ভক্ত নরনারীকে দান করেন সাধন-উপদেশ।

সেদিন বারাণসীর কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত দয়ালদাস-বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহাদের একজন প্রশ্ন করেন, "মহারাজ আপনি কোন্ স্বামী ?"

প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্য—দয়ালদাসজী দশনামী সন্ন্যাসী স্বামীদের কোন্ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, তাহা জানিয়া নেওয়া।

দয়ালদাস-বাবা সহাস্যে উত্তর দেন, "আমি শুধু স্বামী নই, আমি—দাস স্বামী।"

"এ কি কথা আপনি বলছেন, মহারাজ ? সন্ন্যাসী তো কখনো 'দাস' হন না। সবাই তাঁদের জানে 'স্বামী' ব'লে।"

"পণ্ডিতজী, তবে শুনে রাখুন, সন্ন্যাসী মাত্রেই যেমন স্বামী, তেমনি তাঁরা দাসও বটেন।"

"এ বড় অদ্ভুত কথা। এর তাৎপর্য তো আমরা বুঝতে পারছিনে, মহারাজ।"

"অদ্ভুত নয় পণ্ডিতজী, এটা যে পরম সত্য কথা।"

"একটু বিশদ ক'রে বুঝিয়ে বলবেন কি ?"

"তবে শুনুন। নিজ নিজ শিষ্যের কাছে প্রত্যেক সন্ন্যাসী হচ্ছেন—স্বামী, আর নিজ নিজ গুরুর কাছে তাঁরা—দাস।"

"তাই তো, এ দিকটা তো আমরা তেমন ভেবে দেখি নি।"

"তাছাড়া, পণ্ডিতজী, ভেবে দেখেছেন কি, শুধু সন্ন্যাসীদেরই কেন স্বামী আখ্যা দেওয়া হবে ? আরো অনেকেরই তো স্বামীত্ব রয়েছে; যেমন ধরুন ভূস্বামী, গৃহস্বামী। আসল কথাটা কি জানেন, সন্ন্যাসীদের লোকে স্বামী বলে ডাকে বটে, কিন্তু যাঁরা যথার্থ সন্ন্যাসী তাঁরা জানেন যে তাঁরা—দাস, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যিনি মানবজীবনে সম্ভব ক'রে তোলেন সেই গুরুদেবের তিনি একান্ত দাস।"

দয়ালদাস-বাবার এই মন্তব্য ও ব্যাখ্যা শুনিয়া অভ্যাগত পণ্ডিতজী কিছুটা ভড়কাইয়া গিয়াছেন। এবার তিনি প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, আপনার কথায় সব ধারণা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, দয়া ক'রে বলুন তো আপনি কোন্ মঠের সন্ন্যাসী ?"

উত্তর হইল, "গগন মঠের।"

"গগন মঠ ? এর নাম তো কখনো শুনি নি ?" পণ্ডিতজীর চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ।

"বেশ তো, আপনি কোন্ কোন্ মঠের নাম শুনেছেন, বলুন তো।"

"বড় বড় খ্যাতনামা মঠের নাম কে না জানে ? এই ধরুন—শৃঙ্গেরি মঠ, জ্যোতিঃমঠ, সারদা মঠ, গোবর্ধন মঠ।"

পরমহংস দয়ালদাস-বাবার স্বর এবার গম্ভীর হইয়া উঠে—"বলতে পারেন, এসব মঠ কি সনাতন কাল থেকে প্রচলিত হয়েছে? না—নূতন কোনো সাধকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত?"

"মহারাজ, এসব মঠ তো প্রতিষ্ঠা করেছেন আচার্য শঙ্কর।"

"উত্তম কথা, পণ্ডিতজী। কিন্তু, বলুন তো আচার্য শঙ্কর আর তাঁর গুরুদেব শ্রীমৎ গোবিন্দপাদ স্বামী কোন্ মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন?"

প্রশ্নকারী পণ্ডিত এবার এক প্রচণ্ড ধাক্কা খাইলেন। আর তাঁহার মুখ দিয়া কোনো কথা সরিতেছে না।

দয়ালদাস মহারাজ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "নিত্য ও শাশ্বত পরম বস্তু পাবার জন্য যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করবেন, পিতা মাতার পরিচয় নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে সন্ন্যাস নেবেন, তাঁদের কি আবার সন্ন্যাস-আশ্রমের পরিচয় বহন ক'রে বেড়াতে হবে। নূতনতর কৌলীন্য ঘোষণা করতে হবে? স্মরণ রাখবেন যেখানে সম্প্রদায়ের পরিচয়, সম্প্রদায়ের গণ্ডী বড় হয়ে ওঠে সেখানেই জেগে ওঠে অভিমান। আর সে অভিমান হয় অখণ্ড পরমবোধের পরিপন্থী।"

নীরবে নতমস্তকে বসিয়া পণ্ডিতজী এতক্ষণ দয়ালদাস-বাবার কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিলেন। এবার মৃদুস্বরে কহিলেন, "কিন্তু মহারাজ, আচার্য শঙ্করের মঠ-মালাকেই যে আজকের দিনের সাধু সন্ন্যাসীরা গ্রহণ ক'রে নিয়েছেন—"

"তাঁরা ভালোই করেছেন, তাতে মঠমণ্ডলীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে মোহান্ত ও সাধু সন্ন্যাসীর দল। এই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক অভিমানও কম বেড়ে ওঠে নি। একথাটি সদাই স্মরণ রাখবেন আচার্য শঙ্কর বা তাঁর গুরুপরম্পরার কেউ-ই কোনো মঠের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন না। সেই জন্যেই আমি বলেছি - আমি গগন মঠের সন্ন্যাসী। অনাদি অনন্ত যে মহাকাশে ব্রহ্মলীলা আর সৃষ্টির প্রবাহ অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে, সেই মহাকাশই আমার মঠ—আমার পরমাশ্রয়।"

পণ্ডিতজী এবার তাঁহার আসন ত্যাগ করেন, ভাবাবেশে লুটাইয়া পড়েন পরমহংস দয়ালদাসজীর চরণ তলে। আর্তকণ্ঠে কহেন, "মহারাজ, আপনার বিচার পদ্ধতি আর আপনার উদার সার্বভৌম বাণী, আজ আমার ভেতর জাগিয়ে তুলেছে নূতনতর চেতনা। সন্ন্যাসজীবনের প্রকৃত তাৎপর্য আজ বুঝতে পেরেছি। আমি অবোধ, অজ্ঞান, আপনি আমায় কৃপা করুন, চরণাশ্রয় আমায় দিন।"

পরিব্রাজনের পথে দয়ালদাসজী সে-বার সদলে গয়া হইতে রাজগীর অভিমুখে চলিয়াছেন। যাত্রার প্রাক্কালে গয়ার ভক্তেরা কহিলেন, "মহারাজ, রাজগীরের পথ বড় জনবিরল, পথে সমৃদ্ধ কোনো গ্রাম নেই। আপনি তিনশত লোকের জমায়েৎ নিয়ে চলেছেন, ভোজনের দ্রব্য তো পথে মিলবে না। বরং আমরা এখান থেকেই প্রচুর আটা, ঘিউ, চিনি আপনাদের সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি।"

দয়ালদাস-বাবা গম্ভীর স্বরে বলিয়া দিলেন, "না। কোনো খাদ্যবস্তু এই জমায়েতের সঙ্গে দেবার প্রয়োজন নেই।"

মণ্ডলীর দুইজন প্রবীণ সাধু কহিলেন, "বাবা, তিনশত মূর্তি আপনার জমায়েতে রয়েছে। জনহীন রাস্তায় এত লোককে আমরা কি ভোজন করতে দেবো? সবার

কত কষ্ট হবে। এরা যখন দিতেই চাচ্ছেন, কিছুটা খাদ্য সঙ্গে নিয়ে নেওয়া মন্দ কি।"

দয়ালদাস মহারাজ স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "যদি গৃহস্থদের মতো সমস্ত কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহন ক'রেই আমরা পথ চলি, তা হলে গৃহ ছেড়েছি কেন বলতে পারো ?"

"বাবা, অনাহারে এতগুলো লোকের কষ্ট হবে, এ ভেবেই আমরা কথাটি বলেছিলুম।"

"তোমাদের ভয় ভাবনার কোনো কারণ নেই। সদ্‌গুরু সব সময়েই তাঁর কৃপা-দৃষ্টি দিয়ে রেখেছেন এই জমায়েতের ওপর। একথাটি কখনো ভুলো না।"

শিষ্য ও সেবকেরা দয়ালদাস-বাবার আদেশ শিরোধার্য করিয়া রওনা হইলেন পদযাত্রায়।

বেলা তখন দ্বিপহর। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড পথচারীদের উপর অগ্নি বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। সাধুরা সবাই পথশ্রমে কাতর। ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। এমন সময়ে পথিপার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্র গ্রামের বটবৃক্ষতলে জমায়েৎ আশ্রয় নেয়। সঙ্গে সঙ্গে দয়ালদাস-বাবার সম্মুখে উপস্থিত হন এক ভক্ত শেঠ। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া শেঠজী কহেন, "বাবা, আজ দুদিন হয়, তাঁবু খাটিয়ে, লোকজন নিয়ে আমি যে এখানে অপেক্ষা করছি। স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেয়েছি, আপনি এক বিরাট সাধু জমায়েৎ নিয়ে এই পথে যাচ্ছেন, আপনার সেবার জন্য আমি যেন তৈরী থাকি।"

মহাত্মা দয়ালদাস-বাবার দুই চোখে তখন দুষ্টুমির হাসি। শিষ্য সন্ন্যাসীদের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "দ্যাখো, গৃহস্থের মতো ভূতের বোঝা বয়ে আনো নি বলেই, এই সজ্জন গৃহস্থ তোমাদের সেবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন।"

জমায়েতের এক প্রবীণ সাধু দয়ালদাসজীর দিকে তাকাইয়া সহাস্যে মন্তব্য করিলেন, "মহারাজ, ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ স্বমুখে বলে গিয়েছেন,—তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। আপনার বেলায় সব সময়েই এটা প্রভু প্রয়োগ করছেন, আর চাইছেন আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করতে।"

শেঠজীর লোকেরা ভোজ্য বস্তু সব তৈরি করিয়াই রাখিয়াছে। সাধুরা বিশ্রাম করিয়া একটু সুস্থ হইলেই, তাঁহাদের সম্মুখে ভাঁড়ে ভাঁড়ে জড়ো করা হইল গরম লুচি, হালুয়া ও মালপোয়া। সবাইকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া ধর্মপ্রাণ শেঠজী বিদায় গ্রহণ করেন, পরমহংস দয়ালদাসজীর জমায়েৎ আবার চলিতে থাকে। রাজগীরের পথে।

১৩৩০ সালের প্রয়াগ কুম্ভমেলা। প্রতিবারের মতো এবারও এই ধর্মমহামেলায় দেখা যায় দয়ালদাস মহারাজের বিপুল প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা। শুধু তাঁহার নিজস্ব মণ্ডলীর সাধু ও গৃহস্থেরাই তাঁহার সত্রে ভিড় করে নাই, অপরাপর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাও আশ্রয় নিয়াছেন এই উদার, সদানন্দময়, আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে। দয়ালদাসজীর পরম আনন্দ অন্নদানে আর বেদান্তের ত্যাগ-বৈরাগ্যের ব্যাখ্যানে। তাই তাঁহার তাঁবুটিকে কেন্দ্র করিয়া মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুরা গড়িয়া তুলিয়াছে এক বিরাট

জমায়েৎ। ভক্ত দর্শনার্থী ও কৌতূহলী তীর্থযাত্রীরাও বাবার দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের জন্য আসিতেছে দলে দলে।

ধর্মপ্রচারক পত্রিকায় এ সময়কার আনন্দময় পরিবেশটির এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন স্বামী রামানন্দ ভারতী। পূর্বাশ্রমে ইনি পরিচিত ছিলেন রামকুমার বিদ্যারত্ন নামে, ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারকরূপে ইনি দক্ষতার সহিত কাজ করিতেন। ভারতী মহারাজ লিখিয়াছেন :

"আমরা কোনো মণ্ডলীর অন্তর্গত না হইলেও পরমহংস পরিব্রাজক বাবা দয়ালদাস স্বামীর মণ্ডলীর মধ্যে অবস্থান করিতাম। বাবা দয়ালদাসের অপূর্ব ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বাবা দয়ালদাসের উদারতা, প্রেম, দীনের প্রতি দয়া, শিষ্য বাৎসল্য উপমার যোগ্য। বাবা দয়ালদাস একজন যাযাবর সন্ন্যাসী। তাহার মঠ নাই, মন্দির নাই, বাসস্থানের কিছুই ঠিক নাই, তিনি যেখানে যান, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শত শত ভক্ত শিষ্য আছেন। এই কুম্ভমেলা বসিবার অন্যূন একমাস পূর্বে শিষ্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন,—তোমরা মেলায় যাইয়া সত্র খুলিয়া দাও, যে সব সাধুরা পূর্বে যাইবেন, তাঁহাদের ভিক্ষার যেন কোনো কষ্ট না হয়।

"তাঁহার আদেশ অনুসারে মহাত্মা দয়ালদাস স্বামীর শিষ্যেরা আসিয়া মেলাক্ষেত্রের পূর্বদিকের রেতীর পরপারে অন্নসত্র খুলিয়া দিলেন। সাধুদের বাসের জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কুটির সকল নির্মিত হইল এবং সদাব্রত কার্য আরম্ভ হইল। বাবা দয়ালদাস যেখানে ছাউনি করিলেন, তাহার নিকটবর্তী স্থানে সিন্ধের নানকসাহী সাতবেলা মঠের ও স্বামী কেশবানন্দের ছাউনি হইয়াছিল। স্বামী দয়ালদাসের মণ্ডলীতে একটি পট্টবাস ছিল, কিন্তু তাহাতে তিনি বাস করিতেন না। সেই পট্টাবাসে অপরাপর সাধু বাস করিতেন, এবং ধর্মগ্রন্থ রক্ষিত হইত, তিনি সামান্য কুটিরে অপরাপর সাধুর ন্যায় বাস করিতেন, সমস্ত দিন প্রায় বালুর মধ্যেই বসিয়া থাকিতেন ও অপরাপর সাধুদিগের ও ভিক্ষার্থী কাঙালীদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন। কখন কখন দেখিয়াছি পাঁচ সাত শত সাধু, এবং পাঁচ সাত শত কাঙালি ভোজন করিতে বসিয়াছে, মহাত্মা দয়ালদাস তাঁহাদের এক পার্শ্বে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান আছেন। কখন তিনি বালুর মধ্যে বসিয়া আছেন, ধনীমানী গণ্যমান্য শত শত লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। কি সুন্দর দৃশ্য!

"বাবা দয়ালদাসের ভাণ্ডার অফুরন্ত—চারিদিক হইতে আহারীয় দ্রব্য আসিয়া তাঁহার ভাণ্ডারে পুঁজি হইতেছে, আর সাধু দরিদ্রদিগকে বিতরিত হইতেছে। কোনো বিচার নাই—যে চাহিতেছে, সেই পাইতেছে। পাতা লইয়া বসিলেই হইল। অবারিত দ্বার।

"কোনো এক সময়ে বাবা দয়ালদাসকে একজন সাধু বলিয়াছিলেন, 'আপনি আপামর সাধারণকে অন্ন বিতরণ করেন কেন? সাধু ভোজনে বিশেষ ফল আছে, সাধুদিগকেই অন্ন বিতরণ করুন।'

"উত্তরে বাবা বলিলেন, 'সকলেরই একটা মর্যাদা আছে, রাজা আসিলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, পণ্ডিত আসিলে তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে। আহারটা ক্ষুধার মর্যাদা দান মাত্র। সাধু ভোজনে কেবল সাধু ভোজনের ফল হয়,

কাঙালী ভোজন করাইলে শিব ভোজনের ফল ; কারণ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বস্ত্রহীন।' বাবার এই উত্তর শুনিয়া সাধুটি অবাক্ হইয়া গেলেন।"

কুম্ভস্নানের মিছিল চলা সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। বিভিন্ন মণ্ডলী ও আখড়ার মোহান্তেরা, কেহ হাতীর উপরে কিংখাবে মোড়ানো হাওদায় কৌপীনবন্ত হইয়া সমাসীন। কেহ বা অর্ধনগ্ন অবস্থায় ঘোড়ায় চাপিয়া চলিয়াছেন। আর আগে পিছে চলিয়াছেন রূপার আশাসোটা হস্তে শত শত অনুগামী সন্ন্যাসী। পতাকা ধ্বজা, ত্রিশূল ও সন্ন্যাস দণ্ডের ছড়াছড়ি চতুর্দিকে। গঙ্গার তটভূমি আর আকাশ বাতাস লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত গৃহস্থের আনন্দোল্লাস এবং জয়ধ্বনিতে তখন ভরপুর।

জমায়েতের এক তরুণ সন্ন্যাসী দয়ালদাসজীকে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, স্নানের মিছিল শুরু হয়ে গিয়েছে, ঐ দেখুন, গজবাজী সহ সাড়ম্বরে মোহান্তেরা সবাই এগিয়ে আসছেন। আপনার মণ্ডলী চল্‌বে কখন?"

পরমহংস দয়ালদাসজী ভারতখ্যাত এক প্রকাণ্ড সন্ন্যাসীমণ্ডলীর অধিপতি। কিন্তু চাল চলনে ব্যবহারে কোনো আড়ম্বর তাহার নাই, নিরভিমানতার মূর্ত বিগ্রহ তিনি। সন্ন্যাসীটির প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে কহিলেন, "বেটা, আমি হচ্ছি সাধুদের দাস। অতি গরীব আমি, নিজের বলতে একটা কানাকড়িও নেই। আমার আবার ধুমধাম কি? মিছিলে যোগ দেবার সামর্থ্যই বা কই? মূল্যবান জিনিসপত্র, গজবাজী, রূপোর হাওদা আমার কিছু নেই। কি ঐশ্বর্য দেখাবো আমি সবাইকে, বলতো?"

"সে কি মহারাজ! যাঁর জমায়েতে হাজার হাজার লোক রোজ অন্ন পাচ্ছে, তাঁকে গরীব বলবো কি ক'রে।" বিস্মিত হইয়া উত্তর দেন যুবক সন্ন্যাসী।

সহাস্যে দয়ালদাস বলেন, "বেটা, সব সময়ে মনে রাখবে, লোকে অন্ন পাচ্ছে অন্নপূর্ণা মায়ীর দরবারে, আমার দরবারে নয়।"

দর্শনার্থী শেঠ ও সম্পন্ন গৃহস্থেরা বাবার চরণে ভেট দেয় তোড়া তোড়া টাকা, গাঁট গাঁট লুই, শাল, কম্বল, বস্ত্র, টুপি প্রভৃতি। আর সেই মুহূর্তেই দয়ালদাসজী ঐসব ভেটের দ্রব্য বিতরণ করিয়া দিতেছেন সাধু সন্ন্যাসী ও দীন দরিদ্রদের মধ্যে।

জনৈক সরল হৃদয় ভক্ত প্রশ্ন করেন, "বাবা দেশের নানা অঞ্চল থেকে ভারে ভারে এত সব দ্রব্য কেন আসছে, কেন এখানে আপনার চরণতলে স্তূপীকৃত হচ্ছে এর কারণ কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এ কি আপনার ইন্দ্রজাল না যোগবিভূতির খেলা?"

দয়ালদাসজী উত্তরে হাসিয়া বলেন, "বেটা, এ রহস্য তুমি ভেদ করতে পারছো না? আচ্ছা আমি তোমায় গোপন কথাটি ভেঙে বলছি। এ সব বস্তু আমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কৃপাময়ী অন্নপূর্ণাজী। জানতো বেটা—

দেৎ কো দেৎ হ্যায় জাঁহা তাঁহা সে আন।
অন্ দেৎ মাঁগৎ ফিরে সাহেব ন সুনে কান্॥

—যে মানুষ নিজে কোনো বস্তু ভোগ না ক'রে অপরকে দান করেন, ভগবান্ যে কোনো স্থান থেকে এনে তাঁর কাছে পৌঁছে দেন সে সব বস্তু। আর যে মানুষ কখনো দান করে না, সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে বেড়ালেও তার আবেদন কখনো পৌঁছে না ভগবানের কানে।

শুধু এদেশের বিভিন্ন কুম্ভমেলা ক্ষেত্রেই দয়ালদাস-বাবার মহিমা প্রচারিত ছিল না,

ভারতের সর্ব অঞ্চলে, সর্ব তীর্থ ও সাধনপীঠে ছিল এই সিদ্ধ মহাত্মার জয় জয়কার। তাছাড়া, তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত প্রতিভাধর সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ছিলেন অধ্যাত্মরাজ্যের এক একটি দিক্‌পাল। সাধন-ঐশ্বর্য, ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যান, বাগ্মিতা ও সংগঠন-শক্তিতেও অনেকে ছিলেন অতুলনীয়। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ ষড়দর্শনবেত্তা স্বামী আনন্দপ্রকাশ, মণ্ডলীশ্বর জগদীশানন্দ স্বামী, অবধূত সুন্দর-দাসজী, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, দিগম্বরাবধূত মুক্তানন্দ, পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ, সাধু চৈতন্যদেবজী, শ্রীমৎ ব্রহ্মপ্রকাশজী, পরমহংস রামেশ্বরানন্দ স্বামী, মৌনী মহারাজ, শঙ্করানন্দ স্বামী, মোহান্ত রামস্বরূপজী, স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দ, স্বামী বালানন্দ (কাশী), স্বামী সর্বানন্দ প্রভৃতি।[১]

দয়ালদাস-বাবার গৃহস্থ শিষ্য ভক্তদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। ভারতের সর্ব তীর্থে, শহরে ও জনপদে কয়েক শত সাধুর জমায়েৎ নিয়া তিনি পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আর এই সময়ে শক্তিধর মহাপুরুষ জাতিবর্ণ নির্বিশেষে এবং ধনী দরিদ্রের কোনো তারতম্য না করিয়া আর্ত ও মুমুক্ষু গৃহস্থদের করিতেন কৃপা বিতরণ। নাভার বৃদ্ধ মহারাজ ধর্মপ্রাণ হীরাসিংজী দয়ালদাসজীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা-পূজো করিতেন। পাতিয়ালার তৎকালীন মহারাজা দীর্ঘদিন অপুত্রক ছিলেন। পরমহংস দয়ালদাসের অক্লান্ত সেবা করিয়া মহারাজা তাঁহার কৃপাভাজন হন, লাভ করেন একটি পুত্ররত্ন। পাতিয়ালার প্রভাবশালী মন্ত্রী সর্দার গুরুমুখ সিংজীও দয়ালদাসজীর অন্যতম অনুগৃহীত ভক্ত। বাবার বৃহৎ জমায়েতের সেবায় সর্দারজী চিরদিন অকাতরে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে চাতুর্মাস্য কালে কয়েক শত সন্ন্যাসীসহ তিনি দয়ালদাসজীকে আহ্বান করিতেন, তাঁহার মণ্ডলীর সেবা পরিচর্যা করিয়া হইতেন কৃতকৃতার্থ।

দয়ালদাসজীর সত্রে ও জমায়েতে রাজা, রাজমন্ত্রী, শেঠ বণিকেরা যেমন অর্থ ও দ্রব্যাদি সাহায্য করিতেন, তেমনি হাজার হাজার দরিদ্র ভক্তও প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিত তাঁহার ভাণ্ডারা ও দীন দুঃখীর সেবা-কর্মে। রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল ভক্তই এই উদার মহাপুরুষের মণ্ডলীসূত্রে বিধৃত থাকিত নানা রঙের নানা ঔজ্জ্বল্যের রত্নখণ্ডের মতো।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সার্থকনামা শিষ্য মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সে-বার প্রয়াগ কুম্ভমেলায় দয়ালদাস-বাবার মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনের তথ্য তিনি সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "মহাত্মা দয়ালদাস পঞ্জাব সাধু সম্প্রদায়ের এক প্রধান ব্যক্তি। প্রসিদ্ধ বক্তা, কৃষ্ণানন্দ স্বামীমহাশয় দয়ালদাসের মন্ত্রশিষ্য। এই আশ্রমে আমরা স্নানাহার করিলাম। দয়ালদাসের আশ্রমে যাহা দেখিলাম তাহা অতি অদ্ভুত। আজানুলম্বিত হস্ত, সুদীর্ঘ কায়, গৈরিকধারী দয়ালদাস-বাবাকে আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনিও আশীর্বাদ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মা দয়ালদাস কতকালের আত্মীয়ের ন্যায়, যে কয়দিন কুম্ভমেলায় থাকিব, আমাকে তাঁহার নিকট থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিছু কিছু উপদেশ শুনিলাম। সদ্‌গুরু বাণীতে যে সমস্ত উপদেশ আছে, সে সমস্ত অতিশয়

---

১ দ্য বেঙ্গলী, ক্যালকাটা—১৩, ৪, ০৯

দুর্লভ। সেই সমস্তের যদি বাঙ্গলায় অনুবাদ হয়, তবে তাহা দেশের একটি বিশেষ সম্পত্তি হইবে[১]।

"দয়ালদাস মহারাজের এক শিষ্যকে দেখিলাম তিনি মাঘমাসের আরম্ভ হইতেই কিছুই আহার করেন নাই, যেদিন তাঁহাকে দেখিলাম সেদিন ২৪শে মাঘ। তিনি অতি বিনম্রভাবে আমাদিগকে কিছু ধর্মোপদেশ দিলেন। শেষ কথা দয়ালদাসের সদাব্রত। দয়ালদাসের সদাব্রত কুম্ভমেলার একটি বিশেষ বিষয়। প্রয়াগে দুঃখী দরিদ্রের অন্ত নাই, কত লোক যে অনাহারে দিন কাটায়, তাহার খবর কে রাখে? দয়ালদাসের আশ্রমদ্বার একমাসকাল তাহাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। অন্যান্য আশ্রমে কর্তৃপক্ষের সাধু-সেবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকে, তাহার পর কাঙ্গাল-ভোজন। কিন্তু দয়ালদাসের সাধু কাঙ্গাল সকলই সমান। একদিন একজন বলিয়াছিলেন যে, আপনার সাধুভোজন অপেক্ষাও কাঙ্গাল-ভোজনের দিকে অধিক দৃষ্টি, ইহার কারণ কি?

"দয়ালদাস উত্তর করিলেন, 'সকলেরই এক এক প্রাপ্য অধিকার আছে। রাজার প্রাপ্য সম্মান ও অভ্যর্থনা, সাধুর প্রাপ্য অভিবাদন ইত্যাদি, সেইরূপ অন্ন কেবল ক্ষুধিত ব্যক্তিরই প্রাপ্য, তাহাতে সাধু অসাধু বিচার কি? যদি পরিচ্ছদের মানমর্যাদা ধর তবে গৈরিকধারী সন্ন্যাসীদিগকে ভোজনের ফল হয়, তবে বস্ত্রাভাবে নগ্নপ্রায় এই সমস্ত কাঙ্গালিদিগকে ভোজন করাইলে মহাদেব ভোজনের ফল হয়। মহাত্মা দয়ালদাসের সদাব্রত কি মহান্ ভাবব্যঞ্জক।

"দয়ালদাসের কোথাও কোনো নির্দিষ্ট আশ্রম নাই। তিনি বার মাস দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং যখন যেখানে থাকেন, সেইখানেই প্রতিদিন হাজার হাজার লোক তাঁহার অতিথি। কোনো নির্দিষ্ট আয়ের উপর তাঁহার নির্ভর নাই। শিলাবৃষ্টির ন্যায় চারিদিক হইতে টাকা ছুটিয়া আসে, একজন আসিয়া টাকা ঢালিয়া দিলেন, এক শিষ্য কুড়াইয়া নিয়া গেলেন এবং আর একজন খরচ করিয়া ফেলিলেন। অর্থাপাদরজোপমা—এ কথা ইঁহাদের আচরণে প্রত্যক্ষ হয়। সংসারীর সাধ্য নাই, এভাবে অর্থব্যয় করে। ইঁহাদের ব্যবহার দেখিলে ঘোর সংসারাসক্তেরও সংসার বন্ধন পলকের তরে ছিন্ন হইয়া যায়।

"মহাত্মা দয়ালদাস বক্তৃতা ও কীর্তন শুনিতে বড় ভালবাসেন, তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় মেলাস্থলে মাঝে মাঝেই বক্তৃতা করিতেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গীয় লোকদের কীর্তন তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। আমাদের কাছে সেকথা তিনি বলিয়াছিলেন। দয়ালদাস দয়ার সাগর, ভক্ত প্রেমিক, তিনি প্রেমহীন কর্মী বা কর্মহীন সন্ন্যাসী নহেন।"

এই কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের সমাগম যেমন হয়, তেমনি মঠমণ্ডলী আখড়ায় মোহান্ত ও শেঠেরাও সদাব্রতের জন্য ব্যয় করে লক্ষ লক্ষ টাকা। নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ দয়ালদাস-বাবার মণ্ডলীর মাধ্যমেও কম টাকা এসময়ে ব্যয়িত হয় নাই।

---

১ দয়ালদাস-বাবার উপদেশ সংগ্রহ হিন্দি ভাষায় বিচার প্রকাশ নামে সংকলিত হয়। এই পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ কাশী যোগাশ্রম হইতে শ্রীকামাখ্যা নাগ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক কৌতূহলী দর্শনার্থী সেদিন দয়ালদাসজীর তাঁবুতে আসিয়া তাঁহার এক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই মেলার সদাব্রত ও দানসত্রে যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল, তার স্থায়ী ফল বা গঠনমূলক কাজ কি হলো? দেশের কি কল্যাণ সাধিত হলো?"

শিষ্যটি উত্তর দিলেন, "দেখুন, সমাজতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করবার শক্তি আমার নেই। তবে, এতে যে দেশের কল্যাণ হচ্ছে, তা বিশ্বাস করি। কল্যাণ শব্দটির এক মোটামুটি অর্থ আমরা বুঝি—যাতে মানবাত্মার কল্যাণ হয়, হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, তাকেই বলি সত্যকার কল্যাণ। সে কল্যাণ কিছুটা সাধিত হয়, অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারা, গঠনমূলক কাজ দ্বারা। আবার অর্থকে ধূলি মুষ্টির মতো জলে ফেলে দিয়েও কল্যাণ সাধন করা যায়।"

"সেটা কি রকম?"—প্রশ্ন করেন দর্শনার্থী।

"এই ধরুন, সেদিনকার মেলাক্ষেত্রের একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা। আমাদের শতশত লোকের চোখের সামনে এটি ঘটলো। এক ধনী শেঠ দয়ালদাস-বাবাকে প্রণাম ক'রে এক বস্তা টাকা তাঁর সামনে রেখে দিলো। মিনতি ক'রে বললো, 'বাবা, এ টাকাটা আপনি সাধু বা দীন দুঃখীর ভাণ্ডারায় লাগিয়ে দিন, আমায় কৃতার্থ করুন।' বাবা উত্তর দিলেন, 'তা কি ক'রে হয়, বেটা? এখানে তো আজ আর টাকা নেওয়া যাবে না। আগে যারা দিয়ে গিয়েছে, তাদের টাকা সবটা খরচ না হলে তোমার টাকা খরচ করি কি ক'রে? তুমি বরং অন্য কোথাও যাও।' লোকটি কত কাকুতি মিনতি করলেন। কিন্তু বাবা পূর্ববৎ তাঁহার সিদ্ধান্তে রইলেন অটল। ভেবে দেখুন, এ ঘটনাটি যাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন, টাকাকড়ি সম্পর্কে অনাসক্তি তাদের কত বেড়ে গেল, প্রাণে জেগে উঠলো ত্যাগ বৈরাগ্যের হাওয়া। একে কি সত্যকার কল্যাণ বলে না?"

প্রশ্নকারী ভক্ত দর্শনার্থীর অন্তরে কথা কয়টি আলোড়ন তুলিয়া দিল। নীরবে সেস্থান হইতে তিনি চলিয়া গেলেন। প্রয়াগে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলার শেষে মণ্ডলীর তিনশত সাধু সমভিব্যাহারে দয়ালদাসজী কানপুরে আসিয়া ছাউনি ফেলিলেন। এবার এখানকার ভক্তদের সহিত কিছুদিন অতিবাহিত করবার পর তিনি গুজরাট ও পাঞ্জাব অঞ্চলে গমন করিবেন।

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার আহ্বানে বাবার শিষ্য, ধর্মবক্তা কৃষ্ণানন্দ স্বামীজীও তখন সেখানে উপস্থিত আছেন। তাঁবুতে আসিয়া ভক্তিভরে দয়ালদাস-বাবাকে তিনি প্রণাম জানাইলেন। প্রিয় শিষ্যকে আশিস্ জানাইয়া বাবা বলিলেন, "বেটা কৃষ্ণানন্দ ভালই হয়েছে তুমি ঠিক এসময়ে কানপুরে উপস্থিত হয়েছ। এর পর এ অঞ্চলে আমার আর আসা হবে না, এ নরদেহে থাকাও হবে না। এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।"

"সে কি বাবা, এসব কি অলক্ষুণে কথা আপনি আমায় বলছেন?" কৃষ্ণানন্দের নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

দয়ালদাস-বাবা, এবার মৃদু স্বরে বলেন, "হাঁ বেটা, এবার শরীর আমি ছেড়ে দেবো। অনেক প্রাচীন হয়ে গেছে এটা।"

কৃষ্ণানন্দ আর্ত স্বরে কহেন, "বাবা, আপনাকে পেয়ে অবধি সংসারের সব কিছু ভুলে আছি, আর দিন কাটাচ্ছি দিব্য আনন্দে। আপনি দেহ ছাড়লে যে আমরা সবাই নিরাশ্রয় হয়ে পড়বো।"

স্মিতহাস্যে দয়ালদাসজী বলেন, বেটা, নিরাশ্রয় কেন হবে ? আমার এ শরীরের সান্নিধ্য তো বড় কথা নয়। আমার আত্মা, আমার শাশ্বত পরম সত্তাই হচ্ছে আসল বস্তু। তাঁর সঙ্গে তোমাদের অনেকের যোগ সাধিত হয়েছে। সেই নিত্য, অখণ্ড পরম বোধটিকে মনের ভেতর ধরে রাখো, বৈরাগ্যময় তপস্যা চালিয়ে যাও। আশীর্বাদ করছি তুমি সিদ্ধকাম হবে।"

কয়েক মাস পরে চাতুর্মাস্য আসিয়া পড়ে। পাতিয়ালার রাজমন্ত্রী সর্দার গুরুমুখ সিং দয়ালদাসজীর পরমভক্ত। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা চাতুর্মাস্যের কয়েকটি মাস বাবা মহারাজ তাঁহার কাছে অবস্থান করুন, সেবার সুযোগ দিয়া তাঁহাকে ধন্য করুন।

এ সাদর আমন্ত্রণ দয়ালদাসজী গ্রহণ করেন, প্রায় এক শত সঙ্গী সাধু সন্ন্যাসী নিয়া উপস্থিত হন পাতিয়ালায়। সর্দার গুরুমুখ সিং-এর উদ্যান বাটিকায় নির্দিষ্ট হয় তাঁহার মণ্ডলীর বাসস্থান।

এ সময়ে হঠাৎ এক মারাত্মক পীড়ায় দয়ালদাস-বাবা আক্রান্ত হন। সেবক গুরুমুখ সিংজী এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যেরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। পাতিয়ালার মহারাজের নির্দেশে চিকিৎসার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হয়। শিষ্য ও সেবকেরা প্রাণপণে করিতে থাকেন বাবার সেবা শুশ্রূষা। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা বল্লই বিফল হয়। রোগীর অবস্থা ক্রমে সংকটাপন্ন হইয়া পড়ে।

একদিন সেবকদের ডাকিয়া বাবা কহিলেন, "মাধোলাল এসেছে ? আহা, বেটা, বড ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। তাঁকে ডেকে আনো।"

সেবকেরা এ উহার মুখের দিকে চায়। কাহার কথা বলিতেছেন দয়ালদাসজী ? তাঁহারা প্রশ্ন করে, "কে এই মাধোলাল, বাবা ?"

বাবা উত্তর দেন, রোহতক জেলায় গুরুদ্বার গাঁও-এ তার বাড়ি। আমার পুরোনো শিষ্য। আমার সঙ্গে যে তার বড় জরুরী দরকার। সে এসেছে কি ?"

"না—বাবা, এমন কোনো লোক তো আসে নি।"

"তা হলে আমিই যাবো তার কাছে। হাঁ আজই যাবো, বড় জরুরী।"

সেবকেরা ভাবিলেন বাবা রোগের প্রকোপে ভুল বকিতেছেন। একথা নিয়া আর তাঁহারা আলোচনা করিলেন না।

দেহ ত্যাগের কিছুক্ষণ পূর্বে দয়ালদাস-বাবা সঙ্গীয় সাধু সন্ন্যাসী এবং ভক্তদের নিকটে ডাকিলেন। আদেশ মতো উদ্যানের মধ্যস্থলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নিয়া যাওয়া হইল।

প্রসন্নমধুর দৃষ্টি বুলাইয়া মহাপুরুষ সবাইকে জানাইলেন অন্তরের আশীর্বাদ। তারপর ধীর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "আমার শরীর এবার চলে যাচ্ছে। তাতে তোমরা শোক ক'রো না। আমার ভেতর যে নিত্য বস্তু, শাশ্বত বস্তু রয়েছে, তার সঙ্গে যোগ স্থাপন ক'রে চলো, তবেই এগিয়ে আসবে পরম প্রাপ্তি।"

একটু থামিয়া আবার ভক্তদের কহিলেন, "আত্মার কথাই চিরজীবন বলে আসছি, এই দেহ পড়ে যাবার সময়েও সেই কথাই বলবো। আত্মা ব্যাপক, অনাদি ও অনন্ত। জন্ম মৃত্যু বলে কিছু তো নেই, অনিত্য ও সসীম বস্তুতেই এই জন্ম মৃত্যুর কথা প্রতীয়মান হয়। সমুদ্রের জল আর তার তরঙ্গে কোনো ভেদ নেই, সব রয়েছে অখণ্ড

অদ্বৈত সত্তায় বিধৃত। সারা জগৎ হচ্ছে ব্রহ্মময়, জগৎ অস্তি ভাতি প্রিয়রূপে এই ব্রহ্ম বা আত্মা সর্বত্র পূর্ণ।

"আসলে দ্বৈতভাবের ফলেই মরণকে আমরা পৃথক ক'রে দেখি, ভয় পাই। কিন্তু তোমাতে দ্বৈত নেই। তুমি—অখন্ড ব্রহ্মস্বরূপ। শ্রুতি ও গুরুবাক্য স্মরণে রেখে অদ্বৈত ব্রহ্মের চৈতন্যময় প্রকাশ। অনুভব ক'রো, অজ্ঞানজনিত জগৎ প্রপঞ্চ স্বতই বিলীন হয়ে যাবে। এই দেহের জন্য কেউ শোক ক'রো না। আর এই দেহভস্মের ওপর কোনো স্মৃতিসৌধও কেউ যেন তৈরি ক'রো না।'

কথা কয়টি বলার অব্যবহিত পরেই মহাপুরুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, লীলাবৈচিত্র্যময় সিদ্ধজীবনের উপর নামিয়া আসিল চিরবিবর্তির যবনিকা। ১৩০১ সনের ১৭ই ভাদ্র, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি এই দিনটি তাঁহার সহস্র সহস্র ভক্তের স্মৃতিতে চিরচিহ্নিত হইয়া রহিল।

পাতিয়ালার প্রধান প্রধান সর্দার, অগণিত সাধু সন্ন্যাসী ও জনসাধারণ বাবা মহারাজের শবদেহের অনুগমন করে। বাদ্য ভান্ড সহ, হস্তী অশ্ব উষ্ট্র ও ধ্বজ পতাকাদি সহ, চলিতে থাকে সমারোহপূর্ণ এক বিরাট মিছিল। সমবেত জনমন্ডলীর শ্রদ্ধার্ঘ্য সমর্পণের পর দয়ালদাস মহারাজের মরদেহ সমাহিত হয় নদীগর্ভে।

ঠিক এই সময়েই পরমহংস দয়ালদাস-বাবার এক অলৌকিক লীলা অনুষ্ঠিত হয় রোহতক জেলার ক্ষুদ্র অখ্যাত গ্রাম গুরুদ্বার-এ। মাধোলাল বেদী দয়ালদাসজীর এক পুরাতন শিষ্য, এই গ্রামেই তাঁহার বাস। দয়ালদাসজীর কাছে বহুদিন আগে দীক্ষা নিয়া এ যাবৎ নিভৃতে তিনি আপন সাধনা চালাইয়া যাইতেছেন। এবার সাধনার এমন এক স্তরে তিনি উপনীত হইয়াছেন যে গুরু মহারাজের সাক্ষাৎ দর্শন ও সাধন-উপদেশ ছাড়া আর অগ্রসর হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য কয়েকদিন যাবৎ কাতরভাবে গুরুজীকে তিনি স্মরণ করিতেছেন। লোকমুখে শুনিয়াছেন, চাতুর্মাস্যের জন্য দয়ালদাস-বাবা পাতিয়ালায় অবস্থান করিতেছেন। আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, দুই এক দিনের জন্য পাতিয়ালায় যাইবেন, গুরুমহারাজের দর্শনের পর মাগিয়া নিবেন তাঁহার প্রার্থিত সাধন বস্তু। কিন্তু সংসারের নানা জটিল জালে জড়াইয়া থাকায় গ্রাম ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

হঠাৎ মাধোলাল দেখিলেন, গুরুজী দয়ালদাস-বাবা গ্রামের বড় রাস্তাটি ধরিয়া তাঁহারই বাড়ির দিকে দ্রুত পদে আসিতেছেন। একি কান্ড। হঠাৎ গুরুমহারাজ এখানে? তাছাড়া, একলাই আসিয়াছেন, সাঙ্গোপাঙ্গ নাই। এ বড় বিস্ময়ের কথা।

গুরুজী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মাধোলাল দন্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করেন। প্রশ্ন করেন, "একি মহারাজ, আপনি একলা এতদূরের পথ হেঁটে আসছেন। আপনার মন্ডলী কোথায়? দু' একশ' সাধু সন্ন্যাসী সঙ্গে না নিয়ে তো আপনি পথ চলেন না?"

গুরুজী হাসিয়া বলেন, "বেটা মাধোলাল, তোমার ব্যাপারটা যে জরুরী। এ ক'দিন কাতর হয়ে আমায় কত ডেকেছো। তাই আমি একলাটিই তোমার কাছে এলাম। মন্ডলী? হাঁ, তা পরে আসছে।"

অতঃপর কৃপালু দয়ালদাসজী শিষ্য মাধোলালের ভজনকুটিরে গিয়া বসিলেন,

নিভৃতে তাঁহাকে দান করিলেন সেই নিগূঢ় সাধনক্রিয়া যাহাব জন্য প্রিয় শিষ্য এত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

এবাব প্রসন্নমধুব হাসিয়া দযালদাসজী কহিলেন, "বেটা, আমাব জবুবী কাজ শেষ হযেছে, তোমাব সন্তোষ বিধানও কবতে পেবেছি। এবাব আমি পাতিয়ালায ফিবে যাই। সবাই যে শোকার্ত হযে আমাব প্রতীক্ষা কবছে। হাঁ, বেটা, তুমি এখানকাব কাজেব ঝামেলা মিটিযে দুই দিন পবে পাতিযালায চলে এসো।"

গুবুব আদেশ মাধোলাল শিবোধার্য কবিযা নেন। কাজকর্ম গুছাইযা বাখিযা দুই দিন পবে গুবুমহাবাজেব দর্শনেব জন্য তিনি পাতিযালায আসিযা উপস্থিত। কিন্তু একি অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কান্ড। শিষ্য সেবকেবা সবাই সর্দাব গুবুমুখ সিং-এর উদ্যানে শোকার্ত হইযা বসিযা আছেন, বাবা দুই দিন পূর্বে ছেদ টানিযা দিযাছেন তাঁহাব মবলীলায। ঠিক যে সময়ে গুবুদ্বাব-গাঁও-এ মাধোলালেব গৃহে তিনি আবির্ভূত হন, সেই সমযেই বাদ্যভান্ড ও মিছিল নিযা পাতিযালায লক্ষাধিক লোক অনুগমন কবিতেছিল তাঁহাব শবদেহেব।

"এ কি দৈবী মাযা। এ কি অলৌকিক বহস্য। বাবা, মহাবাজের এ কি অত্যাশ্চর্য কৃপা লীলা।" - কথা কযটি বাব বাব মাধোলাল বলিতেছে, আব কপোল বহিয়া ঝবিতেছে শোকেব অশ্রুধাবা।

স্বামী শিবানন্দ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুদিন হয় নরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। গুরুর বিরহে ও শোকে ভক্ত শিষ্যেরা রহিয়াছেন মুহ্যমান। এমনি সময়ে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত বলরাম বসু একদিন তাঁহার গৃহে বরানগর মঠের তরুণ গুরুভাইদের আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা, সবাই মিলিয়া ঠাকুরের পুণ্যপ্রসঙ্গ আলোচনা করিবেন।

বলরামের গৃহ শ্রীরামকৃষ্ণের বহুতর স্মৃতিবিজড়িত। ভক্তদের নিয়া কত আনন্দই না তিনি এখানে করিয়াছেন। তাঁহার কীর্তন নর্তন, ভাবাবেশ ও সমাধি দর্শন করিয়া সবাই হইয়াছেন কৃতকৃতার্থ। তাই বরানগর হইতে নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতি ভক্তেরা সোৎসাহে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

ভজন কীর্তন ও প্রসাদান্ন গ্রহণের শেষে ঠাকুরের স্মৃতিচারণ চলিতেছে। এমন সময়ে কথাপ্রসঙ্গে নরেন কহিলেন, "আমাদের ঠাকুরই ছিলেন একমাত্র কামজিৎ পুরুষ। বিবাহিত জীবনে এমন কামজিৎ জগতে আর কেউ হয়েছেন বলে শোনা যায় না।"

একথায় কিন্তু মৃদু একটু প্রতিবাদ উঠিল। তরুণ সাধক তারক সবিনয়ে কহিলেন, "তা কেন? ঠাকুর কৃপাবলে আরও কামজিৎ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই ধরুন, আমার ভেতরেই তিনি এমন শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন যার বলে বিবাহিত জীবন-যাপন ক'রেও আমি কাম জয় করতে পেরেছি।"

"তাহলে তো আপনি মহাপুরুষ।" বিস্ময় ও সম্ভ্রম জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন নরেন্দ্রনাথ—উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ।

নরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত এই 'মহাপুরুষ' আখ্যাই তারককে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে চিরচিহ্নিত করিয়া দেয়, মহাপুরুষ মহারাজ নামে তিনি মণ্ডলীতে পরিচিত হইয়া উঠেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাহার নব নামকরণ হয় শিবানন্দ স্বামী।

সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর দিগ্‌দিশারী ছিলেন স্বামী শিবানন্দ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নূতনতর ধর্ম আন্দোলনে এবং মঠ মিশনের সংগঠন ও পরিচালনায় তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনীষী ও সাধক মহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ভ্রাতা, বলিয়াছেন, "প্রত্যেক মহাধর্ম বা মহাসঙ্ঘের গঠন প্রচারে ভাব-উদ্বোধক, ভাব-বিকীরক এবং ভাব-সংবেশক—তিনেরই অঙ্গাঙ্গী প্রয়োজন আছে। তিনটির মধ্যে একটিকেও পরিত্যাগ করিলে মহাধর্মের বা মহাসঙ্ঘের কোনো কার্য চলিতেই পারে না, একের অবর্তমানে অপরের সার্থকতাও থাকে না—ধর্মজগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে যে শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই শক্তি স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া জগতে বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণের ভিতর দিয়া তাহা জনসাধারণের মধ্যে সংবেশিত হইয়াছিল।"

ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির উজ্জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যে নব তরঙ্গ

উৎসারিত করিয়া যান, মহাপুরুষ শিবানন্দ সেই তরঙ্গে সঞ্চারিত করেন তাঁহার সাধন শক্তি—কীর্তিত হন তাঁহাদেরই এক উত্তরসাধকরূপে।

গুরুভাই তারক যে একজন ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ, এ ধারণাটি পূর্ব হইতেই নরেন্দ্রনাথের ছিল। এ সম্পর্কিত এক অলৌকিক ঘটনারও তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কাশীপুরের বাগানবাড়িতে, মারাত্মক ক্যান্সার রোগে তিনি শয্যাশায়ী। গুরুর সেবা পরিচর্যায় তরুণ ভক্ত শিষ্যেরা সবাই প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন, আর অলক্ষ্যে গুরুকৃপায় তাঁহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে এক অচ্ছেদ্য আত্মিক বন্ধন। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যময় সান্নিধ্য ও স্পর্শে হৃদয়ে তাঁহাদের জ্বলিতেছে মুমুক্ষার আগুন। এই আগুন এক সময়ে আরো তীব্র হইয়া উঠে। নরেন্দ্রনাথ সংকল্প করেন বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের তপস্যাপূত ভূমিতে গিয়া কয়েকটা দিন ধ্যানাবিষ্ট থাকিবেন, প্রতীক্ষা করিবেন মুক্তির আলোক সঙ্কেতের।

এই প্রস্তাব শুনিয়া তারক ও কালিপ্রসাদও উৎসাহিত হইয়া উঠেন। তিন গুরু-ভ্রাতা এবার বুদ্ধগয়ায় গিয়া উপস্থিত হন, শুরু করেন তাঁহাদের তপস্যা।

এ সময়কার অলৌকিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পিছন দিকের শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ দেখিতে পান, একটি শক্তি তারকনাথের দেহে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে তারকনাথের পায়ে প্রণাম করিলেন। তারকনাথ তাহাতে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবেই শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।"

নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ এ সময়ে বলেন, "ওরে কোথাও কিছু নেই, এবার সব এখানে। আর যেখানেই যাওনা কেন, কিছুই পাবে না। এখানকার সব দুয়ার খোলা।"

ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত এই মহা-ইঙ্গিতটি তারক তাঁহার দীর্ঘ তপস্যাময় জীবনে ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত হন নাই। এই দিব্যোজ্জ্বল ইঙ্গিতটিকে সযতনে তিনি রাখিয়াছিলেন তাঁহার হৃদয়সম্পুটে, ইহা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহার সাধন-পথের পরম পাথেয়। জীবন তাঁহার হইয়া উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণময়, লাভ করিয়াছিলেন তিনি বহুবাঞ্ছিত অধ্যাত্মসম্পদ।

তারকের পিতা রামকানাই ঘোষাল ছিলেন এক বিশিষ্ট তান্ত্রিক আচার্যের শিষ্য। নিজেও তিনি বহুতর তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করিতেন।

বারাসতের এক বিশিষ্ট মোক্তার ছিলেন রামকানাই। আইন ব্যবসায়ে প্রসার প্রতিপত্তি যেমন ছিল, তেমনি সদ্ব্যয় ছিল প্রচুর। ধনজন পরিপূর্ণ সংসার। কিন্তু রামকানাই ও তাঁহার পত্নী বামাসুন্দরীর অন্তরে সুখ নাই। এ যাবৎ তাঁহাদের কোনো পুত্রসন্তান হয় নাই। এজন্য পূজা ব্রত অনেক কিছুই করা হইয়াছে, কোনো ফল হয় নাই।

অবশেষে উভয়ে বাবা তারকেশ্বরের পূজা দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। বামাসুন্দরী অতিশয় সাধ্বী, শুদ্ধাচারিণী ও ভক্তিমতী। বাবা তারকেশ্বর এ সময়ে তাঁহাকে স্বপ্নে

দর্শন দেন। প্রত্যাদেশ হয়—"ওগো, মনে খেদ ক'রো না। এ বৎসরের মধ্যেই এক পুত্ররত্ন তুমি লাভ করবে।"

প্রত্যাদেশের ফল ফলিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে, কৃষ্ণা একাদশীর তিথিতে ভূমিষ্ঠ হইল এক নয়নাভিরাম পুত্র।

সুন্দর সুঠামতনু শিশুকে পাইয়া ঘোষাল দম্পতির আনন্দের অবধি নাই। ধন-জনে পূর্ণ প্রাচুর্যের সংসার এবার আরো আনন্দময় হইয়া উঠে।

কিন্তু মাতা বামাসুন্দরী দীর্ঘদিন এই আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পুত্রের নবম বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। বালক তারকের জীবনে জননীর এই বিয়োগব্যথা এক শূন্যতার সৃষ্টি করে। দিন দিন সে উদাসীন হইয়া পড়ে। প্রায়ই দেখা যাইত, সহপাঠী ও সঙ্গীদের সহিত থাকিয়াও সে যেন তাহার জীবনের চতুর্দিকে এক গন্ডী রচনা করিয়া চলিয়াছে। আপন উদাস মনোবৃত্তি নিয়া সে যেন সবার মধ্যে থাকিয়াও নিঃসঙ্গ। মাতার মৃত্যুর পর এক ভগিনীর মৃত্যু ঘটে। তারপর আসে আর এক শোচনীয় দুর্দৈব। অপর এক ভগিনী বিধবা হন। এ সময়ে পিতার আর্থিক অবস্থাও দিন দিন খারাপ হইতে থাকে।

তারকনাথ যখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন তখন তাঁহার হৃদয় নানাভাবে বিপর্যস্ত। অবশেষে তিনি পিতৃগৃহের পরিবেশ ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। পশ্চিমাঞ্চলে কিছুদিন ভ্রাম্যমাণ থাকিবার পর গ্রহণ করেন রেলওয়ের চাকুরী। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজে উপার্জন করিবেন, আর তীর্থদর্শন ও ভগবৎ-চিন্তায় কাল কাটাইবেন, ইহাই তখন তাঁহার অন্তরের একান্ত ইচ্ছা।

এই সময়কার কথাপ্রসঙ্গে তিনি নিজে বলিতেন, "সেই সময় সমাধি জিনিসটা যে কি তা নিয়ে মনে খুব আন্দোলন হত। সমগ্র জগৎ-সংসার ভুলে কি ক'রে সমাধির আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকা যায়—এই আকাঙ্ক্ষার আগুন প্রাণে সর্বক্ষণ জ্বলত। শিবের ধ্যানমূর্তি, বুদ্ধের ধ্যানমূর্তি—এসব খুব ভাল লাগত। মোট কথা সমাধিলাভ করবার জন্য প্রাণ খুব ছটফট করত এবং যাতে সমাধি লাভ করতে পারি তার জন্য খুবই চেষ্টা করতাম। মাসের পর মাস গিয়েছে, রাত্রে ভাল ঘুম হত না, সর্বক্ষণ ঐ এক চিন্তা—কি করলে সমাধি লাভ হয়।"

তারকনাথের পিতা তাঁহার বিবাহের জন্য বার বার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু পুত্র একেবারে সংসারবিমুখ। অবশেষে তারককে পড়িতে হইল এক কঠিন পরীক্ষার। পিতার নিকট হইতে সংবাদ আসিল, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ প্রায় স্থির হইয়াছে। কিন্তু পাত্রপক্ষের শর্ত অনুযায়ী তারককে বিবাহ করিতে হইবে বরের ভগিনীকে। মাতৃহীনা কনিষ্ঠা ভগিনীর কল্যাণে তারকনাথ কি এ প্রস্তাবে রাজী হইবেন না?"

তারকের ইচ্ছা ছিল বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইবেন না। তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবেন আর রত হইবেন সাধন ভজনে।

অসহায়া ভগিনীর দিকে তাকাইয়া এই ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিতে হইল। বাধ্য হইয়া বিবাহে তিনি মত দিলেন।

বারাসতের নিকটে মহেশ্বরপুর গ্রাম। এই গ্রামের পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা,

নিত্যকালী দেবী, তারকের বধূরূপে ঘোষাল গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তারকনাথ একটি নূতন কর্মগ্রহণ করিয়া আসিলেন কলিকাতায়।

তখনকার দিনে আদর্শবাদী তরুণদের মধ্যে ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের খুব প্রতিপত্তি। তারকনাথ কেশবচন্দ্রের উপাসনায় মাঝে মাঝে যোগদান করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণের অদম্য পিপাসা সেখানে মিটিতেছে কই? সমাধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় তখন তাঁহার জীবন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এক একদিন গভীর রাতে উঠিয়া কাঁদিতেন, আর প্রার্থনা করিতেন, "হে প্রভু, তোমার ভাবে আমায় একেবারে ডুবিয়ে দাও, আমায় ঠিক পথের সন্ধান জানিয়ে দাও। কি করলে এই জগৎ-সংসার ভুলে মন সমাধিস্থ হয়ে যাবে, কৃপা ক'রে তাই শিখিযে আমায় দাও।"

১৮৮০ সালের মধ্যভাগ। একদিন কয়েকটি ভক্ত নিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রামচন্দ্র দত্তের গৃহে উপনীত হইয়াছেন। ঘরে বাহিরে দর্শনার্থী জনতার ভিড়। এইদিন তারকনাথও সকলের সাথে ঠাকুরকে দর্শন করিলেন।

আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্যে পরমহংসদেব হঠাৎ সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া কি যেন তিনি বলিতে চান। কখনো অস্ফুট কখনো বা আধ-আধ কথা। খানিক বাদে মন নিম্নভূমিতে অবতরণ করিল। তখনও সেই পরম অনুভূতির রেশ টানিয়া সমাধির প্রসঙ্গে ঠাকুর নানা তত্ত্বকথা কহিতেছেন।

একি দেবদুর্লভ ভাবাবেশ! একি আনন্দঘন রূপ! তারকনাথের হৃদয়ে এ দিনের স্মৃতি চিরতরে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

এই সঙ্গে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেন, এই সমাধিবান্ মহাপুরুষই তাঁহার সংত্রাতা, ইঁহার কৃপালাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু।

সেদিনকার এই দর্শন তারকের জীবনে আনিয়া দেয় ঈশ্বর প্রাপ্তির তীব্র ব্যাকুলতা। আবার কবে এই দিব্য পুরুষের সন্নিধানে যাইবেন তাহাই হয় তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান।

ইহার পর এক বন্ধুর সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। তারকের মনে কি ভাব জাগিল কে জানে? বালকের মতো ঠাকুরের কোলে মাথা ঠেকাইয়া বার বার তিনি প্রণাম করিতে থাকেন। ঠাকুর যেন এক করুণাঘন পরমাশ্রয়। মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ ও মাধুর্য যেন ঝরিয়া পড়িতেছে তাঁহার দিব্য মূর্তি হইতে।

তখন সন্ধ্যা সমাগত। ভবতারিণীর মন্দিরে কাঁসর শঙ্খ ঘণ্টা অবিরত বাজিয়া চলিয়াছে। আর ঠাকুর বসিয়া আছেন ভাবাবিষ্ট অবস্থায়। আরতি থামিলে তারককে প্রশান্ত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি সাকার মান—না নিরাকার?"

"আমার ভাল লাগে নিরাকার? নিজের প্রবণতা ও ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারাকে মিলাইয়াই একথাটি তিনি বলিলেন।

ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত উত্তর শোনা গেল, "শক্তি মান্তে হয়।"

ইহার পর পরমহংসদেব ভাবোন্মত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে মন্দিরে গিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে ও কেশবচন্দ্রের সভায় ঘোরাফেরা করিয়া তারক নিরাকার ঈশ্বরের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছেন। তাই দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া ভাবিলেন, কালী মূর্তিকে প্রণাম করিবেন কিনা।

কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় এই দ্বিধা মুহূর্তে কাটিয়া গেল। বুঝিলেন যিনি বিভু,

ভূমা—প্রস্তর মূর্তিতে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ বলিয়া ভাবা কেন? সাকার নিরাকার, খণ্ড ও অখণ্ড, দুই-ই যে তিনি।

মধুর কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া দিলেন, "আবার এসো।"

দিব্যভাবে সদা আবিষ্ট এই মহাপুরুষের প্রেম-মধুর মূর্তির আকর্ষণ যে অমোঘ! পরদিনই সন্ধ্যায় তারক আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তাঁহাকে পরমাত্মীয়ের মতো গ্রহণ করিলেন। সযত্নে তাঁহাকে দেবীর প্রসাদ খাওয়াইয়া বারান্দায় শয়নের স্থান করিয়া দিলেন।

কোনো ভক্তই দক্ষিণেশ্বরে সেদিন উপস্থিত নাই। ঠাকুরের নিবিড় সান্নিধ্য ও দিব্য স্পর্শ লাভের পর তারকনাথের হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ বহিতেছে। শয়ন করিয়াও নিদ্রা আসিতেছে না। মধ্যরাত্রিতে দেখিলেন, ভাবোন্মত্ত ঠাকুর উলঙ্গ হইয়া পায়চারি করিতেছেন, আর উচ্চারণ করিতেছেন কি সব দুর্বোধ্য বাণী।

ইহার পর বারান্দায় আসিয়া তারককে ডাকিতে লাগিলেন, "ওগো ঘুমিয়েছ নাকি? আমায় একটু রামনাম শোনাও তো!"

শশব্যস্তে উঠিয়া তারক ঠাকুরকে বহুক্ষণ রামনাম শুনাইয়া শান্ত করিলেন। এক অনির্বচনীয় আনন্দ-আবেগের মধ্য দিয়া তারকের সেই রাতটি অতিবাহিত হইল।

বিদায় গ্রহণের সময় ঠাকুর কহিলেন, "আবার এসো—একলা।"

একলাই তারকনাথ আবার একদিন ছুটিয়া আসিলেন। এই দিনকার অভিজ্ঞতা তিনি নিজেই বিবৃত করিয়াছেন—"তিনি হঠাৎ তাঁহার পা আমার বুকে দিলেন। সে দিব্য স্পর্শে আমার বাহ্যিক সংজ্ঞা লোপ হয়ে গেল। সে অবস্থায় যে কতক্ষণ ছিলাম তা জানিনে, কিন্তু পরে যখন চৈতন্য হল, দেখলাম ঠাকুর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলছেন, 'মা, নেমে এস, নেমে এস।' ঐরকম অবস্থায় অপরের বেলায়ও তাঁকে এরকম করতে দেখেছি।"

তারক দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু এতদিন ঠাকুর তাঁহার কোনো পরিচয়ই জিজ্ঞাসা করেন নাই। যেন কতদিনের পরমাত্মীয়কে আবার কাছে পাইয়াছেন, এই রকম ভাব। এইবার হঠাৎ তারকের পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তর শুনিয়া তিনি মহাখুশী! বলিলেন, "বটে। তুই কানাই ঘোষালের ছেলে? তাইতো বলি, মা কেন তোর বাড়ির খবর নেবার ইচ্ছে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তোর বাবাকে যে খুব জানি। তিনি রাণী রাসমণির বাড়ির মোক্তার। ভারি সাধক লোক। এখানে এসে গঙ্গাস্নান ক'রে লাল চেলীর কাপড় পরে মায়ের মন্দিরে আসতেন। তখন মনে হত যেন সাক্ষাৎ ভৈরব! যেমন লম্বা চওড়া চেহারা, তেমনি গৌরবর্ণ—বুকটা যেন সর্বদা লাল হয়েই থাকত। মায়ের মন্দিরে বসে খুব ধ্যান করতেন। তাঁর সঙ্গে একজন গায়ক থাকত, সে পেছনে বসে নানা দেহতত্ত্ব ও শ্যামা বিষয়ক গান গাইত, আর তোর বাবা ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন—অবিরল অশ্রু ঝরত। যখন ধ্যান ক'রে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেন, তখন সারা মুখ লাল হয়ে যেত—তাঁর সামনে আসতে লোকের ভয় হত।

"আমার তো তখন খুব গাত্রদাহ—অসহ্য জ্বালা সর্বাঙ্গে। তাঁকে দেখে একদিন বল্লাম, 'হ্যাগো, তুমি তো মাকে ডাক, আমিও মাকে ডাকি—একটু ধ্যানও হয়। কিন্তু

আমার যে এত জ্বালা করে, এর মানে কি বলতে পার? দ্যাখো, আমার এমনি গাত্রদাহ যে, লোমগুলি সব পুড়ে গেছে। কখনও কখনও বড় অসহ্য হয়।' তখন তোর বাবা আমায় ইষ্টকবচ ধারণ করতে বললেন। আশ্চর্য। এই কবচ ধরণ করা অবধি গাত্রদাহ একেবারে কমে গেল। তাঁকে একবার আসতে বলিস তো?"[১]

তারকের পিতা লোকের কাছে শুনিলেন, পুত্র দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মশায়ের কাছে যাতায়াত করিতেছেন, এ সংবাদে তিনি বেশ আনন্দিতই হইলেন।

তারক ক্রমে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন, এখন মাঝে মাঝে মনের গোপন কথা, দ্বন্দ্ব সংঘাতের কথা খুলিয়া বলেন। সেদিন কহিলেন, "দেখুন, বিয়ে ক'রে ফেলেছি বাধ্য হয়ে। ঘরে স্ত্রী রয়েছে। মনে ভয় হয়, আমার সংযমের বাঁধ যদি ভেঙে যায়, ঈশ্বর দর্শনের যে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, যা নিয়ে এখানে পড়ে রয়েছি, তা ব্যর্থ না হয়ে যায়।"

আশ্রিত শিষ্যকে ঠাকুর আশ্বাস দিলেন, "ভয় কি রে? আমি আছি। স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে দেখাশুনা করতে হবে বৈকি। একটু ধৈর্য ধর্। মা সব ঠিক ক'রে দেবেন।"

এ সম্পর্কে উত্তরকালে স্বামী শিবানন্দ কথাপ্রসঙ্গে মঠের ভক্তদের বলিয়াছেন, "ঠাকুরের কাছে যখন যাতায়াত করতুম তখন আবার মাঝে মাঝে বাড়িও দেখতে হত। বিবাহ হয়ে গিয়েছিল কিনা আগে। আমার কিন্তু আদৌ ভাল লাগত না; কোনো-রকমে নাক কান বুজে ভগবানের নাম ক'রে রাতটা কাটিয়ে দিতুম। স্ত্রী অনেক কান্নাকাটি করত। তাই ঠাকুরকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে, আমার সব বন্ধন কেটে দেবার জন্য প্রার্থনা জানালুম। ঠাকুর সব শুনে, আমায় একটা ক্রিয়া আচরণ করতে শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন—'ভয় কি? আমি তো রয়েছি আমায় খুব স্মরণ করবি, আর এই ক্রিয়া করবি, তোর কিছুই হবে না। যা, স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে থাকলও তোর কোনো ক্ষতি হবে না। দেখবি, বরং তোর বৈরাগ্য এতে আরও তীব্র হবে।'"[২]

শ্রীরামকৃষ্ণের এই আশীর্বাদ ফলপ্রসূ হয় সাধক তারকনাথের জীবনে। স্ত্রী তাঁহার পরমা ভক্তিমতী। সাত্ত্বিক ও শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। স্বামী তারক-নাথের কাছে তাঁহার সাধনা ও সংকল্পের কথা শুনিয়া, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহার মন আরো পরিবর্তিত হয়। স্বামীর সাধনজীবনের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা তিনি করিতে থাকেন।

তারকনাথের সধবী পত্নী বেশীদিন বাঁচিয়া থাকেন নাই। অল্পকালের ব্যবধানে, রোগে ভুগিয়া, ইহধাম তিনি ত্যাগ করেন। তারকের সংসারবন্ধন এবার ছিন্ন হইয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থাকিয়া, একনিষ্ঠভাবে নিজের সংকল্প সাধনে তিনি ব্রতী হইয়া পড়েন।

ধনী সম্ভ্রান্ত গৃহের যুবক তারক। ঠাকুর প্রথমেই তাঁহার অভিমানের কাঁটা উৎপাটন করিতে শুরু করেন। সাধনায় ব্রতী হইতে হইলে অনেক কিছু ভাঙচুর

---

১ মহাপুরুষ শিবানন্দ : স্বামী অপূর্বানন্দ
২ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন

আগে করিয়া নিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই আগেই এদিকে মনোযোগ দিলেন। মাঝে মাঝে তারককে পাঠাইতে লাগিলেন ভিক্ষা সংগ্রহে। দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে ভিক্ষা নিয়া তারক যখন ফিরিতেন, ঠাকুরের আনন্দের অবধি থাকিত না। দিন ও রাত্রির সর্ব কর্মে, শয়নে ভোজনে ঠাকুরের সতর্ক প্রহরা তরুণ সাধককে রক্ষা কবচের মতো ঘিরিয়া থাকিত।

গুরু শিষ্যের এ সময়কার মধুর সম্বন্ধটির স্বরূপ স্বামী শিবানন্দের মুখে উত্তর-কালে শোনা যাইত—"আমাদের সঙ্গে ঠাকুরের যে ভাব ছিল তাতে ঐশ্বর্যের ভাব একটুও ছিল না। আমরা আমাদের কথা বলছি—ঠাকুরকে সেভাবে দেখি নি। তিনিও ওরূপ ভালবাসতেন। কেউ অবতার, কেউ ভগবান্ এসব বললে তিনি বিরক্ত হতেন। ওতে আপন বুদ্ধি যেন একটু কমে যায়। কি ভাগ্যবান্ আমরা—পান সেজে তামাক সেজে খাইয়েছি, তাঁর সেবা করেছি—আদর ভালবাসা কত পেয়েছি।"

এমন সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়া সুদক্ষ কাণ্ডারী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার আশ্রিতদের অধ্যাত্ম-জীবনের পরপারে পেঁাছাইয়া দিয়াছিলেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তখন ভক্ত তারকনাথের অন্তর-সত্তায় এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাইয়া দিতেছে। মুমুক্ষু জীবনের চারিপাশের আকর্ষণ ও বন্ধন যেন কোন্ ইন্দ্রজাল-স্পর্শে অপসৃয়মান। ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শনের একি পরম বিস্ময়কর ফলশ্রুতি। তারকের অন্তর্জীবনের তুষারাবরণ যেন অধ্যাত্ম-সূর্যের কিরণ সম্পাতে আজ গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

ঠাকুরের সহজ ভালবাসা ও কল্যাণেচ্ছার প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই ভালবাসার শক্তি কাজ করিত প্রচ্ছন্নভাবে, কিন্তু ইহার ক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। এই সময়কার কথাপ্রসঙ্গে শিবানন্দ স্বামী বলিয়াছেন :

"ঠাকুরের কাছে হয়তো দু এক ঘণ্টা মাত্র কাটিয়ে এলাম, সব দিন তেমন কথা-বার্তাও হত না, কিন্তু ফল বহুদিন পর্যন্ত থাকতো। কেমন যেন একটা নেশার মতো হয়ে যেত—সর্বক্ষণই ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হয়ে থাকতাম· তাঁর কৃপা-কটাক্ষে সমাধি হয়ে যেত। তিনি স্পর্শমাত্রেই ভগবৎ-দর্শন করিয়ে দিতে পারতেন।"

সুদক্ষ অধ্যাত্ম-শিল্পী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ; নিজ ভক্তদের রূপান্তর তিনি সাধন করিয়াছেন অসামান্য ধৈর্য ও সতর্কতা নিয়া। দীর্ঘ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়া এই সাধকদের জীবন অঙ্কুরিত ও মুকুলিত হইয়াছে। তারপর ঠাকুর তাঁহার দিব্য করস্পর্শে থরে থরে ইহাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন কুসুমরাজি।

তারকের মনে পড়ে, দুই তিনবার ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি তাঁহাকে মন্দিরের এক নিভৃত স্থানে নিয়া যান, তারকের জিহ্বার নিজের আঙুল দিয়া কি যেন এক মন্ত্র লিখিয়া দেন। অদ্ভুত তাহার প্রতিক্রিয়া। তারকনাথের চেতনার কেন্দ্রটি যেন এক মুহূর্তে বিপর্যস্ত হইয়া যায়। পার্থিব জগতের অস্তিত্ব তখন তাঁহার চৈতন্য হইতে বিলুপ্ত। জড় সমাধিতে তিনি মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। ইহার পরও তিনি আরও দুইবার চৈতন্য-বিলুপ্তির এই অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

সর্বজ্ঞ ঠাকুর প্রিয় শিষ্যের প্রস্তুতি সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেন। তারপর উপযুক্ত সময়ে ঢালিয়া দিতেন কৃপাবারি।

তরুণ সাধক তারকের মন কয়েকদিন যাবৎ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, ঈশ্বর দর্শনের পিপাসা হইয়াছে দুর্নিবার। একদিন তিনি নিভৃতে দক্ষিণেশ্বরের বকুল তলায় বসিয়া খুব কাঁদিতেছেন। এদিকে ঠাকুর নিজের কক্ষে বসিয়া ঈশ্বরীয় কথায় ব্যস্ত। হঠাৎ তিনি তারকের জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। "তারক কই গো, তারক কই গো?" বলিয়া সবার কাছে খোঁজ নিতেছেন। তারকনাথ উপস্থিত হইলে পরম কারুণিক ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "বোস্, বোস্, দ্যাখ্ ভগবানের কাছে খুব কাঁদবি, প্রাণভরে কাঁদবি। কাঁদলে তার ভারী দয়া হয়।" ভক্ত জীবনে তখন তীব্র আকূতি, ক্রন্দন ও পরিশুদ্ধির পালা চলিতেছে—অন্তর্যামী ঠাকুর এ সংবাদটি জানিতেন।

আর একদিনের কথা। নিভৃতে পঞ্চবটীতে বসিয়া তারকনাথ ধ্যান করিতেছেন। ধ্যান খুব গাঢ় হইয়াছে, সদ্‌গুরুর অন্তর্লোকেও পৌঁছিয়াছে তাঁহার আকর্ষণ। পরমহংসদেব ত্বরিৎপদে এ সময়ে ধ্যানাবিষ্ট তারকনাথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। শিবানন্দজী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যেই তিনি আমার দিকে চেয়েছেন অমনি হুহু ক'রে কান্না পেল। ঠাকুর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বুকের ভেতর গুর্‌গুর্ ক'রে উঠল, আর এমন কাঁপুনি যে, থামে না। ঠাকুর আর একজনকে ডেকে বললেন, 'ওরে এ কান্না কি অমনি হয়? ওর একটা ভাব এসেছে, ওকে নিয়ে আয়!' আপন প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া ঠাকুর অতঃপর তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পরম ত্যাগী সাধক, অপাপবিদ্ধ মহান্ পুরুষ। তাঁহারই জীবনাদর্শে তারকনাথ আপনাকে প্রস্তুত করিয়া নিতেছিলেন। চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া, জীবনের পশ্চাৎপটখানি একেবারে মুছিয়া দিয়া, ঠাকুরের পদপ্রান্তে আসিয়া বসিবেন, ইহাই তাঁহার সংকল্প।

কিছুদিন রোগভোগের পর পত্নী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এবার তারকের সংসার জীবনের এক বড় বন্ধন খসিয়া গেল। স্থির করিলেন, গৃহে গিয়া পিতার নিকট গ্রহণ করিবেন শেষ বিদায়। তারপর সদ্‌গুরুর চরণতলে বসিয়া শুরু করিবেন ঈশ্বর লাভের কঠোর তপস্যা।

শক্তি-সাধক রামকানাই ঘোষাল সেদিন পুত্রের সমক্ষে শক্তিমানের মতোই আচরণ করিলেন। তারককে আশীর্বাদ করিয়া সজল চক্ষে বলিলেন, "আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেছি। সংসার এড়াবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারি নি। বাবা, প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি, তোমার ভগবান্ লাভ হোক!" সংসার ত্যাগের প্রাক্কালে পিতার নিকট হইতে এমন আশীর্বাদ কোন্ সন্তানের ভাগ্যে মিলে?

দক্ষিণেশ্বরে ও রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে থাকিয়া তারকনাথ কিছুদিন একান্তে সাধন-ভজন করেন। অতঃপর কাঁকুড়গাছির বাগানের নির্জন পরিবেশে তিনি সাধনায় নিমগ্ন হন। এই অঞ্চল তখন জঙ্গলে পূর্ণ—সাপ, ব্যাঙ ও মশার রাজত্ব সেখানে। শিবানন্দ তখনকার জীবন-সম্বন্ধে বলিতেন, "বেশ থাকতাম খুব নিরিবিলিতে। একটি আমগাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে সেখানেই পড়ে থাকতাম। ধ্যান, জপ, বিশ্রাম সবই ওখানে। সাপগুলি ধুনির আগুন দেখে আসতে আসতে আবার চলে যেত।

আমি এক একবার শুধু দেখতাম—তা আমার দিকে আসতো না। দিনে একবার ভিক্ষায় বের হতাম, যা জুটতো তাই খাওয়া যেত—বেশ লাগত।”

কঠোর সাধনা ও কৃচ্ছ্রব্রতের ফলে তারকের দেহ তখন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। নয়ন দুটি সদা অন্তর্মুখীন, অন্তরের অন্তস্তলে কোন্ পরশমণি যেন তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ক্যান্সারে ভুগিতেছেন। এই সময়ে রোগশয্যায় থাকাকালীনই তিনি শিষ্যদের মধ্যে তাঁহার কৃপার ধারা শেষবারের মতো ঢালিয়া দিয়া যান। ত্যাগ-ব্রতী রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সূচনা দেখা দেয়, আর শেষ শয্যায় শায়িত গুরুকে কেন্দ্র করিয়া গুরুভাইদের মধ্যে রচিত হয় এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্র।

চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে কাশীপুরে আনয়ন করিলে ভক্ত তারকও তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দিনরাত পালা করিয়া গুরুর সেবা, আর অবসর সময়ে তীব্র সাধন-ভজন, ইহাই ছিল তখন তরুণ সাধকদের নিত্যকার কাজ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসময়ে একটা সহজ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ত্যাগী শিষ্যদের দান করেন প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাস। বুড়ো গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) এই সময়ে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, কয়েকটি সাধুকে ভোজন করাইবেন। ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, “কোথায় আর সাধু খুঁজে বেড়াবি ?—এখানেই সব রয়েছে। এই ছোকরাদের খাওয়ালেই সব হবে।”

তাঁহার ইঙ্গিতে গেরুয়া বস্ত্র ও মালাচন্দন তখনি আনা হইল এবং তাঁহার প্রিয় একাদশটি ত্যাগী ভক্তকে নিজ হস্তে তিনি এসব দান করিলেন।

ঠাকুরের শ্রীহস্ত প্রদত্ত মালাচন্দন ও গেরুয়া বসন তারকের সন্ন্যাসকামী জীবনের সম্মুখে সেদিন তুলিয়া ধরে অমৃতময় জীবনের এক নূতনতর ইঙ্গিত।

কিছুদিনের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ ঘটে, ভক্তদের জীবনে নামিয়া আসে শোক আর নৈরাশ্যের ছায়া। এসময়ে তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ আগাইয়া আসেন তাঁহার অসামান্য নেতৃত্ব শক্তি নিয়া। বরানগর মঠে তাঁহারই উৎসাহ উদ্দীপনার ফলে ত্যাগী ভক্তেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়, ঠাকুরের আদর্শ ও বাণী প্রচারে তাহারা উদ্বুদ্ধ হয়। ঠাকুরের প্রদত্ত পরোক্ষ সন্ন্যাসব্রতকে নরেন্দ্রনাথ এইবার দিলেন আনুষ্ঠানিক রূপ। নরেন্দ্র, রাখাল, তারক, কালীপ্রসাদ প্রভৃতি ঠাকুরের পাদুকার সম্মুখে বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাস নিলেন। তারকের নব নামকরণ হইল স্বামী শিবানন্দ।

বরানগর মঠে রামকৃষ্ণ গোষ্ঠীর অধ্যাত্ম-প্রস্তুতি এবার গড়িয়া উঠিতে থাকে। চরম দারিদ্র্য, সামাজিক লাঞ্ছনা ও মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে তরুণ সাধকেরা নিজেদের আত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হন।

সঙ্গীদের সাথে তারক এ সময়ে ধ্যানানন্দে মাতিয়া উঠিয়াছেন। অন্তরে তাঁহার সদাই জাগিতেছে নির্গুণ রূপাতীতের ধ্যানাকাঙ্ক্ষা। এইবার বিদেহী শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরালে থাকিয়া শিবানন্দের অধ্যাত্মস্রোতকে বদলাইয়া দিলেন। ঠাকুর এই সময়ে হঠাৎ একদিন তাঁহাকে দর্শন দিলেন। সারতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া কহিলেন, “ওরে, গুরুই সব। গুরুর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।”

নির্গুণ ধ্যানের পরিবর্তে শিবানন্দ মত্ত হইলেন শ্রীগুরুর ধ্যানে, গুরুকে গ্রহণ করিলেন ইষ্টদেব রূপে।

পরবর্তীকালে তাঁহার অধ্যাত্মচেতনার পরতে পরতে স্ফুরিত হয় এই সদ্‌গুরু-ভাবনা, জীবন তাঁহার রামকৃষ্ণময় হইয়া উঠে।

বরানগরের মঠ-জীবনে শিবানন্দের কঠোর তপস্যা ছিল গুরুভ্রাতাদের শ্রদ্ধার বস্তু। রামকৃষ্ণ তনয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসেন। তাঁহার ত্যাগসর্বস্ব জীবন উত্তরকালে উদ্বুদ্ধ করে হাজার হাজার ভক্ত নরনারীকে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও মঠ-জীবনের উজ্জীবনেও তাহা বিস্তার করে পর্যাপ্ত প্রভাব।

বরানগরের তরুণ সাধকদের মধ্যে তখন তপস্যার বান ডাকিয়াছে। ঈশ্বর দর্শনের আকুলতা হইয়া উঠিয়াছে দুর্নিবার। জপ ধ্যানেই বেশী সময় তাহাদের অতিবাহিত হয়।

একদিন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ পণ করিয়া বসিয়াছেন, জপ-সাধন ভঙ্গ করিয়া কোনোমতেই তিনি আহারে বসিবেন না। এদিকে গুরু ভ্রাতারাও তাঁহাকে অভুক্ত থাকিতে দিতে রাজী নন। অবশেষে ত্রিগুণাতীতানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "তারকদা যদি আমার স্পর্শ ক'রে থাকেন, তা'হলে তা জপের সমান কাজ করবে। সেই অবসরে আমি দুটি খেয়ে নেব।"

তারকনাথকে তখন বাধ্য হইয়া এ কাজ করিতে হয়। এ ঘটনাটি হইতে বুঝা যায়, ধ্যানী তারকনাথ গুরুভাইদের দৃষ্টিতে এ সময়ে কতটা আস্থা ও সম্ভ্রমের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তারকের অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তিটি গড়িয়া দিয়াছিলেন সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। দক্ষিণেশ্বরে এবং কাশীপুরে এই ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করিয়া তোলেন নিজের একনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যময় তপস্যা দ্বারা।

বিশেষ করিয়া কাশীপুরের বাগানে যে তপস্যার ধুনি তারক ও তাঁহার ত্যাগী গুরুভাইরা প্রজ্বলিত করেন উত্তরকালে তাহা আনিয়া দেয় পরমা সিদ্ধি। এ সম্পর্কে মনীষী মহেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন:

"যদিও তারকনাথ এবং অপর সকলে পরমহংস মশাইয়ের কাছে দক্ষিণেশ্বরে বাগবাজারে ও সিমলাতে সর্বদাই যাতায়াত করিতেন কিন্তু সেটা অপেক্ষাকৃত দর্শক হিসাবে। তাঁহাদের প্রকৃত সাধকজীবন কাশীপুর বাগান হইতেই শুরু হয়। এই কাশীপুরের বাগানে কয়েকটি অন্তরঙ্গ যুবকবৃন্দ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই কঠোর তপস্যা পূর্ব অবস্থার তুলনায় অতীব মহান্ হইয়াছিল। ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া জপ ধ্যান, কখনও বা কীর্তন করা, কখনও বা সচ্চর্চা সৎপ্রসঙ্গ করা, কখনও বা হলঘরটিতে বসিয়া জপ করা, ধ্যান করা ইত্যাদি। দিবারাত্রি তাঁহারা ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, কঠোর দুরূহ তপস্যা অর্থাৎ প্রাণস্পর্শী তপস্যা এই সময় হইতেই চলিতে লাগিল।"

ইহার পর শুরু হয় বরানগর মঠে ত্যাগব্রতী তরুণ তাপসদের সাধনা। একদিকে চরম দারিদ্র্য এবং কৃচ্ছ্রব্রত, আর একদিকে ভগবৎ-দর্শনের জন্য প্রাণপাত তপস্যা— এই দুইয়ের মধ্য দিয়া তারক প্রভৃতি সাধকদের অন্তর্লোক ধীরে ধীরে ঈশ্বরীয় চেতনায় পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে।

এ সময়ে কয়েকমাস এমন আকাশবৃত্তি তাঁহারা গ্রহণ করেন, যাহার তুলনা সচরাচর

মিলে না। পরিধানের বস্ত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে, শেষে আসিয়া ঠেকিয়াছে একটিতে। কৌপীন ও বহির্বাস পরিয়া সবাই মঠে বাস করিতেন এবং ধ্যানভজন করিতেন। কাহারো বাহিরে যাইবার দরকার হইলে, একটি বস্তুই ছিল সম্বল।

সকলেই তাঁহারা মোটামুটি সচ্ছল ঘরের ছেলে। কিন্তু বৈরাগ্যময় জীবন অবলম্বন করার ফলে আহার্য জুটিত শুধু নুনভাত। একদিন কিছুই জুটিল না, অগত্যা সবাই কীর্তন আনন্দে কাটাইয়া দিলেন।

"বরানগর মঠ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অতিশয় কষ্টের দিন ছিল, সকলে তীব্র বৈরাগ্যবশতঃ কাহারও কোনো বস্তু গ্রহণ করিত না। সাধনা আর তপস্যা, একমাত্র মূলমন্ত্র ও লক্ষ্য ছিল। পাছে কোনো বস্তু গ্রহণ করিলে শক্তি ক্ষয় ও তপস্যার বিঘ্ন হয়, এইজন্য সাধ্যমতো কেহ কাহারও কোনো দান গ্রহণ করিত না। এদিকে আহারের কষ্ট, অপর দিকে কঠোর তপস্যা, এইরূপ কঠোর তপস্যা করায় হৃদয়ে সিংহ-বিক্রম জাগ্রত হইত। চক্ষুর দৃষ্টি ও পদক্ষেপে বোধ হইত যেন মেদিনীকে কম্পিত করিয়া এই কয়টি যুবক জগতে বিচরণ করিবে। তাহারা জগৎ ও জগতের ভোগ্য বস্তু বা জগতের আকর্ষণী শক্তি সমস্তকেই তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল। কি করিলে ব্রহ্মলাভ হয়, জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মশক্তি বিকাশ করা যায়—এইটাই তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল। আর ভবিষ্যতে ইহাও দেখা যাইত যে, এই কয়টি যুবক গম্ভীর নিস্তব্ধ পদক্ষেপে সমস্ত জগৎকে বিক্ষোভিত ও পদদলিত করিল। বরানগর মঠে ইহাদের জীবনের প্রথম অবস্থায় মনে যে উদ্দেশ্য জাগ্রত ছিল, প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে পরে তাহা দেখাইয়াছেন।"

স্বামী শিবানন্দের পুণ্যস্মৃতি অনুধ্যান করিতে গিয়া মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন:

তারকদা সকালে রামতনু বোসের গলির বাড়িতে আসিলেন। গায়ে ধুলো কাদাতে মোটা সরের মতন একটা লেউনি পড়ে গেছে, মাথায় উড়িখুড়ি চুল আর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো দাড়ি।

আমি বললুম, 'তারকদা, চল তোমায় নাইয়ে দি।' সেই সময় দিল্লী থেকে একজন গা মাজবার গোঁজ বা বগলী, যাকে খিস্‌সে বলে—সেইটে এনেছিল। আমি তারকদাকে কলের নিচে বসিয়ে নিজের হাতে সেই বগলীটা প'রে তারকদার গা ঘষতে লাগলুম। গা ঘষতে ঘষতে কাদাটে কাদাটে জল বেরুতে লাগল। এইরূপ অনেকক্ষণ পিঠ, বুক, হাত, পা, মুখ ঘষার পর গায়ের চামড়ার রং বেরুলো।

আমি বললুম 'তারকদা, এত কাদা বেরুচ্ছে কেন?' তারকদা বললেন, সমস্ত রাত্রি ধুনির পাশে বসে জপ করি, আর দিনের বেলায় গঙ্গায় তিনটা ডুব দিয়ে আসি। গাও ঘষিনি, গাও পুঁছিনি। যেখানে সেখানে পড়ে থাকি। সেইজন্য গায়ে এত কাদা লেগেছে।'

তারপর তিনি বললেন, 'ওহে একটু গুল দাও দিকিনি? দাঁতটা মাজি। অনেক-দিন দাঁত মাজতে ভুলে গেছি।'

আমি তখন একটু গুল গুঁড়িয়ে এনে দিলুম। তখন তারকদার জোয়ান বয়স, রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, গা ঘষে দেবার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতে হল, কিন্তু দেহ অতিশয় কৃশ হয়ে গিছল। তারপর কাপড়-চোপড় কেচে শুকুতে দিলুম।

তাবকদা ঘবেব ভিতব গিয়ে একটু শ্দলেন। দেখি না, পায়েব গোড়ালীগ্দলো একেবাবে ফেটে গেছে। আমি নাবকেল তেল এনে সেই ফাটাগ্দলোর ভিতব দিতে লাগল্দম। তারকদা একটু হেসে বললেন, ওহে, তুমি একদিন দিযে আব কি করবে? আমায সর্বদাই এ বকম অবস্থায থাকতে হয। পা-টা ফেটে গেছে এতে আব কি ক্ষতি হযেছে? যাহা হোক, তাবকদা আহাবাদি ক'বে চলে গেলেন। এই সমযে তিনি সাধন-ভজনে বিভোব থাকতেন, দেহেব দিকে কিছ্দই মন ছিল না।

ববানগর মঠবাড়িটা আসলে ছিল একটা জঙ্গলাকীর্ণ, অতি প্দবাতন ভগ্নপ্রায বাগানবাড়ি। তাবক প্রভৃতি তব্দণ বামকৃষ্ণ-ভক্তেবা এখানে বাস কবাব সময যে সব কান্ড কবিতেন, মহেন্দ্রনাথ তাহাব চিত্র দিয়াছেন :

"মঠবাড়িব আশে পাশে অনেক পোড়ো জমি ছিল। কেলোমালী একটা উড়ে মালী। সে কিছ্দ ক্ষেত কবেছিল। সেই ক্ষেতে বড বড পাঁড শসা হ'ত। মধ্দব বালকস্বভাব তাবকদা এক একদিন চটে উঠতেন—'দ্দবতেবি ছাই। এমন দ্দখ্দ চেটে খাওযা আব খাওযা যায না।' এই বলে তিনি হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিযে নেমে কেলো মালীব ক্ষেতে যেতেন এবং দ্দ-চাবটা পাঁড় শসা তুলে আনতেন।

কেলো মালী সেই সময় ঘাপটি মেবে ল্দকিযে থাকত, স্দম্দখে আসত না। তার পবদিন, কেলোমালী এসে ন্যাকামি ক'বে কান্না শ্দব্দ কবত। সে বলত, 'আমি গরীব মান্দষ, আমাব শসা নিলেন? আমি এখন কি কবব।' সেটা কিন্তু মৌখিক ছিল। তাবকদা কখনও কখনও দ্দ-চাবখানি ব্দটি দিতেন। কখনও বা কোনো ভক্ত এলে তাঁকে বলে কেলো মালীকে একটা টাকা বা একখানা কাপড় দেওয়াতেন। এই শসা তুলবার সময কখনও কখনও আমাকেও সঙ্গে নিতেন। সে একটা হাসি তামাশা আমোদেব জিনিস ছিল।

দ্দ'চারটা শসা এনে তারকদাব কি আহ্লাদ। কি হাসি। যেন কত দিগ্বিজয হ'ল। তিনি ঘাড নেড়ে নেড়ে ম্দখ নেড়ে নেড়ে, ডান হাতেব তর্জনী নেড়ে নেড়ে যে হাসি তামাসা কবতেন, তাতে সকলেই বড আনন্দিত হতেন। সে চিত্র এখনও আমাব স্দম্দখে বযেছে। যা হোক সেই কেলো মালীব শসা একটু ন্দন ঝাল দিযে তবকাবী হ'ত।

সদ্‌গ্দব্দ শ্রীবামকৃষ্ণেব বিবহব্যথা এক একদিন শিষ্যদের ম্দহ্যমান কবিযা ফেলে। দীর্ঘশ্বাস আব অশ্র্দজলেব মধ্য দিযা কবেন তাঁহাবা স্মৃতি তর্পণ। বিবহেব মধ্য দিয়াই ভাবময বামকৃষ্ণ-সত্তায় চলে তাঁহাদেব আত্মিক অবগাহন। প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ তাবকনাথেব এমনি এক বিরহখিন্ন দৃশ্যে বর্ণনা কবিযাছেন মর্মস্পর্শী ভাষায : "আমি ববানগব মঠে গেল্দম। মেঘলা কবেছে। ঝিমঝিম বৃষ্টি হচ্ছিল। বড ম্যালেবিযা হওযায সকলেই বাইবে পালিযেছে। শশী মহাবাজ ঠাকুবঘবে সন্ধ্যা-আবতিব উদ্যোগ কবিতেছেন বড ঘবটাতে তাবকদা ও শবৎ মহাবাজ আছেন। তাবকদা দক্ষিণদিকেব দেওযালেতে পিছন করে বাঁ দিকেব হাতে মাথা বেখে বেঁকে শ্দযে আছেন। শবৎ মহাবাজ একটু দ্দবে আধশোযা হয়ে, হাতে মাথা বেখে, শ্দযে বযেছেন। আমি কাছে গিযে বসল্দম।

বৃষ্টিব জল পডায বাগানেব আম পাতা থেকে টোপ টোপ জল গড়াচ্ছে, বাড়ি

নিস্তব্ধ। দু'জনের মুখ ভাবে বিভোর ও বিষাদে পরিপূর্ণ, চক্ষুতে জল ভরে রয়েছে এবং যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। খানিকক্ষণ পরে তারকদা বললেন, 'শরৎ, বাঁয়াটা পাড়ো তো, ঠেকা দাও তো। তারকদা উঠে বসে গাইতে লাগলেন—

হরি গেল মধুপুরী, হাম কুলবালা,
বিপথ পড়ল, সহি। মালতী মালা;
নয়নক ইন্দু তুমি, বয়ানক হাস,
সুখ গেল প্রিয় সাথে, দুঃখ মোহি পাশ।'

তারকদা প্রাণের আবেগে এ বিরহগীত এমন সুন্দর গাইতে লাগলেন যে আমার পর্যন্ত মন দ্রব হয়ে গেল। আর তারকদার ও শরৎ মহারাজের উভয়েরই চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল—'নয়ন জলে বয়ান ভাসে।'

হৃদয় বিদারক বিরহ যে কি জিনিস এবং কৃষ্ণ বিরহে রাধিকা যে অতি করুণ স্বরে বিলাপ করেছিলেন তাহা যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। এইরূপ করুণ স্বরে বিরহ সংগীত প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না। ইহার সহিত সংগীতের বিশেষ সম্পর্ক নেই। এটা হচ্ছে নাদ ব্রহ্ম—যা হৃদয় হতে উদ্ভূত হয়ে কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ হয়েছিল। সেই গাওয়া ও শুনায় আমরা তিনজনেই স্তম্ভিত হয়েছিলাম। অন্তরে যেন বিরহভাবের তরঙ্গ চলতে লাগল। পক্ষান্তরে ইহা তারকদা ও শরৎ মহারাজের সাধকজীবনের অন্যতম রূপ; কারণ তাঁহাদের প্রাণও তখন ভগবান্ লাভের জন্য আকুলি-বিকুলি করছিল। এইজন্য নিজেদের হৃদ্‌গতভাবে তাঁরা নিজেরাই সুর ক'রে ভজন গাইছিলেন।

শেষ সময়ে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শরৎ মহারাজকে বললাম, 'বরাহনগর মঠে, সেই যে ভজন হয়েছিল আর কেঁদেছিলে মনে আছে?'

শরৎ মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন, 'সেটা খুব মনে আছে, প্রাণে বড় ধাক্কা লেগেছিল।'

কয়েক মাসের মধ্যেই বরাহনগরের চরম দারিদ্র্যবরণের পালা শেষ হইল। গৃহী ভক্তেরা এই ত্যাগী সাধকদের মঠে কিছু কিছু সাহায্য দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের পূজা ভোগ ও সন্ন্যাসী আশ্রমিকদের অশন-বসনের কিছুটা সুরাহা হইল।

তারকনাথ ছিলেন স্বভাবতই ধ্যানী, গুরুর দেওয়া সাধন নির্দেশের মধ্য দিয়া নিজের তপস্যা তিনি চালাইয়া যাইতে থাকেন পরম নিষ্ঠাভরে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "প্রথম হইতেই একটা ভাব তাঁহার মধ্যে লক্ষিত হইত। একদিকে যেমন তিনি নির্লিপ্ত ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, কোনো বস্তুতে যেমন তাঁর আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা ছিল না, অপরদিকে তাঁহার অতিশয় উদার ভাব ছিল অর্থাৎ কোনো গণ্ডী বা সীমার ভিতর তিনি থাকিতে পারিতেন না। এই সময় তাঁর মুখে প্রায় এই কথাটা থাকিত—'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ'। এত বিধি নিয়ম পূজা - এসব তাঁহার ভাল লাগিত না। তাঁর ধাতস্থ এসব নয়। 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' ভাবটাই তাঁর খুব প্রবল ছিল। অপর যা' কিছু তিনি করিতেন বটে, কিন্তু সেটা তাঁর প্রাণের জিনিস নয়। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে এবং জীবনের শেষ অবস্থায় এই ভাবটা আরও প্রবলভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল, —যদিও তিনি কোনো বিশেষ ভাবের বিরোধী বা পক্ষপাতী ছিলেন না। এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাবটি-ভবিষ্যতে তাঁর ভিতর ভালবাসা উদ্ভূত করিয়াছিল। এই

ভালবাসা হইতেছে আত্মপ্রসারণ অর্থাৎ নিজের আত্মাকে সর্ববস্তুর মধ্যে দর্শন করা।"

অতঃপর স্বামী শিবানন্দের জীবনে শুরু হয় পরিব্রাজনের পালা। ভারতের বহু তীর্থে তিনি পরিভ্রমণ করেন, হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে তপস্যা করার জন্য মঠ হইতে কয়েকবার নিষ্ক্রান্ত হন।

এসময়কার তিতিক্ষাময় জীবনের নানা কাহিনী তিনি উত্তরকালে ভক্তদের কাছে বর্ণনা করিতেন :

"এমন অনেক সময় গেছে যখন একখানা কাপড়ের বেশী সঙ্গে থাকতো না। সেই এক কাপড়ই অর্ধেক পরে আর অর্ধেক গাঁতি মেরে গায়ে জড়িয়ে পথ চলতাম। পথে চলতে চলতে হয়তো কোনো কুয়োতে স্নান ক'রে, কৌপীন প'রে থেকে কাপড়খানি শুকিয়ে নিতাম। কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুয়ে। তখন মনে তীব্র বৈরাগ্য। শারীরিক আরামের কথা মনেই হোত না। কঠোরতাতেই আনন্দ।"

নিষ্কিঞ্চন পরিব্রাজক জীবনের নানা দুঃখ ও দুর্দশায় সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন তাঁহার ভরসাস্থল, অন্তরালে থাকিয়া তিনিই তাঁহাকে সতত দিয়েছেন আশা আশ্বাস ও আশ্রয়। শিবানন্দ মহারাজ কহিতেন, "এসময়ে ঠাকুরই সর্বদা সঙ্গে থেকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। কখনও অভুক্তও রাখেন নি। অবশ্য এমন দিন গিয়েছে যে খুব সামান্যই আহার জুটেছে। একদিনের কথা বেশ মনে আছে। বিঠুরে যাচ্ছি একজন সাধুকে দর্শন করতে। দুপুরে পথে এক জায়গায় গাছতলায় বিশ্রাম করছি। তখনও খাওয়া হয় নি। নিকটে কোনো লোকালয় ছিল না। এমন সময় পাশের বেলগাছ থেকে একটা পাকা বেল ধুপ ক'রে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল। তখন সেই বেলটি কুড়িয়ে এনে তাই খেয়ে সেদিন কাটিয়ে দিলাম।"

স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় সনাতন হিন্দুধর্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া দেশে ফিরিলেন। রামকৃষ্ণ শিষ্যমণ্ডলীতে আনন্দের বান ডাকিল, এবং সারা ভারতেও অপূর্ব প্রাণতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ মঠ তখন শিক্ষিত দেশপ্রেমিক মানুষ মাত্রেরই দৃষ্টিতে এক পরম গৌরবের বস্তু। এই মঠের উৎসমুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। অন্যান্য গুরু ভাইদের মতো শিবানন্দও এ সময়ে বিবেকানন্দের এই কর্মযজ্ঞের পাশে আসিয়া দাঁড়ান।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, ধ্যানী শিবানন্দ মহারাজ এবার আবির্ভূত হন কর্মযোগী-রূপে। বেদান্ত এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারকল্পে শিবানন্দ এই সময়ে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন। এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী প্রতিভাত হইতেন বেদান্তেরই এক জীবন্ত ভাষ্যরূপে। শিবানন্দের বেদান্ত প্রচার সে সময়ে মাদ্রাজ ও কলম্বোতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তাঁহার কলম্বো কেন্দ্রের ছাত্রী হরিপ্রিয়া (মিসেস পিকেট) তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিতা হইয়া পরবর্তীকালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডে বেদান্তের প্রচারে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন।

বারাণসীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন শিবানন্দের অন্যতম অবদান। তিরোধানের কিছু পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচারের জন্য তাঁহার

রাজার নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত হন। এই টাকা দিয়া বারাণসীতে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত তিনি করেন এবং শিবানন্দকেই দেন ইহার দায়িত্বভার।

আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। শিবানন্দ মহারাজ উপলব্ধি করিলেন, শুধু মৌখিক ভাষণ-দানে তো বেদান্তের তত্ত্ব মানুষের জীবনে প্রতিফলিত হইবে না, ভজন-সাধন ও পূর্ণ বেদান্তের অনুকূল জীবনের আদর্শ দেখাইতে হইবে। তবেই সম্ভব হইবে বেদান্তের প্রকৃত বিস্তার সাধন।

অসামান্য ত্যাগ তিতিক্ষার বলে একাজ তিনি সম্ভব করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ও সহকর্মীদের এই সময়কার তপস্যা ও বৈরাগ্যের আদর্শ কাশীধামে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে চরম দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দশার মধ্যে শিবানন্দকে কাটাইতে হয়। কিন্তু নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তাঁহার ধ্যানগম্ভীর মূর্তিটি সদা বিরাজিত থাকিত অটল মহিমায়। নিত্যকার ধূলি ঝঞ্ঝার ঊর্ধ্বে, দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায়, সর্বসময়ে তিনি অবস্থান করিতেন। এ সময়কার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন :

"কাশীতে যখন রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম হ'ল, তখন কাশীবাসী অনেকেই আপত্তি তুললেন—'অদ্বৈত আশ্রম বলছেন আবার এখানে পূজা হোম ইত্যাদি হচ্ছে কেন? এসব হ'ল অদ্বৈত মতের বিরোধী ভাব।" এইরূপে অনেকেই অনেক প্রকার আপত্তি তুলতে লাগলেন। আমি এতে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। শেষে জিজ্ঞাসুদের বুঝিয়ে দিলুম যে, নীরস অদ্বৈতবাদ– সেভাব এখানে নয়। এখানে হচ্ছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত অদ্বৈতভাব। এখানে বসে বসে সারেমাতে বস্তু থাকবে। অধিকারী হিসাবে অদ্বৈতজ্ঞানও থাকবে, ভক্তি পূজা পাঠ ইত্যাদিও থাকবে। একঘেয়ে অদ্বৈতবাদ হলে প্রাণটা বড় শুষ্ক হয়ে যায়। ভক্তি প্রাণকে সরস রাখবার একটা উপায়। আর কর্মও নিতান্ত আবশ্যক - এও এক বড় সাধনা।"

সহজ ভাষায়, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা সহকারে এমন করিয়া তিনি এই তত্ত্বটি বুঝাইয়া দিলেন যে, কাহারো মনে কোনো প্রশ্ন রহিল না, বিরূপ ভাব রহিল না। রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের বহুকথিত মূল তাত্ত্বিক সূত্রটি—আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—সকলের মনে গ্রথিত হইয়া গেল।

কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে তখন খুব অর্থাভাব। বাড়ি ভাড়াও অনেক বাকী পড়িয়া গিয়াছে। শিবানন্দ মহারাজ বহু কষ্টে একদিন একশত টাকা যোগাড় করিয়াছেন এবং বাড়িওয়ালাকে দিবার জন্য তাহা রাখিয়া দিয়াছেন একটি ভাঙা ক্যাশবাক্সে।

আশ্রমের একটি নবাগত যুবক কর্মীর উপর এই সময়ে রাজারের ভার ছিল। লোভে পড়িয়া সে ঐ টাকাটা আত্মসাৎ করিয়া বসে এবং আশ্রম হইতে পলায়ন করে। সব টাকা নিয়া গিয়াও সে কিন্তু ক্যাশবাক্সে একটি পয়সা রাখিয়া যায়। কোনমতে তাহা দিয়াই সেদিন বাতাসা কিনিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া সম্ভব হইল।

বহু কষ্টে যোগাড় করা টাকাগুলি তো উধাও হইয়া গেল। এখন বাড়িভাড়ার টাকা আসিবে কোথা হইতে। এত টাকা আবার কোথায় পাওয়া যাইবে? এদিকে বাড়িওয়ালাটি অতি দুর্দান্ত লোক, রাগে পাইলে সহজে কাহারেও সে ছাড়ে না। আশ্রমিকেরা প্রমাদ গণিলেন।

বাড়িওয়ালা শিবানন্দ মহারাজকে ডাকাইয়া নেয় এবং টাকা আদায়ের জন্য তাঁহাকে নিজের গদিতে আটকাইয়া রাখে। বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় বাড়িওয়ালার সঙ্গে আপাতত মিটমাট হইল, এবং মহাপুরুষজী আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

বিস্ময়ের বিষয়, যে যুবকটির জন্য এত লাঞ্ছনা, তাহার উপর শিবানন্দ স্বামীর এতটুকু রুষ্টভাব নাই। প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু বলিলেন, "ছেলেটির অভাব হয়েছিল, তাই টাকা নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার ধর্মবুদ্ধি কিছুটা ছিল—তাই তো একটি পয়সা রেখে গিয়েছিল। আর তাতেই ঠাকুরের ভোগ দেওয়া গেল। কাজ তো আটকায় নি!"

শিবানন্দ মহারাজের সেদিনকার এই ক্ষমাসুন্দর রূপ সেদিন মঠের কর্মী ও ভক্তদের হৃদয়ে চির অঙ্কিত হইয়া যায়। এই স্বাভাবিক মহিমা ও অপূর্ব মহাপ্রাণতা ছিল বলিয়াই, শুধু বারাণসীর যুবক মহলেই নয়, পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী মহলেও তাঁহার আত্মিক প্রভাব সে সময়ে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

নিবিড় ধ্যান-তন্ময়তার মধ্য দিয়া তখন মহাপুরুষজীর দিবা ও রাত্রি অতিবাহিত হইত। যে অতীন্দ্রিয় আনন্দ-আস্বাদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনে সম্ভব করিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই নিবিড়ভাবে, নিরন্তর ধারায়, তিনি উপলব্ধি করিতে চাহেন। তাই কোনোদিন ইষ্টদর্শন না হইলে, দিব্য অনুভূতির রসে অন্তর অভিষিক্ত না হইলে, দুঃখের তাঁহার সীমা থাকিত না। বালকের মতো ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেন। আর সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীকে হৃদয়ের বেদনা জানাইয়া খেদোক্তি করিতেন, "চন্দ্র, দিনটা আজ বৃথায় গেল। আজ তাঁর দর্শন পেলাম না—তাঁর জন্য একটু চোখের জলও বেরুল না।"

ধ্যানী সাধকের অন্তরাত্মায় মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে সর্বপ্লাবী ঈশ্বরীয় চেতনা। কঠোরতপা, ধ্যান-গম্ভীর সাধক উদ্বেল হৃদয়ে বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়ান, আর ব্যাকুল কণ্ঠে গাহিয়া চলেন—

তুমি পূর্ণ পরাৎপর ;
তুমি অগম্য অপার,
ওহে নাথ! কার সাধ্য
ধ্যানেতে ধরে তোমায়॥
মনেরে বুঝাই কত
তুমি বাক্য মনাতীত,
তবু প্রাণ ব্যাকুলিত
তোমারে দেখিতে চায়॥

শিবানন্দের কপোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, নয়ন দুটি অর্ধ নিমীলিত। রামকৃষ্ণময় সাধকপ্রবরের এই রসাপ্লুত, প্রেমমধুর মূর্তি যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে চিরতরে।

বারাণসীর আশ্রমে শিবানন্দ মহারাজ সাত বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যা-পূত জীবনের এটি এক সুবর্ণময় যুগ। দিনের পর দিন তখন অদ্বৈত আশ্রমে চরম দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ চলিয়াছে। কোনো দিন ব্রহ্মচারীদের হয়তো আহার জোটে নাই। ক্ষুধার জ্বালায় পাশের বাড়ির বাগান হইতে তাহারা দুই চারিটা পেয়ারা পাড়িয়া খাইয়া আসিয়াছে। এই ত্যাগ তিতিক্ষাময় দিনগুলিতে কিন্তু শিবানন্দ

মহারাজের কঠোর তপস্যা বহিয়া চলিয়াছে অবিরাম ধারায়। সংঘাতময় বাস্তব জীবনের বহু ঊর্ধ্বে, এক অবিচল ধ্যানতন্ময়তায় তিনি আবিষ্ট হইয়া আছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সম্পাদক শরৎ মহারাজ মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া হাসিয়া বলিতেন, "তারকদা, তোমার ধ্যান কি টাকার যোগাড় করতে পারবে? আশ্রমের জন্য শিগ্‌গীর টাকা সংগ্রহে লেগে পড়ো।" কিন্তু একথা শুনিবার মতো মানুষটি তখন যেন হারাইয়া গিয়াছে।

ইহার পর ক্রমাগত কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের ফলে শিবানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। অতঃপর তিনি কাশীর অদ্বৈত আশ্রমের দায়িত্ব অপর একজনের উপর ন্যস্ত করিয়া বেলুড়ে চলিয়া আসেন।

সে-বার ডায়মণ্ডহারবারের একটি বাগ্‌দী ছেলে দীক্ষা নিবার জন্য বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে ভক্তশিষ্যদের সঙ্গে ঐ ছেলেটিও পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া গেল। ভোজন শেষে এক রক্ষণশীল ভক্ত জাত বিচারের কথা উঠাইয়া মঠ সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে থাকেন।

জাত বিচারের এই কথা শিবানন্দ মহারাজের কানে গেল। শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দ্যাখো, এটা ঠাকুরের দরবার। ভগবান্ লাভ, সাধন-ভজন—এই হল এখনকার মূল উদ্দেশ্য। ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি রাখা ও সাধন-ভজন করা, এইটাই হচ্ছে দেখবার জিনিস। বামুন কি কায়েত, কি বাগ্‌দী, একথার কোনো আবশ্যক নেই; কারণ এখানে কুটুম্বিতা করা বা বিবাহাদি দেওয়া বা সামাজিক অন্য কোনো কাজ করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে হল সাধন-ভজনের স্থান, সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে কোনো সংস্রবই নেই। যে ঠাকুরকে মানবে, সাধন-ভজন করবে, সেই এখানে থাকতে পারবে। জাতাজাতির কথাটা এখানে যেন না হয়।"

সে-বার শীতকালে বড়দিনের সময় বেলুড়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এক বিশেষ ভোগ দেওয়া হইতেছে। বহু ভক্ত ও অভ্যাগত প্রসাদ পাইবার জন্য আসিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত শিবানন্দের এ সময়কার একটি আচরণ সম্পর্কে লিখিতেছেন:

"দুপুরবেলায় উঠানে সকলে খাইতে বসিয়াছেন, দালান, আর উঠানের মাঝখানে যে জমিটা সেখানে সকলে জুতা ছাড়িয়া রাখিয়াছেন। তখনও প্রায় শতাবধি লোক দাঁড়াইয়া আছেন, বসিবার স্থান পাইতেছিলেন না। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, ঐ জায়গাটার জুতাগুলি সরাইলে ভক্তেরা বসিতে পারেন। সকলেই এই কথা বেশ চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন; কেহ উঠিয়া নিজের নিজের জুতা সরাইলেন না—মুখে সকলেই আদেশ করিতে লাগিলেন। তারকদা স্বভাবসুলভ বালকভাবে কহিতে লাগিলেন, 'ঠিক তো, ঠিক। জুতাগুলি সরালে এদেরও জায়গা হয়।' এই কথা বলিয়া, কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া সেই জুতাগুলি দুইবাহু ও বক্ষের মাঝে ধরিয়া, দেওয়ালের কোণটাতে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। জুতা উঠাইবার সময় কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, 'কি করেন মহাপুরুষ, কি করেন? আমার জুতায় হাত দিবেন না,' তিনি বলিলেন, 'ওহে। বস, বস—খাও। এই সামান্যর জন্য এত চঞ্চল হবার দরকার নেই, এটা এখনি ক'রে নিচ্ছি।' এইরূপ তিন চারিবার করিতেই জায়গাটা

পরিষ্কার হইয়া গেল। পরে নিজে একটা ঝাঁটা আনিয়া ঝাঁটা দিলেন। তারপর সকলকে নিজ নিজ আসন আনিয়া বসিতে বলিলেন।

যাঁহারা আহারের জন্য উঠানের মাঝে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, 'হাঁ, সত্যকার মহাপুরুষ বটে! কোনো মান, অভিমান নাই।' এই উপাখ্যানটিতে তাঁহার একটি বিশেষ মনোভাবের চিত্র পাওয়া যায়। যিনি উপস্থিত সকলের গুরু বা গুরুস্থানীয়, তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সকলের জুতা দুই বাহু ও বুকের মাঝে রাখিয়া সরাইলেন—কোনোই সঙ্কোচ করিলেন না। তিনি আদেশ করিলে উপস্থিত যে-কোনো ব্যক্তি জুতা সারাইত। কিন্তু তিনি এত বিনয়ী ও অভিমানশূন্য লোক ছিলেন যে, এসব বিষয়ে কোনো প্রাধান্য বা ইতরবিশেষ ভাব তাঁর একেবারেই মনে আসিত না।[১]

কয়েক বৎসর পরের কথা। শিবানন্দজী আবার বারাণসীতে আসিয়াছেন। এসময়ে প্রায়ই থাকেন তিনি ধ্যানমগ্ন, বাস করেন অপার্থিব আনন্দ রাজ্যে। অদ্বৈত আশ্রমের সকলেরই প্রবল ইচ্ছা, তাঁহার একটি ফটো তুলিবেন। বহু অনুরোধের পর তাঁহাকে সম্মত করানো গেল। আসনে উপবেশন করার পর যুক্তকরে তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন, সম্মুখে রাখা হইল একটি কমণ্ডলু। মুহূর্ত মধ্যে মহাপুরুষজী ধ্যানতন্ময় হইয়া পড়িলেন। দৃষ্টি ভ্রূনিবদ্ধ, একেবারে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। ছবি তোলার ব্যাপারটি মহাপুরুষের কাছে তখন গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

এভাবে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইবার পর স্বামী তুরীয়ানন্দ এই সংকটের অবসান করিলেন। ধ্যানাবিষ্ট শিবানন্দজীর গায়ে ধাক্কা দিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "মহা-পুরুষজী, প্রকৃতিস্থ হয়ে বসুন, আপনার ফটো তুলবে যে।"

বার বার ডাকাডাকির পর মহাপুরুষজীর চেতনা ফিরিয়া আসিল। নিদ্রোত্থিতের মতো বলিতে লাগিলেন, "অ্যাঁ অ্যাঁ কি বলছো?" কোনোক্রমে তাড়াতাড়ি করিয়া সেদিনকার ফটো তোলা পর্ব শেষ করা হইল।

শিবানন্দ মহারাজের এই সময়কার জীবন আত্মসমর্পণের সাফল্যে মহিমোজ্জ্বল—গুরুকৃপার দিব্য রসধারায় তাহা অমৃতময়। তাঁহার সমকালীন এক চিঠিতে ইহার আভাস মিলিবে। তিনি লিখিয়াছেন, "তুমি আমার জীবন সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ। আমার জীবনে এমন কোনো বিশেষ ঘটনা নাই যাহা লিখিবার যোগ্য। তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণ দর্শন ও তাঁহার কৃপালাভ। সেও তাঁহারই নিজগুণে! আমার এমন কোনো গুণ ছিল না, যদ্দ্বারা তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারি। তিনি ইচ্ছা করিয়া আমায় দয়া করিয়াছেন—এই মাত্র ঘটনা আমার জীবনে।"

অন্যত্র আবার লিখিতেছেন—"আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস এই মাত্র জানি। তিনি দয়া করিয়া যখন তাঁকে স্মরণ করান তখন স্মরণ করি। যখন পাঠ করান তখন পুস্তকাদি পাঠ করি বা কাহারও কাহারও সহিত ধর্মকথা আলাপ করি—এই আমার কাজ। ভরসা একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা—সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আছে। আর এ জীবনে

১ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান : মহেন্দ্রনাথ দত্ত

আমার কিছুই নাই এবং কিছু আকাঙ্ক্ষাও নাই তাঁহার কৃপায়। আমি এখন প্রভু যেখানে রাখিবেন, সেখানেই থাকিব। নিজের কর্তৃত্ব কিছুই নাই, প্রভু যেরূপ করাইবেন, তাহাই করিব।"

দীর্ঘ অধ্যাত্ম প্রস্তুতির পর শিবানন্দকে সদ্‌গুরু কর্মবৃত্তের মধ্যে টানিয়া আনেন। জীবনের চল্লিশ বৎসর কাটিয়াছে কঠোর প্রব্রজ্যা ও তপশ্চর্যায়। এবার তিনি মঠের কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই মঠ যে ঠাকুর রামকৃষ্ণেরই তৈরি। আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের প্রাণকেন্দ্ররূপে এ যে তাঁহারই সুমহান সৃষ্টি। প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া ঠাকুর স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেরণা দিয়েছেন, এই মঠ ও মিশনকে স্থাপন করিয়াছেন নূতন অধ্যাত্ম ভাবধারার উৎসরূপে। এই ধৃতিটি শিবানন্দের হৃদয়ে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

বড়লাট-পত্নী লেডি মিণ্টো সেবার বেলুড় মঠ পরিদর্শনে আসিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়া উঠেন, "স্বামী বিবেকানন্দই তো রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন। তাই না?" শিবানন্দ মহারাজ উত্তর দিলেন, "না—তা কেন? প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই সঙ্ঘ আমরা কেউ সৃষ্টি করিনি! ঠাকুরের অসুখের সময় এই সংঘ তিনি নিজেই সৃষ্টি করেন। সেই সময় তিনি নিজে স্বামীজী এবং আর সকলকে শিক্ষা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কি ক'রে এই সঙ্ঘ গঠন ও চালনা করতে হবে তা শিখিয়েছিলেন। সেই হল মঠের গোড়াপত্তন।"

জীবন-প্রভুর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এইবার তিনি নিষ্ঠা সহকারে আঁকড়িয়া ধরিলেন। জপ ধ্যান ও প্রব্রজ্যার শেষে তাঁহার জীবনে শুরু হইল কর্মযোগের নবতম অধ্যায়।

পূর্বের পরিব্রাজক জীবন ও তপস্যার কথা কেহ উল্লেখ করিলে তিনি কহিতেন, "এক সময় এ সব খুব করা গেছে। এখন তো ঠাকুর আমাদের কর্মবৃত্তে টেনে এনেছেন। তাঁর যুগধর্ম প্রচারের জন্য এইরূপই প্রয়োজন হয়েছে। তাই এখন এই বুড়ো বয়সে আমাদের দ্বারাও ঠাকুর তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। আমরা তো ভেবে-ছিলাম যে, তপস্যা ক'রেই জীবন কাটিয়ে দেব করেছিলামও তাই। কিন্তু ঠাকুর তা করতে দিলেন কোথায়?"

ভক্তজনের জন্য বাবুরাম মহারাজের ছিল প্রাণভরা স্নেহ ভালবাসা—মঠ ও জনসাধারণের মধ্যে হৃদয়যোগ তিনি স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর দেখা গেল, বহিরাগত ভক্তের দল ক্রমে ক্রমে মঠের সহিত যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। বাবুরাম মহারাজ নাই, আর কে তাহাদের দরদভরা দৃষ্টি নিয়া দেখিবে? কে আদর-যত্ন করিবে? সাধন-নির্দেশই বা এত উৎসাহ করিয়া কে দিবে? অনেকে মঠে আসা বন্ধও করিয়াছেন।

এক রাত্রিতে কিছুসংখ্যক যুবক ভক্ত বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। আরতির পর তাঁহারা নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় শিবানন্দজী আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "আচ্ছা তোমরা আজকাল আর আগের মতো মঠে আসছো না কেন? আগে যেমন মঠে আসতে এখনও তেমনি এসো। জেনো, বাবুরাম মহারাজ তোমাদের যেমন ভালবাসতেন, আমিও তোমাদের তেমনি ভালবাসি।"

এই ধ্যান-গম্ভীর মহাপুরুষের অন্তর্লোকে এমনতর প্রেমের ফল্গু বহিতেছে একথা জানিয়া যুবক ভক্তদল বিস্মিত হইলেন। ইহার পর হইতে বহু মুমুক্ষু ও ভক্ত সাধক শিবানন্দের স্নেহচ্ছায়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইতে থাকে। বহুতর প্রাণ-শিখা তাঁহার অধ্যাত্ম-জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

শিবানন্দ বিশ্বাস করিতেন, রামকৃষ্ণ মণ্ডলী ও বেলুড় মঠ তাঁহার প্রভু রামকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় ও প্রেরণায় সৃষ্ট। মনে প্রাণে সদাই তিনি আশা করিতেন, এই মণ্ডলী ও মঠ হইবে অধ্যাত্ম-শক্তির এক বিরাট উৎস। তাই নিষ্ঠাভরে নিজের আত্মিক সাধনা ও কর্মসাধনাকে এই মঠের সহিত একান্তভাবে তিনি যুক্ত করিয়া দিলেন। নিজে যেমন সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনায় সদা বিভোর থাকিতেন তেমনি মঠের কর্মী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের মধ্যেও বিস্তারিত করিতেন সেই চিন্তা ও সাধনার ধারা।

অধ্যাত্ম-আলোচনা প্রসঙ্গে যে কোনো ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ও ভক্তের চেতনাকে তিনি অবলীলায় ঊর্ধ্বতর স্তরে নিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সৎপ্রসঙ্গ ও সাধনতত্ত্বের স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

কোনো গৃহস্থ ভক্ত একবার বলিতেছিলেন, "মহারাজ, জীবনে কত পাপ করেছি। আপনি মহাপুরুষ। আমায় কৃপা করুন।"

শিবানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি আর কি পাপ করেছ, বাবা? তুমি কি ঠাকুরের কথা শোন নি? ঠাকুর প্রায়ই বলতেন, পাপ—তুলোর পাহাড়। পাহাড়প্রমাণ তুলো যেমন সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গেই অচিরে ভস্মীভূত হয়, তেমনি ভগবানের কৃপাকণা লাভে পাহাড়প্রমাণ পাপও ধ্বংস হয়ে যায়। তোমার কোনো ভয় নেই। তাঁকে ডাক, তাঁর নাম করো। আর কিছু করতে হবে না।"

রাঁচীর ভক্তগণ একবার শিবানন্দ মহারাজকে তাঁহাদের উৎসবে নিয়া গিয়াছেন। এটি ছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুণ্য-জন্মতিথি উৎসব। শিবানন্দজী ইষ্টদেবের পূজায় উপবিষ্ট হইলেন। দীর্ঘকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া ঠাকুরের চরণে পুষ্পবিল্বদল দিয়া যখন পূজাকক্ষের বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার দেহ ভাবাবেশ ও দিব্য অনুভূতিতে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, নয়ন দুটি রক্তবর্ণ। এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী সেই সময়ে আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়েন।

শিবানন্দজী প্রশ্ন করিলেন, "কি চাই?" মহিলা ভক্তটি করজোড়ে কহিলেন, "মুক্তি।"

ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, "আচ্ছা তা হবে। আমি ঠাকুরকে বলব।" প্রত্যয় ও করুণার দীপ্তিতে তাঁহার আননখানি তখন সমুজ্জ্বল।

এই সময়ে এক উপদেশপ্রার্থী ভদ্রলোক তাঁহাকে বলিতেছিলেন, "ঠাকুরের নামই তো শুনেছি, তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য তো আমাদের হল না, মহারাজ!"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "সে কি কথা? যাঁরা ভগবানের পুত্রকে দেখেছে, তারা যে ভগবানকেও দেখেছে! আমি আর আমার পিতা যে একই।" এই তেজোদৃপ্ত বাণী শুনিয়া সকলে নির্নিমেষে সম্ভ্রমভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বহুদিন আগের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র, রাখাল, তারক প্রভৃতিকে বলিতেছিলেন, "দ্যাখ্, কালে তোদের বহু লোককে দীক্ষা দিতে হবে।"

তারক বলিয়া উঠিলেন, "আমি কিন্তু ওসব পারবো না।"

ঠাকুর তখন উত্তর দিয়াছিলেন, "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। পরে দেখা যাবে। তুই এখন অত ভাবিস্ কেন?"

সেই ঐশ ইচ্ছা এইবার বুঝি রূপায়িত হইতে থাকে। এতদিন শিবানন্দ মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। মুমুক্ষু ভক্তেরা কত কাঁদাকাটি করিয়াছে, প্রবীণ গুরু-ভ্রাতারা বার বার অনুরোধ উপরোধ করিয়াছেন, তিনি সে সব কানে তোলেন নাই। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা পরিভ্রমণের কালে, দীক্ষাদান সম্পর্কে তাঁহার মত পরিবর্তিত হয়, সম্মত হন মুমুক্ষুদের সাহায্য দানে।

ঢাকা শহর ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের অনেক ভক্ত স্বামী শিবানন্দের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান দীক্ষার জন্য। শিবানন্দজীর মন এবার নরম হয় এবং কয়েকদিন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান তাঁহার নির্দেশের জন্য। এ নির্দেশ তিনি লাভ করেন, এবং মঠ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট আদেশপ্রার্থী হইয়া তিনি এক পত্র লিখেন।

ব্রহ্মানন্দজী উল্লসিত হইয়া উত্তর দেন, "খুব দিন, প্রাণ খুলে দীক্ষা দিন। আপনার কাছে যারা দীক্ষা পাবে তাঁদের জীবন তো ধন্য হয়ে যাবে।"

শিবানন্দ মহারাজ এই সময়ে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, ঢাকাতে আমি প্রায় দেড়মাস ছিলাম। সেখানে অনেক নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁহার নাম পাইয়াছে। সে সময় ঠাকুরের প্রেরণায় আমার ভিতরও একটি ভাব আসিয়াছিল।"

মঠের নবীন ব্রহ্মচারীদের উপদেশ দিতে গিয়া শিবানন্দজী উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিতেন,[১] "খুব ডেকে যাও, খুব তাঁর নাম ক'রে যাও। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে পড়ে থাক—যখন যা দরকার তিনি সব দেবেন। পবিত্রতা ধর্মজীবনের ভিত্তি। পবিত্র হৃদয়ে ভগবান্ শীঘ্র প্রকটিত হন, কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকার চেষ্টা করো। এখন তো তোমাদের ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবন বড়ই পবিত্র। ঠাকুর পবিত্রহৃদয় ও বিষয়-বাসনাহীন ছেলেদের খুব ভালবাসতেন। যার মনে বিষয়ের দাগ লাগেনি তার শীঘ্র শীঘ্র চৈতন্য হবে। আর দরকার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। যেমন বললাম, সরল প্রাণে সব বিশ্বাস করে নিয়ে ঠিক তেমনিভাবে সাধনায় লেগে যাও। দেখবে তাঁর দয়া হবে—খুব আনন্দ পাবে। আসল কথা কাজ করতে হবে। ঠাকুর বলতেন—'খালি সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে তো নেশা হবে না। সিদ্ধি আনতে হবে—পরিশ্রম ক'রে ঘুঁটতে হবে, সিদ্ধি খেতে হবে—তবেই নেশা হবে।' তেমনি ভগবানের নাম করো, তাঁর ধ্যান করো, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো—আন্তরিকভাবে, তবেই আনন্দ পাবে।"

সে-বার একটি মহিলা ভক্ত মহাপুরুষের কাছে নিবেদন করেন, "বাবা, আমাদের কি করে উদ্ধার হবে? কি ক'রে এ মায়া থেকে মুক্ত হব? আপনি একটু আশীর্বাদ করুন।"

তিনি এ কথার উত্তরে স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিতে লাগিলেন, "দ্যাখো, আসল কথাটা কি জানো, এ সংসার যে অনিত্য, এ বোধ তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না। একমাত্র ভগবানের

---

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন।

শরণাগতি ছাড়া এ-মায়া জাল কাটাবার অন্য কোনো উপায় তো নেই মা! শ্রীভগবান নিজেই গীতাতে বলেছেন—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

—এই যে দৈবী মায়া, যা জীবকুলকে মোহিত ক'রে রেখেছে, তা বাস্তবিকই দুস্তরা, এ মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন। কিন্তু যারা অনন্য মনে আমায় ভজনা করে, তারা এই দৈবী মায়া অতিক্রম করতে পারে, এ মায়ার হাত থেকে অব্যাহতি পায়।'

"অনন্য মনে তাঁকে ডাকা ছাড়া আর তো জীবনে কোনো উপায় নেই। তোমরা সংসারে রয়েছে, নানা কাজকর্ম আছে। তোমাদের তো সাধনভজন করবার মতো সময় নেই। তোমরা তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক আর কাঁদ। কেবল কাঁদ আর প্রার্থনা করো, 'প্রভু দয়া করো, দয়া করো।' কাঁদতে কাঁদতে মনের ময়লা ধুয়ে যাবে। তখন তিনি সহস্র সূর্যপ্রভায় প্রতিভাত হবেন; তখন দেখবে যে তিনি অন্তরেই রয়েছেন। খুব কাঁদবে আর মধ্যে মধ্যে সদসৎ বিচার করবে। একমাত্র ভগবান্‌ই সত্য আর সংসারের জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ সবই অনিত্য। এইরকম বিচার আর প্রার্থনা করতে করতে তবে তাঁর দয়া হবে, সংসারের প্রতি ঘৃণা জন্মাবে এবং মন শ্রীভগবানের দিকে যাবে।"

সাধারণভাবে মঠের ভক্ত সাধকেরা শিবানন্দ স্বামীর ধ্যানপরায়ণ, গম্ভীর রূপটির সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু নবীন ভক্তদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে গিয়া হাসি-তামাশাও তিনি কম করিতেন না। মহেন্দ্রনাথ দত্তমহাশয় এ সম্পর্কে বলিয়াছেন:

"হাসি-তামাশার ভিতরেও একটা বিশেষত্ব দেখতুম, যদিও তিনি নানা রকম রঙ্গভঙ্গী ক'রে নিজে হাসচেন বা অপরকে হাসাচ্ছেন, কিন্তু তা হলেও তাঁর মনটা আর একদিকে রয়েছে। মুখে তিনি এক বলছেন—মন কিন্তু আর এক দিকে।' উনি সেটা এমনভাবে বলছেন যে তাতেও আর একটা বড় উচ্চভাব রয়েছে।। আবার এই রঙ্গভঙ্গী করবার মুহূর্তেক পরেই তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন পুরুষ হইয়া যাইতেন, তখন আর পূর্বের সে গলার আওয়াজ নাই, চোখের আর সে চাউনি নাই, মুখের আর সে ভাবও নাই। সহসা এক গম্ভীর ধ্যাননিমগ্ন ব্যক্তির বিকাশ পাইল এবং যাহারা পূর্বে তারকদার চাপল্যের কথা শুনিয়া হাস্য-কৌতুক করিতেছিল তাহারাও তারকদার এই আশ্চর্য ভাব পরিবর্তনে স্তম্ভিত ও সংযত হইয়া যাইল।

"আজীবন কাল আমি তারকদাকে দেখিয়াছি যে, তিনি জগৎ হইতে সব সময় যেন পৃথক বা বিচ্যুত রহিয়াছেন। এইটিই তাঁহার স্বাভাবিক ভাব ছিল। এই জন্যই বোধহয় জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি বিশেষ কিছু কার্য করিতে পারেন নাই এবং সকলে তাঁহাকে যতটা উচিত ততটা শ্রদ্ধা করে নাই। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে যখন এই ভাবটি ঘনীভূত হইয়া বেশ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল তখন তাঁহাকে সকলেই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া সম্মান করিতে লাগিল। যাহা হউক তিনি সকল ভাবই বুঝিতেন, সকল ভাবকেই শ্রদ্ধা করিতেন, কোনো ভাবের বিরোধী ছিলেন না। তবে তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ ধ্যানী ভাবটি তাঁহার প্রিয় ছিল—এই মাত্র। এইজন্য তিনি

তাণ্ডবনৃত্যে বা অন্য প্রকার ভাবেতে ততটা মিশিতেন না, দূরে ইহতে সমস্ত দেখিতেন। তিনি ধ্যানী ছিলেন—কীর্তনী ছিলেন না।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসিতেছে কত ভক্ত, কত মুমুক্ষু। ইহাদের দেখিয়া শিবানন্দজীর আনন্দের অবধি নাই। এক সুশিক্ষিত মুসলমান ভক্ত ঠাকুরের নাম নিয়া সাধনা করেন, কৃপাও কিছু পাইয়াছেন। সপরিবারে শিবানন্দ মহারাজের কাছে আসিয়া সেদিন তিনি উপস্থিত। এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে শিবানন্দ হর্ষভরে একদিন বলিয়াছিলেন :

'ভক্ত মুসলমান ভদ্রলোকটি বলিলেন, আপনাকে দর্শন করতে এসেছি। আমার স্ত্রী বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে এসেছেন। তাঁর কিছু বলবার আছে।' এই বলে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রী তখন খুব ভক্তিভরে আমায় প্রণাম ক'রে অনেক প্রাণের কথা বললেন। তিনি বাল্যকাল হতেই কৃষ্ণভক্ত, শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপাল ভাবে ভজনা করেন, এবং দর্শনাদিও মাঝে মাঝে পান। তারপর ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ পড়ে ঠাকুরের উপর তাঁর খুবই ভক্তি হয়েছে। তাঁর ধারণা, তাঁর ইষ্টদেবই রামকৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেখলুম যে ঠাকুরের উপর অগাধ ভক্তি। বেশ সাধন-ভজন করেন। ঠাকুরও নানাভাবে তাঁকে কৃপা করেছেন। শেষটায় বিদায় নেবার সময় হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে বললেন—'আমার মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করুন। আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করেছেন, তাঁর কৃপা পেয়েছেন। আপনার যে হাত শ্রীরাম-কৃষ্ণকে স্পর্শ করেছে সে হাত আমার মাথায় একটু দিন।' আর কি কান্না! আমার তো কেবল মনে হতে লাগল 'ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা!' তোমার কে বুঝবে বল? সেই শিব-মহিম্নঃ স্তোত্রের কথা মনে হল—

তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ॥

'—হে মহেশ্বর, তুমি যে কিরূপ—তোমার তত্ত্ব কি, তাতো আমি জানি না। হে মহাদেব, তুমি যেরূপই হও সেইরূপ তোমাকেই ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার।' বাস্তবিক ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের ঐ কথাই বলতে হয়। তাঁকে কে বুঝবে? ঠাকুরের আরও অনেক মুসলমান ভক্ত দেখেছি। একজন দেখলুম কাড়াপায়। খুব মানী লোক, গভর্নমেন্ট খান খানবাহাদুর খেতাব দিয়েছে। ওঁরা সুফী সম্প্রদায়ের কিন্তু ঠাকুরের উপর খুব ভক্তি। ওখানে ঠাকুরের একটি ছোট আশ্রম আছে। ঐ খান বাহাদুর এবং স্থানীয় কালেক্টর—তিনিও মুসলমান—প্রভৃতি পাঁচজনে চেষ্টা ক'রে এ আশ্রমটি করেছিলেন। আমরা তিন চারদিন ওখানে ছিলুম। প্রায়ই দেখতুম, কি সকালে, কি বিকেলে, সেই খান বাহাদুর ঠাকুরমণ্ডপের এক কোণে বসে আছেন খুব দীনহীন ভাবে, আর এক দৃষ্টে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ধারণা যে, তাঁদের পয়গম্বর মহম্মদই এবার রামকৃষ্ণরূপে জগতের কল্যাণের জন্য এসেছেন। এমনি ক'রে কত ভাবে যে ঠাকুর কত লোককে কৃপা করেছেন, তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।"

সেদিন এক গৃহস্থ ভক্ত সাধন-ভজন ও জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে শিবানন্দ মহা-

রাজের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, "ঠাকুরের কথাতেই তো আছে সংসারে সব কাজ করবে কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরে। যেমন বড়মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু সারাটি মন পড়ে আছে দেশে নিজের বাড়ির দিকে। তেমনি সংসারে থাকতে হবে অনাসক্ত হয়ে। স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন সকলেরই সেবাযত্ন করবে, কিন্তু প্রাণে প্রাণে জানবে যে তোমার একমাত্র আপনার জন শ্রীভগবান্। তিনি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই। তা বলে স্ত্রীপুত্রদের অবহেলা করবে না। তাদের ভগবানের প্রেরিত জীবজ্ঞানে, ভগবানের অংশজ্ঞানে যথাশক্তি সেবা করবে। তাদের সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ করবে।

"সংসারে থাকবে; কিন্তু মন যেন সংসারে আবদ্ধ হয়ে না থাকে। আর ঠাকুর বলতেন—'বিচার করা খুব দরকার। সংসার অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য ও সত্য বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় এই পর্যন্ত। কিন্তু তাতে ভগবান্ লাভ হয় না। অতএব টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার।' খুব বেশী সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে স্থান পেতে দিও না। সাধারণভাবে জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত তো ক'রে নিয়েছ, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। মনের স্বাভাবিক গতিই নিম্নদিকে—কামকাঞ্চন ও মানযশের দিকে। সেই ছড়ানো মনকে গুটিয়ে এনে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে লীন করতে হবে। জীবনে মানুষের সব চাইতে বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে ভগবান্ লাভ। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মনে সর্বক্ষণ ধরে রাখবে এবং সে লক্ষ্যে যাতে পেঁছিতে পারো তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।"

তরুণ সাধকদের পক্ষে মনকে শান্ত করিয়া গুটাইয়া আনা, ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়া একটা বড় সমস্যা। এ সম্পর্কে তাঁহাদের উৎসাহ দিয়া বলিতেন, "এজন্য মোটেই ভেবো না। অশান্ত মনকেও ক্রমে শান্ত করে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করা যেতে পারে। ধ্যান জপ করতে আসনে বসে তখনই জপ বা ধ্যান শুরু করো না। প্রথমটায় ধীর-ভাবে বসে ঠাকুরের নিকট কাতর প্রার্থনা করবে। ঠাকুর হলেন জীবন্ত সমাধিস্বরূপ, তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা ক'রে তাঁকে চিন্তা করলেই মন সমাহিত হয়ে যাবে। বলবে—'প্রভু, আমার মন স্থির ক'রে দাও।' এই ভাবে খানিকক্ষণ প্রার্থনা ক'রে ঠাকুরের সমাধির কথা ভাববে। তাঁর যে ছবি দেখছো, এ ছবি খুব উচ্চ সমাধি অবস্থার ছবি। সাধারণ লোক এ ছবির কোনো তাৎপর্য বুঝতে পারে না। পরে চুপচাপ বসে মনকে লক্ষ্য করতে থাকবে যে, মন কোথায় ছুটে যায়। তুমি তো আর মন নও। মন হল তোমার, তুমি মন হতে স্বতন্ত্র আত্মস্বরূপ। ধীরভাবে দ্রষ্টার মত বসে মনের গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে যাবে। অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করার পর মন আপনা হতেই শান্ত হয়ে পড়বে। তখন মনকে ধরে এনে ধ্যানে লাগাবে। যতবার মন পালিয়ে যাবে ততবারই মনকে ধরে নিয়ে আসবে। এই রকম করতে করতে দেখবে যে, মন ক্রমে ক্লান্ত হয়ে যাবে। তখন খুব প্রেমের সহিত ভগবানের নাম জপ করবে, তাঁর ধ্যান করবে। কিছুদিন ঠিক যেমন ক'রে বল্লুম তেমনি ক'রে যাও দেখবে যে, মন তোমার বশে এসেছে। তবে কিন্তু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য নিয়মিত ভাবে এটি ক'রে যেতে হবে।"

"ভগবান্ লাভের ব্যাকুলতা একদিনে আসে না এবং তাঁর কৃপা ছাড়াও হয় না।

সেজন্য নিত্য অভ্যাস করতে হয়—আর কেঁদে কেঁদে প্রাণের আবেগ জানাতে হয়—'প্রভু, দয়া করো, আমি সাধারণ মানুষ। তুমি দয়া করে দর্শন না দিলে আমার সাধ্য কি যে তোমার দর্শন পাই! কৃপা করো প্রভু। এই দুর্বলকে কৃপা করো'—এভাবে নিত্য প্রার্থনা করবে। যত তাঁর জন্য কাঁদবে তত মনের ময়লা ধুয়ে যাবে। আর সেই স্বচ্ছ মনে শ্রীভগবান্ প্রতিভাত হয়ে উঠবেন। তোমরা সাধু হয়েছ, তাঁর নাম ক'রে ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছ—তাঁর উপর তো তোমাদের দাবি আছে। ঠাকুরকে খুব আপনার ভেবে তাঁর উপর জোর করবে। দয়া করবেন বলেই তো তিনি তোমাদের মা বাপের কোল থেকে টেনে এনেছেন এবং তাঁর আশ্রয়ে তাঁর সঙ্গে স্থান দিয়েছেন।

"পড়ে থাকো, বাবা, শরণাগত হয়ে পড়ে থাকো তাঁর দুয়ারে। পওহারী বাবা যেমন স্বামীজীকে বলেছিলেন, 'গুরুকে দুয়ারমে কুত্তেকে মাফিক পড়ে রহো।' স্বামীজী এ কথা আমাদের অনেকবার বলেছিলেন। কুকুর যেমন কখনও প্রভুর বাড়ি ত্যাগ করে না, তাকে খেতে দাও আর নাই দাও, মারো আর যাই করো, সে যেমন কখনও প্রভুর বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না, তেমনি আমাদেরও প্রভুর দ্বারে একনিষ্ঠভাবে, তাঁর শরণাগত হয়ে, পড়ে থাকতে হবে। ভাল খেয়ে হোক, মন্দ খেয়ে হোক, মিঠে খেয়ে হোক বা তেতো খেয়ে হোক, যো-সো ক'রে যে শেষ পর্যন্ত তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাকতে পারবে তার হয়ে যাবে।

"তোমরা ঠাকুরের আশ্রয়ে রয়েছ, তাঁর সঙ্গে স্থান পেয়েছ, তোমাদের আর ভাবনা কি? ঠাকুর যেমন বলতেন, 'বাপ যে ছেলের হাত ধরেছেন, সে ছেলের আর পড়বার ভয় থাকে না।' তেমনি যতদিন এ সঙ্ঘে তাঁর আশ্রয়ে থাকবে—ততদিন কোনো ভয় নেই, তিনি ঠিক তোমাদের উদ্ধার করবেন—নিশ্চয় জেনো।"

ভগবৎ-দর্শন ও পরম শান্তি লাভ সম্বন্ধে এক তরুণ মুমুক্ষু প্রশ্ন তুলিয়াছেন। উত্তরে শিবানন্দজী প্রশান্ত স্বরে বলিলেন:

"দ্যাখো বাবা, শান্তি লাভ করা অত সোজা কথা নয়। এ রাস্তা খুবই কঠিন—খুব কণ্টকাকীর্ণ—

'ক্ষুরস্য-ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥'

—ক্ষুরের ধার যেমন তীক্ষ্ম ও দুরতিক্রমণীয়, তত্ত্বদর্শীরা সেই আত্মসাক্ষাৎকারের পথকে সেইরূপে দুর্গম বলে থাকেন। এসব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের কথা। এ বড় দুর্গম পথ। বাইরে থেকে যত সোজা বলে মনে হয়, ততটা সোজা নয়—অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। কিন্তু আন্তরিকভাবে যদি তাঁকে চাওয়া যায়—তবে তাঁর কৃপা হয়, এও সত্যি। ঠাকুরের জীবনীতে পড়েছ তো, তাঁকেই কত কঠোর সাধনা করতে হয়েছিল। তবে তো মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি সবই লোকশিক্ষার জন্য করেছেন, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। "ভগবানের উপর অনুরাগ না এলে কিছুই হবে না। আন্তরিক টান চাই। ঠাকুর যেমন বলতেন, তিন টান এক হলে ভগবান্ লাভ হয়—সতীর পতির উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর কৃপণের ধনের উপর টান। এই তিনটান এক হলে যতটা ব্যাকুলতা জন্মায়, সেই পরিমাণ ব্যাকুলতা যদি কারু প্রাণে আসে তবেই তার ভগবান্ ও শান্তি লাভ হয়।"

এক ব্রহ্মচারী সেদিন তাঁহার কাছে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, ঠাকুর তো

বলেছেন, সাধুব পক্ষে স্ত্রীলোকেব পট পর্যন্ত দেখতে নেই, কিন্তু আমাদের তো নানা কাজকর্মে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত বলতে হয়। এসব অবস্থাব ভেতব আমাদেব কিভাবে থাকতে হবে ?"

মহাপুরুষ কিছুটা মৌন থাকিয়া বলেন, "দ্যাখো, বাবা, বাড়িতে যখন ছিলে তখন মা বোন ছিল তো ? মা, বোনেদেব সঙ্গে যেমন সবল প্রাণে মেলামেশা কবতে, ঠিক সেই বকম মন নিযে এখানে স্ত্রীলোকদেব সঙ্গে প্রযোজন মতো কথাবার্তা বলবে। মনে মনে ভাববে যে তাবা তোমাব মা, বোন। অবশ্য বিশেষ প্রযোজন ছাড়া এমন কি ভক্ত স্ত্রীলোকদেব সঙ্গেও কথাবার্তা না বলাই ভাল—বিশেষ ক'রে আলাদাভাবে। পাঁচজনেব সামনে কাজকর্মেব কথা বলতে পাব। তোমবা সাধু হতে এসেছ, নিজেব ভাব বজায বেখে, নিজ আদর্শেব দিকে দৃষ্টি বেখে সর্বদা চলবে। নাবী জাতিকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীব অংশ ব'লে জ্ঞান কববে। এই হল সাধনা।"

"কিন্তু তাতেও যদি মনে কুভাব আসে তো কি কবব মহাবাজ ?"

মহাপুরুষজী তদুত্তবে একটু দৃঢ়স্ববে বললেন,—"যেখানে সেখানে মেযেমানুষ দেখলেই যাদের মনে কুভাবের উদয হয় তাবা সাধু হবাব তো উপযুক্ত নযই এমন কি লোকসমাজে থাকাবও উপযুক্ত হয়নি। তাদেব উচিত এমন কোনো নিভৃত স্থানে চলে যাওযা যেখানে স্ত্রীলোকেব কোনো সংস্রব নেই এবং সেখানে দীর্ঘকাল কঠোবভাবে জীবন যাপন ক'বে মনেব ঐ সকল পশুপ্রবৃত্তি সমূলে ধ্বংস ক'বে তবে লোকসমাজে আসা উচিত। সমাজেবও একটা নিযম আছে, একটা শৃঙ্খলা আছে।"

জপেব কার্যকাবিতাব উপব শিবানন্দ মহাবাজ সব সমযেই গুরুত্ব আবোপ কবিতেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইযা এক ভক্তকে বলিযাছিলেন, "প্রীতিব সঙ্গে বার বাব নাম কবাই জপ। তাই কববে, কবতে কবতে আনন্দ পাবে। জপেব বিশেষ কোনো নিযম নেই—সব সমষ চলতে, ফিবতে, খেতে, শুতে, শযনে স্বপনে জাগবণে সর্বাবস্থাযই জপ কবা চলতে পাবে। আসল জিনিস হল—প্রেম। যত প্রেমভবে তাঁব নাম করবে তত বেশী আনন্দ পাবে। তিনি যে অন্তর্যামী—তিনি দেখেন প্রাণ। প্রাণে ব্যাকুলতা এলে—ব্যাকুল হযে তাঁকে ডাকলে—সঙ্গে সঙ্গে ফল প্রত্যক্ষ কববে। বালক যেমন মা-বাপেব কাছে আব্দাব ক'বে কাঁদে, ঠিক তেমনি ক'বে তাঁব কাছে বিশ্বাস ভক্তি প্রেম চাও, নিশ্চয পাবে। তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা, পতিত পাবন, কলিকল্মষহাবী, পবম কারুণিক, ভক্তবৎসল ও প্রেমময। খুব তাঁব নাম ক'বে যাও। সব সময তো যতটা পাব জপ কববেই ; কিন্তু বিশেষ ক'বে সকালে সন্ধ্যায় নিযম ক'বে, নির্দিষ্ট সমযে, একই স্থানে বসে জপধ্যান কবা খুব দবকাব। তাই কবো।"

এ সম্পর্কে আব একদিন আবো বিশদ কবিযা কহিলেন, "জপ তিন বকমে করা যেতে পাবে। মালাতে, হাতেব কবে বা মনে মনে। মনে মনে জপ কবাই সর্বশ্রেষ্ঠ জপ। তুলসীদাস বলেছেন, 'মালা জপে শালা, কব জপে ভাই, মন জপে তো বলিহাবি যাই। মনে মনে জপ কবাব অভ্যাস কবলে চলতে ফিবতে, খেতে শুতে সব সমযই জপ কবা যেতে পাবে। কিছুকাল ঐভাবে মানস জপেব অভ্যাস কবলে তখন অমনি ঘুমেব সমযও জপ ঠিক চলতে থাকবে এবং সর্বক্ষণ মনে একটা আনন্দেব ধাবা বইবে। তবে প্রথম প্রথম সংখ্যা রেখে জপ কবা ভাল ; এবং নিষ্ঠাব সঙ্গে প্রতিদিন অন্তত

দ্‌বাব ক'রে আসনে বসে নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ কববে, আব এক একবাবে হাজাবেব যেন কম না হয়—তার বেশী যত পাবা যায় ততই ভাল। সংখ্যা ক'রেও বাখা চলে বা মালাযও রাখা যায।

"ঠাকুর বলতেন, 'নাম নামী অভেদ' ইষ্টমন্ত্র জপেব সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্তিও চিন্তা কববেন। এইভাবে জপ ও ধ্যান এক সঙ্গেই হতে পাবে। ভগবান্ অন্তর্যামী—তিনি দেখেন প্রাণ। তিনি সংখ্যাও দেখেন না, সময়ও দেখেন না। ঠিক ঠিক আন্তবিকভাবে একবাব যদি ভগবানেব নাম নেওয়া যায়, তাতে উড়ো-উড়ো মন নিযে লক্ষ জপেব চাইতেও বেশী ফল হবে। চাই ইষ্ট চিন্তাব তীব্রতা, চাই ব্যাকুলতা আব চাই আন্তবিকতা। প্রাণে ব্যাকুলতা এলে শীঘ্রই হযে যাবে। এসব একদিনে হয় না—বোক ক'রে লেগে পড়ে থাকতে হয়, ক্রমে সব হয়।"

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায সতেব বৎসব স্বামী শিবানন্দ বেলুড়ে থাকিযা মঠ ও মিশনেব দাযিত্ব-পূর্ণ পবিচালনা কার্যে আত্মনিযোগ কবেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইতিপূর্বে বাব বাব তাঁহাকে অনুবোধ জানাইযাছেন—তপস্যায নিমগ্ন না থাকিযা তিনি যেন মঠ ও মিশনেব কল্যাণকর্মে আগাইযা আসেন। কিন্তু ধ্যানী সাধক শিবানন্দকে তখন এ বিষযে তেমন উৎসাহী হইতে দেখা যায নাই। কাশী অদ্বৈত আশ্রমেব সংগঠনে, মিশনেব বিভিন্ন ত্রাণ কর্মে, বামকৃষ্ণ বাণীব প্রচাবে মাঝে মাঝে তিনি দাযিত্বভাব গ্রহণ কবিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু একটানাভাবে মঠ ও মিশনেব পবিচালনাকে কিছুটা এড়াইযা গিযাছেন। এবাব তাঁহাব পূর্বতন মানসিকতাব পবিবর্তন দেখা দিল।

এ প্রসঙ্গে শিবানন্দ মহাবাজেব জীবনীকাব স্বামী অপূর্বানন্দ লিখিযাছেন, "মহাপুরুষজীব জীবনেব যেন একটি নূতন অধ্যায আবম্ভ হইল; যিনি প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসব কাল অনেক সমযেই প্রব্রজ্যা ও নির্জনবাসে কাটাইযাছিলেন—কোনো প্রকাব গুরুদাযিত্বপূর্ণ কাজে জড়িত হইতে যেন দ্বিধা বোধ কবিতেন, এইবাব তিনিই স্বামী ব্রহ্মানন্দেব নির্দেশে ঠাকুবেব কাজে ষোল-আনা আত্মনিযোগ কবিলেন। এখন হইতে দীর্ঘ সতেব বৎসব কাল তিনি তীর্থভ্রমণ বা নির্জনবাস ভুলিযা গিযা অনুগত ভৃত্যেব ন্যায প্রভুব দ্বারে বেলুড মঠে পড়িয়া বহিলেন, ঠাকুবেব কার্য উপলক্ষ ছাড়া তিনি আব কোথাও যান নাই। অনেক বৎসব পূর্বে স্বামীজী শিবানন্দকে একদিন সপ্রেমে জড়াইযা ধবিযা বলিযাছিলেন—'তাবকদা, আপনাকে তপস্যায যেতে দেব না।' কিন্তু শিবানন্দেব মনেব অবস্থা এমনই ছিল যে তিনি স্বামীজীব ঐ অনুবোধ বক্ষা কবিতে পাবেন নাই।" এবাব মহাপুরুষেব অভ্যুদয ঘটিল কর্মযোগেব ব্যাপকতব ক্ষেত্রে।

১৯২২ সালেব এপ্রিল মাস। বামকৃষ্ণমণ্ডলীব মুকুটমণি ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন অন্তিম শয্যায শাযিত। প্রিয গুরুভ্রাতাব বিচ্ছেদেব আশঙ্কায শিবানন্দ অধীব হইযা উঠিযাছেন। ধ্যানাসনে বসিযা মুমূর্ষু ব্রহ্মানন্দেব বোগমুক্তিব জন্য ঠাকুবেব নিকট এই সমযে তিনি প্রার্থনা জানাইতে থাকেন। বাত্রিতে তিনি তিনবাব বিদেহী বামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। আব প্রতিবাবই প্রার্থনাব উত্তবে দেখা যায ঠাকুবেব মৌন ও গম্ভীব মুখ, প্রতিবাবই তিনি প্রার্থনাব কোনো সাড়া না দিযা অন্তর্ধান হন।

বুঝা গেল, ব্রহ্মানন্দ আর নরদেহে থাকিবেন না। প্রভাতে উঠিয়া শিবানন্দ সেবক-ব্রহ্মচারীকে এ কথাটি হতাশ প্রাণে বলিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ইহার পরই নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন।[১]

স্বামী শিবানন্দ এইবার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিলেন। অভিমানশূন্য মহাপুরুষ মঠ ও মিশনের ভার নিতে গিয়া ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "আমি তো তাঁর (ব্রহ্মানন্দ মহারাজের) চাকর। তাঁর পাদুকা মাথায় ক'রে এখানে বসে আছি। ভরত যেমন রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য শাসন করেছিলেন, আমিও তেমনই মহারাজের পাদুকা মাথায় ক'রে তাঁর কাজ চালাচ্ছি—তিনি যেমন বুদ্ধি দেন তেমন করছি।"

এই সেবক-বুদ্ধি নিয়াই রামকৃষ্ণমণ্ডলীর নেতা, মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শিবানন্দ স্বামী তাঁহার গুরুদায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ বার বৎসর কাল বিরাট প্রতিষ্ঠানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

শিবানন্দজীর প্রেমপূর্ণ ব্যবহার, শিক্ষা ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল সঙ্ঘের ভাবী কর্মীদের সাধনপথের মূল্যবান পাথেয়।

'মিশনের কর্ম বড়—না ধ্যানজপ বড়,' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন, "ধ্যান জপের প্রাধান্য অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কাজের কথা বলছো? ধ্যান-জপ বাদ দিয়ে ঠাকুর-স্বামীজীর সত্যকার আদর্শ অনুযায়ী কাজ তো কখনও করা যেতে পারে না। ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ারশিপ—কর্ম ও উপাসনা, এক সঙ্গে চালাতে হবে।"

তাছাড়া, বার বার তরুণ কর্মীদের মর্মে এই কথাটিও তিনি প্রবেশ করাইয়া দিতেন, "সঙ্ঘের প্রতি আনুগত্য হচ্ছে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আনুগত্য।"

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম পরিধি এ সময়ে দ্রুত প্রসারিত হইতেছে। বহু নূতন স্থানে বিস্তারিত হইতেছে মঠ ও কর্মকেন্দ্র তাই এই অধ্যাত্মগোষ্ঠীর সংহতির উপর শিবানন্দ এত গুরুত্ব দিতেন।

ধ্যানসিদ্ধ শিবানন্দের এই সময়কার মূর্তিটি ছিল পরম প্রেমময়, পরম কারুণিক। আশ্রিতের সামান্য একটু প্রার্থনায়, আর্তের দৈন্যময় সংবেদনে হৃদয় তাঁহার ভাবাবেগে আকুল হইয়া উঠিত, গলিয়া ঝরিয়া পড়িত। কেহ কেহ ভাবিতেন, এই কোমলকান্ত মহাপুরুষ কি মঠ ও মিশন পরিচালনার ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করিতে পরিবেন? দৃঢ় মুষ্টিতে হাল ধরিতে পারিবেন? মনীষী ও সাধক মহেন্দ্রনাথ দত্তমহাশয়ের মনেও এই চিন্তাটি দেখা দিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন। "সেই সময় তাঁর কণ্ঠের স্বর, চক্ষের দৃষ্টি ও মুখের ভাব এমন স্নেহপূর্ণ, এমন নম্র, এমন বিনয়ী ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালক মাত্র। সকলের কাছেই নম্র, সকলের কাছেই বিনয়ী, সকলের কাছেই ঋজু। কথাগুলিতে যেন মিষ্টি মাখানো।

১ মহাপুরুষ শিবানন্দ স্বামী : অপূর্বানন্দ

"মহাপুরুষ শিবানন্দের এইরূপ ঋজু ভাব দেখিয়া প্রথমটা আমি একটু ব্যথিত হইয়াছিলাম। মনে হইল, তিনি এইরূপে হইয়া যাইলে মিশনের মতো কাজকর্ম কি করিয়া করিবেন। কারণ, সাধারণের ধারণা এই যে, যে ব্যক্তি তেজী ও দাপট করিতে পারে, সেই বড় কর্মী হয়। এইজন্য, আমার প্রথম এই ভ্রমটা আসিয়াছিল এবং এইজন্যই আমি মহাপুরুষ শিবানন্দের এই অতীব ঋজুভাব দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত ও চিন্তিত হইয়াছিলাম। দু' তিনদিন তাঁহাকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর বুঝিতে পারিলাম যে, মহাপুরুষ শিবানন্দ একটা নূতন পথ বাহির করিলেন— নম্রভাব, ঋজুভাব, এবং ভালবাসা দিয়াও প্রভূত কার্য করা যাইতে পারে। পূর্বভাব একেবারে পরিবর্তন হইয়া যাইল এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ যেন এক নূতন ভাবের মানুষ হইলেন।

"পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি যে অসীম ভালবাসা ও শক্তি বিকাশ করিয়াছিলেন, মুঠিগঞ্জের মঠে তাহা প্রথম লক্ষ্য করি। ইহাকেই বলে অহৈতুকী ভালবাসা— ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—প্রতিদানের কোনোই প্রত্যাশা নাই। মোট কথা, এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয় হইতে একটা ভালবাসা বা আত্মপ্রসারণের উৎস উঠিয়াছিল, আর তিনি তাহা অযাচিতভাবে চতুর্দিকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।"

কিছুদিন পরে শিবানন্দ স্বামী এলাহাবাদে মুঠিগঞ্জের মঠে গিয়া অবস্থান করেন। মহেন্দ্রনাথ দত্তমহাশয়ও তখন এখানে উপস্থিত। প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি লিখিয়াছেন :

"মুঠিগঞ্জের মঠে দেখিলাম—কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মানী, কি সামান্য লোক, মহাপুরুষ শিবানন্দের কাছে সকলেই সমান ভালবাসা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে এমন একটা লোকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, সেখানে এইসব পার্থক্য একেবারেই নাই, সকলেই তাঁহার আশীর্বাদ ও ভালবাসার পাত্র। কোনো প্রকার সামাজিক ব্যবধান বোধ বা অন্য কোনো প্রকার পার্থক্যের ভাবও সেই সময়টা কাহারও মনে ছিল না, কোনো প্রকার হিংসা, দ্বেষ, উঁচু নীচু ভাব কাহারও ভিতর রহিল না; কিন্তু সকলেই যেন এমন এক মহাপুরুষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে যাঁহার পরিধি ও উন্নতত্বের কিছুই পরিমাণ করা যায় না। অথচ তিনি পাঁচ ছয় বৎসরের বালকের মতন। "অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান্"—অণুর চেয়েও তিনি ছোট, মহতের চেয়েও তিনি বড়। আমি দিনের পর দিন তাঁহাকে দেখিতাম এবং মনে মনে চিন্তা করিতাম, 'এখন হইতে তিনি তাঁহার পূর্ব সঞ্চিত শক্তি বিকাশ করিবেন এবং ঋজুতা ও মিষ্ট ভাষা দিয়া তাহা জগৎকে বিতরণ করিয়া যাইবেন।' এই সময়টাকেই তাঁহার সাধনলব্ধ শক্তির বহির্বিকাশের কাল বলা যাইতে পারে।

" দেখিলাম, মহাপুরুষ শিবানন্দের দেহের ভিতর হইতে এক প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা উঠিতেছে—তাহার কাছে উপস্থিত জ্যোতি সকল হীনপ্রভ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু সেই অগ্নিশিখা, সেই জ্যোতি চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে, সেই জ্যোতি অঙ্গুলি ও চর্ম দগ্ধ করে না। সেই অগ্নিশিখা, সেই দীপ্তিপুঞ্জ স্নিগ্ধ, স্থির ও মাধুর্যপূর্ণ। ভালবাসা বা আত্মপ্রসারণ জ্যোতিরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার ভিতর হইতে স্নিগ্ধ কিরণ বিকিরণ করিতে লাগিল।"

মহাপুরুষ শিবানন্দের কৃপাভাণ্ডার এবার যেন সবার জন্য উন্মুক্ত। প্রকৃত সাত্ত্বিক আধার নিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণের ভাব নিয়া, যাহারা আসেন, ধন্য হন তাঁহার দীক্ষার দাক্ষিণ্যে। সে-বার সুদূর সিন্ধুপ্রদেশ হইতে একটি ভক্ত আসিয়াছেন। কিছুদিন আগে স্বপ্নে তিনি এক মন্ত্র লাভ করেন। ইহার মর্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া শিবানন্দ স্বামীর নিকট পত্র লিখেন, তীব্র ব্যাকুলতা নিয়া প্রার্থনা করেন দীক্ষা ও সাধন নির্দেশ।

কিছুদিন পরে মহাপুরুষের সম্মতি পাইয়া ভক্তটি বেলুড়ে চলিয়া আসেন। এবার মনোবাসনা তাঁহার পূর্ণ হয়, ধন্য হন স্বামী শিবানন্দের কৃপালাভে।

দীক্ষিত ভক্তটি মহাপুরুষজীর নির্দেশানুসারে এতক্ষণ ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসে ধ্যান করছিলেন। ভক্তটি ঠাকুরঘর হতে এসে খুব ভক্তিভরে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম ক'রে, তাঁর চরণতলে উপবেশন ক'রে, করজোড়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বললেন —"আপনার দয়ায় আমি শান্তিলাভ করেছি। স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া অবধি মন বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। একেবারে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। আজ আপনার মুখ থেকে সেই স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রই পেয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখেছিলাম সবই সত্যি এবং স্বপ্নে আমায় যিনি কৃপা করেছিলেন তিনি আপনিই।"

এই সিন্ধী ভক্তটির দীক্ষাদানের পর এক অপূর্ব দিব্য ভাবে শিবানন্দ মহারাজ আবিষ্ট হন। কিছুক্ষণ পরে এক সেবক ব্রহ্মচারী এ সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দেন, "আহা লোকটি খুবই ভক্তিমান্! ওর উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা আছে, তা না হলে অত ভক্তি হয় না। কার কেমন আধার, দীক্ষা দেবার সময় বেশ বুঝতে পারা যায়। যাদের আধার খুব ভালো তারা মন্ত্র পাওয়া মাত্রই বিহ্বল হয়ে পড়ে—অশ্রু, পুলক, কম্পন এইসব হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয় ওঠে, আর সহজেই ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। এ ভক্তটিকেও দেখলাম তাই। মন্ত্র শোনা মাত্রই সর্বাঙ্গে কম্পন ও একটু পুলক হতে লাগল এবং ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ল। আর কী প্রেমাশ্রু! দু চোখের কোণ দিয়ে ধারা বয়ে পড়ছিল। তাই দেখে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছিল। ঠিক ঠিক ভক্তকে মন্ত্র দিয়ে খুবই আনন্দ হয়—মন্ত্র দেওয়া সার্থক হয়। যাদের মন্ত্র পাবার ঠিক সময় হয়েছে তাদের হৃদ্‌পদ্ম যেন মন্ত্র পাবার জন্য বিকশিত ও উন্মুখ হয়ে থাকে এবং মন্ত্র পাওয়া মাত্র উহা যেন সযত্নে আঁকড়ে ধরে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ঠাকুরের দয়ার কথা। আহা! তিনি কতভাবে কত লোককে কৃপা করেছেন। দেশ-বিদেশের কত লোকে যে তাঁর কৃপা পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ধন্য প্রভু!"

সেবক ভক্তটি সবিনয়ে আবার প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা মহারাজ, দীক্ষামন্ত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলেরই তো এতটা উদ্দীপনা হয় না। যাদের অত উচ্চ আধার নয়, আপনাদের কৃপা পেয়ে তাদের কি কোনো কল্যাণ হবে না?"

"তা কেন হবে না? তাদেরও হবে, তবে একটু দেরিতে হবে। সিদ্ধগুরুর এমন শক্তি আছে যে, শিষ্যের মনকে তৈরি ক'রে নিতে এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাদের

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন

জীবনের গতি আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। সিদ্ধমন্ত্রের শক্তি অমোঘ, বিশেষ ক'রে সেই সিদ্ধ মন্ত্রশক্তি যদি আত্মজ্ঞগুরুর ভেতর দিয়ে সংক্রামিত হয়। ঠাকুর বলতেন—সদ্‌গুরুর কৃপা হলে জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। আর গুরু কাঁচা হলে শিষ্যের সংসার বন্ধন কাটে না, শিষ্য মুক্ত হয় না।"

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের এক ভক্ত সেদিন মঠে আসিয়া উপস্থিত। শিবানন্দজীকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সাধন-ভজন করিতেছিলেন, এবং স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আধার প্রস্তুত হলেই তুমি দীক্ষা পাবে।" কিন্তু তাঁহার দেহান্ত হওয়ার আর ইহা সম্ভব হয় নাই। সকাতরে ভক্তটি আরও কহিলেন, "ঠাকুরের কাছে আমি খুবই কাতর প্রার্থনা করছিলাম, তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আজ তিন দিন হল স্বপ্নে মহারাজের দর্শন পেয়েছিলাম এবং তিনি কৃপা ক'রে আমায় মন্ত্রও দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘুম ভেঙে যাবার পরে সে মন্ত্র পুরোপুরি আর স্মরণ করতে পারিনি। খুব চেষ্টা করেছি—কিন্তু কিছুতেই হল না। সেই থেকে মনটা খুবই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।"

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভক্ত মাত্রেই স্বামী শিবানন্দের অতি আপন জন। তাহাদের জন্য শিবানন্দের কৃপার দুয়ার সদা উন্মুক্ত। এই ব্যাকুল ভক্তটিকে নানা কথায় শান্ত করিতে লাগিলেন।

"ভক্তটি মহাপুরুষজীর আশ্বাস বাণীতে শান্ত না হয়ে মন্ত্র দেবার জন্য তাঁরই নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। অগত্যা কতকটা যেন রাজী হয়ে, ভক্তটিকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে, তিনি মহারাজের ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলেন। (তখনও শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দির নির্মিত হয় নি। মহারাজ মঠে যে ঘরে থাকতেন সে ঘরেই তাঁর ব্যবহৃত সব জিনিসপত্র ছিল এবং নিত্য পূজা হত।) প্রায় আধঘণ্টা পরে মহাপুরুষজী মহারাজের ঘরের দরজা খুলে সেই ভক্তকে মহারাজের ঘরে আসবার জন্য ইঙ্গিত ক'রে ডাকলেন এবং উভয়ে সে ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। খানিক পরে মহাপুরুষজী একাই মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজ তক্তাপোশের উপর চুপচাপ বসে রইলেন। ঘণ্টাখানেক পরে ভক্তটি মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে মহাপুরুষজীকে বললেন—'আজ আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। স্বপ্নে মহারাজ যে মন্ত্র দিয়েছিলেন আপনিও সেই মন্ত্রই আমায় বলে দিলেন। এতেই আমার বিশেষ আনন্দ হয়েছে। তিনি আপনার ভিতর রয়েছেন এ আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি। এই আশীর্বাদ করুন যেন এ জীবনে ইষ্ট দর্শন হয়।'

"মহাপুরুষজী কহিলেন, যে মন্ত্র পেয়েছেন নিয়মিতভাবে জপ ক'রে যান। আর জপের সঙ্গে সঙ্গে খুব কাতরভাবে প্রার্থনা করবেন—'প্রভু, তোমার ধ্যান যাতে হয়, আর তোমার শ্রীপাদপদ্মে মন যাতে লীন হয়, তাই ক'রে দাও।' তিনি তাই করবেন—নিশ্চয় জানবেন। তিনিই সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, প্রভু, পিতা, মাতা, সখা এবং জীবের সর্বস্ব। সংসারে যাদের আমার আমার বলে লোক কাঁদছে তারা সব দুদিনের, চিরস্থায়ী একমাত্র তিনিই। আপনি একমনে খুব নাম-জপ ক'রে যান, দেখবেন ক্রমে আপনা হতেই ধ্যান হয়ে যাবে। খুব প্রেমের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করতে

কবতে ক্রমে প্রাণে এক বিমল আনন্দেব অনুভব হয। সেই আনন্দ স্থাযী হলে তাও একবকমেব ধ্যান। ধ্যানেব বহু প্রকাব আছে। খুব প্রেমেব সঙ্গে প্রভুব জ্যোতির্ময় শ্রীমূর্তি হৃদযে ধাবণ কববেন, আব ভাববেন যে, তাঁর শ্রীঅঙ্গ জ্যোতিতে আপনাব হৃদযকন্দব আলোকিত হযে গেছে। এইবকম ভাবনা কবতে কবতে এক অপূর্ব আনন্দে মনপ্রাণ ভবে যাবে। ক্রমে ক্রমে মূর্তিও লয হযে যাবে এবং কেবল চৈতন্যময একপ্রকাব আনন্দ অনুভূত হবে। এও এক-প্রকাবেব ধ্যান। আবও কত বকমেব ধ্যান আছে—পরে পবে আপনি নিজেই সব উপলব্ধি কববেন।

"আসল কথা হল আন্তবিকভাবে তাঁকে ডাকা। তাঁকে ডাকতে ডাকতে, কাঁদতে কাঁদতে মনেব মযলা সব ধুযে যাবে, মন শুদ্ধ হবে। তখন সেই সংস্কৃত মনই গুরুব কাজ কববে। আপনাব কখন কি প্রযোজন, কিভাবে ধ্যান কবতে হবে, তাঁকে কিভাবে ডাকতে হবে, সেসব ভেতব থেকেই জানতে পাববেন, ঠাকুবেব কথাব পড়েছেন তো? তিনি বলতেন—'কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' এই পাল তুলে দেওয়া মানে আন্তবিক অধ্যবসায সহকাবে সাধন-ভজন কবা। তিনি সদাই কৃপা কববাব জন্য বসে আছেন -- যেমন মা অবোধ শিশুকে কোলে তুলে নেবাব জন্য হাত বাড়িযে থাকেন, তেমনি। একটু ক'বে দেখুন—তবেই তাঁব কত কৃপা তা অনুভব কবতে পাববেন[১]।"

কথাপ্রসঙ্গে ভক্ত শিষ্যদেব মধ্যে সেদিন পাশ্চাত্য দেশেব ধন-ঐশ্বর্য, জীবনযাত্রাব উচ্চমান ও ঐহিক সুখেব কথা উঠিল। শিবানন্দ মহাবাজ কহিলেন,—"ওসব সুখ তো ক্ষণিক সুখ। ওতে আছে কি। ওবা ভগবৎ-আনন্দেব আস্বাদ কখনও পাযনি বলে ঐ ক্ষণিক আনন্দে মত্ত হযে আছে। বাবা, যে যাই বলুক, কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই। তা স্বর্গেই থাক, আব যেখানেই থাক – বিদ্বানই হও, আব যাই হও; কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই, নেই, নেই। এ ভগবানেব কথা। ছান্দোগ্য উপনিষদও বলেছে—

'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি
ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ·'

"আসল সুখ বযেছে সেই ভূমা বস্তুতে। তাই জানতে হবে। বিজ্ঞান সেই ভূমাব সন্ধান দিতে পাবেনি। বিজ্ঞান নাড়াচাড়া কবছে জড় বস্তু নিযে, জাগতিক জিনিস নিযে। জাগতিক ভোগ কবতে কবতে ভোগস্পৃহা দিন দিনই বাড়তে থাকে। তাতে তৃপ্তি কোথায? তাতে শান্তি কোথায? ভোগেব ভেতবেই তো অশান্তিব বীজ।

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষাকৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয এবাভিবর্ধতে॥'

"পবে জীবনে শান্তিলাভ প্রসঙ্গে বললেন—"অনাত্ম বস্তুতে শান্তি নেই। আত্মজ্ঞান লাভেই প্রকৃত শান্তি। আব সেই শান্তিব সন্ধানও কবতে হবে ভিতবে। শান্তি ভেতবেই আছে, বাহিবে নেই। জ্ঞান, ভক্তি, ভগবৎ-প্রেম সব ভেতবে। সাধন-ভজন কবো, ভগবানকে ডাক। বাবা, শান্তি তিনি ভেতবেই দেবেন নিশ্চয।"

---

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন।

সে-বার রামকৃষ্ণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু এক ভক্ত শিবানন্দকে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা মহারাজ, ঠাকুর কি নিজে দীক্ষা দিতেন?"

শিবানন্দজী উত্তরে কহিলেন, "হ্যাঁ, দিতেন—তবে খুব কম। তাছাড়া, তাঁর দীক্ষা তো সাধারণ দীক্ষার মতো কান-ফোঁকা দীক্ষা নয়। তিনি কাউকে স্পর্শ ক'রে চৈতন্য ক'রে দিতেন, বা ইচ্ছা শক্তির দ্বারা কারো মনের মোড় ফিরিয়ে দিতেন। তিনি হলেন জগদ্গুরু। তাঁর কথা স্বতন্ত্র। 'জগদ্গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে, আর মানুষগুরু মন্ত্র দেন কানে।' তিনি ভক্তদের অন্তরে ঐশী শক্তি, ঈশ্বরীয় ভাব উদ্দীপিত ক'রে দিতেন, আর অধিকারভেদে সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাধন করাতেন। একঘেয়েমি তাঁর ছিল না। যে যে মার্গেই সাধনা করুন না কেন, তিনি তাকে সেই পথেই এগুবার সাহায্য করতেন।"

মহাপুরুষদের অলৌকিক শক্তি বিভূতি সম্পর্কে, আর্তের রোগ-মুক্তি ঘটানো সম্পর্কে এক ভক্ত সেদিন প্রশ্ন তুলিয়াছেন। শিবানন্দ স্বামী প্রশান্ত কণ্ঠে কহিতে, লাগিলেন, "শারীরিক ব্যাধি দূর করা স্পর্শমাত্র—এ আর কি বেশী অলৌকিক? এসব তো সহজ ব্যাপার। ঠাকুর যে সব চাইতে বড় অলৌকিকত্ব দেখিয়ে গেছেন—স্পর্শমাত্র মানুষকে ভগবদ্দর্শন করিয়ে দিয়েছেন, সমাধিস্থ করেছেন! জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সংস্কাররাশি একমুহূর্তে ক্ষীণ ক'রে দিয়ে মানুষের সমগ্র মনের গতি ভগবৎ-মুখী ক'রে দেওয়া—এ হল সব চেয়ে বড় সিদ্ধাই। উঃ! কি কাণ্ডই না ঠাকুরকে করতে দেখেছি। সে সব ভাবতে গেলেও রোমাঞ্চ হয়। মানুষের মনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন, মনের আড়বাঁক সব ইচ্ছামাত্র সোজা ক'রে দিতেন। তাঁর স্পর্শমাত্র মনের সব ব্যাধি আরাম হয়ে যেত। কি বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির আধার ছিলেন ঠাকুর! বাহির থেকে দেখতে তো সাধারণ মানুষের মতো, কিন্তু তাঁর দেহ আশ্রয় ক'রে লীলা করতেন সর্বশক্তিমান্ ভগবান্।"

সদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উঠলেই মহাপুরুষের সর্ব সত্তায় দিব্য, আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিত, ঠাকুরের লীলাকথায়, মাহাত্ম্য প্রচারে, এই সদা অন্তর্লীন সাধক মুখর হইয়া উঠিতেন। কহিতেন, "যে কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তাঁকে ভালবেসেছে তার মুক্তি অনিবার্য। দক্ষিণেশ্বরের সেই রসিক মেথরের গল্প তোমরা শোননি? সে ঠাকুরকে 'বাবা বাবা' বলত। একদিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছিলেন। তখন রসিক মেথর ঠাকুরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় ক'রে ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা ক'রে বলেছিল—'বাবা, আমায় কৃপা করলে না? আমার গতি কি হবে?' তখন ঠাকুর বলেছিলেন 'ভয় নেই, তোর হবে, মৃত্যু সময় আমায় দেখতে পাবি।' ঠিক তাই হয়েছিল। মরবার আগে তাকে তুলসীমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে রসিক বলে উঠল—'এই যে বাবা এসেছ—বাবা এসেছ—!' এই বলতে বলতে মারা গেল।

"ঠাকুরের সব ভক্তদের দেহত্যাগই খুব অদ্ভুত রকমের। বলরামবাবুর দেহত্যাগের ঘটনাও অতি আশ্চর্য রকমের। তাঁর তো খুবই কঠিন অসুখ; সকলেই মহা চিন্তিত। দেহত্যাগের দু'তিন দিন আগে থেকেই আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আসতে দিতেন না। মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি আমাদের কেবল দেখতে চাইতেন। আমরাই তাঁর কাছে কাছে থাকতাম। যতটুকু কথা বলতেন, তা খালি ঠাকুর সম্বন্ধে। দেহত্যাগ

করার একদিন আগেই ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেল। বলরামবাবুর স্ত্রী শোকে খুবই ম্রিয়মাণ হয়ে গোলাপ মা, যোগীন মা প্রভৃতির সঙ্গে অন্দরমহলে বসে আছেন। এমন সময় বলরামবাবু স্ত্রী দেখতে পেলেন, আকাশে এক খণ্ড কাল মেঘ ভেসে আসছে। পরে ঐ মেঘ ঘনীভূত হয়ে ক্রমে নিচে নেমে আসতে লাগল এবং যতই নিকটে আসতে লাগল ততই তিনি দেখতে পেলেন যে, তাতে একখানি দিব্য রথ। ক্রমে ঐ রথ বলরাম মন্দিরের ছাদের উপর নামল এবং ঠাকুর ঐ রথ থেকে নেমে এসে বলরাম-বাবু যে ঘরে ছিলেন সে-ঘরে ঢুকলেন। খানিক পরেই বলরামবাবুর হাত ধরে ঠাকুর রথে এসে বসলেন। তখন সেই রথ ঊর্ধ্বে উঠে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে বলরামবাবুর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। এমন সব কত অলৌকিক ব্যাপার হচ্ছে, ঠাকুরের নাম করতে করতে দেহ ছেড়ে ঠাকুরের কাছে চলে যাচ্ছে। ঠাকুরের সব ভক্তদের উচ্চ গতি হবে নিশ্চয়।"

সেদিন এক গৃহস্থ ভক্ত শিবানন্দজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণতলে ভেট স্বরূপ কিছু টাকা রাখিয়া ছিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, "টাকা দিয়ে প্রণাম করলে কেন? আমার টাকার তো কোনো দরকার নেই—আমরা বাবা সাধু মানুষ; টাকা দিয়ে কি করবো? ঠাকুরের কৃপায় আমার কোনো অভাব নেই। আমি প্রভুর দাস। তিনি দয়া করে 'দো রোটি' দিচ্ছেন। এই বলে গাইতে লাগলেন—

'প্রভু মৈ গোলাম, মৈ গোলাম, মৈ গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥
দো রোটি এক লঙ্গেটী তেরে পাস মৈ পায়া।
ভকতি ভাব আউর দে নাম তেরা গাওয়া॥
প্রভু মৈ গোলাম তেরা॥

—তা তিনি দয়া ক'রে দো রোটি তো দিচ্ছেনই, আর কি হবে টাকা-কড়িতে? নিয়ে যাও বাবা ঐ টাকা। তোমরা গৃহস্থ, তোমাদেরই টাকার দরকার।"

ভক্তটি কাঁদো কাঁদো হইয়া উঠিল। কাতরভাবে বার বার পীড়াপীড়ি করাতে শিবানন্দজী সেবককে নির্দেশ দিলেন, ঐ টাকা যেন ঠাকুরের সেবার জন্য দিয়ে দেওয়া হয়।

মঠের নবদীক্ষিত সন্ন্যাসীরা একে একে শিবানন্দ মহারাজকে প্রণাম করিতেছেন। প্রাণে তাঁহার অপার আনন্দ, নয়ন দুটি দিব্য আনন্দে উজ্জ্বল। প্রসন্ন গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "দ্যাখো বাবা, নামরূপ এ সবই বাহ্যিক, সব অনিত্য—দুদিনের, এসব কিছুই নয়। নাম রূপের পারে যেতে হবে, সেই পরমানন্দ লাভ করতে হবে। আত্মবস্তু লাভ করতে হবে। সন্ন্যাসের অর্থ তো তাই। বিরজাহোম ক'রে শিখাসূত্র ত্যাগ ক'রে গেরুয়া পরা ও সন্ন্যাসী হওয়া তো সহজ। সে তো প্রবর্তক সন্ন্যাসী মাত্র, কিন্তু খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া বড় কঠিন। মহাবাক্য নিত্য ধ্যান করো। যাও বাবা, এখন খুব ধ্যান লাগাও। আত্মবস্তু অনুভব করো। তবেই ঠাকুরের সঙ্ঘে আসা, সন্ন্যাস নেওয়া, এসব সার্থক হবে। আমার কথা শুনতে চাও তো এই।"

সাধু সন্ন্যাসীর কর্তব্য কি, একথার উত্তরে একদিন তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, "সাধু উঠবে খুব সকালে। রাত তিন চারটার পর আর ঘুমুবে না। সাধু তখন

আব ঘুমুবে কি? ঠাকুবকে দেখেছি তিনটাব পব আব কখনও ঘুমুতেন না, ভগবানের নাম কবতেন। সাধু সকাল সকাল স্নান কববে। স্নান ক'বে ধ্যান ধাবণাদি কববে। স্নান কবেই খাবে না। স্নান ক'বে ধ্যানভজন না ক'বে খাওযা, সে তো অন্যান্য লোকেবা কবে, সাধু তা কববে না। সাধুব চেহাবা কথাবার্তা সবই অনুবূপ হবে, সবল সুন্দব দেবোপম। সাধুব টাকা কেন থাকবে? সাধু একদম নির্ভবশীল হবে—ঠাকুব আছেন তিনি দেখবেন। সাধু পবিষ্কাব-পবিচ্ছন্ন থাকবে, কিন্তু তা বলে বিলাসিতা কববে না। ত্যাগেব পথে যাবা থাকবে তাদেব পক্ষে বিলাসিতা ভাল নয। সাধু বাত্রে বেশী খাবে না। ঠাকুব বলতেন—বাত্রেব খাওযা হবে জলখাবাব মতো। সাধু মূর্খ হবে না, বিদ্যাচর্চা কববে। সাধুব স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। সাধু মিষ্ট-ভাষী, ধীবস্থিব হবে, ভদ্র ব্যবহাব কববে। সাধু সর্বদাই কামিনীকাঞ্চন থেকে তফাত থাকবে। কামিনীকাঞ্চনেব কোনো সংসর্গ বাখবে না।"

এক নবীন সন্ন্যাসী শিবানন্দজীকে সেদিন জিজ্ঞাসা কবেন,[১] "মহাবাজ, সন্ন্যাস-জীবনে কি কি নিযম পালন ক'বে চলতে হবে? পবমহংস উপনিষদে এবং নাবাযণ উপনিষদে সন্ন্যাসীব পক্ষে যে সব নিযমেব বিধি আছে সে সব তো আমাদেব এই কাজ-কর্মেব ভিতব অনেক সময মেনে চলা সম্ভবপব নয।" উত্তবে শিবানন্দ মহাবাজ বলেন, "হ্যাঁ, সন্ন্যাসীব পক্ষে অনেক সব নিযম আছে, কিন্তু সে সব নিযম তোমাদেব মানতে হবে না। ও তোমাদেব জন্য নয। তোমবা হলে কর্মযোগী সন্ন্যাসী তোমাদেব জন্য স্বামীজী নূতন আদেশ বেখে গেছেন। তোমাদেব সাধনভজন কবতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কবতে হবে অনাসক্ত হযে সাধনভজনেব অনুকূল কর্ম। কাজেই তোমাদেব পক্ষে ঐ সব নিযম অক্ষবে অক্ষবে মেনে চলা সম্ভবপব নয। সেসব নিযম হল কেবল জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীদেব জন্য যাঁবা কোনো কাজকর্ম কবেন না, কেবল জ্ঞান বিচাব কবেন, তাঁদেব জন্য। তবে কি জানো বাবা, মূল জিনিস ক'টা ঠিক বাখতে পাবলে ক্রমে সব ঠিক হযে যায।"

"মূল জিনিসটি কি, মহাবাজ?"

"মূল জিনিস হ'ল খালি বাহ্যিক ত্যাগ নয, কামকাঞ্চনাসক্তিও ত্যাগ কবতে হবে। ঐ যে সব আহুতি দিলে, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ইত্যাদি, ঐ সমস্ত এষণাব মূলেই হ'ল কাম ও কাঞ্চন এই দুটো জিনিস। কামকাঞ্চন ত্যাগ কবা সর্বতোভাবে—এই হ'ল সন্ন্যাসীব একমাত্র বিশেষ ক'বে মানবাব জিনিস। ঠিক ঠিক শবণাগত হযে পড়ে থাকতে হবে তাঁব কাছে। তিনি তো ভগবান্, তিনিই কৃপা ক'বে সব জানিযে দেবেন, সব বুঝিযে দেবেন।"

"কিন্তু মহাবাজ, যতদিন দেহ আছে ততদিন দেহবক্ষাব জন্যে কিছু কিছু এষণা তো বাখতেই হবে?"

"হ্যাঁ, সে ঠিক। তা শাস্ত্রেও তেমন বিধি বযেছে—। বৃহদাবণ্যক উপনিষদেই বযেছে, 'এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণাযাশ্চ লোকৈষণাযাশ্চ ব্যুত্থাযাথ ভিক্ষাচর্যং চবন্তি'—'ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকেই অবগত হযে পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত হযে, অর্থাৎ পুত্রবিত্তাদি বিষযে কামনা পবিত্যাগ ক'বে ভিক্ষাচর্য অবলম্বন ক'বে থাকেন।' শবীব ধাবণমাত্রেব জন্য যতটা দবকাব ততটুকু

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন

মাত্র এষণা বাখতে হবে। ভিক্ষাদিও প্রযোজনমতো অতি সামান্য কববে। কিন্তু চব্য চুষ্য, লেহ্য, পেয খেতে হবে বা আবামে থাকতে হবে, তেমন কথা কোথাও নেই। আব শবীব ধাবণেব উদ্দেশ্যও হবে তাঁকে প্রাণভবে ডাকা এবং তাঁব সেবাদি কাজ কবা, তদতিবিক্ত আব কিছু নয।"

মঠেব সাধনবত ব্রহ্মচাবী ও সন্ন্যাসীবা আন্তবিকভাবে এই সিদ্ধ মহাপুরুষেব আশীর্বাদ ভিক্ষা কবিত, তাহাদেব উৎসাহ ও প্রেবণা যোগাইতে গিযা ভাবাবেগে তিনিও উদ্দীপিত হইযা উঠিতেন। কহিতেন:

"তোমবা সর্বস্ব ছেড়ে ঠাকুবকেই জীবন-সর্বস্ব কবেছ; তোমাদেব উপব আশীর্বাদ থাকবে না তো কাব উপব থাকবে? কিন্তু তোমাকেও খাটতে হবে। ঠাকুব যেমন বলতেন 'কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' ঐ পাল তোলাই হল নিজেব চেষ্টা। ঐকান্তিক অধ্যবসায, পুরুষকাব চাই বিশেষ ক'বে সৎ কাজেব জন্য, সাধন ভজনেব জন্য। আত্মজ্ঞান লাভ কবাব জন্য সিংহবিক্রম প্রকাশ কবতে হবে। উদ্যম ছাড়া, পুরুষকাব ছাড়া, কিছুই হবাব জো নেই। পাল তুলে দিলে তাতে কৃপাবাতাস লাগবেই। যতদিন মানুষেব অহংবুদ্ধি আছে ততদিন অধ্যবসায বাখতেই হবে। তোমবা সাধু হযেছ, বাপ মা, ঘববাড়ি সব ছেড়ে এসেছ কেন? না, ভগবান্ লাভ কববে বলে। আব পূর্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতিব ফলে, ভগবৎকৃপায ঠাকুবেব আশ্রযে এসে পড়েছ, তাঁব পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পেযেছ, বিশেষ ক'বে আমাদেব কাছে সর্বক্ষণ থাকাব সুযোগও ঠাকুব ক'বে দিযেছেন। এত সব সুযোগ পেযেও যদি জীবনেব লক্ষ্য ভ্রষ্ট হযে যায, তাব চাইতে পবিতাপেব বিষয আব কি হতে পাবে? মনে খুব জোব আনবে। তাঁব পতিতপাবন নাম নিযে এ ভব সমুদ্রে পাড়ি দিযেছ। একটু জোবে ঢেউ দেখে ভযে জড়সড় হযে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? এসব তো মহামাযাব বিভীষিকা। এ সব দেখিযে তিনি সাধকদেব পবীক্ষা কবেন, ওসবে এখন সাধকেব মন বিচলিত না হয, সাধক-যখন দৃঢপ্রতিজ্ঞ হযে সুমেরুবৎ অচল অটল থাকে, তখন মহামাযা প্রসন্না হযে মুক্তিব দ্বাব খুলে দেন। তিনি প্রসন্না হলেই সব হল। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না ববদা নৃণাং ভবতি মুক্তযে।' বুদ্ধদেবেব জীবনীতে পড়নি? স্বযং বুদ্ধদেবকেও মহামাযা মাবেব রূপে কত বিভীষিকা দেখিযেছিলেন।"

মঠেব এক দক্ষিণ-দেশীয সন্ন্যাসী তাঁব প্রাণেব আকাঙ্ক্ষা জানাইযা শিবানন্দজীকে বলেন, "মহাবাজ, আমাব একান্ত ইচ্ছে শ্রীভগবান্‌কে আমি সর্বভূতে দর্শন কববো। কিন্তু কবে এ আকাঙ্ক্ষা আমাব পূর্ণ হবে, কৃপা ক'বে তা বলুন।"

ভাবেব ঘবে কোনো ফাঁকি মহাপুরুষ সহ্য কবিতে পাবিতেন না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায কহিলেন, "বাবা, আগে ভগবান্‌কে নিজ হৃদযে দর্শন কবতে হবে। অন্তরে তাঁব দর্শন না হলে বাইরে সর্বভূতে তাঁকে দেখা কি ক'বে সম্ভব? আত্মানুভূতিতে বেশ দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন অন্তবে বাইবে সর্বত্র তাঁব দর্শন হয, তাই সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ এই অবস্থা লাভ হয।"

সন্ন্যাসীটি কবজোড়ে নিবেদন কবেন, "মহাবাজ। সত্যকথা সর্বভূতে দয়া ও প্রেম,

নির্বিকার চিত্তে সব দুঃখ সহ্য করা, এসব নৈতিক গুণের পূর্ণতা নিয়ে সে অবস্থায় কি পৌঁছানো যায় না ?"

শিবানন্দজী উত্তরে কহিলেন, "হ্যাঁ, নৈতিক চরিত্র গঠনে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধ মনে ক্রমে ভগবদ্‌ভাবের স্ফুরণ হয়। একথা ঠিক। কিন্তু কেবল মাত্র নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করলেই ভগবদ্দর্শন হবে না। নিরন্তর তাঁর ধ্যান করতে করতে তিনি কৃপা ক'রে ভক্তের হৃদয়ে প্রতিভাত হন। তাই তাঁর ধ্যান—সর্বদা তাঁর স্মরণ মনন। সত্যস্বরূপ, বিভু, প্রেমময়, সর্বশক্তিমান, চৈতন্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দকে ভাবনা করতে করতে মানুষ ক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যো সো ক'রে একবার ভগবান্‌কে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সব হয়ে গেল। তখন আলাদা ক'রে নৈতিক চরিত্র গঠনের দরকার হয় না। সত্য, দয়া, প্রেম এ সকল সদ্‌বৃত্তি তখন আপনা হতেই এসে পড়ে। ঠাকুর বলতেন যে, বাপ যে ছেলের হাত ধরেছে সে ছেলের আর পড়ে যাবার ভয় নেই। আসল কথা কি জান বাবা ? কৃপা কৃপা। তিনি কৃপা ক'রে দর্শন দিলেই মানুষ তাঁর দর্শন পেতে পারে। ভজনসাধন এসব মনকে ভগবন্মুখী করার উপায় মাত্র।"

অতঃপর কিছুক্ষণ ভাবতন্ময় অবস্থায় থাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুর বলতেন যে, কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দেনা ? এই পাল তুলে দেওয়াই হল পুরুষকার —সাধনভজন। ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করার মতো ক'রে নিজেকে তৈরি ক'রতে হবে—ভজনসাধন দ্বারা। বাকী তাঁর কৃপা। নিরন্তর তাঁর স্মরণ মনন তাঁর ধ্যান করতে করতে মনপ্রাণ শুদ্ধ হয়ে যায় ; আর ঐ শুদ্ধ মনে স্বতই ভগবদ্‌ভাবের স্ফুরণ হয়, ভগবৎ কৃপা প্রতিভাত হয়। তা ছাড়া, সাধু হয়েছ, সব ছেড়েছুড়ে তাঁর আশ্রয়ে এসেছ, ভগবান্ লাভ করাই তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তোমাদের তো তাঁকে নিয়েই সব সময় থাকতে হবে। ঠাকুরের কথায় আছে যে, মৌমাছি ফুলেই বসে, মধুই পান করে। তেমনি তোমরাও শয়নে, স্বপনে জাগরণে, সর্বাবস্থায় ভগবান্‌কে নিয়েই বিলাস করবে। তাঁর বিষয় স্মরণ, তাঁর বিষয় পাঠ, আলোচনা, তাঁর কাছে প্রার্থনা, এই সব নিয়েই তোমাদের থাকতে হবে। তবেই জীবনে প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি পাবে, আর তাঁর আশ্রয়ে আসাও সার্থক হবে। ভগবান্ অন্তর্যামী। যেখানে আন্তরিক ব্যাকুলতা, সেখানে তাঁর কৃপাও হয়। তাঁর রাজ্যে অবিচার নেই।"

সন্ন্যাসীর জীবন ত্যাগ তিতিক্ষাময়, দেহবুদ্ধি বিনষ্ট করাই তাঁহার সাধনার প্রধান লক্ষ্য এই তত্ত্বটি শিবানন্দ মঠের উপদেশপ্রার্থী সন্ন্যাসীদের মনে গ্রথিত করিয়া দিতেন। একদিন পরম স্নেহভরে কহিতেছিলেন, "বাবা, তোদের জীবনের আদর্শ হল ঠাকুর। আর তিনি ছিলেন ত্যাগীর বাদশা। তোরা তাঁরই আশ্রয়ে এসেছিস তা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখবি। তাঁর এই পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পেয়েছিস, সেও মহা সৌভাগ্যের কথা। তোদের উপর কত বড় দায়িত্ব যে আছে তা ভেবে দেখবি। আমাদের শরীর আর ক'দিন। এর পরে তোদের দেখেই লোকে শিখবে। ত্যাগই হল সন্ন্যাস জীবনের ভূষণ। যে যত বেশী ত্যাগ করতে পারে সে তত ভগবানের দিকে এগোয়।

"খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া খুবই কঠিন, তাছাড়া, খালি বিরজাহোম ক'রে গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হল না। যে কায়মনোবাক্যে সব এষণা ত্যাগ করতে পেরেছে সেই হল ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী। যত পারিস ত্যাগ করে যা। দেখবি সময়ে দরকার হ'লে মা

এত দেবেন যে সামলাতে পারবিনি। সঞ্চয় করতে নেই, এমন কি সাধুর সঞ্চয়বুদ্ধিও রাখতে নেই। ঠিক সাঁকোর জলের মতো একধার দিয়ে আসবে আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু সঞ্চয় করেছিস তো আর আসবে না, তখন ময়লা জমতে শুরু করবে। আর কখনও কোনো জিনিস চাইতে নেই। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাক। যখন যা দরকার মা সব দেবেন। এই দেখ না, এখন এত জিনিসপত্র খাবারদাবার কাপড়চোপড় আসছে যে সামলানো দায়। একদিন গিয়েছে যখন বরাহনগর মঠে থাকতে একখানা কাপড়ই সকলে মিলে পরতাম। আর এখন নিত্য নূতন নতুন গরদ পরলেও ফুরোয় না। তবে কি জানিস তাঁর দয়ায় মনটা তখনও যা ছিল এখনও তাই। পরনের কাপড় ছিল না ব'লে মনে কোনো দুঃখ ছিল না; কোনো অভাব বোধ হত না। তিনি কৃপা ক'রে ভরপুর আনন্দ দিয়েছিলেন। এই দেখ্ না, তোরা তো এখন আমায় দুহাত গদির উপর শুইয়ে রেখেছিস্, কিন্তু আমার মনে হয় সেই কাশীর কথা—যখন শীতকালে কেবল খড় পেতে তার উপর শুয়ে থাকতাম। তাতে যা আনন্দ তা এর সঙ্গে তুলনাই হয় না।"

"দেখ্, আমার সেবা করছিস এ খুবই ভাল। ঠাকুরের মহা কৃপা তোর উপর যে, তাঁর একজন সন্তানের সেবা তিনি তোর দ্বারা করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু বাবা, সঙ্গে সঙ্গে সাধনভজনও করা চাই। নিয়মিত জপধ্যান, ভজনসাধন করলে তবেই ঠাকুর যে কি ছিলেন তা ঠিক ঠিক উপলব্ধি হবে। আমাদের উপর মানুষবুদ্ধি এলেই মারা যাবি—বেশ মনে রাখবি। ভগবদ্‌বুদ্ধি আনার জন্য চাই তীব্র সাধনা। ভগবানের নাম তাঁর ধ্যান করতে করতে মন সংস্কৃত হলে সেই শুদ্ধ মনে ভগবদ্ভাব উদ্দীপিত হয়। আমরা তো ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গ করেছি, তাঁর কৃপা পেয়েছি; তবু তিনি আমাদের কত উগ্র সাধনা করিয়ে নিয়েছেন। তিনি যে ভগবান্, তিনি যে এসেছিলেন জগৎকে মুক্তি দেবার জন্য, তা কি আমরাই প্রথমটা ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলাম? ক্রমে সাধনভজনের দ্বারা সে জ্ঞান পাকা হয়ে গেছে। অবশ্য তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হয়নি। তবে কাতর হয়ে ডাকলে, ব্যাকুল হয়ে চাইলে, তিনি কৃপা করেনও।"

শরীর ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। রক্তের চাপ মাঝে মাঝে বৃদ্ধি পায়। অথচ দীক্ষার্থী ও জিজ্ঞাসু ভক্ত নরনারীর আনাগোনা লাগিয়াই আছে। সেদিন শরীরটা খুবই অবসন্ন। ডাক্তারেরা কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। একজন দর্শনার্থী আসিলে সেবকটি সে কথা স্মরণ করাইয়া দেন। শিবানন্দজী বলিলেন—"আমি রামকৃষ্ণের চেলা। তাঁর অত ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও যখনই কেউ এসেছে, তার জন্য কত ভাবনা, কত আলাপ। আর আমি চুপ ক'রে বসে থাকব? শরীর খারাপ তা কি হবে? তোমরা এসে শুধু প্রণাম ক'রে চলে যাও—তোমরাই বা কি ভাববে? ভাববে—'রামকৃষ্ণের চেলা এই রকম।'

রামকৃষ্ণ-চেতনা ছিল মহাপুরুষ শিবানন্দজীর সাধনজীবনের পরম বৈশিষ্ট্য, এই চেতনার পূর্ণতাকে তিনি ধরিয়া নিয়াছিলেন আপন অভীষ্টরূপে। একবার এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার জীবনে এমন কোনো ঘটনা ঘটে নাই যাহা লিখিবার যোগ্য। তবে এক বিশেষের অপেক্ষাও বিশেষ ঘটনা আছে। তাহা—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চরণদর্শন ও তাঁহার কৃপা।... যিনি ইচ্ছামতো, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, তিনি ইচ্ছা করিয়া আমায় দয়া করিয়াছেন—এইমাত্র ঘটনা আমার জীবনে।"

স্বামী অপূর্বানন্দ রামকৃষ্ণ-ধৃত এই মহাজীবনের মূল্যায়ন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

"এই একটিমাত্র ঘটনা দ্বারাই কিন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এক গৌরবময় স্বর্ণ-যুগের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে সকল সৌভাগ্যবান্ সেই যুগটির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে উহার স্মৃতি চিরদেদীপ্যমান্ থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসঙ্ঘের গুরুপারম্পর্যে সেই যুগটিকে একটি সন্ধি-যুগ বলাও বোধ করি অন্যায় নয়। প্রাচীন অল্পপরিধিযুক্ত কিন্তু অগাধস্পর্শ বিদায় লইতেছে, পরবর্তী - বৃহৎ কিন্তু অগভীর বিস্তারলাভ করিতেছে। মহাপুরুষজী যেন প্রাচীনকে তাঁহার ভিতর বহুভাবে দেখিবার সুযোগ দিয়া গেলেন আর আগামীকেও ভগবদ্‌বিধানে অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সানন্দে আশীর্বাদ করিলেন।"

গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দজী শিবানন্দ মহারাজের এ সময়কার কৃপালীলা সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, "শেষ বয়সে শারীরিক নানা অসুস্থতা হেতু তাঁহাকে খুবই কষ্ট পাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি যেরূপে অবিচলিতভাবে সে সকল সহ্য করিতেন, তাহাতে মনে হইত যেন তাঁহার দেহজ্ঞান আদৌ ছিল না। সেই অবস্থাতেও বহু দূর দূর স্থানের অনেকলোক তাঁহার কৃপা ও আশীর্বাদ পাইবার জন্য আসিত। তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না, সকলকেই অকাতরে কৃপা করিতেন। পরের দুঃখ কষ্ট দেখিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না, অফুরন্ত কৃপা ভাণ্ডার খুলিয়া দিতেন। মানুষে এতটা সম্ভব হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর, মাতাঠাকুরাণী ও স্বামীজী প্রভৃতি সকলেই যেন তাঁহার ভিতরে থাকিয়া বহু লোককে উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ নিজেকে বাস্তবপক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে এত মিলাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার আর পৃথক সত্তাই ছিল না। তিনি যাহাদিগকে কৃপা করিয়াছেন তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা পাইয়াছে। তাঁহার উপদেশও ঠাকুরেরই উপদেশ।"

এই কৃপার শক্তি মহাপুরুষ শিবানন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার কৃপালু সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে। ঠাকুর তাঁহার সকল শক্তির উৎস,—এই পরম সত্যটি নিজের দীর্ঘ জীবনে এক মুহূর্তের তরেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাই দেখি মনীষী রমাঁ রল্যাঁকে তিনি লিখিতেছেন,—

"ঠাকুরের কৃপায় আমাদের আধারানুযায়ী উচ্চ উচ্চ জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর স্পর্শে, তাঁর ইচ্ছায় আমার নিজেরই তাঁর জীবৎ কালে তিনবার সমাধিলাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল—তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি সপ্রমাণ করতে আজও আমি বেঁচে আছি।"

শিবানন্দস্বামী সে-বার দেওঘরে অবস্থান করিতেছেন। একদিন তাঁহাকে বৈদ্যনাথ বিগ্রহ দর্শন করিতে নেওয়া হয়। মন্দিরের পূজারী ও পাণ্ডারা তাঁহাকে সসম্মানে ভিতরে নিয়া গেলেন। তারপর তাঁহাদের ব্যবস্থাপনায় যাত্রীদের স্রোত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তবে একথাও জানানো হইল, দর্শন ও পূজার জন্য শিবানন্দ মহা-

রাজকে সাত মিনিট সময় দেওয়া হইবে। এদিকে মন্দিরে ঢুকিয়া লিঙ্গ বিগ্রহকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবাই তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। নির্ধারিত কাল অতিক্রম হইয়া গেল তবুও তাঁহার কোনো হুঁশ নাই। অবশেষে নানা চেষ্টার পর তিনি বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন এবং সবাই ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনিলেন। ইহার পর তিনি আনন্দ সহকারে বার বার বলিয়াছিলেন, "বাবার কৃপায় আজ খুব দর্শন হল।"

এই সময় একদিন রাত্রিতে শিবানন্দ মহারাজ প্রবল হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হন। যন্ত্রণায় দম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম! এই সংকট সময়ে তিনি স্বেচ্ছায় ধ্যানমগ্ন হন এবং দেহবোধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সারা রাত্রি কাটাইয়া দেন।

পরের দিন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "বুড়ো বয়সের ধ্যান কিনা! অল্পক্ষণ পরেই মনটা একেবারে গভীরভাবে ভেতরের দিকে চলে গেল। তখন দেখি কোনো যন্ত্রণা নেই, কষ্ট নেই—স্থির প্রশান্তি। বাইরের ঝড়ঝাপটা সেখানে স্পর্শ করতে পরছে না।"

এক সেবক এই সময়ে প্রশ্ন করেন "ওটা কি ব্যাপার, মহারাজ!" মহাপুরুষ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ওই তো আত্মা?"

শিবানন্দজীর শরীর একে অসুস্থ, তদুপরি নিদ্রা নাই। সেবক ব্রহ্মচারীটি বলেন, "মহারাজ একটু ঘুমুবেন না?"

ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষ উত্তর দেন, "আমার আবার ঘুম কি রে?" সঙ্গে সঙ্গে সুর করিয়া গুনগুন স্বরে গাহিতে থাকেন—'ঘুম ভেঙেছে, আর কি ঘুমাই, যোগ যাগে জেগে আছি। এবার যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি। এবার আমি ভাল ভাব পেয়েছি, ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি। যে দেশে রজনী নেই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি। আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।'

নিদ্রার প্রসঙ্গে আর একদিন বলিলেন, "চণ্ডীতে আছে যে, মা ই সেই নিদ্রারূপিণী—'যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।' তিনি সকলের অধিষ্ঠানরূপিণী, চরাচর সমস্ত জুড়ে রয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। 'আধারভূতা জগতস্তমেকা।' সেই মা-ই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধার। আমার হৃদয় কন্দর আলোকিত ক'রে সর্বক্ষণ বিরাজ করছেন। তাঁকে দর্শন করলেই যে সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায়, ঘুমের আর দরকারই বোধ হয় না। যখন একটু শ্রান্তি বোধ করি তখনি মাকে দেখে নিই। ব্যস্ আনন্দম্। সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায়।"

মহানিশায় জপ ধ্যান করা স্বামী শিবানন্দ খুব পছন্দ করিতেন। একদিন গভীর রাত্রিতে উঠিয়া বসিয়া সেবক ব্রহ্মচারিটিকে কহিতে লাগিলেন, "দ্যাখ্, জপ করবি গভীর রাতে। মহানিশায় জপ করলে খুব শীঘ্র শীঘ্র ফল পাবি। সমগ্র মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যাবে। এত আনন্দ পাবি যে, জপ ছেড়ে আর উঠতে ইচ্ছা হবে না। এই তো আমার সেবার জন্য জেগে থাকতে হয়। এ সময় বসে বসে জপ করবি—বুঝলি? সময় বৃথা যেতে দিস্‌নি বাবা। তাঁর নামে ডুবে যেতে হবে, ভাসা ভাসা হলে কিছুই হবে না। যতটুকু করবি তন্ময় হয়ে করবি; তবেই আনন্দ পাবি। তাই তো ঠাকুর গাইতেন—"ডুব দেরে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।" যে কোনো

কাজে ডুবে যেতে না পারলে আনন্দ নেই। তিনি দেখেন—প্রাণ, আন্তরিকতা; তিনি সময় দেখেন না। আর ধ্যান জপ নিত্য নিয়মিতভাবে করলে তাতে মন শুদ্ধ হয় এবং সে ভাব হৃদয়ে পাকা হয়ে যায়। নিত্য নিরন্তর অভ্যাস করা চাই। গীতাতে ভগবান্ বলছেন—'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।' ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে নিত্য ডেকে যা, দেখবি যে সেই ব্রহ্মশক্তি কুলকুণ্ডলিনী জেগে উঠবেন, ব্রহ্মানন্দের রাস্তা খুলে দেবেন। সেই ব্রহ্মময়ী মা প্রসন্ন হলেই সব হল। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' সেই তিনিই প্রসন্না হয়ে মানবগণের মুক্তির জন্য বর প্রদান করেন। তিনি দুহাত বাড়িয়ে আছেন দেবার জন্য, কিন্তু নিচ্ছে কে? তাঁর কাছে একটু কাতর প্রাণে চাইলেই তিনি সব দিয়ে দেন—ভক্তি মুক্তি সব।

"বাড়িঘর ছেড়ে এসেছিস্ ভগবান লাভ করবি বলে। ঐ তো জীবনের উদ্দেশ্য। আসলে যেন ভুল না হয়ে যায়। খুব খেটে জপ ধ্যান স্মরণ-মনন ক'রে ঠাকুরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ক'রে নে, তখন খালি আনন্দম্—খুব মজায় থাকবি। সব দেহেরই নাশ আছে। আমাদের শরীরই বা আর কদিন? এই তো বৃদ্ধ শরীর। এখন চলে গেলেই হল—তখন সব অন্ধকার দেখবি। কিন্তু জপ ধ্যান ক'রে যদি ইষ্ট দর্শন ক'রে নিতে পারিস তা তখন দেখবি যে, গুরু, ইষ্ট একই এবং গুরু তোর হৃদয় মন্দিরেই চির প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। স্থূল দেহনাশে গুরুর নাশ হয় না। তোদের ভালবাসি বলেই এত বলছি। তোদের যাতে প্রকৃত কল্যাণ হয় তাই তো আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

স্বামী শিবানন্দের শেষ জীবনের ভাবময় প্রেমঘন মূর্তিটি প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লেখনীতে অপরূপ ব্যঞ্জনায় ফুটিয়া উঠিতে দেখি:

—এই সময় তিনি একটি ভালবাসার মূর্তি হইয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি ও সকলের জন্যই তিনি বিশেষ চিন্তা করিতেন এবং তাঁহাদের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিতেন, 'মহাপুরুষ মহারাজ' তাঁর অতি আপনার জন তাঁর নিজস্ব।

—কয়েক হাজার ব্যক্তির মানসিক দুঃখ কষ্টের ভার তিনি বহন করিতেন, যেন একটি ছোটখাট ভালবাসার রাজ্য তিনি চালাইতেন। তিনি প্রকাশ্য কর্মী ছিলেন না, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ কর্মী। সাধারণত, কর্মী বলিলে বুঝায় যিনি বহুপ্রকার চাঞ্চল্যকর কার্য করিতেছেন, কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ হইয়া তাঁর ভালবাসা হৃদগত শক্তি দিয়া অপরের নিজস্ব ভাবটি—অপরের নিজস্ব কর্মের ভাবটি, জাগ্রত করিয়া দিতেন। তিনি স্থির হইয়াও চঞ্চল ছিলেন; একস্থানে থাকিয়াও সর্বত্র বিচরণ করিতেন, বিশেষ কোনো চিন্তা না করিয়াও চিন্তা করিতেন।

—ভালবাসা ছাড়া তাঁহার আর একটি শক্তি—যাহার বিষয়ে পূর্বেও বলা হইয়াছে—উদ্ভূত হইয়াছিল গুণাতীত জ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। তর্ক, যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেচনার দ্বারা মানুষ যতটা উঁচুতে উঠিতে পারে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ তাহার বহু ঊর্ধ্বে উঠিতেন। তাঁহার সেই অবস্থার কথাগুলি এমনই মিষ্ট ও এমনই

সত্য হইত যে সেখানে বিচারবুদ্ধি চলে না। তিনি জগৎকে ও সৃষ্টিকে অন্য এক স্তর হইতে অন্য এক চক্ষে দেখিতেন। সাধারণ লোকে যেমন জগৎকে কারণ অন্তর্গত দেখে তিনি সেইরূপে দেখিতেন না। তিনি কারণ অতীত হইতে জগৎকে দেখিতেন।

—মহাপুরুষ শিবানন্দ আনন্দময়-লোকে তাঁহার মনকে সর্বদাই তুলিয়া রাখিতেন। জীবনের শেষভাগে যাঁহারা তাঁহার কথাবার্তা, ভাব ভঙ্গি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিয়া থাকিবেন যে তিনি অধিকাংশ সময় এই 'আনন্দময়-লোকেই' বিচরণ করিতেন বিদেহ না হইলে কেহই এই অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইহা হইল জীবন্মুক্ত পুরুষের বিশেষ লক্ষণ। মহাপুরুষ শিবানন্দ এই আনন্দময়-লোকে অবস্থান করিতেন বলিয়াই সমস্ত জগৎকে আনন্দময় দেখিতেন। এইজন্য জীর্ণ দেহে নানাপ্রকার কষ্টের মধ্যেও তিনি সর্বত্র 'আনন্দ' বা 'ব্রহ্ম' দেখিতেন।

—যে আনন্দ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি বা ব্যক্ত করি সে আনন্দ দেহজ; কিন্তু মহাপুরুষ শিবানন্দ যে আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা সৎ, চিৎ, আনন্দের। সে অবস্থায় মাত্র আনন্দের অংশটুকু প্রকাশ করা হয়। চিৎ অবস্থায় মন যাইলে মনে বৃত্তি, চঞ্চল ভাব স্পন্দন তিরোহিত হয়। মন তদূর্ধ্বে উঠিলে সৎ বা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। সৎ অব্যক্ত ও স্বয়ং। এই দুই অবস্থার বিষয় কেহই প্রকাশ করিতে পারেন না—কেবলমাত্র বিকাশমুখী আনন্দ অপেরিবস্তর প্রকাশ করিতে পারেন। এইজন্য জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ জগৎকে আনন্দময় ধাম দেখিতেন, কিন্তু স্বয়ং তদূর্ধ্বে অবস্থায় চলিয়া যাইতেন। সে অবস্থা প্রকাশ করিবার নয়। 'সৎ, চিৎ, আনন্দের' এক অংশ তিনি জনসমাজের কাছে ব্যক্ত করিতেন, অপর দুই অংশ তিনি নিজেই হইয়া যাইতেন, কারণ সেই অবস্থা বাক্য মনের অতীত—অবাঙ্ মনসোগোচরম্।

মঠের এক ব্রহ্মচারী অনবধানতা বশত সেদিন শিবানন্দজীর একটি নির্দেশ পালন করে নাই। নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া বার বার সে ক্ষমা চাহিতে থাকে।

মহাপুরুষ ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ঠিক বুঝেছ। এখানকার কথা শুনে চললে তোমাদের কল্যাণ নিশ্চয় হবে। এখান থেকে এখন যে সমস্ত কথা বেরুচ্ছে, সে সব ঠাকুরের কথা বলে জানবে। এখন ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছি।" মনের দুয়ার তখন আলগা ছিল, তাই তাদাত্ম্য বোধের স্বীকৃতি হঠাৎ এদিন শোনা গেল সিদ্ধকাম মহাপুরুষের মুখে।

স্বল্পবাক গম্ভীর পুরুষ, শিবানন্দজীর মধ্যে এই সময়ে এক এক দিন যেন মধুর স্বভাব বালকের মুখরতা আসিয়া হাজির হইত। স্বীয় আনন্দময় অনুভূতির কথা আর যেন চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না।

সে-বার তিনি কাশীধামে আসিয়াছেন। সকালবেলায় আশ্রমের সন্ন্যাসীরা একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে। এমন সময় একজনকে সম্বোধন করিয়া আনন্দভরে কহিতে লাগিলেন, "দ্যাখ, কাল রাতে একটা ভারী মজা হয়েছে। গভীর রাত, শুয়ে আছি। হঠাৎ দেখি যে এক শ্বেতকায় পুরুষ, জটাধারী ত্রিনয়ন—সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিব্য কান্তিতে চারিদিক আলোকিত হয়ে গেছে। আহা! কী সুন্দর কমনীয় মূর্তি - কী সকরুণ চাউনি! তাঁকে দেখবামাত্রই ভিতর থেকে মহাবায়ু একেবারে গড় গড় ক'রে উপরের দিকে উঠতে লাগলো। ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লাম…

আর খুব আনন্দ। এমন সময় দেখি যে, মূর্তিটি ক্রমে বিলীন হয়ে গেলেন, আর তাঁর স্থানে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন—সহাস্য বদন, আমার হাত ধরে ইসারা ক'রে বললেন, 'তোর এখন থাকতে হবে, আরও কিছু কাজ আছে।' ঠাকুরের এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার নিচের দিকে আসতে লাগলো এবং প্রাণবায়ুর ক্রিয়াও চলতে লাগলো। সবই তাঁর ইচ্ছা। আমি কিন্তু বেশ আনন্দে ছিলাম। তিনি আর কেউ নন সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ।"

এই দর্শনের পর হইতেই শিবানন্দ স্বামীর মন সর্বক্ষণ এক অতি উচ্চ অধ্যাত্ম ভূমিতে অবস্থিত থাকিত। আহার নিদ্রায় দেখা যাইত বিস্ময়কর নির্লিপ্তি। ডাক্তারেরা এটিকে বায়ুরোগ বলিয়া ধরিয়া নেন এবং তদনুযায়ী চিকিৎসাও করিতে থাকেন।

মঠের এক সন্ন্যাসীর মনে কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ উপজিত হয়। তিনি গোপনে মহাপুরুষকে বলেন, "মহারাজ, ডাক্তারেরা বলেছেন, এটা বায়ুরোগ। আমার কিন্তু তা মনে হয় না, বোধহয় এটা যোগজ। কাশীতে আপনার কি কোনো দর্শনাদি হয়েছিল? কাশী হতে আসার পর থেকেই এর সূত্রপাত দেখছি।"

শিবানন্দ স্বীকার করিলেন, "হ্যাঁ, কাশীতে এক শুভ্র, জ্যোতির্ময় যোগীমূর্তি দেখি, তারপর থেকেই এই রকম হয়েছে।"

ভক্ত ও দীক্ষাপ্রার্থীর সংখ্যা এ সময়ে কেবলই বৃদ্ধি পাইতেছে। একদিন মঠের এক সন্ন্যাসীকে শিবানন্দ বলিতে থাকেন, দ্যাখ্‌, স্বয়ং ঠাকুরই প্রেরণা দিয়ে লোকদের এখানে আনছেন, আর এই শরীরটার মধ্যে বসে সকলকে কৃপা করছেন। নইলে আমায় দেখে এত লোক আসবে কেন? আমি তাঁর নাম স্মরণ মনন করি, অন্য কিছু জানিনে। যারা এখানে আসে আমি সকলকে তাঁরই পায়ে সঁপে দিই। বলি, 'এই নাও ঠাকুর তোমার জিনিস তুমি নাও।' লোকে যেমন নানা ফুল দিয়ে তাঁর চরণ পুজো করে, আমিও তেমনই নানা রকম মানুষ অঞ্জলি ক'রে তাঁর পায়ে ঢেলে দিই। তা সকলকে তিনি গ্রহণ করছেন স্পষ্টই দেখতে পাই।"

এক একদিন দিব্য উদ্দীপনা ভাব। আশীর্বাদ প্রার্থীদের বলিতেন, "ফ্লোয়িং, ফ্লোয়িং, ফ্লোয়িং, আশীর্বাদ তো সর্বদাই বয়ে যাচ্ছে। কিছু ভাবনা নেই। সব হয়ে যাবে। এমনি বলছি যে তা নয়—ঠিক্।

আবার এক একদিন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বলিতেন, "যে আসবে কাউকে ফেরাব না। আমি মা গঙ্গা হয়ে গেছি।"

কোনো কোনো দিন মহাপুরুষের সর্বসত্তায় মহাভাবের মাতামাতি আরম্ভ হইয়া যাইত। আনন্দে তিনি তখন গর্গর মাতোয়ারা। ভাবের উপসম ঘটিলে ভক্তসেবকদের ডাকিয়া বলিতেন, "শরীরে যেন একটা ডাকাত ঢুকেছিল। কালী কীর্তন হতেই ছেড়ে গেল। বাপরে বাপ, শরীরটা যেন তছনছ ক'রে দিয়ে গেছে। এ রকম ভাব ঠাকুরের হত। আমি তো তাঁরই সন্তান। কুছ নহী তো থোড়া থোড়া তো আছে?"

শরীরে হাঁপানি ও রক্তচাপের যন্ত্রণা খুব চাপিয়া বসিয়াছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই। মাঝে মাঝে সিদ্ধ সাধক দ্রষ্টা স্বরূপে বলিতে থাকেন, "আজকাল একটা ভারী মজা দেখছি। এটাকে অবলম্বন ক'রে দুটো ব্যাপার চলছে—একটা শরীরের আর একটা আত্মার। শরীরের দিক থেকে ব্যাধি ইত্যাদি কত কি, আত্মার দিক থেকে নির্মল আনন্দ—বেশ আনন্দ হয় দেখে, আর ভেবে।"

কিছুদিন যাবৎ শিবানন্দজীব অধ্যাত্মজীবনে আত্মপ্রকাশ কবে পবম অনুভূতিব একটা বিশেষ অবস্থা। দর্শনার্থী ভক্ত, মঠেব ব্রহ্মচাবী সন্ন্যাসী যে কেহ তাঁহাব সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহাকেই ভক্তিভবে কবজোড়ে তিনি প্রণাম নিবেদন কবেন। কেহ বিস্মত হন, কেহ বা ভয়ে সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া পড়েন।

একদিন গভীব বাতে বোগশয্যায় শুইয়া আছেন, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে সেবক সন্ন্যাসীটিকে কবজোড়ে প্রণাম জানাইলেন। এই সেবকটি তাঁহাব দীক্ষিত শিষ্য। ভীত স্ববে তিনি বলিয়া উঠেন, "মহাবাজ, এভাবে প্রণাম ক'বে আমায় আর পাপেব ভাগী কববেন না।"

শিবানন্দ মহাবাজ শান্ত স্ববে কহেন, "আসল ব্যাপাবটা কি জানিস্ যখনই লোকজন সামনে আসে তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীব মূর্তি দেখতে পাই, তাই সেই সেই দেবতাদেব প্রণাম কবি। কোনো লোক সামনে এলেই প্রথমটা তাব ভেতবকাব যা সত্তা সেই সত্তা অনুসাবে কোনো ঈশ্ববীয় জ্যোতির্ময় বূপ সামনে আবির্ভূত হন। লোক-জন তখন ছায়াব মতো অস্পষ্ট, আব ঈশ্ববীয় বূপেই স্পষ্ট ও জীবন্ত দেখায়। তাই তো প্রণাম করি। প্রণাম কবাব পবে ঈশ্ববীয় বূপ অন্তর্ধান হয়। তখন লোকজনকে স্পষ্ট দেখতে পাই, চিনতেও পাবি।"

উচ্চতব দিব্য অনুভূতিসমূহ তখন তবঙ্গায়িত হইতেছে শিবানন্দেব সাধনসত্তায়। একদিন আপন মনে সেবকদেব কহিতে লাগিলেন, "কৃপা—কৃপা—কৃপা। তিনি কৃপা ক'বে বোঝালে সবই সম্ভব, নইলে কি ক'বে তাঁকে বুঝবে? দেখতে তো সাধাবণ মানুষেব মতো—খাচ্ছেন, শুচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, শৌচাদি কবছেন। কিন্তু তাবই ভেতবে যে এত কাণ্ড তা কি ক'বে লোকে বুঝবে বল, বিশাল শক্তিব খেলা যত দিন যাবে ততই লোক দেখতে পাবে। ধর্মজগতে একটা মহা ওলটপালট হয়ে যাবে। সে-সব ঠাকুব কৃপা ক'বে কত যে দেখিয়ে দিচ্ছেন তা আব কাকে বলব? কাকেই বা বলি, আব কেই বা ওসব বুঝবে? তিনি কত কি জানিয়ে দিচ্ছেন। তাব বিষয়ে কত কথা যে প্রাণেব ভিতব (বুকে হাত দিয়া দেখাইয়া) গজ্‌গজ্‌ কবছে, কাউকে তো তা বলবাব জো নেই। কেউ ওসব বুঝতে পাববে না। তোমাদেবও বলতে পাবিনি। এমনকি তোমবাও ওসব বুঝতে পাববে না। মহাবাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যতদিন ছিলেন, তাঁব কাছে প্রাণ খুলে ওসব কথা বলতুম, বলে প্রাণটা খোলসা হ'ত। তিনিও আনন্দ পেতেন, আমাবও আনন্দ হ'ত। সে-সব অতি গুহ্য কথা। তাঁব সঙ্গে নিবিবিলিতে কত সব কথা হয়েছে। তিনিও অনেক সময় নিজেব অনেক কথা বলতেন। এখন তো আব তা হবাব জো নেই। এখন সে-সব অনুভূতি, সে-সব কথা প্রাণেব ভেতবই বয়ে যাচ্ছে, বলবাব লোকই পাইনে। সবই যে তাব ইচ্ছা। তবে আন্তবিক প্রার্থনা কবছি, জগতেব কল্যাণ হোক্, তোমাদেব কল্যাণ হোক্, তোমবা সব শান্তিতে থাক।"

স্বামী শিবানন্দেব শবীব এখন প্রায় পতনোন্মুক্ত, অন্তর্লোকে নিবন্তব চলিয়াছে মা-ব্রহ্মময়ীব কৃপা আস্বাদন। সেদিন নিজেব সম্বন্ধে সেবক শিষ্যদেব বলিতে থাকেন, 'কামনা-বাসনা থাকলে চিবশান্তি লাভ কবা অসম্ভব, আব সেই কামনা-বাসনা ভগবৎ-কৃপা ছাড়া সমূলে বিনষ্ট হওয়াও সম্ভবপব নয়। ঠাকুব কৃপা কবে আমাব সব কামনা-বাসনা একেবাবে মুছে দিয়েছেন; কোনো বাসনা নেই। এই শবীবটা কেবল তাঁব

ইচ্ছায়, তাঁরই কাজের জন্য রয়েছে, আমি হচ্ছি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। এ শরীরটাও যে আছে তাই অনেক সময় মনে হয় না। তবে প্রভুর অনেক কাজ এই শরীর দিয়ে করাচ্ছেন, তাই তিনি এই শরীর এখনও রেখেছেন। আমার কিন্তু কোনো বাসনা নেই, বুঝলি আমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ!'—এই বলে ধীর স্থির হয়ে বসে রইলেন। তখন তাঁর চেহারা একেবারে বদলে গেছে, তিনি যেন এক নূতন লোক। তাঁর দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পরে আপন মনেই বলতে লাগলেন—'মা আমায় কৃপা ক'রে সব দিয়েছেন। তাঁর ভাণ্ডার খালি ক'রে আমায় পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছেন। আমার আর কিছু চাইবার নেই। তাঁর কৃপায় সব লাভ হয়েছে—যং লব্ধ্বাচাপরং লাভং মন্যতেনাধিকং ততঃ। তবু যে তিনি এ শরীরটা কেন রেখেছেন তিনিই জানেন।'

গভীর রাত। মহাপুরুষজী তাঁর নিজের খাটে বসে আছেন—ধ্যানস্থ। অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পর আপন ভাবে এক একবার চোখ মেলে দেখে আবার চোখ বুজে বসে আছেন। এমন সময় হঠাৎ একটা বেড়াল ঘরের মেঝের উপর মিউমিউ ক'রে ডেকে উঠলো। তিনি সেদিকে তাকিয়ে হাত জোড় ক'রে বেড়ালের উদ্দেশে প্রণাম করলেন। তিনি যে বেড়ালকে প্রণাম করছিলেন নিকটস্থ সেবক প্রথমটায় তা বুঝতেই পারেনি। সেজন্য সে একটু সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি বললেন —'দ্যাখ ঠাকুর আমায় এখন এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, সবই দেখছি 'চিন্ময়', ঘর-দোর, খাট-বিছানা এবং সর্বপ্রাণীর ভেতরই সেই এক চৈতন্যের খেলা—কেবল নামের ভেদমাত্র, কিন্তু মূল সব একই। বেশ পরিষ্কার দেখছি, চেষ্টা ক'রেও সে ভাবটা সামলাতে পারছি না। সবই চৈতন্যময়। এই বেড়ালের ভেতরও সেই চৈতন্যের প্রকাশ জ্বলজ্বল করছে। এই ভাবেই ঠাকুর আজকাল আমায় ভরপুর ক'রে রেখেছেন। লোকজন আসে যায়, কথাবার্তা বলতে হয় বলি, সাধারণ কাজকর্ম আহারাদি করতে হয় করি। যেন অভ্যাসবশত ক'রে যাই। কিন্তু এসব থেকে মন একটু তুলে নিলেই দেখি যে, সর্বত্রই সেই চৈতন্যের খেলা। নামরূপ এসব তো অতি নিম্ন স্তরের ব্যাপার। নামরূপের ওপরে মন গেলেই বাস্। তখন সবই চৈতন্যময়, আনন্দময়! এসব বলে বোঝাবার জিনিস নয়। যার সে অবস্থা হয় সেই জানে।' আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঐটুকু বলেই হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। সেবক মুগ্ধ প্রাণে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল[১]।"

শিবানন্দজীর রোগজীর্ণ দেহটিকে নিয়া সেবকগণ অতিশয় বিব্রত, দিবারাত্র তাহাদের উৎকণ্ঠার সীমা নাই। নিজ দেহের নশ্বরতার কথা মহাপুরুষ যেমন বলিতেন আবার তেমনি উদ্দীপনা ভরে বলিতেন, "এই শরীরের জন্য তোমাদেরও কত কষ্ট দিচ্ছি! এতটা করি কেন, জান? এ দেহ তো সাধারণ দেহের মতো নয়। এর একটা বিশেষত্ব আছে। এ শরীরে ভগবান্-উপলব্ধি হয়েছে। এ শরীর ভগবানকে স্পর্শ করেছে, তাঁর সঙ্গে বাস করেছে, তাঁর সেবা করেছে। এই শরীরটাকে তিনি যুগধর্ম প্রচারের মন্ত্রস্বরূপ করেছেন—তাই এত।"

তাঁহার শরীর খারাপ বলিয়া ভক্ত শিষ্যদের ঠেকানোর উপায় নাই। কারণ,

---

১ শিবানন্দ বাণী : উদ্বোধন

ডাক্তারেরা নিষেধ করিলেও তিনি মানিতে চাহেন না। বিদায় লগ্নে সিদ্ধকাম শিবানন্দ যেন সদাব্রত খুলিয়া বসিয়াছেন।

এ সময়ে সর্ব অস্তিত্বে তিনি ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শ পাইতেছেন। মাঝে মাঝে তাই বলিয়া উঠেন, "ঠাকুর ব্যাপক হয়ে রয়েছেন, সর্বদা শ্বাসে শ্বাসেই তাঁর দর্শন পাচ্ছি।"

কোনো ভক্ত বা আগন্তুক মঠে আসিয়া প্রসাদ না পাইয়া চলিয়া গেলে সেবক সন্ন্যাসীদের আর রক্ষা নাই। ভাণ্ডারীকে ভয়ে ভয়ে সদা সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়।

বৃদ্ধ জেলে পূর্ণ হালদার গঙ্গায় তাহার ছোট ডিঙিতে বসিয়া মাছ ধরিতেছে, তাহার সব কিছুই ডবল দামে বেলুড় মঠকে কিনিয়া রাখিতে হইবে—বড় দুঃস্থ সে, তাঁহার দুঃখের কথা প্রাণ খুলিয়া একদিন সে শিবানন্দজীকে জানাইয়া দিয়াছে।

উৎসবের কুলী মজুর, পাড়ার বাগ্দী, সাঁওতাল ভৃত্য, দারোয়ান সকলেরই 'বাবার' কাছেই দরকার। বারান্দায় দাঁড়াইয়া 'বাবা' তাঁহাদের খোঁজখবর নেন, প্রয়োজন বোধে নোট টাকা ছুঁড়িয়া ফেলেন, দরাজ মনে আদেশ দেন, 'ভাণ্ডারসে লে যাও।'

ঠাকুর শব্দ উচ্চারণেই হয় দিব্যভাবের উদ্দীপন। পূজারীকে দেখিলেই ঠাকুরের কালের আনন্দস্মৃতি উদ্বেল হইয়া উঠে। মা হংসেশ্বরীর মূর্তিটি দেখিলে হন আনন্দে মাতোয়ারা।

গায়ক হয়ত তাঁহার সম্মুখে মায়ের নাম গাহিতেছেন, আর শিবানন্দ মহারাজ মুহূর্তে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছেন। আনন্দবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গায়ককে বলিতেছেন, "যা যা—পালা পালা। এঃ হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলে! এ যেন শুকনো দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে রয়েছে। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'একটুতেই দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে'—তাই হয়েছে।"

এমনভাবে দিনের পর দিন তাঁহার সাধন-সত্তায় লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে ভাব-জলধির বিচিত্র তরঙ্গমালা। কখনো মায়ের কথা, কখনো ঠাকুরের কথা নিয়া নানা-ভাবে চলিছে মধুর আস্বাদন।

দিব্য অনুভূতির শিখরদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া স্বামী শিবানন্দ এবার বিরাজিত 'ভাবমুখে'। মা ব্রহ্মময়ীর অঙ্কে বসিয়া আছেন—মায়ের বালকটি। সেদিন এক স্নেহ-ভাজন ব্রহ্মচারীকে—জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, তুই কি পড়ছিস্ আজকাল?"

"আজ্ঞে, মাণ্ডূক্যকারিকা পড়ছি," সবিনয়ে উত্তর দেন নবীন সাধক।

"দূর শালা। ওতে কি আমার মায়ের নাম আছে?" পরমানন্দে বলিয়া বসেন শিবানন্দ মহারাজ।

সর্ব বন্ধনহীন, শুদ্ধম্ অপাপ বিদ্ধম্ এই কুসুমপেলব বৃদ্ধ শিশুর আননে সদা স্ফুরিত রহিয়াছে দিব্য জ্যোতির আভা। জগৎপ্রপঞ্চে ওতপ্রোত পরমসত্তার মধ্যে নিজেকে যেন নিরন্তর তিনি বিস্তারিত করিয়া দিতেছেন।

অপূর্ব তাঁহার এসময়কার শিশু-লীলা। বিছানায় বসিয়া মহাপুরুষ কখনো শালিক ময়নাকে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ডাকিতেছেন। কখনো বা খেলনার ডমরু শব্দে দিতেছেন দূরে তাড়াইয়া।

হঠাৎ একদিন আব্দার ধরিলেন, রিস্ট্‌ওয়াচ একটি এখনি তাঁহার চাই। তখনি তাহা আসিয়া গেল। দুই একবার হাতে বাঁধিবার পর আর উহার কোনো প্রয়োজন রহিল না।

১৯৩২ সালের কথা। কোনো কোনো দিন দেখা যাইত এই সিদ্ধ মহাপুরুষ বালকবৎ অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। "বিছানার উপর কথামৃত, গীতা, চণ্ডী, হিতোপদেশ, ঠাকুমার ঝুলি, একটি খঞ্জনী, লাঠি, ছবির বই—ইত্যাদি নানা জিনিস নিয়ে বসে আছেন - যেন পাঁচ বছরের একটি বালক। আর ইচ্ছানুরূপ সব জিনিস নাড়াচাড়া করছেন। হয়তো একটু খঞ্জনী বাজালেন, ঠাকুমার ঝুলি একটু পড়লেন, আবার কখনো বা হাসতে হাসতে লাঠি হাতে সেবকদের শাসাচ্ছেন। তিনি যে কেন এরূপ আচরণ করতেন তার একটু আভাস পাওয়া যায়—তাঁর একদিনকার কথা থেকে। জনৈক সেবককে কথায় কথায় বলেছিলেন—'দ্যাখ্‌, মনটা সব সময়ই নির্গুণের দিকে ছুটে যেতে চায় ; তাই এসব পাঁচ রকম নিয়ে মনটাকে নামিয়ে রাখার চেষ্টা করি। মা যেমন খেলনা দিয়ে ছেলেদের ভুলিয়ে রাখেন, তেমনি আমিও মনকে পাঁচ রকমে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি।"

মঠের প্রবীণ সাধকেরা বুঝিলেন, নির্গুণ পথের অভিযাত্রী নির্বাণোন্মুখ এই মহাসাধককে আর বেশীদিন ধরিয়া রাখার উপায় নাই।

শেষ বিদায়ের দিনটি আসিয়া পড়িতেছে। আজকাল শিবানন্দ মহারাজ মাঝে মাঝে তাঁহার বিদেহী গুরুভ্রাতাদের দর্শন লাভ করেন। একদিন ভক্তদের বলিলেন, "কাল খুব ধ্যান হয়েছিল। এইসব রাজ্য ছেড়ে, দেহজ্ঞান ছেড়ে মন চলে গিয়েছিল ঊর্ধ্বলোকে। স্বামীজীকে দেখলাম। একটা জ্যোতির সুতোর মতো ঝুলছে, সেটিকে ছেড়ে দিয়ে স্বামীজী নিচে এসেছিলেন। মহারাজকেও দেখেছি তিনিও রয়েছেন। বেশ আনন্দে ছিলাম।"

আর একদিন জানাইলেন, "এই মাত্র স্বামীজী ও মহারাজ এসেছিলেন। আর বললেন, 'চল তারকদা।' তোরা কেউ দেখতে পেলিনে? এই যে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

মারাত্মক সন্ন্যাস রোগে শিবানন্দ স্বামী আক্রান্ত হইয়াছেন। মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা, গৃহস্থ ভক্তেরা, সেবার কোনো ত্রুটি হইতে দিতেছেন না। স্যর নীলরতন প্রভৃতি সুবিজ্ঞ ডাক্তারেরা প্রাণপণ চিকিৎসা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার শরীরের কোনো উন্নতি দেখা যাইতেছে না। স্যর নীলরতন সেদিন পরম শ্রদ্ধাভরে মন্তব্য করিলেন, "যে ক'রেই হোক এঁকে আপনারা আট্‌কে রাখুন। বলুন তো এমন মহাপুরুষ চলে গেলে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে?"

গুরুভাই বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সেদিন এলাহাবাদ হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন স্বামী শিবানন্দকে দর্শনের জন্য। তিন দিন পরে, বিদায় নিতে গিয়া প্রণাম করিতেছেন, এমন সময়ে শিবানন্দজী নীরবে বাম হাতটি তাঁহার মাথায় রাখিলেন। এই ঘটনাটির প্রসঙ্গে উত্তরকালে বিজ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন, "যেদিন মহাপুরুষ মহারাজ আমার মাথায় হাত দিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই মনের ভাব একেবারে বদলে গেল। তাঁর ভাবটা যেন আমার ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। এখন মনে হচ্ছে, যে পর্যন্ত আমার

গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকবে, সে পর্যন্ত যে আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে যাবো।"

১৯৩৪ সালের ২০শে এপ্রিল রোগের সংকট ঘনাইয়া আসে, ডাক্তারেরা বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করেন। মঠবাড়ি ও মঠপ্রাঙ্গণে শোকাকুল নরনারী ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। সাধুরা স্বামী শিবানন্দের শয্যা ঘিরিয়া বসিয়া আছেন, নিরন্তর শুনাইতেছেন সদ্‌গুরুর পবিত্র নাম। মহাপুরুষের সারা দেহে তখন দেখা দিতেছে পুলক রোমাঞ্চ। দিব্য আনন্দের জ্যোতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাঁহার মুখে চোখে।

"শেষ মুহূর্ত যতই নিকটবর্তী হইতেছে তাঁহার অঙ্গে পুলক আরো ঘন ঘন হইতে লাগিল। মুখ স্মিত প্রশান্ত। অপরাহ্ণ ৫টা ৩৬ মিনিটের সময় হঠাৎ মহাপুরুষজীর বদনমণ্ডল এক অপূর্ব আনন্দ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুল এবং সর্ব শরীরে লোম কদম্বফুলের মতন খাড়া হইয়া উঠিল এবং একটু পরেই মুখ দিয়া অন্তিম নিঃশ্বাস নির্গত হইল। সেই পুলকিত অবস্থা অনেকক্ষণ ছিল[১]।"

বেলুড় গঙ্গাতীরে শত শত শোকাকুল নরনারীর সম্মুখে সেদিন ভস্মীভূত হয় মহাসাধক শিবানন্দ স্বামীর মরদেহ, আর এই সঙ্গে নির্বাপিত হয় রামকৃষ্ণ দেউলের একটি সুপবিত্র আলোকবিস্তারী দীপশিখা।

---

১ মহাপুরুষ শিবানন্দ : অপূর্বানন্দ

নিত্যানন্দ অবধূত

বীরভূমের একচক্র গ্রাম। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সেদিন ধীর পদে এ গ্রামের হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মস্তকে জটার ভার, গৌরকান্তি দীর্ঘবপু এই অভ্যাগতকে দেখিয়া পণ্ডিতের আনন্দের সীমা নাই। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া যুক্তকরে কহেন, "প্রভু, কৃপা ক'রে দর্শন যখন দিয়েছেন, আজ আমাদের সেবার অধিকার দিন। এখানেই রাত্রি যাপন করুন।"

স্মিতহাস্যে হস্ত উত্তোলন করিয়া সন্ন্যাসী আশীর্বাদ জানান। বুঝা গেল, এ রাত্রির মতো আতিথ্য গ্রহণে তাঁহার আপত্তি নাই। হস্ত পদ প্রক্ষালনের জল দেওয়া হইলে তিনি আসন বিছাইয়া বসিলেন।

পণ্ডিতের বালক-পুত্র কুবের। খেলাধূলা সাঙ্গ করিয়া সবে মাত্র বাড়ি ফিরিয়াছে। ছুটিয়া আসিয়া অতিথির চরণে সে দণ্ডবৎ করিল।

সন্ন্যাসীর চোখে এ কোন্ বিদ্যুতের ঝলক? স্থির, প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে তিনি এই বালকের দিকেই চাহিয়া আছেন। কাঁচা সোনার মতো তাহার রং, সুন্দর সুঠাম অঙ্গখানি লাবণ্য ঢলঢল। চোখে-মুখে দিব্য আনন্দের আভা। হাড়াই পণ্ডিতের এ পুত্রটি মায়ামুক্ত সন্ন্যাসীকে আজ কোন্ আকর্ষণে ফেলিতে চাহিয়াছে? এ কোন, জন্মান্তরের সম্বন্ধ? আজিকার এ সাক্ষাতের অন্তরালে কোন্ গূঢ় দৈবী ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা কে বলিবে? সর্বত্যাগী পরিব্রাজকের দৃষ্টি বালকের দিকে বার বার নিবদ্ধ হইতে থাকে।

পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রীর সেবা-যত্নের অবধি নাই। অতিথি পরম পরিতুষ্ট হইলেন, ভগবৎ কথাপ্রসঙ্গে ও আনন্দে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইল।

পরের দিন প্রভাতে পণ্ডিতকে ডাকিয়া সন্ন্যাসী যা বলিলেন তাহাতে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কহিলেন, "দ্যাখো বাবা, আমি নানা তীর্থ পর্যটনের জন্য বার হয়েছি, বয়স যথেষ্ট হয়েছে দেখাশুনা করবার মতো সঙ্গে কেউ নেই। আমি ভাবছি কি, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবেরকে আমার সঙ্গে নেব। তোমাদের কোন ভয় নেই, পুত্রাধিক স্নেহে তাকে আমি রক্ষণাবেক্ষণ করবো, তীর্থ ও ধর্ম উভয়ই তার লাভ হবে কুল পবিত্র হবে। এতে তোমার সম্মতি চাই।"

হাড়াই পণ্ডিত নিস্তব্ধ নির্বাক। ভাবিয়া আকুল হইলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবের তাঁহাদের নয়নমণি, তাহাকে বিদায় দিতে গেলে যে হৃদয় ভাঙিয়া যাইবে। আবার সম্মতি না দিয়াই বা উপায় কি? সন্ন্যাসীর ক্রোধে হয়তো ইহকাল পরকাল উভয়ই যাইবে। হাড়াই নিজে ভগবদ্ভক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ। কিছুটা স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, মানুষ তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিতে পুত্রের কতটুকু কল্যাণ সাধন করিতে পারে? তবে এ শক্তিধর সন্ন্যাসীর হাতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিই না কেন? এমন যে পরাক্রমশালী রাজচক্রবর্তী দশরথ, তিনিও ঋষি বিশ্বামিত্রের হাতে প্রাণপ্রিয় পুত্র দুইটিকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

চিন্তাকুল হৃদয়ে পণ্ডিতপ্রবর পত্নী পদ্মাবতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। এ বিষয়ে তাঁহার মতও যে নেওয়া চাই। সন্ন্যাসীর এ অনুরোধের কথা তাঁহাকে জানাইলেন।

পদ্মাবতীর মনে পড়িল কয়েকদিন আগেকার এক ঘটনা। বালক কুবের হঠাৎ সেদিন এক ভাবের ঘোরে মূর্ছিত হইয়া পড়ে, তারপর শুশ্রূষার ফলে তাহার সংজ্ঞা-লাভ হয়। উৎকণ্ঠিতা মায়ের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, "মাগো, হঠাৎ কি জানি কেন আমার চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল। তারপর সে অবস্থায় আমি স্বপ্ন দেখলাম এক দিব্যকান্তি মহাপুরুষের সঙ্গে আমি দূর-দূরান্তের তীর্থস্থানে বেড়াচ্ছি। তারপর যে সব দৃশ্য ভেসে এল তা মনে নেই।"

মায়ের মনে পুত্রের সেই কথারই স্মৃতি আজ আলোড়ন তুলিয়া দেয়। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার তাঁহার সীমা নাই। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্বামীকে শুধু কহিলেন, "ওগো, ধর্মের দিকে চেয়ে যা তুমি স্থির করবে তাতেই আমার মত।"

পণ্ডিত তাঁহার জীবনসর্বস্ব এই পুত্রকে সন্ন্যাসীর করে অর্পণ করেন। সারা গ্রামে ঘনাইয়া আসে বিষাদের ছায়া। দ্বাদশ বৎসরের বালক কুবের দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেদিন ঘরের বাহির হইয়া পড়েন, আর সেখানে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন নাই। পর্যটন, পরিব্রাজন ও অবধূত জীবনের নানা পর্যায় অতিক্রম করিয়া কুবের একদিন ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু একচাকার নয়—নবদ্বীপে, প্রেমভক্তি প্রচারের এক প্রেরিত পুরুষরূপে। নাম তখন—নিত্যানন্দ অবধূত। শ্রীচৈতন্যের কীর্তন নর্তনে নদীয়া তখন টলমল, শক্তিধর নিত্যানন্দের আবির্ভাবে এই আনন্দের স্রোতে জোয়ার জাগিয়া উঠে। অদ্বৈত প্রভু ইঁহারই স্তুতি সেদিন গাহিয়া উঠেন :

তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি
তুমি সে চৈতন্যের বক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি।

হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে সন্ন্যাসী সেদিন বুঝিবা এক ঐশী ইঙ্গিতেই আসিয়া আবির্ভূত হন, বালক কুবেরের জীবনধারাটিকে অর্গলমুক্ত করিয়া দেন। দেশ-দেশান্তর অতিক্রম করিয়া চৈতন্য-প্রেমের সমুদ্রে আসিয়া একদিন তাহা ঝাঁপাইয়া পড়ে।

চতুর্দশ শতকের কথা। একচাকা গ্রামে তখন এক সম্পন্ন ও ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন। গৃহস্বামীর নাম সুন্দরমল্ল। বংশের উপাধি বাঁড়ুরী। লোকে ডাকিত ওঝা বলিয়া। যজনযাজন ও অধ্যাপনায় তাঁহার সংসার চলে, বিত্ত ও প্রতিপত্তি কোনো কিছুরই তাঁহার অভাব নাই। কিন্তু পণ্ডিতের মনে বড় কষ্ট, সন্তান হইয়া প্রায়ই বাঁচে না। বহু পূজা আরাধনা ও শান্তি স্বস্ত্যয়নের পর এক পুত্র জন্মিল, উমা মহেশ্বরের চরণে তাহাকে সমর্পণ করিয়া নাম রাখিলেন, হাড়াই। পোশাকী নাম মুকুন্দ বাঁড়ুরী।

বিদ্যাবত্তা ও চরিত্রগুণে এ পুত্র ক্রমে খ্যাতিমান হইয়া উঠেন। বংশের যিনি একমাত্র পুত্র, বাপ-মা তাই আদর করিয়া অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ দেন। সম্ভ্রান্ত বংশের সুলক্ষণা কন্যা পদ্মাবতীকে পুত্রবধূ রূপে তাঁহারা ঘরে আনেন। ইহার অল্প-কাল পরেই সুন্দরমল্ল ও তাঁহার স্ত্রী লোকান্তরে চলিয়া যান।

হাড়াই পণ্ডিত নিজে শাস্ত্রবিদ্‌ ও ধর্মপরায়ণ, পত্নীও বড় ভক্তিমতী। ব্রত-পূজা, দান-ধ্যান ও অতিথি সৎকারে তাঁহাদের অত্যন্ত নিষ্ঠা। কিন্তু দীর্ঘদিন কোন পুত্র-সন্তান না হওয়ায় মনে তাঁহাদের সুখ নাই, শান্তি নাই। কিছুদিন পরে পদ্মাবতী রাত্রিতে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। তাঁহার নয়নসমক্ষে যেন এক সুদীর্ঘ জ্যোতির্ময় বর্ত্ম খুলিয়া গেল। জটাজুটধারী, আজানুলম্বিত-বাহু এক দিব্যপুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রসন্নমধুর হাস্যে তিনি কহিলেন, "বৎসে, তোমার মনস্তাপের আর প্রয়োজন নেই। পাপী তাপী উদ্ধারের জন্য এক মহাশক্তিধর পুরুষ তোমার গর্ভে শীঘ্র জন্মগ্রহণ করবেন। তুমি দুশ্চিন্তা করো না।" স্বপ্নবার্তা কিন্তু সত্য হইয়া উঠে। ১৩৯৫ শকাব্দের মাঘ মাসে, শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথির এক শুভক্ষণে এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। ওই শিশুই উত্তর কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, নিত্যানন্দ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তিন প্রভুর অন্যতম।

অনিন্দ্যসুন্দর শিশু। যে দেখে সেই তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া যায়। পিতামাতার আদরের নাম, কুবের। যথাকালে হাড়াই পণ্ডিত খুব ধুমধাম করিয়া পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসব করিলেন। এই শিশু শুধু পিতামাতারই নয়, পাড়া-প্রতিবেশীরও যে আনন্দ ধন। রূপে ভুবনমোহন, মুখে আধ আধ বুলিতে ভুবন-মঙ্গল হরিনাম। সহচরদের সঙ্গে শিশু খেলিতে যায়, মা পদ্মাবতী মোহন সাজে তাহাকে সাজাইয়া দেন সে যেন তাঁহার এক মস্ত বড় কাজ। নিজের লালপেড়ে নীলাম্বরী শাড়িটি কোঁচা দিয়া পরাইয়া দেন, কপালে আঁকেন শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, চোখে মাখাইয়া দেন কালো কাজল। কুবের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়, যে একবার দেখে লাবণ্য ঢল-ঢল শিশুকে কোলে তুলিয়া বার বার আদর জানায়।

কুবের ক্রমে বড় হইয়া উঠিতে থাকে। সহচরদের সহিত যে খেলাধুলা সে করে তাহার ভঙ্গী বড় বিচিত্র। শাস্ত্র পুরাণের কথা ও কাহিনী শুনিতেই বেশী উৎসাহ। তাই আমোদপ্রমোদ ও ক্রীড়ায়ও তাহাই রূপায়িত হইয়া উঠে, কখনো রামলীলা কখনো কৃষ্ণলীলা তিনি সঙ্গীদের নিয়া অভিনয় করিয়া বেড়ান।

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তান। শাস্ত্র বিশারদ না হইলে চলিবে কেন? মান-সম্মান ও অর্থোপার্জন, সবই যে নির্ভর করে ইহার উপর। হাড়াই ওঝা পুত্র কুবেরকে তাই টোলে ভর্তি করিয়া দেন। মেধা ও প্রতিভার দিক্‌ দিয়া বালকের জুড়ি নাই, অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণে তাঁহার ব্যুৎপত্তি হয়। বয়স তখন মাত্র বার বৎসর তখনই দুরূহ ন্যায়শাস্ত্রে কুবের পারঙ্গম হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা সস্নেহে তাঁহাকে ন্যায়চূড়ামণি উপাধি প্রদান করেন। অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে ইহারই উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছে—"ন্যায় চূড়ামণি ইঁহার শাস্ত্রের আখ্যাতি, নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি।"

সবে মাত্র বার বৎসর বয়স। কিন্তু কুবেরের জীবনে যেন তখনই এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত হইতে চাহিতেছে। খেলাধুলা ও অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ কি জানি কেন সে গম্ভীর হইয়া বসে, পরিপার্শ্ব হইতে আপনাকে অবলীলায় বিচ্ছিন্ন করিয়া নেয়। গত জন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার এবার জীবনের দোরগোড়ায় বার বার আঘাত করিয়া ফিরে। সংসারের কোনো আকর্ষণই যেন আর তার নাই।

পুত্রের এ পরিবর্তন দেখিয়া জনক-জননীর দুশ্চিন্তার অবধি নাই

এ কি অদ্ভুত ভাবান্তর ও উদাসীনতা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে ? উভয়ে ভাবিতে বসেন—পুত্রকে কি তবে তাড়াতাড়ি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবেন ? তাহাতে কি সংসারের দিকে মন একটু ফিরবে ?

ঠিক এই সময়েই হাড়াই ওঝার গৃহে ঘটে সন্ন্যাসীর আকস্মিক আবির্ভাব। কুবেরের বিবাগী মনের শিথিল বোঁটায় এ যেন দমকা হাওয়ার একটা বড় আঘাত।

সন্ন্যাসীর সঙ্গীরূপে এবার তাঁহার পরিব্রাজন শুরু হয়। দূর-দূরান্তের অরণ্যে পর্বতে, দুর্গম তীর্থস্থলগুলিতে দিনের পর দিন উভয়ে পরিক্রমা করিয়া বেড়ান। পরিব্রাজক জীবনের কঠোরতায় কুবের ক্রমে অভ্যস্ত হইতে থাকেন। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও পবিত্রতার মধ্য দিয়া তাঁহার সাধনজীবনের ভিত্তিটি দৃঢ়তর হইয়া উঠে। বৎসরের পর বৎসর এরূপে অতিবাহিত হইয়া যায়। অবশেষে কুবের একদিন তাঁহার অভিভাবক-সন্ন্যাসীকে হারাইয়া ফেলেন। কিশোর সাধকের জীবনে শুরু হয় নিঃসঙ্গ পর্যটনের পালা।

কিছুদিন যাবৎ কুবেরের অন্তর দীক্ষা গ্রহণের জন্য বড ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় তাঁহার চিহ্নিত গুরু, কোন্ শুভ মুহূর্তে অধ্যাত্মজীবনের বীজটি তিনি রোপণ করিয়া দিবেন, আর জীবন তাঁহার ধন্য হইবে, এই চিন্তায় অন্তর দিনের পর দিন আলোড়িত হইতে থাকে।

নানা তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে সেবার তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া পেঁীছিলেন। কৃষ্ণলীলার মুখ্যভূমিতে আসা মাত্র মনপ্রাণ কৃষ্ণাবেশে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। কুঞ্জগলির পথে পথে জঙ্গলাকীর্ণ লীলাস্থলীর আনাচে-কানাচে, দিনরাত ঘুরিয়া বেড়ান। আর্তিভরে খেদোক্তি করিতে থাকেন, জীবন-সর্বস্ব কৃষ্ণধন কোথায় ? কে তাঁহাকে এ পরম সম্পদ মিলাইয়া দিবে ? উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের মতো সারা বৃন্দাবন তখন তিনি চুঁড়িয়া বেড়াইতেছেন।

সহসা একদিন নয়ন পথে পড়িল বহু শিষ্য পরিবৃত পরমভাগবত এক সন্ন্যাসীর মূর্তি। কৃষ্ণরসে তনুমন সদা রসায়িত। এই সন্ন্যাসী হইতেছেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী। শ্রীচৈতন্য-লীলার সহায়ক ঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈত আচার্য ইঁহারই কৃপাপ্রাপ্ত।

মহাত্মার দর্শন মাত্রেই তরুণ সাধক কুবেরের সর্ব অঙ্গে ভক্তিরসের জোয়ার জাগিয়া উঠিল। ভাব প্রমত্ত হইয়া কিছুক্ষণ মধ্যে তিনি সংবিৎ হারাইলেন।

মাধবেন্দ্রপুরীর চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠে। কে এই বৈষ্ণব যে সদা করে কৃষ্ণরসে অবগাহন ? এই তরুণ বয়সে এমন কৃপাধন্য হইয়া উঠিয়াছে ? সর্বদেহে তাঁহার অষ্টসাত্ত্বিক ভাবাধিকার, বদনমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিয়াছে অপরূপ জ্যোতির আভা। ভূতলে পতিত দেহটির দিকে মাধবেন্দ্র নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন।

দীর্ঘকাল পর তরুণ সংবিৎ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া কহিলেন, "প্রভু, বহু ভাগ্যবলে আজ আপনার দর্শন মিলেছে। কৃপা ক'রে এ অভাজনকে উদ্ধার করুন, আশীর্বাদ করুন, আমার যেন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।"

মহাপ্রেমিক মাধবেন্দ্রপুরী দু'হাত প্রসারিয়া তাঁহাকে করেন আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

তারপর এক শুভলগ্নে কৃষ্ণমন্ত্রে এই নবীন সাধককে করিলেন দীক্ষিত। নামকরণ হইল নিত্যানন্দ। উভয়ের নর্তন কীর্তনে বৃন্দাবনে আনন্দরস উথলিয়া উঠিল।

প্রেমভক্তি সিদ্ধ মহাপুরুষ মাধবেন্দ্রের পূতসান্নিধ্য লাভ করিয়া সেদিন নিত্যানন্দের আনন্দের আর সীমা নাই। গদ্গদস্বরে বার বার তাঁহার মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তকবি এই পুরীমহারাজের প্রেম-শক্তির প্রশস্তি গাহিয়া বলিয়াছেন—

মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর,
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর !
কৃষ্ণরস বিনে আর নাহিক আহার,
মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার।[১]

মাধবেন্দ্রের কৃপাদীক্ষা[২] এ সময়ে সাধক নিত্যানন্দের জীবনে এক নূতন রসতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দেয়। কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করিয়া আবার তিনি পর্যটনে বাহির হন। এবার তিনি এক স্বেচ্ছাবিহারী অবধূত। ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া কখনো বঙ্গনাথে, রামেশ্বরে, কখনো বা নীলাচলে ও গঙ্গাসাগরে ঘুরিয়া বেড়ান। কৃষ্ণরসের ঐন্দ্রজালিক মাধবেন্দ্রপুরীর স্পর্শ তাঁহার সারা সত্তাকে আজ উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। যে দেব-দেউলেই তিনি যান, আকুল হইয়া কেবলই খুঁজিয়া বেড়ান, কোথায় প্রাণ-সর্বস্ব শ্রীনন্দ নন্দন, কবে তাঁহার দর্শন লাভে এ জীবন শীতল হইবে, সার্থক হইবে ?

কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল নিত্যানন্দ কিন্তু আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। এবার নিরন্তর থাকেন ভাবসাগরে নিমজ্জিত। দিবারাত্র জ্ঞান নাই। আহার নিদ্রার প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে। প্রেম সাধনার গভীর স্তরে ধীরে ধীরে হইতেছেন প্রবিষ্ট।

একান্তে প্রচ্ছন্নভাবে বৃন্দাবনে তিনি দিন যাপন করিতেছেন। হঠাৎ এ সময়ে কৃষ্ণ একদিন স্বপ্নযোগে কহেন, "অবধূত, কেন আর বৃথা এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করা ? গৌড়দেশে নবদ্বীপে যাও। প্রেমভক্তির সুধাভাণ্ড হাতে ক'রে নিমাই পণ্ডিত সেখানে আচণ্ডালে পরম সম্পদ বিতরণ করছে, তাঁর কর্মে তনুমনপ্রাণ ঢেলে দাও। ভাগবত-ধর্ম, ভগবৎপ্রেম প্রচারের তুমি যে চিহ্নিত পুরুষ। তোমার ভেতর দিয়ে এ মহাব্রত উদ্‌যাপিত হয়ে উঠুক।"

ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দ তৎক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছেন। প্রেমভক্তির উৎস-সন্ধান এবার মিলিয়াছে। সোৎসাহে তাহারই উদ্দেশে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দ সেদিন নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রথমেই নন্দ আচার্যের সহিত তাঁহার দেখা। দেবদ্বিজ সন্ন্যাসীর উপর আচার্যের অগাধ ভক্তি, অপূর্ব তাঁহার বৈষ্ণবীয় নিষ্ঠা। নিত্যানন্দের দেবদুর্লভ কান্তি, আজানুলম্বিত বাহু ও আয়তনেত্র দেখিয়া তিনি মোহিত হন এবং সযত্নে নিজ গৃহে

---

১ বৃন্দাবন দাস : চৈতন্য ভাগবত

২ ভক্তিরত্নাকর ও অন্যান্য গ্রন্থে মাধব সম্প্রদায়ের আচার্য লক্ষ্মীপতি কর্তৃক নিত্যানন্দের দীক্ষা দানের কথা আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য-প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নাই। মাধ্বদের দর্শন ও সাধনপ্রণালীর সহিত কিন্তু শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাদৃশ্য নাই (দ্রঃ সাধক ৪র্থ খণ্ড মাধবাচার্য) কাজেই নিত্যা-নন্দের মাধ্ব-দীক্ষার কথা যুক্তিসঙ্গত নয়।

রাখিয়া দেন। নীরবে প্রচ্ছন্ন জীবনযাপনেই অতিথির অভিলাষ। তাই তাঁহার নির্দেশে আচার্য কাহাকেও এ সংবাদ দেন নাই।

নিত্যানন্দের আগমন সংবাদ কিন্তু সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গের কাছে অজানা রহে নাই। কয়েকদিন হয় প্রভু কেবলই ভক্ত পার্ষদদের বলিতেছেন, "তোমরা সবাই দেখবে, শিগ্‌গীরই নবদ্বীপধামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে।"

ভক্তেরা জিজ্ঞাসু হইয়া এ উহার মুখের দিকে তাকায়। কে এই মহাপুরুষ? কি তাঁহার পরিচয়? কিছু বুঝা যাইতেছে না।

কৌতুকী প্রভু এবার ব্যাপারটিকে আরও কিছুটা স্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। কহিলেন, "তোমরা এক আনন্দের সংবাদ শোনো। কাল রাত্রে চমৎকার এক স্বপ্ন আমি দেখলাম। মোহন বেশধারী অনিন্দ্যসুন্দর এক অবধূত পুরুষ আমার সম্মুখে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বদনমণ্ডল থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। তিনি বললেন, আমি আর তিনি নাকি অভিন্নহৃদয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানালেন, আজই তিনি আমাদের দর্শন দান করবেন।"

মহাপুরুষের এ প্রসঙ্গটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর একি বিচিত্র রূপান্তর। ভাবাবিষ্ট হইয়া বারংবার তিনি হুঙ্কার ছাড়িতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবা কহেন, "দ্যাখো, তোমরা শিগ্‌গীর নবদ্বীপধামের চারিদিকে সন্ধান নাও। সেই মহাপুরুষকে অবিলম্বে বার করতে হবে। তাঁকে দেখবার জন্য আমার মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।"

ভক্তেরা ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বাহির হন। কিন্তু বহু খোঁজখবর করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

গৌরাঙ্গ এবার নিজেই পার্ষদগণ-সহ নগরে বাহির হইলেন। স্বপ্নে দৃষ্ট মহাপুরুষকে দর্শন না করিয়া তাঁহার স্বস্তি নাই। নয়নে প্রেমাশ্রুর ধারা, সারা দেহখানি পুলকাঞ্চিত—প্রভু যন্ত্রচালিতবৎ নবদ্বীপের রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে জুটিয়াছে বহুতর ভক্ত। নন্দন আচার্যের গৃহের সম্মুখে আসিবামাত্র প্রভু থামিয়া পড়িলেন। তারপর ঢুকিয়া পড়িলেন অঙ্গনে। সম্মুখে তাঁহার দণ্ডায়মান শুভ্রকান্তি প্রেমিক পুরুষ—নিত্যানন্দ। দর্শনমাত্র প্রভু তাঁহাকে স্বগণসহ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন।

একি মহা বিস্ময়। যে পরম বস্তুর জন্য তীর্থে তীর্থে অরণ্যে পর্বতে নিত্যানন্দ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়াছেন, আজ তাহা নিজে যাচিয়া আসিয়া নন্দন আচার্যের গৃহে উপস্থিত। শুধু তাহাই নয়, প্রভু সাগ্রহে এতদিন নিত্যানন্দেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। এবার তাঁহার নিভৃতির আড়াল ঘুচাইয়া দিয়া এক মুহূর্তে তাঁহাকে করিলেন আত্মসাৎ।

আনন্দাবেশে নিত্যানন্দ অধীর। অপার ঔৎসুক্যে প্রভুর ভুবন-ভুলানো রূপ দেখিতেছেন। এ রূপ দেখিয়া তাঁহার নয়ন যেন আর ফিরিতে চাহে না। বৃন্দাবনদাস এ অপরূপ রূপমাধুর্যের ভাণ্ডটি উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন—

বিশ্বম্ভর মূর্তি যেন
মদন সমান
দিব্য গন্ধ মাল্য
দিব্য বাস পরিধান ॥

কি হয় কনক দ্যুতি
সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে
চাঁদের সাধ লাগে ॥
দেখিতে আয়ত দুই
অরুণ নয়ন।
আর কি কমল আছে
হেন হয় জ্ঞান ॥
সে আজানু দুই ভুজ
হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে যজ্ঞসূত্র
অতি সূক্ষ্ম ক্ষীণ ॥

গৌরসুন্দরের পদ্মপলাশ নেত্রের দিকে চাহিয়া নিত্যানন্দ ভাবের গভীরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছেন। নির্নিমেষ নয়নে, ঋজু দেহে, তিনি একেবারে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান। প্রভু এবার ভক্তপ্রবর শ্রীবাসকে সোৎসাহে কহিলেন, "পণ্ডিত, দিব্য প্রেমাবেশ যদি দেখতে চাও তবে নিত্যানন্দের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোল, শিগ্‌গির ভাগবত থেকে শ্রীনন্দনন্দনের রূপ বর্ণনা করো।"

প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র শ্রীবাসও শ্লোক পড়িতে লাগিলেন পরম আনন্দে।— বর্হাপীড়ম্ নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্ । শ্যামসুন্দরের রূপমাধুর্যের বর্ণনায় নিত্যানন্দের আনন্দতরঙ্গ চকিতে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। সর্বশরীরে আত্মপ্রকাশ করে অশ্রু কম্প পুলকাদি প্রেমবিকারের চিহ্ন।

কিছুটা বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্তির পর তাঁহার নর্তন কীর্তন শুরু হয়, হুঙ্কার ধ্বনিতে আচার্যের গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া ভক্তদের হৃদয় হয় আনন্দে উদ্বেলিত।

নিত্যানন্দ ক্রমে শান্ত হন। এবার শুরু হয় পরস্পরের কুশল-প্রশ্ন ও প্রশস্তির পালা।

পুলকাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে নিত্যানন্দ কহিলেন, "প্রভু, এত তীর্থ এত জনপদ আমি ঘুরেছি আর তোমার সন্ধান করেছি, কোথাও তোমায় পাই নি। অবশেষে জানলাম, তুমি নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছো, জীবের উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করেছো। তাই দর্শনের আশায় এখানে ছুটে এলাম।"

প্রভুও হটিবার পাত্র নহেন। সমাগত ভক্তদের সম্মুখে নিত্যানন্দের মর্যাদা বাড়াইয়া কহিলেন—

মহাভাগ্য দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ (চৈঃ ভাঃ)

প্রেমাবশে বিহ্বল দুই প্রভু অতঃপর পুলকাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে আলিঙ্গ-নাবদ্ধ হইলেন। এখন হইতে নিত্যানন্দ হইলেন গৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ, নবদ্বীপে প্রেমভক্তি আন্দোলনের অন্যতম নিয়ন্তা। বৈষ্ণব ভক্তেরা তাঁহাদের প্রাণসর্বস্ব গৌর-

নিতাইকে দেখিয়াছেন এক সম্মিলিত ভাবঘন বিগ্রহরূপে। বৈষ্ণব কবিও তাই প্রেমভরে গাহিয়াছেন—

দুই ভাই এক তনু সমানপ্রকাশ।

পরের দিন ব্যাসপূজা হইবে। স্থির হইল, শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনেই নিত্যানন্দ এ পূজার অনুষ্ঠান করিবেন। সন্ধ্যার পরই গৌরাঙ্গ শ্রীবাস অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদিনই ভক্তগণ-সহ এখানে তিনি কীর্তনানন্দে মত্ত হন। আজ যেন তাঁহার উৎসাহ শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। দুয়ারে কপাট লাগাইয়া দেওয়া হয়। গৌরনিতাইকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হয় বৈষ্ণব ভক্তদের উদ্দণ্ড কীর্তন।

আজ গৌরাঙ্গের যেন উদ্দীপনার সীমা নাই। প্রেমাবেশে দেহ থরথর কাঁপিতেছে। মুখে উচ্চারিত হইতেছে সঘন হুঙ্কার। উদ্দাম নৃত্যেরও যেন আর বিরাম নাই। দিব্য লাবণ্যময় বিশাল দেহটি ভূমিতে বার বার আছড়িয়া পড়ে—ভক্তেরা হাহাকার করিয়া উঠেন। অশ্রু কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারের প্রকাশ দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। যে কথা এতকাল লোকে শুধু শুনিয়াছে ভক্তিশাস্ত্রে পড়িয়াছে, শ্রীবাস অঙ্গনে আজ তাহারই অপূর্ব রূপায়ণ। নৃত্যশেষে ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া গৌরাঙ্গ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাত্রিযোগে নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরেই রহিয়া গিয়াছেন। গৌরাঙ্গের অদ্ভুত নৃত্যলীলা, ভক্তদের এই কীর্তন ও জয়ধ্বনি—আজ তাঁহাকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ের প্রেম উৎসটি যেন শতধারে আজ উৎসারিত, বিশ্বের সমস্ত কিছু প্লাবিত না করিয়া উহা নিরস্ত হইবে না।

প্রেমাবিষ্ট নিত্যানন্দ রাত্রিতে এক অদ্ভুত কাজ করিয়া বসেন। সন্ন্যাসজীবনের পরম ধন – দণ্ড ও কমণ্ডলু দুইটি অকস্মাৎ ভাঙিয়া ফেলেন। অরণ্য প্রান্তরে তীর্থে তীর্থে কম কাঠোর জীবন এযাবৎ তিনি যাপান করেন নাই। চিরবাঞ্ছিত নিধি আজ বহুদিন পরে মিলিয়াছে। এবার তাঁহার নূতন জীবনের পালা। প্রেমের ঠাকুরের পাশে দাঁড়াইয়া প্রেমভক্তির প্রচারে তাঁহাকে ব্রতী হইতে হইবে। তাই তো দণ্ড-কমণ্ডলুর বোঝা তিনি এমন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত সবিস্ময়ে দেখেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ভাবাবেশে সংবিৎহারা, সন্ন্যাস-দন্ড ও কমণ্ডলুটি ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে।

সংবাদ পাইয়া গৌরাঙ্গ দ্রুতপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলেন, নিত্যানন্দ অর্ধবাহ্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন, সুস্মিত আনন হইতে দিব্য আনন্দের জ্যোতি ঝরিয়া পড়িতেছে। সস্নেহে শ্রীপাদের হস্তটি ধারণ করিয়া প্রভু তাঁহাকে স্নানের ঘাটে আনয়ন করিলেন। ভগ্ন দণ্ড কমণ্ডলু তখনই গঙ্গায় বিসর্জিত হইল। অবধূত নিত্যানন্দ হইলেন মহাপ্রেমিক নিত্যানন্দ—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ।

ভাবরাজ্যের মানুষ, আনন্দ চঞ্চল নিত্যানন্দকে নিয়া ভক্তদের বিপদ বড় কম নয়। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছেন, শিশুর মতো শুরু করিলেন জলকেলি, আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। অথচ এদিকে ব্যাসপূজার সময় প্রায় হইয়া গিয়াছে।

গৌরাঙ্গ কোনোমতে তাঁহাকে বুঝাইয়া-সুজাইয়া পণ্ডিতের গৃহে নিয়া আসিলেন। সেখানে ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। অঙ্গন মধ্যে প্রভু ভক্তগণ-সহ

কীর্তনানন্দে বিভোর, আর ঘরের ভিতরে নিত্যানন্দ ব্যাসপূজার আসনে বসিয়া গিয়াছেন। পূজা শেষে মালা অর্পণ করিয়া প্রণাম নিবেদন করিতে হইবে, কিন্তু নিত্যানন্দের সেদিকে কোনো হুঁশই নাই। আবেশ-বিহ্বল হৃদয়ে মালাখানি হাতে নিয়া তিনি বসিয়া আছেন।

শ্রীবাস বার বার ব্যগ্রভাবে কহিতেছেন, "শ্রীপাদ, ব্যাসদেবের উদ্দেশে মাল্য অর্ঘ্য দিয়ে আপনি পূজা এবার সাঙ্গ করুন।"

তাঁহার একটি কথাও কিন্তু নিত্যানন্দের কানে পৌঁছে নাই। ভাবাবিষ্ট তিনি। এদিক ওদিক তাকাইয়া কেবল কাহাকে যেন খুঁজিতে চাহিতেছেন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত তখন গৌরাঙ্গকে ডাকিয়া আনিলেন। কহিলেন, "প্রভু, দ্যাখো তোমার নিত্যানন্দ পূজা সমাপ্ত করতে দিচ্ছেন না। এবার মাল্য অর্ঘ্য দেবার কথা, কিন্তু তা তাঁর হাতেই রয়ে গিয়েছে। তুমি এসে যা করবার হয় করো।"

প্রভুকে নৃত্যগীত থামাইতে হইল, তাড়াতাড়ি পূজার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। বেদীর সম্মুখে গিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, একি করছো তুমি? মালাগাছ হাতে তুলে নিয়ে এমন চুপচাপ বসে কেন? এবার ব্যাসদেবের উদ্দেশে ভক্তিভরে অর্ঘ্য দাও।"

ভাববিভোর হইয়া আছেন অবধূত নিত্যানন্দ, চোখে মুখে এক অপূর্ব আনন্দের দ্যুতি খেলিয়া গেল। বহুবাঞ্ছিত প্রভু তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, হাতের এ মালা তাঁহার গলায় না পরাইয়া আর কাহার উদ্দেশে নিবেদন করিবেন? পরমানন্দে তিনি গৌরসুন্দরের গলায় পুষ্পমালাটি পরাইয়া দিলেন। সমবেত ভক্ত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে সে অঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠিল।

মাল্যপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই আনন্দ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যান। প্রভুর সে প্রেমমধুর নয়নাভিরাম রূপের বদলে একি অলৌকিক ঐশ্বর্যময় মূর্তি! এ ঐশ্বর্য ও বিভূতি দেখিয়া তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর বিভূতিলীলা সংবরণ করিয়া গৌরাঙ্গ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—

যে কীর্তন নিমিত্ত করিলা
অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল
কিবা চাহ আর॥
তোমার সে প্রেমভক্তি
তুমি প্রেমময়।
বিনে তুমি দিলে কারো
ভক্তি নাহি হয়॥
আপনা সংবরি উঠ,
নিজ জন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা
তাহারে বিলাহ॥

প্রভু গৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম প্রচারের প্রধান ও চিহ্নিত পরিকর উপস্থিত। এবার তিনি স্বেচ্ছামতো নাম-প্রেমধন বিলাইয়া ফিরিবেন।

করজোড়ে ভক্তি গদ্‌গদকণ্ঠে অবধূত নিত্যানন্দ সর্বসমক্ষে গৌরাঙ্গের স্তবগান করিতে লাগিলেন।

এমনিতেই নিত্যানন্দ এক মহাপ্রেমিক পুরুষ —তদুপরি অন্তরে লাগিয়াছে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গের দিব্যস্পর্শ। দিব্য ভাবের প্রবাহ তাই উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, নিত্য নূতন লীলাচ্ছন্দে নিত্যানন্দকে নাচাইয়া তুলিতেছে। এ প্রমত্ত অবস্থায় তাঁহাকে স্থির করিয়া রাখিবে কে? চৈতন্য ভাগবতের ভাষায়, এখন তিনি—

অহর্নিশ ভাবাবেশে
পরম উদ্দাম।
সর্ব নদীয়ায় বুলে
জ্যোতির্ময় ধাম॥

সেদিন অপরাহ্ণে নিমাই স্বগৃহে বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় অবধূত নিত্যানন্দ একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত। প্রেমাবেশে তিনি তখন মতোয়ারা, দুই চোখে দরদর ধারে পুলকাশ্রু নির্গত হইতেছে। কখনো অট্টহাসি হাসিতেছেন, কখনো বা পরম উল্লাসভরে প্রভুর অঙ্গনে নৃত্য করিতেছেন। নৃত্যপরায়ণ এই দিগম্বর পুরুষকে দেখিয়া বাড়ির মেয়েরা লজ্জায় পলায়ন করিল। নিমাই বিশ্রামরত ছিলেন, দ্রুতপদে শয়নমন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রেমোন্মাদ নিত্যানন্দকে শান্ত করিতে তাহার বেশী সময় লাগিল না। নিজের মস্তকের আচ্ছাদন বস্ত্রটি তাঁহার কোমরে সযত্নে জড়াইয়া দিলেন, স্বহস্তে তাঁহাকে চন্দনচর্চিত করিলেন, গলে দিলেন গন্ধপুষ্পের একগাছি মালা। অতঃপর শুরু করিলেন অবধূতের অপূর্ব স্তুতি—

নামে নিত্যানন্দ তুমি
রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ।
রাম মূর্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ—পর্যটন
ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু
নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি
মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য—তুমি
যথা কৃষ্ণ তথা॥

প্রভু শুধু এখানেই থামিলেন না। ভিক্ষা মাগিলেন, "শ্রীপাদ আমার বড় অভিলাষ —তোমার একটি কৌপীন কৃপা ক'রে আমায় দান করো।"

নিত্যানন্দের কৌপীনটি আনানো হইল। গৌরাঙ্গ এটি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ভক্তেরা আগ্রহ-ব্যাকুল হইয়া প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছেন। এবার

সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা সবাই এ পবিত্র বস্ত্রখণ্ড শিরে ধারণ করো। নিত্যানন্দ কৃষ্ণরসময়—তাঁর কৃপায় তোমাদের প্রকৃত কৃষ্ণভক্তির উদয় হবে।"

প্রভুর নির্দেশে ভক্তেরা সোল্লাসে কাড়াকাড়ি করিয়া নিত্যানন্দের পাদোদক পান করিলেন। অবধূত কিন্তু পূর্ববৎ প্রেমাবিষ্ট ও মৌন হইয়াই আছেন, আর স্মিত হাসি হাসিতেছেন।

নবদ্বীপের বৈষ্ণবসমাজে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সেদিন নিত্যানন্দের মহিমার তত্ত্বটি এমনি ভাবে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভক্তদের বুঝিতে বাকি রহিল না—অবধূত নিত্যানন্দ শুধু প্রভুর প্রধান পার্ষদই নহেন, অভিন্নহৃদয় সখা এবং প্রধান সহকর্মীও বটেন।

গৌরাঙ্গ প্রেমধর্ম ও নামকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তক। জীব উদ্ধারের ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। নিবেদিত প্রাণ ভক্তদলও চারিপাশে কম জুটে নাই। কিন্তু তাঁহার প্রেমধর্ম-বাহিনীর প্রস্তুতি এতদিন সম্পূর্ণ হয় নাই—অভাব ছিল অভিযাত্রা পথে তাঁহার প্রধান এই সহকারীর। অবধূত নিত্যানন্দের আবির্ভাব সে অভাব আজ দূর হইয়াছে। এবার যাত্রা শুরুর পালা।

নবদ্বীপের পথে পথে নিতাই এবার প্রবল উৎসাহে নাম প্রচার শুরু করিয়াছেন। নগরের লোকে বলাবলি করিতে থাকে—একে নিমাই পণ্ডিত ও তাঁহার সঙ্গীদের নর্তনে-কীর্তনে লোকের রক্ষা নাই, তারপর এই দিব্যকান্তি, শক্তিধর তরুণ সাধক কোথা হইতে আসিয়া জুটিল? প্রেমঘনমূর্তি কে এই অবধূত?

নিত্যানন্দ এখন হইতে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই বাস করেন। সর্ববন্ধনমুক্ত আনন্দময় মহাপুরুষ—সদাই যেন বালকবৎ ভাব। বালচাপল্য আর আনন্দরঙ্গে সদা উচ্ছল হইয়া ফিরেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী দেবীকে নিতাই মা বলিয়া ডাকেন। এই বত্রিশ বৎসরের বালককে লইয়া মালিনী দেবীরও ঝঞ্ঝাটের সীমা নাই। চাঞ্চল্য ও আবদারের নানা অত্যাচার তাঁহাকে সহিতে হয়। নিতাই নিজের হাত দিয়া কিছু খান না—মালিনী দেবীকেই তাই তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। ভক্তিনিষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের দৃষ্টিতে নিতাই যে পরম দুর্লভ ধন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন। তাছাড়া প্রভুর মুখে নিত্যানন্দের স্বরূপ মাহাত্ম্য তিনি শুনিয়াছেন। এ গৃহে এই মহাপুরুষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এ যে তাঁহার পরম সৌভাগ্য।

প্রভু একদিন কৌতুক করিয়া শ্রীবাসকে কহিলেন, "পণ্ডিত, তুমি এসব কি করছো বলতো? অজ্ঞাত-কুলশীল এ অবধূতকে তুমি ঘরে রেখেছো কেন? এর কি জাত কুল কিছুর ঠিক আছে শিগ্‌গীর ভালোয় ভালোয় একে বিদেয় করো।'

এ যে প্রভুর এক পরীক্ষা তাহা বুঝিতে শ্রীবাসের দেরি হয় নাই। হাসিয়া কহেন, "প্রভু, তোমার ছলনা বুঝতে আমার বাকী নেই। যে তোমায় একদিনের তরেও ভালোবাসে, ভক্তি করে, সে হয় আমার প্রাণতুল্য। আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যে তোমারই অভিন্নস্বরূপ, তিনি যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। আমাকে আর এসব পরীক্ষায় ফেলা কেন প্রভু?"

নিত্যানন্দ মাহাত্ম্য শ্রীবাস কিছুটা বুঝিয়াছেন, একথা জানিয়া প্রভুর সেদিন আনন্দের সীমা রহিল না। স্মিত হাস্যে বর প্রদান করিলেন, "শ্রীবাস, আমি আজ

তোমার প্রতি বড় প্রসন্ন হয়েছি। আমি বলছি, 'তোমার গৃহে দারিদ্র্য কখনো থাকবে-না, আর তোমার স্বজনদের থাকবে আমার উপর অচলা ভক্তি।"

শচীমাতার কাছেও নিতাই এক অমূল্য নিধি। গৌরাঙ্গ নিজে নিতাইকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলেন, "মা, এই তোমার হারানো ছেলে বিশ্বরূপ।" বহুদিনের চাপা দীর্ঘশ্বাস মায়ের বুক হইতে নিঃসারিত হয়, অশ্রুসজল চোখে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁ বাবা, সত্যিই কি তুই আমার বিশ্বরূপ?"

"বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়া নিতাই বললেন, "হ্যাঁ মা, আমিই যে তোমার সন্তান।"

নিমাই আর নিতাই—এই দুটিকে নিয়া শচীর আনন্দ ও গর্বের সীমা নাই। নিতাই নূতন আসিয়াছেন বটে, কিন্তু দুইদিনেই তাঁহার পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

গৌরাঙ্গ পরিকরদের সংখ্যা তখন কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে, ভক্ত সমাজের বিস্তৃতি ঘটিতেছে। প্রভু এবার নিতাই ও হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ থেকে তোমরা দু'জন জীব উদ্ধারের কাজেআমার সহায় হও। পাপ, অনাচার আর শুষ্ক ধর্মাচরণে দেশ ছেয়ে গেছে। সকলের দ্বারে গিয়ে তোমরা কৃষ্ণনাম বিলাও। এ কাজ তোমরা ছাড়া আর কে করবে, বলো? পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু সবাইর কাছে এই ভুবনমঙ্গল নাম তোমরা পেঁাছে দাও।"

প্রভুর নির্দেশ পাইয়া নিত্যানন্দ মহাখুশী, ঈশ্বর-নির্দিষ্ট ব্রতরূপে এ কাজকে তিনি গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপের পথে পথে ঘরে ঘরে সকলকে সাধিয়া বিলাইতে লাগিলেন হরিনাম। তাঁহার প্রধান সহায়ক হইলেন নামাচার্য যবন হরিদাস।

দুই জনেরই পরনে সন্ন্যাসীর বেশ। দেহ দীর্ঘায়ত, দিব্য লাবণ্যে ভরা রূপ মন কাড়িয়া নেয়। উদাত্ত কণ্ঠের নাম শুনিয়া ভক্তজনেরা ধন্য হয়।

অধার্মিক ও বৈষ্ণব-দ্বেষীর সংখ্যা তখন নদীয়ায় প্রচুর। নাম প্রচারক এই সন্ন্যাসীদুটিকে দেখিয়া কেহ অবজ্ঞা দেখায়, কেহ বা টিট্‌কারী দেয়, কেহ বা মারমুখী হইয়া তাড়াইতে আসে। পরম ভাগবত নিত্যানন্দের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া নগরময় ঘুরিয়া বেড়ান, সাধিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলকে বলেন, ভাই, কৃপা ক'রে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করো, আমায় বিনামূল্যে কিনে নাও।"

জগন্নাথ ও মাধব নবদ্বীপের দুই প্রতাপশালী ব্যক্তি, নগরের শান্তিরক্ষার ভার রহিয়াছে ইহাদের উপর। অর্থ ও সামর্থ্যের যেমন অভাব নাই, পাপাচার ও অত্যাচারেও তেমনি ইহাদের জুড়ি মেলানো ভার। দুই ভাই মদের নেশায় সর্বদা চুর হইয়া থাকে, ভক্ত বৈষ্ণব দেখিলে উপহাস করে, অসম্মান অত্যাচার করিতেও কিছুমাত্র তাহাদের বাধে না। সমস্ত নদীয়া এই দু'জনের ভয়ে সন্ত্রস্ত।

নিতাই ও হরিদাস ইহাদের নানা কুকীর্তির কথাই শুনিতে পান। দূর হইতে দুই মাতালের হুড়াহুড়িও মাঝে মাঝে তাহাদের চোখে পড়ে।

নিতাই ভাবিতে থাকেন, পাতকী উদ্ধারের জন্য গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। কিন্তু কৃপার যোগ্য এমন পাতকী প্রভু আর কোথায় পাইবেন? তাঁহার কোনো শক্তি বিভূতির লীলা না দেখিয়া তো লোকে এমনিতেই উপহাস করে। জগাই মাধাইর পরিবর্তন সাধন যদি করা যায়, তবে তো সকলে প্রভুর প্রভুত্ব বুঝিবে, তাঁহার জয় গাহিবে।

নিতাই সেদিন পরম ভাগবত হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভাই হরিদাস, এ দুই

পাতকীর দুর্গতি তো দেখতেই পাচ্ছো। হরিনাম করার অপরাধে, মুসলমান কাজীর আদেশে, তোমার উপর কি দুঃসহ অত্যাচার না হয়েছিল, কিন্তু তুমি তো তাদের জন্য সেদিন শুভ ইচ্ছাই জানিয়েছিলে। এবার তুমি মনে মনে একবার জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের সংকল্প করো, অচিরে প্রভু এদের কৃপা করবেন। তাতে দেশবাসী বুঝতে পারবে প্রভুর মাহাত্ম্য ও প্রভাব।"

হরিদাস হাসিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, একথা তোমার মুখে সাজে না। তোমার ইচ্ছা যে প্রভুরই ইচ্ছা, একথা যে আমার অবিদিত নয়। তুমি যখন একবার ভেবেছ—জগাই মাধাই উদ্ধার হলে ভাল হয়, তবে প্রভুর কৃপা থেকে তাদের আর বঞ্চিত করবে কে?"

উভয়ে মিলিয়া সেদিন জগাই মাধাইর বাসগৃহের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উদাত্ত স্বরে হরিনাম কীর্তন শুরু হইল। কাণ্ড দেখিয়া সকলের তো চক্ষুস্থির। এ দুই সন্ন্যাসী কি পাগল, না—মরিতে বাসনা হইয়াছে ইহাদের? কোনো হিংসার কাজ, ঘৃণিত কাজ করিতে এ দুরাত্মাদের বাধে না। কেহ কেহ সম্মুখে আসিয়া সতর্ক করিয়াও দিল - "কেন ভাই সাধ ক'রে এ দুর্বৃত্তদের ক্ষেপিয়ে তুলছো? তোমাদের কি প্রাণের মায়া নেই?"

হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া নিত্যানন্দ অগ্রসর হইয়া চলেন। সম্মুখে মূর্তিমান যম-দূতের মতো জগাই মাধাই দণ্ডায়মান। মদের ঘোরে চক্ষু আরক্তিম, হস্তে যষ্টি। উত্তেজিত হইয়া কৃষ্ণনামরত দুই সন্ন্যাসীর দিকে দুজনে ধাইয়া আসিল। কৌতুকী নিত্যানন্দের রঙ্গ বুঝিয়া উঠা ভার। বৃদ্ধ হরিদাসকে টানিয়া নিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিলেন।

রাজপথে ততক্ষণে চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী দুইটি কোনোমতে প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিতে পারিয়াছে—একদল লোক ইহাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বিদ্রূপ করিবার লোকেরও অভাব নাই, তাহারা বলিতে থাকে, "এ পাপিষ্ঠ দুটোকে এমন ক'রে ঘাঁটিয়ে কি লাভ বাপু। এদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে আবার এমন পালিয়ে যাওয়াই বা কেন?"

লীলাময় নিত্যানন্দের আসল স্বরূপ তাঁহার সহকারী হরিদাসের অজানা নয়। এবার কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সয়েছি, জলে ডুবেও আবার ভেসে উঠেছি। এতদিন এতো অত্যাচার সহ্য ক'রেও প্রাণটা কোনো মতে ছিল। কিন্তু আজ দেখছি চঞ্চল অবধূতের সঙ্গী হয়ে তাও শেষে খোয়াতে হবে।"

কৌতুকী নিত্যানন্দ জগাই মাধাই উদ্ধার লীলার ভূমিকাটি রচনা করিতেছেন। এ লীলায় গৌরাঙ্গের আবির্ভাব চাই, করুণা চাই। নইলে তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় লোকে কি করিয়া পাইবে? তাঁহার প্রভুত্বই বা জনসমাজে কি করিয়া হইবে প্রতিষ্ঠিত? প্রভুর কানে এ দুই দুরাত্মার অত্যাচারের কথা তিনি প্রথমে পৌঁছাইয়া দিতে চান। তারপর এক বড় সংকটের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে এই পাতকীতারণ লীলায় অবতরণ করাইতে চান।

আপন মনোভাব নিতাই গোপন রাখিলেন, হরিদাসের ঐ প্রণয়-কোন্দলের জের টানিয়া কহিলেন, "আমার চঞ্চলতার দোষ ধরলে কি হবে। একবার তোমার প্রভুর

কথাটাও ভেবে দেখো। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে ধরেছেন তিনি রাজসিক বৃত্তি পরিকরদের ওপর আদেশ জারি করেছেন—ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম বিতরণ ক'রে বেড়াতে হবে। তাঁর এ আজ্ঞা পালন না করলে চলবে না, আবার দুরাত্মাদের কাছে গিয়েও আমাদের প্রাণ হবে বিপন্ন। হরিদাস, তাই বলছি, আমার দোষ না ধরে তোমার প্রভুর কাণ্ডটা একবার দেখে নাও!'

ভক্তজনসহ গৌরাঙ্গ সেদিন ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস দুই ভগ্নদূতের মতো সেখানে আসিয়া উপস্থিত। নিত্যানন্দ জগাই মাধাইর নানা দুষ্কর্মের কথা, আজ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবনের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। তারপর কহিলেন, "প্রভু, তুমি নবদ্বীপের এই দুই মহাপাতকীকে আগে কৃষ্ণনাম নেবাও, তবে তো লোকে তোমার মাহাত্ম্য বুঝবে। যে ধার্মিক সে তো তার আপন স্বভাবেই নামকীর্তন করতে এগিয়ে আসছে। চরম পাপী যে, তাকে ভক্তি পথে নিয়ে এসো, তবে তোমার পাতকীপাবন নাম সার্থক হবে।"

প্রেমাবতার নিত্যানন্দের এই অনুরোধ এড়ানোর উপায় নাই। প্রভুকে জগাই-মাধাই উদ্ধারের জন্য কথা দিতে হইল:

হাসি বোলে বিশ্বম্ভর—
হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন
পাইল তোমার॥
বিশেষে চিন্তহ
তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তার
করিবে কুশল॥

প্রেম-ভিখারী নিত্যানন্দ নদীয়ার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, সাধু-অসাধু ভক্ত-অভক্ত সবাইর দুয়ারে গিয়া যাচিয়া যাচিয়া নাম-প্রেম দান করেন। সেদিন কীর্তন-টহল হইতে ফিরিতেছেন। সঙ্গে রহিয়াছেন সহকারী হরিদাস। দু'জনেই দেখিলেন, অদূরে পানোন্মত্ত দুই ভাই জগাই-মাধাই ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ ইহাদের উদ্ধারে নিতাই কৃতসংকল্প। দুই বাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া তিনি উচ্চস্বরে নামকীর্তন শুরু করিলেন।

দুই পাপী প্রচণ্ড ক্রোধে ও উত্তেজনায় লাফাইয়া উঠে। এই তো নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গী সেই অবধূত—দিন নাই রাত নাই তারস্বরে হরিনাম গাহিয়া লোকের শান্তি ভঙ্গ করে। জগাই-মাধাই হরিনামের বিরোধী, এ কথা সে ভালভাবেই জানে, তবুও তাহার ভয়ডর নাই। এত বড় স্পর্ধা তো নবদ্বীপের কাহারও নাই। মাধাই ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়, নিতাইর মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারে এক ভাঙা কলসী।

আঘাতের ফলে নিতাইর মস্তক হইতে দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে। এক হাতে তিনি আহত স্থানটি চাপিয়া ধরিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে গাহিতেছেন কৃষ্ণনাম। পথচারীর দল করুণ নেত্রে এ অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে যাইবে, এমন দুঃসাহস কাহার? দুর্বৃত্তদের কোপে একবার পড়িলে যে আর নিস্তার নাই। মাধাইর এ হঠকারিতায় জগাই কিন্তু বড় চঞ্চল হইয়া পড়ে। তাই তো,

এ সন্ন্যাসী তো তেমন কিছু অপরাধ করে নাই। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের দুভাইর তেমন কি ক্ষতি সে করিয়াছে? মাধাই এতটা নির্মম না হইলেই পারিত। নিতাইর বুক বাহিয়া রক্ত ঝরিতেছে কিন্তু দেহে মনে কোনো বিকার, কোনো বৈলক্ষণ্যই যেন নাই। দিব্যকান্তি পুরুষের দুই চোখে অতলস্পর্শী করুণার মহিমা। কি যেন এক অপূর্ব মোহনী শক্তি এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর রহিয়াছে, জগাই তাহার অমোঘ আকর্ষণে সেই মুহূর্তে বাঁধা পড়িয়া যায়।

উত্তেজিত মাধাই আবার নিতাইকে আঘাত করিতে যাইবে এমন সময় জগাই তাহাকে ধরিয়া ফেলে। দৃঢ়স্বরে কহে, "ওরে, কেন শুধু শুধু এই বিদেশী সন্ন্যাসীকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারছিস্? এবার থাম্ তো।" মাধাইকে নিরস্ত হইতে হইল, নিত্যানন্দ একটা প্রাণঘাতী আঘাতের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন।

ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গের নিকট এ চাঞ্চল্যকর সংবাদ পেঁছে—নিত্যানন্দ আহত হইয়াছেন, মাধাইর নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁহার মস্তক হইতে হইতেছে রক্তপাত। স্বগণসহ তখনি তিনি ত্বরিৎগতিতে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত।

প্রাণপ্রতিম নিতাই আহত। ক্ষতস্থান হইতে দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া গৌরাঙ্গের ধৈর্যের বাঁধ সেদিন ভাঙিয়া গেল। ক্রোধে হুংকার ছাড়িলেন, এই পাপিষ্ঠদের আজ দিবেন তিনি চরম দণ্ড।

নিতাই অগ্রসর হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার হস্ত ধারণ করেন। প্রেম বিগলিত কণ্ঠে কহেন, "প্রভু, ক্ষান্ত হও, মাধাইর যেন দোষ হয়েছে, কিন্তু জগাই তো নিরপরাধ। বরং তার সহায়তায়ই আমার জীবন রক্ষা হয়েছে। সত্যি বলছি প্রভু, এ আঘাত ও রক্তপাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। কৃপা ক'রে জগাই আর মাধাইকে আমায় তুমি ভিক্ষে দাও।"

তৎক্ষণে জগাইর প্রতি প্রভুর করুণা জাগিয়া উঠিয়াছে তাই তো পরম প্রিয় নিত্যানন্দের জীবন সে রক্ষা করিয়াছে। তবে তো তাহাকে প্রভুর আজ অদেয় কিছু নাই। প্রেমভরে দুবাহু বাড়াইয়া জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া কহেন, "জগাই তুমি আমার প্রাণসর্বস্ব নিত্যানন্দের জীবন রক্ষা করেছো, আজ আমায় তুমি কিনে নিয়েছ। আশীর্বাদ করি, কৃষ্ণকৃপা তোমার ওপর বর্ষিত হোক্। আজ হতে তোমার ভক্তি লাভ হোক্।"

অপূর্ব প্রভুর মহিমা, অপূর্ব তাঁহার এই বর দান। সমবেত পার্ষদ ও ভক্তগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া ওঠেন। গৌরাঙ্গের দিব্য স্পর্শে জগাইর দেহে দেখা যায় অদ্ভুত প্রেমাবেশ। মূর্ছিত হইয়া তখনি সে ভূতলে পতিত হয়।

মাধাইর অন্তরেও ইতিমধ্যে তীব্র অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠে। আর সে ধৈর্য ধরিতে পারে না, সাশ্রুনয়নে সেও প্রভুর চরণ জড়াইয়া ধরে। বলে—এক সঙ্গে দুই ভাই এতদিন পাপ করিয়াছে, আজ কেন কৃপা বিতরণের বেলায় দুই রকমের ফল? তাছাড়া, মাধাই হয়তো অধর্মাচরণ করিয়াছে, কিন্তু দয়াময় প্রভু তাঁহার নিজের ধর্ম, দয়া-ধর্ম, ছাড়িবেন কিরূপে?

মাধাইর এ ক্রন্দন ও মিনতিতে কিন্তু প্রভু টলিতেছেন না। তাহাকে কহিলেন, "মাধাই, তোমার অপরাধের যে সীমা নেই। পরম ভাগবত নিত্যানন্দের—আমার

অভিন্নহৃদয় নিত্যানন্দের রক্তপাত তুমি করেছ। শ্রীপাদ কৃপা করে যদি তোমার ক্ষমা করেন তবেই তোমার রক্ষা। তুমি তাঁর চরণে ধরে পড়ো।"

মাধাই পদতলে পড়া মাত্রই নিতাই তাহাকে দুই হাতে টানিয়া তুলিলেন, প্রেমালিঙ্গন দিয়া তাহার সর্ব অপরাধ করিলেন মার্জনা। এবার প্রভুর কৃপা বর্ষণ করাইয়া দুই মহাপাপীকে শুদ্ধ করিয়া নিতে হইবে। নিতাই তাই সানুনয়ে কহিলেন—

কোন জন্মে থাকে যদি
আমার সুকৃতি।
সব দিনু মাধাইরে
শুনহ নিশ্চিতি॥
মোর যত অপরাধ
কিছু তার নাই
মায়া ছাড়া কৃপা কর
তোমার মাধাই॥ (চৈঃ ভাঃ)

অবধূত নিত্যানন্দের একি ক্ষমাসুন্দর রূপ, একি পরমমধুর প্রেমলীলা! ভক্তেরা পুলকাঞ্চিত দেহে অনিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। মিলিত কণ্ঠের আনন্দধ্বনির মধ্যে গৌরাঙ্গ এবার মাধাইকেও করিলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ, প্রেমভক্তি দানে তাহাকে করিলেন কৃতার্থ। জগাই-মাধাই আত্মসাৎ-এর এ লীলাটি অবধূত নিত্যানন্দের প্রভাবে সেদিন এমনি করিয়াই নবদ্বীপের ভক্তজন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল।

ক্ষমা ও আশ্বাস পাইলে কি হয়, অনুশোচনার তীব্র দহনে মাধাইর অন্তর নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। নিত্যানন্দের পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া একদিন সে কহিল, "প্রভু, আমি এমন মহাপামর যে তোমার দিব্য অঙ্গে আঘাত করেছি, রক্তপাত করেছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ক'রে হবে, কৃপা ক'রে তাই আমায় বলে দাও।" নিত্যানন্দের চরণে একান্ত শরণ নিয়া বার বার সে তাঁহার মহিমার স্তুতি গাহিতে থাকে।

দয়াল নিতাই প্রেমপূরিত নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, দিব্য দেহের আলিঙ্গনে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া কহেন—

শিশুপুত্রে মারিলে কি
বাপে দুঃখ পায়।
এই মত তোমার
প্রহার মোর গায়॥
তুমি যে করিলে স্তুতি,
ইহা যেই শুনে।
সেই ভক্ত হইবেক
আমার চরণে॥

আমার প্রভুর তুমি
অনুগ্রহ পাত্র।
আমাতে তোমার দোষ
নাহি তিলমাত্র ॥
যে জন চৈতন্য ভজে
সেই মোর প্রাণ।
যুগে যুগে আমি তার
করি পরিত্রাণ ॥ (চৈঃ ভাঃ)

প্রেমাবতার নিত্যানন্দের আলিঙ্গন ও আশ্বাসবাণী পাইয়া মাধাই যেন আজ প্রাণ পায়। তাহার বুকের উপর হইতে এক বিরাট পাষাণভার নামিয়া যায়। নিতাইর চরণে নিবেদন করেন, "দয়াল প্রভু, তুমি তো আজ আমায় কোল দিয়ে উদ্ধার করলে। কিন্তু দীর্ঘ বৎসর ধরে যে কত লোকের হিংসা করেছি, কত অপরাধ করেছি, তার কোনো সীমা সংখ্যা নেই। আমি তাদের আজ চিনতে পারবো কি ক'রে? তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাই বা জানাবো কি ক'রে? কৃপা ক'রে তাই আমায় বলে দাও, প্রভু।"

নিত্যানন্দ উপায় করিয়া দিলেন, "মাধাই, তুমি আজ থেকে সর্ব অপরাধ ভঞ্জন-কারী গঙ্গার সেবা-কার্য শুরু করো। গঙ্গার ঘাটে সহস্র সহস্র মুক্তিকামী ভক্তের সমাবেশ হয়। তাদের জন্য ঘাট নির্মাণ করো, দিনরাত গঙ্গাতীরে বাস করে ভক্তদের পদরেণু ও আশিষ গ্রহণ করো।"

মাধাই এই উপদেশ পালন করিতে বিলম্ব করে নাই। স্বহস্তে এক কোদালি নিয়া সে ঘাট নির্মাণে ব্রতী হয়, গঙ্গাতীরে আগত ভক্তজনের সেবায় করে জীবন উৎসর্গ। নিজের নির্মিত এই ঘাটে মাধাই প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গা স্নান করে, দুই লক্ষ নাম জপ সমাপ্ত করে। তারপর স্নানার্থীদের চরণে ভক্তিভরে সে প্রণত হয়, কাতরে নিবেদন করে—

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত করিনু অপরাধ
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ।

এই ঘাটে বসিয়াই এক কঠোরতপা ব্রহ্মচারীরূপে সে খ্যাতি লাভ করে। আজিও নবদ্বীপে 'মাধাইর ঘাট' পাষণ্ডী মাধাইর এই দিব্য রূপান্তরের পবিত্র স্মৃতিটি বক্ষে ধরিয়া আছে।

জগাইর জীবনেও লাগে গৌর নিতাইর পুণ্য স্পর্শ, জীবনে তাহার আসে মহা পরিবর্তন। উভয় ভ্রাতার একি অপূর্ব বৈষ্ণবীয় আর্তি আর দৈন্য। নবদ্বীপের যে কেহ ইহাদের দর্শন করে, তাহারই দু'চোখ অশ্রু সজল হইয়া উঠে। লোকে বলাবলি করিতে থাকে, ধন্য পুরুষ এই নিমাই পণ্ডিত আর তাঁহার প্রধান পরিকর, অবধূত নিত্যানন্দ। ঐশ্বরীয় শক্তি ধারণ না করিলে দুর্বৃত্ত জগাই মাধাইর এমন পরিবর্তন তাঁহারা কি করিয়া সম্ভব করিলেন?

এমন করিয়া সেদিন নিত্যানন্দের কৌশল ও রঙ্গলীলা সারা নদীয়ায় গৌরাঙ্গের প্রভাবকে বিস্তারিত করিয়া দেয়।

শ্রীবাসের কুটিরে প্রতিদিন কীর্তন ও অভিনয়ের নব নব রঙ্গ অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রভু গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ, এই দুই প্রেমঘন বিগ্রহকে ঘিরিয়া ভক্ত-গোষ্ঠীর আনন্দের আর সীমা নাই। নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গৌর হইয়াছেন তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ, আর নিতাই বিরাজমান তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিষ্ঠার উৎসরূপে। প্রভু নিতাইকে পরিকরদের সম্মুখে তাঁহার দ্বিতীয় বিগ্রহ-রূপে স্থাপন করিয়াছেন। ভক্তগোষ্ঠী ও ভক্ত সংগঠনের মধ্যে তাঁহাকে প্রধান প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে হইবে, তাই বারবারই অন্তরঙ্গ মহলে নূতন করিয়া অবধূতের স্বরূপ ও লীলা মাহাত্ম্য তিনি তুলিয়া ধরিতেছেন।

সেদিন সন্ধ্যার গৌরসুন্দর ভক্তজন পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণকথায় মত্ত রহিয়াছেন। অন্যতম প্রধান পার্ষদ মুরারি গুপ্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদিনকার অভ্যাস-মতো মুরারি প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ করিলেন। তারপর প্রণত হইলেন পার্শ্বে উপবিষ্ট অবধূত নিত্যানন্দের পদতলে।

প্রভু সব কিছু লক্ষ্য করিতেছেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠেন, "মুরারি, প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে তোমার কিন্তু একটা ব্যতিক্রম ঘটলো। তোমার মত ভক্তবীরের কাছে সবাই প্রকৃত তত্ত্ব জানবে, প্রকৃত আচরণ শিখবে, এই তো আমি আশা করি। কিন্তু সেই তোমার দেখছি সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে।

মুরারি গুপ্তও হটিবার পাত্র নহেন। করজোড়ে কহেন, "প্রভু, আমার যা কিছু আচার আচরণ সবই তো তোমারই প্রভাবে, তোমারই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আর প্রণামের যে ক্রম তুমি ভেতর থেকে শিখিয়ে দিচ্ছ, বাইরের ব্যবহারে যে তা-ই প্রকাশ প্যাচ্ছে।"

"ভাল, ভাল মুরারি। আজ আর বৃথা বাক্যব্যয় ক'রে কাজ নেই। আগামী কালই সব কিছু তোমার ভেতর হয়তো স্ফুরিত হবে, প্রকৃত তত্ত্ব হবে তোমার বোধগম্য।"

সেদিনকার সভা ভঙ্গের পর মুরারি চলিয়া গেলেন। অন্তরে তাঁহার যুগপৎ হর্ষ ও ভয়ের দোলা লাগিতেছে। প্রভুর ইঙ্গিতের মর্ম বুঝিয়া উঠা ভার। কি ভাবে কোন্ তত্ত্ব তিনি স্ফুরিত করিবেন কে জানে?

সেই রাত্রিতে মুরারি গুপ্ত এক স্বপ্ন দর্শন করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। গৌর ও নিতাই দুই প্রভু দিব্যোজ্জ্বল মূর্তিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গৌর-সুন্দর এসময়ে স্পষ্টভাবে তাঁহার উপলব্ধিতে আনিয়া দিলেন—নিত্যানন্দ শুধু তাঁহার দ্বিতীয় বিগ্রহই নয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রতিম। কহিলেন, গৌরকে প্রণাম নিবেদনের আগে পরম ভক্ত মুরারি যেন নিতাইয়ের চরণে প্রণতি জানায়।

অস্ফুটকণ্ঠে বার বার নিত্যানন্দ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মুরারি গুপ্তের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভোরে উঠিয়াই তিনি প্রভুর গৃহের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। প্রভু ভক্ত-পারিষদদের মধ্যে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। মুরারি সম্মুখে গিয়া প্রথমেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, তারপর গ্রহণ করিলেন গৌরাঙ্গ প্রভুর চরণধূলি।

কৌতুকী প্রভু ভক্তদের সমক্ষে অবধূত নিত্যানন্দের মহিমা প্রচারের জন্য ব্যগ্র। স্মিতহাস্যে তিনি কহেন, "মুরারি' তোমার প্রণামের ক্রম আজ যেন অন্য রকম দেখছি।"

"প্রভু, সবই তোমার লীলা। তুমি যেমন দেখালে ও বুঝালে, সেই অনুযায়ীই তো আমায় আচরণ করতে হলো। তুমি স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে যে দেখিয়ে দিলে—নিত্যানন্দ তোমার জ্যেষ্ঠ!"

সমবেত ভক্তদের শুনাইয়া সস্নেহে গৌরাঙ্গ কহেন, "মুরারি, তুমি আমার বড় প্রিয়, তাই তো নিত্যানন্দ-তত্ত্ব বুঝবার অধিকার তুমি পেয়েছ।"

প্রভুর কর্মলীলার, কৃপালীলার প্রধান সহকারী নিত্যানন্দ। অক্রোধ পরমানন্দরূপী এই বিরাট পুরুষের কীর্তন-তান্ডবে নদীয়া তখন টলমল। মানুষের দ্বারে দ্বারে তিনি প্রেম-ভক্তির পসরা নিয়া ফিরেন, প্রভুর প্রবর্তিত মণ্ডলীর সংগঠনকে ধীরে ধীরে পূর্ণায়ত করিয়া তুলেন। এই বিরাট সংগঠন শক্তি গৌরাঙ্গের কাজীদলন লীলার পরম সহায়ক হইয়া উঠে, মুসলমান শাসনকর্তার আদেশ অমান্য করিয়া এই দেশে প্রকাশ্যে ও সর্বপ্রথমে কীর্তন-অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়।

বহুতর লোক এখন হইতে প্রভু গৌরাঙ্গের চরণে শরণ নিতে আরম্ভ করে, বৈষ্ণব ভক্তগোষ্ঠীর আয়তন ক্রমেই বিস্তৃততর হইতে থাকে। কিন্তু পাষন্ড, পাপাচারী ও বৈষ্ণব বিরোধীদের সংখ্যা দেশে তখন নিতান্ত কম নয়। প্রেম ভক্তিধর্মের নেতা নিমাই পণ্ডিতকে তাহারা স্বীকৃতি দিতে চাহে না। প্রকাশ্যে বৈষ্ণবদের করে নানা লাঞ্ছনা ও উপহাস, অত্যাচার করিতেও অনেক সময় দ্বিধা করেন না।

প্রভু একদিন সঙ্গোপনে নিত্যানন্দকে নিকটে ডাকাইলেন। কহিলেন, "শ্রীপাদ, আমার প্রাণের ইচ্ছা—পাপক্লিষ্ট জীবকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করবো, আর তারা উদ্ধার পাবে। কিন্তু তা সফল হতে পারছে কই? হিংসা ও দ্বেষের আগুন ছড়িয়ে নিন্দুকেরা আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে। এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে আমার সন্ন্যাস গ্রহণ। সংসারের ভোগ সুখ একেবারে ত্যাগ না করলে সংসারের জীব আমায় তো প্রীতির চোখে তেমন দেখবে না, আমার কথারও মূল্য তারা দেবে না।"

নিত্যানন্দের শিরে এ যেন এক আকস্মিক বজ্রাঘাত। রুদ্ধবাক্ হইয়া করুণ নয়নে তিনি প্রভুর দিব্য মূর্তির দিকে চাহিয়া আছেন।

প্রভু বুঝিলেন, তাঁহার বিচ্ছেদের এ পূর্বাভাস নিত্যানন্দের প্রাণে কি তীব্র আঘাত হানিয়াছে। সান্ত্বনার সুরে, প্রেমপূরিত কণ্ঠে তাঁহাকে কহিলেন,—"শ্রীপাদ, ভেবে দ্যাখো, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কোনো শত্রু নেই। আমি সেই সন্ন্যাসী হয়ে কেঁদে কেঁদে লোকের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম ভিক্ষে করবো। তাহলে তো আর তারা নাম প্রচারে বাধা জন্মাতে আসবে না? কাজেই আমার সন্ন্যাসের কথায় তুমি এমন ভেঙে পড়ো না।"

নিত্যানন্দ তবুও নিরুত্তর। একি মহা দুর্দৈবের কথা আজ তাঁহাকে শুনিতে হইতেছে? কোন্ মুখে তিনি প্রভুর এ নিষ্ঠুর প্রস্তাবে সম্মতি দিবেন?

প্রভু এবার তাঁহার শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, স্বীয় আবির্ভাবের নিগূঢ় কারণটি জানাইয়া অবধূতকে কহিলেন—

ইথে তুমি কিছু দুঃখ
না ভাবিও মনে।

বিধি দেহ তুমি মোরে
সন্ন্যাস কারণে ॥
....
জগৎ উদ্ধার যদি
চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি
করিবে আমারে ॥

এতক্ষণে নিত্যানন্দ মুখ খুলিলেন। সজল চক্ষে প্রেম গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "প্রভু, তুমি স্বেচ্ছাময়। যে সিদ্ধান্ত তুমি মনে মনে স্থির করেছ তার অন্যথা করবে এমন শক্তি কার আছে? তোমার বিহনে ভক্তদের কি গতি হবে, শচী-মা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কি মর্মান্তিক অবস্থা হবে, তাই আমি কেবল ভাবছি। তোমার এই জীব উদ্ধারলীলার গতিপ্রকৃতি অবশ্য শুধু তুমিই জানো। সন্ন্যাস নেওয়া যখন স্থির ক'রেই ফেলেছ, তখন তাই হোক। কিন্তু তোমার মনের কথাটি অন্তরঙ্গ ভক্তদের একবারটি জানাও, তারা অন্তত প্রস্তুত হয়ে নিক্।"

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ গৌরাঙ্গ অগ্রাহ্য করেন নাই। তাই পার্ষদদের মধ্যে কয়েকজন এ আসন্ন বিচ্ছেদের কথা সেদিন জানিতে পারিয়াছিলেন।

প্রভুর গৃহত্যাগের দিনটি অবশেষে আসিয়া যায়। ভক্তদের প্রেমবন্ধন, স্নেহময়ী জননীর আকর্ষণ ও পত্নীর প্রণয়পাশ ছিন্ন করিয়া তিনি পথে বাহির হইয়া পড়েন। কাটোয়া নগরে পরম ভাগবত সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর আশ্রম। এই মহাপুরুষের নিকট তিনি সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। নব নামকরণ হইল—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। এ সময়ে তাঁহার সঙ্গী হইবার অধিকারী হন অবধূত নিত্যানন্দ, গদাধর ইত্যাদি পঞ্চ পার্ষদ।

কাটোয়ায় গিয়া দীক্ষা গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যের প্রেমসিন্ধু যেন উত্তাল, দুর্বার হইয়া উঠে। মহাভাবরসে সদা তিনি মাতোয়ারা। হৃদয়ে তাঁহার নিরন্তর পশিতেছে নীলাচলনাথ দারুব্রহ্মের অমোঘ আহ্বান। তাই ব্যাকুলভাবে এবার তিনি মহাধাম নীলাচলের দিকে ধাবমান হইলেন।

চির বিদায়ের আগে জননী ও ভক্তদের সহিত প্রভু একবার সাক্ষাৎ করিতে চান। তাই নিত্যানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, আমি আর নবদ্বীপে ফিরবো না, শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের ভবনে অপেক্ষা করবো। তুমি নিজে গিয়ে জননী ও ভক্তদের সংবাদ দাও।"

নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পৌঁছা মাত্র ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া যায়। প্রভুর সংবাদের জন্য সকলেই মহা ব্যগ্র। সকলকে আশ্বস্ত করিয়া নিতাই শচীমাতার চরণ বন্দনা করিতে যান। প্রভুর গৃহের দৃশ্য দেখিয়া সেদিন তাঁহার পক্ষে আত্মসংবরণ করা কঠিন হয়। পুত্রশোকে মাতা উন্মত্তা-প্রায়, নিরন্তর তিনি বিলাপ করিতেছেন, বারো দিন যাবৎ কোনো আহার্যই গ্রহণ করেন নাই। বিরহবিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ মূর্তি দেখিয়া অশ্রুরোধ করা যায় না। নিত্যানন্দ উভয়কে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তারপর শচীমাতাকে কহিলেন, "মাগো, তোমার উপবাসে যে কৃষ্ণও

উপবাসে থাকেন। তুমি স্থির হয়ে উঠে বসো, ভোগান্ন প্রস্তুত করো। আমি ক্ষুধার্ত তোমার হাতের প্রসাদান্ন খেতে আমার বড় অভিলাষ হয়েছে। আমার সঙ্গে আজ ভক্তেরাও তোমার এখানে প্রসাদ পাবেন।"

নয়নাশ্রু মুছিয়া শচী রন্ধন শুরু করিলেন। সেদিন প্রভুর গৃহে নিত্যানন্দ ও ভক্তদের আহার সম্পন্ন হইল, শচীদেবীও উপবাস ভঙ্গ না করিয়া পারিলেন না। তারপর শচীমাতা ও ভক্তগণসহ নিত্যানন্দ অদ্বৈতের গৃহে উপনীত হইলেন। শান্তিপুরে সেদিন আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিল।

জননী ও ভক্তদের নানাভাবে প্রবোধ দিয়া চৈতন্য এবার পুরীর পথে পা বাড়াইলেন। সঙ্গী শুধু অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্ষদগণ।

নৃত্য ও কীর্তন করিতে করিতে সকলে সুবর্ণরেখার তটে আসিয়া পেঁাছিলেন। প্রভু তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, আর ভক্তেরা আসিতেছেন কিছুটা পিছনে। এ সময় নিত্যানন্দ এক দুঃসাহসী কাজ করিয়া বসেন।

প্রভু প্রায়ই ভাবাবিষ্ট ও অর্ধবাহ্য অবস্থায় থাকেন, সন্ন্যাসদণ্ডটি ঠিকমতো হাতে রাখিতে পারেন না। এজন্য পণ্ডিত জগদানন্দকেই এটি সন্তর্পণে বহন করিতে হয়। সেদিন পণ্ডিত ভিক্ষায় বাহির হইবেন, প্রভুর দণ্ডটি নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, প্রভুর এ সন্ন্যাসদণ্ড তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, এটা কিন্তু খুব সাবধানে রাখতে হবে। আমি গ্রাম থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ ক'রে এখনই ফিরে আসছি।"

নিত্যানন্দ তখন ভাবাবেশে বিভোর, কখনো বা থাকেন অর্ধবাহ্য অবস্থায়। প্রভুর দণ্ডটি হাতে আসিতেই চেতনা ফিরিয়া আসে, চিন্তা করিতে থাকেন, জীব উদ্ধারের জন্য প্রেমাবতার প্রভুর আবির্ভাব। তাঁহার আবার এ দণ্ড কমণ্ডলু বহন করা কেন? হঠাৎ কি এক অদ্ভুত উদ্দীপনা তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত হয়, হস্তস্থিত দণ্ডটি তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলেন, নদীর জলে দেন তাহা বিসর্জন।

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত জগদানন্দের তো চক্ষুস্থির। ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় নিত্যানন্দ এ কি সাংঘাতিক কাজ করিয়া বসিয়াছেন? প্রভুর সন্ন্যাসদণ্ড যে এক পরম পবিত্র বস্তু। এটি ভগ্ন হইয়াছে দেখিলে যে তিনি তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন। পণ্ডিত সঙ্কোচে ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই প্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ। দণ্ডটি ভগ্ন দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিলেন, কার এমন সাহস, কে আমার দণ্ডের এই দুরবস্থা করেছে?"

নিত্যানন্দ তখনও ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "প্রভু, এ কাজ আমারই। যদি ইচ্ছা হয়, তুমি দণ্ড বিধান করো!"

নিত্যানন্দের একথা শুনার পর প্রভুকে রোষ সংবরণ করিতে হইল। সর্ব পাশমুক্ত অবধূতের এ আবার কোন্ বিচিত্র লীলা, কে বলিবে। তাছাড়া, চৈতন্য যে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মান দিয়া থাকেন। তাই ভাবের ঘোরে দণ্ড ভাঙার জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করারই বা উপায় কই?

প্রভু শুধু কহিলেন, "এ পৃথিবীতে একমাত্র এ দণ্ডটিই ছিল আমার প্রধান অবলম্বন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় আজ তাও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভালোই

হলো। এবাব আব কাবুব সঙ্গেই আমাব কোনো সম্পর্ক বইল না। এখন থেকে আমি একলাই পথ চলবো, আব তোমবা সবাই যদি নীলাচলে যেতে চাও—পৃথকভাবে এসো।”

এ ব্যবস্থাই ভক্তদেব আপাতত মানিয়া নিতে হইল। প্রভুকে আগে যাইতে দিয়া ভক্তেবা তাঁহাব পিছু পিছু চলিলেন।

জলেশ্বব গ্রামে শিবেব এক জাগ্রত বিগ্রহ বর্তমান। এখানে পেঁীছিযাই প্রভু নব-ভাবে উদ্দীপিত হইযা উঠেন। কীর্তন ও উদ্দণ্ড নর্তনেব ফলে সেখানে লোকেব ভিড জমিযা যায়।

ইতিমধ্যে অনুসবণকাবী পবিকবগণ সেখানে আসিযা উপস্থিত। ভক্তপ্রবব মুকুন্দেব সুললিত কীর্তন ও ভাবাবিষ্ট প্রভুব নৃত্যে এক আনন্দেব হাট বসিযা গেল।

শ্রীচৈতন্যেব অন্তব পবম প্রসন্নতায ভবিযা উঠে। সন্ন্যাসদণ্ডটি ভাঙাব ফলে যা কিছু উষ্মাব সঞ্চাব হইযাছিল, এতক্ষণে তাহা দূব হইযাছে। এবাব নিত্যানন্দকে নিকটে আহ্বান কবিয়া প্রেমপূবিত কণ্ঠে অনুযোগ দিলেন—

কোথা তুমি আমাবে
কবিবে সংববণ।
যেমতে আমাব হয
সন্ন্যাস বক্ষণ॥
আবো আমা পাগল
কবিতে তুমি চাও।
আব যদি কব তবে
মোব মাথা খাও॥
যেন কব তুমি আমা
তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি
সভাস্থানে কই॥

প্রভুব শ্রীমুখেব এ কথা কযটিতে অবধূত নিত্যানন্দেব মাহাত্ম্য ও তত্ত্ব ফুটিযা উঠিয়াছে।

চৈতন্য একাকী সবাব আগে নীলাচলে আসিযা পেঁীছিলেন। জগন্নাথ মন্দিবে সেদিন দেখা গেল অভূতপূর্ব দৃশ্য। শ্রীবিগ্রহ দর্শন মাত্রেই প্রভু প্রেমোদ্বেল হইযা উঠিযাছেন, সর্বদেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকাবেব লক্ষণ ফুটিযা উঠিযাছে। স্বল্পকাল মধ্যেই দিব্যকান্তি দেহখানি সংবিৎহাবা হইযা ধূলায লুটাইতে থাকে। বাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম এই সমযে মন্দিবেব গর্ভগৃহে উপস্থিত। তবুণ সন্ন্যাসীব অদ্ভুত প্রেম-বিকাব দেখিযা তাঁহাব বিস্মযেব অবধি বহিল না। পবিহাবীদেব সাহায্যে তাঁহাকে তিনি সযত্নে নিজ আলযে নিযা গেলেন।

নিত্যানন্দ ও অপব সঙ্গীবা পিছনে পডিযাছিলেন, এবাব প্রভুব সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন্য ও তাঁহাব বিশিষ্ট ভক্তদেব পবিচয পাইয়া সার্বভৌমেব আনন্দেব অবধি বহিল না। চৈতন্য ও নিত্যানন্দ এই উভযকে তিনি পবম যত্নে তাঁহাব গৃহে আতিথ্য গ্রহণ কবাইলেন।

ভাবের মানুষ নিত্যানন্দকে সামলাইয়া চলা বড় কঠিন। কখনো তাঁহার প্রেমাবেশ উদ্দাম হইয়া উঠে, কখনো বা উদ্দণ্ড নর্তন-কীর্তন ও হুঙ্কারে তিনি সকলকে সচকিত করিয়া তুলেন। একদিন তো ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি জগন্নাথ মন্দিরে এক প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে দাঁড়াইয়া নিত্যানন্দ সেদিন সঙ্গীগণ সহ কীর্তন করিতেছেন। অকস্মাৎ মহাভাবে উদ্দীপিত হইয়া পড়িলেন। প্রেম-প্রমত্ত অবধূতের হুঙ্কারে সবাই ভীত চকিত হইয়া উঠিল। ভাবের ঘোরে প্রচণ্ড বিক্রমে তিনি ছুটিলেন জগন্নাথ-বলরাম বিগ্রহদ্বয়কে আলিঙ্গন করিতে। মন্দির পরিহারীরা সবাই ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল, কিন্তু তাহাকে ঠেকানো গেল না। বেদীর উপর আরোহণ করিয়া অবধূত নিত্যানন্দ বলরাম বিগ্রহকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন, আর তাঁহার মালাগাছা তুলিয়া নিয়া নিজের গলায় পরিলেন। ঈশ্বরীয় ভাবে তিনি তখন উদ্দীপিত, আননখানি দিব্য আনন্দের ছটায় উদ্ভাসিত। ভক্ত ও পরিহারী-দের জয়ধ্বনিতে শ্রীমন্দির মুখরিত হইয়া উঠিল।

নিত্যানন্দের এই প্রেম-প্রমত্ত ভাব এ সময়ে নীলাচলবাসীর বিস্ময় উদ্রেক করিতে থাকে। চৈতন্যের প্রধান পার্ষদরূপে সর্বত্র তিনি হন অসামান্য মর্যাদার অধিকারী।

চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সংকল্প স্থির করিয়াছেন; ভক্ত পার্ষদদের কাহাকেও সঙ্গে নিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। সবাইকে কহিলেন, সেতুবন্ধ হইতে তিনি না ফিরিয়া আসা অবধি তাঁহারা সবাই যেন নীলাচলে অপেক্ষা করেন। নিত্যানন্দ প্রমাদ গণিলেন। কহিলেন, "সে কি কথা প্রভু, একাকী তোমার যাওয়া কি ক'রে হয়? তোমার প্রায়ই কোনো বাহ্যজ্ঞান থাকে না, কখন কি বিপদ ঘটে তা কে জানে? কাউকে তোমার সঙ্গে নিতেই হবে। দক্ষিণের সব পথ ঘাট আমার চেনা, সেখানকার তীর্থগুলো আমি পরিক্রমণ ক'রে বেড়িয়েছি। আমাকেই তোমার সঙ্গে যেতে দাও।"

চৈতন্য এ প্রস্তাবে রাজী নন, এই ভ্রমণ সময়ে তাঁহাকে বহুতর কার্য সাধন করিতে হইবে, বহুলোককে উদ্ধার করিতে হইবে, এ সময়ে মুক্ত ও স্বতন্ত্র হইয়াই তিনি চলিতে চাহেন। নিত্যানন্দের স্নেহবন্ধনে নিজেকে জড়িত রাখা তাঁহার মনঃপূত নয়—

প্রভু কহে আমি নর্তক
তুমি সূত্রধার।
যৈছে তুমি নাচাহ
তৈছে নর্তন আমার॥
সন্ন্যাস করি আমি
চলিলাম বৃন্দাবন।
তুমি আমা লৈয়া
আইলা অদ্বৈত ভবন॥
নীলাচলে আসিতে তুমি
ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ় স্নেহে
আমার কার্য ভঙ্গ॥

সঙ্গীরূপে অন্য কোনো ভক্তকে গ্রহণের প্রস্তাবও তিনি উড়াইয়া দিলেন। এবার

নিত্যানন্দ মিনতি করিয়া কহিলেন, "বেশ কথা, আমরা অন্তরঙ্গের দল না হয় নাই গেলাম, কিন্তু পরিচারক ও সঙ্গী হিসাবে একজন কাউকে তোমায় নিতেই হবে। তুমি সদাই থাকবে প্রেমাবেশে বিভোর, দুই হস্ত থাকবে কীর্তন বা নামজপে ব্যাপৃত, কৌপীন-বহির্বাস ও জলপাত্রই বা বহন করবে কে, কে-ই বা এসব দেখাশুনা করবে? ভক্তসবলপ্রাণ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস এখানে রয়েছেও তাকেই আমরা তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, অন্তত একে নিতেই হবে।"

নিত্যানন্দের এ অনুরোধ এড়ানোর উপায় রহিল না। অগত্যা প্রভু স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, তবে তাই হোক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

প্রভু দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের পর শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সেদিনকার এই দীর্ঘ পরিক্রমার উদ্দেশ্যটি কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। ব্রজরসতত্ত্বের মর্মজ্ঞ রামানন্দ রায়কে তিনি এ উপলক্ষে আত্মসাৎ করিলেন, প্রেমধর্মের বীজ সারা দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে বপন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

মহাধাম নীলাচলে চৈতন্যের লীলানাট্যের মঞ্চটি ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছে। ভারতের দূরদূরান্তে পাদ-পরিক্রমা করিয়া তিনি লক্ষ লক্ষ লোককে কৃষ্ণনামে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, এবার তাঁহার দৃষ্টি পড়িল মাতৃভূমি গৌড়ের উপর। এখানকার জনসমাজে তান্ত্রিক প্রভাব বড় প্রবল। নব্যন্যায়ের তর্ক ও কচকচিতে পণ্ডিতসমাজ সদাই থাকে অতিমাত্রায় মুখর। সাধারণ মানুষের জীবনে নীতিধর্ম ও শরণাগতির চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তাই নিজের এই আবির্ভাব-ভূমিতে তাঁহার নব-ধর্ম প্রচার না করিলে চলিবে কেন? সারা গৌড়দেশকে মন্থন করিয়া প্রেমভক্তির অমৃত উৎসারিত করিতে প্রভু ব্যগ্র হইলেন।

কিন্তু এই বিরাট কাজের ভার তিনি কাহাকে দিবেন? প্রভু নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্থায়িভাবে পুরীধামে বাস করিতেছেন। উচ্চকোটির ভক্ত সাধকদের অনেকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হইয়াছেন সন্ন্যাসী। অনেকেরই ধারণা, প্রভুর প্রকৃত অনুগামী হইতে হইলে বুঝি গার্হস্থ্য অবলম্বন না করাই ভাল।

অদ্বৈত অবশ্য গৃহীরূপেই গৌড়ে অবস্থান করিতেছেন। প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্মজ্ঞ ও ব্যাখ্যাতা রূপে তিনি পরিচিত। গৌড়ীয়া ভক্তসমাজ তাঁহার মতো মহা-পুরুষকে পাইয়া ধন্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অদ্বৈত বৃদ্ধ হইয়াছেন, এই বিরাট বৈষ্ণব সংগঠনের ভার নিবার মতো বয়স তাঁহার নাই। তাছাড়া, গৌড়দেশে জ্ঞানপন্থী পণ্ডিতের ছড়াছড়ি। ইহাদের আত্মসাৎ করিতে হইলে প্রেমঘন মূর্তি নিতাইর মতন নেতারই প্রয়োজন। প্রভু তাই মনে মনে ভাবিলেন, এ গুরুভার নিত্যানন্দকেই দিবেন।

নিতাই প্রভুর অভিন্নহৃদয় সহকারী। ভক্তগণ তাঁহাকে প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর বলিয়া ভাবিয়া নিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। নব ভাবের উদ্বোধন ঘটাইতে, নবগঠিত বৈষ্ণবসমাজে নূতন উদ্দীপনা নূতন রসতরঙ্গ সৃষ্টি করিতে, তাঁহার মতো সমর্থ পুরুষ আর কে আছে? বলা বাহুল্য সিদ্ধান্ত স্থির করিতে প্রভুর দেরি হইল না।

নিত্যানন্দকে একদিন বিরলে ডাকিয়া নিয়া কহিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ, আমার দুঃখের অবধি নেই। আমি নিজমুখে ঘোষণা করেছি বিদ্বান মূর্খ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ধনী দরিদ্র সবাইকে কোলে টেনে নেব, হরিভক্তি ও প্রেমধর্ম বিতরণ করবো। কিন্তু

তার তো উপায় দেখছিনে। আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, গৃহস্থদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আর রইল না। তুমিও যদি সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে থাকো, তবে পতিত অভাজনদের গতি কি হবে? তাদের উদ্ধার কে করবে? তুমি নিজেকে এমন ক'রে সংবরণ ক'রে রাখলে তো চলবে না। শ্রীপাদ, আমার কথা রাখো। তুমি গৌড়দেশে ফিরে যাও, সেখানে গিয়ে সংসারী হও, সংসারের উষর ক্ষেত্রে প্রেমভক্তির অমৃত প্রবাহ নামিয়ে আনো।"

এ কি নির্মম আদেশ! প্রভুর কথা কয়টি শুনা মাত্র নিত্যানন্দ মর্মাহত ও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এ যেন এক আকস্মিক বজ্রাঘাত। অতি অল্প বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছেন। সন্ন্যাস ও অবধূত জীবনের মধ্য দিয়া ভাগবত প্রেমের পরম মাধুর্য খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। পূর্বতন জীবনের সমস্ত কিছু মহান আদর্শ বিসর্জন দিয়া শেষকালে বিবাহ করিতে হইবে, গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিতে হইবে?

একথাও নিতাই বুঝিয়া নিয়াছেন, প্রভুর জীব উদ্ধার ব্রতের তিনি এক বড় সহায়ক। এ ব্রত সাধনের জন্য যে কোনো প্রকার দুঃখবরণে বা ত্যাগ স্বীকারে তিনি পরাঙ্মুখ নন, ইহাও সত্য। প্রভুর আজিকার আদেশ সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন। নিতাইর কাছে ইহা অনভিপ্রেত হোক, তাহা অমান্য করার প্রশ্ন উঠে না। তাই অবনত শিরে এ নির্দেশ তিনি গ্রহণ করিলেন। সর্বজনবন্দিত অবধূত নিত্যানন্দ সেদিন প্রভুর দেওয়া শৃঙ্খল বন্ধন স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

নিতাই এবার গৌড়ের পথে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে তাঁহার রহিয়াছেন প্রেমধর্ম প্রচারের উপযুক্ত ভক্তদল—রামদাস, গদাধরদাস, সুন্দরানন্দ, পরমেশ্বরদাস, পুরুষোত্তম দাস ইত্যাদি।

নিত্যানন্দ নূতন উদ্দীপনায় উন্মত্ত, রসাবেশে আনন্দচঞ্চল। ভক্ত পরিকরদের মধ্যেও তিনি একসময়ে এক বিস্ময়কর অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত করেন। তারপর ভাববিহ্বল সঙ্গীদলসহ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে গৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হন।

গৌড়দেশে সেদিন নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটে প্রেমদাতা 'দয়াল নিতাই' রূপে। ভুবনমোহন তাঁহার দিব্যকান্তি, উল্লাসময় তাঁহার নর্তন-কীর্তন, প্রেমে বিগলিত ঘন তাঁহার নয়নের অশ্রু আর অদ্ভুত তাঁহার সাত্ত্বিক বিকার। এই অলৌকিক পুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া ভক্তেরা সাক্ষাৎভাবে ভাগবত প্রেমের স্পর্শ অনুভব করে, তাঁহার দিব্য প্রেম দর্শনে নরনারী সেদিন উদ্বেল হইয়া উঠে, তাঁহার দৃষ্টি সম্পাতে ও করস্পর্শে হয় প্রেম প্রমত্ত। সেদিনকার গৌড়ে প্রেমাবতার নিত্যানন্দ-প্রভু যেন ভাগবতী সাধনার এক শতদলরূপে বিরাজিত, আর তাহার মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে দূর দূরান্তের ভক্তদল।

নিত্যানন্দের এ সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য ও করুণার কথা তুলিয়া বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

যাহারে করেন দৃষ্টি
নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া
পড়েন পৃথিবীতে॥

এ এক অপূর্ব শক্তি সঞ্চাবণ। নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া ও হুঙ্কাব ছাড়িয়া নন্দ সেদিন সাবা গৌড়ে অপূর্ব প্রেমতবঙ্গেব সৃষ্টি কবিলেন।

সেদিন তিনি পানিহাটি গ্রামে বাঘব পণ্ডিতেব গৃহে আসিয়া উপস্থিত। দিকে বহুসংখ্যক পার্ষদ ও ভক্তদলেব ভিড। অবিবাম ধাবায কীর্তনানন্দ চলি হঠাৎ তিনি ঈশ্ববীয ভাবযুক্ত হইয়া উঠেন। ভক্তদেব আদেশ দেন, এখনি সাড়ম্ববে অভিষেক কবাইতে হইবে। ভাবে ভাবে গঙ্গাজল আনাযন কবিযা নন্দেব অভিষেক সম্পন্ন হয। বনমালা গলে চন্দনচর্চিত দেহে খট্টাব উপব উপবিষ্ট, আব বাঘব পণ্ডিত তাঁব শিবে ছত্র ধবিবা দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তদেব ও উল্লাসে ধ্বনিতে চাবিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিযাছে।

বাঘব পণ্ডিতেব গৃহে লীলাকৌতুকী নিত্যানন্দ সেদিন এক অলৌকিক ঘটান বলিযা জনশ্রুতি আছে। পণ্ডিতেব দিকে চাহিয়া সহসা স্মিত হাস্যে "পণ্ডিত শিগ্‌গীব আমাব জন্য এক ছড়া কদম্বমালা গেঁথে আনো, কদম্ব যে সব চাইতে প্রিয।"

বাঘব মহা বিপদে পড়িলেন। এ অসমযে কদম্বপুষ্প কোথাব পাইবেন? হস্তে বাব বাব একথা নিবেদন কবিযাও নিষ্কৃতি পাইলেন না। নিত্যানন্দ স্ববে আদেশ দিলেন, "পণ্ডিত, দ্যাখো না একবাব বাড়িব ভেতব গিযে। হঠাৎ কোথাও এ ফুল ফুটে থাকতেও তো পাবে।"

সত্যই তো। বাঘব পণ্ডিত দেখিলেন, গৃহকোণেব এক লেবুগাছে গুটিকযে ফুল ফুটিযাছে। বিস্ময বিমূঢ বাঘব কোনোমতে আত্মসংববণ কবিযা মা শেষ কবিলেন, তাবপব সর্বসমক্ষে এটি পবাইয়া দিলেন নিত্যানন্দেব গলায।

সেদিনকাব কীর্তনে নিত্যানন্দ আবও একটি অলৌকিক লীলা বিস্তাব কবে শোনা যায। কীর্তনবত ভক্তদেব নাসিকায় হঠাৎ দমনক পুষ্পেব তীব্র সুব কবিতে থাকে। বিস্মিত হইযা সকলেই পবস্পবেব মুখেব দিকে তাকা নিত্যানন্দ এ বহস্যেব মর্ম কহিলেন—

চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্তন।
নীলাচল হইতে কবিলেন আগমন
সর্বাঙ্গে পবিযা দিব্য দমনক মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্ব কবিযা বহিলা॥
সেই শ্রীঅঙ্গেব দিব্য দমনক গন্ধে।
চতুর্দিক পূর্ণ হই আছযে আনন্দে॥
তোমা সবাকাব নৃত্য কীর্তন দেখিতে।
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হৈতে॥
এতেকে তোমবা সর্ব কার্য পবিহবি।
নিববধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাসবি॥
নিববধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে
সভাব শবীব পূর্ণ হউক প্রেমবসে॥

নিত্যানন্দের প্রেমদৃষ্টিপাতে সেদিন সমবেত ভক্তদের মধ্যে এক অপবূপ দিব্য ভাবেব সঞ্চাব হয, কীর্তনক্ষেত্রে স্বর্গীয় আনন্দেব তবঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠে। তাঁহাব

অপবূপ ঐশ্বর্য প্রকাশেব ফলে প্রতিটি লোক সেদিন অলৌকিক প্রেমাবেশে আত্মহাবা হয—

অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম
পুলক হুঙ্কাব।
স্ববভঙ্গ, বৈবর্ণ, গর্জন
সিংহসাব॥
শ্রীআনন্দ মূর্ছা আদি
যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত
কৃষ্ণ অনুবাগ॥
সভাব শবীবে পূর্ণ
হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দস্ববূপেব
প্রেম-বল॥
যে দিকে দেখেন
নিত্যানন্দ মহাশয।
সেই দিকে মহাপ্রেম-
ভক্তি বৃষ্টি হয॥

পানিহাটিতে প্রায তিনমাস কাল নানা লীলাবিলাসেব পব নিত্যানন্দ খড়দহে যা আসেন। সেখানেও আনন্দেব হাট বসিয়া যায। এ হাটেব ক্রেতা আপামব সাধাবণ, বিক্রেতা নিত্যানন্দ, পণ্য চৈতন্যপ্রভু। সুবধুনীব তীবে তীবে নিতাই র্তন ধরেন—

ভজ গৌবাঙ্গ কহ গৌবাঙ্গ
লহ গৌবাঙ্গেব নাম।
যে ভজে গৌবাঙ্গ চাঁদ
সে হয আমার প্রাণ॥

'প্রেমদাতা দযাল নিতাই'র সে এক অপবূপ বূপ। গুরুগম্ভীব তত্ত্বেব আড়ম্বব , সূক্ষ্ম তত্ত্বেব বিচাব বিশ্লেষণ নাই, আছে শুধু ভাবোদ্বেল কীর্তন-নর্তন আব াশ্রুর ধাবা। আচণ্ডালে তিনি প্রেম বিতবণ কবিতে থাকেন, কখনো ভূমিতলে টাইযা, কখনো লোকেব গলা জড়াইযা ধবিযা কাঁদিযা কাঁদিযা কহেন, "ভাই, দযা বে একবাব কৃষ্ণ ভজ, গৌবাঙ্গ ভজ। বিনামূল্যে চিবতবে আমায কিনে নাও। আমাব মাদেব দাসানুদাস কবো, ভাই।"

দেবপ্রতিম মহাসাধকেব এ কি হৃদযবিদাবক দৈন্য ও আর্তি। যে-ই এ দৃশ্য দর্শন বে, নযনাশ্রু সংবরণ কবা তাহাব পক্ষে কঠিন হয। নিত্যানন্দকে কিনিযা নেওযা তো বেব কথা, মুহূর্তে সে নিজেই তাঁহাব চবণে বিক্রীত হইযা বসে। প্রেমিক অবধূতেব ম যেমন অতি-মানুষিক, তাঁহার এই প্রচাব পদ্ধতিও তেমনি অভিনব। ভাগীবথীর দুই তীরে এমনিভাবে হরিনাম-প্রেমেব মহোৎসব তিনি জাগাইযা তোলেন।

এ এক অপূর্ব শক্তি সঞ্চাবণ। নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া ও হুঙ্কাব ছাড়িয়া নিত্যানন্দ সেদিন সাবা গৌড়ে অপূর্ব প্রেমতবঙ্গের সৃষ্টি কবিলেন।

সেদিন তিনি পানিহাটি গ্রামে বাঘব পণ্ডিতেব গৃহে আসিয়া উপস্থিত। চাবিদিকে বহুসংখ্যক পার্ষদ ও ভক্তদলেব ভিড। অবিবাম ধাবায কীর্তনানন্দ চলিযাছে। হঠাৎ তিনি ঈশ্ববীয ভাবযুক্ত হইযা উঠেন। ভক্তদেব আদেশ দেন, এখনি তাঁহাকে সাড়ম্ববে অভিষেক কবাইতে হইবে। ভাবে ভাবে গঙ্গাজল আনায়ন কবিবা নিত্যানন্দেব অভিষেক সম্পন্ন হয। বনমালা গলে চন্দনচর্চিত দেহে খট্টাব উপব তিনি উপবিষ্ট, আব বাঘব পণ্ডিত তাঁব শিবে ছত্র ধবিযা দাঁড়াইযা আছেন। ভক্তদেব কীর্তন ও উল্লাসে ধ্বনিতে চাবিদিক পূর্ণ হইযা উঠিযাছে।

বাঘব পণ্ডিতেব গৃহে লীলাকৌতুকী নিত্যানন্দ সেদিন এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটান বলিযা জনশ্রুতি আছে। পণ্ডিতেব দিকে চাহিযা সহসা স্মিত হাস্যে কহেন, "পণ্ডিত শিগ্‌গীব আমাব জন্য এক ছডা কদম্বমালা গেঁথে আনো, কদম্ব যে আমাব সব চাইতে প্রিয।"

বাঘব মহা বিপদে পড়িলেন। এ অসমযে কদম্বপুষ্প কোথায পাইবেন? জোড়হস্তে বাব বাব একথা নিবেদন কবিয়াও নিষ্কৃতি পাইলেন না। নিত্যানন্দ গম্ভীব স্ববে আদেশ দিলেন, "পণ্ডিত, দ্যাখো না একবাব বাড়িব ভেতব গিযে। খোঁজ নাও হঠাৎ কোথাও এ ফুল ফুটে থাকতেও তো পাবে।"

সত্যই তো। বাঘব পণ্ডিত দেখিলেন, গৃহকোণেব এক লেবুগাছে গুটিকযেক কদমফুল ফুটিযাছে। বিস্মষ বিমূঢ বাঘব কোনোমতে আত্মসংবরণ কবিযা মালা গাঁথা শেষ কবিলেন, তাবপব সর্বসমক্ষে এটি পবাইযা দিলেন নিত্যানন্দের গলায।

সেদিনকাব কীর্তনে নিত্যানন্দ আবও একটি অলৌকিক লীলা বিস্তাব করেন বলিযা শোনা যাব। কীর্তনবত ভক্তদের নাসিকায হঠাৎ দমনক পুষ্পেব তীব্র সুবাস প্রবেশ কবিতে থাকে। বিস্মিত হইযা সকলেই পবস্পবেব মুখেব দিকে তাকাইতেছেন। নিত্যানন্দ এ বহস্যেব মর্ম কহিলেন —

চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্তন।
নীলাচল হইতে কবিলেন আগমন
সর্বাঙ্গে পরিযা দিব্য দমনক মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া বহিলা॥
সেই শ্রীঅঙ্গেব দিব্য দমনক গন্ধে।
চতুর্দিক পূর্ণ হই আছযে আনন্দে॥
তোমা সবাকাব নৃত্য কীর্তন দেখিতে।
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হৈতে॥
এতেকে তোমবা সর্ব কার্য পরিহবি।
নিববধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাসবি॥
নিববধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে
সভাব শবীব পূর্ণ হউক প্রেমবসে॥

নিত্যানন্দেব প্রেমদৃষ্টিপাতে সেদিন সমবেত ভক্তদেব মধ্যে এক অপবূপ দিব্য ভাবেব সঞ্চাব হয, কীর্তনক্ষেত্রে স্বর্গীয় আনন্দেব তবঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠে। তাঁহার

অপরূপ ঐশ্বর্য প্রকাশের ফলে প্রতিটি লোক সেদিন অলৌকিক প্রেমাবেশে আত্মহারা হয়—

অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম
পুলক হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ, গর্জন
সিংহসার ॥
শ্রীআনন্দ মূর্ছা আদি
যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত
কৃষ্ণ অনুরাগ ॥
সভার শরীরে পূর্ণ
হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দস্বরূপের
প্রেম-বল ॥
যে দিকে দেখেন
নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিকে মহাপ্রেম-
ভক্তি বৃষ্টি হয় ॥

পানিহাটিতে প্রায় তিনমাস কাল নানা লীলাবিলাসের পর নিত্যানন্দ খড়দহে চলিয়া আসেন। সেখানেও আনন্দের হাট বসিয়া যায়। এ হাটের ক্রেতা আপামর জনসাধারণ, বিক্রেতা নিত্যানন্দ, পণ্য চৈতন্যপ্রভু। সুরধুনীর তীরে তীরে নিতাই কীর্তন ধরেন—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ
লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ
সে হয় আমার প্রাণ ॥

'প্রেমদাতা দয়াল নিতাই'র সে এক অপরূপ রূপ। গুরুগম্ভীর তত্ত্বের আড়ম্বর নাই, সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ নাই, আছে শুধু ভাবোদ্বেল কীর্তন-নর্তন আর নয়নাশ্রুর ধারা। আচণ্ডালে তিনি প্রেম বিতরণ করিতে থাকেন, কখনো ভূমিতলে লুটাইয়া, কখনো লোকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহেন, "ভাই, দয়া ক'রে একবার কৃষ্ণ ভজ, গৌরাঙ্গ ভজ। বিনামূল্যে চিরতরে আমায় কিনে নাও। আমার তোমাদের দাসানুদাস করো, ভাই।"

দেবপ্রতিম মহাসাধকের এ কি হৃদয়বিদারক দৈন্য ও আর্তি। যে-ই এ দৃশ্য দর্শন করে, নয়নাশ্রু সংবরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হয়। নিত্যানন্দকে কিনিয়া নেওয়া তো দূরের কথা, মুহূর্তে সে নিজেই তাঁহার চরণে বিক্রীত হইয়া বসে। প্রেমিক অবধূতের প্রেম যেমন অতি-মানুষিক, তাঁহার এই প্রচার পদ্ধতিও তেমনি অভিনব। ভাগীরথীর দুই তীরে এমনিভাবে হরিনাম-প্রেমের মহোৎসব তিনি জাগাইয়া তোলেন।

দিক্‌বিদিকে সংবাদ রটিয়া যায়, পতিতপাবন রূপে গৌড়দেশে নিত্যানন্দের প্রকাশ ঘটিয়াছে। আচণ্ডালে নাম-প্রেমসুধা বিতরণ করিয়া তিনি জীবের উদ্ধার সাধন করিতেছেন। অলৌকিক তাঁহার শক্তি, অপরিমেয় তাঁহার জীবপ্রেম, আর প্রভু চৈতন্যের তিনি দ্বিতীয় কলেবর। দলে দলে লোক প্রেমধর্মের প্রবর্তক এই বিরাট পুরুষকে দর্শনের জন্য ভিড় জমায়।

প্রেম সরোবরে নিতাই সদা ভাসমান—প্রেম-রসেরই তরঙ্গভঙ্গে তিনি সদা টলমল। হৃদপদ্মে তাঁহার নব নব ভাবের দল বিকশিত হইয়া উঠে, উদ্বোধন ঘটে নব নব লীলা-রঙ্গের।

সর্বত্যাগী এই অবধূতের হঠাৎ কি এক খেয়াল হয়, মনোহর নাগর সাজে তিনি সজ্জিত হইবেন, সর্ব অলংকারে ভূষিত হইয়া দেশের যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইবেন। এই অদ্ভুত ইচ্ছা জাগিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে বসনভূষণ সংগ্রহে দেরি হইল না। এমনিতেই দেহখানি সুগৌর সুঠাম, এবার নীল বসনে মণ্ডিত হইয়া এটি আরও নয়নাভিরাম হইয়া উঠিল। কণ্ঠে তাঁহার রত্নহার, হস্তে সুবর্ণ বলয়, অঙ্গুলি কয়টিতে রত্নখচিত অঙ্গুরীয়—চরণে রমণীয় রৌপ্য নূপুর। অঙ্গ চন্দনে চর্চিত, ললাটে অঙ্কিত তিলক চিহ্ন, আর গলে বিলম্বিত রহিয়াছে মল্লিকামালতীর শুভ্র সুগন্ধ মাল্য। এই দিব্য রূপ, এই মোহন সাজ আর তাঁহার নৃত্যের ছাঁদ একবার যে দেখে সে মোহিত হয়। নিত্যানন্দের ভুবনমঙ্গল নামকীর্তন একবার যে শ্রবণ করে—মন প্রাণ তাঁহার চিরতরে বাঁধা পড়িয়া যায়।

তাঁহার পারিষদ দলও কম রঙ্গিয়া নন। মনোহর ব্রজরাখাল বেশে তাঁহারা সদাই সজ্জিত থাকেন। বসন ভূষণের পারিপাট্য তাঁহাদেরও যথেষ্ট। গলে গুঞ্জামালা, হাতে শিঙ্গা, বেত্র ও বংশী নিয়া তাঁহারা শহরে জনপদে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান। এই পরিকরদের এক একটি যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, অলৌকিক প্রেম ও শক্তির নানা প্রকাশ দেখাইয়া, ভক্তিরসের প্রবাহ উদ্বেলিত করিয়া সারা গৌড়দেশে তাঁহারা চাঞ্চল্য তুলিয়া দিলেন।

খড়দহ প্রভৃতি অঞ্চল পরিক্রমা করিয়া নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে উপনীত হন। এখানে ত্রিবেণীর ঘাটে পরম ভক্ত উদ্ধারণ দত্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। সাক্ষাৎ মাত্রই ঘটে তাঁহার আত্মসাৎ। উদ্ধারণ সর্বমনপ্রাণ নিত্যানন্দের চরণে নিবেদন করেন, অতুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া তিনি হন তাঁহার পার্শ্বচর। সপ্তগ্রামে নিরন্তর অবধূতের নর্তন-কীর্তন ও আনন্দলীলা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। এখানকার বণিক-সমাজের নেতা হইতেছেন উদ্ধারণ দত্ত। ইঁহারই প্রভাবে গৌড়ীয় বণিকেরা নিত্যানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়। বাংলার হিন্দুসমাজে ইহাদের তখনও জলচল ছিল না। নিত্যানন্দ ইহাদের নূতন মর্যাদা দান করিলেন, নবধর্মের প্রবর্তনে সুবর্ণ বণিকেরা হইয়া উঠিল তাঁহার পরম সহায়ক।

নাম-প্রেমের ঝঙ্কারে সপ্তগ্রাম অঞ্চল মাতাইয়া তুলিয়া নিতাই শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার দর্শনে অদ্বৈতের আনন্দের অবধি রহিল না। সোৎসাহে দুই বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে তিনি আলিঙ্গন করিলেন। ভাবমত্ত দুই মহাপ্রেমিকের হুঙ্কারে ও ক্রন্দনে শান্তিপুরে সেদিন এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হইল।

বৃদ্ধ আচার্য অদ্বৈত প্রভুর কণ্ঠে সেদিন নিত্যানন্দের স্তুতি উচ্চারিত হইতে শোনা যায়—

তুমি নিত্যানন্দ মূর্তি
নিত্যানন্দ নাম।
মূর্তিমন্ত তুমি
চৈতন্যের গুণগ্রাম ॥
সর্বজীব পরিত্রাণ
তুমি মহা সেতু।
মহাপ্রলয়েতে তুমি
সত্য-ধর্ম সেতু ॥
তুমি সে বুঝাও
চৈতন্যের প্রেমভক্তি
তুমি সে চৈতন্য-বৃক্ষে
ধর পূর্ণ শক্তি ॥

(চৈঃ ভাঃ)

নবদ্বীপের ভক্তেরা মাঝে মাঝে নিত্যানন্দের দর্শন পান এবং আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন, গৌর লীলাভূমিতে প্রেমভক্তি রসের নূতন জোয়ার জাগিয়া উঠে। প্রধানত মহাবলী নিত্যানন্দের প্রেরণাতে গৌরাঙ্গ ভজন বিস্তার লাভ করিতে থাকে।

একবার নিত্যানন্দ নবদ্বীপে হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। পণ্ডিত দরিদ্র হইলেও বড় শুদ্ধসত্ত্ব ও ভক্তিমান্। পরম আগ্রহে অবধূত নিত্যানন্দের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। নিজে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব হইলে কি হয়, এসময়ে তাঁহার গৃহের উপরই পড়ে ডাকাতদের দৃষ্টি। নিত্যানন্দের বেশভূষায় খুব আড়ম্বর। কণ্ঠে ও হাতে পায়ে রহিয়াছে নানা সোনা রূপার অলংকার। ভক্তদের উপহারও ভারে ভারে কম আসিতেছে না। অবশ্য এসব কোনো কিছুতেই নিত্যানন্দের হুঁশ নাই। দিনরাত নামপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন।

এই ডাকাতদলের নেতা এক তরুণ ব্রাহ্মণ। নরহত্যা গৃহদাহ প্রভৃতি এমন কোনো কুকাজ নাই যাহা করিতে সে পশ্চাৎপদ হয়। দলবল সঙ্গে নিয়া এক রাত্রিতে সে হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহের পিছনে লুকাইয়া থাকে। সুযোগ মতো নিত্যানন্দকে মারিয়া তাঁহার অলংকার ও টাকাকড়ি সে লুঠ করিবে।

রাত্রি তখনও গভীর হয় নাই। ডাকাতেরা ঠিক করিল, মধ্যরাত্রে তাহারা আক্রমণ শুরু করিবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে কেমন এক অদ্ভুত ঘুমে সবাই অচেতন হইয়া পড়ে। এ রহস্যময় ঘুম টুটিয়া যায় ভোরবেলায়, তখন সূর্যালোক ছড়াইয়া পড়িতেছে। তখন তাড়াতাড়ি তাহারা সরিয়া পড়ে।

দস্যুদলের জেদ কিন্তু বাড়িয়া যায়। আবার একদিন তাহারা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া সেখানে হানা দিতে আসে। কিন্তু কি বিস্ময়কর ব্যাপার। বাড়ির চারিদিকে এবার কাহারা পাহারা দিতে শুরু করিয়াছে। দীর্ঘ সুঠাম সুন্দরবপু এই রক্ষীদল, আর ইহাদের হাতেও রহিয়াছে নানা মারাত্মক অস্ত্র। এদিনও লুণ্ঠনের সুযোগ হইল না। ভীত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয়দিন নিশাযোগে আবার তাহারা আসিয়া উপস্থিত। সোরগোল করিয়া অঙ্গনে ঢুকিবামাত্র দেখা গেল কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে তাহাদের সকলেরই দৃষ্টিশক্তি হঠাৎ লোপ পাইয়া বসিয়াছে। ভীত বিভ্রান্ত ডাকাতদের নিজেদের মধ্যেই জড়াজড়ি হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। ইহার উপর আবার আরম্ভ হয় প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। অতিকষ্টে পথ হাতড়াইয়া কোনোমতে তাহারা পণ্ডিতের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

এবার দস্যুদের সত্যই ভয় হইয়াছে। নাম কীর্তনে প্রমত্ত এই নিত্যানন্দটি তবে তো নিতান্ত সাধারণ সাধক নন। নিশ্চয়ই তাঁহারই শক্তিবলে এ তিন দিন এত কিছু অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাগ্যে তাহাদের প্রাণ যায় নাই। দস্যুদলপতি তাঁহার অনুগামীদের সহ নিত্যানন্দের চরণে আসিয়া আত্মসমর্পণ করে। এ কয় দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া সে বলে, "প্রভু, আমি মহাপাষণ্ড, আপনার অলংকারের লোভে পড়ে পণ্ডিতের বাড়ি লুঠ করতে এসেছিলাম। আমার পাপের আর সীমা নাই। আপনি কৃপাময়, এ অধমকে চরণে স্থান দিন।"

দস্যু ব্রাহ্মণটিকে আলিঙ্গন করিয়া অবধূত নিত্যানন্দকে কহিলেন, "বাবা, তোমায় ক্ষমা করবো না তো করবো কাকে? তুমি যে মহা ভাগ্যবান্। কৃষ্ণ কৃপার ফলে তুমি কৃষ্ণের ঐশ্বর্যপ্রকাশ এই তিন দিন এমন ক'রে দেখতে পেয়েছো। এ বস্তু কজনের চোখে পড়ে, ভাই? তুমি এবার লুণ্ঠন আর নরহত্যা ছেড়ে দিয়ে পাষণ্ডদের ধর্মপথে টেনে নিয়ে এসো।"

আপন গলার মালাটি দস্যুদলপতির কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া দয়াল নিতাই তাঁহাকে সানন্দে জড়াইয়া ধরেন। নিত্যানন্দের প্রসাদে উত্তরকালে সে এক পরম ভাগবতরূপে পরিণত হয়, অশ্রুকম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইতে থাকে।

গৌড়ে আসিবার পর হইতে নিত্যানন্দ যে সব বৈপ্লবিক কাণ্ড শুরু করেন তাহাতে চারিদিকে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। সুবর্ণবণিকেরা গৌড়ীয় সমাজে তখন অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল, তিনি তাঁহাদের কোলে তুলিয়া নেন। বণিক উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন মহাভক্ত, ইঁহারই উপর ছিল নিত্যানন্দের ভোগ রন্ধন ও সেবার ভার। বৈষ্ণবীয় উদারতা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান নিত্যানন্দ, অব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদেরও ধর্মগুরুর ভূমিকা গ্রহণের অধিকার দেন। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নিরক্ষর, অন্ত্যজ হিন্দু তাঁহার কৃপায় শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবে পরিণত হয়। সমকালীন সমাজের অনুদারতা, প্রাণহীন ধর্মাচরণ ও অজস্র বিধিনিষেধের নিগড় ভাঙিয়া নিতাই আনয়ন করেন নূতনতর মুক্তির প্রাণপ্রবাহ।

অগণিত লোক তাঁহার এই উদ্দীপনা ও মুক্তিমন্ত্রে সেদিন মাতিয়া উঠে, উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গোঁড়া ব্রাহ্মণদের বিরোধিতাও এ সময়ে তাঁহাকে কম সহ্য করিতে হয় নাই। নিতাইর নামে তাঁহারা নানা নিন্দাবাদ ও কলঙ্ক রটাইতে ছাড়েন নাই। একদল বৈষ্ণবও তাঁহাকে ভুল বুঝিতে আরম্ভ করে। শুধু তাহাই নয়, নিত্যানন্দের সাজসজ্জার পারিপাট্য, তাঁহার রঙীন ও মনোহর ক্ষৌম বস্ত্র, অঙ্গের অলঙ্কারও একদল লোকের নিন্দা-সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠে।

প্রভুর দর্শনের জন্য নিতাই সেবার নীলাচলে গিয়াছেন। সেখানে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার বড় নির্বেদ উপস্থিত হইল। সবাই জানে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী চৈতন্য-প্রভুর

প্রধান অনুগামী তিনি। কিন্তু আপন প্রেমাবেশ ও আনন্দে মত্ত হইয়া একি চণ্ডলের ন্যায় ব্যবহার তিনি করিতেছেন? বৈরাগ্য ও অবধূতবৃত্তি তো অনেক দিন হইল বিসর্জন দিয়াছেন। উত্তম বেশভূষায় সাজিয়া সদাই তিনি আনন্দরঙ্গে দিন কাটাইতেছেন। এজন্য সমাজের ও সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোকের সমালোচনাও তাঁহাকে মাঝে মাঝে সহ্য করিতে হয়।

পুরীধামের প্রান্তে একটি ফুল বাগিচায় নিতাই সেদিন বিষণ্ন মনে বসিয়া আছেন। বেশ কিছুটা ভয়ও হইয়াছে—প্রভু এবার তাঁহাকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন, তাঁহার প্রেমধর্ম-প্রচারের পদ্ধতি ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে তিনি কি মনোভঙ্গী অবলম্বন করিবেন, তাহা কে জানে?

সদানন্দময় নিত্যানন্দ মনোদুঃখে, একাকী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন একথা প্রভুর কানে পেঁাছিল। ভক্তবৎসল প্রভু তখনি দলবল সহ সেখানে ছুটিয়া আসিলেন।

এখানে তিনি এক বিচিত্র কাণ্ড করেন। নিত্যানন্দকে মুখে কিছু না বলিয়া যুক্তকরে প্রভু তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। ভক্তেরা তখন দলে দলে আসিয়া চারিদিকে ভিড় জমাইয়াছে। চৈতন্য সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া নিত্যানন্দের স্তুতি গাহিতে শুরু করিলেন। কিন্তু এ যে বড় অসহনীয় দৃশ্য। নিত্যানন্দ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বল হইয়া প্রভুর সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, সন্ন্যাসীর ধর্ম ছাড়িয়ে তুমি আমার এ কি অবস্থায় রাখলে? আমি আমার ভাবস্রোতে স্বেচ্ছামতই চলেছি। আমার আচার আচরণ, আমার বেশভূষা দেখে কতজনে কত পরিহাস ও বক্রোক্তিও করে। আমার প্রকৃত কর্তব্য কি তা তুমি এবার আমায় বলে দাও।"

নিত্যানন্দকে প্রবোধ দিয়া প্রভু কহিতে লাগিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি কি জান না, তুমি সংকল্প ক'রে আমায় যা করাও তাই আমি ক'রে থাকি। আর তোমার মতো মহামুক্ত পুরুষের আচরণে আবার নিন্দনীয় কি থাকতে পারে? তোমার দেহে যে অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে সে যে শ্রবণ কীর্তনাদি নববিধা ভক্তিরই প্রতীক। তুমি আপামর জনসাধারণে যে ভক্তিসম্পদ বিতরণ ক'রে যাচ্ছো তার তুলনা কোথায়? জীব উদ্ধারে তুমি অবতীর্ণ সাধারণ বিধিবিধান তো তোমার জন্য নয়।"

ত্রিজগতে এই প্রভু ব্যতীত নিতাইর আর কে আছে? এই প্রভুর চরণেই যে তিনি তাঁহার সর্বস্ব অর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাই তাঁহার এ প্রবোধ বাক্যে নিতাই স্থির হইয়া উঠিয়া বসিলেন, শান্ত হইলেন।

গদাধরকে নিত্যানন্দ বড় ভালবাসেন। গৌড় হইতে নীলাচলে আসিলেই তিনি তাঁহার সেবা-কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হন, উভয়ের মিলনে অপূর্ব আনন্দ তরঙ্গ উত্থিত হয়। গদাধরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের জন্য এবার তিনি গৌড়ের সূক্ষ্ম আতপ চাল ও রঙীন বস্ত্র আনিয়াছেন। টোটাগোপীনাথে উপস্থিত হইয়া নিতাই আদেশ দেন, "গদাধর, আজ তোমার মনোমতো ক'রে প্রভুর ভোগ লাগাও।"

গদাধর পরম উৎসাহে উদ্যোগ আয়োজনে লাগিয়া যান। উৎকৃষ্ট ভোগান্ন প্রস্তুত হয় এবং উহা শ্রীগোপীনাথকে ভক্তিভরে নিবেদন করা হয়।

হঠাৎ দ্বারদেশে মধুর কণ্ঠের ধ্বনি শোনা যায়, 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ'। চৈতন্য প্রভু হাসিতে হাসিতে এ সময়ে গোপীনাথ মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। গদাধর ত্রস্তে ছুটিয়া

গিয়া দণ্ডবৎ হইলেন। প্রভু স্মিতহাস্যে কহিলেন, "গদাধর, তোমার এ কি আচরণ, বলতো? আজ এই আনন্দের দিনে আমায় তুমি ভিক্ষা নেবার জন্য বল নি? শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এনেছেন ভোগের উপকরণ, পরম নিষ্ঠাভরে তা রন্ধন করেছ তুমি, আর শ্রীগোপীনাথের মুখামৃতের স্পর্শ রয়েছে এ প্রসাদে। এতে আমার ভাগ যে নিশ্চয় রয়েছে।"

নিত্যানন্দ দর্শনে গদাধর ও অন্যান্য ভক্তদের যে আনন্দ হইয়াছে প্রভুর আগমনে তাহা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

নিত্যানন্দ নীলাচলে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর চৈতন্য তাঁহাকে একদিন নিভৃতে নিকটে ডাকাইয়া আনেন। প্রভুর আরত নয়ন দুইটি করুণায় ছলছল, কণ্ঠে মিনতির সুর। মৃদু স্বরে কহেন, "শ্রীপাদ, আর কেন এভাবে সময় ক্ষেপণ করছো? জীব উদ্ধারের জন্য সমাজকে ধারণ ক'রে রাখবার জন্য অবিলম্বে তোমার দারপরিগ্রহ করা প্রয়োজন। তোমার গৃহজীবনকে কেন্দ্র ক'রে, তোমার বংশের ধারাকে অবলম্বন ক'রে গৃহে গৃহে বৈষ্ণবজীবন গড়ে উঠুক—তোমার প্রচারিত নামগানে সবাই নূতন মানুষ হয়ে উঠুক। আমি তো বিরাগী, সংসারত্যাগী হয়ে রয়েছি। জীব উদ্ধারের জন্য জীব-জীবনের বন্ধন স্বীকার—এ যে তোমাকেই করতে হবে। আর দেরি নয়, তুমি আজই গৌড়ে চলে যাও।"

নিতাই একথায় ক্ষুণ্ণ হন। উত্তরে বলেন, "প্রভু, ছলনার তোমার অন্ত নেই। নিবেদিতপ্রাণ ভক্তদের বিচ্ছেদের আগুন জ্বালিয়ে মারতেই যেন তোমার পরম আনন্দ। বেশ, আমি তোমার দেওয়া দুঃখকেই মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু সত্য ক'রে আজ বল, তোমার সাক্ষাৎ আমি কখন কিভাবে পাবো।"

প্রভুর অধরে দেখা দেয় স্মিত হাসির আভা। চৈতন্যের যিনি অভিন্নহৃদয়, অভিন্ন কলেবর বলিয়া পরিচিত তাঁহার মুখে বহিরঙ্গ দর্শনের এ ব্যাকুলতা কেন? কিন্তু নিতাইকে আশ্বস্ত করিয়া অবিলম্বে গৌড়ে না পাঠাইলেও চলিবে না—

প্রভু কহে প্রতিবর্ষে এখানে আসিয়া
ইচ্ছামাত্র আমাকে যে দেখতে পাইবা॥
তোমার নর্তনে আর মাতার বন্ধনে।
নিঃসন্দেহে আমারে পাইবে দুইস্থানে॥
(নিঃ বংশবিস্তার)

অতঃপর আরম্ভ হয় উভয়ের প্রেমার্তি ও ক্রন্দন। নয়নাশ্রুর ধারায় বসন তিতিয়া যায়। কৃষ্ণকথার রসভুঞ্জনে, আর নিজ নিজ মর্ম কথার উদঘাটনে সারারাত্রি অতিবাহিত হয়।

প্রভাতে উঠিয়া চৈতন্য ও নিত্যানন্দ সমুদ্র স্নান সমাপন করেন—উভয়ে মিলিয়া দর্শন করেন দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ। সেই দিনটি হইতে দেখা দেয় চৈতন্যপ্রভুর বিরাট ভাবান্তর। ভক্তদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া নিমজ্জিত হন কৃষ্ণবিরহের মহাসাগরে। ভক্তকবি বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভাষায়—

সেদিন হইতে প্রভুর
হৈল কোন দশা।

নিরন্তর কহে কৃষ্ণ
বিরহের ভাষা ॥

চৈতন্য এইদিন হইতে প্রবেশ করিলেন গম্ভীরার গর্ভে। আর তাঁহার প্রতিনিধি নিত্যানন্দ বাহির হইলেন সমাজজীবনের উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে—প্রেমধর্মের শ্রেষ্ঠতম ধারক ও বাহকরূপে। চৈতন্যের শক্তি যেন অবধূতের জীবনে নূতন করিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে—নব প্রচারিত প্রেমধর্ম আজ তাঁহার মধ্যেই যেন হইয়াছে বিগ্রহীভূত।

নিত্যানন্দ সেবার পানিহাটীতে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে আসিয়াছেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি ও উল্লাসের অন্ত নাই। সেদিন নদীতীরে এক গাছের নীচে পার্ষদদের নিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় এক তরুণ আসিয়া তাঁহার চরণে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানায়। সেবকেরা কহেন, "প্রভু, ইনি সপ্তগ্রামের জমিদার পুত্র রঘুনাথ। আপনার কৃপাপ্রার্থী হয়ে এসেছেন।"

রঘুনাথের কথা নিত্যানন্দ শুনিয়াছেন। এই বৈরাগ্যবান্ ভক্ত ইতিপূর্বে শান্তিপুরে চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রভু ইহাকে আশীর্বাদ করেন, কিন্তু আরও কিছুকাল সংসারে থাকিয়া ধর্মাচরণ করিতে উপদেশ দেন। সেই দেবদুর্লভ মূর্তি দর্শনের পর হইতে ভক্ত রঘুনাথের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, কবে সংসার ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণতলে আশ্রয় লাভ করিবেন, সেই চিন্তায়ই দিন গুণিতেছেন।

দয়াল নিতাইচাঁদের কথা, তাঁহার জীবোদ্ধার লীলার নানা কাহিনী, রঘুনাথদাস শুনিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভুর এই প্রতিভূকে দর্শনের অভিলাষ তাঁহার বহুদিন হইতে হইয়াছে। আজ সুযোগ পাইয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

পরম ভক্ত রঘুনাথের আগমনে নিত্যানন্দের অন্তর প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। রঘুনাথ কিন্তু ইতিমধ্যে সরিয়া দৈন্যভরে দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নিতাই তাঁহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আনেন, পদদ্বয় করেন তাঁহার শিরে সংস্থাপন। তারপর কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহেন, "হ্যাঁরে চোরা, তুই নিকটে না এসে এতদিন দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্ কেন? আয়, আজ আমি তোর দণ্ড বিধান করবো। আমার সব ভক্তদের, সব বৈষ্ণবদের তুই দই-চিড়ে ভোজন করিয়ে দে তো।"

এ যে রঘুনাথের পরম সৌভাগ্য। এ আদেশ যে প্রভু নিতাইর দণ্ডদান নয়, এ তাঁহার বরদান। সমকালীন গৌড়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমিদারের সন্তান রঘুনাথ, ধনজনের তাঁহার অভাব নাই। নির্দেশ দেওয়া মাত্র অমনি দিকে দিকে লোক ছুটিয়া যায়। অবিলম্বে চিড়া মহোৎসবের সমস্ত কিছু উপকরণ সংগ্রহ করা হয়।

ভারে ভারে চিড়া, দধি, গুড়, কলা ও মিষ্ট দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত। পানিহাটির গঙ্গাতীরে বৈষ্ণবসমাজের আনন্দমেলা বসিয়া গেল। লক্ষ লোকের সমাবেশ সেখানে, আর চারিদিকে কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাং রব। ঘনিষ্ঠ পরিকরদের সঙ্গে নিত্যানন্দ তাঁহার এই পুলিন-ভোজন রঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন।

শুনা যায়, মহাবলী নিতাই সেদিনকার এই মহোৎসবে মহাপ্রভু চৈতন্যকেও আকর্ষণ করিয়া আনেন চিড়া, দধি তাঁহাকে ভোজন করান। কয়েকটি ভাগ্যবান ভক্ত সেদিন গৌর ও নিতাই এই দুই প্রভুর লীলাকৌতুকী রূপ দেখিয়া ধন্য হন।

পুলিন-ভোজনের পর শুরু হয় রাঘব পণ্ডিতের গৃহে নৃত্য ও কীর্তন। নিত্যানন্দ

আজ যেন প্রেমতরঙ্গভঙ্গে উদ্বেল। মনের আগলটি কোন্ মুহূর্তে খুলিয়া গিয়াছে। রাঘবের গৃহে তিনি সেদিন আরো একটি অলৌকিক লীলা বিস্তারিত করিলেন।

উদ্দণ্ড কীর্তনের পর প্রসাদ গ্রহণের ডাক পড়ে। নিত্যানন্দের আসনের দক্ষিণে স্থাপন করা হইয়াছে চৈতন্যপ্রভুর জন্য এক আসন। রাঘব পণ্ডিত সবিস্ময়ে দেখেন, নিত্যানন্দের পাশে প্রভু চৈতন্যও প্রসাদ পাইতে বসিয়া গিয়াছেন। কোথায় সুদূর নীলাচল আর কোথায় পানিহাটি। ভক্তের আকর্ষণ প্রভুকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে, আর অলৌকিক দিব্যদেহ ধারণ করিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। দুই প্রভুর ভোজনাবশিষ্ট তুলিয়া নিয়া রাঘব পণ্ডিত ভক্ত রঘুনাথকে অর্পণ করিলেন।

পরদিন গঙ্গাস্নানের পর নিত্যানন্দ সাঙ্গোপাঙ্গসহ কৃষ্ণকথা শুরু করিয়াছেন। রঘুনাথ এসময়ে দীনভাবে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, বামন হয়ে আমার চাঁদ ধরবার সাধ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণ পেতে আমি অভিলাষী হয়েছি। কিন্তু বার বারই আমার যাত্রাপথে বাধা এসে পড়ছে।"

"রঘুনাথ, তুমি যে মহাভক্ত। বাধা পেয়ে তুমি পশ্চাদপদ হবে কেন? আরো দৈন্য আরো আর্তি নিয়ে এগিয়ে পড়।"

কিন্তু অভিজ্ঞ বৈষ্ণবদের কাছে রঘুনাথ যে শুনিয়াছেন, নিতাইর কৃপা না হইলে গৌরকৃপা লাভ করা বড় কঠিন। তাই তাঁহার কৃপার জন্য সর্বসত্তা আজ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—

তোমার কৃপা বিনা কেহ
চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে
অধমেও পায় ॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন
করিতে করো ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঁই
হইয়া সদয় ॥
মোর মাথে পদ ধরি
করহ প্রসাদ।
নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাই,
কর আশীর্বাদ ॥

রঘুনাথের শিরে চরণ রাখিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকে আশিস্ প্রদান করিলেন। সঙ্গীয় পার্ষদের কহিলেন, "ভক্ত রঘুনাথের বিষয়-বাসনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তোমরা সকলে আশীর্বাদ করো, প্রার্থিত চৈতন্যপদ সে যেন অচিরে প্রাপ্ত হয়।"

মুমুক্ষু রঘুনাথের দুই নয়নে তখন অঝোর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। নিত্যানন্দ সস্নেহে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহেন, "রঘুনাথ, তুমি যে মহাভাগ্যবান্। তোমার প্রতি কৃপা ক'রে গৌরসুন্দর নীলাচল থেকে এসে পুলিন-ভোজনে যোগ দিয়েছিলেন, তোমার মহোৎসবের দধি চিড়া তিনি ভোজন করেছেন, রাত্রে আমাদের পঙ্‌ক্তিতে বসে প্রসাদ ভক্ষণও বাদ দেন নি। তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে এমন ক'রে যিনি ছুটে

আসতে পারেন, তিনি কি তোমার বিষয়-বন্ধন মোচন করতে পারেন না ? ভয় নেই। আমি আশীর্বাদ কচ্ছি, শীগ্‌গীরই তুমি চৈতন্যচরণ পাবে, তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকর রূপে অবশ্য গণ্য হবে।"

নিত্যানন্দের কথায় রঘুনাথ আশ্বস্ত হন, ভক্তদের চরণ বন্দনা করিয়া তিনি সপ্তগ্রামে চলিয়া যান। নিত্যানন্দের পুণ্যস্পর্শ পাইবার পর হইতে রঘুনাথের বিষয়-বিরক্তি চরমে উঠে। এ সময় হইতে তিনি বাড়ির ভিতরে যান নাই, শয়ন মন্দিরেও প্রবেশ করেন নাই। যে কয়দিন সংসারে ছিলেন, বহির্বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপে বাস করিতেন, কৃষ্ণনাম জপ আর গৌরাঙ্গ চরণের ধ্যানে থাকিতেন সদা নিবিষ্ট। নিত্যানন্দের কৃপায় অচিরে এই বৈরাগ্যবান্ সাধক লাভ করেন দুর্লভ চৈতন্যচরণ।

সপ্তগ্রামের জমিদার পুত্র রঘুনাথের এই রূপান্তরের মধ্য দিয়া সেদিন নিত্যানন্দের মহিমা নূতন করিয়া ঘোষিত হয়। এই সঙ্গে সারা গৌড়দেশের বৈষ্ণব সংগঠন দৃঢ়তর ও বিস্তৃততর হয়। নিত্যানন্দ ও ভক্ত রঘুনাথের অনুষ্ঠিত এই চিড়া মহোৎসবের স্মৃতি দীর্ঘকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উদ্দীপিত করিয়াছে। আজিও এদেশে উহার স্মৃতি ম্লান হয় নাই।

নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে নিত্যানন্দ সেবার অম্বিকা কালনায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সঙ্গে প্রিয় শিষ্য ও সেবক উদ্ধারণ দত্ত। চৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস এই নগরে। পণ্ডিতের ভ্রাতা সূর্যদাস তৎকালীন রাজ-সরকারের এক বিশিষ্ট কর্মচারী, সজ্জন ও ভক্তিমান্ বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি সে অঞ্চলে যথেষ্ট। বসুধা ও জাহ্নবী নামে তাঁহার বিবাহযোগ্যা দুইটি কন্যা রহিয়াছে। উভয়েই সুলক্ষণা ও রূপবতী।

নিতাই বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করুন, ইহাই চৈতন্য প্রভুর ইচ্ছা। তাই নিতাই নিজ সিদ্ধান্তও এবার তিনি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। সূর্যদাস পণ্ডিতের গৃহে আসার পর কন্যার সন্ধানও পাওয়া গেল। পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা বসুধার পাণিপ্রার্থী হইলেন নিত্যানন্দ।

বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দের তখন অতুল প্রতাপ। চৈতন্যের অভিন্ন হৃদয় ভক্ত ও প্রতিনিধিরূপে সর্বত্র তাঁহার অসামান্য মর্যাদা। সূর্যদাস পণ্ডিতের কাছে তাঁহার এ প্রস্তাব মোটেই ফেলিবার মতো নয়। কিন্তু পণ্ডিত বড় দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডি কি করিয়া অতিক্রম করিবেন ? অবধূত-জীবনে নিত্যানন্দ জাতি বিচার করেন নাই, যত্রতত্র আহার বিহার করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাইতে হইবে, জ্ঞাতি ও আত্মীয়স্বজনেরাও ইহা অনুমোদন করিতে চাহিবে না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সূর্যদাস পণ্ডিত যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, আপনি উপযাজক হয়ে আমার গৃহে কন্যাপ্রার্থী, এ আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আপনি নিজেই বলুন, জাতিবর্ণ যিনি ত্যাগ করেছেন, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ হয়ে তাঁর ঘরে আমি কি ক'রে কন্যা সম্প্রদান করবো ? আপনি আমায় মার্জনা করুন।'

ভক্তসমাজের বুদ্ধিজাল, বণিকশ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ দত্তের অনুনয় বিনয় কোনো কিছু সেদিন সূর্যদাস পণ্ডিতের সম্মতি আদায় করিতে পারিল না। এ বিবাহ-প্রস্তাব

সম্বন্ধে সকলে হাল ছাড়িয়া দিলেন। নিত্যানন্দ এ বিষয়ে তখন আর কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই। সেবক-ভক্ত উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে নিয়া তিনি গঙ্গাতীরে চলিয়া যান, এক নিভৃত কুটিরে বাস করিতে থাকেন।

এদিকে সূর্যদাস পণ্ডিতের গৃহে দেখা দিল এক আকস্মিক বিপদ। বসুধা এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, বহু চেষ্টায়ও তাঁহাকে নিরাময় করা যাইতেছে না। অবস্থা ক্রমে চরমে পৌঁছিল, মুমূর্ষু রোগিনীকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় নাই।

ভক্ত গৌরীদাস সেদিন সেখানে উপস্থিত। ভাইকে কহিলেন, "সব চেষ্টাই তো করলে, এবার প্রভু নিত্যানন্দকেই আহ্বান করো, তাঁর শরণাপন্ন হও। নইলে বসুধাকে বাঁচাবার কোনো উপায় আমি দেখছিনে। আমার মনে হয়, অবধূতের কথা অগ্রাহ্য করায়, তাঁর অবমাননা করায়, এ বিপদ উপস্থিত হয়েছে।"

উপায়ন্তর নাই, সূর্যদাস অশ্রুসজল চোখে কহিলেন, "তবে তাই হোক, অবধূতের কাছে ক্ষমা চেয়ে চরণ ধরে তাঁকে নিয়ে এসো। কন্যা যদি তাঁর কৃপায় জীবন পায় তবে তাঁর করেই তাকে সমর্পণ করবো।"

গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নিচে বসিয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেছেন। সবাই তাঁহার কাছে গিয়া মার্জনা চাহিলেন। মিনতি করিয়া তাঁহাকে সূর্যদাস পণ্ডিতের গৃহে নিয়া আসা হইল।

মুমূর্ষু বসুধার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবধূত নিত্যানন্দ সেদিন যে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখান তাহা বড় বিস্ময়কর। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থে ঈশান নাগর এ দৃশ্যের এক মনোরম বর্ণনা দিয়াছেন। নিত্যানন্দ কহিতেছেন—

এই কন্যার যদি মুঞি
জীয়াইতে পারি।
তবে মোরে কন্যা দিবা
কহ সত্য করি॥
শুনিয়া পণ্ডিত কহে
আর বন্ধুগণ।
জীয়াইলে কন্যা দিব
করিলাম পণ॥
তাহা শুনি নিত্যানন্দ
আনন্দিত মনে।
মৃত সঞ্জীবন নাম
দিলা কানে॥
হরিনামামৃত পিয়া
বসুধা উঠিলা।
অলৌকিক কার্যে সবে
বিস্ময় মানিলা॥

বসুধা সুস্থ হইয়া উঠিলে সূর্যদাস সানন্দে নিতাইর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। ইহার কিছুদিন পরে পণ্ডিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জাহ্নবীকেও তাঁহার করে অর্পণ

করেন। চির উদাসীন, সর্বপাশমুক্ত অবধূত চৈতন্য-কৃপায় হইয়া উঠেন প্রেমধর্মের প্রধান উদ্‌গাতা—কৃষ্ণনাম রসের প্রধান ভাণ্ডারী। আবার সেই প্রভুরই প্রেরণায় এবার তাঁহাকে হইতে হয় সংসারী।

নিতাই এখন হইতে পত্নীদ্বয়সহ খড়দহে বাস করিতে থাকেন। এখানে প্রেমের ঠাকুর শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিয়া গার্হস্থ্যের পরিমণ্ডলকে করিয়া তুলেন অমরার আনন্দ-কানন।

তাঁহার প্রথমা পত্নী বসুধা দেবীর গর্ভে পরম বৈষ্ণব বীরভদ্রের জন্ম হয়। খড়-দহের গোস্বামীরা ইহাদেরই বংশের সন্তান-সন্ততি। দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবী দেবীর পোষ্যপুত্র রামাই গোস্বামী বিস্তারিত করেন আর এক গোস্বামী-শাখা। বাংলার সমাজ-জীবনের নানা স্তরে প্রেমধর্মের প্রবাহ বেশ কিছুকাল নিত্যানন্দ ধারার এই গোস্বামীরা বিস্তারিত করিয়া যান।

নিতাই ভাবের মানুষ। ভাবপ্রমত্ত ঝঞ্চার মতো কখনো তিনি সম্মুখের সমস্ত কিছু ভাঙিয়া চুরিয়া উড়াইয়া দিয়া যান, কখনো বা অপার প্রেম ও করুণায় বিগলিত হইয়া সহস্রধারায় আপনাকে বিস্তারিত করিয়া দেন। সর্বপাশমুক্ত অবধূতের জীবন আধারে দিনের পর দিন চলে প্রেমরসের এই অপরূপ লীলা। ভাবের মানুষ, রসের মানুষ নিতাইকে তাই অনেক সময় দেখা যাইত উদ্দাম ও স্বাতন্ত্র্যবাদী মহাপুরুষরূপে। কোন কোন কঠোরী, বৈরাগ্যবান্ সাধকের চোখে এ স্বাতন্ত্র্য, এ চাঞ্চল্য, কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকিত। এ সম্পর্কে নিন্দা সমালোচনাও মাঝে মাঝে দেখা দিত।

নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ ছিলেন চৈতন্যের সহপাঠী। প্রভুর এবং তাঁহার প্রেমধর্মের তিনি খুব অনুরাগী। কিন্তু গৌড়ে আসিয়া নিতাই যে আচার আচরণ করিতেছেন তাঁহার মর্ম তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। অচ্ছুৎ অন্ত্যজের হাতে ভোজন, তাহাদের নাচানাচি সর্বোপরি স্বর্ণালঙ্কার ধারণ, মাল্য গন্ধ এবং বিলাসের উপকরণ ব্যবহার—এসবেরই বা তাৎপর্য কি? সেবার নীলাচলে থাকার সময়, সুযোগ বুঝিয়া একদিন এই ব্রাহ্মণ চৈতন্যের কাছে এসব কথা পাড়িলেন।

প্রভু সহাস্যে কহিলেন, "সে কি কথা ভাই, তুমি কি জান না, অধিকারী পুরুষ ও মহাসমর্থ সাধকেরা যে সব দোষগুণের অতীত। ভাগবতে ঠাকুর তো নিজেই বলেছেন—

ন ময্যেকান্তভক্তানাং
গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং
বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম।

—যাঁরা রাগাদি দোষশূন্য, যাঁরা সকলের প্রতি সমদর্শী হয়ে প্রকৃতির অতীত হয়েছেন ও পরমেশ্বরকে পেয়েছেন - বিধিনিষেধজনিত পুণ্য-পাপের সঙ্গে আমার সেই একান্ত ভক্তদের সম্পর্ক নেই।

সন্দিগ্ধচেতা ব্রাহ্মণটিকে প্রভু আরো স্পষ্টরূপে বলিয়া দিলেন, "ভাই, পদ্মপত্রে যেমন জল স্পর্শ করে না, আমার নিত্যানন্দের তেমনি পাপের স্পর্শ লাগতে পারে না।

সর্বজন আরাধ্য প্রভুর কণ্ঠে নিত্যানন্দ মাহাত্ম্যের এই ব্যাখ্যা শুনে ব্রাহ্মণটির বিস্ময় চরমে উঠিলে, তিনি নির্বাক হইয়া গেলেন। প্রভু বলিয়া চলিলেন—

নিত্যানন্দ স্বরূপ
পরম অধিকারী।
অল্প ভাগ্য তাঁহাকে
জানিতে না পারি॥
অলৌকিক চেষ্টা যেবা
কিছু দেখি তান।
তাহাতেও আদর করিলে
পাই ত্রাণ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি
তাঁর অবতার।
তাঁহা হৈতে সর্বজীব
পাইবে উদ্ধার॥
তাঁর আচার বিধি-
নিষেধের পার
তাঁহাতে বুঝিতে শক্তি
আছয়ে কাহার॥

পরবর্তীকালে প্রভু একবার গৌড় আগমন করেন। দিকে দিকে সেদিন ছড়াইয়া পড়ে এই আনন্দের বার্তা। সহস্র সহস্র ভক্তের হৃদয়-সাগর প্রেমভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। জাহ্নবীর তীরে তীরে আনন্দের মেলা বসিয়া যায়। এই সময় পানি-হাটিতে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে বসিয়া প্রভু একদিন তাঁহার নিকট নিত্যানন্দতত্ত্ব বর্ণনা করেন। পণ্ডিতকে বলেন—

রাঘব তোমারে আমি
নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাই
নিত্যানন্দ বই॥
এই নিত্যানন্দ যেই
করাবেন আমারে।
সে-ই করি আমি, এই
বলিল তোমারে॥
আমার সকল কর্ম
নিত্যানন্দ দ্বারে।
এই আমি অকপটে
কহিল তোমারে॥
যে-ই আমি সে-ই নিত্যানন্দ
ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব
জানিবা হেথাই॥

প্রভু চৈতন্যের এই ইঙ্গিতপূর্ণ চাবি-কাঠিটি দিয়া রাঘব পণ্ডিত নিত্যানন্দতত্ত্বের মঞ্জুষা উন্মুক্ত করেন - গৌর ও নিতাইর অভেদত্ব তাঁহার সাধনসত্তায় স্ফুরিত হইয়া উঠে।

খড়দহকে কেন্দ্র করিয়া নিতাই তাঁহার প্রেম-ভক্তির রসস্রোত তখন দিকে দিকে ঢালিয়া দিতেছেন। সারা গৌড়দেশ জুড়িয়া তখন অপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য, প্রেমার্তি ও উন্মাদনা। আপামর জনসাধারণ দয়াল নিতাইর জীবনকাঠির স্পর্শে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেমনাট্যের এ রঙ্গমঞ্চে নিতাইকে কিন্তু বেশীদিন ধরিয়া রাখা যায় নাই। ধীরে ধীরে এক দিব্য ভাবান্তর তাঁহার জীবনে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। কোথায় সে নিতাই যিনি 'মাতা হাতীর' মতো নৃত্যের তাণ্ডবে ধরণী কম্পিত করিয়া তোলেন? প্রেমে বিগলিত অশ্রুধারায় যিনি শত শত পাষণ্ডীকে অবলীলায় ভাসাইয়া নিয়া যান, তিনি আজ ধীরে ধীরে আপন মর্মতলের কোন্ গোপন নীড়ে আশ্রয় নিতে যাইতেছেন?

ভক্ত ও পার্ষদদের অন্তরে এজন্য বিষাদের অন্ত নাই। নিত্যানন্দের এই অন্তর্মুখীনতায় তাঁহারা বড় বেদনা পান, বড় অসহায় বোধ করেন।

ইহার পর গৌড়ীয়দের জীবনে আসে মর্মান্তিক আঘাত। নীলাচলধাম হইতে সংবাদ প্রেরিত হয় প্রভু শ্রীচৈতন্য ভক্তদের শোকসাগরে ভাসাইয়া অপ্রকট হইয়াছেন।

নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে আপনাকে আরও সংহৃত করিয়া নেন। প্রায়ই থাকেন বাহ্যজ্ঞানহীন। আর অর্ধবাহ্য অবস্থায় উচ্চারিত হয় কেবল কৃষ্ণকথা আর গৌরগুণগান।

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের এ সময়কার এক আলেখ্য আঁকিতে গিয়া বলিয়াছেন—

চৈতন্য বিচ্ছেদে সদাই প্রভুর বিলাপ।
কদাচিৎ বাহ্য হইলে চৈতন্য আলাপ॥
কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্য ধেয়ায়।
উচ্চ শব্দ করি সদা গৌরাঙ্গ গুণ গায়॥
আপনে গৌরাঙ্গ গাই গাওয়ায় জগতে।
গৌরাঙ্গের গুণ গাও পারে নন্দ সুতে॥

চিরদিনের আনন্দ-চঞ্চল নিতাই ক্রমে হইয়া উঠেন ভাবগম্ভীর এবং দুরবগাহ। নয়টি বৎসর এভাবে অতিবাহিত হয়।

১৪৬৪ শকাব্দের এক প্রভাত। শ্যামসুন্দর মন্দিরে মঙ্গলারতির পর নৃত্য ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে। অবধূত নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাতের জন্য অদ্বৈত প্রভু সেদিন খড়দহ মন্দিরে উপস্থিত। দুই প্রভুর মিলনে ভক্তদের আনন্দের অবধি নাই।

নিতাইও সেদিনকার কীর্তনে দিব্য ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। ক্রমে দেখা দেয় মহাভাবের গাঢ় আবেশ। এ আবেশ সেদিন আর ভাঙে নাই। সুমহান্ জীবনলীলার শেষ অঙ্ক সমাপ্ত করিয়া নিত্যানন্দ চিরতরে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। শুদ্ধ

খড়দহে নয়, শুধু গৌড়ে নয়, সারা ভারতের ভক্তসমাজে নামিয়া আসে বিবাদের অন্ধকার।

ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষরূপে আবির্ভূত হন নিত্যানন্দ। তাঁহার প্রকাশ ঘটে প্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রধান সহকারীরূপে, প্রেমভক্তির উত্তাল রসতরঙ্গ তিনি দিকে দিকে উৎসারিত করেন। কর্মমুখর লীলাচঞ্চল জীবনের চমকপ্রদ অধ্যায়গুলি একের পর এক হয় অতিক্রান্ত। যতটা নিজেকে তিনি উদ্ঘাটিত করেন, অনুদ্ঘাটিত থাকে তার চাইতে অনেক বেশী, যে পরিমাণে জীবকে তিনি কাঁদান, কাঁদিয়া যান তার চাইতে বহু গুণ। নিত্যানন্দের মর্ম বুঝিতে গিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্তকবিকে তাই হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিতে হইয়াছে—

বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখান যারে সে দেখিতে পারে ॥

বীরশৈব বসভেশ্বর

দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদে দক্ষিণ ভারতের কানাড়ায়, বর্তমানের মহীশূরে, আবির্ভূত হন মহাসাধক বসভেশ্বর। ভক্তিধর্মী শৈব-সাধনার এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেন এই সিদ্ধপুরুষ সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত করেন উদার, সর্বভৌম ও বৈপ্লবিক ধর্মবোধ।

বসভেশ্বরের, বীরশৈববাদ এবং তাঁহার সংগঠিত লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের অবদান এ দেশের ধর্ম সংস্কৃতিতে আনিয়া দেয় নূতনতর মহিমা, নূতনতর সমৃদ্ধি। শুধু তাহাই নয়, জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির এক অপরূপ সমন্বয় সাধিত হয় এই সিদ্ধ শিবযোগীর ধ্যান-ধারণা, জীবন সাধন ও ধর্ম-আন্দোলনের ফলে।

১১০৫ খ্রীষ্টাব্দে কানাড়ার বাগওয়াড়ী[1] নামক স্থানে বসভেশ্বর ভূমিষ্ঠ হন। পিতা মাদিরাজ ছিলেন এই অঞ্চলের সরকারী প্রধান—'গ্রামনির্মণি'। ধনবান্ ও ধর্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বসভের মাতার নাম মাদাম্বা। মহা ভক্তিমতী এই মহিলা নিজের দিনান্তের কাজ সমাপ্ত হইলে রোজ তিনি নন্দীশ্বরের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হন, দীর্ঘ সময় শিবের পূজা ও ধ্যান জপে কাটাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন।

কন্যা আক্কা নাগাম্মার জন্মের পর কয়েক বৎসর গত হইয়াছে, কিন্তু কোনো পুত্র-সন্তান এযাবৎ হয় নাই। জননী মাদাম্বার মনে তাই শান্তি ও স্বস্তি নাই, নন্দীশ্বরের মন্দিরে গিয়া প্রভুর কাছে বার বার সাশ্রুনয়নে নিবেদন করেন তাঁহার অন্তরের আকুতি।

দেবতা অবশেষে একদিন প্রসন্ন হইয়া উঠেন। মৃদু-মধুর কণ্ঠের দৈববাণী ধ্বনিত হয় মন্দিরের অভ্যন্তরে—"সুতপা মাদাম্বা এমন ক'রে আর তুমি অশ্রুপাত করো না। তোমার দুঃখ-রজনীর অবসান হবে এবার, কোল জুড়ে আসবে কুলপাবন পুত্র। শিবাংশে হবে তার জন্ম। শিব-আরাধনার নূতন পন্হা সে করবে উদ্ভাবন। শিবভক্ত মানুষের হবে দিক্-দিশারী—হাজার হাজার আর্ত, দীনজনের হবে আশ্রয় স্বরূপ।"

আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠেন মাদাম্বা। স্বামীর কাছে সোৎসাহে বিবৃত করেন এই অলৌকিক ঘটনার কথা।

দম্পতির আশা পূর্ণ হয়, বৎসরান্তে মাদিরাজের গৃহে ভূমিষ্ঠ হয় সুলক্ষণযুক্ত, প্রিয়দর্শন এক পুত্রসন্তান।

নন্দীমন্দিরের অধীশ্বরের কৃপায় জন্ম, তাই তাহার নাম রাখা হয়, বসভেশ্বর।[2]

মাদিরাজ গ্রামের প্রধান বিত্ত-বিষয়ও তাঁহার যথেষ্ট। তাই এই পুত্রের জন্মকে কেন্দ্র করিয়া সেদিন তাঁহার ভবনে শুরু হয় আনন্দ উৎসব। আত্মীয়-কুটুম্বদের সাড়ম্বরে আপ্যায়ন করা হয় আর সেই সঙ্গে চলে দরিদ্রদের অন্ন বিতরণ।

---

১ দ্রঃ—ডঃ পি বি. দেশাই, বসভ অ্যান্ড হিজ টাইমস, পৃঃ ১৬৮, আর সি. সি কার্ ' মনোগ্রাফ অন লিঙ্গায়েৎস, পৃঃ ৩, ই, থারসটন . কাস্ট অ্যান্ড ট্রাইব্স অব ইণ্ডিয়া, ভল্যু ৪, পৃঃ ২৩৯।

২ কানাড়ী ভাষায় 'বসভ' শিবের বাহন বৃষভেরই প্রতিশব্দ।

গ্রামের উপান্তে রহিয়াছে নন্দীশ্বরের প্রাচীন মন্দির। কয়েকদিন হয় এখানে আশ্রয় নিয়াছেন জাতবেদমুনি নামে এক প্রখ্যাত শৈব সাধক।[1] সিদ্ধপুরুষ এবং শিবভক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা বলিয়া লোক তাঁহাকে যথেষ্ট সমীহ করিয়া চলে। এই সাধক সেদিন আপনা হইতেই মাদিরাজের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। অভ্যর্থনা ও পদবন্দনার পর মাদিরাজ যুক্তকরে নিবেদন করেন, "প্রভু, আপনার সাধনস্থান পবিত্র কুডল-সঙ্গম ছেড়ে, কবে এখানে এলেন তা তো জানিনে। যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেনই আমার নবজাত পুত্রটিকে একটিবার আশীর্বাদ করে যান।"

"বৎস, সেই জন্যেই যে আমার বাগওয়াড়ী গ্রামে আসা। আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নেই। কোথায় তোমার নবজাত পুত্র?"

শিশুটিকে তখনই মহাপুরুষের সম্মুখে নিয়া আসা হয়। বর্ষীয়ান্ সাধকের দুই চোখ দিব্য আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাড়াতাড়ি ঝুলি হইতে একটি ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ বাহির করিয়া বালকের কণ্ঠে তিনি স্পর্শ করান। অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করেন শিব মহিমার স্তোত্রমালা।

গৃহে সমাগত নরনারী সবাই বিস্মিত হইয়া মহাত্মার কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছেন। এবার মাদিরাজের দিকে তাকাইয়া তিনি কহিলেন, "বৎস, তুমি পরম ভাগ্যবান, তাই এ শিশু তোমার গৃহে আবির্ভূত হয়েছে। কয়েকটি দিব্য লক্ষণ রয়েছে এর অঙ্গে। দেখবে উত্তরকালে এক শক্তিধর শৈব মহাপুরুষ বলে এ কীর্তিত হবে। বহু সাধক-জনের হবে পথপ্রদর্শক। ধ্যানযোগে এর সংবাদ আমি জেনেছি, তাই দ্রুতপদে চলে এসেছি এই গ্রামে।"

শিশুকে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইয়া বৃদ্ধ সাধক ধীর পদে মাদিরাজের ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণের সন্তানকে উপনয়নের পর শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী হইতে হয়। পিতা তাই বসভেশ্বরের শিক্ষার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বালকের মেধা ও প্রতিভা অসামান্য। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি একের পর এক সে আয়ত্ত করিতে থাকে। অভ্যাসমতো শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী থাকিলেও মনে কিন্তু তাহার তৃপ্তি নাই, প্রসন্নতা নাই। জন্মগত সংস্কার কেবলই তাহার মনকে উধাও করিয়া নেয় কোন্ এক অজানার আকর্ষণে। এই কাঁচ বয়সেই সাধন-ভজন ও ধ্যান-ধারণার দিকেই মন বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতে চায়।

বাগওয়াড়ীতে বহু অগ্রহার[2] ব্রাহ্মণের বাস। বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়া-কর্মে ইঁহারা সবাই ছিলেন পারদর্শী। কিন্তু বালক বসভের কাছে কি জানি কেন এগুলি ছিল অর্থহীন ও প্রাণহীন বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। বরং ইহার চাইতে মাতুলালয় ইংগলেশ্বরের ভক্তিময় পরিবেশ আর শিবভক্ত সাধুসজ্জনের সান্নিধ্য তাঁহার কাছে ছিল অনেক বেশী আকর্ষণীয়। বালক বয়সে মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁহাকে ইংগলেশ্বরে

---

১ সিংগিরাজ পুরাণ ' ভল্যু ৭৪

২ বসভেশ্বরের পূর্বপুরুষ ছিলেন অগ্রহার ব্রাহ্মণ, কাম্যকুল ও সাংখ্যায়ন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। (সিংগিরাজ পুরাণ—১২শ খণ্ড)

গিযা বাস কবিতে হইত। তাই এখানকাব প্রভাব ছোটবেলা হইতে তাঁহাব জীবন বড হইযা দেখা দেয।

ইংগলেশ্ববেব শিববিগ্রহ বেবন-সিদ্ধেশ্ববেব খ্যাতি বহুদিনেব।[১] স্থানীয জন-সাধাবণেব পবম শ্রদ্ধাব বস্তু এটি। একটি প্রাচীন গুহাব এ বিগ্রহটি অধিষ্ঠিত। পূজা পার্বণ উপলক্ষে দূব দূবান্ত হইতে শত শত নবনাবী এই পবিত্র গুহাব আসিযা সমবেত হয, বেবন-সিদ্ধেশ্বব মহাদেবেব উদ্দেশে জানাব অন্তবেব যত বিছু আকুতি। এই বিগ্রহেব কাছে ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী নির্ধনেব কোনো ভেদ-বৈষম্য ছিল না। উদাব সার্বভৌম শিবসাধনা ছিল এখানকাব বিশেষত্ব।

ইংগলেশ্ববেব দিব্য মণ্ডপ বা মহামনে-তে জড়ো হইতেন দেশ বিদেশে শৈব সাধু-সন্ন্যাসীবা, ইঁহাদেব সান্নিধ্যে আসিযা তত্ত্ব ও সাধনেব উপদেশ নিযা গৃহস্থ নব-নাবীবা উপকৃত হইত। বসভেশ্ববেব মাতুল বলদেব এবং মাতা মাদাম্বা স্বভাবতই ভক্তিভবে এই সব সাধু সন্ন্যাসীদেব সেবা যত্ন কবিতেন, ধন্য হইতেন তাঁহাদেব উপদেশ ও কৃপালাভে। বালক বসভেশ্ববেব মানসপটে এই সব শৈব সন্ন্যাসীব স্মৃতি চিবতবে মুদ্রিত হইযা যায। বলা বাহুল্য, এই পবিবেশ তাঁহাব জীবনে শিবভক্তিব উদয হয অতি স্বাভাবিকভাবে।

বসভেশ্বব তখন অষ্টম বৎসবে পদার্পণ কবিযাছে। পিতা মাদিবাজ তাহাব উপনযন সংস্কাবেব জন্য ব্যস্ত হইযা পডিলেন। গ্রামেব স্বগোত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেবা সবাই অগ্রহাব – যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম-কাণ্ডেব অনুষ্ঠানে তাঁহাবা দক্ষ ও উৎসাহী, আব এদিকে মাদিবাজও সমাজে ধনবান্ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলিযা পবিচিত। তাই উপনযনেব অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয ক্রিযাব সঙ্গে সামাজিক উৎসব-আনন্দও সেদিন কম দেখা গেল না।

অতঃপব কযেক বৎসবেব মধ্যেই বালক বসভেব জীবনে ঘটিযা যায চবম দুর্দৈব। পিতা ও মাতা গৃহেব সবাইকে শোকসাগবে ভাসাইযা ইহধাম ত্যাগ কবেন। ইহাব অল্প কিছুদিন পবেই জ্যেষ্ঠাভগ্নী নাগলাম্বেব সঙ্গে বসভ চলিযা যান তাঁহাব মাতুলালয ইংগলেশ্ববে। ফলে বসভেশ্বব কিছুদিনেব মধ্যেই বেবন-সিদ্ধেশ্ববে সমাগত সাধকদেব প্রভাব গণ্ডীব মধ্যে আসিযা পড়েন।

শৈব সাধনার এক নূতনতব, উদাবতব পন্থাব দিকে অতঃপব তিনি অগ্রসব হইতে হইতে থাকেন।[২]

মাতুল বলদেব বাজসবকাবেব কাজ কবেন। বৎসবেব বেশীব ভাগ সময কল্যাণ শহবে (তৎকালীন মঙ্গলওযাড়া) তাঁহাকে বাস কবিতে হয। তাই মাতামহীব অভিভাবকত্বে এবং আদবযত্নে তিনি ও তাঁহাব ভগ্নী নাগলাম্ব লালিত হইতে থাকেন।

---

১ হবিহব ' বসভবাজ দেবল বগলে, পৃঃ ১ ১০

২ গবেষকদেব মতে, বীবশৈব সম্প্রদাযেব পূর্বসূবীবা বেবন-সিদ্ধেশ্ববেব প্রভাবেই অনেকাংশে প্রভাবিত হন এবং বেদাচাব বহির্ভূত শিব-আবাধনাব এক নূতনতব বৈপ্লবিক ধাবাব প্রবর্তন কবেন। উত্তবকালে বসভেশ্বব এই সাধকদেব ধ্যান ধাবণাকেই বূপাযিত কবেন।

মাতামহী ছিলেন এক খ্যাতনামা শিবভক্তি-সিদ্ধা সাধিকা। স্থানীয় মহামনে বা ধর্মসভায় যে সব সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন ঘটিত তাঁহারা সবাই এই বৃদ্ধা মহিলাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন, তাঁহার সেবা-যত্নে আপ্যায়িত হইতেন। বালক বসভও পরমানন্দে ঘোরা-ফেরা করিতেন এই সব সাধু-সজ্জনদের সঙ্গে। বেবন-সিদ্ধেশ্বর এখন হইতে খুব বেশী দূরে নয়। লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন সাধু সন্ন্যাসী, বহু শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ এ অঞ্চলে যাওয়া-আসা করিতেন। বেদাচারের বাহিরে এক সর্বজনীন শিবভক্তির আন্দোলন ইহাদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেখানে গড়িয়া উঠিতেছিল।

এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থ কুড়ল-সঙ্গম খুব বেশী দূরে নয়। লিঙ্গায়েৎ সাধু ও শৈব যোগীদের কয়েকটি সিদ্ধ-গুহা ও সাধনকেন্দ্র প্রাচীনকাল হইতেই সেখানে রহিয়াছে। সেখানকার সাধকেরা অনেক সময় ইংগলেশ্বরের মহামনে বা ধর্মসভার আসিয়া জুটিতেন। মাতামহী ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্বের সহিত বসভও এই সব সাধুদের সান্নিধ্য উপভোগ করিতেন প্রাণ ভরিয়া। শৈবধর্মের তত্ত্ব ও সাধনক্রম তিনি এই সুযোগে শ্রদ্ধাভরে তাঁহাদের নিকট হইতে জানিয়া নিতেন।

ইংগলেশ্বরে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়। বসভ এবার পদার্পণ করেন ষোল বৎসরে। কৈশোর ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণেই তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতা। শৈবধর্মের বিশেষত্ব লিঙ্গায়েৎদের সর্বজনীন উদার মতবাদের গভীরে প্রবেশ করার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়েন।

বালককাল হইতেই ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিক্‌টি তাঁহাকে আকৃষ্ট করে নাই। বাগওয়াড়ীর আত্মীয়-স্বজনেরা খ্যাতনামা কর্মকাণ্ডী পণ্ডিত। যে-কোন পূজা-পার্বণে উৎসবে তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও যাগযজ্ঞ নিয়া মাতিয়া উঠেন, ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠার চাইতে বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানই যেন তাঁহাদের কাছে বড় হইয়া উঠে। এ অনুষ্ঠানে আত্মিক সংবেদন তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ যে শুধু ধর্মের প্রাণহীন কাঠামো বা খোলস নিয়া অকারণ মাতামাতি করা।

তরুণ বসভেশ্বরের অন্তর এবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসে। উপনয়নের সংস্কার তিনি আগ্রহ্য করেন, আর উপবীত ছিন্ন করিয়া আসিয়া দাঁড়ান লিঙ্গায়েতী সাধু-সন্ন্যাসীদের আস্তানায়। এখন হইতে সেই পরম শিবের আরাধনা ও সাধনা তিনি করিবেন, যাঁহার কৃপায় পণ্ডিত মূর্খ ও ব্রাহ্মণ অন্ত্যজের ভেদ-বৈষম্য ঘুচিয়া যায়, ধনী নির্ধন আচারী অনাচারী পার্থক্য হয় দূরীভূত। খণ্ড বুদ্ধির পরপারে যে দেবাদিদেব বিরাজিত, যাঁহার অখণ্ড পরমসত্তায় বিশ্বসৃষ্টির স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত কিছু ওতপ্রোত সেই পরমপুরুষের কাছেই নিজেকে করিবেন তিনি উৎসর্গীত।

অধ্যাত্ম-জীবনে এই বিপ্লব-সূচনায় বসভের সারা অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠে শৈব সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র কুড়ল-সঙ্গমে গমনের জন্য। সেখানে গিয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী না হওয়া অবধি জীবনে যে তাঁহার শান্তি নাই, স্বস্তি নাই।

দেবাদিদেব বুঝি তাঁহার ভক্তের অন্তরের এই আকুতি শুনিতে পাইলেন। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটানোর জন্য অচিরে পরম সুযোগ মিলিয়া গেল। বসভের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নাগলাম্ব যৌবনে পদাপর্ণ করিয়াছেন, ভক্তিমতী সাধিকা বলিয়া তাঁহার সুনামও এ অঞ্চলে ইতিমধ্যে রটিয়া গিয়াছে। মাতামহী ঠিক করিলেন এবার তাঁহার বিবাহ

দিবেন। কুড়ল-সঙ্গমে এক ধনবান্ ও ভক্তিমান্ বংশের ছেলে শিবদাস। রূপে গুণে সব দিক দিয়াই সে নাগলাম্বের বর হইবার উপযুক্ত। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সাড়ম্বরে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। বসভেরও সুযোগ আসিল তাঁহার বহু ঈপ্সিত তীর্থ কুড়ল-সঙ্গমে যাওয়ার জন্য।

মাতামহীকে কহিলেন, "কুড়ল-সঙ্গম সাধু তপস্বীদের স্থান তো বটেই, তাছাড়া সেখানে রয়েছে শাস্ত্রপাঠের ও আত্মিকজীবন গঠনের পরম সুযোগ। ঠিক করেছি, আমি এবার সেখানে থেকেই শাস্ত্রপাঠ করবো, সাধন-ভজনে রত হবো।'

দিদি নাগলাম্বের তো উৎসাহের অবধি নাই। ছোট ভাই তাঁহার কাছাকাছি থাকিবে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে? তিনিও মাতামহীকে চাপিয়া ধরিলেন। এবার বসভের কুড়ল-সঙ্গমে যাওয়ার পক্ষে আর কোনো বাধা রহিল না। অচিরে সেখানে পৌঁছিয়া একটি বিদ্যাকেন্দ্রে তিনি আশ্রয় নিলেন, তারপর ব্রতী হইলেন আত্ম-উজ্জীবনের সাধনায়।

কুড়ল-সঙ্গম এ সময়ে খ্যাত ছিল বেদ, উপনিষদ, আগম এবং কাব্য পুরাণ প্রভৃতির পঠন-পাঠনের জন্য। ১১৬০ খৃষ্টাব্দে এ স্থানে যে চারিটি বিশাল শিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে বলা হইয়াছে, 'কুড়ল-সঙ্গম সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণদের আবাসস্থল, আর এখানকার সন্ন্যাসী সাধক বা মহাজনেরা সারা কানাড়ায় প্রসিদ্ধ তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার জন্য। ঈশানীয় গুরু এই মহান্ বিদ্যাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ।'

বসভের মেধা প্রতিভা ও জ্ঞানতৃষ্ণার পরিচয় পাইয়া এই ঈশানীয় গুরুই গ্রহণ করিলেন তাঁহার শিক্ষাগুরুর স্থান।

বসভের মনের স্বাভাবিক ঝোঁক কিন্তু শৈবশাস্ত্র ও শৈবসাধকদের তথ্য আহরণের দিকে। অল্পদিনের মধ্যে দাসিমায়, রেবনসিদ্ধ, মাদরণ কেশিরাজ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষের কথা ও তাঁহাদের তত্ত্ব-উপদেশ তিনি জানিয়া নিলেন। তের্বাট্টু পুরাণ বা তামিলী নাইনারদের কাহিনী অধ্যয়ন শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

শাস্ত্র ও ধর্মসাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ বসভের হৃদয়ে শিবভক্তির ধারাস্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এখানকার নির্জনতা, নিসর্গ-সৌন্দর্য ও আনন্দময় পরিবেশ স্বতই মনকে রসাবিষ্ট করিয়া তোলে। সব চাইতে বড় কথা, এখানে আসিয়া বসভ লাভ করেন জাগ্রত বিগ্রহ সঙ্গমেশ্বরের সান্নিধ্য।

প্রতিদিন প্রত্যূষের আগেই বসভ শয্যাত্যাগ করেন। কৃষ্ণ ও মলপ্রভার পুণ্য সঙ্গমে গিয়া সমাপন করেন তাঁহার অবগাহন স্নান। তারপর নিজ হাতে রাশি রাশি পুষ্প চয়ন করিয়া উপনীত হন প্রভু সঙ্গমেশ্বরের মন্দির দ্বারে। ধ্যান ভজন ও স্তবগানে প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হয়। দিনে রাতে এমনি করিয়া চলে ইষ্টদেবের আরাধনা।

সেদিন পূজা ধ্যান সারিয়া সবে তিনি মন্দির চত্বর হইতে বাহিরে আসিয়াছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে অদূরে দণ্ডায়মান জটাজুটধারী এক শৈবসন্ন্যাসীর উপর। বসভের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

বসভ শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করিতেই সন্ন্যাসী প্রসন্ন মনে আশীর্বাদ করেন,

স্নিগ্ধ স্বরে কহেন, "বৎস, আমি যে তোমারই জন্য এতদিন অপেক্ষা করে আছি। তুমি প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চরণতলে এসে গিয়েছো, ভালই হয়েছে।"

বসভের সারা দেহ-মন-প্রাণ স্বর্গীয় আনন্দে আবিষ্ট হইয়া উঠে। মনে হয়, এ সন্ন্যাসী যেন তাঁহার অতি পরিচিত, অতি আপনার জন। কিন্তু কে তিনি, কি তাঁহার পরিচয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

সন্ন্যাসী এবার তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহেন, "বসভ, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের। আমি তোমায় ঘনিষ্ঠভাবে জানি, বৎস। কিন্তু তোমার পক্ষে আমার পরিচয় জানা সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের ভক্ত সাধকেরা সবাই আমায় জানে জাতবেদমুনি বলে। তোমার পিতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তোমাদের গ্রাম বাগওবাড়ীতেও আমি গিয়েছি।"

"তাহলে, তখনই কি আপনাকে দেখেছি, প্রভু?" করজোড়ে বসভ নিবেদন করেন।

"না বৎস, তুমি তখন সদ্যপ্রসূত শিশু মাত্র। আমার স্মৃতি ধরে রাখবার মতো বয়স তখন তোমার কই? বাগওবাড়ীর নন্দীমন্দিরে কয়েকটা দিন অতিবাহিত করতে গিয়েছিলাম আর তা তোমারই কারণে। প্রভু সঙ্গমেশ্বরের প্রত্যাদেশ পেয়ে তোমায় আমি দিয়েছিলাম লিঙ্গায়েৎ শৈবদের প্রথা অনুযায়ী লিঙ্গদীক্ষা। তোমার কণ্ঠে স্থাপন করেছিলাম লিঙ্গপ্রতীক। প্রভু সঙ্গমেশ্বরের চিহ্নিত ভক্ত তুমি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক কিছু কাজ তোমায় করতে হবে। পরে জানতে পারবে সব।"

"প্রভু, আমি বালক মাত্র। শৈশব থেকেই অজানিতভাবে ইষ্টরূপে গ্রহণ করেছি দেবাদিদেব মহাদেবকে। কিন্তু এই ইষ্টের দর্শন কি করে হবে, কি করে তাঁর সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দেবো, তা আমার জানা নেই। এই অবোধ অজ্ঞান বালককে আপনি কৃপা করে আশ্রয় দিন, পরম পথের সন্ধান দিয়ে কৃতার্থ করুন।"

"সেজন্যই তো এ স্থানে আমার আগমন। বৎস, তোমায় আমি নূতন করে লিঙ্গ-দীক্ষা দেবো, আর দেবো নিগূঢ় সাধনার গভীরে প্রবেশলাভের উপদেশ কিন্তু এ সবই প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র। এই সঙ্গে তোমায় প্রাচীন ও নবীন শাস্ত্রে পারঙ্গম হতে হবে। শৈবধর্মের প্রচারে, জন-জীবনের উন্নয়নে, তোমার একটা বিধি নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কাজেই সাধনা ও সিদ্ধির সঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞানও তোমায় আয়ত্ত করতে হবে।"

সেদিন এমনি আকস্মিকভাবে ঐশী কৃপার দ্বার উন্মোচিত হয় বসভের জীবনে। জাতবেদমুনির প্রভাবে এখন হইতে অতি সহজে কুড়ল-সঙ্গমের বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিতে থাকে।

সহজাত শুভসংস্কার ও সাধননিষ্ঠা বসভের রহিয়াছে, তদুপরি রহিয়াছে শক্তিধর গুরুর নির্দেশ ও পরিচালনা। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার সাধনজীবনে যেমন রূপান্তর ঘটে, তেমনি তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন প্রাচীন বেদ-বেদান্ত আগম এবং আধুনিক শাস্ত্র ও প্রবচন গ্রন্থের তত্ত্ব উদ্ঘাটনে।

সাধনা ও শাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়া বসভের মনে ইষ্টভাবনা ও শিবতত্ত্বের একটা নূতনতর উপলব্ধি ফুটিয়া উঠে। পরমতত্ত্ব হিসাবে শিব অনাদি ও অনন্ত, অবিনশ্বর বিশ্বসৃষ্টির সব কিছু তাঁহা হইতেই উদ্ভূত—আবার লয় হয় তাহাতেই। চেতন,

অচেতন, স্থাবর, জঙ্গম সবই শিবের শরীর, শিবময়। তবে তাঁহার সৃষ্ট এই বিশ্ব-সংসারে উচ্চ-নীচের ভেদবৈষম্য কেন থাকিবে?

পৌরাণিক যুগের শিবের ক্ষেত্রেও দেখা যায়—তিনি আশুতোষ, পরম কারুণিক। আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ-শূদ্র পণ্ডিত-মূর্খের ভেদ তাঁহার কাছে নাই। হিমালয় শিখরের গলিত তুষারের মতো তাঁহার কৃপার ধারা সতত সর্বত্র ঝরিয়া পড়িতেছে। শিবের বৈশিষ্ট্য—তাঁহার মহা করুণা। তবে এই করুণার ধারাকে সমাজের সর্ব স্তরে কেন ছড়াইয়া দেওয়া হইবে না? জাতিভেদের প্রাচীর কেন মাথা উঁচাইয়া থাকিবে শিবভক্ত জঙ্গমদের মধ্যে? কৃত্রিম বর্ণভেদের বিলোপসাধন করিয়া, স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য দূর করিয়া কেন শিব আরাধনা ও শিবলোকের কল্যাণধারাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হইবে না।

গুরু জাতবেদমুনির কাছে বসভ মাঝে মাঝে তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করেন। গুরু সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ দেন না, প্রসন্নমধুর কণ্ঠে দুই চারিটি কথা বলিয়া উঠিয়া যান।

সেদিন দুজনে এ বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ হইল। বসভ সবিনয়ে কহিলেন, "গুরুদেব, শৈবযোগ ও শিবভক্তি আজ যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে আমার মনে শান্তি খুঁজে পাচ্ছি না।"

"কি ব্যাপার খুলে বলতো।'

"শৈবধর্ম করুণার ধর্ম, সর্বজনীন ধর্ম। একদল আচার্য ও সাধুমণ্ডলীর গণ্ডীর মধ্যে একে এমন ক'রে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা কেন? বৈদিক, অবৈদিক, আর্য, দ্রাবিড, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলের মধ্যে শিবের আরাধনাকে ছড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন?"

"বেশ তো, বৎস, এতো অতি উত্তম কথা।"

"প্রভু, আজকের দিনের সমাজের দিকে চেয়ে দেখুন। ধর্ম, ন্যায়নীতি বলতে কিছু নেই। স্বার্থের কলুষে দেশ ভরে গিয়েছে। এ সময়ে শৈবধর্মেরই বা কি দুর্দশা। সাধকেরা নেমে গিয়েছে গোপন বীভৎস পাপাচারের পথে। আজ এ ধর্মের উজ্জীবন চাই। প্রকৃত শিবভক্তির মধ্য দিয়ে এ উজ্জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে, নিয়ে যেতে হবে দীন হীন প্রতি মানুষের দ্বারে, দেবাদিদেব আশুতোষের প্রসন্নতা লাভ করবে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবাই।"

"বসভ কানাড়ায়, শুধু কানাড়া কেন সারা দক্ষিণ ভারতে, এক নূতন শৈব আন্দোলন আসন্ন, তা আমি জানি। এই আন্দোলন সফল হবে তোমার সাধনা ও সিদ্ধিতে। কিন্তু বৎস, এজন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি তো চাই।"

"আদেশ করুন, এই মুহূর্তে আমি সকল কিছু ত্যাগ ক'রে শৈব সন্ন্যাস গ্রহণ করি। সারা দেহ মন নিয়োজিত করি ঈশ্বরের এই মহান্ কর্মে।"

"না বৎস, এজন্য তোমার সন্ন্যাস নেবার প্রয়োজন নেই। বরং গৃহে থেকে, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকেই তোমায় করতে হবে এই নূতন শৈব আন্দোলনের নেতৃত্ব।"

"আপনার কথার মর্ম ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে প্রভু। আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"জানতো কর্ণাটী শৈব সাধকদের কথা—'কাযকভে কৈলাস', অর্থাৎ কাযক বা কর্ম হচ্ছে মানবজীবনের কৈলাস। এই কাযক সাধনা তোমায় গ্রহণ করতে হবে, কৈলাসপতির সংসারকে ক'রে তুলতে হবে কৈলাসস্বরূপ। কাযকের মূল কথা, দেহ মনকে ব্যবহারিক কর্মে নিয়োজিত রাখতে হবে এবং এই ব্যবহারিক কর্মকেই বিশ্বাস করতে হবে ঐশ্বরীর কর্ম বলে। দেহ মনের কর্ম ও ধর্মসাধনায় যে ঐকতান বেজে উঠবে তার ফলে মানবসমাজে নেমে আসবে মুক্তির স্বর্গ। আরও একটা কথা আছে। ব্যবহারিক কর্মজাত সমস্ত অর্থ নিবেদন করতে হবে শিবভক্ত ও শিবযোগী জঙ্গমের সেবায়। স্মরণ রাখবে এই সঙ্গে, শিবে পূর্ণ আসক্তি ছাড়া কর্মে অনাসক্তি জন্মে না। শিবে পূর্ণ আত্মোৎসর্গ ছাড়া এ সাধনা সম্ভব নয়।

"বেশ, আপনার অনুমতি পেলে এ সাধন-পথই আমি আজ থেকে বেছে নেবো।"

"তাই নাও বৎস। আর এ সঙ্গে তৈরী হও গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করার জন্য। অদূরে ভবিষ্যতে রাজ্যের প্রশাসনের ভারও তুমি পাবে। শৈবধর্মের নব জাগৃতির জন্য তার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বসভ মূল কথাটি কোনোদিন যেন বিস্মৃত হয়ো না, তা হচ্ছে—কাযকভে কৈলাস।"

"কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তিসাধন, এ বড়ো কঠিন কাজ প্রভু। আপনার আদেশে সঙ্কল্প আমি গ্রহণ করেছি কিন্তু এই সঙ্গে মনে ভয়ও হচ্ছে, এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে দেবাদিদেবের পরম পদে আমি পেঁছিতে পারবো তো।"

"ভয় নেই বসভ, তোমার দিকে আজ শুধু আমার স্নেহদৃষ্টি রয়েছে তাই নয়, অল্লাম প্রভুদেবের প্রসন্ন দৃষ্টিও রয়েছে তোমার উপর নিবদ্ধ।"

"প্রভুদেবের নাম আমি শুনে আসছি এখনো তাঁর দর্শন পাবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। প্রকৃত পরিচয়ও জানা নেই।"

"মনে রেখো প্রভুদেব অল্লাম হচ্ছেন শিবসাধনা ও শিবসিদ্ধির ঘনীভূত বিগ্রহ। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শৈবযোগী বলে তিনি সাধকসমাজে স্বীকৃত। যোগবিভূতির দিক্ দিয়ে অনেকে তাঁকে তুলনীয় মনে করেন মহাযোগী গোরখনাথের সঙ্গে। ধর্ম ও সমাজের দুর্গতিতে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছে, শৈবধর্মের একটা পুনরুত্থান তিনি চান। তোমার মতো শক্তিমান্ সাধকের উপর তাঁর দৃষ্টি তাই রয়েছে।"

"তাঁর দর্শনের সৌভাগ্য কি আমার হবে না?"

"এখনো সময় হয় নি বৎস। যথা সময়ে তুমি তাঁর সান্নিধ্য ও সহায়তা পাবে।"

স্মিত হাস্যে বসভকে আশিস্ জানাইয়া জাতবেদমুনি ধীর পদে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কুডল-সঙ্গমের মঠ মন্দিরে সাধক ও পণ্ডিতসমাজে বসভ ক্রমে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। যে কোনো মহামনে-তে বা ধর্মসভায় যান, এই নবীন শিবভক্তের ব্যক্তিত্ব ও মতবাদ জনগণকে সচকিত করিয়া তোলে। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী, সর্বজনীন শৈববাদ, ধারালো যুক্তিতর্ক সবাইকে মুগ্ধ করিতে থাকে।

গুরুর আদেশ, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিয়া করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় এ কাজ শুরু করিবেন? মঙ্গলওয়াড় চালুক্যদের শাসনকর্তা বিজ্জলের রাজধানী, সেখানেই জীবিকার উদ্দেশ্যে গিয়া উপস্থিত হন। প্রথমটা কিছুটা অসুবিধায় পড়িলেন। প্রভু সঙ্গমেশ্বরের ঠিক কোথায় তাহার কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া

রাখিয়াছেন তাহা জানা নাই। যাই হোক যে-কোনো একটা কাজ তাড়াতাড়ি না জুটাইতে পারিলে বিপদ। কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর রাজকোষাগারে হিসাব রক্ষকের এক শিক্ষানবীশী কাজ তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

আত্মিক সাধনা আর ব্যবহারিক কর্ম দুইয়েতেই বসভের সমান নিষ্ঠা। যথাসাধ্য শ্রম ও দক্ষতার সহিত তিনি কাজে রত হইলেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝিলেন, কর্মচারীরা সবাই বড় অলস প্রকৃতির। সরকারী কাজে শৈথিল্য যেমন রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে অজস্র ভুলভ্রান্তি। একটি বড় হিসাবের ভুল তাঁহার নজরে পড়িল। সিদ্ধ-দণ্ডাধিপ তখন কোষাগারের অধ্যক্ষ। বসভ তখনই সরাসরি তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত।

হিসাবের খাতায় এ ধরনের মারাত্মক ভুল দেখিয়া তো অধ্যক্ষের চক্ষুস্থির। তখনই উহা সংশোধনের আদেশ দিলেন।

বসভের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এবার তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন স্থায়ী চাকুরীতে।

তরুণ কর্মচারীর পরিচয় নিতে গিয়া সিদ্ধ-দণ্ডাধিপের আনন্দের অবধি রহিল না, কহিলেন, "দেখছি, তোমার পিতা মাদিরাজ আমার জ্ঞাতি, তুমি আমার আত্মীয় হয়ে অন্যত্র কেন থাকবে? এখন থেকে আমার গৃহে এসে বাস করতে থাকো।"

সিদ্ধ-দণ্ডাধিপের সস্নেহ পৃষ্ঠপোষকতায় ও নিজের দক্ষতার গুণে উপর্যুপরি বসভের পদোন্নতি ঘটিতে থাকে। ক্রমে এই সুদক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ তরুণ কর্মচারীর প্রতি প্রদেশের শাসক বিজ্জলের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয়। বসভকে সরকারী কোষাগারের দায়িত্ব-পূর্ণ কাজে তিনি নিযুক্ত করেন।

কয়েক বৎসর পরে সিদ্ধ-দণ্ডাধিপ লোকান্তরে চলিয়া যান এবং বিজ্জল তরুণ বসভকেই প্রদান করেন অধ্যক্ষের পদ। বসভ একজন শৈবসাধক কুড়ল-সঙ্গমের সাধু-সন্ন্যাসী ও ঈশানীয়-গুরু প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার গুণমুগ্ধ একথা বিজ্জল শুনিয়াছেন। বসভ ইতিমধ্যে মঙ্গলওয়াড-এ অবস্থান করিয়া একটি শিবভক্ত গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছেন, একথাও তাঁহার জানা আছে। তাই এই তরুণ ধর্মনিষ্ঠ কর্মচারীকে রাজকোষাগারের অধ্যক্ষ পদে বরণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইলেন।

ভাণ্ডারী বা অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের পর বসভ গুরুর আদেশে বিবাহ করেন। সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, পরম ভক্তিমতী, গঙ্গাম্বি পত্নীরূপে তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিতা হন। স্বামীর সংসার এবং শিবভক্ত শরণদের সেবা, দুইই তিনি আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরিয়া তোলেন।

গুরু জাতবেদমুনির উপদেশ বসভ মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, কর্মজীবনকে কৈলাসে পরিণত করিতে হইবে আর আত্মিক সাধনাকে ছড়াইয়া দিতে হইবে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে। তাই মঙ্গলওয়াড়ে থাকিয়া রাজস্ব বিভাগের কার্যে যেমন দক্ষতা ও তৎপরতা তিনি দেখাইতেন, কুড়ল-সঙ্গমে গেলেও তেমনি ফুটিয়া উঠিত তাঁহার অপরিসীম ইষ্টনিষ্ঠা ও ধ্যান-ভজনের দিব্য আবেশ।

বিজ্জল ছিলেন শৈবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বসভের শৈবদীক্ষা ও সাধনার খ্যাতি তিনি শুনিয়াছেন, সচিব তাঁহারই ধর্মপথের পথিক, ইহাতে তিনি মনে মনে মহা

আনন্দিত। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বিজ্জল বুঝিলেন, বসভ প্রাচীন শৈববাদের অনুগামী নহেন, বেদাচার বহির্ভূত, সংস্কারপন্থী, এক নূতন শৈবধর্ম তিনি স্থাপন করিতে উৎসুক। বিজ্জলের মনে সচিব সম্বন্ধে দ্বিধা ও সংশয় জাগিয়া উঠে। কিন্তু আবার ভাবেন, এই তরুণ সাধক কুডল-সঙ্গমের সাধু-সন্ন্যাসীদের পরমপ্রীতিভাজন, তা ছাড়া, কানাড়ার শিবভক্ত সাধু ও গৃহস্থেরা দলে দলে তাঁহার কাছে আসা-যাওয়া করিতেছে। তাঁহার এই জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের মধ্যে আপত্তি করার তো কিছু নাই। বরং শাসনকর্তা হিসাবে বিজ্জলের কাজের পক্ষে ইহা কিছুটা সহায়কই হইবে।

ব্যবহারিক কর্ম আর শিব-সাধনার অপরূপ সমন্বয় সাধন করিয়াছেন বসভ, তাঁহার নূতন সুসংস্কৃত শৈববাদ প্রচারেও হইয়াছেন উদ্বুদ্ধ। এ সময়ে একবার তিনি কুডল-সঙ্গমে গিয়া উপস্থিত হন।

গুরু জাতবেদমুনির সহিত সাক্ষাৎ হইতেই স্মিতহাস্যে তিনি কহিলেন 'বৎস বসভ, তোমার ভাগ্য আজ বড় সুপ্রসন্ন। অল্লাম প্রভু এ সময়ে এখানে উপস্থিত। তোমার প্রসঙ্গ উঠতেই বলিলেন,—তোমার সাধনা সিদ্ধির পথে এগিয়ে এসেছে। তাই ভাবছি, বড় সুসময়েই তুমি এসে পড়েছো।'

অল্লাম প্রভুর চরণে প্রণাম নিবেদন করিতেই বসভকে তিনি প্রাণ ভরিয়া করিলেন আশীর্বাদ। তারপর স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বসভ, দেখতে পাচ্ছি তোমার কায়ক-সাধনা ও ইষ্টনিষ্ঠা ঠিক পথেই চলেছে। কিন্তু বৎস, ইষ্টদর্শন না হলে তো তোমার কায়ক-সাধনা দৃঢ়ভূমিতে স্থাপিত হবে না। কর্মক্ষেত্রকে কৈলাসে পরিণত করার সঙ্কল্প তুমি গ্রহণ করেছো, কিন্তু কৈলাসপতির দর্শন না পেলে তো সে সাধনায় সহজে তুমি জয়যুক্ত হবে না। ইষ্টদর্শন লাভ করে ইষ্টের আশীর্বাণী নিয়ে অগ্রসর হও, তবেই তো শৈবধর্মের পুনর্গঠনের ব্রত তোমার সফল হয়ে উঠবে।"

সেদিন গভীর রাত্রে সঙ্গমেশ্বর মন্দিরে গিয়া বসভ ধ্যান-জপে বসিয়াছেন। ভাবাবেশে দীর্ঘ সময় নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ মন্দিরগৃহ স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বর আবির্ভূত হইলেন তাঁহার নয়ন-সমক্ষে। দৈবীকণ্ঠের বাণী শুনা গেল, "বৎস বসভ, শিবভক্তি ও শিবযোগের উজ্জীবনের জন্য, প্রচার ও প্রসারের জন্য, যে সঙ্কল্প তুমি করছো, তা অবশ্য সিদ্ধ হবে। সহস্র সহস্র সাধকজন শিবভক্ত নরনারী তোমার সহায়তার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তাদের ভেতর তোমার সাধনা ও সিদ্ধির কল্যাণধারা তুমি বিস্তারিত ক'রে দাও।"

জ্যোতির্ময় দিব্য মূর্তিটি ধীরে ধীরে এবার মন্দিরের লিঙ্গপ্রতীকে মিলাইয়া যায়। সাধক বসভের অন্তরে বার বার অনুরণিত হইতে থাকে দৈবী কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার। দ্রুতপদে তখনই তিনি ছুটিয়া যান যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর কাছে। রুদ্ধস্বরে কাতর কণ্ঠে, অনুনয় করেন, "প্রভুদেব, আপনার কৃপায় এ দাস ধন্য হয়েছে। কিন্তু কৃপার ধারা একবার উন্মুক্ত ক'রে আর যেন আমায় বঞ্চিত করবেন না।'

"বৎস, তুমি শান্ত হও, স্থির হয়ে বসো'—স্নিগ্ধ মধুর হাস্যে অল্লাম প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দেন।

"প্রভু আমাব প্রার্থনা আপনাকে পূর্ণ কবতেই হবে। নিজেব সম্বন্ধে আমাব মূল্যাবোধ বযেছে, আমাব শক্তি যে সীমাবদ্ধ সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। শৈবধর্মেব পুনবভ্যুদয এক বিবাট কাজ, অতি গুবুত্বপূর্ণ ঐশ্ববীয কাজ। সাক্ষাৎভাবে আপনি আমাব সহাযতা না কবলে আমাব পক্ষে এ কাজ সম্পন্ন কবা সম্ভব হবে না।"

"বসভ, আমি যাঁকে জীবনভব ধ্যোযাই সেই ইষ্টেব দর্শন তুমি লাভ কবেছো। তাঁব আশীর্বাদও পেযেছো। শিবেব আদিষ্ট কাজে, শিব স্মবণ ক বে, তুমি অগ্রসব হও। পাপাচাব আব কলুষে শৈবসম্প্রদায ভবে উঠেছে, এব সংস্কাব সাধন কবো সর্বাগ্রে। লিঙ্গদীক্ষাব ভেতব দিযে সহস্র সহস্র বীবশৈব সাধক সৃষ্টি কবো দেশেব দিকে দিকে। এই পুনর্গঠিত শৈবেবা পবিচিত হবে বীবশৈব বা লিঙ্গাযেৎ বলে। আব এ কাজে আমাব সাহায্য অদূব ভবিষ্যতে, প্রযোজনমতো অবশ্যই তুমি পাবে বৎস।"

অল্লাম-প্রভু ও সমবেত শিবযোগীদেব পদবন্দনা কবিযা হৃষ্টচিত্তে বসভ মঙ্গলওযাডে ফিবিযা আসেন।

নব প্রেবণায উদ্বুদ্ধ হইযা শৈবধর্মেব সংস্কাব সাধনে ও প্রচাবে তিনি ব্রতী হন। তাবপব অচিবে জনসাধাবণেব মধ্যে পবিচিত হইযা উঠেন ভক্তি-ভাণ্ডাবী বসভেশ্বব নামে।

বসভেশ্বব প্রচাবিত বীবশৈববাদ এবং তাঁহাব জীবন ও সাধনপন্থাব তাৎপর্য বুঝিতে হইলে কানাডাব ধর্ম আন্দোলনেব পশ্চাৎপট অনুধাবন কবা দবকাব।

বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল দীর্ঘদিন। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ মহাবংশে দেখা যায, মহাবাজ অশোক বনবাসী (উত্তব কানাডা) এবং মহিষমণ্ডলে (মহীশূব) ধর্ম প্রচাবকদেব প্রেবণ কবেন। কযেক শতক ব্যাপিযা এখানকাব বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বৌদ্ধ মতবাদেব প্রতাপ দেখা যায, তাবপব ক্রমে তাহা নিস্তেজ হইযা আসে। একাদশ শতকেও বল্লিগাভেব বৌদ্ধকেন্দ্রেব স্মৃতি জনমানস হইতে একেবাবে মুছিযা যায নাই। কানাডায জৈনধর্মেব প্রভাব অতঃপব ধীবে ধীবে বৃদ্ধি পায। বাষ্ট্রকূট ও গঙ্গবংশেব বাজাবা সোৎসাহে এ ধর্মেব পৃষ্ঠপোষকতা কবিতেন, তাই অষ্টম হইতে দশম শতক অবধি এ ভূখণ্ডে দেখিতে পাই জৈন সাধুদেব প্রবল প্রতিপত্তি। কোপন ও শ্রবণ-বেলগোলাব জৈনমন্দিবগুলি তখনকাব জনসমাজে সুপবিচিত হইযা উঠে। চালুক্য-বাজেব সেনাপতি নাগদেবেব ভক্তিমতী পত্নী অত্তিমবে প্রায পনেব শত জৈনমন্দিব স্থাপন কবিযা যান। এজন্য জনগণ তাঁহাকে আখ্যা দেয—দান-চিন্তামণি।

কানাড়ায বৈষ্ণব ও শৈবেব সংখ্যাও একসমযে নিতান্ত কম ছিল না। চালুক্য-বাজাবা ছিলেন বিষ্ণুভক্ত, ইষ্টবূপে তাঁহাবা ববাহ অবতাবেব পূজো কবিতেন। বাদামীব মনোবম গুহা-মন্দিব আজিও এই ইষ্টপূজাব স্বাক্ষব বহন কবিতেছে।

মহাত্মা মৎস্যেন্দ্রনাথেব যোগ এবং তন্ত্রেব সাধনাও এক সমযে মহাবাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যেব নানা স্থানেব মধ্য দিযা কানাডায ছডাইযা পডে। শক্তিমান্ সাধক ও সিদ্ধদেব মাধ্যমে জনসমাজে এ সাধনা বিস্তাবিত হয।

ভাবতেব শৈবধর্ম অতি প্রাচীন। ঋক্‌বেদেব বুদ্রেব উল্লেখ হইতে এই ধর্ম ও

উপাসনাব পবিচয় পাওয়া যায। পৌবাণিক ও মধ্যযুগে এই শাস্ত্রানুগ শৈবধর্মেব বিস্তার সাধিত হয়। কিন্তু পববর্তীকালে শৈবসম্প্রদায কতগুলি উপদলে বিভক্ত হইযা পড়ে এবং এক শ্রেণীব সাধকদেব মধ্যে মানসিক বিভ্রান্তি ও নৈতিক অধঃপতনেব প্রসাব দেখিতে পাওয়া যায। একাদশ শতকেব কানাড়াযও শৈবসম্প্রদাযেব মধ্যে নানা পাপাচাব ও নৈতিক উচ্ছৃংখলতা বৃদ্ধি পায। পাশুপত (লাকুল), কালামুখ, কাপালিক সবাইব ভিতবেই ছড়াইযা পড়ে পাপাচাব এবং স্খলন পতনেব ঘুটি।

বহুলখ্যাত তরুণ বীবশৈব বসভেশ্ববেব ভাগিনেব ও হাতে-গড়া সাধক, চন্নবসভেশ্বর সমকালীন ধর্মসম্প্রদাযগুলি সম্পর্কে একটি দোঁহাতে বলিযাছেন[১] :

শৈব বযেছে বিমূঢ় হতবাক্ হযে,
পাশুপত খুঁজে পাচ্ছে না পথেব সন্ধান,
কালামুখীব দুই চোখে অন্ধত্বেব কালো,
মহাব্রতী ঘুবছে তাব ঔদ্ধত্য আব অহঙ্কার নিয়ে।
সন্ন্যাসী আজ ঈশ্বরবিমুখ,
কৌল হযেছে উন্মাদ বোগগ্রস্ত,
ভক্তিমার্গে এই ছয জনাব কাকে আনবে টেনে ?

দ্বাদশ শতকে শৈবধর্মেব পুনরুজ্জীবনেব জন্য প্রযাস পান তিনটি স্বনামখ্যাত সাধক, সামাজিক ও বাষ্ট্রীয জীবনে ইঁহাদেব প্রভাব ছিল অসামান্য। ইঁহাদেব নাম একান্তদ বামাইযা, মহামণ্ডলেশ্বব বিবুপবস এবং বীব গাগ্যিদেব। কিন্তু শৈব সাধনা সিদ্ধিব সহিত সামাজিক উদাবতাব সমন্বয সাধনে ইঁহাবা সক্ষম হয নাই। এ সমন্বযেব জযধ্বনি সর্বপ্রথমে উচ্চাবিত হয বীবশৈব বসভেশ্ববেব কণ্ঠে।

ইষ্টদেব মঙ্গলময শিবকে বসভ গুরুকৃপায ও স্বীয সাধনশক্তি বলে দর্শন কবিযাছেন, উপলব্ধি কবিযাছেন তাঁহাব সর্বব্যাপী চৈতন্যময পবমসত্তা। আব অনুভূতি বাজ্যেব এই শিখবে উঠিযাই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, গুরুব কৃপাব অপার করুণায হইয়াছেন উদ্বেল, শিবতত্ত্বকে জনগণেব মধ্যে বিস্তাবিত কবিতে হইযাছেন বদ্ধপবিকব। শুধু তাহাই নয, এই করুণা ও জনকল্যাণেব সংকল্প নিযা বসভেশ্বর কানাড়ায যে সামাজিক বিপ্লব ও সর্বজনীন মুক্তিব সূচনা কবেন, ভাবতেব ধর্ম-সংস্কৃতিব ইতিহাসে আজো তাহা স্মবণীয হইযা আছে।

বসভেশ্বব উপলব্ধি কবিযাছেন তাঁহাব ইষ্ট সঙ্গমেশ্বব যে বিভু, তাঁহাব সর্বব্যাপী পবমসত্তায অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড বহিযাছে ওতপ্রোত, সর্বত্র সর্ব সময তাঁহার অস্তিত্ব বসভ অনুভব কবিযাছেন মনপ্রাণ দিয়া। একটি বচনে এ পবম অনুভূতিব আভাস পাই[২] ·

হে প্রভু, যেখানেই নযন দুটি আমি মেলে দিই,
তোমাব মাধুর্য কবি নিবীক্ষণ,
অনাদি অনন্ত মহাকাশেব যে দিকেই তাকাই—
নযন আমাব ভবে ওঠে তোমাব রূপে

১ ডক্টব পি· বি· দেশাই · বসভেশ্বর অ্যান্ড হিজ্ টাইমস।
২ দাস্ পেক্ বসভ—অনুবাদ এ· সুন্দববাজ থিযোডোব

তুমিই যে এই বিশ্বসৃষ্টির নয়নের জ্যোতি,
তুমিই যে এই লাবণ্যময় প্রদীপ্ত আনন,
তোমার নিঃসীম হস্ত দুইটি প্রসারিত দিগন্ত জুড়ে,
ওগো কুড়ল-সঙ্গমের দেব,
তোমার চরণচিহ্ন ছড়ানো দেখি যে দিকে দিকে।

দেবাদিদেবের সীমাহীন ব্যাপ্তি ও অনন্ত ঐশ্বর্যের প্রশস্তি গাহিয়া বসভেশ্বর আর একটি অনুপম বচনে বলিতেছেন :

এই বিশ্বসৃষ্টির মতোই
সীমাহীন তুমি প্রভু, স্বর্গের মতোই
তুমি ঊর্ধ্বায়িত, মহীয়ান—
প্রপঞ্চের চাইতেও তুমি বৃহত্তর,
তোমার বাতুল চরণ দুটি স্থাপিত রয়েছে
পৃথিবীর নিম্নতম স্তরে,
আর তোমার উজ্জ্বল কিরীট
ধক্ ধক্ করে জ্বলছে অবিরত
এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি ছাড়িয়ে।

সাধক বসভের আর একটি বড় পরিচয় তাঁহার মানবপ্রীতি—শিবশরণ, শিব-ভক্তদের প্রীতি। সর্বজনীন প্রেম দিয়া যেমন নিজ সাধনাতে তিনি জয়যুক্ত হন, তেমনি ইহারই মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ উদার বুদ্ধি ও ভক্ত মানুষের সঙ্গে তিনি বাঁধা পড়েন নিবিড় বন্ধনে। বসভের অনুভূতিলব্ধ 'বচনে' তাঁহার এই করুণাঘন স্বরূপটি ফুটিয়া উঠিতে দেখি :

করুণার রসধারা আর সঞ্জীবনী শক্তি
নেই যাতে—কি ক'রে তা
অভিহিত হবে ধর্ম বলে ?
করুণার অমৃতধারা পড়বে ঝরে অজস্র ধারায়,
আর লক্ষ কোটি মানুষের জীবনে
করুণার রস সতত হবে উৎসারিত
ধর্ম বিশ্বাসের মূল দেশ থেকে -
তবেই না রক্ষা পাবে এই বিশ্বসংসার।
ওগো, করুণা নেই যেখানে
সেখানে নেই আমার প্রভু দেবাদিদেব কুড়ল-সঙ্গম।

ধর্মজীবনে এবং ব্যবহারিক জীবনে বসভেশ্বরের এখন বিপুল প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি।

দিকে দিকে খ্যাতি রটিয়া যায় বসভ শিব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কুড়ল-সঙ্গমের শৈব সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রকারেরা তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী অল্লাম-প্রভু সাধকসমাজে যিনি প্রভুদেব বলিয়া খ্যাত, বসভেশ্বরকে কৃপা করিয়াছেন অকৃপণ করে, আখ্যা দিয়াছেন তাঁহাকে—ভক্তিভাণ্ডারী।

প্রাদেশিক শাসনকর্তা বিজ্জলের দরবারেও বসভেশ্বর প্রধান সাবির সচিব।

রাজ্যের রাজস্বের হিসাব ও কোষাগারের পরিচালনভার তাঁহারই উপর। বিজ্জলের তিনি দক্ষিণ হস্ত।

ঋদ্ধি ও সিদ্ধির এই সমাহার বসভেশ্বরকে রাজ্যমধ্যে করিয়া তুলিয়াছে অনন্য-সাধারণ। শত শত শিব-শরণ এবং শিবভক্ত গৃহী ও সন্ন্যাসী সাধক প্রতিদিন তাঁহার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। ধর্ম, দর্শন ও সাধন সম্পর্কে সোৎসাহ আলোচনা চলে। আর চলে সাধু-সংবর্ধনা ও সাধু ভোজন—দীযতাং ভুজ্যতাং রবে সারা নগরী মুখরিত হইয়া উঠে।

ভক্তজন ও সাধকদের সমাবেশে বসভেশ্বর যে শৈবধর্মের কথা, বীরশৈববাদের কথা বলেন—তাহা কিন্তু বেদানুগ শৈবধর্ম নয়। কর্মকাণ্ডের কথা ইহাতে নাই, নাই বর্ণাশ্রমের সমর্থন। বেদাচার বহির্ভূত এ এক বৈপ্লবিক ও সংস্কারপন্থী নবতর শৈবধর্ম। বসভেশ্বর ঘোষণা করেন জাতিবর্ণ নির্বিশেষে, স্ত্রী-পুরুষের ভেদ বৈষম্য না মানিয়া, প্রত্যেক নবজাত শিশুকে দিতে হইবে লিঙ্গদীক্ষা। এই দীক্ষার বলে সাধনক্ষেত্রে সকল শিবভক্তই হইবে সমপর্যায়ভুক্ত, সমান অধিকারযুক্ত। বসভেশ্বর আরও কহেন, শিব-শরণ বা শিবে শরণাগত সন্ন্যাসী মাত্রেই শিবের প্রতিভূ। প্রত্যেক ভক্তের প্রধান কর্তব্য এই শিবশরণদের আন্তরিক সংবর্ধনা জানানো এবং ইঁহাদের সেবা ও ভোজনের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা।

বীরশৈববাদের দার্শনিক ভিত্তিও বসভেশ্বর এই সময়ে রচনা করেন তাঁর সৃষ্ট স্থায়ী ধর্মসভা ও অনুভব-মণ্ডপেও দার্শনিকতা ও সাধনপদ্ধতির উপকরণ সংগৃহীত হয়।

এই মত অনুযায়ী শিব হইতেছেন অনাদি অনন্ত পরমপুরুষ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। শক্তি শিবের ক্রিয়াশীল সত্তা, শিব হইতে শক্তিকে কোনোমতে পৃথক করা যায় না। তাই দার্শনিক মহলে বীরশৈববাদকে বলা হয় শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

এই মতের সাধকেরা লিঙ্গ ও অঙ্গ এই দুইটি তত্ত্বের উপর জোর দেন। লিঙ্গ হইতেছেন শিব, আর অঙ্গ—জীবাত্মা। আসলে এই দুইটিতে কোনো পার্থক্য নাই। অজ্ঞানতার জন্য আমরা অন্তর্নিহিত ঐক্যকে উপলব্ধি করিতে পারি না, এই অজ্ঞানতার মল দূর হইলেই শিবশক্তির অখণ্ড পরমসত্তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। একের সাথে, অখণ্ডের সাথে, সাধকের ঘটে মহামিলন। এই মহামিলনই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য। এই মিলনকে শৈবযোগের ভাষায় বলা হয়—লিঙ্গাঙ্গ সামরস্য।

এই সামরস্য সাধিত হয় দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলে এবং ছয়টি স্তরের ভিতর দিয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। এগুলিকে বলা হয় ষট্‌স্থল। অষ্টাবরণ বা আটটি সূক্ষ্ম মানসক্রিয়ার উপরও বীরশৈব সাধকেরা গুরুত্ব আরোপ করেন।

লিঙ্গাঙ্গ সামরস্য বা পরম প্রাপ্তির পথে চলিতে হইলে সাধকের নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক আচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। বসভেশ্বরের অনুগামী সাধকেরা এগুলিকে বলেন—পঞ্চাচার। কায়ক বা শিবে উৎসর্গীত ব্যবহারিক কর্ম বীরশৈব-বাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। কায়কের মূল কথা—প্রত্যেক মানুষকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কর্ম করিতে হইবে। এই কর্ম শিবেরই কর্ম, এই সঙ্গে বজায় রাখিতে হইবে 'দাসোহং' মনোভাব। কায়কের উপার্জিত অর্থে শিবভক্তের কিন্তু কোনো অধিকার

নাই, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট অর্থ তাহাকে দান করিতে হইবে। বীরশৈববাদের প্রচারক জঙ্গম সাধুরা এই অর্থ ব্যয় করিবেন সমাজের কল্যাণে।

কায়ক বা নিবেদিত কর্ম সম্বন্ধে বসভেশ্বর অত্যন্ত উদারপন্থী। যে কোনো বর্ণের লোক স্বেচ্ছানুযায়ী তাহার বৃত্তি নির্বাচন করিবে, এই বিধি তিনি দিয়াছেন।

অনুভব-মণ্ডপ বা সাধকসভা বসভেশ্বরের এক বিশিষ্ট অবদান। এই সভায় পণ্ডিত অপণ্ডিত, উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য সবাই মিলিত হইতেন। নিজেদের সাধনজীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা যেমন সবাই দিতেন, বিতর্কেও তেমনি করিতেন অংশ গ্রহণ।

এই অনুভব-মণ্ডপকে শিবানুভব মণ্ডপও বলা হইত। এখানকার আলোচিত তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বসভেশ্বর ও অন্যান্য সিদ্ধ সাধকদের উপদেশ ও অনুভূতিজাত তত্ত্ব শ্লোকবদ্ধ হইত 'বচন'-রূপে।[১] তারপর অগণিত শিবভক্তের জন্য এগুলি বিভিন্ন শহরে ও জনপদে বিতরণ করা হইত।

সংকলিত বচনগুলিতে বসভেশ্বর শুধু তত্ত্বের ব্যাখ্যান করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। এই তত্ত্বকে রূপায়িত করিতেন নিজের ব্যবহারিক জীবনে। শাসনকর্তা বিজ্জলের সচিব ও কোষাগারের অধ্যক্ষরূপে তিনি ছিলেন সমাজের এক অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু নিজ গৃহে, অনুভব-মণ্ডপে, দরিদ্র অস্পৃশ্যদের সঙ্গে উপবেশন করিতে তাঁহার বাধিত না। সরকার হইতে যে উচ্চ বেতন তিনি পাইতেন, সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য তাহা হইতে সামান্য কিছু রাখিয়া দিয়া অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করিতেন শিবশরণ ও শিবযোগীদের জন্যে। তাঁহার ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন, সিদ্ধ জীবন, তাই সে সময়ে আকৃষ্ট করে সহস্র সহস্র সাধারণ নরনারীকে। জনমনে তিনি পরিগ্রহ করেন শিবকল্প মহাপুরুষের আসন।

সেদিন অনুভব-মণ্ডপে ভক্ত আর শিবশরণেরা জড়ো হইয়াছেন। আত্মিক সাধনার নানা সমস্যা নানা জটিলতার হইতেছে সমাধান। এক সাধক বসভকে প্রশ্ন করেন, "প্রভু-প্রভু বলে আকুল হয়ে কতো ডাকছি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কিন্তু কই একান্ত আপনার জন হয়েও, প্রাণপ্রভু হয়েও, তিনি তো সাড়া দিচ্ছেন না। বলে দিন এবার আমি কি করি?"

বসভ অন্তর্লীন হইয়া যান। ভাবাবেশে নির্গত হয় আশ্বাসভরা এক 'বচন'—[২]

মুখে শুধু প্রভু-প্রভু বললে হবেনা কোন কাজ,
বিশ্বাসের ভিত্তি যেখানে নেই
'প্রভূ' ডাক যে সেখানে শূন্যগর্ভ।
একবার বিশ্বাসে ভর করে দাঁড়াও,
অমনি হৃদয় তাঁর যাবে গলে'
এগিয়ে আসবেন প্রভু সঙ্গমেশ্বর—
এই যে আমি, এই যে আমি, বলে

১ বসভেশ্বর কমেমোরেশন্ ভল্যুম: কায়ক—ভি কে, জাবলি।
২ বচনস্ অব বসভন্না. অনুবাদ—মেনেজেস অ্যাণ্ড অঙ্গাডি।

এক নবীন সাধক সেবার বসভকে প্রশ্ন করেন, "ইষ্টদেব শিবে আত্মসমর্পণ করলে সাধকের কোন্ অবস্থা হয়, পরিপূর্ণতা ও আনন্দে কি তার হৃদয় ভরে ওঠে চিরতরে ?"

বসভেশ্বর উত্তর দেন তাঁহার সদ্য রচিত এক 'বচনের' মধ্য দিয়া, সাধনা ও সিদ্ধির পথে দান করেন দিব্য প্রেরণা :

প্রভুর প্রতি সত্যকার প্রেম যখন জাগে,
মানুষের কামনা বাসনা হয় নিষ্কাশিত।
প্রভুর পদে যে নেয় আশ্রয় ও শরণাগতি,
অন্তরে তার থাকে না ভেদ বৈষম্যের রেখা।
প্রেমের কারবারে সে হয় ধনী,
অপর ধনকে তুচ্ছ করে সে অবলীলায়।
পরা শান্তি লাভ করেছে যে সাধক,
ভ্রান্তি আর চাঞ্চল্য নেই তার জীবনে—
ঈর্ষা অহঙ্কারের গন্ডী সে করেছে অতিক্রম,
পরম প্রভু আসন পেতেছেন তাঁর হৃদয়ে।

নব দীক্ষিত অপরিণত সাধকদের উদ্দেশ্য করিয়া বসভেশ্বর একস্থলে বলিতেছেন : "তোমার সাধনার বৈরীরা লুকিয়ে আছে তোমার দেহে মনে। তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে বিপন্ন পশুর মতো আর্ত চীৎকার করতে হবে, উদ্ধারকে করতে হবে ত্বরান্বিত।"

একটি 'বচনে' এই আর্ত ভঙ্গীটি তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শৈবধর্মের তিনটি তত্ত্ব—পশু, পাপ ও পশুপতির তত্ত্ব এখানে আভাসিত :

হতভাগ্য পশু মুমূর্ষু হয়েছে খাদে পড়ে,
কি করে নিজেকে বাঁচাবে সে,
নিরুপায় হয়ে কতই বা ছুঁড়বে সে চারটে পা ?
নিজের প্রভুকেই ডাকতে হবে তাকে—
মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবার আশায়।
তেমনি করে হে সাধক, হে পশু,
আর্ত হয়ে ডাকো তোমার পশুপতিকে,
বলো—হে প্রভু, হে কৃপাময়,
টেনে তোল আমায় এই গহ্বর থেকে,
পাপ আর কলুষ আমায় চেপে ধরবার আগে
তোমার পুণ্যহস্তে করো আমার উদ্ধার।

সঙ্গমেশ্বরের কৃপায় সাধকপ্রবর বসভের প্রধান উপজীব্য, এই কৃপাই তাঁহার পরমাশ্রয়। এ সম্বন্ধে তিনি প্রভুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন ;

তোমার কৃপায় অসম্ভব হয়ে ওঠে সম্ভব
শুষ্ক শাখায় নামে সবুজের স্নেহ—
জীর্ণপাতায় জাগে নূতন প্রাণের জোয়ার।

তোমার কৃপায় উর্বর ভূমিতে আসে স্নিগ্ধ সরলতা,
আর প্রাণঘাতী বিষ হয় অমৃত।
কৃপা তোমার এনে দেয় প্রাচুর্যের সমারোহ
হে প্রভু কুডল-সঙ্গম দেব।

১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মঙ্গলওয়াড়-এর রাজনৈতিক জীবনে এ সময়ে ঘটে এক চাঞ্চল্যকর পটপরিবর্তন। চালুক্যরাজ তৃতীয় তইলো এ সময়ে দুর্বল হস্তে শাসন-কার্য পরিচালনা করিতেছেন। নিজের সেনাধ্যক্ষ ও শাসনকর্তাদের আয়ত্তে রাখার শক্তি তাঁহার নাই। শত্রুর আক্রমণ ও সামন্তরাজাদের বিদ্রোহের ভয়ে তিনি সদা সন্ত্রস্ত।

ইতিমধ্যে রাজা এক মহাসংকটে পড়িলেন। বিদ্রোহী কাকতীয় বংশের সামন্ত দ্বিতীয় প্রোলকে দমন করিতে গিয়া নিজেই হইলেন তাঁহার হস্তে বন্দী। বিজ্জল ও অন্যান্য অমাত্যদের হস্তক্ষেপের ফলে রাজা বন্দীদশা হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আর রাজধানী কল্যাণে ফিরিয়া আসিলেন না।

ইহার ফলে সারা রাজ্যে দেখা দেয় চরম বিশৃংখলা, প্রশাসন ভাঙিয়া পড়ার উপক্রম হয়। শক্তিমান্ শাসনকর্তা বিজ্জল তখন মঙ্গলওয়াড-এ বসিয়া ঘটনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছেন, অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ভাবিতেছেন দুর্বল হস্ত হইতে যে রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িতেছে শক্তিধর বিজ্জল কেন তাহা অধিকার করিবেন না?

কলচুরি সম্রাটবংশে বিজ্জলের জন্ম। দুই-তিন পুরুষ যাবৎ চালুক্যরাজদের সামন্ত বা শাসনকর্তা হিসাবে তাঁহারা কাজকর্ম করিতেছেন। এবার সুযোগ আসিয়াছে, রাজসিংহাসন অধিকারের, কলচুরি সাম্রাজ্য আবার প্রতিষ্ঠা করার। বিজ্জল ভাবেন, সেনা ও যুদ্ধ উপকরণ তাঁহার আছে, নিজে তিনি কুশলী যোদ্ধা, কুশাগ্রবুদ্ধি। রাজনীতিজ্ঞতায় তাঁহার জুড়ি নাই। অধিকাংশ অমাত্য ও সামন্ত মেরুদণ্ডহীন চালুক্য রাজার উপর আস্থা হারাইয়া বসিয়াছে, বরং তাঁহারা বিজ্জলেরই পক্ষপাতী। প্রজারাও উন্নততর শাসন ও আইন-শৃংখলা প্রবর্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এই সুবর্ণ সুযোগ বিজ্জল কেন হেলায় হারাইবেন? ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে কেন তিনি গ্রহণ করিবেন অসহায় দর্শকের ভূমিকা? না, আর দেরি করা নয়, রাজদণ্ড তাঁহাকে ছিনাইয়া নিতেই হইবে।[১]

অচিরে সুযোগও মিলিয়া গেল। রাজা তইলো বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া রাজধানী কল্যাণে আর ফিরিয়া আসেন নাই। অমাত্য ও সেনাধ্যক্ষদের ষড়যন্ত্রের ভয়ে তিনি দূরে সরিয়া আছেন। নিজেই বরং তিনি আদেশ দিলেন তাঁহার প্রতিনিধিরূপে বিজ্জলই কল্যাণে অবস্থান করিবেন, গ্রহণ করিবেন সারা রাজ্যের শাসনভার।

---

১ বিজাপুর জেলায় মুত্তগী নামক স্থানে একটি শিলালেখা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিজ্জলের তৎকালীন মনোভাব ও পরিকল্পনার চিত্র পাওয়া যায়। শিলা-লেখালেখটি বিজ্জলের উত্তরাধিকারী রাজা রায়মুরারী সোভিদেবের আমলে উৎকীর্ণ হয়। দ্রঃ ডক্টর পি বি দেশাই: বসভ অ্যান্ড হিজ টাইম্‌স পৃঃ ২৯-৩০

বিজ্জল এবাব সাড়ম্বরে কল্যাণে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অল্প কিছুদিনেব মধ্যেই একদল সামন্ত ও শাসনকর্তাব সমর্থন নিয়া নিজেকে বাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

মঙ্গলওবাড হইতে অন্যান্য সচিব ও উচ্চ বাজকর্মচাবীব সঙ্গে বসভেশ্ববকেও কল্যাণে আসিতে হয়। বিজ্জল বাজসিংহাসনে আসীন হইয়া বসভেশ্ববকে নিযুক্ত কবেন বাজ্যেব কোষাগাব-অধ্যক্ষবূপে। আয়-ব্যয়েব সমস্ত কিছু দাযিত্বও তাঁহাব উপব অর্পিত হয়।[১]

উচ্চাকাঙ্ক্ষাব তাগিদ ও তাঁহাব নিজস্ব যুক্তিতর্ক যাহাই থাকুক, চালুক্য সিংহাসন বিজ্জল অন্যাযভাবে জোব কবিযাই দখল কবিযাছেন। মনে মনে তিনি ঠিকই জানেন, ন্যায়নীতিব দিক দিযা কাজটা ভাল হয নাই। অমাত্য ও সামন্তদেব মধ্যে একদল ঈর্ষাপবাযণ হইযাছে, আব জনসাধাবণেব মধ্যে জাগিযাছে অসন্তোষ। এ সময়ে বসভেশ্ববেব মতো একজন জনপ্রিয় ধর্মনেতা তাঁহাব পাশে থাকেন, ইহা তিনি চাহেন। কিন্তু বসভেশ্ববেব উপবও আজকাল তিনি তেমন আস্থা স্থাপন কবিতে পাবিতেছেন না।

বিজ্জল সনাতনী শৈব, বৈদিক আচাব-অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিব উপব তাঁহাব তীব্র অনুবাগ। অপব দিকে দেখা যাইতেছে বসভ একজন সংস্কাববাদী বীবশৈব। ব্রাহ্মণ শূদ্রেব তাবতম্য তিনি মানেন না, শিবভক্ত ও লিঙ্গদীক্ষায দীক্ষিত মানুষ মাত্রেকেই সানন্দে কোল দেন। তাছাড়া, বিজ্জলেব বাজসিংহাসন দখল কবাব কাজটাকেও বসভেশ্বব তেমন সুচক্ষে দেখিযাছেন বলিযা তাঁহাব মনে হয না। তবুও সাময়িকভাবে বসভেব প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তা ও লক্ষ লক্ষ বীবশৈবেব নেতৃত্বকে রাজা কাজে লাগাইতে মনস্থ কবিলেন।

বাজধানী কল্যাণে আসাব পব হইতে বসভেশ্ববেব মনে কিন্তু শান্তি নাই। কুচক্রী বিজ্জল হঠাৎ নিতান্ত অন্যাযভাবে চালুক্য সিংহাসন অধিকাব কবিযা বসিযাছেন। অথচ তাঁহাবই অধীনে বসভেশ্ববকে কাজ কবিতে হইবে। নৈতিকতাব দিক দিযা মনে তিনি একটুও সায পাইতেছেন না। বিপুল সংখ্যক শিব-ভক্তেবাই বা এ সম্পর্কে কি ভাবিতেছে? এ পবিস্থিতিতে কি তাঁহার কর্তব্য, অচিবেই তাহা স্থিব কবিতে হইবে। মন তাই বড চঞ্চল হইযা উঠিল।

এই সংকটময সময়ে সেদিন তাঁহাব ভবনে আবির্ভূত হন মহাসমর্থ শিবযোগী অল্লাম প্রভু। ভক্তিভবে প্রণাম নিবেদন কবিযা বসভেশ্বব কহেন, "প্রভুদেব, আপনাব আগমনে এ ভবন আজ পবিত্র হযেছে, আব আমিও অন্তবে পেযেছি পবম শান্তি। বাজা বিজ্জলেব অধীনে কাজ কবাব ইচ্ছা আব আমাব নেই। কল্যাণনগব ত্যাগ কবে আব কোথাও চলে যাবো বলে ভাবছি। কিন্তু তাতেও বয়েছে এত বড বাধা। শৈবধর্মেব উজ্জীবন ও পুনর্গঠনেব পবিত্র কাজটি আজ এমন একটা স্তবে এসে পেীছেছে যে এ সময়ে এ নগব ছেডে গেলে সমূহ ক্ষতি হবে। আন্দোলন শিথিল হযে পডবে। আমায বলুন, এ সংকটে কোন্ পথ আমি অবলম্বন কববো।"

---

১ চন্নমল্লিকার্জুন ' লাইফ টাইম অব বসভেশ্বব

"বৎস, 'কায়কভে কৈলাস' এই কানাড়ী বাণীর রহস্য তুমি কি ভুলে গিয়েছো ?"

"না, প্রভু। এক মুহূর্তের তরেও তা ভুলি নি।"

"তোমার ব্যবহারিক জীবনের কাজ তো শিবেরই কাজ। রাজ্যে, সমাজে যা ঘটবার তা ঘটুক। তোমার তাতে কি হয়েছে ? নিজের কাজের পরিমণ্ডলকে কৈলাস বলে জ্ঞান করো, নিষ্ঠাভরে তুমি তোমার কাজ ক'রে যাও।"

"কিন্তু প্রভু, বিশ্বাসহন্তা পররাজ্য-অপহারক বিজ্জলের সান্নিধ্যটা যেন ।"

"তেমন ভালো লাগছে না, এই তো ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

রাজা বিজ্জল কি করেছেন না করেছেন তা দেখবেন শিব স্বয়ং। তুমি এ নিয়ে বৃথা কেন চঞ্চল হয়েছো ? বিজ্জলের ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল অপেক্ষা তোমার সিদ্ধ জীবনের পরিমণ্ডল অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক বেশী জ্যোতির্ময়। তাঁর সান্নিধ্যে থাকলে তোমার মতো সাধকের আবার কি অপকার হবে ?"

"বুঝতে পারছি প্রভু, এ-ও আমার একটা বড় রকমের পরীক্ষা।"

"হ্যাঁ, বৎস, এই পরীক্ষাই তোমার শিবসাধনার শেষ পরীক্ষা। ঘৃণ্য পাপীর সান্নিধ্যে থেকেও তুমি অবিচল ও অনাসক্ত থাকো কিনা, সহজ সমাধি তোমার অধিগত হয় কিনা, তাই আমি দেখতে চাই।"

"বেশ প্রভু, তাই হবে, আপনার এ আদেশ সদাই হবে আমার শিরোধার্য।'

"একটা কথা মনে রেখো বৎস। বিজ্জলের পাপের ভরা পূর্ণ হতে আর দেরি নেই। শিব সত্বরই তাঁর শাস্তি বিধান করবেন।"

"কিন্তু প্রভু, একটা বিশেষ নিবেদন আমার রয়েছে। অভয় দেন তো বলি।'

"বল বসভেশ্বর তোমায় আমার অদেয় কিছুই নেই।"

শিব-ভক্ত শরণদের জন্য এক বিশাল অনুভব-মণ্ডপের প্রতিষ্ঠা আমি করেছি। আমি চাই, অধ্যক্ষ ও নিয়ন্তা হিসাবে আপনার নাম এর সঙ্গে যুক্ত হোক। এই পবিত্র মণ্ডপে আপনি মাঝে মাঝে উপস্থিত হবেন, শিবযোগী ও শিবভক্তদের দান করবেন নিগূঢ় সাধনের উপদেশ। এই আমার প্রার্থনা।"

"বৎস, আমি তো সদাই তোমার ধর্ম-আন্দোলনকে আশীর্বাদ জানাচ্ছি, সাহায্যও করছি। তবে, শুধু শুধু আমার নামটি এর সঙ্গে যুক্ত রাখার কি সার্থকতা আছে, বলতো ?"

"প্রভু, আমার সাধনা ও সিদ্ধি যাই থাক্, রাজমন্ত্রী বলেই সবাই আমায় জানে। আর আপনার পরিচয়—আপনি মহামুক্ত সিদ্ধপুরুষ, এ দেশের শ্রেষ্ঠ শিবযোগী। তাছাড়া, বিস্ময়কর শক্তি-বিভূতি রয়েছে আপনার করায়ত্ত। আপনার পুণ্যময় নামটি বীরশৈবদের অনুভব-মণ্ডপের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দিন। তার-ফলে আমাদের আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে বিপুল পরিমাণে।"

"বেশ বৎস, তাই যদি হয়, আমার নাম এতে যুক্ত করে দিয়ো। আমি স্বেচ্ছামতো তোমাদের মণ্ডপে মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হবো, তোমাদের সমস্যার সমাধানে সাহায্যও করবো।"

বসভেশ্বরকে প্রাণভরা আশীর্বাদ জানাইয়া অল্লাম প্রভু ধীরপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কল্যাণ দাক্ষিণাত্যের এক শ্রেষ্ঠ নগর এবং বিজ্জলের রাজধানী। এই নগরই এখন হইতে বীরশৈব আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। বসভেশ্বরের ভবনে, তাঁহার অনুভব-মণ্ডপে, হাজার হাজার শিবভক্ত গৃহস্থ, যোগী, জঙ্গম আসিয়া ভিড় করে। আর সমদর্শী সাধক বসভ এই সব ভক্তদের জ্ঞান করেন ইষ্টদেব শিবের প্রতিভূ বলিয়া, তাঁহাদের ডাকেন—'মহেশ্বর' নামে।

রাজমন্ত্রীরূপে বসভেশ্বর প্রচুর বেতন পান, কিন্তু এই বেতনের সামান্য কিছু নিজ পরিবারের জন্য রাখিয়া আর সবই ব্যয় করেন অভ্যাগত 'মহেশ্বর'দের অশন-বসনের জন্য। প্রতিদিন শত শত নরনারী পঙ্‌ক্তি ভোজন করেন বসভেশ্বরের অঙ্গনে। উৎসবে পার্বণে যেদিন ভাণ্ডারা দেওয়া হয় সেদিন তো অগণিত ভক্ত, সাধু ও সন্ন্যাসী ভোজনে বসিয়া যায়। ভক্তি-ভাণ্ডারী বসভেশ্বরের অর্থভাণ্ডারও হয় সেদিন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

তাঁহার গৃহের এ অন্নসত্রের খ্যাতি প্রচারিত হয় দেশের দিক্‌-বিদিকে। কিন্তু এ খ্যাতিই এক অনর্থ ডাকিয়া আনে।

সনাতনপন্থী শৈবেরা কোনোদিনই বসভের উপর তেমন প্রসন্ন নন। তাঁহার উদার বৈপ্লবিক মতবাদ এসময়ে বহু নরনারীকে আকৃষ্ট করিতেছে, বীরশৈবদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় রাজধানী হইতেছে কম্পিত। বসভেশ্বরের গৃহের এই জনসংঘট্ট প্রাচীনপন্থী শৈব আচার্যদের আর সহ্য হইতেছে না। রাজা বিজ্জল তাঁহাদের মতোই সনাতনী শৈব। এবার তাঁহার দরবারে মন্ত্রী বসভেশ্বরের নামে এক অভিযোগ উত্থাপিত হইল। অভিযোগকারীদের সমর্থন জানাইলেন বসভের বিরোধী একদল অমাত্য।

সবাই কহিলেন, "মহারাজ অর্থমন্ত্রী ও কোষাগারের অধ্যক্ষ বসভেশ্বরের উপর সমস্ত কিছুর ভার দিয়া আপনি পরম নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু আপনার মন্ত্রী যে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন সে খবর আপনি রাখেন না।"

রাজা বিজ্জল চমকিয়া উঠেন, প্রশ্ন করেন, "কি তাঁর অপরাধ, রাজ-সরকারের কি ক্ষতি তিনি করেছেন তা কি আপনাদের জানা আছে। তবে সব আমায় খুলে বলুন।"

"মহারাজ, আপনি কি জানেন, বসভেশ্বরের ভবনে রোজ কয়েক হাজার বীরশৈব প্রসাদ পায়। কিন্তু টাকা আসে কোত্থেকে? আপনার কোষাগার থেকেই এ টাকা ব্যয়িত হচ্ছে।"

"না-না, তা হতে পারে না, বসভেশ্বর তেমন লোক নয়। উচ্ছৃংখল ধরনের একটা শৈবধর্ম নিয়ে যতই মাতামাতি করুক, সরকারী তহবিল তছরূপ কখনো সে করবে না।"

"সুচতুর মন্ত্রী বসভেশ্বর আপনার চোখে ধুলো দিচ্ছে। আপনি অবিলম্বে হিসাব পরীক্ষা করুন, তার অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ নিশ্চয় পেয়ে যাবেন।"

রাজা মনে মনে ভাবিলেন, 'বেশ তো, একদল সম্ভ্রান্ত আচার্য কথাটা যখন তুলেছেনই, রাজকোষ পরীক্ষা করে দেখা যাক্‌না কেন?'

তৎক্ষণাৎ রাজার সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে হিসাব-নিকাশ নেওয়া হইল, কোষাগারে নগদ অর্থ-গণনাও বাদ গেল না। কিন্তু তহবিল ভাঙার কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

রাজা বিজ্জল এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন, "মন্ত্রীবর, বলুন তো আপনার ভবনে রোজ হাজার হাজার লোকের পাত্ পড়ে, তার ব্যয় সংকুলান কি ক'রে হয় ?"

বসভেশ্বর সবিনয়ে নিবেদন করেন, "মহারাজ, বীরশৈবদের কায়ক তত্ত্বে আমি বিশ্বাস করি। পরিশ্রম দ্বারা যে অর্থ আমি উপার্জন করি তার নগণ্য অংশ পরিবারের জন্য রেখে দিয়ে আর সব উৎসর্গ করি শিবের প্রতিভূ শিবভক্তদের জন্য। আমার মতো এই তত্ত্বে অনেকেই বিশ্বাসী, তাঁদের প্রদত্ত অর্থও ভক্ত জঙ্গমদের সেবায় যথেষ্ট সাহায্য করে। শিবের কাজে অর্থের অভাব হবার তো কথা নয়, মহারাজ।"

রাজা বিজ্জল, তখন বেশ কিছুটা অপ্রস্তুত। অভিযোগকারী পণ্ডিতেরাও অতঃপর ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন।

বসভেশ্বরের দৃষ্টিতে শিবভক্ত মাত্রেই 'মহেশ্বর'। তাঁহার ভবনের ভৃত্য ও রক্ষীরা তাঁহারই শৈব মতবাদে বিশ্বাসী, তাই এই সব ভৃত্য ও রক্ষীদের তিনি গণ্য করেন ইষ্টের বিভূতি রূপে। গৃহের একটি ভৃত্যের, প্রতিবেশী একটি ভক্তের, আহার সমাধা না হওয়া অবধি বসভ নিজে কোনো আহার গ্রহণ করেন না। এমনি ছিল তাঁহার ধর্মানুশীল নিত্য রীতি।

একদিন গভীর রাতে বসভেশ্বরের গো-গৃহে চোর আসিয়া উপস্থিত হয়। দুগ্ধবতী, সুপুষ্টা কয়েকটি গাভী নিয়া চোরেরা তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে সরিয়া পড়ে।

রাত্রি প্রভাত হইলে ভৃত্যেরা চুরির ঘটনা জানিতে পারে এবং তাড়াতাড়ি মনিবকে তাহার সংবাদ দেয়।

গো-গৃহে পৌঁছিয়া বসভেশ্বর দেখেন, মাতৃহারা গো-বৎসগুলি করুণনয়নে চাহিয়া আছে, কোনো আহার্য গ্রহণে তাহাদের রুচি নাই। বসভেশ্বর মহাউদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, মা-হারা হইয়া কিরূপে ইহারা প্রাণে বাঁচিবে? দুই চোখ তাঁহার জলে ভরিয়া উঠে।

ব্যগ্রস্বরে পরিচারকদের কহেন, "এক্ষুনি তোমরা সবাই চোরদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো। তোমরা ফিরে না আসা অবধি আমার পক্ষে আহার নিদ্রা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। চোরদের ঠিকানা পেলে তক্ষুনি এই বৎসগুলোকে তাদের মায়েদের কাছে পৌঁছে দাও।"

আদেশমতো সন্ধান তখনই শুরু হইয়া যায়। তস্করদের ধরিয়া আনা হইলে বসভেশ্বর কহেন, "ভাই দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তা বজায় থাক। তোমাদের ঘরে দধি দুগ্ধের সরবরাহ বেড়ে যাক, শিবভক্তদের সেবা হোক বোধ হয় এটাই প্রভুর ইচ্ছা। তোমরা গাভীগুলো রেখেই দাও আর এই বৎসগুলোকে এখনি নিয়ে যাও তোমাদের ঘরে। আহা। মা-হারা হয়ে কি দুঃখে এরা রয়েছে।"

শিবপ্রতিম সাধকের এই অদ্ভুত আচরণে তস্করদের চোখে জল আসিয়া যায়। বসভেশ্বরের চরণে শরণ মাগিয়া সেইদিন হইতেই তাহারা শুরু করে উন্নততর জীবন। কৃপালু বসভেশ্বর উত্তরকালে ইহাদের লিঙ্গদীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের নেতার পদে বসভেশ্বর এখন সমাসীন। এই

সম্প্রদায়ের জন্য দরকার সুসম্বদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের। সাধনা ও সিদ্ধির ক্রমিক পর্যায় নির্ণয় করা, পুরাতন শৈবপন্থার সংস্কার-সাধন, নবদীক্ষিত বীরশৈবদের আচার বিচার ও নৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ—এই সব গুরুত্বপূর্ণ কর্ম তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে।

তাঁহার নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির সহিত, সংস্কারপন্থী আদর্শ ও আচরণের সহিত যুক্ত হয় অনুভব-মণ্ডপে আগত শিবভক্ত ও সিদ্ধযোগীদের মতবাদ। এই সংযুক্তি ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়া বীরশৈব সম্প্রদায়ের ভাবধারা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, আচার-ব্যবহারের নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

বসভেশ্বরের ধর্ম-আন্দোলনের প্রধান সহায়ক তাঁহার প্রতিভাধর ভাগিনেয় চেন্ন-বসভ, বালককাল হইতেই চেন্ন বসভের জীবনে দেখা দেয় আত্মিক মুক্তির ব্যাকুলতা, শৈব দর্শন ও শৈব যোগসাধনায় অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন। বীরশৈববাদের প্রচার ও সংস্কারধর্মী মতবাদ সংস্থাপনে তিনি মাতুল বসভেশ্বরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন।

এই সঙ্গে তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি করেন, শোলাপুরের ভক্ত সিদ্ধরাম, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও উচ্চকোটির শৈব সাধক মদিভাল মচ্ছইয় প্রভৃতি। বসভেশ্বরের ধর্ম-আন্দোলনের ইঁহারা শক্তি সঞ্চয় করেন, দিকে দিকে ছড়াইয়া দেন তাঁহার বাণী ও আদর্শবাদ। সর্বোপরি তাঁহার বীরশৈববাদ উপকৃত হয় এবং সাধক ও দার্শনিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভুর আশীর্বাদ ও সহযোগিতার ফলে।

বসভেশ্বরের ধর্ম আন্দোলনে সিদ্ধ নারী সাধিকাদের অবদান কম নয়। তাঁহার অনুভব-মণ্ডপে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদবৈষম্য যেমন ছিল না, তেমনি পুরুষ ও নারীর ছিল সমান মর্যাদা এবং সমান অধিকার। ধর্মীয় উদারতার দিক দিয়া এটি বসভের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। বহুকাল আগে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার মণ্ডলীতে নারী সাধিকাদের প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা নারীদের এই অধিকার দানে তেমন ইচ্ছুক ছিলেন না। বসভেশ্বরের বেলায় কিন্তু দেখি, নারীদের সমমর্যাদা দিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং সাধনজীবন গঠনের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে তাঁহার অসামান্য নিষ্ঠা ও তৎপরতা।

বীরশৈব সাধিকা লকম্মা ছিলেন ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ। কল্যাণনগরে সাধক বসভেশ্বরের তখন বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। প্রতিদিন তাঁহার অনুভব-মণ্ডপে শিবভক্ত ও শিবযোগীদের সমাবেশ হয় ধর্মালাপ ও বিচার বিশ্লেষণের শেষে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী আনন্দ কলরবের মধ্যে ভোজনপর্ব সমাধা করে।

লকম্মা ও তাঁহার স্বামী একদিন কৌতূহল ভরে অনুভব-মণ্ডপে আসিয়া হাজির হন। বসভ তখন শিবযোগীদের কাছে কায়ক-এর তত্ত্ব বুঝাইতেছেন। কি করিয়া মানব-জীবন ও ব্যবহারিক কর্মকে ইষ্টদেব শিবের চরণে উৎসর্গ করিতে হয়, কি করিয়া গার্হস্থ্য জীবনকে পরিণত করা যায় পুণ্যময় কৈলাসরূপে, তাহার ব্যাখ্যান চলিতেছে। বসভের ব্যক্তিত্বে ও আন্তরিকতায় লকম্মা ও তাঁহার স্বামী মুগ্ধ হইলেন, ভাষণ শেষে আশ্রয় নিলেন তাঁহার চরণতলে, বসভেশ্বরের কাছে লিঙ্গদীক্ষা নিয়া এই দম্পতি শুরু করিলেন ত্যাগ তিতিক্ষাময় সাধনা।

লকম্মার বৈরাগ্য ও সংযম ছিল অসাধারণ। কথিত আছে, স্বামী স্ত্রী উভয়ে

প্রতিদিন যে নির্দিষ্ট সংখ্যক তণ্ডুল ভোজনের জন্য রন্ধন করিতেন, তাহা অপেক্ষা বেশী হইলে লক্ষ্মা তৎক্ষণাৎ স্বামীকে দিয়া ভিখারীদের মধ্যে উহা বিতরণ করাইতেন। পরবর্তী বেলার জন্য একটি তণ্ডুলকণাও তিনি নিজের কুটিরে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে দিতেন না।

বসভেশ্বর নারী-ভক্তশিষ্যদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন অক্কা মহাদেবী।[১] এই শিষ্যার প্রশংসায় বসভেশ্বর নিজে ছিলেন পঞ্চমুখ। তাছাড়া, তাঁহার শিষ্য ও সহকর্মী সিদ্ধরাম, মাদিভায়ল, চেন্ন-বসভ হইতে শুরু করিয়া যোগীশ্রেষ্ঠ অল্লাম প্রভু অবধি অনেকেই এই সাধিকার যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

মহাদেবী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের একটি রাজ্যের রাজা কৌষিকের মহিষী। তরুণ বয়স হইতেই এই ভক্তিমতি মহিলার জীবনে আসে অজানা-লোকের আহ্বান, শিব-বিগ্রহের সেবা-পূজার জন্য অন্তরে জাগে আকুল আগ্রহ। স্বামী কিন্তু স্ত্রীর ধর্মানুরাগ তেমন সুচক্ষে দেখেন নাই; সুযোগ পাইলেই শিবের নিন্দা সমালোচনায় তিনি মুখর হইয়া উঠিতেন।

মহাদেবীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই, ইষ্টদর্শনের আকাঙ্ক্ষা বরং দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিতেই থাকে। ইতিমধ্যে হঠাৎ রাজভবনে আগমন ঘটে এক বীরশৈব সন্ন্যাসীর। ইঁহার কাছে বসভের কথা, কল্যাণের অনুভব-মণ্ডপ ও বীরশৈবদের সমাবেশের কথা তিনি জানিতে পারেন। প্রাণে জাগিয়া উঠে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ভিতর হইতে বার বার কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতে থাকে—"ওরে, মহাসাধক বসভেশ্বরই তোর চিহ্নিত গুরু, তাঁর কৃপা পেলে তবেই পূর্ণ হবে তোর ইষ্ট দর্শনের সঙ্কল্প।"

অতঃপর আর একদিনও মহাদেবী স্বামীর প্রাসাদে বাস করেন নাই। গোপনে রাজ-অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া চলেন কল্যাণ নগরীর দিকে। প্রভু বসভেশ্বরের চরণে স্থান না নেওয়া অবধি জীবনে তাঁহার শান্তি নাই, স্বস্তি নাই।

তাঁহার মতো রূপসী তরুণীর পক্ষে একাকিনী দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা সহজ কথা নয়। বিঘ্ন বিপদ, দুঃখ দুর্দশা, দিনের পর দিন এ সময়ে কম আসে নাই। কিন্তু মহাদেবী যে ইষ্টদেবের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন, তাঁহারই কৃপায় সফল হইল এই অভিযাত্রা। অচিরে বসভেশ্বরের দর্শন তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

তীব্র মুমুক্ষা ও আর্তি নিয়া মহাদেবী গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সর্বস্ব ছাড়িয়াছেন সর্বময় পরম শিবকে লাভ করার জন্য। ত্যাগ-বৈরাগ্যময় সাধনার প্রস্তুতি তাঁহার জীবনে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ঠা ও পবিত্রতায় ভরা এই নারী সাধিকাকে দর্শন মাত্রেই বসভেশ্বর তাঁহাকে সেদিন মা বলিয়া ডাকিলেন, দিলেন তাঁহাকে শৈব যোগের নিগূঢ় সাধনা। উত্তরকালে এই তরুণী শিষ্যার সঙ্গে তিনি ব্যবহার করিতেন অল্পবয়স্ক পুত্রেরই মতো।

দিব্যদৃষ্টি সহায়ে বসভ বুঝিলেন, এই নবাগতা শিষ্যার সাধন-জীবনে রহিয়াছে

---

১ সরোজিনী শিনুরি: বসভ অ্যাণ্ড উওম্যান হুড, সেণ্টিনারী মেমোরিয়াল ভল্যুম, গবর্নমেণ্ট অব মাইসোর।

বিবাট সম্ভাবনা। তাই শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনতত্ত্ব দুই-ই তিনি অকৃপণ কবে ঢালিয়া দিলেন তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব আধাবে। অল্পকাল মধ্যে অক্কা মহাদেবী বীবশৈব সাধনার এক স্তম্ভবূপে গণ্য হন, চিহ্নিত হন এক সিদ্ধ সাধিকা বূপে। শত শত নাবী তাঁহার সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভে কৃতার্থ হয।

এই শিষ্যার সিদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বসভেশ্বর ববাববই অতি উচ্চ ধাবণা পোষণ কবিতেন। মহাদেবী যে উচ্চকোটিব সাধিকা তাহা সবাইকে জানানোব জন্য সেবাব তিনি এক কৌশল অবলম্বন কবেন।

অল্লাম প্রভু এ সমযে কয়দিনেব জনা কল্যাণে আসিযাছেন। অনুভব-মণ্ডপে তাই ভক্ত, যোগী ও সাধু-সন্ন্যাসীব ভিড়েব অন্ত নাই। বসভেশ্বব সেদিন অক্কা মহাদেবীকে এই বিবাট গুণীজন সমাবেশেব সমক্ষে দাঁড়কবাইয়া দেন। আব অল্লাম প্রভুকে অনুবোধ কবেন, তাঁহাব এই নবীনা শিষ্যাব সাধনা ও সিদ্ধি কোন্ স্তবে অবস্থিত তাহা যেন তিনি নির্ণয কবিযা দেন।

অল্লাম ও অপবাপব যোগীদেব প্রশ্নেব যথাযথ উত্তব দিযা অক্কা মহাদেবী সবাইকে সেদিন বিস্মিত কবেন। অতঃপব শুধু বীবশৈব মহলেই নয, দাক্ষিণাত্যেব বিভিন্ন ধর্মমণ্ডলীতে এই মহীযসী নাবী সাধিকাব খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে।

বসভেশ্ববেব কাছে ধনী নির্ধন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রী-পুবুবেব যেমন ভেদবৈষম্য নাই। তেমনি নাই নবীন প্রবীণ সাধকদেব। অনুভব-মণ্ডপেব সভায নিত্য নূতন কত সাধনেচ্ছু ভক্তেবা আসে। বসভেশ্বব অপাব প্রেম ও স্নেহ নিযা সাহায্য কবেন তাঁহাদেব আত্মিক জীবন গঠনে। এই সমযে বেদী হইতে বীবশৈবদেব নির্দেশ দিতে গিযা যে সব বচন তিনি বচনা কবেন, উত্তবকালে সাধকেব কাছে তাহা গণ্য হইযা বহিযাছে অমূল্য সম্পদবূপে।

বীবশৈব বা লিঙ্গাযেৎবা কণ্ঠে লিঙ্গ-ধাবণ কবে দীক্ষাব দিন হইতে মন্দিব বা বিগ্রহ পূজা তাঁহাদেব মধ্যে প্রচলিত নাই। এই সম্পর্কিত একটি 'বচনে' বীবশৈবদের মতবাদ পবিস্ফুট :

যাদেব আছে বিপুল বিত্ত বিভব
হে প্রভু, তাবা তৈবী কবুক তোমাব মন্দিব,
কিন্তু আমাব মত বিত্তহীন তা কববে কি দিযে ?
আমাব নিজেব চবণ দুইটি হচ্ছে স্তম্ভ,
তাব ওপব স্থাপিত বযেছে আমাব দেহবূপ মন্দিব—
আমাব শিবোদেশে এই মন্দিবেব গম্বুজ।
হে প্রভু ইঁট কাঠ দিযে গড়া যে মন্দিব
তাতো একদিন ধসে পড়ে গুঁড়ো হযে যায ;
কিন্তু আমাব এই সিদ্ধ কাযা
চলমান মন্দিব বূপে ছড়াবে তোমাব দিব্য নাম,
বেঁচে থাকবে, আব অটুট থাকবে দীর্ঘকাল।

বীবশৈবদেব সাধনায কাযকেব কথা, ইষ্টদেব শিবেব চবণে নিবেদিন কর্মেব কথা বহিযাছে। কিন্তু কাযাকে ক্লিষ্ট কবিয়া যে সাধনা অনুষ্ঠিত হয তাহাব কথা নাই।

দেহের উপর নির্যাতন না চালাইয়া মনকে নিয়ন্ত্রিত করো, সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করো—ইহাই যে প্রভু সঙ্গমেশ্বর চাহেন। তাই বসভেশ্বর বলিতেছেন

প্রকাণ্ড এই উই-এর ঢিবির নিচে
লুকিয়ে আছে বিষাক্ত গোখরো সাপ,
উই ঢিবির ওপরে যদি করো লাঠির আঘাত
গভীরে লুকানো সাপ হয় কি নিহত ?
তেমনি বাইরের এই দেহের অস্থি মজ্জা মাংসে
যতই চালাও কৃচ্ছ্র আর নির্যাতন—
হৃদয়ের যদি না হয় কোনো শোধন,
পাপ আর অজ্ঞানতার না হয় মৃত্যু,
তবে মিলবে না আমার প্রভুর অনুমতি,
এই দেহের নিপীড়ন করবেন না তো সমর্থন।

নবীন শিষ্যেরা বসভকে প্রশ্ন করেন, "প্রভু, পিচ্ছিল মনকে নিয়ে তো আর পারছিনে। ইষ্টধ্যানে একে কেন্দ্রীভূত করা যে এত দুঃসাধ্য তা তো জানতেম না। এর প্রতিবিধান কি বলুন তো।"

এই সব নবীন শিষ্যদের সতর্ক করার জন্য বসভেশ্বর একটি 'বচনে' বলিতেছেন

মন বশ করার কথা বলছো, হে সাধক,
হিংস্র ক্রূর কেউটে সাপের মত যে এই মন।
যতক্ষণ থাকে সাপুড়ের মোহনিয়া বাঁশীর বশ,
ততক্ষণ হিংসা আর খলতা যায় ভুলে,
সুরে সুরে ফণা নাচিয়ে কত খেলাই না খেলে,
আর ক্রীতদাসের মত করে সে আত্মসমর্পণ।
কিন্তু সাপুড়ের একটি মুহূর্তের ভুল
এনে দেয় অভাবনীয় বিপদ আর বিনষ্টি,
ক্ষিপ্রবেগে কেউটে হঠাৎ ছোবল মেরে বসে
ঢেলে দেয় তার প্রাণঘাতী বিষ।
তাই জানাও তোমার আকুল প্রার্থনা,
বল, হে মোর প্রভু হে কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর
সাধন-জীবন আমার সদাই যেন থাকে
সদা সতর্ক, থাকে যেন সংযমের কঠিন বন্ধনে—
মন ভুজঙ্গ তাকে যেন না করে দংশন।

দুর্বল, নিষ্ঠাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ সাধনা ও সিদ্ধির কথা ভাবিয়া ভয় পায়। ক্ষুদ্র শক্তি নিয়া অনাদি অনন্ত দেবাদিদেবকে কি কখনো লাভ করা যায়, এই প্রশ্ন তাঁহার আত্মিক অভিযাত্রাকে সংশয়াকুল করিয়া তোলে। এই সব সাধকের জন্য বসভেশ্বর উচ্চারণ করেন আশ্বাসের বাণী :

ক্ষুদ্র বৃহতের প্রশ্ন নিয়ে
কেন শুধু নিজেকে করো হতাশ আর উদ্‌ভ্রান্ত ?

বিশালকায় হস্তী—বিপুল সামর্থ্য তার দেহে,
অথচ দ্যাখো, অঙ্গুলি প্রমাণ একটি অঙ্কুশ
অবলীলায় করছে তার নিয়ন্ত্রণ।
আকারে ক্ষুদ্র বটে এই অঙ্কুশ
কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণের পরিধি কি বিস্তৃত।
গগনচুম্বী প্রস্তরীভূত ঐ যে পাহাড়,
ওর গর্ভে রয়েছে ক্ষুদ্র এক টুকরো হীরে
তীব্র দ্যুতির ছটায় করছে ঝলমল,
আকারে ক্ষুদ্রতা, না দ্যুতির ঝলক্—
কি দিয়ে করবে তার মূল্য নিরূপণ?
দূরবিস্তারী সূচীভেদ্য অন্ধকার—
ক্ষুদ্র একটি মোমের আলোয় মুহূর্তে হয় দূর,
এই মোমের আলো কি তুচ্ছ হবে ক্ষুদ্র বলে?
হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গম দেব,
ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ যে মন আমার
তোমার মত ভূমাকে, বিভুকে ধারণ করে হয় ধন্য—
সে মনকে কি ক্ষুদ্র বলে করবো হেলা?

এক সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠীর পুত্র বসভেশ্বরের কাছ হইতে নিয়াছেন লিঙ্গ-দীক্ষা। তারপর শুরু করিয়াছেন তাঁহার আত্মিক সাধনা। এই সঙ্গে বীরশৈব আন্দোলনকে দিকে দিকে বিস্তারিত করার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ও তৎপরতার অবধি নাই। নিজের প্রচুর ধন-সম্পদ ও লোকলস্করও এই মহান্ কর্মে তিনি নিয়োজিত করিয়াছেন। কিন্তু সাধন-জীবনে তেমন কিছু উন্নতি এযাবৎ তাঁহার হইতেছে না। অনুভব-মণ্ডপের সম্মেলনে একদিন এই শিষ্যটি তাঁহার এই সাধনদৈন্যের কথা নিয়া খেদোক্তি করিলেন। বসভেশ্বর কহিলেন:

হাতীর পিঠে কিংখাব-মোড়া হাওদায় বসে
চলেছো তুমি রাজার মতো,
শরীরে লেপন করেছো সুগন্ধী প্রসাধন।
কিন্তু এই রাজকীয় বিলাসিতার ভিড়ে
সত্যকে জানবে কি ক'রে বলতো?
অহং-এর বিলয়ে নিহিত রয়েছে পরমধর্ম—
সে ধর্মের বীজ তো আজও করনি বপন?
অহমিকার হাতীতে চড়ে স্ফীত হয়েছো গর্বে,
এই গর্বই তোমায় ফেলবে টেনে ভূমিতলে।
প্রভু সঙ্গমেশ্বরকে জানতে চাওনি তুমি—
জানতে চেয়েছো নরকের আস্বাদ।

হিংসা, পাপ আর কদাচারে সারা দেশ তখন ভরিয়া গিয়াছে। সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য, সংস্কারবাদী নূতন ধর্ম ও সংস্কৃতি গঠনের জন্য বহু তরুণ এ সময়ে

উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু বসভেশ্বরের মূল কথা—আগে নিজেকে করো শুদ্ধ ও সুপবিত্র মোহাচ্ছন্ন মনকে করাও মুক্তিস্নান, তারপর শিবশক্তিতে শক্তিমান হইয়া অগ্রসর হও জগতের কল্যাণে। তিনি বলিতেছেন :

কুটিলতার জটিল ঘৃণ্য জালে
ছেয়ে গেছে আমাদের এই পৃথিবী—
সেই জাল তুমি ছিন্ন করতে চাও,
চাও এই পৃথিবীকে সরল করতে, সুন্দর করতে ?
কিন্তু কে তুমি ? কে দিয়েছে তোমার এ কর্তৃত্ব ?
নিজের জটিলতাকে আগে সরল করে নাও,
দেহ আর মনকে শুদ্ধ করো, ঋজু করো—
তবে তো করবে অপরকে কলঙ্কমুক্ত।
প্রভু সঙ্গমেশ্বরের কাছে কপটতার নেই স্থান,
নিজের জন্য সবার আগে করো অশ্রু বিসর্জন
কুটিলতা আর মলিনতা দাও ধুয়ে মুছে,
তবেই প্রভুর কাছ থেকে পাবে অনুমতি,
অপরের কলঙ্ক তখন করবে বিমোচন।

সিদ্ধ শিবযোগী অল্লাম প্রভুর শ্রীমুখ হইতে বসভেশ্বর প্রাপ্ত হইয়াছেন পরাভক্তি ও মহা প্রেমের পরমতত্ত্ব। এই তত্ত্বটি বীরশৈব সাধকদের অন্তরপটে সদাই তিনি উৎকীর্ণ করিয়া দিতেন। কহিতেন, "ইষ্টের প্রতি প্রেম থাকবে সারা প্রাণমন জুড়ে, সারা জীবন জুড়ে, তবে তো আত্মিক সাধনায় আসবে সিদ্ধি, হবে পরম প্রাপ্তি। এই তত্ত্বটি বসভের একটি 'বচনে' চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে[১] :

খেলার আনন্দে নিশ্চয়ই মেতে ওঠো তুমি,
গান গাও সুরে ছন্দে তাল-লয়ে,
গ্রন্থপাঠ হয়তো এনে দেয় কতই পাণ্ডিত্য,
কিন্তু সব কিছুই যে হয়ে যায় ব্যর্থ,
যদি না দাসোহং ব'লে একান্ত নিষ্ঠায়
আশ্রয় নাও প্রভুর রাতুল চরণে।
পেখম ধরে ময়ূরী কত নাচই তো নাচে,
বীণার তারে বেজে ওঠে কতনা মধু ঝংকার
তোতার কণ্ঠে কতনা শেখানো বুলি ঝরে,
কিন্তু তাতে হৃদয়ের প্রেমের স্পর্শ কোথায় ?
প্রাণে তোমার প্রেমের বাতি জ্বালিয়ে
যদি না ডাকো আকুল হয়ে, তবে কি করে
প্রভু তোমায় করবেন অঙ্গীকার ?

বসভেশ্বর এখন সাধনা ও কর্মজীবনের উত্তুঙ্গ শিখরে অধিষ্ঠিত। তাঁহার বীর-

১ সিলেক্টেড্ সেইং অব বসভ : বাণী

শৈব মতবাদ দেশের অসংখ্য পণ্ডিত ও সাধকের সমর্থন লাভ করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শিব-যোগী অল্লাম-প্রভুর মূল্যবান সহযোগিতা এবং অনুভব-মণ্ডপের অধ্যক্ষতাও বসভেশ্বরের খ্যাতি প্রতিপত্তি কম বাড়ায় নাই। লক্ষ লক্ষ সংস্কারপন্থী শিবভক্ত এখন তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে, শিবকল্প গৃহী-যোগীরূপে দিতেছে তাঁহাকে অভাবনীয় শ্রদ্ধা ও সম্মান।

বলা বাহুল্য, বসভের এই মর্যাদা ও জনপ্রিয়তার সনাতনী শৈবেরা মোটেই খুশী নয়। বরং তাহাদের ঈর্ষা দিন দিন আরো বাড়িতেছে। রাজা বিজ্জলও আজকাল মন্ত্রী বসভেশ্বরের অসাধারণ প্রতিপত্তিতে বেশ কিছুটা চিন্তিত। তাছাড়া, ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্যকে একাকার করিয়া দিয়া বসভ বেদাচার বিরোধী কাজ করিতেছেন, ইহাও রাজার মনঃপূত নয়। অথচ হঠাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত করাও সমীচীন হইবে না। জনসাধারণের বিশাল অংশ তাঁহাকে দেবতার মতো জ্ঞান করে। তাঁহার বা তাঁহার ধর্মান্দোলনের উপর কোনো হস্তক্ষেপ এইসব ভক্ত অনুগামীরা সহ্য করিবে না। বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ হয়তো শুরু করিয়া দিবে। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তইলোকে সিংহাসনচ্যুত করার পর হইতেই অমাত্য ও সচিবদের মধ্যে একটা বিরোধী দল গজাইয়া উঠিয়াছে। গোপনে বেশ কিছুটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, এ সংবাদও বিজ্জলের অজানা নয়। তাই এ সময়ে বসভেশ্বরকে ঘাঁটানো কূটনীতির দিক্ দিয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁহার অনুগামী বিপুল সংখ্যক বীরশৈবদের ক্ষেপাইয়া তোলাও হইবে এক চরম নির্বুদ্ধিতা। তাই বিজ্জল এখনই তাঁহাকে আঘাত করিতে ইচ্ছুক নন। অদূর ভবিষ্যতে কোনো সময়ে এ সুযোগ হয়তো আসিবে, এই প্রতীক্ষায়ই দিন গুণিতেছেন।

এ সময়ে বসভেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহার ফল হয় দূরপ্রসারী।

কম্বলিয় নাগিদেব নামে অন্ত্যজ সাধক এক শহরের প্রান্তে বাস করিতেন। একজন সাধননিষ্ঠ বীরশৈব বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। অনুভব-মণ্ডপের সভায় প্রবীণ শৈব সাধকেরা ইহার মতামতের গুরুত্ব দিতেন, সবাই তাঁহাকে দেখিতেন, সম্মানের চোখে।

ঘুরিতে ঘুরিতে বসভ সেদিন নাগিদেবের বাড়ির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত। একটি ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী সেখানে সমবেত হইয়াছে এবং শিব-উপাসনার নানা নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ চলিয়াছে।

বসভেশ্বরকে দেখিয়া গৃহস্বামী ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা তো মহা আনন্দিত। সোৎসাহে অভ্যর্থনা জানাইয়া তাঁহাকে গৃহের ভিতরে আনা হইল। শ্রদ্ধাভরে তাঁহার উপদেশ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে ধন্য হইলেন।

বেলা বাড়িয়া গিয়াছে। বসভ এবার ভক্তদের কাছে বিদায় নিবেন। নাগিদেব যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, আমাদের পরম সৌভাগ্য, এই দীনের কুটিরে আপনার মতো সিদ্ধ মহাপুরুষের পায়ের ধূলি পড়লো। আজ এখানে ইষ্টগোষ্ঠী করা হয়েছে, প্রসাদান্ন নিবেদন করা হয়েছে ইষ্টদেবকে। আমাদের একান্ত ইচ্ছে, আপনি এখানে প্রসাদ গ্রহণ করুন। অবশ্য যদি আপনার এতে কোনো আপত্তি না থাকে।"

"আপত্তির তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, নাগিদেব। জান তো, শিবভক্ত মাত্রেই আমার চোখে 'জঙ্গম' মহেশ্বর। শিবের মন্দির, শিবের বিগ্রহ প্রতিটি ভক্তসাধকের দেহে ও অন্তরে প্রতিষ্ঠিত - এ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আর এই বিশ্বাসই তো আমাদের সাধনার অঙ্গ।"

ভক্ত শিষ্যদের আনন্দের অবধি নাই। বসভকে নিয়া সবাই পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসিয়া যান, আনন্দ কলরব আর জয়ধ্বনিতে অন্ত্যজ পাড়া মুখরিত হইয়া উঠে।

বসভেশ্বরের বিরোধী কয়েক ব্যক্তি নিকটেই ছিলেন। ছুটিয়া গিয়া তাঁহারা রাজা বিজ্জলের গুরু আচার্য নারায়ণ ভট্টকে ইহার বিবরণ দিলেন। সনাতন শৈব মতের ধারক-বাহক ক্রমিত, কুচিগ প্রভৃতি বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধকদের কাছেও তখনি সংবাদ পাঠানো হইল। বসভেশ্বরের বিরোধী একদল প্রতিপত্তিশালী রাজ-অমাত্যও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সবাই মিলিয়া রাজা বিজ্জলের প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত।

উত্তেজিত কণ্ঠে তাঁহারা কহিলেন, "মহারাজ, আপনি নিজ হাতে রাজদণ্ড গ্রহণ করার পর থেকে, সারা দেশে আশা ভরসা জেগে উঠেছে। আপনাদের প্রাচীন কলচুরীয় বংশ যেমনি শিবভক্ত তেমনি বেদাচার ও বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষণে তৎপর। কিন্তু এ রাজ্যে ধর্মের যে সব অনাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে তো কলচুরী বংশের কল্যাণ হবে না।"

"আপনারা আমায় খুলে বলুন, কিসের অনাচার, আর কোথায় এটা ঘটেছে।"

রাজগুরু নারায়ণ ভট্ট এবার দৃঢ়কণ্ঠে কহেন, 'মহারাজ, পাপমতি বসভেশ্বর যে ধর্ম সমাজ সব কিছু উচ্ছন্ন দিতে বসেছে। এর কোনো প্রতিকার কি আপনি করবেন না?"

"বসভেশ্বর ধর্ম সংস্কারে মত্ত, যাকে তাকে দীক্ষা দিচ্ছে। এ তো সবাই আমরা জানি। কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঘটলো যে দলবদ্ধ হয়ে আপনারা ছুটে এসেছেন?" গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেন রাজা বিজ্জল।

"সে কথা বলার জন্যই তো আমরা এসেছি। শুনুন মহারাজ। বসভেশ্বর তার নিজ গৃহে, নিজের অনুভব-মন্ডপে অন্ত্যজ অস্পৃশ্যদের নিয়ে কত কিছু পাপাচারই তো ক'রে যাচ্ছে, তাতে আমরা এতকাল কিছু বলি নি। কিন্তু এমন সাহস হয়েছে তার যে অবলীলায় নগরের যত্রতত্র অধর্ম অনাচার সে ক'রে যাচ্ছে।"

"ব্যাপার কি খুলে বলুন আচার্যদেব।"

"মহারাজ নগরের প্রান্তে, নাগিদেব নামে এক অস্পৃশ্য ব্যক্তির ঘরে গিয়ে বসভেশ্বর সবার সঙ্গে বসে ভোজন করেছে। প্রকাশ্যে বহু লোকের দৃষ্টির সমুখেই একাজ সে করেছে। অথচ সে জানে, রাজ্যের রাজা বেদাচার মানেন, জাতিভেদ বর্ণভেদ মেনে চলেন। কোন্ সাহসে প্রকাশ্যে সে তার বিরোধিতা করছে? এতে আপনার সনাতন শৈব ধর্মকে সে যেমন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে, তেমনি অপমান করেছে আপনাকে। না —মহারাজ, এ অন্যায়ের শাস্তি আপনাকে দিতে হবে কঠোরভাবে। নইলে লোকে বুঝবে, আপনি দুর্বল হস্তে শাসন করছেন।"

রাজা বিজ্জল মন দিয়া কথাগুলি শুনিলেন, তারপর ধীরস্বরে কহিলেন, "আচার্য-দেব, আপনি ও রাজপণ্ডিতেরা এখানে রয়েছেন। বিশিষ্ট অমাত্যদেরও আমি দেখতে

পাচ্ছি। আপনারা সবাই অতি বিশ্বস্ত, আমার কল্যাণের জন্যও সদা যত্নবান। তাই খোলাখুলিভাবেই এ ব্যাপারটা আমি আলোচনা করতে চাই।"

"হ্যাঁ, তাই করুন মহারাজ, সেটাই তো আমাদের কাম্য।"

"তবে শুনুন আপনারা। বসভেশ্বরের কোনো কথাই আমার অজানা নাই। তীক্ষ্ম সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আমি তাকে দিনের পর দিন লক্ষ্য ক'রে আসছি, আজকের ঘটনার সব বিবরণও চরমুখে আমি শুনেছি।'

"তবে সত্বর তার দণ্ডবিধান করুন।"

"হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা একটা করতেই হবে, তা ঠিক। কিন্তু আজই, এখনই নয়।"

"সে কি মহারাজ, আপনি কি বসভেশ্বরের চেয়ে শক্তিমান্ নন? এ রাজ্যের রাজদণ্ড কি আপনার হাতে নেই। পাপাচার আর অন্যায়ের সব কথা জেনেও আপনি চুপ ক'রে তা সহ্য করবেন—নারায়ণ ভট্ট ক্রুদ্ধ কণ্ঠে, এক নিঃশ্বাসে কথা কয়টি বলেন।

"তবে শুনুন, রাজদণ্ড আমি ধারণ করি এবং শক্ত হাতেই করি। এ কয় বৎসরে কল্যাণ রাজ্যকে সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমি অজেয় ক'রে তুলেছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো তা ভালোভাবেই জানে। বসভেশ্বরকে সমুচিত দণ্ড দেবার শক্তি আমার নিশ্চয় আছে।"

"তবে?"

"সেই কথাই তো আমি বুঝিয়ে বলছি। বসভেশ্বর শুধু আমার একজন সুদক্ষ মন্ত্রী হলে কথা ছিল না। কিন্তু সে এখন কানাড়া রাজ্যের, শুধু কানাড়া কেন সারা দাক্ষিণাত্যের, অন্যতম প্রধান ধর্মনেতা। ধীরে ধীরে সে অতি মাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ আজ তাকে সম্মান করে, ভালবাসে। তার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত। বসভেশ্বরকে কঠোর দণ্ড দিলে, গণবিক্ষোভ ও গণবিদ্রোহের আশঙ্কা রয়েছে।"

"তবে কি তাঁকে আপনি শাস্তি দেবেন না, আর তার শক্তি দিন দিন বেড়েই চলবে?' —হতাশভাবে বলে উঠেন আচার্য।

"আঘাত আমি তার ওপর হানবোই। কিন্তু সে হবে চরম আঘাত। কূটনীতি ও প্রশাসনের দিক দিয়ে বসভেশ্বরের প্রভাব প্রতিপত্তির এই বৃদ্ধি মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু এখনই তাঁর দণ্ড বিধান ক'রে জটিলতার সৃষ্টি করতে আমি চাই না। আপনারা জানেন চালুক্যরাজ তইলো-তৃতীয়ের দুর্বল শাসনে সারা দেশ খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছিল, ধর্ম যাচ্ছিল রসাতলে। নিজে এ সিংহাসন ভোগ করবো বলে আমি তার হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিই নি, নিয়েছি দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য।"

"মহারাজ, তা তো বটেই"—পণ্ডিত ও অমাত্যেরা তোষামোদের সুরে বলিয়া উঠেন।

"কিন্তু এই সহজ সত্যটি রাজ্যের একদল লোক এখনো স্বীকার ক'রে নিতে পারছে না। গোপনে সদাই তারা ষড়যন্ত্র করছে আমার রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য। ঠিক এ সময়ে বসভেশ্বর ও তার বৃহৎ সংগঠনকে বিদ্রোহী ক'রে তোলা যুক্তিযুক্ত হবে না। বসভেশ্বরকে আমি অবশ্যই ডেকে পাঠাবো। অস্পৃশ্যদের নিয়ে প্রকাশ্যে যেভাবে সে চলাচলি করছে সেজন্য কঠোর ভাষায় তাকে তিরস্কার করবো। সতর্ক

ক'রে দেবো, আর যেন এই অনাচার সে বা তার সংস্কারপন্থী বীরশৈবেরা না করে। অন্যথায় কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে।"

আচার্য ও তাঁহার দলবল ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিছু পরেই বসভেশ্বরকে রাজার সকাশে ডাকিয়া আনা হইল। বিজ্জল তাঁহাকে কাছে বসিতেও দিলেন না, দূরস্থিত এক আসনে স্থান গ্রহণ করিতে বলিলেন। তিনি যেন এক অস্পৃশ্য।

এবার রাজা বিরক্তি ও উষ্মার সঙ্গে প্রশ্ন করেন, "বসভ, এ তোমার কি দুর্মতি, বলতো? ঘরে বসে ভাঙ্গী, চামার, চণ্ডালদের নিয়ে কত পাপাচারই তো করছো। কিন্তু অস্পৃশ্যের সঙ্গে প্রকাশ্যে তুমি পঙ্‌ক্তি ভোজন করলে কোন্ সাহসে। এতে যে আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম ভেঙে পড়বে, প্রজারা হয়ে উঠবে দুর্নীতিপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারী। রাজশাসনের ভয় যাবে ভেঙে। তোমার এ অপরাধ অমার্জনীয়। তাছাড়া, অস্পৃশ্যের সঙ্গে একসাথে বসে খেয়েছো, তাই তোমাকেই আমি গণ্য করছি অস্পৃশ্য বলে। রাজা ও তাঁর মন্ত্রীর ভেতর এই ব্যবধান তুমিই সৃষ্টি করলে, বসভ, তোমার হঠকারিতা দিয়ে।"

বসভেশ্বর এবার শান্ত স্বরে উত্তর দেন, "মহারাজ, আমার ধর্মীয় মতবাদ তো মোটেই আপনার অজানা নয়। আমার আচার-ব্যবহারে গোপনতা কিছু নেই, রাজা ও ধর্মের বিরোধিতা করা তো দূরের কথা তাদের সেবাতেই আমি নিযুক্ত রয়েছি। কিন্তু শিবের জগতে শিব-সন্তানদের মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকবে, এ আমি চাইনে। ব্রাহ্মণ-শূদ্র সবাই মিলে হবে একটি একান্নবর্তী পরিবার, পাপ-তাপে ভরা এই পৃথিবীকে ক'রে তুলবে কৈলাসধাম। এটা আমার নবতর শৈবধর্মের মূল কথা। এতে পাপাচার কিছুমাত্র নেই, কারুর অকল্যাণের প্রয়াসও নেই।"

"না বসভ, তুমি এসব অবাস্তব, ভাবাবেগময় কথায় আমায় বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তোমার সংস্কারপন্থী ধর্মে গণ-বিদ্রোহের বীজ নিহিত রয়েছে। বেদধর্ম ও বেদাচার ধ্বংস করবার কু-অভিসন্ধি নিয়েই তুমি কাজ করছো, অন্ত্যজদের সমর্থনে নিজের শক্তি বাড়িয়ে তোলার স্বপ্ন দেখছো।

"এ আপনি কি বলছেন, মহারাজ?"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আর শোন, এর ফল কিন্তু তোমার পক্ষে মোটেই ভালো হবে না। যাক্, আর যা-ই করো, প্রকাশ্যে অন্ত্যজদের সঙ্গে বসে তুমি বা তোমার লোকেরা যেন কখনো ভোজন ক'রো না, সমাজের বুকে স্বেচ্ছাচার ও বিদ্রোহের সূচনা ক'রো না। প্রথম অপরাধ আমি মার্জনা করলাম। কিন্তু তোমায় সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, এর পর কেউ প্রকাশ্যে এরূপ অপরাধ করলে তার আমি চরম দণ্ড বিধান করবো।"

ক্রুদ্ধ বিজ্জল দৃঢ়স্বরে কথা কয়টি বলিয়া বসভেশ্বরকে বিদায় দিলেন। সেই দিন হইতে রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে গড়িয়া উঠিল এক বিরোধের প্রাচীর।

কয়েক মাস পরের কথা। রাজধানী কল্যাণে এবার আর একটি ঘটনা ঘটে যাহার ফলে বৃহত্তর সঙ্কট ঘনাইয়া আসে।

হরলয় নামক এক অন্ত্যজের পুত্রের সঙ্গে মধুবায় নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ সেদিন অনুষ্ঠিত হয়। উভয়েই বীরশৈব সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু এ ঘটনায়

সনাতনী আচার্যেরা গর্জিয়া উঠেন। একে অস্পৃশ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিবাহ, তদুপরি ব্রাহ্মণের কন্যা যাইতেছে অস্পৃশ্যের ঘরে। এ যে প্রতিলোম বিবাহ। শাস্ত্র কখনো ইহার সমর্থন করে না। প্রভাবশালী সনাতনপন্থীরা রাজা বিজ্জলের দরবারে অভিযোগ পেশ করলেন।

হরলয় ও মধুরায় উভয়কেই ডাকাইয়া আনা হইল। বিজ্জল উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "দ্যাখো, এ প্রতিলোম বিবাহ দেশের শাস্ত্র বিধানের বিরোধী। সরকারী আইন এটা কখনো সমর্থন করবে না। এজন্য গুরুতর কারাদণ্ড তোমাদের পেতে হবে। ভালো চাও তো এ বিবাহ এখনই নাকচ ক'রে দাও।"

অভিযুক্তেরা একটুও ভীত নয়। স্পষ্ট ভাষায় তাহারা নিবেদন করে, "মহারাজ, আমাদের বীরশৈব মত অনুযায়ীই এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এতে তো কারুর কিছু হানি হয় নি। কারুর কিছু বলারও নেই।"

"তবে কি রাজ-রোষের ভয়ও তোমরা করছো না"—বিজ্জল ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন।

"মহারাজ, কারুর রোষের পরোয়া আমরা করিনে। মাথার ওপরে দেবাদিদেব শিব, আর চোখের সামনে মহাসাধক বসভেশ্বর। এই দুই ছাড়া আর কাউকে আমরা জানিনে।"

রোষে উত্তেজনায় রাজা বিজ্জলের সারা দেহ কম্পিত হইতেছে। গাঢ় স্বরে আদেশ দিলেন, "এরা রাজদ্রোহী, সমাজদ্রোহী। চরমদণ্ডই এদের প্রাপ্য। দুষ্টদের চোখ উপড়ে ফেলে দেওয়া হোক। দেশের লোক বুঝুক, সমাজ ও রাজশক্তির বিরোধিতা করলে কোন্ দণ্ড পেতে হয়।"

আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হয়। এক মর্মান্তিক স্তব্ধতা নামিয়া আসে রাজধানীর জন-জীবনে।

বসভেশ্বর শিহরিয়া উঠেন এ সংবাদে। সাধনকুটিরে একান্তে গিয়া উপবেশন করেন। করুণ আর্তি জাগিয়া উঠে সারা অন্তরে। যুক্তকরে নিবেদন করেন, "হে দেবাদিদেব, হে প্রভু সঙ্গমেশ্বর, সারা জীবন ধরে আমি এগিয়ে চলেছি তোমারি নির্দেশে। সাধনভজন, বীরশৈবদের সংগঠন ও সংস্কার সব কিছুতেই পেয়েছি তোমারই সমর্থন ও প্রেরণা। আজ আমায় বলে দাও, অতঃপর কি আমার কর্তব্য।"

কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া বসভেশ্বরের গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যান। তারপর ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বরের ঘটে আবির্ভাব। প্রশান্ত কণ্ঠে প্রভু কহেন, "বৎস বসভেশ্বর, কারবের সাধনা তোমার শেষ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকে তোমার সাধনার বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে মুক্তির দীপশিখা। শিবভক্তির জোয়ার এসেছে লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনগণের জীবনে। তোমার ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কাজ তুমি সমাপন করেছো। এবার এসে পড়ো তোমার প্রাণপ্রিয় কুড়ল-সঙ্গমে। সেখানে তোমাতে আমাতে কি আনন্দেই না কাটবে।"

সিদ্ধান্ত স্থির করিতে বসভের একদিনও দেরি হইল না। রাজা বিজ্জলের কাছে পদত্যাগ পত্র তিনি পেশ করিলেন।

যোগীবর অল্লাম প্রভু তখন বল্লিগাভেতে অবস্থান করিতেছেন। তাড়াতাড়ি

সেখানে এক পত্র পাঠাইরা বসভ সঙ্গমেশ্বরের নির্দেশ তাঁহাকে জানাইরা দেন। তারপর সর্বত্যাগী জঙ্গমের বেশে শুরু করেন কুড়ল-সঙ্গমের দিকে পদযাত্রা।

ভক্তেরা কাঁদিয়া বলে, "প্রভু, আমাদের প্রতি কি নির্দেশ রইলো আপনার? কি ক'রেই বা আমাদের দিন কাটবে, তা বলে দিন।"

প্রশান্ত কণ্ঠে বসভেশ্বর বলেন, "শিবময় ধর্মজীবন, আর শিবের মতন ত্যাগপূত তপস্যা নিয়ে দিন যাপন করো। অনুভব-মণ্ডপ আর বীরশৈব সংগঠনের কাজ পূর্ববৎ চালিয়ে যাও তোমরা। ভুলবে না, তোমরা সবাই শিবভক্ত, শিবস্বরূপ হওয়াই তোমাদের সাধনার চরম লক্ষ্য। প্রভু সঙ্গমেশ্বর আমায় ডাক দিয়েছেন। তাঁর পুণ্যধামেই আমি এবার যাচ্ছি। তাঁর প্রেরণায় তোমাদের ভেতর এসেছিলাম, তোমাদের সেবা যথাসাধ্য করেছি। এবারে তাঁরই আদেশে ফিরছি কুড়ল-সঙ্গমে।"

সহস্র সহস্র মানুষের আর্তি ও ক্রন্দন পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, বসভেশ্বর ধীর পদে অগ্রসর হইলেন প্রভুর ধামের দিকে।

সঙ্গমেশ্বর তীর্থে পৌঁছিয়া তাঁহার আনন্দের আর অবধি নাই। জীবনে এবার আসিয়াছে চির-বিরতির পালা। এবার শুধু প্রভু আর তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের আনন্দ-রঙ্গ, আনন্দ মিলন।

প্রভুর চরণকমল ধ্যানেই বাকিটা দিন বসভেশ্বর অতিবাহিত করিবেন। যতদিন এ দাসকে তিনি আত্মসাৎ না করেন, ততদিন চলিবে তাঁহার আরাধনা ও ধ্যান জপ। সঙ্গমেশ্বরের চরণে সেদিন সাশ্রুনয়নে নিবেদন করিলেন :

তোমার চরণ-কমলের মধুকর আমি,
হে প্রভু, চেয়ে দেখো, তাইতো জিহ্বা আমার
তোমার নামের সুধায় হয়েছে মিঠে,
তোমার মুখশশীর জ্যোতির ছটায়।
প্রদীপ্ত হয়েছে আমার এই নয়ন যুগল ॥
তোমার নিরন্তর ভাবনা আর অনুধ্যানে
আমার দিনরাতের ব্যবধান গেছে ঘুচে,
তোমার স্তুতিগানের পবিত্র ঝংকারে
আমার এ শ্রবণ দুটি সদাই রয়েছে ভরপুর।

পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে যে একটি নিবিড় আনন্দময় অনুভূতি রহিয়াছে, তাহা বসভেশ্বরের এ সময়কার একটি বচনে পরিস্ফুট। তাঁহার মতে—সাধক-দেহ যেন একখানি রম্য বীণা, পরম প্রভু লীলাভরে এই যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, আবার নিজ হাতেই সুরে তালে লয়ে তাহা সানন্দে বাজাইয়া চলিয়াছেন। এই রূপকটির বর্ণনা দিতে গিয়া বসভ গাহিয়াছেন :

দয়াল প্রভু, আমার এ দেহকে
কর তোমার বীণা যন্ত্রের দেহ।
আমার এই শির হোক তার শীর্ষচক্র,
স্নায়ু-শিরাগুলোর হোক রূপান্তর

সেই বীণার মধু-নিষ্যন্দী তারে,
আমার এই হাতের আঙুলগুলো হয়ে উঠুক্
বীণার তার-জড়াবার কান,
হে প্রভু কুড়ল-সঙ্গমেশ্বর।
আমার এ দেহবীণার তারে তারে
কর আঘাত, আর বাজাও তোমার দিব্য সুর।

এ সময়ে হঠাৎ একদিন রাজধানী কল্যাণের এক দুঃসংবাদে কুড়ল-সঙ্গমে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। জানা যায়, বিরোধীদের আকস্মিক আক্রমণে রাজা বিজ্জল নিহত হইয়াছেন এবং আততায়ীরা বীরশৈব দলেরই অন্তর্ভুক্ত চরমপন্থীদল।

হরলয় ও মধুবায়ের চক্ষু উৎপাটন করার পর বিজ্জলের বিরুদ্ধে জনরোষ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বসভেশ্বরের অন্তরঙ্গ সাধকেরা শান্ত থাকিলেও একদল উগ্র বীরশৈব রাজার এই নৃশংস কার্যের সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে উদ্যত হয়। এই দলের প্রধান নেতা জগদেব। সহকারীদ্বয় মোল্ল ও বোম্মরকে নিয়া রাজা বিজ্জলের নিধনের জন্য তিনি এক গোপন চক্রান্ত গড়িয়া তোলেন। তারপর সুযোগ বুঝিয়া হঠাৎ একদিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে তাঁহারা হত্যা করেন। রাজধানী কল্যাণে অতঃপর চলিতে থাকে সরকারী দমন-অভিযান আর উত্তাল হইয়া উঠে গণ-বিক্ষোভ ও গণ-সংঘর্ষ।

কুড়ল-সঙ্গমের ভক্তেরা বসভেশ্বরকে এই সংকটময় পরিস্থিতির কথা জানাইলেন, চাহিলেন কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ।

ধ্যানাবিষ্ট বসভেশ্বর শুধু কহিলেন, "বিজ্জলের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। তাই বুঝি তাকে বিদায় নিতে হলো। তবে জগদেব ভুল করেছে, নিজ হাতে নিধনের অস্ত্র তুলে না নিয়ে তাঁর ওপরই নির্ভর করা উচিত ছিল, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ন্তা হয়ে যিনি রয়েছেন সদা জাগ্রত। এ সম্পর্কে আমার নিজের কিছু বলার নেই, করারও নেই। এখন প্রভুর লীলার আমি দর্শক মাত্র।"

গুরু জাতবেদমুনি বহুদিন যাবৎ গত হইয়াছেন। কিন্তু কুড়ল-সঙ্গমের শৈব সাধক ও সন্ন্যাসীর সমাবেশ পূর্ববৎই রহিয়াছে। বসভেশ্বর কিন্তু আজ কাহারও সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করেন না, আপন মনে দিনের বেলায় ঘুরিয়া বেড়ান সঙ্গমস্থলে, আর রাত্রে ধ্যানে জপে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন।

এখন কেবলই তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন পরিপূর্ণতার পথে, দেবাদিদেব মহেশ্বরের পরম সঙ্গমের দিকে। দেহ, মন, আত্মা সব কিছুই আজ ভরিয়া উঠিয়াছে তাঁহার প্রভুর প্রেম, আর অবদানে। এ সময়কার একটি বচনে তিনি গাহিয়াছেন[১]:

হে প্রভু, যত কিছু কথা আমার
ভরে তুলবো তোমার নামের সুধায়,
নয়ন দুটি জুড়ে উঠবে ফুটে
তোমার নয়নাভিরাম রূপ।

---

১ বচনস্ অব বসভস্—অনুবাদ: মেনজেস্ অ্যান্ড অংদি।

তোমাব বম্য স্মৃতিতে পূর্ণ হবে আমাব অন্তব,
শ্রবণ দুটি উঠবে ভবে তোমাব যশোগানে,
হে কুড়ল-সঙ্গম দেব,
তোমাব চবণকমল দুটি ছুঁয়ে
সার্থক ক'বে তুলবো আমাব এ জীবন।

সাধনাব চবম স্তবে পৌঁছিয়াছেন বসভেশ্বব। ধ্যানদৃষ্টিতে সদাই হইতেছে অপবূপ দর্শন। পবম শিব আব তাঁহাব অনাদ্যন্ত সৃষ্টি দুইই হইযা গিযাছে একাকাব। বসভেব মুখনিঃসৃত একটি বচনে, এই দিব্য অভিজ্ঞতাটি বর্ণিত :

যে দিকেই কবি নযনপাত, হে প্রভু
নিবন্তব হয শুধু তোমাবই দর্শন।
এই সীমাহীন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড
বিলসিত বযেছে তোমাবই অপবূপ বূপে—
তুমিই এই ব্রহ্মাণ্ডেব আযত নযন,
বিকচ কমল সদৃশ আনন তুমিই,
স্কন্ধ, হস্ত ও চবণদ্বয় তাও যে প্রভু তুমি,
বিশ্ব নিযন্তা হে কুড়ল-সঙ্গমেশ্বব,
কোটি কোটি নক্ষত্রে খচিত তোমাব এই মহাকাশ—
তোমাব এই বিবাম বিহীন সুমহান্ সৃষ্টি—
তোমাবই মত অনাদি আব অনন্ত,
তোমাবই মত অপবূপ মহিমায তাবা সমুজ্জ্বল।

সাধনাব এই পবম অবস্থাব পব দেহবোধ তাঁহাব বিলুপ্ত হয, ইষ্টদেব সঙ্গমেশ্বব প্রাণপ্রিয় ভক্ত বসভেশ্ববেব দেহ মন আত্মাকে কবেন আত্মসাৎ।

১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বসভেব মহাপ্রযাণেব এই মর্মান্তিক দিনটি বীবশৈব সাধকেবা কোনোদিন বিস্মৃত হইতে পাবিবে না।

লাটু মহারাজ

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেদিন ভক্ত লাটুকে নিয়া মহাব্যস্ত। এই নতুন অবাঙালী শিষ্যটি নিরক্ষর, কোনোমতে বর্ণ পরিচয় করাইয়া দিলে যদি বা লেখাপড়ার দিকে তাহার মনটা ঘোরে। আজ ঠাকুর তাই স্থির করিয়াছেন লাটুর অক্ষর পরিচয় শেষ করিয়া তবে ছাড়িবেন।

ঠাকুর যতবার পড়ান 'ক', ছাত্র ততবার বলে 'কা'। পশ্চিমদেশীয় ভক্তের জিহ্বায় অকারান্ত উচ্চারণ আসে না। ঠাকুর মহাসমস্যায় পড়িয়াছেন, আর বলিতেছেন, "শালা ক'কে যদি 'কা' বলিস, তবে এতে আকার দিলে তখন কি বলবি?" বহু চেষ্টার পর রামকৃষ্ণ শিক্ষাদানে ক্ষান্ত হইলেন। বলিলেন, "যা শালা তোর পড়েই আর কাজ নেই।"

উত্তরকালে এই নিরক্ষর শুদ্ধসত্ত্ব শিষ্যের আধারে ঠাকুর অকৃপণ করে কৃপার ধারা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিজের সাধনজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পবিত্রতা, সরলতা ও ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা। তাঁহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই অধ্যাত্ম-শিল্পী রামকৃষ্ণের এই বিহারী ভক্ত লাটু মহারাজের মধ্যে।

ব্যবহারিক শিক্ষা ও লেখাপড়ার অভাব যে ভগবৎ-প্রাপ্তির অন্তরায় ঘটাইতে পারে না, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ঠাকুর নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন, উত্তরকালে লাটু মহারাজের আলোকসামান্য অধ্যাত্ম-জীবনেও দেখা গিয়াছে তাহারই অনুকৃতি।

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রয়াস সেদিন বিফল হইয়া গেল। লাটু তারপর পরমানন্দে গঙ্গাতীরের বাগানে গিয়া প্রাণ খুলিয়া গান শুরু করিলেন, 'মনুয়ারে—সীতারাম ভজন করলিজিয়ে।'

স্মিতহাস্যে ঠাকুর দূর হইতে শুনিতেছেন। লাটুকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, তোর ওতেই হবে।" সত্যিই ইহাতেই তাঁহার হইয়াছিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বৈরাগ্যবান্ স্বভাবসরল লাটু সদ্‌গুরু নির্দেশিত শ্রদ্ধা-ভক্তির পথেই অগ্রসর হন। এই পথেই তাঁহার ভাগবত জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। লীলাময় রামকৃষ্ণের আনন্দ কাননের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া লাটু মহারাজ ফুটিয়া উঠেন একটি দিব্য সৌগন্ধবিস্তারী পুষ্পরূপে।

লাটু মহারাজ তাঁহার উত্তর জীবনে ঠাকুরের একটি গল্প প্রায়ই ভক্তদের কাছে বলিতেন। গুরু-নিষ্ঠার দিক দিয়া এ গল্পটি কিন্তু লাটু মহারাজকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

রামচন্দ্রের সভায় সর্বজনসমক্ষে ভক্ত বীর হনুমান যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভু রামচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া এ সময়ে হনুমানকে একছড়া বহুমূল্য মুক্তামালা উপহার দেন। হনুমান উহা প্রথমে নাড়িয়া-চাড়িয়া কি যেন পর্যবেক্ষণ করেন। তাহার পর

প্রত্যেকটি মুক্তা নখাঘাতে বিদীর্ণ করেন, ভেতরকার বস্তুটি বুঝি আবিষ্কার করিতে চাহেন। তাহার পর ঐ মালা ছুঁড়িয়া ফেলেন ভূতলে।

প্রভু রামচন্দ্রের মালার এই অপমান! লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্বাণ উদ্যত করিয়াছেন, এমন সময় শ্রীরাম বাধা দিয়া কহেন, "আসল কথাটা কি জানো, মুক্তা-মালাতে 'রামনাম' কোথাও ক্ষোদিত নেই, তাই পরমভক্ত হনুমানের কাছে এটা মূল্য-হীন, পরিত্যজ্য।"

গুরু রামকৃষ্ণের প্রতি এমনই একনিষ্ঠ ভক্তি লাটু মহারাজের ও ছিল। জীবনে প্রাপ্ত সমস্ত কিছু তত্ত্ব ও শিক্ষাই তিনি সদ্‌গুরু রামকৃষ্ণের কষ্টিপাথরে সতর্করূপে যাচাই করিয়া নিয়াছেন।

লাটুমহারাজের গুরুভাইরা বলিতেন, ভক্তবীর পবন-তনয় যেমন রামচন্দ্রের লীলার এক উজ্জ্বল রত্ন, রামকৃষ্ণের লীলার লাটু মহারাজও তেমনই একটি বড় সম্পদ। তাই বুঝি কাশীতে স্থাপিত স্মৃতি মন্দিরে হনুমানজীর প্রস্তরমূর্তি বিরাজ করিতেছে। এই নৈষ্ঠিক ভক্তের প্রেম-ভক্তির স্মারকরূপে।

লাটুমহারাজের গুরুকৃপার সৌভাগ্য ও অধ্যাত্ম-সিদ্ধির পরিমাপ করা যায় তাঁহার গুরুভাই বিবেকানন্দের একটি মন্তব্যের মধ্য দিয়া। ঠাকুর ও ঠাকুর-সন্ততির আলোচনার প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে লেটোটাই ঠাকুরকে ঠিক ধরেছিল।' সদ্‌গুরুর অনুসরণে, নিরন্তর অনুধ্যানে, লাটুমহারাজের অন্তর-সত্তা তাঁহারই ভাবে ও ভাবনায় হইয়াছিল বিভাবিত। দেহেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণেরই ছাপ। তাই প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের আকৃতির সহিত লাটু মহারাজের সাদৃশ্যে দেখিয়া একবার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

লাটুমহারাজের জীবন ছিল ত্যাগবৈরাগ্যময়। এ জীবন ভক্তিময় ভজনের নিরালা পথটি ধরিয়াই অগ্রসর হয়। রামকৃষ্ণ মণ্ডলী তাঁহার প্রাণপ্রিয় হইলেও বিবেকানন্দের প্রবর্তিত সঙ্ঘে তিনি যোগ দেন নাই। প্রিয় গুরুভ্রাতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও তিনি মঠে রাত্রিবাস কখনো করিতেন না। বলিতেন, "হামরা সাধু। হামাদের আবার জমি, বাড়ি, বাগান, ঐশ্বর্য এ সব কি বাবা? এ সবের মধ্যে হামি থাক্‌বে না।'

তবুও মঠের বাহিরে, একান্তচারী এই মহাপুরুষের রামকৃষ্ণময় জীবন হইতে, মণ্ডলীর কত সাধু-সন্ন্যাসী যে অধ্যাত্ম-পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছে, আপ্তকাম হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রায়ই লাটুমহারাজের কাছে নবীন ভক্তদের পাঠাইতেন। আর এই কঠোরী মহাপুরুষের কাছে পাঠানোর সময় আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "লাটুর কাছে ঘেঁষতে ভয় কিসের রে? ওর বাইরে একটু রুক্ষভাব—সেটা লোকসঙ্গ এড়ানোর জন্য, কিন্তু ওর ভেতরটা একেবারে ক্ষীরে ভরপুর।'

ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ তো লাটুমহারাজ সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত, সবাইকে তাঁহার আশীর্বাদ চাহিয়া নিতে তিনি উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন, "এমন বেলাগ্‌ সাধু আমি জীবনে কখনো দেখি নি।"

দক্ষিণেশ্বরে একদিন সমাধির পরে অর্ধবাহ্য অবস্থায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ লাটুকে বলিয়াছিলেন, "ওরে লেটো, দেখবি একদিন তোর মুখ দিয়ে বেদ-বেদান্ত ছুটে বেরোবে।"

এই অমোঘ বাক্যের ফল ফলিয়াছিল এবং নিরক্ষর লাটুমহারাজ প্রখ্যাত হইয়াছিলেন রামকৃষ্ণের এক অসামান্য সৃষ্টিরূপে।

লাটুমহারাজের বাল্যকালের নাম রাখতুরাম। বিহারের ছাপরা জেলায় এক কৃষকের পরিবারে তাঁহার জন্ম। গরীব ঘরের ছেলে, ভেড়া ছাগল চরানো অর্ধনগ্ন রাখাল, এই রাখতুরাম যে একদিন রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হইবেন, তাহা কে জানিত? জানিতে পারিলে কেহ হয়তো তাঁহার জন্মের সাল তারিখ সতর্কতার সহিত লিখিয়া রাখিত। তবে মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায়, রাখতুরাম পিতৃগৃহে ভূমিষ্ঠ হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে।

বাল্যকালেই রাখতু পিতামাতাকে হারায় এবং তারপর সে পিতৃব্যের সংসারে থাকিয়া মেষপালন করিতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা লাভেরও কোনো সুযোগ তাহার ঘটে নাই। আর্থিক দুরবস্থায় পড়িয়া পিতৃব্য সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং এখানে রামকৃষ্ণ-ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে পরিচারক হিসাবে রাখতুরাম কাজ করিতে থাকে। বাড়ির সকলে আদর করিয়া তাহাকে ডাকিত লালটু নামে। তেজস্বী, সৎ ও ঈশ্বরভক্ত এই নূতন ভৃত্যটিকে রামদত্ত ও তাঁহার পরিবারের সবাই স্নেহ করিতেন। অকপট ও উচিতবক্তা এই বালক কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্যার সৃষ্টি করিয়া বসিত, রাম দত্ত সস্নেহে তাহাকে মানাইয়া চলিতেন।

গৃহে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রায়ই চলে। বালক উৎকর্ণ হইয়া এই আলোচনা শুনিতে চেষ্টা করে। কি এক অমোঘ আকর্ষণ যে সে অনুভব করে, কিছুই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না।

এক একদিন কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া লালটু গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠে। অহেতুক কান্নার দুই চোখ ভাসিয়া যায়।

সাধক নিত্যগোপাল অবধূত এই সময়ে রাম দত্তের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ধর্মালোচনা ও নামগান তাই মাঝে মাঝে হয়, আর লালটুর অন্তরে গভীর রহস্যময় শিহরণ জাগে, নূতন জীবনোন্মেষের ইঙ্গিত সারা দেহমন চঞ্চল করিয়া তুলে।

রামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রায়ই আলোচিত হয় আর এসব তাহার কানে পৌঁছে। দিনরাত চলে তাহার গুঞ্জরণ—'যে সদা ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই কাছে ঈশ্বর হন প্রকাশিত।'

প্রভু রামকৃষ্ণের কথাগুলো লালটু মনে রাখিয়াছে। মন তাই অজানা পরম বস্তুর জন্য বার বার চঞ্চল হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে কেনই বা সে ফুঁপাইয়া কাঁদে আর চক্ষুর জল ফেলে বাড়ির কেহ সে রহস্যের সমাধান করিতে পারে না।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দটি লালটুর জীবনের এক স্মরণীয় বৎসর। একদিন মনিব রাম দত্তের সঙ্গে গিয়া সে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া লালটু প্রণাম করে, করজোড়ে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া থাকে।

সমবেত ভক্তদের উদ্দেশ্য করিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠেন, "দ্যাখো, যারা নিত্যসিদ্ধ তাদের কিন্তু জন্মে জন্মে জ্ঞানচৈতন্য হয়েই রয়েছে। তারা যেন পাথরচাপা ফোয়ারা।

মিস্ত্রী এখানে-সেখানে ওস্কাতে ওস্কাতে যেই এক জায়গায় চাপটা সরিয়ে দেয়, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফর্‌ফর্‌ করে জল বেরুতে থাকে।”

কথা কয়টি শেষ করিয়া হঠাৎ ঠাকুর লাটুকে স্পর্শ করিলেন।[1] এই দিব্য স্পর্শে ঘটে তাহার বিস্ময়কর ভাবান্তর। গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, সমস্ত শরীর কম্পমান, দেহের রোমরাজি কণ্টকিত। আর তার অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইতেছে কান্না।

রাম দত্ত বিপদ গণিলেন। ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন, “ব্যাপার তো বুঝলুম। তা, ছেলেটি কি সারাক্ষণ কাঁদতেই থাকবে?”

ঠাকুর আবার স্পর্শ করা মাত্র লালটুর ক্রন্দন থামিয়া যায়। অধ্যাত্ম-জীবনের অলৌকিক শক্তিধর শিল্পী ছিলেন রামকৃষ্ণ। সেদিন লালটুর অন্তস্তলে কোন্‌ পাথর-চাপা নির্ঝরের মুখ তিনি নিপুণ হস্তে খুলিয়া দিলেন তাহা তিনিই জানেন।

ইহার পর লালটুর জীবনে এক বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে। তাঁহার সমস্ত চঞ্চলতা ও কলরব হয় অন্তর্হিত—সে যেন তখন একটি কলের পুতুল। ঠাকুরের জন্য ফল-মূল নিয়া আবার একদিন লালটু পরমোৎসাহে দক্ষিণেশ্বরে যায়। ঠাকুরের মিষ্টি কথা শুনিয়া ও প্রসাদ পাইয়া নিজেকে জ্ঞান করে কৃতকৃতার্থ।

ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বাস করার জন্য লালটু বদ্ধপরিকর। কিন্তু এই সময়ে ঠাকুর হঠাৎ কিছুদিনের জন্য স্বগ্রামে চলিয়া যান। তীব্র ব্যাকুলতা নিয়া চাতক পক্ষীর মতো দক্ষিণেশ্বরে লালটু মাঝে মাঝে বসিয়া থাকে। তাঁহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ দেশে গেলেও অলক্ষিতে এখানে সদাই বর্তমান আছেন। তবে লালটু তাঁহার সূক্ষ্ম দেহের সান্নিধ্য ছাড়িবে কেন?

একদিন ভক্তবৎসল ঠাকুরের কৃপায় তাহার মনোবাঞ্ছা কিন্তু পূর্ণ হয়, অলৌকিক-ভাবে ঠাকুর তাঁহাকে দর্শন দান করেন। লালটুর অধ্যাত্ম-জীবনে সদ্‌গুরুর আশীর্বাদটি এই দর্শনের মধ্য দিয়া সক্রিয় হইয়া উঠে।

পরমহংসদেব কামারপুকুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মনিবের প্রদত্ত ফল-মূল ও মিষ্টান্ন নিয়া আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছে। ঠাকুর সস্নেহে এবার কহিলেন, “ওরে আজ তুই এখানেই থেকে যা, মায়ের প্রসাদ পাবি।”

লালটু দক্ষিণেশ্বরে রহিয়া গেল। রাত্রে প্রসাদ পাইবার পর সে ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদসেবার ভার পাইয়াছে। তাই আনন্দ আর ধরে না! অকস্মাৎ তাহার সারা দেহে মনে একটা দিব্য ভাবের ঘোর নামিয়া আসে, তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। চোখে নামে অশ্রুর বন্যা।

ঠাকুর নীরবে লক্ষ্য করিতেছেন। এবার রহস্য করিয়া হাঁসিয়া বলেন, “কিরে, তোর আবার একি হল?”

কম্পিত কণ্ঠে লালটু উত্তর দেয়, “হামে কি জানে?”

সবাই বুঝলেন, পরমহংসদেবের সামান্যতম কৃপা কটাক্ষে এই নবাগত শিষ্যের দেহে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার ভাব হইয়াছে এমন ঘনীভূত।

লালটুকে দিয়া আর বাড়ির পরিচারকের কাজ করাইতে রাম দত্তের মন এবার সরে

---

১ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়: শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা

না। ঠাকুরের কাজের জন্যেই তাঁহাকে তিনি নিয়োজিত রাখিতে চান। লালটু আজকাল ঠাকুরের উৎসব অনুষ্ঠানে কর্মী হিসাবে ঘোরাঘুরি করিতে থাকে। অবশেষে ঘটনাচক্রে দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের সেবক হৃদয় মুখুয্যে অপসারিত হন, রাম দত্ত নিজেই উৎসাহ করিয়া লালটুকে স্থায়িভাবে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দেন।

ঠাকুরের সেবায় লালটু এবার কায়-মন-প্রাণ ঢালিয়া দেয়। সদ্‌গুরুর সস্নেহ ও সতর্ক দৃষ্টিও তাহার উপর থাকে নিবদ্ধ। মাঝে মাঝে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন, "দেখিস রে লেটো, তুই যেন ইখানকার বাইরেটা দেখে ভুলে যাস নি। ওরে এটার (হাড় মাসের খাঁচা) সেবায় কিছু পাওয়া যায় না। এর ভেতরে যে বাস করে, তার সেবা করলে সব পাবি।"

সাধক লাটু সারা জীবন ভরিয়া এই নির্দেশটি পালনে চেষ্টিত ছিলেন। ঠাকুরের দেহাবসানের পরেও তাঁহার মুখ্য ভাব ছিল 'তাঁকে যেন না ভুলি।' ঠাকুরকে জীবন-সর্বস্ব করিবার এই সাধনায় লাটু মহারাজ যে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি কৃতী গুরুভাইরা অকুণ্ঠ চিত্তে ইহা স্বীকার করিতেন।

লাটুর সাধনায় ছিল আত্মসমর্পণের সাধনা। সদ্‌গুরু চরণে তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ, সর্বসত্তা।

আত্মসমর্পণের এই সাধনায় লাটু মহারাজের নিরক্ষরতা ও শুদ্ধা-ভক্তির বেগ তাঁহাকে অশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

শিষ্য নিজেকে সমর্পণ করিতেছেন, তাঁহার যেমন সব কিছু দিয়াও মন প্রাণ ভরিয়া উঠিত না, গুরুর তেমনি চাওয়ার অন্ত ছিল না। শিষ্যের আত্মসমর্পণকে নিরন্ধ্র ও নিখুঁত করিবার জন্য তাঁহার কি ব্যাকুলতা, কি সতর্ক প্রহরা।

শরৎ মহারাজের মাতা একদিন লাটুকে আদর করিয়া চচ্চড়ি রাঁধিয়া খাওয়ান। লাটু তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে বলিতেছেন, "আজ এমন চচ্চড়ি রসুই হয়েছে যে হামনে জীবনে খায় নি, মোশাই।"

ঠাকুর যেন তাঁহার সঙ্গী অবোধ বালকটি। ব্যথিত স্বরে তিনি বলিলেন, "বলিস্ কিরে। তুই একা সে-সব খেয়ে এলি! ইখানকার জন্যে কিছু আনলি নে?"

ঐ চচ্চড়ি পরের দিন আনানো হয়। সর্বপাশমুক্ত, সর্ব-লোভমুক্ত ঠাকুর তাহা ভোজন করেন। গুরুগত প্রাণ শিষ্য সামান্য চচ্চড়িটুকু খাইতে গিয়াও ঠাকুরের কথা স্মরণে রাখুক, নিজের তৃপ্তির সহিত ঠাকুরের তৃপ্তির অন্বয় সাধন করুক, আত্মবৎ সেবার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝুক ইহাই ছিল রামকৃষ্ণের চচ্চড়ি-ভক্ষণে উৎসাহের প্রকৃত মর্ম। শিষ্য গুরুকে যেমন আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, গুরুও তেমনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন সর্বাত্মক আশ্রয়।

যদু মল্লিকের বাড়িতে সেদিন সিংহবাহিনীর পূজা হইতেছে। সংবাদ পাইয়া রামকৃষ্ণ লাটু প্রভৃতি ভক্তদের নিয়া দেবীকে প্রণাম করিতে গেলেন। মল্লিক মহাশয় তখন মহাব্যস্ত, এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছেন, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করা তো দূরের কথা, একবার বসিতেও বলিলেন না।

রামকৃষ্ণ দেবী প্রতিমা প্রণাম করিয়া সঙ্গী ভক্ত-শিষ্যদের নিয়া বাহিরে আসিলেন। লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা এবার রামকৃষ্ণকে চাপিয়া ধরিলেন। শুধু শুধু অপমানিত হইবার জন্য এই অভদ্র বড়লোকের বাড়িতে কেন তিনি আসেন?

ঠাকুর স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁরে, তোরা কি তবে বাড়ির বড়লোক কর্তাকে দেখতে গিয়েছিলি যে, বসতে বলেনি বলে অভিমান করছিস্। সাধু হতে চাইলে অভিমান ত্যাগ করতে হবে, কেউ মানলো কি না মানলো এসব চলবে না বুঝলি ?"

এমনি করিয়া ঠাকুর লাটু প্রভৃতি ভক্তদের নিয়া অহমিকার অঙ্কুর সযত্নে দিনের পর দিন উৎপাটন করিতেন।

গিরিশ ঘোষ একদিন মদ্যপানের পর মত্ত অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ঠাকুর লাটুকে কহিলেন, "ওরে, যা তো গাড়িতে গিরিশবাবু কিছু ফেলে এসেছে কিনা দ্যাখ।"

লাটু গাড়ির ভিতরে উঁকি মারিয়া তো অবাক্। তারপর সেখান হইতে একটি মদের বোতল ও গ্লাস উদ্ধার করিয়া আনিলেন। উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

ঠাকুর প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ওগুলো রেখে আয়। শেষ খোঁয়াড়ীর কাজে লাগবে।"

উদ্দাম গিরিশবাবুকে রামকৃষ্ণ কিভাবে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। ভক্তের জন্য এই উদার আশ্রিতবাৎসল্য ও সহনশীলতা দেখিয়া লাটুর চোখে সেদিন অশ্রুধারা নামিয়া আসে।

লাটু প্রথম বয়সে খুব ব্যায়াম চর্চা করিয়াছিলেন, কুস্তী কসরতও কম করিতেন না। স্বভাবতই সে সময়ে তিনি বেশী পরিমাণে আহার করিতে পারিতেন এবং ইহাতে প্রচুর উৎসাহও তাঁহার ছিল।

"ওরে, কখনো ভুলিসনে তপস্যা করতে গেলে কম খেতে হয়" ঠাকুরের এই সতর্কবাণী লাটুর মর্মমূলে গিয়া প্রবিষ্ট হয় এবং তাঁহার এই একদিনের কথায় তিনি আহারের কৃচ্ছ্রসাধনে রত হন।

ক্লান্ত হইয়া প্রথম প্রহর রাত্রে একদিন তিনি ঘুমাইতেছিলেন। ঠাকুর তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "সে কিরে, এত ঘুমুলে সাধনভজন করবি কখন ?' লাটু গুরুবাক্যের তাৎপর্য তখন বুঝিলেন, নিজেকে করিলেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। এখন হইতে রাত্রির অধিকাংশ সময়ই ধ্যান জপে কাটাইতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই নিয়ম পালন করিয়া গিয়াছেন।

লাটু অন্তরঙ্গভাবে ঠাকুরের সেবা করিতেন আর দিন রাতের অবসর সময়টা কাটাইতেন সাধনকর্মে। পরে ঠাকুর এই শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তকে শ্রীমা সারদামণির সেবায়ও নিয়োজিত করেন।

মায়ের সম্বন্ধে কথা উঠিলে ভক্তির আবেগে লাটুর কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইত। তিনি বলিতেন, "মা'র মতো বৈরাগ্য হামনে ত দেখি নি। আউর তাঁর দয়ার কি তুলনা আছে ? মায়ের কৃপায় আমার জীওন সার্থক হয়েছে। হামি তাঁকে পেয়েছি।"

গুরুভাইরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিতেন, মায়ের পরিপূর্ণ আশীর্বাদ তাঁহার ভক্ত সন্তান লাটুর উপর বর্ষিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ-সর্বস্ব ছিলেন লাটুমহারাজ। গুরু-দর্শন, গুরুপরিচর্যা, গুরুদত্ত সাধনা তাঁহার জীবনে আবর্তিত হইত পবিত্র অক্ষমালার মতো।

প্রতিদিন ভোববেলায শয্যাত্যাগেব আগে ঠাকুবেব দিব্য আননখানি না দেখিযা তিনি কার্যাবম্ভ কবিতেন না। একদিন ঠাকুব বাহিবে চলিয়া গিযাছেন, লাটুও তাঁহাব প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে অগ্রসব হইতে পাবিতেছেন না। দুই হাতে চক্ষু আববিত কবিযা তিনি শুধু চেঁচাতেইছেন "মোশাই, আপনি কুথায !"

লাটু যতই চীৎকাব কবিযা ডাকেন পবমহংসদেব দূব হইতে ততই ব্যস্ত হইযা উত্তব দেন, "যাচ্ছি বে যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি।"

যতক্ষণ ঠাকুব তাঁহাব সম্মুখে উপস্থিত না হইলেন লাটু তাঁহাব চক্ষু হইতে হাতদুটি অপসাবিত কবিলেন না।

এক ভক্ত সেদিন লাটুকে একজোড়া নূতন চটি দিযাছিলেন। পব দিনই উহাব একপাটি কোথায হাবাইযা যায। বামকৃষ্ণ এ সংবাদ শুনিযা বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন। পবদিন প্রত্যূষে উঠিযাই নিজে বাগানে উপস্থিত হইযা শুরু কবিলেন ঐ চটিব সন্ধান।

লাটু ব্যস্তসমস্ত হইযা ছুটিযা আসেন। কাতব স্ববে কহেন, "ওখানে কি খুঁজছেন, মোশাই? আপনাকে হামাব চটি খুঁজে বেডাতে হোবে না, আমাব যে পাপ হবে।"

ঠাকুব চটিজুতা খুঁজিতেছেন এবং পবিতাপেব সুবে বলিতেছেন, "তাই তো বে। নতুন জুতো জোডা তোব ভোগে এল না।"

লাটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিযা ওঠেন, "হামাব জুতোব জন্য আপুনি কণ্টো কচ্ছেন, হামাব আজ দিনটাই খাবাপ যাবে।"

ঠাকুব ফিবিযা আসিযা উত্তব দিলেন, "ওবে, দিন কি ওতে খাবাপ যায? যেদিন ভগবানেব নাম নেওযা হয না সেই দিনই খাবাপ যায!"

ঠাকুবেব এই অপূর্ব ভক্তবাৎসল্যেব বসে সাধক লাটুমহাবাজ পবিপুষ্টি লাভ কবিযাছিলেন। এই সৌভাগ্যেব তুলনা কোথায?

লাটু গুরু-কৃপায জপসিদ্ধ হইযাছিলেন। এই সময়ে তাঁহাব অন্তবসত্তায় নিবন্তব নাম-সাধনা চলিত। উত্তবকালে তিনি বলিতেন, "নাম কবতে কবতে নাম মনেব মাঝে আপন বাসা বেঁধে নেয। এক মাত্র নামেব শক্তিতে মনেব ধর্ম পাল্টে যায, মনেব সঙ্কল্প-বিকল্প সব বন্ধ হয়ে যায। মনে যখন ঢেউ থাকে না, তখনই মত 'নিসপিওব' হয। তখনই ভগবানেব শক্তি নামতেই থাকে, সৎ বস্তুকে চেনা যায।"

নিবন্তব নাম-জপেব অভ্যাস চালাইযাই প্রথম জীবনে লাটুমহাবাজ কামজযেব সাধনায জয়ী হইযাছিলেন, এই কথা উত্তবকালে তিনি সাধন প্রযাসীদেব প্রাযই বলিতেন।

ব্রহ্মচাবী সাধক লাটুকে ডাকিযা বামকৃষ্ণ সেদিন বলিলেন, 'দ্যাখ্, নামেব সঙ্গে নামীব ধ্যান কবিব।'

ভাব-ভেদে ইষ্টভেদ হইযা থাকে। লাটু নিজ ধ্যেযেব আসনে কাহাকে বসাইবেন? সম্মুখে সদ্‌গুরুব প্রেম-ঘন বিগ্রহ বর্তমান। প্রধানত তাঁহাকে অবলম্বন কবিযাই লাটুব কঠোব তপস্যা এযাবৎ অগ্রসর হইয়াছে। বামকৃষ্ণেব সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে সেদিন তরুণ সাধকেব সকল সমস্যা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিযা যায। ভাবগ্রাহী ঠাকুব তাঁহাকে ডাকিযা বলেন, "দ্যাখ, ধ্যান কবতে বসবাব আগে ইখান্‌কে (আপনাব

বক্ষে অঙ্গুলি সঙ্কেতে) একবার ভেবে নিবি। এঁকে ভাবলেই তাঁকে মনে পড়ে যাবে।”

ঠাকুরের সমাধিমগ্ন অবস্থায় দিব্য জ্যোতির্ময় রূপটি লাটুর ইষ্টের বেদিতে চির-দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

লাটু মহারাজ বলিতেন, “গুরু—সচ্চিদানন্দ। সাধনপথে গুরু করা ভাল। তুমি ভগবান্‌কেও গুরু ক'রে নিতে পার—বাকী ভগবানের ভক্তদেরই গুরু করা ভাল। কেন জান? তোমার যখন পিয়াস লাগে—তুমি কি করো? কাছাকাছি যেখানে পানি মিলবে সেখানকেই যাও তো?”

সর্বজ্ঞ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের চালনা করিতেন নিজ নিজ প্রবণতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী। লাটুর ভক্তি ও ভাবময়তা গোড়ার দিকে গুরু সেবা ও নাম-জপ ধরিয়াই অগ্রসর হয়। ঠাকুর তাঁহাকে সংকীর্তনের রসেও রসায়িত করিয়া নিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কীর্তন-অনুষ্ঠানের সময় ঠাকুর মাঝে মাঝে লাটু ও অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিতেন। এই শক্তি সঞ্চারের কালে লাটুর ভাব-তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিত। তাঁহার অশ্রুপাত, সর্বাঙ্গের কম্পন, উদ্দণ্ড নৃত্য ও হুঙ্কার এক অপার্থিব ভাবঘন পরিবেশের সৃষ্টি করিত। লাটুর ভাবময়তাকে ঠাকুর যেমন প্রশংসা করিতেন, তেমনি আবার উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য সতর্কবাণীও উচ্চারণ করিতেন। তরুণ সাধককে বলিতেন, “ভাব যেন মাতা হাতী। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে, সব তোলপাড় করতে থাকে। কিন্তু ওরে, বেশী নাচুনি-কাঁদুনি ভাল নয়। ওতে সময় সময় ভাব ভঙ্গ হয়ে যায়। ভাবকে গোপন করতে না পারলে তা অন্তর্মুখী হতে চায় না।”

গুরুর এই নির্দেশের পরে ভাবাবেশের পরবর্তী স্তরে লাটুর মধ্যে ধীরে ধীরে অপূর্ব সংযম ও প্রশান্তি আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণের নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, “আমি সারেও আছি, মাতেও আছি।” নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও রূপ-ব্রহ্ম তাঁহার নিকট একাকার। সাধন পদ্ধতির দিক দিয়াও ঠাকুর সর্ব ভাবধারার সমন্বয়কে উৎসাহিত করিতেন। লাটু প্রভৃতি ভক্তদের তিনি তাহাদের নিজ নিজ মানসিক গঠনভঙ্গী ও প্রকৃতি অনুযায়ী চালিত করিতেন। আবার বিভিন্ন সাধনধারার সমন্বয় দেখানোর জন্য, এই সমন্বয়ের রসাস্বাদন করাইবার জন্য, বলিতেন, “ওরে তোরা একঘেঁয়ে হোস্ নি। একঘেঁয়ে ইখানকার ভাব নয়। এখানে ঝোলেও খাবো, ঝালেও খাবো, অম্বলেও খাবো—এই ভাব!”

লাটু মহারাজ ঠাকুরের সাধন সমন্বয়ের মর্ম বুঝিয়াছিলেন, তাই ভাব ও জ্ঞান তাঁহার জীবনে সমভাবে স্ফুরিত হইয়া উঠে। গুরু-কৃপা এবং তাঁহার নিজস্ব সুকঠোর ব্রহ্মচর্য ও সাধনভজন লাটু মহারাজের সম্মুখে ধীরে ধীরে পরমলোকের ইন্দ্রিয়াতীত দ্বার খুলিয়া দেয়।

এই মহাসাধকের তপস্যার বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, ‘কি ঠাকুরের সঙ্গে, কি তাঁহার দেহত্যাগের পর, তিনি আজীবন প্রায় সারা রাত্রি জাগিয়া ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন এবং দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন। এইরূপে সারা

বাত্রি ধ্যান-ধাবণায বত থাকিলেও তিনি নিযমিতভাবেই ঠাকুবেব সেবা কবিয়া যাইতেন।"[১]

সাবদানন্দজী একান্তচাবী লাটু মহাবাজেব সাধন সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ কাহিনী ভক্তদেব বলিতেন। ঠাকুবেব তখন দেহান্ত ঘটিযাছে। অন্তবঙ্গ ভক্তেবা সবাই নিজ নিজ সাধনায বত। এই সময়ে গুবু-ভ্রাতাদেব মধ্যে লাটুকে কেন্দ্র কবিযা একদিন কৌতুককব ঘটনা সংঘটিত হয। লাটু দিবাভাগে নিদ্রা যান এবং বাত্রেও কাহাবো সঙ্গে বসিয়া তেমন ধ্যান-জপ কবিতে তাঁহাকে দেখা যায না। গুবু-ভ্রাতা শবৎ মহাবাজ প্রায়ই গভীব বাত্রে শাযিত থাকা কালে ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিতে পান। প্রথমটায সকলে মনে কবেন যে ঘবে ইঁদুবেব উপদ্রব বাড়িযাছে। শেষটায কিন্তু লাটুর উপর সন্দেহ ঘনীভূত হয।

শরৎ মহাবাজ ও অপর সবাই সেদিন মধ্য-বাত্রিতে নিদ্রাব ভান কবিযা পড়িযা আছেন। সবাইকে ঘুমন্ত মনে কবিযা লাটু মহাবাজ চুপি চুপি নামজপেব মালা হাতে নিযা সাধনে বসিলেন।

জপেব মালা আবর্তিত হইবাব সঙ্গে সঙ্গেই গুবুভাইবা একযোগে চড়াও হন, "তবে বে শালা" বলিযা লাটু মহাবাজকে জড়াইযা ধবেন। বমালসহ চোর ধরা পড়াতে মধ্যবাত্রে মঠে এক হৈচৈ পড়িযা গেল।[২]

এমনই ছিল লাটু মহাবাজেব তপস্যাব সুমধুব গোপনতা ও অন্তর্লীন ভঙ্গিমা।

দক্ষিণেশ্বেবে একদিন বামকৃষ্ণ জপ-ধ্যান-নিবত লাটুব সমগ্র সত্তায় একটি প্রচণ্ড নাড়া দিযা দিলেন। ব্যাপাবটি বাখাল মহাবাজ প্রত্যক্ষ কবেন। তিনি বলিয়াছেন, "একদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে ঠাকুবেব আদেশে লাটু আমাদেব সকলকে ডেকে তুলল। ঠাকুব আমাদেব বললেন, 'তোবা আজ খুব জপ কবতে থাক্।'

"তাবপব তিনি 'জাগো মা কুল-কুণ্ডলিনী' গানখানি বেড়াতে বেড়াতে গাইতে লাগিলেন। হঠাৎ কি জানি দেহটা কেঁপে উঠলো আব লেটো উহুঁ উহুঁ ক'বে চীৎকাব ক'বে উঠলো। ঠাকুব তাঁব কাঁধ দুটো চেপে ধবে বললেন, ঠিক বসে থাকবি। আসন থেকে উঠতে পাবি নি।'

"কিছুক্ষণ পবে লেটো বেহুঁশ হয়ে পড়লো। ঠাকুব তখনো সেই গান গেযে তাঁব শক্তি সঞ্চাবিত ক'বে দিচ্ছিলেন।"

লাটু মহাবাজ তখন কৃচ্ছ্র ও তপশ্চর্যাব বত। নিজেব অভীষ্ট সাধনে দিনেব পব দিন অগ্রসব হইযা চলিযাছেন। একদিন তিনি শিবমন্দিবে ধ্যানমগ্ন অচৈতন্য-প্রায হইযা আছেন। কৃপালু বামকৃষ্ণ ধ্যানী শিষ্যেব অবস্থাটি সম্যক্ অনুধাবন কবিলেন। একটি হাতপাখা ও এক গ্লাস জল নিযা ঠাকুব তখনি লাটুব নিকট গিযা উপস্থিত। শিষ্যেব ঘর্মাক্ত কম্পমান দেহে ব্যজন কবিতে কবিতে কহিলেন, "ওবে বেলা যে গড়িযে এল, সন্ধ্যেটন্ধ্যে সাজাবি কখন?"

---

১ সাবদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গ

২ চন্দ্রশেখব চট্টোপাধ্যায : লাটু মহাবাজেব স্মৃতিকথা।
মহেন্দ্রনাথ দত্ত : তাপস লাটু মহাবাজেব অনুধ্যান।

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে লাটুর লজ্জার সীমা রহিল না। আপত্তি জানাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি এ কি করছেন? এতে যে আমার অকল্যাণ হোবে। কুথায় আপনাকে হামি সেবা করবে, না—আপনি হামার জন্য কষ্ট করছেন।"

স্মিতহাস্যে ভক্ত-বৎসল ঠাকুর উত্তরে কহিলেন, "ওরে তোর কে সেবা করছে? তোর ভেতরে যে উনি (শিবলিঙ্গকে দেখাইয়া) এসেছিলেন। তাঁর সেবা করবো না, সেকি কথারে। এত গরমে ওঁর যে কষ্ট হচ্ছিল।"

কি ঘটিয়াছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে লাটু বলিলেন, "হামি তো কুছু জানে না, বাকী তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সামনে একটা জ্যোতি দেখতে পেলুম, সব ঘরখানা ভরে গেল, আর কুছু হামার মনে নেই।"

একদিন কি এক কারণে লাটু তাঁহার ধ্যানে মনটি নিবিষ্ট করিতে পারিতেছেন না। রামকৃষ্ণকে বিপদের কথা নিবেদন করিলেন। ঠাকুরের নানা প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন, "আজ মন্দিরে যাবার আগে মনে হয়েছিল—মা যদি বর দিতে আসেন তবে হামি কি চাইবো?"

গুরু তখনি ব্যগ্র হইয়া শিষ্যকে সতর্ক করিয়া দিলেন, "ঐ হয়েছে রে। কামনা আশ্রয় করলে কখনো কি জপ-ধ্যানে মন বসে? ওসব করবি নি। ধ্যানে বসে বর চাইতে নেই।"

দেব-দেবীর দর্শন লাভ হইলে সাধক সাধারণত বর প্রার্থনা করিয়া নেন, এই কথাই সরল লাটুর জানা আছে। এবার তাঁহার সর্ব সমস্যার সমাধান করিয়া ঠাকুর নির্দেশ দিলেন, "নাবে না, বর চাইতে নেই। একান্তই মা যদি তোকে বর নিতে বলেন, তবে বলবি,—মা আমি ধন-জন দেহসুখ চাইনে, আমায় কেবল শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

এমনই করিয়া সাধনের প্রতি স্তরে, প্রতি গ্রন্থিতে কৃপাসিন্ধু ঠাকুর আশ্রিতদের সযতনে রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার অধ্যাত্মসন্তানদের সাধনজীবনের কোন রন্ধ্রপথেই তাঁহার সদাজাগ্রত দৃষ্টিকে এড়াইয়া অবিদ্যার প্রবেশ সম্ভব ছিল না।

লাটুর পরবর্তী সাধনজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্বামী অদ্বৈতানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন। একদিন ধ্যানতন্ময় অবস্থায় লাটু অচৈতন্য হইয়া পড়েন। মুখ থুবড়িয়া মাটিতে পড়িয়া তিনি গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে থাকেন।

এ সংবাদ পাওয়া মাত্র ঠাকুর সেখানে গিয়া উপস্থিত। তিনি তাঁহাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া দিলেন আর তাঁহার বুকে নিজের হাঁটু দিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে লাটুর সংবিৎ ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই বুঝি সত্য মা কালীকে দেখেছিস্? চুপ কর্ শালা! চুপ কর্। শুনতে পেলে এখনই একটা হৈচৈ পড়ে যাবে!" স্বভাব-শান্ত সাধক লাটু চুপ করিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে ধ্যানকালে গুরুভাইরা তাঁহার রূপান্তরের নানা বিশিষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাইতেন।

গুরু কৃপায় ও নিজের কঠোর-তপস্যার ফলে লাটুর নানা দিব্য দর্শন হইতে থাকে। ধ্যানে তিনি রামচন্দ্র, মহাবীরজী, বিশ্বনাথ, মা-কালী, ছিন্নমস্তা ও যোগমায়ার দর্শন

প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন ঐশ প্রকাশের, বিভিন্ন লীলামূর্তির আনন্দধারায় স্নাত হইয়া সাধক লাটু তাঁহার চরমসিদ্ধির দিকে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন।

একদিন নিশীথ রাত্রে রামকৃষ্ণ লাটুকে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনে ধ্যান করিতে পাঠাইলেন। দৃঢ় ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, নির্ভীক ও শক্তিধর সাধক ছাড়া ঠাকুর পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সহসা কাহাকেও বসিতে দিতেন না।

সিদ্ধ আসনে গিয়া লাটুমহারাজ উপবেশন করেন বটে, কিন্তু ঠাকুরের সিদ্ধি-পূত এই পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিবার পূর্বক্ষণে এই বীর সাধকের অন্তর কাঁপিয়া উঠে।

ধ্যানে দর্শনাদির পরে লাটু এক বিপদে পতিত হন। কোনোমতেই আসন ছাড়িয়া তিনি উঠিতে পারিতেছেন না। পঞ্চমুণ্ডী আসনের চারিদিকে লাটু বীভৎস ভীতিপ্রদ দৃশ্যাদি দেখিতেছেন, একেবারে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়া আছেন। সর্বজ্ঞ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অজানা কিছুই নাই। তিনি নিকটেই ছিলেন, এবার সংকটমোচনের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। উচ্চকণ্ঠে অভয় জানাইয়া বলিলেন, "কিরে ভয় পেয়েছিস নাকি? এত ভয় কিসের? আয়, আয়, আমার সঙ্গে চলে আয়।"

আর একদিনের কথা। বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর সিদ্ধাসনে লাটু মধ্যরাত্রে ধ্যান শুরু করিয়াছেন। একনিষ্ঠ সাধকের নিশ্চল নিস্পন্দ দেহে বাহ্য চৈতন্যের চিহ্নমাত্র নাই। ব্রাহ্মমুহূর্ত উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তখনো লাটু ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় বেলতলায় বসিয়া আছেন। প্রিয় শিষ্যকে ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘরে দেখিতে না পাইয়া ঠাকুর বেলতলার দিকে অগ্রসর হইলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, লাটু ধ্যানাবিষ্ট, বাহ্যজ্ঞান নাই। বেলতলার অদূরে দুইটি কুকুর স্থির নিষ্পলক নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঠাকুর কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, ক্রমে সাধক চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। সম্মুখে করুণাঘন সদ্‌গুরুর দিব্য-মূর্তি। আনন্দাপ্লুত লাটু ঠাকুরের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন।

ঘরে ফিরিবার পথে রামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওরে তোর মহাসৌভাগ্য। মা তোর রক্ষার জন্য দুটো ভৈরবকে পাঠিয়েছিলেন। কুকুরের বেশ ধরে দুটো ভৈরব তোকে এতক্ষণ পাহারা দিচ্ছিল দেখলুম।"

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্তেরা তখন একে একে আসিয়া জুটিয়াছেন। প্রায় দিনরাত্র ঠাকুরের নির্দেশে শিষ্যদের নাম জপ, কীর্তন ও ধ্যান চলিতেছে। গৃহী-শিষ্যের দলও ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসিয়া ধীরে ধীরে হইতেছেন রূপান্তরিত। একসময়ে একদিন ঠাকুর সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "লেটো চড়েই রয়েছে। ক্রমে লীন হবার যো।"

যুবক নরেন্দ্রনাথ (উত্তরকালের বিবেকানন্দ) তখন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন। দ্বিধা ও সংশয়ে তখনো তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া আছে। তাই বুঝি সেদিন ধ্যানাবিষ্ট লাটুর ধ্যান ভাঙানোর জন্য রামকৃষ্ণ নরেনকেই তাঁহার কাছে পাঠালেন। নিকটেই রহিয়াছে একটি বড় গাছ। লাঠি দিয়া এই গাছের গুঁড়িতে নরেন বার বার আঘাত করিতে লাগিলেন। এই শব্দে লাটুর ধ্যান টুটিয়া যাক, ইহাই তিনি চান। কিন্তু লাটুর কোনো হুঁশই নাই।

এমন সময় ঠাকুর ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "থাক, ওকে আর বিরক্ত করিস নি।"

নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "ওর হুঁশ থাকলে তো বিরক্ত করবো। একেবারেই যে বেহুঁশ।" শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "এরকম বেহুঁশ না হতে পারলে কি ধ্যান জমেরে।"

অন্যান্য দিন পরমহংসদেব লাটুকে দিয়াই নরেনের খোঁজখবর করাইতেন। আজ ধ্যান-বিভোর লাটুর অবস্থাটি দেখানোর জন্যই বুঝি তাঁহার সন্নিধানে নরেনকে পাঠাইলেন।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালেই স্পর্শমণি ঠাকুরের স্পর্শ-প্রভাবে লাটু এক উচ্চতর অধ্যাত্ম-স্তরে আরূঢ় হন। তাঁহার ধ্যানতন্ময়তা এমন বাড়িয়া যায় যে এসময়ে প্রায়ই, ঠাকুর নিজের হাঁটু দিয়া শিষ্যের বক্ষ ঘর্ষণ করিতেন, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতেন।

সদ্‌গুরু রামকৃষ্ণের নিকট হইতে লাটু যে সাধনা ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সারা জীবন তাহা ঠাকুরের নাম করিয়া, ঠাকুরের উপদেশ হিসাবে, মুমুক্ষুদের মধ্যে তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন।

সাকার ও নিরাকার ধ্যান সম্বন্ধে লাটু মহারাজ বলিতেন, "ভক্ত নামরূপ নিয়ে ধ্যেন করে, আর জ্ঞানী জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিয়ে ধ্যেন করে। যারা যা নিয়েই ধ্যেন করনা কেনো, শেষে দুজনাই এক জায়গায় পেঁছায়। জানবে ধ্যেন জমলে নামও ছুটে যায়। তখন একটা বোধ থাকে। বাকী, সেটা যে কি তা মুখে বলতে পারা যায় না। ধ্যেন জমলেই অখণ্ডের বোধ এসে যায়। এ ব্যেপার মুখে বলা যায় না। সেই বোধে দেহজ্ঞান থাকে না, মনের সংকল্প ও বিকল্প কুছু থাকে না, বুদ্ধিভি চলে যায়, তখন শুধু বোধ থাকে।"

আপন অধ্যাত্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা লাটু মহারাজ তাঁহার প্রজ্ঞা-প্রোজ্জ্বল সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন,—"জানো, সাধনকালে জ্যোতি-ট্যোতি দেখা কুছু নয়—ওসব দেখলে শুধু বিশ্বাস দৃঢ় হয়। যখন দেহবোধ চলে যায় আর অন্তর শুদ্ধ, পবিত্র হয়, তখন বুঝতে পারা যায় যে, জ্যোতির পারে এক মুলুক আছে —যে মুলুকের খবর বুদ্ধি-বিচার দিয়ে মেলে না। একদিন তো কাশীপুরে ওনার (শ্রীরামকৃষ্ণের) মাথায় হাত বুলুচ্ছিলুম, তখন তো হামার সামনেই সেই মুলুক খুলে গেলো। সেই মুলুকে যা দেখেছি তা চোখ ধরতে পারে নি, যা আস্বাদন করেছি তা জিব নিতে পারে নি। কিন্তু সব কুছু হামি অনুভব করেছি।"

কাশীপুরের বাগানে রামকৃষ্ণের সেবায় ভক্তগণ প্রাণ-মন ঢালিয়া দেন। নিরন্তর গুরু পরিচর্যার মধ্যেই তাঁহারা অধ্যাত্ম সাধনার মূল ধারাটির সন্ধান প্রাপ্ত হন। এ সময়ে সবাই ঠাকুরকে নিয়াই দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার অবসর বড় একটা মিলিত না।

কেউ কেউ এ সময়ে মন্তব্য করেন, "তাই তো ভজনের সুযোগ আর তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। যারা সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এসে তপস্যা শুরু করছে, তাদের দশা কি হবে?"

লাটু মহারাজ উত্তেজিত হইয়া বলেন, "দ্যাখো, আসলি উপাসনা হচ্ছে তাঁর সেবায়। তিনি (ঠাকুর) হামাদের বলতেন, 'উপাসনা করবার সময় ভাবতে হয় যেন

তিনি (ইষ্টদেব) সামনে রয়েছেন আর তুমি তাঁর পা ধুয়ে দিচ্ছো, তাঁকে নাওয়াচ্ছো, তাঁকে খাওয়াচ্ছো, তাঁকে সাজাচ্ছো গোছাচ্ছো, হৃদয়ে বসাচ্ছো, যেন ফুল দিয়ে পূজো করছো'—হামাদের তো সেখানে ঠাকুরের সেবায় তাই হোত।"

গুরু-অন্ত প্রাণ-সাধকের নয়নযুগল এই সেবাধর্মের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিতে করিতে দিব্য জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত।

একদিন রামকৃষ্ণ বাগানে বেড়াইতে নামিয়াছেন। পরমভক্ত গিরিশের স্তুতিতে তাঁহার মধ্যে দেখা গেল দিব্য ভাবাবেশ।

"তোমাদের চৈতন্য হোক্" বলিয়া কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন সম্মুখস্থ ভক্তদের আশীর্বাদ করিলেন। পুণ্যময় দেহের স্পর্শে সবাই ধন্য হইল। লাটু কিন্তু সেই সময়ে সোরগোল শুনিয়া এবং ভক্তদের আহ্বান পাইয়াও ছুটিয়া আসেন নাই। কল্পতরুরূপী ঠাকুরের কাছে সেদিন তিনি কেন আশিস্-প্রার্থী হন নাই, এ প্রশ্নের উত্তরে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "তিনি তো আশীর্বাদ দিয়ে হামাদের ভরপুর ক'রে দিয়েছেন। আবার হামি কি চাইবো তাঁর কাছে?"

অহেতুক গুরুকৃপার রসধারা যাঁহার সারা সত্তাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, প্রাণ-সর্বস্ব সেই ঠাকুরের নিকট লাটুর নূতন করিয়া আর কি ই বা চাহিবার ছিল?

লাটুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে সর্বসাধারণ এবং ঘনিষ্ঠ মহলের কাছে 'অদ্ভুত' রূপেই চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাই তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইয়াছিল অদ্ভুতানন্দ স্বামী। বহুর মধ্যে লাটু মহারাজ ছিলেন একক, সাধারণের মধ্যে ছিলেন অসাধারণ – এবং রহস্যময়।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকৃষ্ণ শুদ্ধসত্ত্ব কিশোর লাটুকে সারদামণির সম্মুখে উপস্থিত করেন। সারদামণির নানা গৃহকর্মে সহায়তা করিয়া ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া লাটু তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান রূপে চিহ্নিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদামণির স্নেহরসে যেমন লাটু বর্ধিত হন, তেমনি উভয়ের সঙ্গে এক স্বাভাবিক অপত্য-সম্বন্ধের যোগেও নিজেকে তিনি যুক্ত করিয়া নেন। মমত্ব ও নির্ভরতার দিক দিয়া এ যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন।

বরানগরের মঠে একদিন ভোরবেলায় শশী মহারাজ দেখিতে পান যে ঠাকুরের হালুয়াভোগ রান্নার কড়াইটি অপরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। গত রাত্রে লাটু মহারাজ তাহাতে ছোলা সিদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহা পরিষ্কার করিতে ভুল হইয়াছে। ঠাকুরের সেবায় ত্রুটী হইলে একান্ত ভক্ত শশী মহারাজের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া যাইত। তিনি লাটু-মহারাজকে গালি দিতে লাগিলেন।

তিরস্কারের উত্তরে বালকের মতো লাটু মহারাজ ভয় দেখাইয়া বলিলেন, 'তোমার বাবা-মা আর হামার বাবা-মা কি আলাদা আছে? আমি মাকে আজই পত্র দিব।"

ঠাকুরের লোকান্তরের পর শ্রীমার সঙ্গে লাটু মহারাজ বৃন্দাবনধামে তীর্থভ্রমণে যান। খামখেয়ালী সাধক-পুত্রকে নিয়া এই সময়ে মার ঝামেলা কম পোহাইতে হইত না। আহারে বসিয়া লাটু সমস্ত খাবার বানরদের বিলাইয়া দিতেন। আবার অসময়ে আসিয়া মা ও তাঁহার সঙ্গিনীদের কাছে নিজের খাবার চাহিতেন, তাঁহাদের বিব্রত

করিতেন। যমুনার তীরে কখনো বা সারা দিনমান ঘুরিয়া আসিয়া বালকবৎ লাটু মায়ের নিকট আব্দার করিতেন, "বড় খিদে পেয়েছে মা, জলদি হামায় কিছু খাবার দিন।"

"আমার লাটুর সবই অদ্ভুত," এই মন্তব্য করিয়া শ্রীমা তাঁহার সমস্ত স্নেহের দাবি স্মিতহাস্যে মানিয়া নিতেন।

শ্রীমার উপর লাটু মহারাজের শাসনেরও এক মনোরম বিবরণ আছে। বলরামবাবুর ভবনে মা সেদিন আসিয়াছেন। বহির্বাটীতে লাটু তখন অবস্থান করিতেছেন। সাগ্রহে তাড়াতাড়ি এই খেয়ালী পুত্রের সঙ্গে তিনি দেখা করিতে আসিলেন।

লাটু বাড়ির অভ্যন্তরে মেয়েমহলে ইচ্ছা করিয়াই এতক্ষণ যান নাই। এবার মা নিজেই বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ জুড়িলেন—"কি বাবা লাটু, কেমন আছ?"

লাটু বিপদে পড়িলেন। উষ্মা-জড়িত কণ্ঠে মাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি অন্দর ঘরের মেইয়া, সদর বাটীতে তুমি কেন? ভেতরে যাও। হামি তো তোমার গোলাম আছি। হামি সেখানে গিয়ে তোমার সাথে দেখা করছি।"

অদ্ভুতানন্দের অদ্ভুত খেয়াল সারদাদেবীর জানা ছিল। তাই হাসিতে হাসিতে তখনি লাটুর অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি চলিয়া যান। এবার অন্দরমহলে বাড়ির ভিতরে গিয়া মায়ের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া লাটু যুক্ত করে দাঁড়াইয়া রহিলেন।[১]

বরানগর মঠে নরেন্দ্রনাথ লাটুকে বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাস নিবার নির্দেশ দেন। এই হোমের পূর্বে পিণ্ডদান করিতে হয়। লাটু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক ভঙ্গীতে পিতৃ-পুরুষকে আহ্বান করিলেন। তারপর সরল অনাড়ম্বর গ্রাম্য ভাষায় কহিতে লাগিলেন, "এ মেরা বাপজী, হিয়া আব, হিয়া বৈঠ্। ইয়া পুজা লে, পিণ্ড লে, পানি লে।"

অদ্ভুত চরিত্র, অদ্ভুত ভাবময়তা ও ধ্যানানুরাগের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ লাটুর নামকরণ করিলেন অদ্ভুতানন্দ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর লাটু মহারাজের ত্যাগ বৈরাগ্য আরও বাড়িয়া যায়। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশটি অধিকতর নিষ্ঠার সহিত আঁকড়াইয়া ধরেন।

মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বেচ্ছাবিহার করিতেন লাটু মহারাজ, আর গঙ্গার তীরে বসিয়া করিতেন জপ-ধ্যান। বেশভূষা বা আহার্যের দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই—কঠোরতপা তপস্বীর একাগ্র সাধনসত্তার সম্মুখে বিরাজিত শুধু তাঁহার ইষ্টদেব।

বলরাম মন্দিরে বা উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাপাখানায় আপন খেয়াল মতো কখনো কখনো কিছুদিন তিনি বাস করিতেন, আবার কোথায় হইতেন অদৃশ্য।

অর্থের প্রতি তাঁহার তীব্র বিতৃষ্ণা যেমন ছিল, চিরজীবন নারী সান্নিধ্য এড়াইয়া চলার ঝোঁকও তেমনই প্রবল।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে লাটু মহারাজ সেবার কাশ্মীরে বেড়াইতে গিয়াছেন।

---

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা

হাউস বোটে সকলে উঠিতে যাইবেন, লাটু অকস্মাৎ লাফাইয়া মাটিতে পড়িলেন। বোটের মাঝি সপরিবারে এককোণে বাস করে। নৌকায় নারীরা রহিয়াছে দেখিয়া লাটু বাঁকিয়া বসিলেন, এই হাউস বোটে তিনি কিছুতেই উঠিবেন না। স্বামীজী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তবে নৌকায় তোলেন।

একান্তচারী, আত্মগোপন প্রয়াসী লাটু মহারাজ কোনো অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করেন নাই। উচিত-বক্তারূপেই সর্বত্র তিনি পরিচিত ছিলেন।

একবার এক প্রবীণ গৃহী ভক্ত বরানগর মঠে আসেন এবং মাতব্বরী চালে তরুণ সন্ন্যাসীদিগকে আঘাত দিয়া কথা বলিতে থাকেন। বয়সে বড় বলিয়া সকলে ইঁহার অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইতেছেন। লাটু মহারাজের কাছে আসিয়া ভদ্রলোকটি তাঁহার বৈরাগ্য-প্রবণতাকেও উপহাস করিতে ছাড়িলেন না।

এক মুহূর্তে লাটু জ্বলিয়া উঠিলেন। সরোষে কহিলেন, "আঁষচুপড়ীর গন্ধ না হলে মেছোনীদের ঘুম হয় না, শুনেছি। আপনারও যে সেই অবস্থা। আপনি ত্যাগের পথে না এসে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা কি বুঝবেন? জনক রাজার কথা বলছেন, বাকী, জনক রাজা কি সবাই হোতে পারে?"

অভিভাবকত্ব-প্রয়াসী প্রবীণ ব্যক্তিটি লাটুর তিরস্কারে একেবারে চুপসাইয়া গেলেন।

বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে নিয়ম করেন যে ভোর চারটায় ঘণ্টা বাজানো হইবে এবং সবাই তখন ধ্যান-জপ শুরু করিবে। এ আদেশ জারীর পরদিনই দেখা গেল, লাটু-মহারাজ তাঁহার কাপড়-গামছা নিয়া মঠ ত্যাগ করিতেছেন।

সবাই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে লাটু বলেন, "হামি তোমার ওসব কানুন মানতে পারবো না। ঘড়ি ধরে হামার মন ধ্যেনে বসে যাবে না।"

স্বামীজী তাঁহাকে বুঝান, "নূতন সাধকদের জন্যই এই বিধি, লাটু, তোর জন্য এসব নয়।" অনেকক্ষণ পরে লাটু নিরস্ত হন।

আপ্তকাম, রামকৃষ্ণময়, এই ত্যাগী সন্ন্যাসীর নিজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক গঠনের সহিত মঠ স্থাপনা ও কর্মানুষ্ঠানের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে নাই। তাই মঠের গুরুভাইদের সহিত আত্মিক যোগ রাখিয়া লাটু নিভৃত ও নিজস্ব আবেষ্টনীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন।

অথচ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল চিরজাগ্রত। নরেন্দ্র যে ঠাকুরের চিহ্নিত শিষ্য ও প্রতিনিধি একথা তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন। তাই উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দের সংগঠন হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখিলেও লাটু মহারাজ গুরুভাইদের প্রতি ও মঠের প্রতি গভীর মমত্ব চিরদিন পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

লাটু মহারাজ স্বেচ্ছামতো বিহার করেন, যত্রতত্র ভিক্ষা গ্রহণ করেন, ইহা অনেকের মনঃপূত নয়। এদিকে মঠের অধ্যক্ষ রাখাল মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি গোপনে কয়েকজন ভক্তকে নিয়োজিত করেন, তাঁহারা যেন লাটু মহারাজকে বুঝাইয়া ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করেন।

লাটু মহারাজ বুঝিলেন, তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তিতে মঠের সুনাম নষ্ট হইবে বলিয়া রাখাল মহারাজ আতঙ্কিত হইয়াছেন। আগত ভদ্রদের তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ঠিকই তো, রাজাকে অনেক দিক ভেবে চলতে হয়। মঠের সুনাম তারেই যে রক্ষে করতে হবে। তাই সে হামাকে এমন অনুরোধ জানিয়েছে তোমাদের থ্রু দিয়ে।"

ইহার পর তিনি বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসীর অবশ্য করণীয় মাধুকরী বা ভিক্ষা-বৃত্তি ত্যাগ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার ভাবাবেগ ও উৎসাহ বশে বলিতেছিলেন, "ওরে দেখছিস্ কি? যা ক'রে গেলুম, পরে তার ফল বুঝতে পারবি। এর পরে দেখবি—লোকের পর লোক আসছে। তখন বুঝবি এই বিবেকানন্দটা কি ক'রে গেছে।"

তেজস্বী, উচিত-বক্তা লাটু মহারাজ চট্ করিয়া উত্তর দিলেন, "ভাই তুমি আর কি নোতন করেছো? শংকর বুদ্ধ এঁরা যা ক'রে গেছেন, তুমি তো তার উপর শুধু দাগা বুলিয়েছ। এর বেশী কুছু করেছ কি?'

উদারচেতা স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন, কথাটা অপ্রিয় হইলেও সত্য। উত্তরে কহিলেন, "ঠিক বলেছিস লেটো। ঠিক। শুধু দাগাই আমি বুলিয়েছি।"

একবার লাটু মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে তীর্থপরিক্রমায় বাহির হন। কয়েকটি পণ্ডিত লাটু মহারাজকে প্রশ্ন করিতে গেলে, স্বামীজী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠেন, "আপনারা আগে আমায় প্রশ্ন করুন। আমি যদি সদুত্তর না দিতে পারি তবেই আমার এই প্রবীণ গুরুভ্রাতাকে বিরক্ত করবেন।"

বলা বাহুল্য, স্বামীজীকে ডিঙাইয়া লাটুর নিকট কাহাকেও পৌঁছিতে হইল না। দেশে ফিরিয়া আসিয়া লাটু মহারাজ সবাইকে বলিলেন, "হ্যাঁ, গুরুভাই হচ্ছে লোরেন, আমি যে শালা এক মুখ্যু তা জানতেই দিলে না।"

গুরুকৃপায় কাশীপুরে লাটু মহারাজের প্রথম সমাধির আস্বাদন লাভ হয়। ইহার পর তিনি মহাধাম জগন্নাথ পুরীতে গমন করেন। লাটু বলিতেন, "হামনে দারু-ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম—যে রূপ দেখে মহাপ্রভু চোখের জলে ভেসে যেতেন, হামাকে আপুনি তাই দেখান। এমনি শরণ নেবার পর তিনি হামার প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের আট বৎসর পর লাটু মহারাজের আবার একবার সমাধি হয়। এ কথাটি তিনি তাঁহার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, "হামার উপর তাঁর অশেষ কৃপা, তাই সাত-আট বছর মেহনতি করিয়ে তিনি ফিন্ সেই অবস্থায় হামাকে তুলে দিলেন। একদিন গঙ্গাতীরে বসে ধ্যান করছি, আকাশ বাতাস ছেয়ে একটি জ্যোতি এলো, তার মাঝে অসংখ্য জ্যোতি, নিজেকে হারিয়ে ফেল্লুম। বাবা, সে মুলুক থেকে নেমে এসে যে কি আনন্দে রইলুম—তখন সব কিছু আনন্দময় হয়ে গিয়েছে।"

সারা অস্তিত্বে বিস্তারিত পরমানন্দের এই ধারাটি লাটু মহারাজ শুধু নিজের জীবনেই ধরিয়া রাখেন নাই, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই অমৃত তিনি মুক্তিকামী সাধকদের মধ্যে বিলাইয়া গিয়াছেন।

জীবনের শেষ আটটি বৎসর লাটু মহারাজ কাশীধামে যাপন করেন। ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ এই রামকৃষ্ণ সন্তান অল্পকাল মধ্যে কাশীর সাধকসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। নিভৃতে আপন সাধনভজন নিয়া রত থাকিলেও বহু গৃহী ও সন্ন্যাসী সাধক তাঁহার উপদেশ লাভে ধন্য হন, নিজেদের আত্মিক জীবন গঠনে অনেকে সমর্থ হন।

দেহান্তের এক বৎসর আগে লাটু মহারাজের পায়ে একটি গ্যাংগ্রিন্ হয় এবং বার বার ইহাতে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। প্রতি অস্ত্রোপচারের সময় সার্জনেরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেন, মহাপুরুষের চোখে মুখে দুঃসহ যন্ত্রণার কোনো চিহ্নই নাই। নির্বিকার চিত্তে ইষ্টধ্যানে তিনি রহিয়াছেন সদা বিভোর, আর দেহবোধ হইয়াছে তিরোহিত।[১]

কাশী হাড়ারবাগের বাড়িতে শরৎ মহারাজ রোজ শয্যাশায়ী লাটু মহারাজকে দেখিতে আসিয়াছেন।[২] সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সাধু, কেমন আছো ?"

"শরীর ধারণ বিড়ম্বনম্"— সহাস্যে উত্তর দেন লাটু মহারাজ।

লাটু মহারাজকে প্রণাম করিয়া শরৎ মহারাজ বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। এমন সময়ে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর এক সন্ন্যাসী প্রশ্ন করেন, "আপনি লাটু মহারাজকে প্রণাম করেন কেন ?"

"সে কি। সাধু যে আমাদের সবারই আগে ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমাদের সন্ন্যাসী গুরুভাইদের মধ্যে লাটু মাহারাজই জ্যেষ্ঠ। তাঁকে প্রণাম করবো না, বলিস কিরে !"

সেদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের একজন ভক্ত মৃত্যু পথযাত্রী লাটু মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ জগৎ কি এখন আর আপনাদের কাছে ভার-বোঝা বলে মনে হয় ?"

লাটু স্মিতহাস্যে কহিলেন, "দ্যাখো, গঙ্গার জলে ডুব দিলে, মাথার ওপর হাজার মণ জল থাকলেও ভারটা বুঝা যায় না। তেমনি ভগবানের সংসারে ভগবান্‌কে ধরে ডুব দিলে, সংসারের বোঝা আর বোঝা বলে মনে হয় না, সংসার তখন আনন্দের খেলা বলে মনে হয়। তুলসীদাসের একটা কথা মনে রেখো —'যো রাকো শরণ লিয়ে, সে রাখে তাকো লাজ। উলট্ জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ।' আরো একটি কথা জেনে রাখ্‌বে 'তোম জ্যায়সা রাম পা, তোমসে ত্যায়সা রাম। ডাহিনে যাও তো ডাহিনে যায়, বামে যাও তো বাম।"

১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল লাটু মহারাজের বিদায়ের লগ্নটি আসিয়া গেল। পরম সন্তোষের সহিত প্রভু বিশ্বনাথের চরণামৃত পান করিয়া চিরতরে তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন। রামকৃষ্ণের মহাসাধকের জীবনধারাটি এবার মিশিয়া গেল সচ্চিদানন্দ সাগরে।

---

১ দ্য ডিসাইপল্‌স্ অব রামকৃষ্ণ—অদ্ভুতানন্দ।

২ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

রামকৃষ্ণের মানসপুত্র ও ঘনিষ্ঠতম লীলাপার্ষদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জীবন যেন রামকৃষ্ণেরই এক ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির অপূর্ব সমাহার দেখা গিয়াছিল তাঁহার সাধনজীবনে, সেই সঙ্গে অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল গুরুর উদার ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী। চরিত্র, আচরণ ও ব্যক্তিত্বের এই ঐক্য ছিল গুরু ও শিষ্যের মধ্যে, ফলে উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল অপূর্ব একাত্মকতাবোধ। প্রাণপ্রিয় ভক্ত ও সহচর রাখাল সদাই থাকিতেন ঠাকুরেরই রসে অভিসিঞ্চিত।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেবী ভবতারিণীর কাছে স্বগতোক্তি করিতে শুনা যায়, –"মা, তোমার কাছে কাতর হয়ে বলেছিলাম, আমারই মতো আর একজনকে সঙ্গী ক'রে দাও, তাই বুঝি রাখালকে হেথায় পাঠিয়েছো।"

শুধু সঙ্গী নয়, রাখাল ছিলেন ঠাকুরের লীলাসঙ্গী। ঠাকুরের ঐহিক জীবন ও অধ্যাত্মজীবনের অন্তরঙ্গ জন।

রামকৃষ্ণ ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিকরেরা রাখালকে আদর করিয়া ডাকিতেন—রাখাল-রাজ। আর উত্তরকালে তিনি হন রামকৃষ্ণমণ্ডলীর রাজা। এই পদগৌরব ও নেতৃত্বের ইঙ্গিত ঠাকুর নিজেই দিয়াছিলেন।

ঠাকুরের এই ইঙ্গিতের নিহিতার্থ বুঝিতে বিবেকানন্দের ভুল হয় নাই। তাই রাম-কৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষের পদে এই প্রিয়তম গুরুভাইকেই তিনি বরণ করিয়াছিলেন। এই পদের গুরুদায়িত্ব রাখালও অবলীলায় পালন করিয়া গিয়াছেন।

মঠের কাজের সংগঠন ও প্রসার, জনসেবা এবং আর্তত্রাণ, সাধন-প্রয়াসী ভক্ত-শিষ্যদের পরিচালনা এ ধরনের বহুমুখী অনেক কিছু কর্তব্য কর্মই তাঁহাকে করিতে হইত, আর এগুলি তিনি সম্পন্ন করিতেন অসাধারণ দক্ষতায়, স্মিতমুখে, প্রশান্ত চিত্তে।

মঠ পরিচালনার নিত্যকার সমস্ত কিছু জটিল ও বহুমুখী কাজ শেষ হইলেই রাখাল মহারাজ আপন মনে ডুব দিতেন আত্মিক সাধনার গভীরে। বহিরঙ্গ জীবন হইতে অন্তরঙ্গ লোকে উত্তরণের মধ্য দিয়া 'রাজা' হইতেন 'রাজর্ষি'। তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদের বলিতেন, "রাখাল হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার একটা বিরাট আধার। লক্ষ লক্ষ ভোল্টের শক্তি ওর ভিতরে সুপ্ত রয়েছে।"

রাখালের অধ্যাত্ম সাধনা ও সিদ্ধির কেউ প্রশংসা করলে স্বামীজী উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, বলিতেন, "রাজার স্পিরিচুয়েলিটি আঁচড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে কোলে করতেন, আদর ক'রে খাওয়াতেন, একসঙ্গে শয়ন করতেন, তার সঙ্গে কি কারো তুলনা হয় রে! রাজা আমাদের মঠের প্রাণ – আমাদের রাজা।"

রামকৃষ্ণের আদরের ধন, গুরুভ্রাতাদের মধ্যমণি, ধীর গম্ভীর সার্থক সাধক এই রাখাল মহারাজই উত্তরকালে বহুলখ্যাত হইয়া উঠেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে।

চব্বিশ পবগনাব অন্তর্গত গণ্ডগ্রাম শিকবা। এই গ্রামেই এক সম্পন্ন গৃহস্থ আনন্দমোহন ঘোষেব পুত্ররূপে উত্তবকালেব বহুজন বন্দিত বাখাল মহাবাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ আবির্ভূত হন। মাতা কৈলাসকামিনী ছিলেন পবম ভক্তিমতী মহিলা। পূজা-অর্চনা ধ্যান-ধাবণায সদাই তাঁহাব ঝোঁক ছিল। ভাগবত ও কৃষ্ণলীলার গ্রন্থাদি পাঠেও ছিলেন পবম উৎসাহিনী। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দেব ২১শে জানুযাবী তাঁহাব অঙ্ক আলোকিত কবিযা ভূমিষ্ঠ হয এক সুদর্শন শিশু। আদব কবিযা জননী ও পবিজনেবা নাম বাখেন বাখাল।

পাঁচ বৎসব বযঃক্রমকালে বাখাল তাঁহাব জননীকে হাবান, অতঃপব বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবীই তাঁহাকে পুত্র জ্ঞানে পালন কবিতে থাকেন, সযত্নে মানুষ কবিযা তোলেন।

শিশু বাখালেব স্বভাব বড অদ্ভুত। সঙ্গীদেব নিযা প্রাযই পূজাব খেলায থাকেন মত্ত। কখনো ঘোষেদেব পূজা মন্দিবে, কখনো বা বোধন তলায মা-কালীব বিগ্রহ নিযা আনন্দ কবেন। এই পূজা-খেলাব মধ্য দিযা মাঝে মাঝে কোন্ এক অজানা ভাব-গম্ভীব তন্মযতায শিশুচিত্ত তলাইযা যায, কখনো বা সঙ্গীদেব সাথে শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বাখাল বাহ্যজ্ঞান হাবাইযা ফেলেন। আত্মজনেবা শিশুকে নিযা উদ্বিগ্ন হইযা উঠে।

ছেলে বড হইতেছে, লেখাপডাব সুবন্দোবস্ত কবা দবকাব। অভিভাবকেবা ভাবিযা-চিন্তিযা স্থিব কবিলেন, বাখাল কলিকাতাব ভাল স্কুলে পডাশুনা কবিবে। বিমাতা হেমাঙ্গিনী দেবীব পিত্রালয কলিকাতায। স্থিব হয, সেখানে থাকিযাই ছেলে পডিবে। ইংবেজী স্কুল ট্রেনিং একাডেমিতে তিনি ভর্তি হইলেন।

সঙ্গেই সুন্দব একটি ব্যাযামাগাব। বাখাল সেখানে সোৎসাহে শবীব-চর্চা কবেন। স্কুলেব সহাধ্যাযী নবেনও সেখানে যাওযা আসা কবেন। প্রিযদর্শন তেজস্বী এই যুবক যেন এক আগুনেব ফুলকি। অনতিকালমধ্যে বাখাল তাঁহাব প্রতি খুব আকৃষ্ট হইযা পডেন এবং দুজনেব মধ্যে গডিযা উঠে অপূর্ব ঘনিষ্ঠতা। যে অমোঘ আকর্ষণে দুজনেব মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা জন্মে, যেভাবে তাহা পবিণত হয অচ্ছেদ্য আত্মিক সম্পর্কে, তাহাব তাৎপর্য কে সে সমযে বুঝিতে পাবিযাছিল?

বাংলাব শিক্ষিত তবুণসমাজে তখন কেশবচন্দ্রেব অপ্রতিহত প্রভাব। এই ব্রাহ্ম নেতাব অসাধাবণ ব্যক্তিত্ব, তাহাব আদর্শ চবিত্র ও বাগ্মিতা, প্রভাব বিস্তাব কবে বাখালেব তবুণ জীবনে। কেশবেব সংস্কাবপন্থী আন্দোলনে বাখাল আকৃষ্ট হন।

উন্নততব নৈতিক জীবন এবং ব্রহ্ম উপাসনাব আহ্বানও বাখালেব অন্তর্জীবনে গভীবভাবে কবে বেখাপাত।

অবসব ও সুযোগ পাইলেই ব্রাহ্মসমাজ গৃহে গিযা বসেন, উপনিষদেব মর্মার্থ গ্রহণ কবিতে চেষ্টা কবেন। আব প্রাণে জাগে তীব্র আকুলতা, কি কবিযা পবমার্থ লাভ কবা যায? দিনবাত এই ভাবনাতেই থাকেন বিভোব।

পডাশুনায ছেলেব অমনোযোগ দিন দিন বাডিতেছে। পিতা আনন্দমোহন চিন্তিত হইযা পডেন। বিবাহ দিলে সংসাবেব আকর্ষণ বাডিবে মনে কবিযা তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ কবেন। কোন্নগবেব ডাক্তাব ভুবনমোহন মিত্রেব কন্যাটি বড় সুলক্ষণা, পছন্দ কবিযা এই মেযেটিকেই বাখালেব বধূরূপে ঘবে আনা হয। এই বিবাহ সম্বন্ধকে সূত্র করিয়া বাখালেব অধ্যাত্মজীবনের সম্মুখে আসে এক পরম

সুযোগ। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সান্নিধ্য তিনি প্রাপ্ত হন, ধীরে ধীরে পরিণত হন নূতন মানুষে।

রাখালের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সাধক রামকৃষ্ণের অনুরাগী, ইঁহাদের মাধ্যমেই হঠাৎ একদিন তিনি ঠাকুরের পদমূলে আসিয়া পৌঁছেন।

পূত সলিলা গঙ্গাতটে, দক্ষিণেশ্বরে, ভবতারিণী মন্দিরে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। কিছুদিন যাবৎ সিদ্ধ মহাসাধকের অন্তরে জাগিয়াছে শুদ্ধসত্ত্ব আধার, ভক্তদলের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। জগন্মাতার নিকট তাই মাঝে মাঝে ব্যাকুল প্রার্থনা জানান—"মাগো, বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জিভ যে আমার জ্বলে গেল।"

মা আশ্বাস দেন, "তোর ভয় নেই। ত্যাগী শুদ্ধাত্মা ভক্তেরা সব এবার আসছে।"

বালকবৎ ঠাকুর আর একদিন আবদারের সুরে মাকে জানান, "মা, আমার তো সন্তান-টন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছে করে, একটি পরম শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে আমার সঙ্গে সব সময়ে থাকে। তেমনি একটি ছেলে আমায় এনে দে।"

এই প্রার্থনা জগজ্জননী পূর্ণ করিয়াছিলেন, জুটাইয়া দিয়াছিলেন পুত্রপ্রতিম শিষ্য রাখালকে।

বিবাহের পর রাখাল কোন্নগরে তাঁহার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। এই পরিবারটি ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরমভক্ত। রাখালের শ্যালক নিজেই সেদিন ভগ্নিপতিরে ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য দক্ষিণেশ্বরে নিয়া যান।

উভয়ে দেবপ্রতিম ঠাকুরকে প্রণাম করেন। কুশল প্রশ্নাদির পর ঠাকুর একদৃষ্টে রাখালের দিকে তাকাইয়া থাকেন—একি, এ ছেলেটি তো তাঁহার অচেনা নয়। অল্প কিছুদিন আগের কথা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রহিয়াছেন। হঠাৎ দেখিলেন, বটতলায় একটি দিব্য লাবণ্যময় বালক দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরের দিকে সে তাকাইয়া আছে সতৃষ্ণ নয়নে।

হৃদয়কে ডাকিয়া এই অলৌকিক দর্শনের কথা কহিতেই সে বলিয়া উঠিল, "মামা, আমি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝেছি। তোমার ছেলে হবে, তাই এটা তুমি দেখেছো।"

ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "সে কিরে? আমার তো মাতৃযোনি। আমার ছেলে কখনো হবে না।"

ইহার পরই আবার একদিন স্পষ্টতর রূপে দেখিলেন একটি দিব্য শিশু জগন্মাতার কোলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার দিকে ইঙ্গিত করিয়া মা সানন্দে কহিলেন, "এই দ্যাখ্ তোর ছেলে।"

রামকৃষ্ণ কিন্তু বড় ভয় পাইয়া গেলেন। দেবী এ আবার কি বলিতেছেন। গার্হস্থ্য জীবন তিনি চিরতরে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই জীবনেই কি আবার প্রবেশ করিতে হইবে? পুত্র জন্ম নিবে তাঁহার ঘরে?

অন্তর্যামিনী মা সহাস্যে কহিলেন, "না গো তা নয়। এটি হচ্ছে তোর মানসপুত্র।"

একথা শোনার পর তবে রামকৃষ্ণ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচেন।

আর একদিন আসে এই মানস সন্তানের বিষয়ে নূতন সংকেত। ঠাকুর ভাবনেত্রে দেখিতে পান, গঙ্গাবক্ষে মনোরম একটি পদ্মের উপর গোপবিহারী কৃষ্ণ বিরাজিত, আর

তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া আছে এক রাখাল-সখা—নূপুর পায়ে মনোহর ভঙ্গীতে সে নৃত্য করিতেছে।

এই দিব্যদর্শন যখন হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই ভক্ত মনমোহনের সঙ্গে রাখাল গঙ্গা অতিক্রম করেন, উপস্থিত হন দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র ভূমিতে। বিস্ময় ও কৌতুকভরা নয়নে ঠাকুর দেখিলেন—এই তো সেই পূর্বদৃষ্ট গোপ বালক। জগজ্জননীই বুঝি এবার তাহাকে পাঠাইয়াছেন।

ঠাকুর অনেকক্ষণ রাখালের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর হইল—শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ।

মুহূর্তমধ্যে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। গদ্‌গদ কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বলিতে থাকেন, "সেই নাম—রাখাল, ব্রজের রাখাল।"

সাক্ষাতের পর বেশ কিছুক্ষণ পরমানন্দে কাটিয়াছে। এবার রাখালকে সস্নেহে সুধাস্নিগ্ধ স্বরে বলেন, "আবার শিগ্‌গীর এসো একদিন। বুঝলে? শিগ্‌গীর এসো।"

তরুণ রাখালের জীবনে ঠাকুরের এই দর্শন জাগাইয়া তোলে অভূতপূর্ব আলোড়ন। এ আলোড়ন সহজে নিবৃত্ত হইতে চাহে না। ঠাকুরের মোহন মূর্তি, মধুর কণ্ঠ, আর সস্নেহ আহ্বান বার বার মনে পড়িতে থাকে। কেবলই মনে হয়, এ যে কত জন্মের চেনা জন, এ যে আত্মার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়। জন্মান্তরের ধারা বাহিয়া এই আত্মিক যোগ যেন চলিয়া আসিয়াছে।

রাখাল কলিকাতায় ফিরিলেন বটে, কিন্তু মন পড়িয়া রহিল ঠাকুরের কাছে। ব্যাকুল হইয়া আর একদিন একলাই দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া যান। ঘনিষ্ঠ আত্মজনের মতো স্নেহের সহজ ও স্বাভাবিক দাবি নিয়া ঠাকুর প্রশ্ন করেন—"তোর এখানে আসতে এত দেরি কেন রে? তোর জন্য যে আমি ভেবে ভেবে এ ক'দিন অস্থির।"

রাখাল তো অবাক। শুধু একটি দিনের দেখা, এরই ঠাকুর মধ্যে তাঁহাকে এমন আপনার করিয়া নিয়াছেন। মন তাঁহার অজানা আনন্দে ভরিয়া উঠে। নিঃশব্দে ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া থাকেন ভাবসমুদ্র অন্তরে কেবলি তরঙ্গায়িত হইতে থাকে।

ইহার পর হইতে রাখাল মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। আর ঠাকুরকে দেখিলেই হইয়া যান একটা আনন্দোজ্জ্বল শিশু। ঠাকুর যেমন তাঁহাকে আদর করেন, যুবক রাখালও তেমনি সহজ অধিকারের বলে তাঁহার কোলেই কখন কখন চড়িয়া বসেন। আবদারের যেন সীমা নাই, ভুলিয়া যান যে তিনি একটি পূর্ণ বয়স্ক যুবক। ঠাকুরের এ বাৎসল্য লীলা চলে অব্যাহত ধারায়—স্নেহে প্রেমে, মমতায় শিশুপ্রতিম পবিত্রচেতা রাখালকে সদা অভিসিঞ্চিত করেন।

রাখাল ঠাকুরকে কখনো দেখেন স্নেহময় পিতা রূপে, কখনো সখারূপে, কখনো বা দেখেন তাঁহাকে করুণাময়, মুক্তিদাতা সদ্‌গুরুরূপে। গোড়া হইতেই এক সহজ সম্পর্কের মধ্য দিয়াই উভয়ের আত্মিক বন্ধনটি দৃঢ় হইতে থাকে।

আত্মীয়স্বজন কিন্তু রাখালকে নিয়া বড় বিপদে পড়েন। সে সদ্য বিবাহিত যুবক। নবজীবনের আনন্দ-আস্বাদ গ্রহণ করিবে, লেখাপড়ায় কৃতকার্য হইবে, উন্নতির জন্য হইবে যত্নবান্—ইহাই তো তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আচরণ দেখা যাইতেছে বিপরীত। সুযোগ পাইলেই সে দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া যায়। ভাবপ্রমত্ত

ঠাকুরের সান্নিধ্যে থাকিয়া নিজেও হন ভাববিহ্বল। সংসারের সব বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া উঠিতে থাকে।

পিতা আনন্দমোহন বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। কি করিয়া এ ছেলেকে সংশোধন করা যায়? কয়েকদিন তাঁহাকে ঘরের ভিতর জোর করিয়া আবদ্ধও রাখেন। একদিন পিতা বিষয়কর্মে লিপ্ত রহিয়াছেন, এই অবসরে রাখাল পলায়ন করেন, তারপর সোজা ঠাকুরের পদপ্রান্তে গিয়া নিপতিত হন। উত্তেজিত আনন্দমোহনও দক্ষিণেশ্বরে আসেন পুত্রের পিছু পিছু। ঘরে তাহাকে ফিরাইয়া নিতেই হইবে। কিন্তু ঝগড়া বা বিতর্ক করিবেন কাহার সঙ্গে? রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বড় অদ্ভুত, দর্শন মাত্রেই প্রাণ কাড়িয়া নেয়। আর কি সুমধুর প্রাণগলানো ব্যবহার! রাখালের প্রশান্তিও পিতার হৃদয়ে করে গভীর রেখাপাত। পুত্রের নবতর জীবনের সহিত সাময়িক সন্ধি স্থাপন করিয়া পিতা ফিরিয়া আসেন, তাহার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিতে থাকেন।

রাখাল দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া সাধনভজন করিতেছেন। সেদিন তাঁহার শাশুড়ী নিজের কন্যাকে নিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত। কন্যা ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণ করুক, আর রাখালও হোক সংসারী, ইহাই তাঁহার অন্তরের কামনা।

নানা মধুর বাক্যে রামকৃষ্ণ তাহাদের প্রবোধ দেন, প্রসন্ন করেন। হঠাৎ মনে তাঁহার প্রশ্ন জাগে—রাখালের বধূটি সুলক্ষণা তো? তাহার সংস্পর্শে আসিয়া মানসপুত্র রাখালের অধ্যাত্মজীবনের ক্ষতি হইবে না তো?

ঠাকুর তখনি মেয়েটিকে ডাকিয়া নেন, দেহের লক্ষণগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখেন। তারপর প্রসন্ন মনে মন্তব্য করেন, "নাঃ, ভয়ের কোনো কারণ নেই—দেবী শক্তি। স্বামীর ধর্মপথের বাধা হবে না কোনোদিন।

সারদামণি তখন নহবৎখানায় বাস করিতেছেন। খানিক বাদে ঠাকুর রাখালের স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন, নির্দেশ দেন, "ওকে বলবে, টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।"

রাখাল দিবারাত্র রামকৃষ্ণের কাছে অবস্থান করেন সহচররূপে। প্রাণ ঢালিয়া করেন তাঁহার সেবা পরিচর্যা। এখন হইতে ঠাকুর যখন ভাবাবিষ্ট হন, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, রাখালই তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মমতাভরে বুক দিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখেন।

নিত্যসঙ্গী নবীন সাধক রাখালকে ঠাকুর পরম যত্নে ও সতর্কতায় গড়িয়া তুলিতেছেন। যখন যেখানে যান, তরুণসুলভ যে চপলতাই রাখাল করুন না কেন, সর্বজ্ঞ ঠাকুরের চোখ এড়ায় না। চরিত্রের সামান্যতম ত্রুটি দেখিলেই নামিয়া আসে তাঁহার শাসন ও তিরস্কার।

নূতন উৎসাহে রাখাল সাধনভজন করিতেছেন। ঠাকুরের কৃপায় মাঝে মাঝে মিলিতেছে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আলোর ঝলক। সেদিন একটি বিশেষ ধরনের অনুভূতি লাভের জন্য মন তাঁহার বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিল, ঠাকুরকে তাই খুব চাপিয়া ধরিলেন।

সব কিছু অন্তর্যামী ঠাকুরের নখদর্পণে। শান্ত স্বরে বুঝাইলেন, "ওরে, এখনো তার সময় হয়নি, আর একটু সবুর কর্।"

রাখাল কিছুতেই ছাড়িবেন না, বার বার একথা নিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বড় বিরক্ত হইলেন। এ কি রকমের একগুঁয়েমি তার। তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

এবার রাখালের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। রুখিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "বেশ তো, আপনার কাছে কিছু চাইনে। আপনার এখানে থাকারও আমার কোনো দরকার নেই। আমি আজই, এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

কিন্তু কি পরম আশ্চর্য। রাখাল যতই চেষ্টা করুক না কেন, দক্ষিণেশ্বরের বহির্দ্বারটি তিনি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না। পদদ্বয় কি জানি কেন অসাড় হইয়া আসিতে থাকে। ধীরে ধীরে তাঁহার ক্রোধ পরিণত হয় বিস্ময়ে।

ভূমিতলে অসহায়ভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় করুণাময় প্রভু নিকটে আসিয়া জানাইলেন স্নেহ-আহ্বান।

ঠাকুরের চোখে মুখে কৌতুকোজ্জ্বল হাসি। স্নিগ্ধ স্বরে মন্তব্য করিলেন, "কিরে গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারলি? তবেই এবার বুঝে নে।"

রাখাল বুঝিলেন, ঠাকুরের শক্তি ও কৃপার এই গণ্ডীকে ভেদ করিয়া দূরে যাইবার শক্তি তাঁহার নাই। পরম কারুণিক সদ্‌গুরু তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। আর তাঁহারই নির্দিষ্ট পরিধির ভিতরে রাখালকে থাকিতে হইবে, করিতে হইবে আত্মসমর্পণ। আর এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই মিলিবে পরম কাম্য ধন।

আর একবারের কথা। কি এক কারণে ঠাকুর রাখালকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। ফলে রাখালের অভিমান উদগ্র হইয়া উঠে, ক্রোধভরে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

কৃপালু প্রভু অতঃপর নিজেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাখালের সঙ্গে আসিয়া দেখা করিলেন। এইদিন যে কথা কয়টি বলিলেন, তাহা তাঁহার মতো শক্তিধর অধ্যাত্ম-শিল্পীর উপযুক্ত।

রাখালকে বলিলেন, "ওরে, এখানকার কিন্তু শ্রাবণ মাসের জল নয়। জানিস তো, শ্রাবণ মাসের জল হুড়হুড় ক'রে আসে আর বেরিয়া যায়। এখানে পাতালফোঁড়া শিব। বসানো শিব নয়। তুই রাগ ক'রে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে এলি, আমি মাকে বললুম—মা, এতে ওর অপরাধ নিস নি, ও যে নিতান্ত বালক।"

রাখাল অতঃপর তাঁহার স্বস্থান অর্থাৎ ঠাকুরেরই চরণ প্রান্তে ফিরিয়া আসিলেন।

অল্প কিছুকাল পরেই রাখালের সাধনজীবনে জাগ্রত হয় এক অপূর্ব অধ্যাত্ম-অনুভূতি। সেদিন তিনি ঠাকুরের পদসেবায় নিরত আছেন, হঠাৎ এক দিব্য জ্যোতির ছটায় সারা দেহ মন তাঁহার উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তারপর সর্বসত্তা প্লাবিত করিয়া নামিয়া আসে ভাবাবেশের জোয়ার। ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান হয় তিরোহিত। সংবিৎ ফিরিয়া পাইবার পর বুঝিলেন, এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি ঠাকুরের কৃপাপ্রসাদের ফল। যে বস্তু লাভ করার জন্য সামান্য কিছুদিন আগে তিনি আন্দোলন করিয়াছেন, রোষভরে ঠাকুরের সঙ্গে বাতবিতণ্ডা করিয়াছেন, এ যে তাহাই। এই দিনকার অভিজ্ঞতাটি উত্তর জীবনে তাঁহার স্মৃতিতে চিরজাগরূক ছিল।

রাখালের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রায় ছয়-মাস পরে নরেনের সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। প্রিয়বন্ধু নরেনের প্রতি ঠাকুরের রহিয়াছে অপার স্নেহ, দুর্বার আকর্ষণ। নরেনও ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসেন, হৃদয়ের জ্বালা জুড়ান। উভয়ের এই ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া রাখালের আনন্দের অবধি নাই।

সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ মন্দিরের বিভিন্ন বিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম করিতেছেন। রাখাল তাঁহার সঙ্গে, তিনিও ভক্তিভরে হইতেছেন প্রণত। নরেন তখনো তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের মনোভাব ও ধরণধারণ বর্জন করেন নাই। রাখালের এই ভক্তি গদ্‌গদ ভাব, এই দৈন্যময় প্রণাম নিবেদন তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।

রাখাল নরেনেরই সঙ্গে একত্রে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার পত্রে সহি করিয়াছেন, তারপর আর দেবদেবী বিগ্রহকে প্রণাম করার তাঁহার অধিকার কই? সত্যসন্ধ তেজস্বী নরেনের মনে হইল, এতো সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। রাখালকে ডাকিয়া নিয়া কঠোর ভাষায় তিনি তিরস্কার করিলেন।

রাখাল স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, নরেনের এ আক্রমণের সম্মুখে বড় জড়সড়ো হইয়া পড়িয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন। নরেনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ওরে, সকলেরই প্রথমটায় নিরাকার বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া, রাখালের সাকারে বিশ্বাস হয়েছে - নিজের বিশ্বাস অনুযায়ীই তো ও চলবে। ওর যে সাকারেরই ঘর।"

ঠাকুরের এই বিশ্বাসদৃপ্ত কথায় নরেনকে নিরস্ত হইতে দেখা যায়। নূতন জামাই —তাই শ্বশুরবাড়ি হইতে রাখালের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ আসে। কিন্তু সংসারের আকর্ষণ তাঁহার শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাই নূতন দাম্পত্যজীবন আস্বাদনের জন্যও আর যেন উৎসাহ পান না। সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানও তাঁহার কাছে আজকাল বিরক্তিকর।

অন্তর্যামী ঠাকুরের কিন্তু হিসাবে ভুল নাই। দিব্য দৃষ্টি সহায়ে বুঝিতে পারেন, রাখালের অবচেতন মনে সূক্ষ্ম ভোগেচ্ছা কিছু কিছু রহিয়াই গিয়াছে, এগুলি ক্রমে ক্রমে উৎসাদিত করিতে হইবে। এ সম্পর্কে তিনি উত্তরকালে বলিতেন, "রাখাল যে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল বাড়ি-ঘর ছেড়ে। তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতুম—একটু ভোগ বাকী ছিল কিনা।"

রাখাল মাঝে মাঝে নিজের গৃহে চলিয়া যান, দুই চারদিন অবস্থান করিয়া আবার ফিরিয়া আসেন দক্ষিণেশ্বরে। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবেরা তর্ক করেন, "রাখাল, তুমি সাধনভজনে মেতেছো, মুক্তির জন্য অভিলাষী হয়েছো, তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার স্ত্রীর তাতে কি? সে বেচারা অসহায়, কোনো দোষই তো সে করে নি। তাকে ত্যাগ করলে কোন্ ধর্ম লাভ হবে, বল তো?"

পত্নীর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মাঝে মাঝে রাখালের দুশ্চিন্তা হয়। একদিন তো সরল মনে ঠাকুরকেই বলিয়া বসিলেন, "তাই তো, আমার স্ত্রীর কি উপায় হবে? তার দুর্দশার জন্য শেষটায় কি আমিই দায়ী হবো? পাপের ভাগী হবো?"

ঠাকুর যেন কথাটি কানেই নেন না, নীরব নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া থাকেন। পলক-হীন নয়ন দুটিতে বিরাজিত পরম নির্লিপ্তি। রাখাল বড় বিস্মিত হইয়া যান। নিজ জীবনের জটিল প্রশ্নটি তিনি ঠাকুরের কাছে উত্থাপন করিয়াছেন, সিদ্ধান্তের জন্য একান্ত

বসিযা বাখাল সেদিন জপ কবিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, সাবা কক্ষটি এক অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইযা উঠিযাছে। শুধু তাহাই নয, এই জ্যোতিব প্রবাহ ক্রমে আবো তীব্র হইযা উঠে, তাবপব অগ্রসব হয জপনিবত বাখালেব দিকে।

একি অদ্ভুত দৃশ্য। বাখাল কি জানি কেন ভয পাইযা গেলেন। ছুটিয়া গিযা আশ্রয নিলেন ঠাকুবেব কক্ষে। বিস্মিত ও বিমূঢ হইযা অনেকক্ষণ সেখানে চুপচাপ বসিযা রহিলেন।

ঠাকুব ফিবিযা আসিযা আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। তাবপব হাসিযা কহিলেন, "কিরে, তুই না ক্ষোভ কবিস দর্শন-টর্শন তেমন কিছু হচ্ছে না। আবাব তা যখন হয, ভযে পালিযে আসিস্। তা হলে কি কববি বল ?"

বাখাল বুঝিলেন, ভ্রান্ত বুদ্ধিবশতঃ নিজেব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি বড বেশী ব্যগ্র হইযা পডিযাছিলেন। ঠাকুব সদ্‌গুরু, অন্তর্যামী, তাঁহাব কাছে তিনি চিবতবে আত্মসমর্পণ কবিযা আছেন। কাজেই সকল দাযিত্বভাব যে তাঁহারই। এ কথাটি বিস্মৃত হওযা তো বাখালেব পক্ষে শোভন হয নাই।

অপব একদিনেব কথা। বাখাল মন্দিবেব সম্মুখস্থ নাটমন্দিবে বসিযা একান্ত-মনে জপ কবিতেছেন। ধীবে ধীবে সাবা সত্তায নামিযা আসিল ধ্যানেব স্রোত, তবুণ সাধক তাহাব গভীবে সত্তায নিমজ্জিত হইযা গেলেন।

এমন সময সেখানে ঘটিল বামকৃষ্ণেব আবির্ভাব। ভাবতন্ময অবস্থায টলিতে টলিতে উপস্থিত হইলেন বাখালেব সম্মুখে। দৃপ্তস্ববে একটি মন্ত্র উচ্চাবণ কবিয়া কহিলেন, "ওবে, এই যে তোব মন্ত্র। আব এই দ্যাখ তোব ইষ্ট।"

ঠাকুব এ কথা কযটি বলাব সঙ্গে সঙ্গে বাখালেব সম্মুখে ফুটিযা উঠিল জ্যোতির্মঘ ইষ্টমূর্তি।

ঠাকুব যেন অধ্যাত্ম-বাজ্যেব মহান্ ঐন্দ্রজালিক, প্রতীক্ষিত লগ্ন উপস্থিত হওযা মাত্র কোথা হইতে হঠাৎ আবির্ভূত হইলেন, শিষ্যেব জীবনে ঢালিযা দিলেন কৃপাব প্রসাদ।

সেদিনকাব এই অতীন্দ্রিয দর্শন রাখালেব সাবা দেহে মনে জাগাইযা তোলে অপূর্ব আনন্দ শিহবণ। ভাববিহ্বল হইযা ঠাকুবেব চবণতলে তিনি পতিত হন।

বাখালেব সাধনপথেব বাঁকে বাঁকে আসে নানা বাধা বিঘ্ন। তবুণ হৃদয এক এক সমযে অশান্ত বিক্ষুব্ধ হইযা উঠে। মনে উঠে চিন্তাব তবঙ্গ, ঠাকুবেব পবমাশ্রযে তিনি বাস কবিতেছেন বটে, কিন্তু যে পবম প্রাপ্তিব জন্য মন এত আকুল হইযা উঠিযাছে তাহা এখনো বহিযাছে সুদূবপবাহত। মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয দর্শন ও উচ্চতব উপলব্ধি কিছু কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা তো স্থাযী হইতেছে না।

সেদিন জপ কবিতে বসিযা মনে বড় অনুশোচনা জাগিযা উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল আত্মধিক্কাব। ভাবিলেন, নাঃ আব এমন কবিযা এখানে পড়িযা থাকা নয। যেদিকে দুই চোখ যায সেদিকে বাহিব হইযা পডিবেন।

ভক্তেব অন্তবেব এই আলোডন অমনি উচ্চকিত কবে অন্তর্যামী শ্রীবামকৃষ্ণকে। দ্রুত পাযে চটি ঠকঠক কবিযা তখন বাখালেব কাছে আসিযা তিনি উপস্থিত। তবুণ ভক্তকে আশ্বাস দেন, "ভয কিবে ? আমি তো আছি। আচ্ছা হাঁ ক'বে জিবটা বাব কব দেখি।"

আদেশ পালনে রাখালের বিলম্ব হয় না। ঠাকুরও তখনি আপনমনে অস্ফুট স্বরে কি এক মন্ত্র উচ্চারণ করেন, নিজের আঙুল দিয়া রাখালের জিহ্বাতে অঙ্কিত করিয়া দেন তিনটি সাঙ্কেতিক রেখা।

তরুণ সাধকের অন্তরের সব কিছু চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ মুহূর্তের মধ্যে শান্ত হইয়া যায়, দিব্য আনন্দের পাথারে এবার তিনি ভাসিতে থাকেন।

প্রয়োজন মতো এমনি করিয়া শক্তিধর রামকৃষ্ণ মানসপুত্র রাখালের সাধনপথের বাঁকে বাঁকে দর্শন দেন, উচ্চারণ করেন অজস্র অভয়বাণী। সাধনের প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলেন অবিরাম ধারায়, শিষ্যের জীবনকে গড়িয়া তুলিতে থাকেন এক সার্থক অধ্যাত্ম-সৃষ্টিরূপে।

সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া সাধনভজন করার ফলে রাখালের সাধনজীবনে আসে পরম প্রশান্তি, দেখা দেয় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের অপূর্ব সমাহার। নিরন্তর সাহচর্য ও উপদেশাদি দিয়া ঠাকুর প্রিয় ভক্তের সাধনজীবনকেও ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে থাকেন। এসময়ে ধ্যানজপের উচ্চতর প্রণালী শিক্ষা দিবার সঙ্গে ঠাকুর তাঁহাকে আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামের যৌগিক প্রক্রিয়াও কিছু কিছু দিয়াছিলেন।

সেদিন ভবতারিণীর মন্দিরে ঠাকুর অর্ধবাহ্য অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাখাল অদূরে বসিয়া জপধ্যানে নিরত। ঠাকুর হঠাৎ তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন। এক গৃহস্থ ভক্ত খানিক আগে ষোড়শোপচারে কারণবারিসহ দেবীর ভোগ দিয়া গিয়াছে। নিবেদিত পাত্র হইতে কারণবারি আঙুলে তুলিয়া রাখালের ভ্রূ-যুগলের মধ্যে ঠাকুর একটি ফোঁটা দিয়া দিলেন। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন নিগূঢ় মন্ত্র। দেবী ভবতারিণীর সম্মুখে অনুষ্ঠিত সেদিনকার ঐ ক্রিয়ার পর রাখালের জীবনে উন্মোচিত হইতে থাকে সাধনার এক একটি নূতন স্তর। বলা বাহুল্য এই তরুণ শিষ্যের প্রত্যেকটি অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার উপরেই সতত নিবদ্ধ থাকিত শক্তিধর সদ্‌গুরুর সদাজাগ্রত দৃষ্টি।

এসময়কার সাধনকালে, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই রাখাল একটি বিশেষ শক্তির অধিকারী হইয়া উঠেন। দিব্যদৃষ্টি সহায়ে প্রত্যেক মানুষের অন্তস্তল তিনি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেন। ঠাকুরের দর্শনাভিলাষী হইয়া এ সময়ে নানা শ্রেণীর লোক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইত। নব অলৌকিক শক্তির অধিকারী রাখাল ভাবিতেন, যে কেহ আসিয়া উপস্থিত হইলেই ঠাকুরের কাছে তাঁহাকে টানিয়া নেওয়া কেন? বরং কে কেমন স্তরের লোক আগে হইতে তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করিয়া নেওয়া ভাল। নবলব্ধ অলৌকিক দৃষ্টি বলে তিনি সকলেরই মনের অভ্যন্তরভাগ আগে হইতেই খানিকটা দেখিয়া নিতেন। তারপর যে কটি দর্শনার্থীকে তাঁহার মনে হইত শুদ্ধসত্ত্ব, বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের উপস্থিত করিতেন ঠাকুরের কক্ষে।

শিষ্যদের আচার-আচরণ সম্পর্কে ঠাকুর অতিমাত্রায় সজাগ রাখালের এই কাণ্ড তাঁহার চোখ এড়ায় নাই। সেদিন তাঁহাকে ডাকিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "আচ্ছা, তোর এসব কি হীনবুদ্ধি বল্ তো? কোথায় মায়ের চরণে শুদ্ধাভক্তি নিয়ে পড়ে থাকবি, তা না কেবল অষ্টসিদ্ধির দিকে মন দিচ্ছিস্। বিভূতির দিকে নজর দিলে কি কখনো ঈশ্বর লাভ হয় রে? ছিঃ ছিঃ ওদিকে মন রাখিস্‌নে—ওসব একেবারে ঝেড়ে ফেলে দে।"

রাখাল লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলেন, অন্তর্যামী ঠাকুরের অমোঘ দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ রহিয়াছে নগণ্যতম ভক্ত সাধকের প্রতিটি আচার আচরণের দিকে। আজ তাই কৃপা করিয়া তরুণ সাধক রাখালের বিভূতি প্রয়োগের ইচ্ছাটিকে অংকুরে এমনভাবে বিনষ্ট করিয়া দিলেন। এই দিনের তিরস্কারের পর হইতে রাখালের কাছে অতীন্দ্রিয় দর্শন ও সিদ্ধাই ইত্যাদি একেবারে তুচ্ছ হইয়া গেল। মনকে তিনি কেন্দ্রীভূত করিলেন ইষ্টের পাদপদ্মের দিকে।

রামকৃষ্ণের কক্ষে ধ্যান করিতে বসিলেই রাখাল স্বল্পকাল মধ্যে অন্তর্মুখীন হইয়া যান, তলাইয়া যান চৈতন্যময় সত্তার অতল গভীরে। এভাবে ধ্যানাবস্থায় রাখালকে দেখিলেই ঠাকুরের হৃদয়ে জাগে দিব্য উদ্দীপনা। এক একদিন ভাবপ্রমত্ত হইয়া অস্ফুটস্বরে রাখালকে কহিতে থাকেন, "আমি তো সেখান থেকে এসেছি অনেক দিন। হ্যাঁরে, তুই কবে এলি? বল্ দেখি, কবে এলি?"

অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবকেরা অবাক বিস্ময়ে ভাবিতে থাকেন, রাখালের সৌভাগ্যের অন্ত নাই। জন্মান্তরের পুরানো সম্পর্কের ধারাটি বাহিয়া তাঁহার জীবনতরী আজ ঠাকুরের চরণতলে আসিয়া ঠেকিয়াছে। প্রিয় পার্ষদের এই নিত্য সম্বন্ধের গূঢ় ইঙ্গিতটিই যে ভাবমত্ত সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতে হঠাৎ আজ প্রকাশিত হইল।

ইতিমধ্যে ঠাকুরকে ঘিরিয়া দক্ষিণেশ্বরে জড়ো হইয়াছে চিহ্নিত শিষ্যগোষ্ঠী। দিব্য স্পর্শ, সান্নিধ্য ও সাধননির্দেশ দিয়া ঠাকুর ইহাদের জীবনে প্রজ্বলিত করিয়াছেন অধ্যাত্ম চেতনার আলো। তাই বুঝি এবার লীলামঞ্চ হইতে নিজেকে অপসৃত করিয়া নিতে চান। এ উদ্দেশ্যে নিজ দেহে সৃষ্টি করিয়াছেন মারাত্মক ক্যান্সার রোগ। আর তাঁহার শুশ্রূষাকে উপলক্ষ করিয়া শিষ্যেরা হইতেছে দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠতর, গুরুগতপ্রাণ। সবার অলক্ষ্যে গুরুভাইদের মধ্যেও গড়িয়া উঠিতেছে এক দৃঢ় আত্মিক বন্ধন। ঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে রাখালও নিবিড়ভাবে যুক্ত হইলেন, তাঁহার সঙ্গে, অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িলেন তাঁহার প্রত্যেকটি পরিকরের সঙ্গে।

রাখাল প্রায়ই মনে মনে পীড়া বোধ করেন—ঠাকুরের দেহ সিদ্ধ দেহ, তাহাতে কেন এই মারাত্মক রোগের আক্রমণ? সাধন বলে অপরিমেয় শক্তি বিভূতি অর্জনে তবে কি তিনি সমর্থ হন নাই? জগজ্জননীর সাধনায়ই বা কতটা তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন? কি তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ? জিজ্ঞাসু তরুণ সাধকের মনে বার বার এই সব প্রশ্ন আসিয়া ভিড় করে।

শ্যামপুকুরে ঠাকুর রোগশয্যায় থাকা কালে এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয় যাহার ফলে রাখালের মনের সংশয় ঘুচিয়া যায়, ঠাকুরের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তিনি কৃতার্থ হন।

সেদিন শ্যামাপূজা। অন্তরঙ্গ ভক্ত-শিষ্যেরা সকাল হইতেই পূজার আয়োজনে রত। ঠাকুর স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের পূজা সম্পন্ন করিবেন। পূজার লগ্ন উপস্থিত হইলে ভক্তদের মনে জাগিয়া উঠে এক আকস্মিক ভাবের জোয়ার। আদ্যাশক্তি মহাকালী জ্ঞানে সবাই তখন সমস্বরে ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। শুরু হয় তাঁহারই অর্চনা। সচন্দন রক্তজবা ঠাকুরের চরণে অঞ্জলি দিয়া ভক্তেরা আনন্দে মাতোয়ারা

সকলের সাথে রাখালও সেদিন যোগ দেন ঠাকুরের এই অভিনব অর্চনায়। হৃদয় তাঁহার দিব্য আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। বার বার ভাবিতে থাকেন, শ্যামাপূজার এই আয়োজনে ঠাকুর নিজেই আজ কত উৎসাহ দিয়াছেন। অতঃপর একি কাণ্ড। লগ্ন উপস্থিত হইলে দেখা গেল, নিজেই নিজের পূজো তিনি অঙ্গীকার করিলেন, আর দিব্য আবেশে হইলেন অভিভূত।[১]

রাখাল বিশ্বাস করিলেন, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তদের ঠাকুর বুঝাইয়া দিলেন, মহাকালী আর মহাকালীর বরপুত্র রামকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনো ভেদ নাই। ভক্তদের পূজার অঞ্জলি পরম লক্ষ্যে গিয়াই পেঁছিয়াছে।

সেদিন হইতে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে রাখালের চেতনায় জাগিয়া উঠে নূতনতর এক উপলব্ধি। সদ্‌গুরুর সর্বব্যাপী মহিমার আলো নূতন করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাঁহার হৃদয়াকাশে।

সে-বার ঠাকুরের বর্ষীয়ান্ ভক্ত বুড়ো গোপাল (উত্তরকালের অদ্বৈতানন্দ) উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিয়া কাশীপুরে ঠাকুরের সকাশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তীর্থ-দর্শনের পর সাধু-সেবা করাইতে হয়, বুড়ো গোপালের অভিলাষ—একদল ভাল সাধুকে ডাকিয়া আনিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করান।

শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "ওরে, কোথায় আর সাধু খুঁজতে যাবি? এখানে সব রয়েছে—এই ছোক্‌রাদের খাওয়ালেই তোর কাজ হবে।"

বুড়ো গোপাল তখনি সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হন। ঠাকুর তাঁহাকে দিয়া কতকগুলি গেরুয়া বসন ও মালা-চন্দন আনাইয়া নেন। নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ত্যাগী তরুণ ভক্তেরা সবাই সেখানে উপস্থিত। ঠাকুর একে একে তাঁহাদের কাছে ডাকিলেন, প্রত্যেককে দান করিলেন একটি করিয়া গৈরিক বস্ত্র ও মালাচন্দন। সহজ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান, কিন্তু তাহার তাৎপর্য বড় গভীর। সেদিন ইহার মধ্য দিয়া রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসী সঙ্ঘের বীজ ঠাকুর তাঁহার নিজ হস্তে রোপণ করিলেন।

বৈরাগ্য ও শুদ্ধাভক্তির সহিত ভাগবত প্রেমের অমৃতধারা ঠাকুর এই ভক্তদের জীবনকুম্ভে ঢালিয়া দেন। এই কৃপাপ্রসাদ উত্তরকালে তাঁহার চিহ্নিত সন্ন্যাসী পার্ষদদের সাধনজীবনকে রসসমৃদ্ধ করিয়া তোলে, মানবীয় প্রেম ও ভাগবত প্রেমের অপূর্ব সমারোহ সম্ভব হয় তাঁহাদের জীবনে। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এই রামকৃষ্ণ শিষ্যদের কেহই শুষ্ক সন্ন্যাসীতে পরিণত হন নাই।

রামকৃষ্ণ প্রায়ই শিষ্যদের বলিতেন, "শুকনো সাধু হবি কেন শুধু শুধু। তোরা জেনে রাখবি, এখানকার ভাব হচ্ছে রসে-বসে।" রামকৃষ্ণমণ্ডলীর সাধকদের মধ্যে যে কয়জনের জীবনে সাধনরসের এই সমন্বয় দেখা গিয়াছে, রাখাল মহারাজ তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। সুখে দুঃখে মঠ মিশনের কর্মের ভিড়ে বা ভাগবত-প্রসঙ্গে সদাই দেখা যাইত তাঁহার প্রশান্ত, প্রসন্নমধুর মূর্তি।

এই সময়ে ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে তীর্থ পর্যটনের ঝোঁক প্রবল হইয়া উঠে। কেহ যাইতেছেন বুদ্ধগয়াতে, কেহ ছুটিতেছেন পুরী, বারাণসীতে। রাখাল কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্য ছাড়িয়া কোথাও যাইতে রাজী নন, অচল হইয়া ঠাকুরেরই পদপ্রান্তে রহিলা

১ লীলাপ্রসঙ্গ—সারদানন্দ

আছেন, অবিচল নিষ্ঠার করিতেছেন তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা। কাশীপুরের বাগানে এ সময়ে তরুণ সাধক রাখালের যে মহিমোন্নত চরিত্র ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাই, উত্তরকালে রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের নায়করূপে দেখা যায় তাঁহারই পরিণত অভিব্যক্তি।

ঠাকুরের রুগ্নাবস্থায় নরেন একদিন অকস্মাৎ গয়াধামে চলিয়া যান। উদ্দেশ্য, সেখানে থাকিয়া কয়েকদিন তপস্যায় অতিবাহিত করিবেন। নরেনের অনুপস্থিতিতে ঠাকুরের সেবার অসুবিধা হইবে বলিয়া রাখাল কিন্তু বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এ দুর্ভাবনার কথা অন্তর্যামী রামকৃষ্ণের অগোচর রহিল না। রোগশয্যায় বসিয়া স্মিতহাস্যে সেদিন রাখালকে কহিলেন, "কেন তুই মিছে ভেবে মরছিস্? কোথায় যাবে সে? কদিন বাইরে থাকতে পারবে? দ্যাখ্‌না এল বলে। চার খুঁট ঘুরে আয়, দেখবি কোথাও কিছু নেই।

খানিক বাদে নিজের বক্ষ স্পর্শ করিয়া ঠাকুর কহিলেন, "মনে রাখ্‌বি যা কিছু আছে সব এইখানে।"

ঠাকুরের শ্রীমুখের এই আশ্বাস-বাণী শ্রবণে রাখাল বিস্ময়ে আনন্দে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুরের কথাই ঠিক হইল। কয়েকদিনের মধ্যে নরেন ও অন্যান্য ভক্তেরা ফিরিয়া আসিলেন, উপবেশন করিলেন ঠাকুরের চরণতলে।

সাধন করিতে করিতে এসময়ে রাখালের অন্তর্দৃষ্টি স্বচ্ছতর হইয়া আসে। উপলব্ধি করেন, প্রভু রামকৃষ্ণ শুধু তাঁহাদের মতো গুটিকয়েক ভক্ত শিষ্যেরই প্রভু নহেন। জগৎগুরুরূপে তিনি অবতীর্ণ। ঐশী লীলার এক চিহ্নিত পুরুষ তিনি। জগতের কল্যাণে প্রেমভক্তি বিতরণের জন্যই তিনি আসিয়াছেন।

একদিন সঙ্গী ভক্তদের কাছে রাখাল ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার উপলব্ধির কথা স্পষ্টরূপে বলিয়া ফেলিলেন। দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "উনি নিজে কৃপা ক'রে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'সদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু'। তোমরা কি ভেবেছো, উনি কেবল আমাদের ক'জনার জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন?"

নরেন একথা শুনিলেন। অসামান্য প্রতিভা ও তীক্ষ্মবুদ্ধি ছিল তাঁহার। তাই যে কোনো তত্ত্ব ও তথ্য তাঁহার সম্মুখে আসিত, বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া ছাড়িতেন না। সেদিন রাখালের এই কথাটি সোৎসাহে তিনি সমর্থন করিলেন। পরমশ্রদ্ধায় ঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তন শুরু করিলেন।

রাখাল হৃষ্টচিত্তে ঠাকুরকে গিয়া কহিলেন, 'আজকাল নরেন আপনাকে খুব বুঝতে শিখছে।'

ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না। নরেনকে ডাকিয়া কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা বল্‌তো আমার ভেতরে কি ভাব রয়েছে।"

নরেন তৎক্ষণাৎ একথার উত্তর দিলেন, "বীরভাব সখীভাব—সমস্ত কিছু ভাব।'

রামকৃষ্ণ এবার নিজের বুকটি হাত দিয়া স্পর্শ করিলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, "দেখছি, এর ভেতরে যা কিছু।"

তারপর ইশারায় নরেনকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন, "ওরে, কি বুঝলি বল্‌তো?'

"যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভেতর থেকে।"

হর্ষভরে ঠাকুর রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কহিলেন, "দেখছিস্ কেমন বুঝেছে ?"

ঠাকুরের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য সেদিন তাঁহার সহিত কথাপ্রসঙ্গে এমনিভাবে রাখালের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, চিরতরে তাঁহার অন্তরে গ্রথিত হইয়া যায়। রোগশয্যায় শায়িত থাকার সময় ঠাকুর প্রায়ই নরেনের সঙ্গে একান্তে বসিয়া নানা নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করিতেন, আশ্রিত ভক্ত শিষ্যদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ইঙ্গিত বা নির্দেশাদিও দিতেন। একদিন প্রসঙ্গ ক্রমে কহিলেন, "জানিস্, আমাদের রাখালের কিন্তু রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছে করলে একটা প্রকাণ্ড রাজ্য সে চালাতে পারে।"

ঠাকুরের সামান্য একটি মন্তব্য। কিন্তু ইহার নিহিতার্থ বুঝিয়া নিতে তীক্ষ্ণধী নরেনের একটুও দেরি হইল না। ঠাকুরের অভিপ্রায়, ভক্তশিষ্যদের যে সংঘ পরবর্তীকালে গঠিত হইবে, তাহার নায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন রাখাল। বিনা দ্বিধায় তখনি মনে মনে নরেন ইহা মানিয়া নিলেন।

তারপর সুযোগমতো একদিন গুরুভাইদের কাছে রাখালের গুণগান করিতে করিতে কহিলেন, "রাখালরাজকে আজ থেকে আমরা রাজা বলেই ডাক্‌বো।"

ভক্তেরা জানেন, রাখাল ঠাকুর রামকৃষ্ণের মানসপুত্র, পরম আদরের ধন। কাজেই সবাই তাঁহার এই নূতন নামকরণ সোৎসাহে সমর্থন করিলেন।

ঠাকুরের কানে একথা উঠিল। নরেন এবং অন্যান্য ভক্তদের ডাকিয়া আনন্দ সহকারে তিনি কহিলেন, "বেশ করেছিস্ তোরা। রাখালের রাজা নামই ঠিক বটে।"

ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নায়ক সেদিন এভাবে ঠাকুর ও তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে চিহ্নিত হইয়া রহিলেন।

রামকৃষ্ণ ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছেন। তরুণ শিষ্যেরা প্রাণপণে দিন রাত তাঁহার সেবা করিয়া চলিয়াছেন, এই সময়ে এক পাগলী মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত। নানা অনাচার উপদ্রবও করিত।

শশীমহারাজ একদিন অতিষ্ঠ হইয়া কহিলেন, "পাগলীকে আর আস্‌তে দেওয়া ঠিক নয়। এবার এলে ধাক্কা মেরে তাড়াতে হবে।'

কৃপালু ঠাকুরের কানে একথা গেল। রাখালকে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "না—না সে আসবে। আর আমায় দেখেই চলে যাবে। ওকে তোরা তাড়াস্ নে।"

ঠাকুরের আদেশ শশীমহারাজকে শুনাইয়া দিয়া রাখাল কহিলেন, "ঠাকুরের ওপর উপদ্রব সবাই করে, আর তিনি তা অসীম করুণায় সহ্য ক'রে যান। সকলেই কি খাঁটি হয়ে ওঁর কাছে এসেছে ? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নি ? নরেন্দ্র-টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল - কত তর্ক করতো। ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছেন। ধরতে গেলে আমরা কেউই নির্দোষ নই।

উদারবুদ্ধি রাখালের কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর বার বার সানন্দে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"প্রেমে, আনন্দে, সেবায় এবং নিরত সাধনভজনে রাখাল এক অপূর্ব উদার প্রেম-দৃষ্টিতে সকলকে নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার ঈশ্বরানন্দে চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের

আদর্শ ও তাহার প্রেমমূর্তি দিন দিন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতে লাগিল। ঠাকুর রাখাল প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সম্বন্ধে বলিতেন, "আমি কে আর ওরা কে, এই জানলেই হ'ল।" কাশীপুর উদ্যানে তাঁহাদের মধ্যে এই তত্ত্বই দিন দিন স্ফুরিত হইয়া উঠিল। দক্ষিণেশ্বরে যাহা বীজাকারে অন্তরঙ্গদের মধ্যে ছিল, কাশীপুর উদ্যানে তাহা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। অলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের লইয়া একটি মহাশক্তির সঙ্ঘ ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। যে প্রেমসূত্রে ইহারা পরস্পর আনন্দে আবদ্ধ হইতেছেন - সেই প্রেমসূত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ[১]।"

ভক্তদের প্রাণের ঠাকুর ও পরমাশ্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগস্ট মহাপ্রয়াণ করিলেন। নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তরা শোকে হইলেন মুহ্যমান। যাঁহার প্রেরণায় ঐহিক জীবনের সব কিছু তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার চরণতলে বসিয়া আত্মিক সাধনার ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তিনি আজ কোন অদৃশ্যলোকে চলিয়া গেলেন? ত্যাগ বৈরাগ্যে দীপ্ত তরুণ সাধকদের জীবনে নামিয়া আসিল এক সীমাহীন শূন্যতা।

নরেনের হৃদয়ে এখন একমাত্র চিন্তা ঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্তদের কি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, ঠাকুরের আদর্শ কি করিয়া সর্বত্র প্রচার করা যায়।

রামকৃষ্ণ নিজেই বুঝি একদিন সুযোগ মিলাইয়া দিলেন। ভক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র একদিন ঠাকুরঘরে বসিয়া ধ্যান-জপ করিতেছেন। হঠাৎ ছায়ামূর্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। কহিলেন, "তুই করছিস্ কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার আগে একটা ব্যবস্থা কর্।" নির্দেশটি দিয়া তখনই ঠাকুর অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সুরেশ মিত্র ছুটিয়া আসিয়া সাশ্রুনয়নে নরেনের কাছে এই দর্শনের কথা বর্ণনা করিলেন। কহিলেন, "ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদের জন্য একটা আস্তানার বন্দোবস্ত করো, একত্রে তারা সাধন-ভজন করুক। প্রতি মাসে আমি অর্থ সাহায্য করবো।"

নরেনের আনন্দ আর ধরে না, সোৎসাহে বরানগরের গঙ্গাতীরে একটা জীর্ণ বাগানবাড়ি ভাড়া করিয়া ফেলেন। তারপর রাখাল তারককে সঙ্গে নিয়া সেই ভাড়াটিয়া বাড়িতে শুরু করেন বসবাস।

ক্রমে অপর ভক্তেরাও এখানে আসিয়া মিলিত হন এবং তাঁহাদের এখানকার সাধনা ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের মধ্য দিয়া সূত্রপাত হয় মঠ প্রতিষ্ঠার। রামকৃষ্ণের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী এই ভক্তেরা প্রত্যেকেই এক একটি বিশুদ্ধ আধার। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী মূলে ভবতারিণীর মন্দিরে ও কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর আপন হস্তে এই সব আধারে মুমুক্ষার আলো জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এবার সে আলো আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

নরেন রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের ঈশ্বর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইয়া উঠিল। ধ্যান-জপ, কীর্তন ও শাস্ত্রব্যাখ্যার জোয়ার বহিয়া চলিল।

রাখালের বাবা আনন্দমোহন মাঝে মাঝে পুত্রের সঙ্গে দেখা করিতে বরানগরে

---

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ: জীবন কথা—দেবেন্দ্রনাথ বসু

আসিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, রামকৃষ্ণের বিরহে যুবক ভক্তেরা স্বভাবতই শোকে অভিভূত হইয়াছে, কিছুদিন পরে এই শোক কমিয়া গেলে যে যাহার বাড়িতে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল অন্যরূপ। ভক্তদের জীবনে ত্যাগ তিতিক্ষা ও তপস্যা যেন আরো তীব্র হইয়া দেখা দিল।

পিতা বার বার কষ্ট করিয়া মঠে আসেন, আর বিষাদখিন্ন হৃদয়ে ফিরিয়া যান। অবশেষে রাখাল একদিন তাঁহাকে নিজের সিদ্ধান্ত অকপটে জানাইয়া দিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট ক'রে এখানে আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই।'

দৃঢ়, প্রশান্ত কণ্ঠে যে ভাবে রাখাল এই সংকল্পের কথা কহিলেন তাহাতে পিতা বুঝিয়া নিলেন, আর তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া নেওয়া সম্ভব নয়।

বৈরাগ্যবান্ সাধক রাখাল মায়িক সম্বন্ধ ত্যাগের কথা শুধু মুখেই উচ্চারণ করেন নাই, অন্তরেও ইহা প্রতিফলিত করিতে তিনি সক্ষম হন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী বিশ্বেশ্বরীর দেহান্ত ঘটে, কিন্তু নিরাসক্ত ত্যাগী সাধক রাখাল এজন্য একটুও বিচলিত হন নাই। পরবর্তীকালে তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক বালক পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শোনার পরও তিনি ছিলেন পরম প্রশান্ত ও নির্বিকার।

১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে বরানগর মঠের ত্যাগী ভক্তদের জীবনে সংযোজিত হয় এক নূতন অধ্যায়। নরেনের নেতৃত্ব ও প্রেরণায় বিরজা হোম সম্পন্ন করিয়া সবাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রাখালের নব নামকরণ হয় — স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

তপস্যা সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ভক্তদের রামকৃষ্ণ বলিতেন, "ওরে, আমি ষোল ট্যাং করেছি, তোরা অন্তত এক ট্যাং তো কর্।' মুমুক্ষু ভক্তদের এ কথা স্মরণ আছে। সবাই এবার নব ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, কৃচ্ছ্রময় সাধনার পথে দৃঢ়পদে তাঁহারা অগ্রসর হন।

এ সময়ে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় নবীন সন্ন্যাসীদের। ভিক্ষা কোনো দিন জুটে, কোনোদিন জুটে না। পাড়াপড়শীরা পরমহংসের ফৌজ বলিয়া টিটকারী দেয়, অনেকে নানা কুৎসা ছড়ায় আর গালাগালি দেয়। কিন্তু তপস্বীদের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সদাই সাধন-ভজনে তাঁহারা বিভোর হইয়া আছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে এসময়কার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "বরানগরে কতদিন গিয়াছে যে খাবার কিছু নেই, ভাত জোটে তো নুন জোটে না। কয়েকদিন হয়তো শুধু নুনভাতেই চললো, কিন্তু কারুর তাতে গ্রাহ্য নেই। জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখনো শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও নুনভাত—এই মাসাবধি চলেছে। আহা, সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেতো, মানুষের কথা কি?"

বরানগরের এই দিনগুলির স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরবর্তীকালে একবার রহস্যভরে বলেন, "যখন খাবার শক্তি ছিল তখন তেলাকুচো সিদ্ধ ভাত জোটাই মুশকিল হতো, আর এখন খাবার সামর্থ্য নেই তাই উপাদেয় আহার জুটছে।

পরবর্তী পর্যায়ে বরানগরের তরুণ সাধুদের মধ্যে তীর্থদর্শন ও নিভৃত তপস্যার

প্রেরণা জাগিয়া উঠে। অন্যান্য গুরুভাইদের মতো ব্রহ্মানন্দ মহারাজও কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন পরিব্রাজন ও তীর্থ পরিক্রমায়। উত্তর ও মধ্য ভারতের নানা পবিত্র পীঠে তিনি দিনের পর দিন ঘুরিয়া বেড়ান, কখনো বা গভীর ধ্যান-ভজনে থাকেন বিভোর।

সে-বার ব্রহ্মানন্দ নর্মদা তীরে ওঁকারনাথ তীর্থে আসিয়াছেন। পুণ্যতোয়া নর্মদার সহিত আচার্য শংকরের নানা স্মৃতি জড়িত, তাই এখানে পৌঁছিয়া ব্রহ্মানন্দ আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে রহিয়াছেন গুরুভাই সুবোধানন্দ, উভয়ে একটি স্থানীয় মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

নর্মদার আকর্ষণ ব্রহ্মানন্দ বহুদিন যাবৎই বোধ করিতেছিলেন। এবার এখানে পৌঁছানোর পর তাঁহার প্রাণমন ভরিয়া উঠিল।

এখানকার আকাশ, বাতাস, পবিত্র নদী-নীর সবই তপস্যার অনুকূল। কত প্রাচীন সাধুরা ঝুপড়ি বাঁধিয়া, গুম্ফা তৈরি করিয়া, নিভৃত সাধনায় বসিয়া আছেন। নদী-তীরের এক বৃক্ষস্থলে ব্রহ্মানন্দ সেদিন ধ্যানাসনে বসিয়া পড়িলেন। তারপর এখানে ধ্যানস্থ অবস্থায় একাদিক্রমে ছয় দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, অতীন্দ্রিয় পরম বোধে সর্বসত্তা রহিল নিমজ্জিত। এই সময়ে গুরুভাই সুবোধানন্দ পরম যত্নে তাঁহার দেহের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

গোদাবরী তীরের দণ্ডকারণ্য অঞ্চল প্রভু রামচন্দ্রের লীলাস্থল। এখানকার পঞ্চবটী ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের অতি প্রিয় তীর্থ। এই তীর্থে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এক দুর্লভ অধ্যাত্ম-অনুভূতি লাভ করেন।

সেদিন পম্পা সরোবরের তীরে বসিয়া রাম সীতার পুণ্যস্মৃতির অনুধ্যান করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার নয়নসমক্ষে ভাসিয়া উঠিল জটাকম্বল পরিহিত ধনুর্ধারী রামচন্দ্র ও মা জানকীর দিব্য মূর্তি। তরুলতার পুষ্পাঞ্জলি আর পাখির কূজনে সেখানে এক স্বর্গীয় আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে।

'জয় সীতারাম, জয় সীতারাম,' বলিয়া ব্রহ্মানন্দ ভাবাবেগে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। তারপর বাহ্যজ্ঞান হইল তিরোহিত। চেতনা ফিরিয়া আসার পরও দীর্ঘকাল তাঁহার কণ্ঠে রামনামের গুঞ্জরণ চলিতে থাকে। এই সময়ে প্রায়ই ভাবতন্ময় হইয়া তিনি আত্মহারা হইতেন এবং সুবোধানন্দ সতর্কভাবে সদাই তাঁহাকে আগুলিয়া রাখিতেন।

দ্বারকা, গির্ণার, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দ ও সুবোধানন্দ সেবার বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছেন। এখানে আসিবার পর হইতেই মন তাঁহার কঠোর তপস্যার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। দিনের পর দিন ধ্যানাসনে তিনি বসিয়া থাকিতেন, নিমজ্জিত হইতেন অগাধ ভাব-সমুদ্রে। এক কুঠিয়াতে বাস করিয়াও কোনো কোনো দিন সঙ্গী গুরুভাই সুবোধানন্দের সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত হইত না। সুবোধানন্দ ভিক্ষা করিয়া যে আহার্য আনিতেন, প্রায়ই দেখা যাইত ব্রহ্মানন্দ তাহা স্পর্শ করেন নাই।

এই ধ্যানতন্ময়তা ও কৃচ্ছ্র সাধন দেখিয়া সুবোধানন্দ মনে মনে ভীত হইয়া উঠিলেন। সত্যিই তো, এভাবে চলিলে শরীর আর কয়দিন টিকিবে? সেদিন

গোবিন্দ মন্দিরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত তাঁহার দেখা। কথাপ্রসঙ্গে জানাইলেন, ব্রহ্মানন্দ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যা শুরু করিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গোসাঁইজী প্রায়ই যাতায়াত করিতেন, তাই ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। পরদিনই ধ্যানরত ব্রহ্মানন্দের কুটিরে গিয়া তিনি উপস্থিত হন। দুজনে দুজনকে দেখিয়া মহাখুসী, পুরানো দিনের নানা কথার আলোচনা শুরু হইল।

কথাপ্রসঙ্গে গোসাঁইজী কহিলেন, "পরমহংসদেব তো আপনাকে সব রকম সাধন ভজন, অনুভূতি, দর্শনাদি করিয়ে দিয়েছেন। তবে আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধনা করছেন?"

ব্রহ্মানন্দ প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "তাঁর কৃপায় যে সব অনুভূতি বা দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলো আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছি মাত্র।"

গোসাঁইজী বুঝিলেন, ঐশ প্রেমের দুর্বার আবেগে ব্রহ্মানন্দ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, এখন তাঁহাকে নিরস্ত করা সম্ভব নয়।

এই সময়ে বৃন্দাবনে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ শুরু হইয়াছে। কয়েক দিন পরে ব্রহ্মানন্দও এই রোগে শয্যাশায়ী হন। সংবাদ পাইয়াই গোসাঁইজী তাঁহার কুটিরে ছুটিয়া আসেন। কুটিরে কোনো মশারী নাই দেখিয়া তখনি উহা কিনিয়া আনেন এবং নিজ হস্তে রোগীর শয্যায় তাহা টাঙাইয়া দেন। গোসাঁইজীর প্রদত্ত ঔষধ খাইয়াই ব্রহ্মানন্দ এসময়ে তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করেন।

কিছুদিন পরে সঙ্গী সুবোধানন্দ উত্তরাখণ্ডে চলিয়া যান এবং ব্রহ্মানন্দ তখন নিভৃতে বসিয়া কঠোরতর তপস্যার ব্রতী হন। যেদিন ইচ্ছা হয় মাধুকরী করেন বা কোনো কুঞ্জে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, কখনো বা উপবাসে দুই একদিন কাটাইয়া দেন, ধ্যান-জপে সময় কোথা দিয়া অতিবাহিত হয় তাহা জানিতে পারেন না।

এসময়ে একদিন ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর জ্যোতির্ময় মূর্তি চকিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হয়; তারপর এই মূর্তি প্রসন্ন হাসি হাসিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ প্রথমটায় চমকিয়া উঠেন, তারপর সারা অন্তর বিষাদে ভরিয়া উঠে। তবে তো ঠাকুরের ভক্ত-সেবক বলরাম আর ইহলোকে নাই! কয়েক দিন পরেই সংবাদ আসিল, বলরাম বসু মহাশয় সত্য সত্যই পরলোকে গমন করিয়াছেন। বলরামের ব্রহ্মানন্দের সম্বন্ধ মায়িক নয়, আত্মিক। ঠাকুরের পরমভক্ত ও অন্যতম প্রধান সেবক বলিয়াই বলরামের অন্তর্ধান সেদিন এমন করিয়া বাজিয়াছে।

অতঃপর কনখল, আবু পাহাড়, জ্বালামুখী প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল সাধন-ভজন করিয়া ব্রহ্মানন্দ তাঁহার গুরুভাই তুরীয়ানন্দ সহ আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। এবার তপস্যা শুরু করেন ব্রজমণ্ডলের কুসুম সরোবরে।

তুরীয়ানন্দ পরমপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে কখনো ভিক্ষা করিতে দিতেন না, নিজেই গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া আহার্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। একদিন ভিক্ষায় মিলিল কয়েকটি শুকনো রুটি, একটু গুড় বা ব্যঞ্জনও যোগাড় করা গেল না। ঐ রুটিই [illegible] জলে ভিজাইয়া তিনি ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে ধরিলেন। দুই চোখ তাঁহার অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, কম্প্রকণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ, আপনাকে ঠাকুর কত আদর-যত্ন করতেন। আজ,

সব, ননী খাওযাতেন, আব আমাব কি দুর্ভাগ্য, আজ ঠাকুরেব এত আদবেব বাখালকে আমি খাওযাচ্ছি শুকনো রুটি।"

বলিতে বলিতে কান্নায় তিনি ভাঙিযা পডিলেন। গুরুভাইদেব দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ ছিলেন এমনি সমাদব ও শ্রদ্ধাব বস্তু।

১৮৯২ সালেব প্রথমার্ধ। রামকৃষ্ণ ভক্তদেব মঠ এসময বরানগব হইতে আলম বাজাবে স্থানান্তবিত হইযাছে। সেখানকাব চিঠি হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এক বিস্ময়কব আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হন। সুদূব আমেবিকায, চিকাগোব বিশ্ব-ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মেব বিজযপতাকা উড্ডীন কবিযাছেন। এই গৈবিক পবিহিত তরুণ সন্ন্যাসীব মুখে বেদান্তেব তত্ত্ব ও ধর্ম সমন্বযেব উদাত্ত বাণী শুনিযা পাশ্চাত্যেব মানুষ উচ্চকিত হইযাছে, মুগ্ধ হইযাছে। ইউবোপ, আমেবিকায শুরু হইযাছে ভাবতেব ধর্ম সংস্কৃতিব নব মূল্যাযন।

বিবেকানন্দেব এই সাফল্য ভাবতেও আনিযা দিযাছে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, জাতি ও ধর্ম সম্পর্কে নূতনতব গর্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগিযা উঠিযাছে। বামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দেব জয়ধ্বনিতে দশ দিক হইযাছে পবিপূবিত।

কলিকাতা হইতে আবো সংবাদ আসিযাছে, মঠে বামকৃষ্ণেব জন্ম দিনেব উৎসবে এবাব যে আনন্দ উৎসব হয তাহা অভূতপূর্ব। এবাব দক্ষিণেশ্ববে প্রায বিশ হাজাব লোক প্রসাদ পাইযা ধন্য হইযাছে। ব্রহ্মানন্দেব হৃদয তাই আনন্দে নাচিযা উঠিল। ঠাকুবেব মাহাত্ম্য এবাব তবে জগৎবাসী উপলব্ধি কবিবে, তাঁহাব উদাব ধর্মীয আদর্শ ও সাধনপথ গ্রহণ কবিযা জীবন সার্থক কবিবে।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দ স্বামী একবাব লখনৌতে গিযা উপস্থিত হন। গুরুভাইদ্বয তুবীযানন্দ ও শিবানন্দেব সহিত দীর্ঘদিন পবে তাঁহাব মিলন ঘটে, সবাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইযা উঠেন।

ব্রহ্মানন্দেব সাধন পিপাসা তখনো পূর্ববৎ তীব্র বহিযা গিযাছে। মনে সংকল্প কবিযাছেন, ঠাকুবেব সহিত অবস্থানেব কালে যে দিব্য আনন্দেব স্রোতে সদা নিমগ্ন থাকিতেন, সাধনাব ফলে সেই প্রেমমধুর অনুভূতি জাগ্রত না হওযা অবধি বৃন্দাবন তিনি ত্যাগ কবিবেন না। আবাব তাই সেই বৃন্দাবনেই ফিবিযা আসিলেন, শুরু কবিলেন কঠোব তপশ্চর্যা।

ধ্যান-ভজনেব মধ্য দিয়া দিনেব পব দিন তাঁহাব কাটিযা যায়। মাধুকবী বা ভিক্ষাব জন্য কুটিব হইতে এক পাও বাইবে যাইতে মন সবে না। একেবাবে অজগব বৃত্তি। ঈশ্ববেব কৃপায যে দিন যে আহার্য আসিয়া উপস্থিত হয, তাহাতেই হয তাঁহাব ক্ষুৎ-পিপাসাব নিবৃত্তি।

একদিন আসনে বসিযা নিভৃতে একমনে তিনি জপ কবিতেছেন। এসময়ে পুণ্যকামী এক শেঠ অযাচিতভাবে একখানি কম্বল তাঁহাব গাযে চডাইযা দিযা চলিযা যায। ক্ষণপবেই সেখানে উপস্থিত হয এক তস্কব। কোনো কিছু না বলিযা অতি সন্তর্পণে সেই কম্বলটি খুলিযা নিযা দ্রুতপদে সে সবিযা পড়ে। ব্রহ্মানন্দ মৌন হইযা জপ কবিতেছেন। তস্কবেব কুকর্ম সবই লক্ষ্য কবিলেন, কিন্তু একেবাবে বহিলেন নির্বিকাব। মনে মনে ভাবিলেন, ইহা মহামাযাব লীলা ছাডা আব কিছু নয, এক হাতে দান কবিযা আব এক হাতে তিনিই এটি কবিলেন অপসাবিত।'

রামকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করার পর হইতেই ব্রহ্মানন্দ বিরহ-বেদনায় অধীর হইয়া রহিয়াছেন। হৃদয়ের মধ্যে অহর্নিশি গুমরিয়া উঠিতেছে একটা বিরাট আর্তি ও হাহাকার। এই আর্তি এই হাহাকার কি করিয়া দূর হইবে, দিব্য আনন্দে দেহ-মন-প্রাণ কবে হইবে পরিপ্লাবিত তাহা জানেন শুধু জীবনবিধাতা। নিজ জীবনের নৈরাশ্য ও অব্যক্ত বেদনার অবসান ঘটানোর জন্যই দিনরাত ধ্যান-ভজনের মধ্যে তিনি নিমজ্জিত থাকিতে চাহিতেছেন। বৈরাগ্যময় তপস্যাকে তাই এমনভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন।

বৃন্দাবনধামে তখন রাসযাত্রার বড় ধুমধাম। ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রহ্মানন্দ লালাবাবুর কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছেন। সুসজ্জিত রাসমঞ্চে কৃষ্ণ-রাধার বিগ্রহ বিরাজিত। ভক্ত ও সেবকেরা ভাবাবেশে মত্ত হইয়া কীর্তন করিতেছেন। দূর হইতে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে ব্রহ্মানন্দ সেদিকে তাকাইয়া আছেন, প্রেমভক্তি-রসের ধারায় হৃদয় হইতেছে অভিসিঞ্চিত।

হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, মঞ্চের সম্মুখে উপবিষ্ট প্রধান বাবাজীটি ইশারা দিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন।

কাছে যাইতেই বাবাজী তাঁহাকে পরমযত্নে নিজের পাশে বসাইয়া দিলেন। ব্রহ্মানন্দ তখন কীর্তনের আনন্দে আত্মহারা, অন্যদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাঁহার নাই। এক একবার ভাব-তন্ময়তার ফলে বাহ্য চেতনা লোপ পাইবার মতো হইতেছে।

রাস উৎসবে ভক্তদের এত হৈ-চৈ ও নর্তন-কীর্তনের মধ্যেও বাবাজী কিন্তু প্রশান্ত মনে তাঁহার জপে নিরত রহিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দের দিকেও তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টি রহিয়াছে নিবদ্ধ। যতবারই ব্রহ্মানন্দের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয় ততবারই বাবাজী নিজের জপমালার মেরুটি তাঁহার ললাটে স্পর্শ করাইয়া দেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ উদ্দীপিত হইয়া উঠেন দিব্য আনন্দের তরঙ্গে।

ব্রহ্মানন্দের এবারকার বৃন্দাবন-বাস ও তপস্যার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে তাঁদের ভক্তেরা লিখিয়াছেন, "এইরূপ কঠোর সাধন-ভজন ও তন্ময়ভাবে থাকিতে থাকিতে একদিন তাঁহার অন্তরলোক সহসা দিব্য আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া আনন্দরসে প্লাবিত হইয়া উঠিল। মনের যে অশান্তি, যে অভাব, যে দুঃখ নৈরাশ্য তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল তাহা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। গভীর প্রশান্তি তাঁহার সর্বাঙ্গে প্রকাশ পাইল এবং আনন্দের নির্ঝর যেন নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমগ্র বিশ্ব এক অতীন্দ্রিয় ভাবস্পন্দনে স্পন্দিত হইল[১]।"

ব্রহ্মানন্দের সাধনজীবনে সহজ আনন্দের স্রোত আবার ফিরিয়া আসে। আনন্দময় ঠাকুরের কথা, তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভক্ত-শিষ্যদের কথা, ভাবিয়া হৃদয় হয় নবভাবে উদ্দীপিত অতঃপর বৃন্দাবন ছাড়িয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া সারা দেশে এক নূতন প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে, নূতন আধ্যাত্মিকতার জোয়ার বহিতেছে। বিশেষ করিয়া কলিকাতার আকাশ-বাতাস তখন বিবেকানন্দের জয়গানে ভরপুর। আলমবাজারে তখন মঠ

---

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত।

লোকজনের আনাগোনা কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী রামকৃষ্ণভক্তদের দর্শনের জন্য। তাঁহাদের উপদেশ নিয়া জীবন গঠনের জন্য, আদর্শবাদী যুবকেরা দলে দলে আসিতেছে।

দৃশ্যপটের এ পরিবর্তন দেখিয়া ব্রহ্মানন্দের আনন্দের সীমা নাই। বুঝিলেন, লগ্ন উপস্থিত—প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণ মুষ্টিমের ভক্তশিষ্যদের জীবনে যে দীপালোক জ্বালাইয়া গিয়াছেন, এবার তাহা ছড়াইয়া পড়িবে দিগ্‌বিদিকে। যাঁহারা ঠাকুরের কৃপাধন্য, অনন্য নিষ্ঠায় যাঁহারা ঠাকুরকে স্থান করিয়াছেন পরমাশ্রয়রূপে, এবার তাঁহাদের প্রস্তুত হইতে হইবে চরম ত্যাগের জন্য, তাঁহার কাজে দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য।

সেদিন বলরাম বসুর ভবনে বসিয়া গুরুভাই যোগানন্দ ও প্রেমানন্দকে কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "ঠাকুরের কৃপায় বৃন্দাবনে পরম আনন্দে ছিলুম। এবার যাতে মঠের সবাকার ভেতর ঠাকুরের সেই প্রেমভক্তির ভাব বিকাশ পায়, যাতে তাদের দেখে ঠাকুরের কথা সবাই স্মরণ করতে পারে, তাই তো বৃন্দাবন ছেড়ে তাদের সেবা করতে এলুম। এমন সময়, এই যুগ তো আর সহজে মিলবে না।"

আন্তরিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ে ভরা ব্রহ্মানন্দের এই কথাকয়টি। শুধু তাহাই নয়, তিনি যে তাঁহার সর্বশক্তি নিয়া ঠাকুরের ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য এবার বদ্ধপরিকর তাহাও সেদিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল গুরুভাইদের চোখে।

বিশ্ব-ধর্মসভার জয়গৌরব নিয়া, পাশ্চাত্য দেশে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় ১৮৯৭ সালে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাগ-বাজারে পশুপতি বোসের বাড়িতে দেশবাসী তাঁহাকে সাড়ম্বর সংবর্ধনা জ্ঞাপনের বন্দোবস্ত করিয়াছে। সেখানে গিয়া স্বামীজীর কণ্ঠে ব্রহ্মানন্দ একটি মনোহর পুষ্পমালা জড়াইয়া দিলেন।

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। স্মিতহাস্যে কহিলেন, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।"

ব্রহ্মানন্দও সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল স্বরে উত্তর দেন, "জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।"—স্বামীজী বয়সে তাঁহা হইতে কয়েক দিনের বড়, এ কথাটি তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন।

সেই দিনই অপরাহ্নে আলমবাজার মঠে ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী কাছে ডাকাইলেন, বিদেশ হইতে সংগৃহীত টাকার ব্যাগটি তাঁহার হাতে দিয়া সবাইর উদ্দেশে কহিলেন, "এদ্দিন যার জিনিস বয়ে বেড়িয়েছি আজ তাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

এই বৎসরই স্বামীজীর নেতৃত্বে বলরাম বসুর ভবনে মিলিত হইয়া ভক্তরা স্থাপনা করিলেন রামকৃষ্ণ মিশন। ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রেরণা ও নির্দেশে মিশনের কর্মীরা মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, দেওঘরে দুর্ভিক্ষের ত্রাণ কার্যে অবতীর্ণ হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শে বিবেকানন্দ তখন আলমোড়ায় গিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দকেই একাধারে মঠ ও মিশনের সমস্ত কিছু দায়িত্ব বহন করিতে হইতেছে। অর্থ সংগ্রহ, কর্মীদের পরিচালনা, তরুণ ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনের সাহায্য দান, সব কিছু তিনি করিতেন অনন্য নিষ্ঠায় এবং অসাধারণ দক্ষতার সহিত। কিন্তু এত কিছু বহুমুখীন কর্মে নিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন তাঁহার আত্মাভিমান জাগে

নাই, বাহ্যিক জীবনের সংঘাত তাঁহাকে চঞ্চল করে নাই। অপার প্রশান্তি নিয়া অচল অটল পর্বতের মতো সংগঠনের স্নায়ুকেন্দ্রে তিনি সদাই থাকিতেন বিরাজিত।

স্বামীজী সে বার ব্রহ্মানন্দকে কহেন, "রাজা, আমাদের এমন একটা সংগঠন তৈরি করবো যা আপন ত্যাগে ও তেজ বীর্যে আপনা-আপনি চলে যায়, আমরা মরি বা বাঁচি তার অপেক্ষা না করে এটা যেন বেঁচে থাকতে পারে।"

স্বামীজীর এই নির্দেশ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও যত্নে মিশনের মধ্যে এমন একটা দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা ও আত্মিক শক্তির উদ্বোধন ঘটে যাহা দীর্ঘদিন রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বহুমুখী কর্মধারাকে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত করিয়া রাখিয়াছে।

কাশ্মীরে কিছুকাল অবস্থানের পর স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে ফিরিয়া আসেন। স্বাস্থ্য তাঁহার তখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাখাল প্রভৃতি গুরুভাইরা আতঙ্কিত হইয়া পড়েন।

গিরিশ ঘোষ এ সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি মঠে ছুটিয়া আসেন। শয্যায় পড়িয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না, স্বামীজী কোনোমতে হাঁটিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গিরিশবাবু কহিলেন, "একি স্বামীজী, শুনলাম তুমি অত্যন্ত পীড়িত, তাই দেখতে এলাম। এখন দেখছি তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো।"

স্বামীজী উত্তর দিলেন, "কি করবো বল জি সি। বিছানায় শুয়ে থেকে যতবার চোখ মেলেছি দেখেছি রাজা পঁ্যাচার মতো মুখ ক'রে সামনে বসে আছে। তার মুখখানার ঐ ভাব দেখে আর শুয়ে থাকতে পারলুম না। তাই আস্তে আস্তে উঠে এলুম। আমি হাঁটছি বেড়াচ্ছি দেখে যদি রাজার মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে।"

এমন সময়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহেন, "এ কি, তুমি এভাবে উঠে এলে যে? শরীর কি কিছুটা ভাল বোধ হচ্ছে?"

গিরিশবাবুকে উদ্দেশ করিয়া স্বামীজী কহেন, "রাজা শালা আমায় রোগী করে শুইয়ে রাখতে চায়। রোগ ফোগ কি? আমি এখন বেশ ভাল আছি।"

ব্রহ্মানন্দ স্থান ত্যাগ করার পর কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, "বুঝলে জি সি, রাজার কাজ দেখে আমি কিন্তু অবাক্ হয়ে গেছি। কি সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে মঠ ও মিশনের কাজ চালাচ্ছে। রাজার রাজবুদ্ধির তারিফ অবশ্যই করতে হয়। ঠাকুর ঠিকই বলতেন— রাখালের রাজবুদ্ধি, একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে। তা ঠিক।"

গিরিশ সোৎসাহে একথায় সায় দেন, "তা হবে না কেন? ঠাকুরেরই তো ছেলে।'

স্বামীজী হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠেন। তারপর বলেন, "দ্যাখো, রাজার স্পিরিচুয়ালিটি আঁকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে কোলে করতেন আদর করে খাওয়াতেন, এক সঙ্গে শয়ন করতেন, তার কি তুলনা হয়? রাজা আমাদের মঠের প্রাণ—সত্যিই সে আমাদের রাজা।'

সেবার এক ইউরোপীয় ভদ্র মঠে আসিয়া বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিতেছেন, স্বামীজীর কাছে কোনো একটি জটিল তত্ত্বের তিনি মীমাংসা চান। স্বামীজী সাহেবকে বলেন, "তুমি এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে। তাঁর কাছে গিয়ে সব খুলে বল।"

ভক্তটি ব্রহ্মানন্দেরই দ্বারস্থ হইলেন। ব্রহ্মানন্দ কিন্তু তাঁহাকে ফেরত পাঠাইলেন স্বামীজীরই কাছে, কহিলেন, "তিনি ছাড়া তোমার এ তত্ত্ব কে বোঝাবে, বল ?"

স্বামীজীর কাছে ভক্তটি আবার যাইতেই তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তবে শোন, ওঘরে বসে আছেন যে ব্রহ্মানন্দ তিনি হচ্ছেন একটি সক্রিয় ডায়নামো আধ্যাত্মিক শক্তি সদাই নিঃসৃত হচ্ছে তার ভেতর থেকে। আর আমরা এখানকার সবাই হচ্ছি তাঁরই অধীনস্থ। তুমি তাঁকে ভাল ক'রে চেপে ধর - কাজ হবে।"

ব্রহ্মানন্দ বুঝিলেন, বিদেশী ভক্তটি একজন প্রকৃত সত্যান্বেষী। এবার সযত্নে কাছে বসাইয়া জটিল সমস্যার সমাধান তিনি অবলীলায় করিয়া দিলেন। ভক্তটির আনন্দ আর ধরে না। তখনই স্বামীজীর কক্ষে গিয়া বার বার জ্ঞাপন করেন তাঁহার কৃতজ্ঞতা। বলেন, "আমার ভারতে আসা সার্থক হয়েছে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের কৃপায় সত্য বস্তু কি, তা আমি বুঝতে পেরেছি।"

১৮৯৯ সালে রামকৃষ্ণ মঠ বেলুড়ের নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। তারপর একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রাণপ্রিয় রাজাকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। এসময়ে গুরুভাইয়ের সমক্ষে যুক্তকরে ব্রহ্মানন্দের কাছে নিবেদন করেন, "রাজা, তোর আদর শুধু ঠাকুরই যে জানতেন। আমরা কি জানি যে তোর প্রকৃত সমাদর করবো ?"

দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও ইউরোপ সফর করিয়া স্বামীজী দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর অল্প দিনের মধ্যেই রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করেন ব্রহ্মানন্দের উপর। স্নেহপূর্ণ নয়নে স্বামীজী তাঁহাকে কহেন, "রাজা, আজ থেকে এসবই তোর। আমি কেউ নই।"

বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ দুজনেরই প্রকৃতি ও গুণাবলী ছিল ভিন্ন রকমের। কিন্তু দুই জনেই ছিলেন অতি অন্তরঙ্গ, পরস্পরের প্রতি একান্তভাবে নির্ভরশীল ও বিশ্বাস-সম্পন্ন। আর সর্বোপরি তাঁহাদের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের একাত্মকতার মধ্য দিয়া।

রামকৃষ্ণমণ্ডলীর সংগঠনে, রামকৃষ্ণের তত্ত্ব প্রচারে স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দ দুজনেই ছিলেন দুজনের পরিপূরক। তাঁহাদের যুগ্মশক্তি ও যুগ্ম প্রতিভা তাই এদেশের অধ্যাত্মজীবনের কল্যাণে এমন সার্থক হইতে পারিয়াছিল।

"স্বামীজী ছিলেন দৃপ্ত সিংহের মতো তেজস্বী, সাগরের মতো অপার, গভীর জ্ঞানবৈরাগ্য ও বিদ্যাবুদ্ধির আধার, তারুণ্য শক্তির দুকূলপ্লাবী উত্তাল উদ্বেল তরঙ্গে সতত চঞ্চল, আর মহারাজ ছিলেন ধীর প্রশান্ত অচঞ্চল, আকাশের মতো উদার, অপরিমেয়, অসীম ভাবতন্ময়, কমনীয় বালস্বভাবের মাধুর্যে কোমল। একজন ছিলেন প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক কর্মশক্তির দীপ্যমান ভাস্কর, অপরে ছিলেন অন্তর্মুখী ভাবদ্যুতির বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি। একজনের বাণী প্রাণস্পর্শী বিদ্যুৎবাহী শক্তিকণা, অপরের অন্তঃসলিলা ফল্গুর পূতপ্রবাহ। একজনের বিশাল আকর্ণবিস্তৃত নয়নে বিশ্বগ্রাসী প্রেমপূর্ণ প্রখর দিব্য তেজ। অপরের ধ্যানস্তিমিত লোচনে সকরুণ, অপার্থিব, 'ঠাকুরের কথায়—ফ্যালফেলে দৃষ্টি, যেন ডিমে তা দিচ্ছে।'[1]

---

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত

দ্বিতীয় বারে আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ একদিন ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভাইদের বলেন, "প্রথম বারে পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে ওদের সঙ্ঘবদ্ধতা দেখে বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, তাদের সব প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ব্যবসাদারী বুদ্ধি—আর নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ভরে রয়েছে। নিজের নিজের প্রাধান্য আর ক্ষমতার লোভে যেন সবাই তারা সদাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। গরীব দুর্বলদের পিষে ফেলে ধনীরা নিজেদের সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের যোগাড় করে নিচ্ছে। এই দেখে এবার জ্ঞান হল—ওসব যেন সাক্ষাৎ নরক।"

ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ত্যাগপূত আদর্শ প্রেম ভক্তির ভিত্তিতে মঠের কাজকর্ম চলিতেছে, ভক্ত ও কর্মীরা নিস্বার্থভাবে জীব সেবায় ব্রতী হইয়াছে, ইহা দেখিয়া স্বামীজী খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

মিশনের তরুণ কর্মীদের অধ্যাত্ম-জীবন যাহাতে সুগঠিত হয়, কর্মব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ঈশ্বরভজন ও ঈশ্বরনিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়, সেদিকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। ত্যাগ বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক ধৃতি দৃঢ় না হইলে, ঈশ্বরপ্রেমের আনন্দ-রস হৃদয়ে ওতপ্রোত না হইলে, মঠ-মিশনের কাজে স্বার্থ বুদ্ধি, ঐহিকতা ও অহমিকা আসিবে, সঙ্ঘের ভিত্তি ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িবে, ইহা ব্রহ্মানন্দ জানিতেন। তাই সর্বসময়ে তরুণ সাধকদের তিনি যোগাইতেন ঈশ্বরীয় প্রেরণা ও সাধন-ভজনের উদ্দীপনা।

কর্মীদের উপদেশ দিতে গিয়া মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, 'মনের গোলমালের জন্য ধ্যান-জপ হয় না। কাজের জন্য ধ্যান-জপের সময় পাওয়া যায় না, মনে করা ভুল। ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ারশিপ—কর্ম এবং উপাসনা একসঙ্গে করবার অভ্যাস করতে হবে। কেবল সাধনভজন নিয়ে থাকতে পারলে ভাল, কিন্তু কয়জনে তা পারবে? কিছু না ক'রে অজগরবৃত্তি অবলম্বন ক'রে থাকে এক সম্পূর্ণ জড়বুদ্ধি লোকেরা অর্থাৎ যাহাদের মস্তিষ্ক খাটাবার কোনোই শক্তি নেই, কোনো রকমে বেঁচে থাকে, তারাই পারে —আর পারেন মহাপুরুষরা যাঁরা সকল কর্মের পার। গীতায় আছে, কর্ম না করে জ্ঞানলাভ হয় না। কর্মের মধ্য দিয়ে যেতেই হয়। যারা কর্ম ছেড়ে দিয়ে সাধনভজন করে তাদেরও ঝুপড়ি বাঁধতে আর রান্না করতে সময় কেটে যায়। কর্ম ঠাকুর স্বামীজীর —এই ভাব নিয়ে করলে কোনো বন্ধন তো হবেই না, অধিকন্তু তার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক, শারীরিক সব রকমের উন্নতি হবে। তাঁদের পায়ে আত্ম-সমর্পণ করে শরীর মন সব তাঁদের পায়ে দিয়ে দাও।"

মানুষের মনস্তত্ত্ব ও মনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে মহারাজ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নবীন সাধকদের উদ্দেশ্যে বলিতেন[1] :

"মন খাটিতে চায় না, সকল সময় সুখ খোঁজে। কিছু পাইতে হইলে খাটিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় অভ্যাস দৃঢ় করিবার জন্য জোর করিয়া ধ্যান-জপাদি করিতে হয়। যদি অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হয়, শুইয়া জপ করিবে, ঘুম পাইলে বেড়াইয়া বেড়াইয়া করিবে। এইরূপে অভ্যাস দৃঢ় ও ধাতস্থ করিয়া লইতে হইবে।

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পত্রাবলী

ইচ্ছা হইলেই কি ছাড়িয়া দিতে হইবে? এইরূপভাবে চলিলে কোনোদিনও অভ্যাস দৃঢ় হয় না। মনের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করা চাই। এইরূপ চেষ্টার নামই সাধন। মনকে বসে আনাই সাধনপথের লক্ষ্য।'

পৃথিবীতে সৎ অসৎ দুই আছে এবং থাকিবে। এ সম্পর্কে নবীন সাধনার্থীদের তিনি দার্শনিক মনোভাব অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেন। বলিতেন, "সৎভাবের লোক উপকার করেই যাবে, এ তাদের স্বভাব। দুষ্টলোক অনিষ্ট করবে, সেও কিন্তু তাদের স্বভাব। 'একজন সাধু নদীর ধারে বসে ধ্যানজপ ভজন করত। একদিন একটি বিছে জলে ভেসে যাচ্ছে দেখে তার মনে দয়া হল এবং হাতে ধরে বিছেটাকে জল থেকে পাড়ে তুলি দিলে। বিছেটাকে যেমনি ধরতে গেছে, অমনি সে হাতে কামড়ে দিয়েছে। সাধুটি তখন যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে বিছেটা আবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তা দেখে সাধুটি আবার তাকে পাড়ে তুলে দিলে—বিছেটা আবার তাঁকে কামড়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে বিছেটা আবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে সাধুটি যখন তাকে ফের তুলতে যাচ্ছে, তখন এক ব্যক্তি বললে, –'দেখুন বিছেটা আপনাকে বার বার কামড়ে দিচ্ছে আর আপনি ফের তাকে তুলতে যাচ্ছেন?' তার কথা শুনে সাধুটি জবাব দিলে, 'বিছের স্বভাব কামড়ানো, সে কামড়াচ্ছে; সাধুর স্বভাব পরোপকার করা, আমি তাই করব। সে আমাকে কামড়াচ্ছে বলে আমি নির্দয় হব কেন? এই বলে আবার বিছেটাকে জল থেকে তুলে অনেক দূরে ফেলে দিলে, যাতে আর না জলে পড়তে পারে। যাদের সৎস্বভাব, তারা এইরূপই ক'রে যাবে—তারা কখনও নিজের স্বভাব ছাড়ে না।"

তরুণ ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মানন্দের কণ্ঠে যে আশা ও উৎসাহের বাণী শুনিতেন, তাহা অপূর্ব। তিনি বলিতেন, "উঠে পড়ে লেগে বস্তু লাভ করে নে। মনটাকে ঠিক কম্পাসের কাঁটার মতো করতে হবে। জাহাজ যে দিকেই যাক না কেন, কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে। তাই জাহাজের দিক্ ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তাহলে তারও আর কোনো ভয় থাকে না। হাজার কুলোকের মধ্যে পড়লেও তার বিশ্বাস ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎকথা হলেই সে ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কি রকম জানিস্? যেমন চক্‌মকি পাথর শত বৎসর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না—তুলে লোহার ঘা মারা মাত্রই আগুন বেরোয়, সেই রকম তাঁকে লাভ ক'রে যে ধন্য হয়েছে সে অন্য কিছুতেই মন দিতে পারে না। কেবল তাঁকে নিয়েই দিন যাপন করে। ভগবৎ কথা ও সাধু ভক্তের সঙ্গ ছাড়া তার আর কিছুই ভাল লাগে না। ঝড়ের এঁটো পাতার মতো পড়ে থাকে, নিজের কোনো ইচ্ছা বা অভিমান থাকে না, বাতাস তাকে যে দিকে নিয়ে যায় সে দিকেই যায়। সে তখন সংসারেও থাকতে পারে, আবার সচ্চিদানন্দ-সাগরেও ডুবে যেতে পারে।

"তোদের মনের স্বভাবটা যাতে পাকা হয়ে যায় তার চেষ্টা কর্। একবার অন্য রকম হয়ে গেলে আর উপায় নেই। বাসনাহীন মন কেমন জানিস্? যেমন শুক্‌নো দেশলাই—একবার ঘষলেই দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে। কিন্তু ভিজে গেলে ঘষতে ঘষতে কাঠি ভেঙে গেলেও জ্বলে না। তেমনি মনে একবার অন্য রকম ছাপ পড়লে শত চেষ্টাতে তা নষ্ট করা যায় না।"

মঠের যুবক সাধুদের সতর্ক করিতে গিয়া তিনি কহিতেন,[1] "আসল তপস্যা তিনটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম, সত্যাশ্রয়ী হতে হবে, সত্য খোঁটাকে সর্বদা ধরে থাকতে হবে, প্রত্যেক কাজে। দ্বিতীয়, কামজয়ী হতে হবে। তৃতীয় বাসনা জয়ী হতে হবে। এই তিনটি পালন করতেই হবে। এইগুলি জীবনে ফলানো বা সাধন করাই আসল তপস্যা। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি সবচেয়ে দরকারী, অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হতে হবে। আমাদের শাস্ত্র বলেন, যারা বারো বৎসর কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য পালন করে, তাদের পক্ষে ভগবান লাভ করা খুব সোজা। এরূপ হওয়া ভারী শক্ত। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলছি, ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারী না হলে ঠিক ঠিক ধ্যান হওয়া অসম্ভব। সূক্ষ্ম বাসনা জয় করা ভারী শক্ত। এই জন্য সন্ন্যাসীদের এত কঠোর নিয়ম। সন্ন্যাসী কোনো স্ত্রীলোকের দিকে তাকাবে না। এমন কি, ফটোগ্রাফ দেখলেও মনের উপর একটা ছাপ পড়তে পারে। মনের স্বভাব হচ্ছে কোনো একটা সুন্দর জিনিস দেখলেই ভোগ করতে চায়। এইরূপে অনিচ্ছাসত্ত্বে অনেক জিনিস ভোগ করে। এটা অতিশয় হানিকর। ব্রহ্মচর্য পালনে ওজঃশক্তি বৃদ্ধি হবে।"

একটি জিজ্ঞাসু ভক্ত ধ্যানজপ সম্পর্কে মহারাজের কাছে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁহার উত্তরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি লিখেন,[2] "ধ্যান-জপে ও পূজা-পাঠে যত বেশী সময় দিতে পারা যায় তা কল্যাণকর। যাহারা শুধু সাধনভজন লইয়া থাকিতে চায়, তাহাদের অন্তত ১৪।১৫ ঘণ্টা ধ্যান-জপ করা উচিত। অভ্যাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে, সময় আরও বাড়িয়া যাইবে। মন যত ভিতরের দিকে যাইবে তত বেশী আনন্দ পাইবে। ভজনে একবার আনন্দ পাইলে আর কোনোমতেই ছাড়িতে ইচ্ছা হইবে না। তখন কত সময় কি করিতে হইবে সে প্রশ্নের মীমাংসা মন নিজেই ঠিক করিয়া লইবে। মনের এইরূপ অবস্থা না হওয়া-পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ¾ ভাগ সময় যাহাতে ধ্যান-জপে কাটে, বিশেষভাবে তাহার চেষ্টা করিবে। সৎগ্রন্থ পাঠ করিবে ও ধ্যান-জপের সময় মনে কত ভাব উঠে মন কতটা স্থির হয় ইত্যাদি বিষয় ভাবিবে। শুধু চোখ-কান বুজিয়া ঘণ্টাখানেক ধ্যান-জপ করিলেই সব হইয়া গেল না। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করা দরকার। এইভাবে চিন্তা করিলে মনের অবস্থা বিশেষভাবে বুঝা যায় এবং মনে যে সব স্ফুট উঠে সেগুলিকে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করা যায়। এইরূপে একটি একটি করিয়া ত্যাগ করিবার পর মন যখন শান্ত হইবে তখনই ঠিক ঠিক ধ্যান জপ হইবে। ধ্যান-জপের উদ্দেশ্য মনকে শান্ত করা। ধ্যান-জপ করিয়া মন যদি শান্ত না হয়, আনন্দ যদি না পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে ধ্যান জপ ঠিক ঠিক হইতেছে না।"

ব্রহ্মানন্দকে আরও বলিতে শুনা যাইত, "যারা সাধনভজন করে, সব অবস্থাতেই করে। যেখানে সুযোগ-সুবিধা বেশী হয় সেখানে তারা আরও জোরে সাধনভজন করে। এখানে সুবিধা হচ্ছে না, ওখানে সুবিধা হচ্ছে না ক'রে যারা বেড়ায়, তারা কোনো কালে কিছু করতে পারে না, ভ্যাগাবণ্ডের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে শুধু সময় নষ্ট করে।

---

১ ধর্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ . কথোপকথন

২ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

"খুব জপ কর্ বাবা, খুব জপ কর্। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ উপায়। এ যুগে যোগ-যাগ করা বড় কঠিন। জপ করতে করতেই মন স্থির হবে ইষ্টেতে লয় হয়ে যাবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্তি চিন্তা করতে হয়। তাতে জপ-ধ্যান দুই-ই একসঙ্গে হয়ে যায়। এভাবে জপ করতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়।

"স্মরণ-মনন খুব রাখতে হবে। জপ-ধ্যান করতে গেলে নানা সুযোগ সুবিধা খুঁজে নিতে হয়, কিন্তু স্মরণ-মননে কোনো অপেক্ষা রাখে না। খেতে-শুতে, উঠতে-বসতে, সব সময়ই স্মরণ-মনন হতে পারে। দিনরাত স্মরণ-মনন রাখতে পারিস্ তো জানবি, মন অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। রামানুজের মতে, ঐরূপ অবিশ্রান্ত চিন্তার নামই ধ্যান।"

তরুণ সাধকদের শুদ্ধতা, ত্যাগ বৈরাগ্য ও পবিত্রতার উপর ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কহিতেন, "দ্যাখো, ঠাকুর বলতেন ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তাই বলছি, যদি আমরা তার ভক্ত, তাঁর সেবক, তাঁর দাস বলে পরিচয় দিতে চাই, তা হলে আমাদের শুদ্ধ, পবিত্র হতে হবে। শুদ্ধ হৃদয়ই তাঁর আসন। অশুদ্ধ হৃদয় থেকে তিনি অনেক দূরে থাকেন। আমাদের হৃদয় যখন কাঁচের মতো স্বচ্ছ ও নির্মল হবে - কোনো দাগ থাকবে না, তখন আমাদের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা হবে। তখনই আমরা তাঁর ভক্ত, সেবক, আশ্রিত বলবার অধিকারী।

"শুদ্ধ মনে তাঁর ছাপ সুন্দর পড়ে। আরশিতে ময়লা থাকলে যেমন মুখ দেখা যায় না, তেমনি অশুদ্ধ মনে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না। তোমাদের এখন অল্প বয়স, মনে কোনো রকম ময়লা ধরে নি, এখন থেকে তাঁর জন্য হৃদয়ে আসন পেতে রাখ—অন্য কোনো জিনিসের স্থান যেন সেখানে আর না হয়। শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন না হলে তাঁকে কখনো জানা যায় না। শুদ্ধ ও পবিত্র হও। তাঁকে লাভ করতেই হবে এ জীবনে।"

তপস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে এক নবীন সাধককে তিনি লিখিতেছেন[১], "মনকে দুষ্ট অশ্বের সঙ্গে তুলনা করেছে। দুষ্ট অশ্ব বিপথে নিয়ে যায়। যে রাশ টেনে রাখতে পারে সেই ঠিক চলে। খুব লড়াই কর। কি কচ্ছ তোমরা? গেরুয়া নিলে আর সংসার ত্যাগ করলেই কি সব হয়ে গেল? কি হয়েছে তোমাদের?

"সময় শুধু চলে যাচ্ছে। এক মুহূর্তও নষ্ট ক'রো না। খুব জোর আর তিন চার বৎসর করতে পারবে, তারপর শরীর, মন দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন আর কিছুই করতে পারবে না। না খাটলে কি কিছু হয়? তোমরা বুঝি ভেবেছ যে আগে অনুরাগ ও ভক্তি বিশ্বাস হোক তারপর ডাকবে। তা কি কখনও হয়? অরুণোদয় না হলে কি আলো আসে? তিনি এলেই তবে প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে আসবে। তাঁকে জানবার জন্যই তপস্যা। তপস্যা ছাড়া কি কিছু হয়। ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন, 'তপঃ, তপঃ, তপঃ।' দেখছ না অবতার পুরুষদের পর্যন্ত কত খাটতে হয়েছে! কেউ কি না খেটে কিছু পেয়েছে? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য এঁদেরও কত তপস্যা করতে হয়েছে। আহা! কি ত্যাগ, কি তপস্যা!

১ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

"বিশ্বাস কি প্রথমে হয়? রিয়েলিজেশান বা অনুভূতি হলে তবে বিশ্বাস হয়। কিন্তু তার আগে শুধু গুরু মহাপুরুষদের বাক্যে বিশ্বাস করে, এমন কি অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে এগুতে হয়। ঠাকুরের সেই ঝিনুকের কথা জানতো? স্বাতী নক্ষত্রের এক-ফোঁটা জলের জন্য হাঁ করে থাকে, ফোঁটাটা পেলেই অতল জলে ডুবে যায়, গিয়ে মুক্ত তৈরি করে! তোমরাও তেমনি গুরুকৃপারূপ এক-ফোঁটা জল পেয়েছো। যাও, ডুবে যাও।

"তোমাদের একটা আত্মবিশ্বাস নেই। সাধনপথে পুরুষকার দরকার। কিছু কর—চার বৎসর অন্ততঃ ক'রে দেখ দেখি। যদি কিছু না হয় তবে আমার গালে একটা চড় মেরো। তমঃ রজঃ ছাড়িয়ে সত্ত্বে যেতে না পারলে ধ্যান-জপ কিছু হয় না। তারপর সত্ত্বকেও ছাড়িয়ে চলতে হবে: এমন জায়গায় যেতে হবে যে আর আসতে না হয়। মানুষ জন্ম কত দুর্লভ। অপর প্রাণীদের জ্ঞান হয় না। একমাত্র মানুষ জন্মেই ভগবান্ লাভ হয় এবং তা করতে হবে। এই জন্মে খেটে-খুটে মনটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেন আর জন্মাতে না হয়। প্রথমে মনকে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, পরে সূক্ষ্ম থেকে কারণ, কারণ থেকে মহাকারণ, মহাকারণ থেকে মহাসমাধিতে নিয়ে যেতে হবে।

"আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর পাদপদ্মে ছেড়ে দাও। তিনি ছাড়া যে আর কিছু নেই। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' তিনিই সব, সবই তাঁর। কিন্তু হিসেব ক'রো না। আত্মসমর্পণ কি একদিনে হয়? সেটা হলে তো সব হয়েই গেল। সেটার জন্য খুব চেষ্টা করতে হয়। অনন্ত জীবন রয়েছে। মানুষের আয়ু বড় জোর একশ বছর, যদি অনন্ত সুখ চাও তো এই একশ বছরের সুখ ছেড়ে দিতে হবে।"

ভক্তদের প্রায়ই তিনি বলিতেন সময় থাকিতে সাধন ভজনের কাজই গুছাইয়া নিতে —"এই জীবনের কিছুই ঠিক নেই। দশ বিশ বছর পরে শেষ হতে পারে বা আজই শেষ হতে পারে। কখন শেষ হবে তা যখন জানা নেই, তখন পথের সম্বল যত শীঘ্র করা যায় ততই ভাল। কি জানি কখন সে ডাক আসে। শেষে কি খালি হাতে অজানা অচেনা দেশে যেতে হবে? খালি হাতে অজানা দেশে গেলে বড় কষ্ট পেতে হয়। যখন জন্মেছ তখন মৃত্যু নিশ্চয়ই হবে। মৃত্যু হলে অন্য এক দেশে যেতে হবে এটাও ঠিক। যো সো ক'রে পথের সম্বল ক'রে নিয়ে বসে থাকো। ডাক এলে হাসতে হাসতে চলে যাবে। কাজ গোছানো থাকলে আর কোনো ভয় থাকবে না। মনে ঠিক ঠিক জানা থাকে আমাদের পথের সম্বল আছে।

"সদ্‌বাসনা মনে যখন জেগেছে, সদ্ভাবে জীবন যাপন করবার, তাঁকে জানবার ও বোঝবার সুযোগ যখন হয়েছে, তখন খেটে-খুটে বস্তু লাভ ক'রে নাও। খুঁটি পাকড়াও। শরীর যাক্ থাক্, খুঁটি পাকড়ানো চাই-ই চাই। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। আমি মানুষ, আমি সব করতে পারি, এই রকম বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাও— বস্তু পাবে, মনুষ্য জীবনের যথার্থ সদ্ব্যবহার হবে। আসা যাওয়া বড় কষ্ট। আসা যাওয়ার দফা শেষ ক'রে ফেল। তাঁর নিত্যসাথী হয়ে যাও।

"ভয় ও দুর্বলতা মন থেকে দূর করে দাও। পাপ পাপ ভেবে মন বহনও খারাপ করবে না। তাছাড়া, যত বড় পাপই হোক না কেন, লোকের চক্ষেই উহা বড়, ভগবানের

দিক দিয়ে ওটা কিছুই নয়। তাঁর একটি কটাক্ষে কোটি কোটি জন্মের পাপ এক মুহূর্তে ছিন্ন হতে পারে।"

প্রেমপূর্ণ নয়নে, দৃপ্ত ভঙ্গীতে, ঈশ্বরের কৃপার প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ওহে, তিনি যে অপেক্ষা করছেন, পাল তুলে ধরলেই নৌকা ঠিকানায় ঠিক পৌঁছে যাবে। পাল তোল, ওহে পাল তোল। শক্তি তোমাদের যথেষ্ট রয়েছে। এবার নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ—তাঁর নাম শুনেছি, তাঁর নাম করেছি, আমাতে ভয় দুর্বলতা থাকতে পারে না; তাঁর কৃপায় আমি তাঁকে লাভ করবই এ জীবনে। পিছনে ফিরে তাকিও না, এগিয়ে যাও—তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে, মনুষ্য জন্ম সার্থক হবে, অপার আনন্দের অধিকারী হবে।"

মঠের ছেলেদের মহারাজ সকল সময় চোখে চোখে রাখিতেন, তাঁহার পরমাশ্রয়ে অবস্থান করিয়া নির্ভয়ে তাঁহারা গঠন করিত সাধনময় ও সেবাময় জীবন। মহারাজ বলিতেন, "তোদের এত বলি কেন জানিস? আমাদের যখন তোদের মতো বয়স ছিল, ঠাকুর আমাদের জোর ক'রে সাধনা করিয়ে নিতেন। ছেলেবেলা কাঁচা মাটির মতন স্বভাবটা থাকে কিনা, তাই যেটা সামনে পায় সেইটাকেই আঁকড়ে ধরে। নরম মাটিতে যা ইচ্ছে হয় গড়—সব জিনিসই তৈরি করতে পারা যায়। একটি জিনিস তৈরি কর, তাকে ভেঙে ফেলে আবার অন্য জিনিস তৈরি কর। যতক্ষণ মাটি কাঁচা থাকে তাতে যেরূপ ইচ্ছে গড়ন করা যায়। কিন্তু এ মাটিকে আগুনে পোড়াবার পর আর কোনো রকম গড়ন হবে না। তোদের মন এখন কাঁচা মাটির মতো। এখন যে ভাবে গড়বি সে রকম হবে। মন এখন শুদ্ধ পবিত্র আছে—অল্প চেষ্টাতেই ভগবানের দিকে যাবে। মনটা এখন থেকে বেশ ক'রে ভগবানে লাগিয়ে রাখলে অন্য কোনো ভাব ঢুকতে পারবে না। তাঁর ভাবে মন যদি একবার পাকা হয়ে যায়, আর কোনো ভাবনা নেই।

"মন সরষের পুঁটুলির মতো। সরষের পুঁটুলি খুলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লে কুড়িয়ে তোলা যেমন শক্ত, বয়স হলে মন যখন সংসারে ছড়িয়ে পড়ে তখন সে মনকে গুটিয়ে এনে ঈশ্বরীয় বিষয়ে লাগানও তেমনি শক্ত। তাই তোদের বলি, ছড়িয়ে যাবার আগে মনটা গড়ে নে। খুঁটি বেশ পাকা ক'রে নে। এরপর বেশী বয়স হলে মন যখন সংসারে ছড়িয়ে যাবে, তখন সদ্ভাবে মন লাগাতে খুব বেগ পেতে হবে কষ্ট পেতে হবে। ষোল বৎসর থেকে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যা করবার ক'রে নিতে হবে।"

ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ এক ভক্তকে লিখিয়াছেন,[1] "ভগবানের জন্য যে সব ছেড়েছে, ভগবানের উপর তার একটা জোর আছে। বাপ-মার কাছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে যেমন জোর করা যায়, আবদার করা যায়, তাঁকেও তেমনি জোর ক'রে বলা যায় —দেখা দাও, দেখা দিতেই হবে। তখন তিনি দৌড়ে আসেন, কোলে তুলে নেন। তার কোলে উঠলে যে কি আনন্দ, তা সেই জানে যাকে তিনি কোলে তুলে নিয়েছেন। সে আনন্দের কাছে মানুষ যাকে আনন্দ বলে তা তুচ্ছ হয়—আলুনী লাগে। ঠাকুর আরও বলতেন, 'যাঁরা তাঁর জন্য ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করেছে, তারা বার আনা রাস্তা এগিয়ে গেছে।' দেহসুখ ত্যাগ করা কি সোজা রে? তাঁর অনেক কৃপা থাকলে, পূর্ব

১ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

জন্মের অনেক তপস্যা থাকলে তবে মানুষ সেই শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী হয়। মনটাকে এমনভাবে তৈরি করতে চেষ্টা কর যেন ওসব বাসনা মনে আদৌ উঠতে না পারে। এইভাবে জীবন কাটানো বড় শক্ত। এখন ছেলেমানুষ বলে যত সোজা মনে করছিস তত সোজা নয়। এ অবস্থাটা কি রকম জানিস?—খোলা তরোয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। প্রত্যেক মুহূর্তে কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ছাড়া এ রাস্তায় চলা যায় না। ভগবানে ভালবাসা ও বিশ্বাস না হলে ব্রহ্মচর্য রাখা বড় শক্ত। ভোগ বিলাসপূর্ণ জগতে থাকতে হবে, চোখের সামনে শতকরা নিরানব্বই জনেরও বেশী লোক ভোগের পিছনে পিছনে দৌড়ুচ্ছে, এই সব নিত্য দেখতে হবে, এইসব দেখে শুনে মনের মধ্যে নানা রকম ছাপ পড়বার খুবই সম্ভাবনা। এই সব ছাপ যদি একবার কোনোরকমে পড়ে আর রক্ষা নেই। যারা ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করতে চায়, তাদের সদা সর্বদা নিজের মনকে সৎ বিষয়ে নিযুক্ত ক'রে রাখতে হবে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎ বিষয়ে আলোচনা, ঠাকুর সেবা, সাধু সেবা, সাধুসঙ্গ ও জপধ্যান নিয়ে থাকতে হবে। একমাত্র এই উপায়েই নিজেকে তৈরি করা যেতে পারে।

"প্রথমে ব্রহ্মচর্যে নিষ্ঠা পাকা করবে—বাকী সব আপনি এসে যাবে। সাধনা না করলে ব্রহ্মচর্য ঠিক রাখা যায় না। ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই ভগবান্ লাভ হয়। ভগবান্ লাভ না হলে মনুষ্যজন্ম বৃথা গেল। তাঁর দর্শন হলে তবেই আনন্দ। ছেলেমানুষ তোরা, সৎ বুদ্ধি, সৎ মন তোদের। একটু চেষ্টা কর্। অল্প চেষ্টাতেই ভক্তি-বিশ্বাস জেগে উঠবে।"

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া মঠের কঠোর সন্ন্যাসজীবন তরুণেরা নিয়াছে, তাঁহাদের যাহাতে পরমার্থ লাভ হয় এজন্য ব্রহ্মানন্দের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। তাহাদের কহিতেন[১], "ভগবান্ লাভের জন্য ঘর-দোর ছেড়ে এসেছিস্, তাঁকে লাভ করবার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে প্রাণপণ চেষ্টা চাই। পাগলা কুকুরের মতন ভগবানের জন্য 'হন্যে' হতে হবে। চারটি ডাল ভাত খেয়ে মঠে শুধু পড়ে থাকা মানে অত্যন্ত হীনভাবে জীবন যাপন করা—না হল এদিক, না হবে ওদিক, একূল ওকূল দুকূল গেল। ইতো নষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হবে। আর মন যদি তাঁতে বসতে না চায়, অভ্যাস রাখতে হবে। রোজ এক অধ্যায় ক'রে গীতাপাঠ দরকার। আমি নিজে দেখেছি, মন যখন নীচে নামে, একটু গীতাপাঠ করলে সেগুলো একেবারে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেয়। চারটি ডাল ভাত খেয়ে পড়ে থাকাই তো ইতো নষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ।

"প্রত্যহ মনকে খোঁচাতে হবে। কি করতে এসেছি, কি ক'রে দিনটা গেল? বাস্তবিকই কি ভগবান্‌কে আমার চাই? চাই যদি তো করছি কি? বুকে হাত দিয়ে বল দেখি চাওয়ার মতো কাজ করেছিস কিনা? মন ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে। তার গলা টিপে ধরতে হবে, ফাঁকি না দিতে পারে। সত্যকে ধরতে হবে পবিত্র হতে হবে। যতই পবিত্র হবে ততই মনের একাগ্রতা বাড়বে ও মনের সূক্ষ্ম ফাঁকিগুলো ধরা পড়বে আর সেগুলি সম্পূর্ণরূপে নাশ পাবে। 'কে শত্রবঃ সন্তি নিজেন্দ্রিয়াণি। তান্যেব মিত্রাণি জিতানি যানি।' এই মনই নিজের শত্রু আবার এই মনই নিজের মিত্র।

১ পত্রাবলী : ব্রহ্মানন্দ

যে যত বিশ্লেষণ করে, সেবা করে, মনের এই গলদ বের করে তার সম্যক নাশ করতে পারবে, সে তত দ্রুত সাধনরাজ্যে এগিয়ে যাবে।

"খুব জপধ্যান করবি। প্রথম প্রথম মন স্থূল বিষয়ে থাকে। ধ্যানজপ করলে তখন সূক্ষ্ম বিষয় ধরতে শিখে। শীতকালই তো ধ্যানজপের সময়, আর এই-ই বয়স। 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং' —বলে বসে যা। সত্যই ভগবান্ আছেন কি না একবার দেখে নে না। একটু একটু তিতিক্ষা, যেমন অমাবস্যা একাদশীতে একাহার করা ভাল। বাজে গল্পটল্প না ক'রে সারাদিন তাঁর স্মরণ-মনন করবি। খেতে, শুতে, বসতে—সর্বক্ষণ। এইরূপ করলে দেখবি কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগবে। স্মরণ-মননের চেয়ে কি আর জিনিস আছে? মায়ার পর্দা একটার পর একটা খুলে যাবে। নিজের ভেতরে যে কি অদ্ভুত জিনিস আছে দেখতে পাবি—স্ব-প্রকাশ হবি।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই দুই গুরুভাই-এর আকৈশোর বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা ও প্রেম ছিল এক দর্শনীয় বস্তু। আবার দুইজনের মধ্যে কলহ, মান-অভিমান ও কান্নাকাটিও কম দেখা যাইত না। গোলযোগটা প্রায়ই স্বামীজীই শুরু করিতেন। শেষের দিকে, রোগে ভুগিয়া ও অতিরিক্ত শ্রমজনিত অবসন্নতার ফলে স্বামীজীর মেজাজ কিছুটা খিটখিটে হইয়া যায়। এ সময়ে তাঁহার ঝামেলা ও চেঁচামেচি ব্রহ্মানন্দকেই সহ্য করিতে হইত বেশী, আর ইহা তিনি করিতেন স্বামীজীর প্রেমের আকর্ষণে, নিজের ঔদার্য ও প্রশান্তির গুণে।

সে-বার বলরাম বসুর ভবনে স্বামীজী এবং ব্রহ্মানন্দ দুই জনেই অবস্থান করিতেছেন। ডায়াবিটিজ রোগে স্বামী বিবেকানন্দ তখন খুব পীড়িত। ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য গুরুভাইদের এজন্য উদ্বেগের অবধি নাই। রাত্রে স্বামীজী প্রায়ই ঘুমাইতে পারেন না, সেদিন ক্লান্ত হইয়া দুপুরে নিজের ঘরে শয়ন করিয়া আছেন। এমন সময় স্বামীজীর মাতার পুরানো দাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

ব্রহ্মানন্দকে সে প্রশ্ন করে, "হ্যাঁগা, আমাদের নরেন কোথায় রয়েছে, বল তো।"

ব্রহ্মানন্দ জানান, "তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন। শরীর অসুস্থ, কাল সারা রাত ঘুম হয় নি। তুমি বরং আর একদিন এসো।" একথা শুনিয়া দাসী সেখান হইতে চলিয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গের পর বিবেকানন্দকে একথা জানানো হয়। ক্রোধে তিনি গর্জিয়া উঠেন। ব্রহ্মানন্দকে কহেন, "তোর কি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নেই? ঝি কি এমনি শুধু শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল? নিশ্চয় মা তাকে কোনো জরুরী কাজের ভার দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে বর্ষিত হয় প্রচুর তিরস্কার ও কটূক্তি। তখনি একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকাইয়া স্বামীজী তাঁহার জননীর সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলেন।

বাড়িতে পৌঁছিয়া শুনিলেন, মা ঐ ঝিকে তাঁহার নিকট পাঠান নাই। ও পাড়ায় তাহার কি যেন কাজ ছিল, সেই সুযোগে নরেনের সঙ্গেও সে দেখা করার চেষ্টা করিয়াছে।

একথা শোনামাত্র স্বামীজীর অনুতাপের আর সীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ

জননীর নাম করিয়া ব্রহ্মানন্দের জন্য গাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। ব্রহ্মানন্দ সেখানে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অনুতপ্ত স্বরে কহিলেন, "রাজা আমি বড় অন্যায় করেছি। অযথা তোকে এত গালমন্দ দিয়েছি। কেবল তুই বলেই ওরকম কটু কথা আমি বলতে পেরেছি।"

ব্রহ্মানন্দের দুঃখ ও অভিমান ততক্ষণে দূর হইয়াছে। একগাল হাসিয়া এবার স্বামীজীকে প্রবোধ দিবার জন্যই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

স্বামীজীর ইচ্ছা, বেলুড়মঠের গঙ্গা তীরের কিছুটা অংশে পোস্তা বাঁধানো হোক, এবং একটা ঘাট তৈরি করা হোক। বিজ্ঞানানন্দ প্রাক্তন ইন্‌জিনিয়ার, তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "দ্যাখো তাড়াতাড়ি এর একটা প্ল্যান আর খরচের এস্টিমেট দাও।"

বিজ্ঞানানন্দ ভয়ে ভয়ে কম করিয়াই ব্যয়বরাদ্দ স্থির করিলেন। কহিলেন, "তিন হাজার টাকাতেই এটা হয়ে যাবে।"

ব্রহ্মানন্দের উপর টাকা সংগ্রহ ও কাজকর্ম দেখাশুনার ভার, কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু দেখা গেল, পূর্বের ব্যয়বরাদ্দ আর ঠিক থাকিতেছে না। স্বামীজীর ভয়ে বিজ্ঞানানন্দ ভীত হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মানন্দ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তা আর কি করা যাবে? কাজে যখন হাত দেওয়া হয়েছে, খরচ বেশী হলেও শেষ করতেই হবে। এজন্য তুমি ভেবো না। কাজ যাতে ভালো হয় তাই করো।"

স্বামীজী একদিন খোঁজখবর নিতে গিয়ে দেখেন, এস্টিমেটের চাইতে ব্যয় ইতিমধ্যে বেশী হইয়া গিয়াছে এবং কাজ এখনো অনেক বাকী। ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন; তীব্র ভাষায় ব্রহ্মানন্দকে করিতে লাগিলেন গালিগালাজ।

স্বামীজী সেখান হইতে চলিয়া গেলে মর্মাহত ব্রহ্মানন্দ নিজের ঘরে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিলেন।

এবার স্বামীজীর হুঁশ হইল, প্রিয়তম গুরুভাইকে অযথা কি মনোব্যথাই না তিনি দিয়াছেন। অখণ্ডানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "পেশন, শিগ্‌গীর যাও তো একবার, দেখে এসো রাজা কি করছে। আহা তাকে কি কটু কথাই না বলেছি।"

অখণ্ডানন্দ ঘরে ঢুকিয়া দেখেন ব্রহ্মানন্দ শয্যায় মুখ গুঁজিয়া অঝোর ধারে কাঁদিতেছেন। এ সংবাদ স্বামীজীর কাছে পৌঁছিল, তখনি উন্মাদের মতো তিনি ছুটিয়া আসিলেন ব্রহ্মানন্দের কক্ষে। তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন, "রাজা, রাজা, আমায় তুই ক্ষমা কর। কি ঘোর অন্যায় আমি করেছি। তোকে অনর্থক গালাগালি দিয়েছি। আমায় তুই ক্ষমা করলি কিনা বল।'

ব্রহ্মানন্দের মনের ক্ষোভ দুঃখ কোথায় চলিয়া গেল, ক্রন্দনরত স্বামীজীকে সান্ত্বনা দিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "তুমি কেন এমন উতলা হয়েছো? আমায় গালাগাল দিয়েছো, তাতে কি হয়েছে? আমায় এত ভালবাসো বলেই তো গাল দিতে পেরেছো। তুমি শান্ত হও।"

স্বামীজীর অনুশোচনার অন্ত নাই। প্রবোধ বাক্য শোনার পরেও অশ্রু ছলছল নয়নে কহিতে থাকেন, "না, না রাখাল, তুই আমায় ক্ষমা কর। ঠাকুর তোকে কত আদর করতেন, কখনো একটা কড়া কথা তোকে তিনি বলেন নি। আর আমি কিনা ছাই কাজের জন্য তোকে এত গালাগালি করলুম—মনে কষ্ট দিলুম। আমি আর

তোদের সঙ্গে থাকার যোগ্য নই। চলে যাই হিমালয়ে। কোথাও নির্জনে গিয়ে থাকবো।"

ব্রহ্মানন্দ ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলেন, "ওসব কি কথা তুমি বলছো। তোমার গালাগালি যে আমাদের আশীর্বাদ। তুমি কোথায় চলে যাবে? তুমি যে আমাদের মাথা। তুমি চলে গেলে আমরা থাক্‌বো কি নিয়ে?"

বহিরঙ্গ জীবনের অন্তস্তলে এমনি এক গভীর প্রেমের ফল্গুধারা উভয়ের মধ্যে ছিল প্রবাহিত। এক একদিনের আকস্মিক ঘটনায় ইহার প্রকাশ দেখিয়া ভক্ত-শিষ্যেরা অবাক হইয়া যাইতেন।

আর একবার স্বামীজীর কঠোর তিরস্কারে ব্রহ্মানন্দ মনে নিদারুণ আঘাত পাইলেন। ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন, না এই ঝামেলা আর পোহাইবেন না, দু-চোখ যেদিকে যায়, চলিয়া যাইবেন।

মঠ-ত্যাগ করার সংকল্প নিয়া বাহিরে যাইতেছেন, বেলতলায় আসিয়া পা দুটি অচল হইয়া গেল। সেখানেই তিনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'এই মঠ, এই ভক্তসঙ্ঘ এই পবিত্র সেবাকর্ম, সব কিছুই তো ঠাকুরের। আমাদের কারুর ব্যক্তিগত তো কিছু নয়। ঠাকুরের এসব ফেলে কোথায় যাবো। কেনই বা যাবো? স্বামীজীর বকাবকিতে কি আসে যায়। বকেছে তো কি হয়েছে? তাছাড়া, স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়ার জন্যই তো তার এমন খিট্‌খিটে মেজাজ।'

মন তাঁহার অমনি শান্ত হইয়া যায়, চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে আনন্দোজ্জ্বল হাসির আভা। ধীরপদে মঠে ঢুকিয়া শুরু করেন নিজের দিনচর্যা।

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার সারা অন্তরের উপলব্ধি দিয়া জানিতেন, বিবেকানন্দ, তাঁহার আকৈশোর বন্ধু বিবেকানন্দ, তাঁহার প্রাণপ্রিয় ঠাকুরের লীলার প্রধান পার্ষদ—ঠাকুরের সহস্রদল কমল। আবার স্বামী বিবেকানন্দও জানিতেন, ব্রহ্মানন্দ শুধু তাঁহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুই নয়, ঠাকুরের নিজের চিহ্নিত সঙ্ঘনায়ক—রাখালরাজ। তাই বাহিরের লোক এই দুইয়ের প্রীতি ও সখ্যের গভীরত্বের পরিমাপ করিতে সক্ষম হইত না। দুইজনেই ছিলেন গুরুগতপ্রাণ এবং গুরুসর্বস্ব। তাই গুরুর মাধ্যমেই দুইয়ের আত্মিক বন্ধন হইয়া উঠে এমনতর চির-অবিচ্ছেদ্য।

রামকৃষ্ণ লীলার ধারক ও বাহক এই দুই প্রধান শিষ্যের প্রণয়কলহ ছিল মঠের তরুণ ব্রহ্মচারীদের এক দর্শনীয় বস্তু।

"মঠের বাগানের পার্শ্বে খোলা মাঠ জমিতে স্বামীজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি চরিয়া বেড়াইত। স্বামীজী ও মহারাজ এই মাঠ এবং বাগানের একটি সীমা বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। যদি স্বামীজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি ভক্ত-সীমা অতিক্রম করিয়া বাগানে আসিত তবে মহারাজ অনধিকার প্রবেশ লইয়া প্রবল আপত্তি তুলিতেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে তুমুল প্রেমকলহ উপস্থিত হইত। পরস্পরের এই অদ্ভুত বালকবৎ আচরণে তাঁহাদের গুরুভ্রাতারা এবং মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা আনন্দে আপ্লুত হইতেন। মনে হইত যেন দুইটি দিব্য ভাবাপন্ন বালক অপরূপ খেলায় মত্ত হইয়াছেন। ইহাদের একজন বিশ্বজয়ী আচার্য শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যজন মঠ-মিশনের সঙ্ঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দ। দুই জনেই প্রায় প্রৌঢ় সীমায় উপনীত। অথচ

ইঁহাদের দুইজনের বালকের মতো বাহ্যিক প্রীতি-কলহের অন্তরালে কি গভীর প্রেম প্রকাশ পাইত[১]।"

মঠ ও মিশনের কাজ ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে, মঠনায়ক ব্রহ্মানন্দের তাই কর্ম-তৎপরতার সীমা নাই। কিন্তু ব্রহ্মচারী ও কর্মীরা শুধু সেবাকর্ম নিয়াই ব্যস্ত থাকুক ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নয়। এই কর্মের পিছনে একটি সাধনভিত্তি গড়িয়া উঠুক, যে জন্য তাহারা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে সেই ঈশ্বর-লাভের সংকল্প সফল হোক, ইহাই তিনি মনেপ্রাণে সর্বদা চাহিতেন। তাই দেখা যাইত, মঠ পরিচালনার ব্যাপক কর্ম-সূচীর মধ্যেও এই তরুণ কর্মীদের আত্মিক উন্নতির ভিত্তি গঠনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সদা তৎপর থাকিতেন। সাধন-নির্দেশ ও তত্ত্বের মীমাংসা তাঁহার কাছ হইতে জানিয়া নিয়া ভক্ত সাধকেরা কৃতার্থ বোধ করিতেন।

স্নেহপূর্ণ স্বরে ইঁহাদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেন, "খুব সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ করা ভাল। রাত্রি যায় দিন আসে, দিন যায় রাত্রি আসে এই সময়টা সংযম সময়। এই সময় প্রকৃতি শান্ত থাকে, উহা ধ্যানজপের বিশেষ অনুকূল। এই সময় সুষুম্না নাড়ী চলে, তখন দুই নাক দিয়েই নিঃশ্বাস বয়। নচেৎ সর্বদা ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী চলে, অর্থাৎ এক নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বয়। তখন চিত্ত চঞ্চল হয়। যোগীপুরুষরা সর্বদা লক্ষ্য রাখেন, কখন সুষুম্না নাড়ী বইবে। সেই সময় তাঁরা যে কাজেই থাকুন না কেন, সব ছেড়ে দিয়ে ধ্যানে বসবেন।"

সাধন-ভজন সম্পর্কে ভক্ত ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা মহারাজের কাছ হইতে কত খুঁটিনাটি কথা, কত জটিল তত্ত্বের মীমাংসাই না জানিয়া নিতেন। তিনি বলিতেন, সাক্ষাৎ সাধন হচ্ছে সব চেয়ে উত্তম—সেই পরমাত্মা রয়েছেন, সর্বদা তার অনুভূতি হচ্ছে। তারপর হচ্ছে ধ্যান, সেখানে তিনি আছেন, আর আমি আছি, জপ-তপ সব কিছু বন্ধ। যখন ধ্যান জমবে তখন দেখবে শুধু ইষ্টের রূপ, তখন জপতপ সব আর চলে না। তার নিচে স্তবস্তুতি ও জপ-তপ করা যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ চিন্তা করা যাচ্ছে। আর তারও নিচে হচ্ছে বাহ্যপূজা—প্রতীক বা প্রতিমা উপাসনা। এই সব হচ্ছে ক্রমোন্নতির নানা অবস্থা। যার মনের যে রকম অবস্থা সে সেখানে থেকে সাধন আরম্ভ করে, আর ক্রমে বেড়ে যায়। একজন সাধারণ লোকের কথা ধর, তাকে একেবারেই যদি নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তা বা সমাধি সম্বন্ধে উপদেশ করা যায়, সে কিছুই ধারণা করতে পারবে না, তার ভালও লাগবে না। দু-একদিন চেষ্টা করে ছেড়ে দেবে। কিন্তু তাকে যদি ফুল-বেলপাতা নিয়ে পূজা করতে দেওয়া যায়, তাতে সে মনে করবে একটা কিছু করলুম। তার মনটাও খানিক ক্ষণের জন্য কতকটা স্থির হলো। এতে সে বেশ আনন্দও পায় তারপর ক্রমে সেই অবস্থা অতিক্রম করে।

"মন যত সূক্ষ্ম হতে থাকে, স্থূল জিনিসে আর সেই রকম রস পায় না। ধরুন আপনি প্রথমে পূজা আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পরে দেখবেন, আপনা থেকেই মনে হবে—জপ করা ভাল, তখন জপটা বেড়ে যাবে। আবার কিছুদিন পরে মনে হবে ধ্যান করা ভাল, তখন শুধু ধ্যান করতে ইচ্ছা যাবে। এই রকমে মানুষ ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের

---

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন

দিকে এগিয়ে যায়। একেই বলে ন্যাচারাল গ্রোথ্ বা স্বাভাবিক উন্নতি। এই রকম মন যেটুকু লাভ করে তা আর নষ্ট হয় না।

"মনে করুন, আপনি এই উঠানে আছেন, আপনাকে ছাদে উঠতে হবে। কোথায় সিঁড়ি আছে খুঁজে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তবে উঠতে পারেন। তা না হয়ে উঠান থেকে কেউ যদি আপনাকে ছুঁড়ে দেয়, তা হলে আপনার অনেক কষ্ট হবে এবং তাতে বিপদের আশঙ্কাও খুব আছে। এই বাইরের জগতে যেমন দেখছেন নিয়মকানুন আছে, অন্তর্জগতেও ঠিক সেই রকম সব ব্যবস্থা আছে"।[১]

ভক্তদের মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "দ্যাখো, দেহই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। সেইজন্য ধ্যান-ট্যান সব শরীরের ভিতর করতে বলে। সহস্রারে মন গেলে আর নামতে চায় না। 'যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা' প্রভৃতি মানে হচ্ছে, হৃদয়ের ভিতর সেই পরমপুরুষকে দেখলে আর জন্ম হয় না। নিম্ন অধিকারীর জন্য বাহ্যরথ, মন্দির প্রভৃতির সৃষ্টি। রামপ্রসাদ যখন হৃদয়ে মাকে দেখলেন, তখন গান বানিয়ে বললেন 'তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।' উঃ, কি ভয়ানক কথা বল দেখি। বাস্তবিক সেই আস্বাদ পেলে আর অন্য কিছু কি ভাল লাগে?

'ঠাকুর বলতেন—দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে জ্ঞাননেত্র আছে, সেটা ফুটলে চারদিক আনন্দময় দেখায়।

—রাজার সাত দেউড়ি বাড়ি। কোনো গরীব নায়েবের কাছে রাজদর্শন প্রার্থনা করলে নায়েব সঙ্গে ক'রে এক এক দেউড়িতে নিয়ে যায়, আর সে জিজ্ঞাসা করে—এই কি রাজা? উত্তর হয়—'না'। এই প্রকারে যখন সমস্ত দেউড়িতে প্রবেশ ক'রে রাজদর্শন করলে, তখন সেই অপরূপ রূপ দেখে আর জিজ্ঞাসা করলে না। সেই রকম গুরু এক এক দেউড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে ভগবান্‌কে মিলিয়ে দেন।"

ধ্যানের পদ্ধতি ও চরম উপলব্ধি সম্পর্কে এক ব্যক্তি মহারাজকে সেবার প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি জানান, "ধ্যানকালে ইষ্টমূর্তিকে জ্যোতির্ময় ভাবতে হয় যেন তাঁর জ্যোতিতে সব আলোকিত। চৈতন্যস্বরূপ ভাববে। এইরূপ ধ্যান পরে সহজেই নিরাকার ধ্যানে পরিণত হয়। তাতে বোধে বোধ হয়। তারপর জ্ঞানচক্ষু খুলে গেলে তখন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সে আর এক জগৎ। এ জগৎটা যেন আলাদা। তাছাড়া, এটা তখন খুব তুচ্ছ হয়ে যায় যেমন উর্দি (মহারাজের ভুবনেশ্বরস্থিত পাচক) কলকাতায় এসে শহরের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য দেখে বললে, 'ভুবনেশ্বরটা কিছুই না'। তারপর মন লয় হয়ে যায়—তখন সমাধি। তারপর নির্বিকল্প। তারপর আরও এগিয়ে কি যে, তা মুখে আর বলা যায় না। সেখানে দেখা নাই, শোনা নাই, অনন্ত অনন্ত!! এ সবই হচ্ছে অবস্থার কথা। তখন মনকে জোর ক'রে এজগতে আনতে হয়। এটা কিছু নয় বলে মনে হয়। 'দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিতং'। সে অবস্থায় গিয়ে কেউ কেউ শরীরটা মস্ত বাধা মনে ক'রে সমাধিতে শরীরটা ছেড়ে দেন। যেন ঘটটা ভেঙে দেওয়া। ঠাকুর বেশ একটা দৃষ্টান্ত দিতেন—'দশটা সরায় জল আছে, তাতে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে। এক একটা ক'রে সরা ভাঙতে ভাঙতে শেষে একটি সরা ও একটি সূর্য রইল। সেটাও ভেঙে দিতে যা রইল, তাই রইল,—সত্য সূর্য রইল এ কথাও বলা চলে না। কে তখন বলবে?'

১ ধর্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ ' কথোপকথন

অধ্যাত্ম-আলোচনার প্রসঙ্গে একদিন তরুণ সাধকদের তিনি বলিলেন, "ঠিক পাকা বিশ্বাস, সেটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি না হলে হয় না। একবার যদি তাঁর দর্শন হয়, অনুভূতি হয়, তবেই ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়। তার পূর্বে সেই বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি একটা হয়। খুব জোর ক'রে বিশ্বাস আনতে হয়। আর বারে বারে এই রকম করতে করতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। অবিশ্বাস করতে নেই। যখন সন্দেহ উপস্থিত হবে, তখন ভাবতে হয়—ভগবান্ সত্য আমার অদৃষ্টদোষে, আমার অশুভ সংস্কারের ফলে তাঁকে বুঝতে পারছি না। যখন তাঁর কৃপা হবে তখন হবে।

"এই মন কি তাঁর ধারণা করতে পারে? তিনি যে এই মনবুদ্ধির অনেক দূরে। এই যে সৃষ্টিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো মনের রাজত্ব? মনই হলো এর কর্তা। এই সব হচ্ছে মনেরই সৃষ্টি। এর পারে ওর যাবার জো নেই। ভগবানের নাম করতে করতে আর একটি সূক্ষ্ম মন জন্মায়। সেই মন এখন ক্ষুদ্র জীবাণুরূপে সকলেরই ভিতর রয়েছে, সাধনার দ্বারা সেই মন যখন বিকাশ লাভ করে তখন নানারকম সূক্ষ্ম অনুভূতি হয়। সেও ফাইনাল বা চরম কিছু নয়। এই সূক্ষ্ম মনও পরমাত্মার কাছ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে না, জগতের আর কিছু ভাল লাগে না। কেবল ভগবদ্ভাবে বুঁদ হয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়।

"তারপরে সমাধি। সে অবস্থা বর্ণনা করা যায় না, অস্তিনাস্তির পার। সেখানে সুখ নেই, দুঃখ নেই, আনন্দ নেই, নিরানন্দ নেই, আলো নেই, আঁধার নেই—কি যে আছে মুখে বলা যায় না।[১]

এক ভক্ত সেদিন প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, সাধনপথের শেষে তো আনন্দের স্রোত সদাই প্রবাহিত হচ্ছে তাই না?"

উত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলেন, "আনন্দের কথা কি বলছো? সেখানে আনন্দ-নিরানন্দ কিছুই নেই, সুখ-দুঃখ কিছুই নেই, ভাব-অভাব কিছুই নেই, আনন্দ তো সাধন অবস্থার কথা। তোমার নৌকাখানি যতক্ষণ লক্ষ্যস্থলে না পেঁছায় ততক্ষণ অনুকূল বাতাস দরকার। পেঁছে গেলে আর বাতাস-টাতাস দরকার নেই। আনন্দ ঐ অনুকূল বাতাসের মতো খুব সাহায্য করে। জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, সব লয় হয়ে যায়। শাস্ত্রে শুধু ঐ পর্যন্ত বলেছে। কিন্তু কি জান তারপর যা আছে তা আর বলতে পারে না। সাধন করলে সে সব নিজের অনুভব হয়। স্বয়ংবেদ্য হচ্ছে সেই ভূমা বস্তু। সেখানে কোন অভাব নেই কোনো ভয় নেই শুধু ভাবলেই মনটা উঁচু হয়ে যায়। কি মজার জিনিস। কেউ কেউ নিত্য আর লীলা—এই দুটোই দেখেন।"

"নিত্যে পেঁছে তারপরে তো লীলা'—এ প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলিলেন—"তার কিছু মানে নেই, দুই-ই বটে। রাসলীলা যখন হচ্ছিল, তখন এক সখী আর এক সখীকে বলেছিল, সখি, বেদান্ত-সিদ্ধান্তো নৃত্যতি। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত কি না সেই পরব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। এখানে নিত্য আর লীলা এক। আর একটা আছে নিত্য-লীলা দুয়েরই পার।"

সাধনজীবনে মন্ত্র ও গুরুকরণের আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ ছিল

---

১ ধর্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কথোপকথন .

অতিশয় স্পষ্ট—“মন্ত্র না নিলে একাগ্রতা আসে না। আজ হয়তো তোমার কালীরূপে ভাল লাগল, আবার কাল হরিরূপ ভাল লাগল, পরশু নিরাকারে মন হলো—ফলে কোনোটাতেই একাগ্রতা হবে না। মন স্থির না হলে ভগবান্ লাভ ত দূরের কথা, সাধারণ সাংসারিক কাজের মধ্যেও অনেক কিছু গোলমাল হবে। ভগবান্ লাভ করতে হলে গুরু একান্ত দরকার। গুরু তাঁর শিষ্যের ভাবানুযায়ী মন্ত্র ও ইষ্ট ঠিক ক'রে দেন। সেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে নিষ্ঠার সহিত সাধন-ভজন না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। ধর্মপথ অতি দুর্গম। সিদ্ধগুরুর আশ্রয় না হলে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, যতই চেষ্টা করুক না কেন, হোঁচট খেয়ে পড়তেই হবে। চুরি করতে পর্যন্ত একজন গুরুর দরকার হয়। আর এত বড় ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে গুরুর দরকার নেই?”

সাধনা, সিদ্ধি ও ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এক মুমুক্ষু ভক্তকে ব্রহ্মানন্দ সেদিন বলিতেছেন, “মনের আসক্তি ত্যাগই ত্যাগ। হাজার জিনিস আসুক না কেন, আসক্তি না থাকলে কিছুই নয়। আবার কিছুই নেই কিন্তু আসক্তি থাকলে সবই রইল। সাধনার দ্বারা মনটাকে নির্মল করতে হয়। তা না হলে ভগবানের আসন পড়ে না। চাই চেষ্টা চাই সংগ্রাম। সংগ্রাম করবার প্রবৃত্তি যার আসে নি সে তো মৃত। বুক পেতে এই সংগ্রাম বরণ ক'রে নিতে হবে তার পরের অবস্থা হচ্ছে শান্তি। সব চেয়ে সহজ সাধন—সর্বদা তাঁর স্মরণ-মনন। তাঁকে আপনার বলে জানতে হবে। বাইরে যেমন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ানো, পরানো, এবং তাদের সঙ্গে আলাপ ব্যবহারাদি করা, মনোরাজ্যেও যখন এইরূপ হবে, অর্থাৎ সেই রাজ্যেও যখন আলাপ ব্যবহারাদি হবে তখনই শান্তি।

তাঁর কার্য কি বুঝা যায়? অনন্ত অথচ শান্ত। মানুষেও তিনি আসেন। কাকভূষণ্ডী প্রথম প্রথম রামচন্দ্রকে মানুষ বলে ধারণা ক'রে ত্রিলোকের কোথাও স্থান পেলে না। পরে তাঁর কৃপায় তাঁকে ভগবান্ বলে বুঝলে ও স্তবস্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করলে। ভগবান্ কাকে কোন্ পথ দিয়ে নিয়ে যান তা বুদ্ধির অগম্য। তিনি কখনও সুগম পথ দিয়ে কখনও কাঁটার মধ্যে দিয়ে, কখনও দুর্গম পাহাড়-পর্বতের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।”

সে-বার এক জিজ্ঞাসু সাধকের প্রশ্নের উত্তরে ধ্যান এবং ধ্যানলব্ধ অনুভূতি সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলেন, “ধ্যানাদিতে কেবল যে মনের শান্তি হয় তা নয়। ওতে শরীরেরও উন্নতি হয়, ব্যারাম-স্যারাম কম হয়। শরীরের উন্নতির জন্যও ধ্যানাদি করা উচিত।

“প্রথম প্রথম ধ্যানও মনের সঙ্গে যুদ্ধ। দোলায়মান মনকে ক্রমাগত টেনে এনে ইষ্টপাদপদ্মে লাগাতে হয়। এতে কিছুক্ষণ পরে একটু মাথা গরম হয়। এজন্য প্রথম প্রথম বেশী ধ্যান-ধারণা ক'রে মস্তিষ্ককে খুব বেশী খাটাতে নেই, খুব আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়। কিছুদিন এরূপ অভ্যাসের ফলে যখন ঠিক ঠিক ধ্যান হবে তখন এক আসনে বসে দুই-চার ঘণ্টা ধ্যান-ধারণা করলেও কোনো কষ্ট হবে না বরং সুষুপ্তির পর শরীর ও মন যেরূপ সতেজ ও স্বচ্ছন্দ হয় সেরূপ বোধ হবে, আর ভিতরে খুব আনন্দ অনুভব হতে থাকবে।

"দেহটা যেন মন্দির, ঠাকুর তাতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। ধ্যান করতে করতে মন যখন স্থির হবে তখন যেখানে ইচ্ছা ইষ্টদর্শন হবে। পার্শ্বে, হৃদয়ে, পশ্চাতে বাহিরে সবখানেই ধ্যান করা যায়। ধ্যান করতে করতে প্রথমে জ্যোতি দর্শন হয়, কিন্তু ঐরূপ জ্যোতি দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বা একটু পরেই একটা নিবিড় আনন্দ আসে, তা ছেড়ে মন এগুতে চায় না। তারপর জ্যোতির্ঘন-দর্শন, তখন মন তাতে তন্ময় হয়ে যায়। কখনও কখনও বা দীর্ঘ প্রণব ধ্বনি শুনতে শুনতেও মন তন্ময় হয়। দর্শন, অনুভূতির রাজ্য এর কি ইতি আছে? যত এগোও অনন্ত! অনন্ত! অনেকে একটু জ্যোতিঃ-টোতি দেখে মনে ভাবে এই শেষ—তা নয়। সেখানে গিয়ে মনের বিকল্প শেষ হয়, কেউ কেউ বলেন ঐখানেই শেষ। আবার কেউ কেউ বলেন, ঐখান থেকেই আরম্ভ[1]।'

ভগবান্ লাভ না হইলে মানবজীবন সফল হয় না, বন্ধ্যা বলিয়া গণ্য হয়। এ সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "ভগবান্ লাভের জন্য তিনটি জিনিসের দরকার। প্রথম মনুষ্য জন্ম, দ্বিতীয় মুক্তির কামনা, তৃতীয় মহাপুরুষের আশ্রয়। ভগবানের কৃপায় মনুষ্য জন্ম পেয়েছ, সৎসঙ্গও লাভ করেছ, মুক্ত হবার বাসনাও জেগেছে, এখন জীবন-টাকে এমনভাবে গড়ে তোল যেন এই জন্মটা বৃথা না যায়। কি হবে ক্ষণস্থায়ী ভোগের পিছনে দৌড়ে? অনন্তের অধিকারী হও। আর একটা কথা মনে রেখো, মনুষ্যজন্ম আবার হয়তো হবে, মুক্তির বাসনা, পরজীবনে আবার হয়তো আসবে কিন্তু এবারের মতো সাধুসঙ্গ বার বার পাবে না। সব সময় মহাপুরুষের সঙ্গ ভাগ্যে জোটা বড় দুর্লভ। জন্ম-জন্মান্তরের অনেক সুকৃতি ও তপস্যার ফলে এই সুযোগ হয়। ভাগ্যবলে যখন ঠাকুরের গণ্ডির ভিতর এসে পড়েছ, দেখো যেন জীবনটা গোল-মালে কেটে না যায়।

"বিশ্বাস, বিশ্বাস, কেবল বিশ্বাস চাই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে পড়ে থাক। গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে পড়ে থাকলে সব হয়ে যাবে। গুরুবাক্যে যদি বিশ্বাস না থাকে শুধু মন্ত্রে-তন্ত্রে কিছু হবে না। বেড়ালের ছানার মতো পড়ে থাক। গুরু যখন যা দরকার করিয়ে নেবেন। নিজে তুমি কতটুকু বোঝ? তার উপর ভার দিয়ে পড়ে থাক। যাঁকে ভার দিয়েছ, তাঁর একটা দায়িত্ববোধ আছে। তিনি তোমার নিজের চাইতে তোমার বিষয় ঢের বেশী ভাবেন। ষোল আনা তাঁতে নির্ভর করো, তিনি সকল আপদ-বিপদ থেকে তোমায় রক্ষা করবেন। এ জগতে কারও সাধ্য নেই গুরু আশ্রিত শিষ্যের অনিষ্ট করে। গুরুর কৃপায় তার চতুর্দিকে লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। জীবনে অনেক ভুল হবার সম্ভাবনা, যতক্ষণ না ভগবান্ লাভ হয়। গুরুকে আশ্রয় ক'রে থাকলে, ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। আলোর উপর দিয়ে বাপ-বেটার যাবার ঠাকুরের সেই গল্পটি মনে আছে তো? বাপ ছেলের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে না। ছেলে বাপের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে। সদ্গুরুর আশ্রয় যারা পেয়েছে, তারা যদি তাঁকে আশ্রয় ক'রে পড়ে থাকে তবে তিনিই তাদের ভুলভ্রান্তি সব শুধরে নেবেন।'

"গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিতেন, ঠাকুর বলতেন—সদ্গুরু হলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে যায়।' গুরু কাঁচা

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ

হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। কাঁচা গুরুর হাতে পড়লে শিষ্যের অহংকার যায় না, সংস্কার বন্ধন ঘোচে না। যারা ঈশ্বরলাভ করে নি, তাঁর আদর্শ পায় নি, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয় নি, তাদের সাধ্য কি যে অপরের সংসার বন্ধন মোচন করে। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে হিতে বিপরীত হয়। নিজে মুক্ত হলেই তবে অপরকে মুক্ত করা যায়—সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায়।

"যদি কারো ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে, সাধনভজন করবার ইচ্ছে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন। গুরু লাভের জন্যে সাধকের চিন্তা করবার কোনো দরকার নেই। যাদের সদ্‌গুরু লাভ হয়েছে তাদের আর ভাবনা কি? রাস্তা তো তারা পেয়েছে। সে রাস্তা ধরে এখন তারা চলুক।"

সাধনা, সিদ্ধি ও ঈশ্বরীয় কর্ম, সব দিক দিয়া ব্রহ্মানন্দ ছিলেন একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ। একাধারে তিনি ছিলেন আপ্তকাম সাধক, দরদী আচার্য এবং মঠ ও মিশনের সংগ্রামকুশল অধিনায়ক। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত জীবনের এই বহুমুখী সাফল্যের কথাটি প্রত্যক্ষদর্শী, ভক্ত সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসুর লেখনীতে বড় সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।[১] তিনি লিখিয়াছেন, "মহারাজ অমিত ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার বহুমুখী শক্তি বর্ষার বারিধারার ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত শক্তি কিরূপে যে মৃন্ময় আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত, তাহার সন্ধান কেহ জানিতে না। বিদ্যুৎবাহী তার দেখিতে নির্জীব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায় কি অমোঘ শক্তি তাহাতে নিহিত। শুনিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর মৃন্ময় নয় চিন্ময়। কিন্তু এই চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না। কি অলৌকিক ভালবাসায় তিনি সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন। সাধু, ভক্ত বা ব্রহ্মচারী নির্মল চিত্ত লইয়া অথবা ব্যথিত, তাপিত, পতিত, কলঙ্কিত জীবনের বোঝা বহিয়া যে-কেহ এই পুরুষোত্তমের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছে, তিনিই অন্তরে অন্তরে এই সত্যটি অনুভব করিয়াছেন তিনি দেখিয়াছেন, যাহাকে সম্ভাষণ করিতে মন সঙ্কুচিত হয় সেই অনাদৃত জনকে মহারাজ কি আদরে আপ্যায়িত করিতেছেন। আত্মীয়স্বজন যাহার নাম শুনিতে কুণ্ঠাবোধ করে, কি স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে মহারাজ তাদের তত্ত্ব লইতেছেন। যে অভাগা সর্বজন পরিত্যক্ত, কি মমতায় মহারাজ তাঁহাকে বাঁধিয়াছেন। যার কোথাও স্থান নাই, মহারাজের দ্বার তার জন্য চির উন্মুক্ত।

"এই উদার বিশ্বপ্রেমের অমৃত-আস্বাদ পাইয়া কেহ ধারণা করিতে পারিত না যে, এই নিশ্চিন্ত শান্ত শিবময় পুরুষের কি মহান্ ত্যাগ, কঠোর বৈরাগ্য অপরিমেয় তিতিক্ষা, কি জ্ঞান ভক্তি, নিষ্কাম কর্মানুরক্ত সংসার-মোহ-হারিণী এক মহাশক্তির উদ্বোধনের জন্য নিরুদ্বেগ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া থাকিত। ভিক্ষু তাঁহার অপ্রত্যাশিত করুণায় কৃতার্থ হইয়া ফিরিত, জ্ঞানী জ্ঞানচর্চায় তাঁহার ইতি করিতে পারিত না, ভক্ত সে ভক্তিসিন্ধু সন্তরণ করিয়া পার পাইত না, কর্মী কর্মকৌশলে তাঁহার কাছে হার মানিত, সংশয়ী বিশ্বাসের বল পাইত; সংসারী সংসারধর্মের নিগূঢ় মর্ম বুঝিত;

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ: পরিচয়—দেবেন্দ্রনাথ বসু

রসিক তাঁহার রসস্ফূর্তিতে মহাহাস্যধারায় হাবুডুবু খাইত; সাধক তাঁহার কাছে সাধনার উচ্চতত্ত্ব লাভ করিয়া চরিতার্থ হইত, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া হতাশ চিত্ত উৎসাহে, ভগ্ন হৃদয় আশার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিত অথচ এই মহারাজ বালকের সঙ্গে যেন বালকটি হইয়াই খেলা করিতেন।

"মহারাজ যে মহারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন সেথায় দুঃখদৈন্য, শোকের প্রবেশ অধিকার ছিল না, বিপদ্দল সেখানে বল প্রকাশ করিতে পারিত না। সে রাজ্যের যাঁহারা প্রজা—মহারাজের অমায়িক ব্যবহারে তাঁহারা ভাবিতেন, আমি তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, অথচ আপন আপন অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করিয়া প্রশ্রয় লইতে কেহ কখন সাহসী হইতেন না। এ রাজ্যে প্রবেশ করিলে মনে হইত সংসারের বহু ঊর্ধ্বে কোন এক অত্যাশ্চর্য আনন্দময় লোকে আসিয়াছি—যেখানে দ্বেষ দেশছাড়া, দ্বন্দ্ব স্পন্দনহীন, তাঁর আনন্দ অবাধ।"

সে-বার কাশীধামে অবস্থান করার সময় স্বামী বিবেকানন্দ গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সারা শরীরে শোথ দেখা দেয়, ডাক্তারেরা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠেন।

বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের নিকট এই সংবাদ পেঁছে। তিনি স্থির করেন কলিকাতায় আনিয়া স্বামীজীর চিকিৎসা করানো হইবে। অবিলম্বে স্বামীজীকে বেলুড়মঠে নিয়ে আসা হয় এবং অভিজ্ঞ কবিরাজের তত্ত্বাবধানে তাঁহার চিকিৎসা চলিতে থাকে। এ সময়ে ব্রহ্মানন্দ গুরুভাই ও তরুণ ব্রহ্মচারীদের বলিতেন, "তোমরা সব ই প্রাণপণে স্বামীজীর সেবা-যত্ন করো, তাঁকে সুস্থ ক'রে তোল। স্বামীজী আমাদের সব চাইতে বড় অবলম্বন।"

স্বামীজীর সেবা-পরিচর্যায় ব্রহ্মানন্দ নিজেও একান্তভাবে তাঁহার প্রাণ-মন ঢালিয়া দেন। এসময়ে দিনরাত রোগীর শয্যার পাশে চিন্তাকুল হইয়া তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। ক্রমে স্বামীজী কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠেন, গুরুভাইরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন এবং ব্রহ্মানন্দের মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার আভা। এ সময়ে সকৌতুকে তাঁহাকে বলিতে শোনা যায়, 'স্বামীজীর এই পীড়ার সময় কি ব্যস্ততা আর উদ্বেগেই না দিন কেটেছে। মনে হচ্ছে ঠাকুরের পীড়ার সময়ও এত সেবা করতে পারি নি।

স্বামীজীর ভগ্নস্বাস্থ্য আর জোড়া লাগে নাই, কয়েকমাসের মধ্যেই আবার দেখা দেয় এক দারুণ সঙ্কট। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে তিনি মরধাম চিরতরে ত্যাগ করিয়া যান। ভক্ত ও গুরুভাইদের হৃদয়ে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার।

প্রিয়তম গুরুভাই, গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধানতম লীলাপার্ষদ বিবেকানন্দের শোকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ উন্মত্তের মতো হইয়া যান, স্বামীজীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তিনি ক্রন্দন করিতে থাকেন। শোকের বেগ কিছুটা প্রশমিত হইলে মহারাজকে সাশ্রুনয়নে বলিতে শোনা যায়,—"সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড়টা আজ অদৃশ্য হয়ে গেল।"

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারা এসময়ে দিকে দিকে বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করিয়া তরুণ ছাত্রসমাজের সেবাধর্মের একটা জোয়ার বহিয়া যায়। আর্তত্রাণ,

নিরক্ষরদের শিক্ষাদান, আর বন্যা-দুর্ভিক্ষের সংকটে দেশের তারুণ্য শক্তি রামকৃষ্ণ মিশনের নেতৃত্বে অগ্রসর হইয়া আসে। সারা ভারতের জনজীবনে ইহার প্রভাব অনুভূত হয়।

মঠ ও মিশনের বিস্তার সাধিত হইতেছে আর ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বশক্তিও হইতেছে দূরবিস্তারী। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণীবহরূপে, জীবন্ত ভাষ্যরূপে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

যুবক ভক্ত ও ব্রহ্মচারীদের কাছে ব্রহ্মানন্দের প্রথম ও শেষ কথা ছিল কর্ম ও উপাসনার যুগ্ম সাধনা। প্রায়ই বলিতেন, "রামকৃষ্ণ-ভক্তদের সেবাধর্ম মানুষের বা জীবের সেবা নয়, এটা হচ্ছে জীবন্ত ভগবানের পূজো—প্রেমে ও ভক্তিতে জীবরূপী নারায়ণের সেবা।"

ব্রহ্মানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ-রসের ঘনীভূত বিগ্রহ। মঠ মিশনের কাজে যখন যেখানে তিনি উপস্থিত হইতেন ভক্ত ও সেবকদের অন্তরে, নবাগত জিজ্ঞাসু তরুণদের অন্তরে জাগিয়া উঠিত আনন্দের স্রোতধারা। মহারাজের প্রেম বিহ্বলতার স্মৃতি চিরতরে তাহাদের মনে অঙ্কিত হইয়া যাইত। ঐশ্বরীয় ভাবে তাহারা উদ্দীপিত হইয়া উঠিত।

মহারাজের প্রাণঢালা ভালবাসাই ছিল তরুণ কর্মীদের এবং সমগ্র রামকৃষ্ণমণ্ডলীর ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই সেবা ও উপাসনার এক বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিতে তিনি সক্ষম হন। "সকল প্রকার কাজকাম ও জাগতিক ব্যাপারের ঊর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় উচ্চ ভাবভূমিতে নিয়ত অবস্থান করিয়াও রামকৃষ্ণ সংঘকে তিনি দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এইরূপ পরমহংসের ন্যায় বিরাজ করিয়াই তিনি সংঘের বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন। মঠ ও মিশনের যাবতীয় সদনুষ্ঠান এবং জনহিতকর কার্যের প্রেরণার মূলে থাকিয়াও তিনি অনাসক্ত, একক, নির্দ্বন্দ্ব এবং সমাহিত। বালকবৎ কোমল, সরল ও আনন্দময় হইয়াও তিনি ছিলেন প্রশান্ত অচঞ্চল এবং গম্ভীর। এই অপূর্ব দিব্যভাবেই আধ্যাত্মিক তরঙ্গের প্রবাহে তিনি নীরবে সংঘের সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন[১]।"

বঙ্গভঙ্গের পর সারা দেশে একটা বিরাট রাজনৈতিক আলোড়ন দেখা দেয়। রাজনৈতিক মুক্তি-সাধন এবং ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির উজ্জীবন সাধনের জন্য শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগিয়া উঠে। এই সময়ে বিশেষ করিয়া বিবেকানন্দের ভাবধারা দেশের সর্বত্র বিপুল উন্দীপনার সৃষ্টি করে। দলে দলে যুবক কর্মী ও মুমুক্ষুরা রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনে ভিড় করিতে থাকে। রামকৃষ্ণের ধারক ও বাহক ব্রহ্মানন্দের বাণী ও দিব্য সান্নিধ্য এই সময়ে অনেকের জীবনকে রূপান্তরিত করে।

কিছুসংখ্যক প্রাক্তন বিপ্লবী ও রাজরোষে পতিত রাজনৈতিক কর্মী এই সময়ে সাধনপ্রয়াসী হন এবং ব্রহ্মানন্দের শরণ নেন। বিদেশী শাসকদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া মহারাজ মঠে তাঁহাদের আশ্রয় দেন, পরমার্থ লাভের সুযোগ পাইয়া তাঁহারা ধন্য হয়।

নবাগত সাধনার্থী ও কর্মীদের মহারাজ বলিতেন, 'ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য স্থির

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ: উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত

রাখলে মনের একটা শান্তি জন্মে। বারো আনা মন ভগবানের দিকে রেখে, চার আনায় জগতের কাজ ভেসে যায়।"

ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সাধনার সংকল্প স্থির থাকিলে এবং ঈশ্বরের আশ্রয় নিলে সাধনার সমস্ত কিছু সুযোগ, ঈশ্বর নিজেই পুরাইয়া দেন। ঈশ্বরের ধারক বাহক জীবন্ত মহাপুরুষেরাই শুধু নয়, সূক্ষ্মদেহী বিদেহী মহাপুরুষেরাও সাধনপথে সাধকদের নানাভাবে সাহায্য করেন। এই সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ তাঁহার নিজ জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা মাঝে মাঝে বলিতেন।

একবার তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। সে সময়ে রাত বারোটায় ঘুম হইতে উঠিয়া জপ-ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার অভ্যাস তাঁহার ছিল। জপ করার সময় প্রায়ই চোখে পড়িত এক অলৌকিক দৃশ্য। কক্ষের দ্বার বন্ধ। কিন্তু, দেখা যাইত, এক সৌম্যমূর্তি বৈষ্ণব বাবাজী জপের মালা হাতে নিয়া শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রহ্মানন্দ বুঝিতেন, কোনো সূক্ষ্মদেহী মহাত্মা তাঁহাকে আশ্বাস ও প্রেরণা দিবার জন্যই রোজ প্রভাতে আবির্ভূত হইতেছেন।

একদিন শরীর বড় ক্লান্ত ছিল, অভ্যাসমতো বারোটার প্রাক্কালে ব্রহ্মানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। এমন সময়ে কে যেন তাঁহাকে ধাক্কা মারিয়া জাগাইয়া দিল। চোখ মেলিতেই দেখিলেন, সে বিদেহী বাবাজী স্মিতহাস্যে শয্যার পাশে দণ্ডায়মান, জপমালাটি প্রসারিত করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ইঙ্গিত করিতেছেন জপে বসিবার জন্য।

ভগবান্ লাভে বদ্ধপরিকর সাধুদের জন্য সাহায্য এমনিভাবে ভগবৎ কৃপায় জাগতিক ও সূক্ষ্ম স্তর হইতে নামিয়া আসে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের চেষ্টায় ও যত্নে মাদ্রাজের মঠ তখন দৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, মঠনায়ক ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একবার সেখানে পদার্পণ করেন। মহারাজের আগমনের প্রাক্কালে রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ মঠের সাধু ও কর্মীদের ডাকিয়া কহিলেন, "একথাটি তোমরা সবাই স্মরণ রেখো স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের নিজের সন্তান। তোমরা তাঁকে যখন দর্শন করবে তখন ঠাকুর কেমন ছিলেন তার কতকটা আভাস পাবে। ব্রহ্মানন্দের অহংটি সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে। তিনি বলেন, যা তিনি করেন তা ঠাকুরের প্রেরণায়। ঠাকুর তাঁকে ঠিক নিজের ছেলের মতোই দেখতেন। তিনি ঠাকুরের ঘরেই শুতেন, কখনো কখনো এক মশারির ভেতরেই থাকতেন। রাখালের পরিধানে কোনো ছিন্ন বস্ত্র দেখলে তিনি কেঁদে ফেলতেন আর চেঁচিয়ে বলতেন, 'রাখালকে নূতন কাপড় দেবার কি কেউ নেই ?' ঠাকুরের জন্য কেউ কোন ফল মিষ্টি বা খাবার জিনিস আনলে অনেক সময় তিনি তাদের বলতেন, 'ও সব রাখালকে দাও—আমি তার মুখে খাই।' একদিন রাত্রে ঠাকুরের পিপাসা পায়। তিনি রাখালকে খাবার জল দিতে বললেন। রাখাল বিছানায় শুয়ে তন্দ্রার ঘোরে বিড়বিড় ক'রে 'পারবো না' বলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন। গুরু মহারাজের এতে আনন্দ যেন উথলে উঠল। পরের দিন তিনি আনন্দ ক'রে সবাইকে এই ঘটনাটি আনন্দপূর্বক উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন, 'এখন বুঝেছি, রাখাল আমাকে ঠিক বাপ বলেই জানে।"

গুরুভাই ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে বামকৃষ্ণ-শিষ্যদেব ধাবণা ও মূল্যায়ন কি ছিল, এই ভাষণ হইতে তাহা উপলব্ধি কবা যায।

ঠাকুব বামকৃষ্ণেব ভাষায বাখাল মহাবাজ ছিলেন একটি বর্ণচোবা আম। সহজ সুন্দব অমাযিক আনন্দময এই সাধকেব ভিতবে যে গম্ভীব তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষটি বাস কবিতেন তাহাব সন্ধান অনেকেব পক্ষেই পাওযা কঠিন ছিল। বামকৃষ্ণানন্দকে সে সময়ে ভক্ত-প্রবব গিবিশ ঘোষ এক পত্রে লিখিযাছিলেন, "তুমি আমায লিখিযাছিলে, বাখালকে কেহ চিনতে পাবে না। আমাব ধাবণা, যে ভাগ্যবান্ বাখালকে চিনিবে, সে সেইদিনই মহাবাজেব (ঠাকুব বামকৃষ্ণেব) কৃপা প্রাপ্ত হইবে তাহাব মনুষ্য জন্ম সফল।'

মাদ্রাজে মীনাক্ষী মন্দিব দর্শন কালে ব্রহ্মানন্দেব যে দিব্য ভাবাবেশ হয তাহাব স্মৃতি স্থানীয ভক্তদেব হৃদযে দীর্ঘদিন জাগ্রত ছিল। দর্শনেব দিন ভোববেলা হইতে মহাবাজ গুরুভাই বামকৃষ্ণানন্দকে বলিতে থাকেন, "মনে কেমন একটা অপূর্ব ভাবেব জোযাব আসছে, যেন একটা কিছু আজ ঘটবে।"

মন্দিবেব ভিতবে গিযা দেবমূর্তিব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবাব সঙ্গে সঙ্গেই মহাবাজ নীবব নিস্পন্দ হইযা দাঁড়াইযা পড়েন, অতীন্দ্রিয দর্শনেব ফলে হাবান তাঁহার বাহ্যজ্ঞান। গুরুভাই বামকৃষ্ণানন্দ তাড়াতাড়ি ছুটিযা আসিযা তাঁহাব দেহটি বেষ্টন কবিয়া থাকেন।

একঘণ্টা কাল ব্রহ্মানন্দেব এই ধ্যানাবেশ চলিতে দেখা যায, মন্দিবে তীর্থযাত্রী ও সাধু-সন্ন্যাসীবা দিব্যভাবে বিভাবিত এই মহাপুরুষেব দিকে সবিস্মযে নির্নিমেষে চাহিযা থাকেন। বাহ্যজ্ঞান ফিবিযা আসিলে শত শত লোক তাঁহাকে প্রণাম কবিযা ধন্য হয।

সেদিনকাব ভাবাবেশ সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ ভক্তদেব বলিযাছিলেন, "যখন মন্দিবে বিগ্রহেব সামনে দাঁড়ালাম তখন দেখলাম, জগন্মাতাব বিগ্রহ যেন জীবন্ত হযে আমাব দিকে এগিযে আসছেন—তাই তো অমন সংজ্ঞাহারা হযে গিয়েছিলাম।"

বাঙ্গালোবে মঠ স্থাপিত হওযাব পব সে-বাব স্বামী নির্মলানন্দেব আগ্রহাতিশয্যে ব্রহ্মানন্দ সেখানে গিযা কিছুদিন অতিবাহিত কবেন। তাঁহাব উপস্থিতিতে আশ্রমে ও তাহাব আশেপাশে আনন্দেব হিল্লোল বহিযা যায, একটা অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক পবিবেশ বচিত হয।

এখানকাব মুচি সম্প্রদাযেব কিছু সংখ্যক ভক্ত ববিবাবে মঠে আসিযা কীর্তন ও ভজনে অংশ গ্রহণ কবিত। মহাবাজ পবমানন্দে তাঁহাদেব সহিত যোগ দিতেন, তাঁহাবাও এই পুণ্যচবিত মহাত্মাব পদবন্দনা কবিযা ধন্য হইত। এই অস্পৃশ্য ভক্তদেব আকর্ষণে মহাবাজ একদিন তাহাদেব পল্লীস্থিত ঠাকুবঘবে গিযা উপস্থিত হন, সাধন-ভজনে উৎসাহ দান কবিযা এই মুচিদেব আশীর্বাদ কবিযা আসেন। তাঁহাব এই প্রেম-পূর্ণ মনোভাব ও সমদর্শিতা দেখিযা স্থানীয ব্রাহ্মণ ও ভক্ত-সাধকেবা প্রেবণা লাভ কবেন, অন্ত্যজদেব প্রতি সংস্কাবজাত যে বৈষম্যবোধ ও বিদ্বেষ ছিল তাহা অনেকটা দূবীভূত হয।

এই মঠেব কর্মী ও সাধুদেব আধ্যাত্মিক ভিত্তি যাহাতে দৃঢ় হয় এজন্য ব্রহ্মানন্দ

সদাই তাহাদের উৎসাহিত করিতেন। কখনো কখনো মধ্য রাত্রে বা শেষ রাত্রে একজন লণ্ঠনধারী সেবককে সঙ্গে নিয়া নবীন সাধুদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেন, লক্ষ্য করিতেন জপতপে কাহারা রত, আর কাহারাই বা রহিয়াছে তামস ঘুমে অচেতন। পরের দিন ভোরবেলাও ছেলেরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিত, রুদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে মহারাজ আলস্যপরায়ণ সাধুদের তীব্র তিরস্কার করিতেন, "এ কি করছিস্ তোরা? রাত্রিকাল সাধনের প্রশস্ত সময়। আর তোরা ঘুমিয়ে তা কাটিয়ে দিচ্ছিস। এই জোয়ান বয়সে তোদের এত ঘুম? এখন যদি ভগবান্ লাভ করবার জন্য না খাটবি, তবে কবে আর তোদের সময় হবে? দিনের বেলা তো কাজকর্মে গল্পে-সল্পে সময় কেটে যায় তাঁকে ডাকবি কখন?'

স্বভাব গম্ভীর, শান্ত সমাহিত পুরুষ, ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভিতরে বাস করিত একটি আনন্দময় বালক। এই বালকটি হঠাৎ এক একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিত, তখন আনন্দরঙ্গ ও হাস্য পরিহাসে মহারাজ চারিদিক মাতাইয়া তুলিতেন। তখন তাঁহার রকমসকম দেখিয়া কে ভাবিতে পারিত যে ইনিই রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বহু ভক্ত-সেবিত অধিনায়ক ব্রহ্মানন্দ মহারাজ।

মহারাজের রহস্যপ্রিয়তার একটি কাহিনী এখানে বর্ণিত হইতেছে। সেবার দূর-দেশ হইতে এক গুরুভাই বেলুড়ে ব্রহ্মানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কয়েকদিন পরমানন্দে মঠে অতিবাহিত করার পর তিনি জানান, এবার তাঁহাকে নিজের কর্মকেন্দ্রে ফিরিতে হইবে, রাত্রির ট্রেনেই তিনি রওনা দিবেন।

অনেক দিন পরে গুরুভাইকে কাছে পাইয়াছেন, মহারাজের মন চাহিতেছে না যে তিনি চলিয়া যান। কহিলেন, "আরো দু'চার দিন থেকেই যাও না। কতকাল পরে দেখা।'

"তা কি ক'রে হয়। সেখানে যে নানা জরুরী কাজ রয়েছে। আজই আমার যাওয়া অত্যন্ত দরকার।" গুরুভাইটি উত্তরে বলেন।

ব্রহ্মানন্দ চুপ করিয়া গেলেন। গুরুভাইকে ধরিয়া রাখার জন্য গোপনে আঁটিলেন এক ফন্দী। তখনকার দিনে বেলুড়মঠ হইতে স্টেশনে যাইতে হইলে পাল্কী নিতে হইত। রাতের বেলায় পাল্কী নিয়া বেহারারা হাজির, যাত্রার প্রাক্কালে মহারাজ তাহাদের নিভৃতে ডাকিয়া ফিসফিস করিয়া কি যেন বলিয়া দিলেন। পাল্কী চলিতে শুরু করিল, গুরুভাইটি ভিতরে পা ছড়াইয়া তন্দ্রায় ঢুলিতেছেন আর মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে বাহকদের হুম্‌হুম্ আওয়াজ। ক্রমে তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অতি প্রত্যূষে দেখা গেল, বাহকেরা পাল্কীটি নিয়া মঠের মাঠেই বিচরণ করিতেছে, আর অবিরাম হুম্‌হুম্ শব্দ করিয়া চলিয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া স্মিতহাস্যে গুরুভাইটিকে অভ্যর্থনা জানাইলেন।

বুঝা গেল, বাহকেরা পাল্কীটি নিয়া মোটেই স্টেশনের দিকে যায় নাই। আরোহীটি ভিতর হইতে বাহকদের মুখের আওয়াজ শুনিয়া নিশ্চিন্তে শুইয়া ভাবিতেছিলেন, পাল্কী যথারীতি তাহাদের গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর কখন হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়েন। আসলে সারারাত তিনি মঠের ময়দানেই চক্কর খাইয়াছেন।

মহারাজের এই রসিকতায় তিনি একেবারে বোকা বনিয়া গেলেন, চারিদিক হইতে হাসির রোল উঠিল।

গুরুভাইটি উপলব্ধি করিলেন, ব্রহ্মানন্দের এই রসিকতার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে পুরাতন ও অন্তরঙ্গ সখাকে আরো দুই চারিদিন কাছে ধরিয়া রাখার ব্যাকুলতা। তাই দুই চোখ তাঁহার আনন্দের অশ্রুতে ছলছল হইয়া উঠে।

সে-বার ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও প্রবীণ ভক্তেরা কিছুদিনের জন্য কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে আসিয়াছেন। বিশেষ করিয়া মহারাজের আগমনে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, নানা স্থান হইতে কর্মী ও সাধুরা জমায়েত হইতেছেন। আশ্রম ও সেবায়তন দিন রাত আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ। মহারাজ তরুণ সাধুদের রোজ উৎসাহ দিতেছেন, "ক্ষেত্রের মধ্যে কাশীধাম শ্রেষ্ঠ। কাশীর মতো জায়গা নেই। কত সাধু ঋষি তপস্বী রাজর্ষির সাধনার ক্ষেত্র, সিদ্ধির স্থান। এখানে একটু জপ-ধ্যান করলেই জমে যায়।"

কখনো বা কাউকে বলিতেছেন, "খুব উঠে পড়ে লাগ্। এ এমন স্থান যে ধ্যান আপনা হতেই হয়। রাতদিন হর-হর বোম্-বোম্ শব্দ হচ্ছে। এখানকার হাওয়াই অন্যরকম। একটু করলেই হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়।"

মা-সারদামণিও তখন কাশীতে রহিয়াছেন। একদিন ভক্তেরা পরম সমাদরে তাঁহাকে আশ্রম ও সেবায়তনে নিয়া আসিলেন।[১] পাল্কীতে করিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া তাঁহাকে সব দেখানো হইল। দেখিয়া শুনিয়া শ্রীমার আনন্দ আর ধরে না। তাঁহার নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তনের পর এক ভক্ত মায়ের পদবন্দনা করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "মা, কেমন দেখলেন আপনার ছেলেদের সেবাশ্রম?"

প্রশান্ত কণ্ঠে সারদামণি উত্তর দিলেন, "দেখলুম, ঠাকুর এখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন। তাই সব কাজ হচ্ছে। এই সব যত কিছু তাঁরই কাজ।"

ভক্তটি তখনি আশ্রমে গিয়া সোৎসাহে মহারাজকে মায়ের এই মন্তব্য জানাইয়া দিলেন। শিষ্য ও ভক্তেরা সবাই এ সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল। ঠাকুরের প্রবীণ ভক্ত, কথামৃতকার মহেন্দ্র গুপ্ত এসময়ে আশ্রমে আসিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে এক-দল কহিতেন, 'ঠাকুরের উপদেশের সারমর্ম—প্রাণপণ প্রয়াসে ঈশ্বর লাভ করো। ত্রাণ-কার্য ও সেবাধর্মের কথা কখনো তিনি বলেন নাই। এসব পরিকল্পনা এসেছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে।' মহেন্দ্র গুপ্ত এই মতবাদীদের অন্যতম। ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য শিষ্য-ভক্তেরা তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন; কহিলেন, "মাস্টারমশাই, মার কথা শুনেছেন তো? এখন আর না মানলে চলবে না যে ঠাকুরের সম্মতি আছে সেবা-কর্মে। মা এই সেবাশ্রমে ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করলেন। মা বলছেন—এ তাঁরই শ্রীমুখের কথা।"

মহেন্দ্র গুপ্তমহাশয় সহাস্যে কহিলেন, "তা বটেই তো। আর এসব অস্বীকার করবার জো নেই।"

---

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা

ব্রহ্মানন্দ-স্বামী বালকের মতো আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। স্বামীজীর আহ্বানে কর্ম ও উপাসনার যে তত্ত্ব তাঁহারা প্রচার করিয়া চলিয়াছেন সে তত্ত্বের বিপুল সমর্থন যেন তিনি আদায় করিয়া ছাড়িলেন।

কাশীতে মা-সারদামণি অদ্বৈত আশ্রমের নিকট এক ভক্তের বাড়িতে অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মানন্দ প্রতিদিনই সেখানে মাকে দর্শন করিতে যাইতেন। নীচতলায় দাঁড়াইয়া এই দর্শনকার্য চলিত। এক-একদিন বালকের মতো হাসি গানে তিনি মাতিয়া উঠিতেন, আর উপর হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মা আনন্দ উপভোগ করিতেন।

মায়ের কাছে দর্শনার্থীদের নানা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উত্থাপিত হইত। কোনো কোনোটির সমাধান তিনি নিজেই করিতেন, কখনো বা বলিতেন, "রাখালের কাছ থেকে এর উত্তর জেনে নিও।" কোনো কোনো মুমুক্ষু ভক্তকে গৈরিক দিয়া মা নির্দেশ দিতেন, "এবার রাখালের কাছ থেকে সন্ন্যাস নিও।'

একদিন মাতৃ দর্শনের জন্য ব্রহ্মানন্দ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। আশেপাশে আরো কয়েকজন উপস্থিত। মায়ের সেবিকা গোলাপ-মা দোতলা হইতে ডাকিয়া বলেন, "রাখাল, মা জিজ্ঞেস করছেন, আগে শক্তিপুজো করতে হয় কেন?'

ব্রহ্মানন্দ যুক্তকরে উত্তর দেন, "মার কাছেই যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা ক'রে চাবি দিয়ে দোর না খুললে আর উপায় নেই।"

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহে মনে এক দিব্যভাবের তরঙ্গ খেলিয়া যায়। পরমানন্দে উদাত্ত স্বরে তিনি গান ধরেন

শঙ্করী চরণে মন মগ্ন হয়ে রওরে।
মগ্ন হয়ে রওরে সব যন্ত্রণা এড়াওরে।
এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়ে বেড়াওরে।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধেয়াও রে।
কমলাকান্তের বাণী শ্যামা মায়ের গুণ গাওরে।
এতো সুখের নদী নিরবধি ধীরে ধীরে বাওরে।

ভাবাবেশে মত্ত মহারাজ বালকের মতো নাচিয়া নাচিয়া করতালি দিয়া গানটি শেষ করেন। তারপর হো-হো হো শব্দে অট্টহাস্য করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করেন।

মা-সারদামণি এতক্ষণ অলিন্দ হইতে এই স্বর্গীয় দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন। বালক ভাবে বিভাবিত তনয়ের এই আনন্দরঙ্গ দেখিয়া অন্তর তাঁহার অপার প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল।

বেলুড়মঠে আর একদিন মা-সারদামণির সম্মুখে ব্রহ্মানন্দ যেরূপে দিব্যভাবে আবিষ্ট হন, তাঁহার স্মৃতিও সেবকদের মনে দীর্ঘকাল জাগরূক ছিল।

মঠপ্রাঙ্গণে কালীকীর্তন হইতেছে, লোকে লোকারণ্য। শ্রীমা উপরের ঘরে বসিয়া কীর্তন শুনিতেছেন। প্রেমানন্দ স্বামী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মহারাজকে কীর্তনের আসরে ধরিয়া নিয়া বসাইলেন। ক্ষণপরেই দেখা গেল, ভাবরঙ্গে উদ্দাম হইয়া মহারাজ নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছেন। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইল তিরোহিত।

ভক্তেরা প্রমাদ গণিলেন। অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে কীর্তন আসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া বসানো হইল মঠবাড়ির নিম্নতলের এক কক্ষে।

মহারাজ স্থাণুবৎ নিশ্চল নির্বাক হইয়া বসিয়া আছেন। বাহ্য চেতনার কোনো চিহ্ন নাই। সেবকদের বহু ডাকাডাকিতেও তাঁহার হুঁশ আসিতেছে না।

মা-সারদামণি মঠে আসিবেন, তাই মহারাজ ভোর হইতে রহিয়াছেন উপবাসী। দীর্ঘসময় ভাবাবিষ্ট থাকার পরও তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেছে না দেখিয়া প্রবীণ গুরুভাইরা শঙ্কিত হইলেন।

এ সংবাদ মাকে জানানো হইল। তাঁহার চোখে মুখে প্রসন্নতার আভা, কহিলেন, "সেজন্য ভেবো না। নাও—এই প্রসাদ রাখালকে গিয়ে দাও।"

মায়ের প্রসাদ সামনে রাখিয়া অনেকবার উচ্চ স্বরে ডাকাডাকি করা হইল, কিন্তু ধ্যানস্থ ব্রহ্মানন্দের কানে কোনো কথাই পেঁাছিল না। নিমীলিত নয়নে ঋজু হইয়া তিনি বসিয়া আছেন, মুখমণ্ডল দিব্য আনন্দের ছটায় উজ্জ্বল। এই বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার যে আর কোনো যোগাযোগ নাই।

মা-সারদামণি এবার ধীরপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। ব্রহ্মানন্দের বাহু স্পর্শ করিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে কহেন, "ও রাখাল, এই যে আমি প্রসাদ দিয়েছি, তুমি খাও।"

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। রোমাঞ্চিত কলেবরে মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন, তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের বালকবৎ ভাব ও প্রেমঘন অন্তর্লীন অবস্থার উল্লেখ করিয়া স্বামী সারদানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে একমাত্র মহারাজের ভেতরেই ঠাকুরের পরমহংস অবস্থার হাবভাব, চালচলন দেখতে পাওয়া যায়। মহারাজকে পেছন থেকে দেখলে তো ঠাকুর বলেই মনে হত।"

ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন বহুভাবের প্রমূর্ত রূপ। কর্ম, জ্ঞান ও প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যাইত তাঁহার মহাজীবনে। "কোন্ সময়ে কোন্ ভাবের স্ফুরণ হইবে তাহা বাহির হইতে দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। অনুভূতির বিশাল রাজ্য যেন তাঁহার করতলগত, অথচ তাহা যেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—'মন এখন লীলা হইতে নিত্য এবং নিত্য হইতে লীলায় আসে।' তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তাঁহার দেহ-মন যেন কোনো অপার্থিব বস্তুতে গঠিত। প্রেম, পবিত্রতা, সরলতা ও সাধু প্রবৃত্তির তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিগ্রহ। মহারাজের মুখমণ্ডল প্রায়ই ভাব-জ্যোতিতে পরিপূর্ণ থাকিত, সর্বদাই আনন্দময়—কখনও বালকের মতো হাস্যকৌতুক ও ক্রীড়ারঙ্গে মত্ত আবার কখনও নৃত্যবাদ্যে উৎফুল্ল। তাঁহার একদিকে সহজ বাল-স্বভাব, অপরদিকে অপূর্ব গম্ভীরভাব। তিনি যখন নিজের ভাবে মত্ত থাকিয়া ভাব-গম্ভীর অবস্থায় বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার নিকট কেহ অগ্রসর হইতে সাহস পাইত না, এবং কেহ কোনো প্রশ্ন করিতে আসিলেও নীরব হইয়া থাকিত, আবার কেহ কিছু বলিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইত। যখন তিনি একাকী মঠের প্রাঙ্গণে বা কোনো উন্মুক্ত দিগন্ত

বিস্তৃত প্রান্তরে গম্ভীরভাবে পাদচারণা করিতেন তখন তাঁহাকে দেখিলে তেজোদৃপ্ত নরসিংহের ন্যায় বোধ হইত[১]।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে গুরুভাই, প্রতিভাধর নাট্যকার ও নট, গিরিশ ঘোষের অতি উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁহার এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন "রাখাল-টাখাল আমার কাছে ছেলেমানুষ, কালকের ছোকরা। ঠাকুরের কাছে আমি যখন যেতাম, তখন আর ওদের বয়স কত? এই রাখালকে আমি ঠাকুরের মানস-পুত্র বলে মানি। তা কি শুধু শুধুই মানি? যখন আমার প্রথম হাঁপানি হল, তখন খুব জ্বর, খুব দুর্বলও হয়ে পড়লুম। এখানে তো শান্তি স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ হচ্ছে। এদিকে আমার মনে এক সর্বনেশে ভাবের উদয় হল—ঠাকুর একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। তখনি মনে হল—গুরুতে মানুষজ্ঞান, মানুষ-বুদ্ধি, আমি বেটা গেছি। মনে এল দারুণ অশান্তি, কিছুতেই ঠাকুরের উপর ভগবদ্‌বুদ্ধি এল না। অনেককে বললাম, যে সব ত্যাগী গুরুভাইরা আমায় দেখতে আসতো, সবাইকে বলতাম। কিন্তু সবাই শুনে চুপ ক'রে থাক্‌তো। আমার মনে দিন দিন দারুণ অশান্তি বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মনের সঙ্গে সর্বদা লড়াই করছি—তবু ঠাকুরের উপর মানুষবুদ্ধি যায় না। এই সময় একদিন রাখাল দেখতে এল। তাঁকে সব খুলে বলে, কাতরভাবে প্রশ্ন করলাম, 'এখন উপায় কি?'

"রাখাল সব কথা শুনে হোহো ক'রে হেসে উঠলো। বললে—'ও কিছু নয়, ঢেউ যেমন হুস ক'রে উঁচু হয় আবার তখনি নীচু হয়ে নেমে যায়, মনটাও তেমনি। ওর জন্য কিছু ভাববেন না। শরীরেই আধ্যাত্মিক উন্নতির একটা উঁচু স্তরে আপনাকে নিয়ে যাবে, তাই মন এমনি হচ্ছে। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না'। নদিদি খাবার এনে দিলে। রাখাল খেয়ে উঠে গেল, যাবার সময়ে হেসে বললে, 'ব্যস্ত হবেন না। কোনো ভয় নেই, মন আবার তড়াক্‌ ক'রে লাফ দিয়ে কোথায় চলে যাবে।' এই বলে যেই রাখাল বাড়ির সামনের গলি পার হয়ে অন্য গলিতে মোড় ফিরলে, অমনি আমার কাঁধের ভূতটা যেন চলে গেল—ঠাকুরের উপর আগেকার মতো ভগবদ্‌বুদ্ধি এল। সাধ ক'রে কি ওকে মানি? রাখাল পিছন ফিরলে অনেক সময় ঠাকুর বলে আমারই ভুল হয়। ঠিক সেই রকম হাব-ভাব কথাবার্তা কতক কতক পেয়েছে।'

ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তির বিচ্ছুরণ আরো অনেক ভক্তের উপর পড়িয়াছে, তাহাদের জীবনে আনয়ন করিয়াছে শান্তি, স্থৈর্য ও আত্মিক সাধনার সাফল্য।

ত্যাগ বৈরাগ্যের সহিত সংগঠন পরিচালকের দক্ষতা ও দূরদৃষ্টি ব্রহ্মানন্দের জীবনে সমন্বিত হইয়াছিল। তাই মঠ মিশন ও ভক্ত শিষ্যেরা তাঁহার প্রজ্ঞা এবং সূক্ষ্ম স্বচ্ছ দৃষ্টির সাহায্য লাভ করিয়া সতত উপকৃত হইতেন।

সে-বার এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁহার একমাত্র পুত্রের দেহান্তের পর শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সাধুসঙ্গমের ফলে প্রাণে শান্তি আসিবে এই আশায় কিছুদিন তিনি বেলুড়মঠের কাছাকাছি একটি বাড়িতে বাস করিতে থাকেন। দুবেলা মঠে যাতায়াত

---

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন

এবং ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করার ফলে হৃদয়ের জ্বালা কিছুটা দূর হইল। মঠের প্রতি ক্রমে তিনি খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

রামকৃষ্ণের উদার মত, বিবেকানন্দের সেবাধর্ম এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের পূত চরিত্র তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এদিকে নিজের হৃদয়ে জাগিয়াছে নির্বেদ। সংসারে কে কাহার এবং বিত্ত ও পুত্র কলত্রের স্থায়িত্বই বা কতটুকু? স্থির করিলেন, নিজের সব কিছু বিষয়-আশয় ত্যাগ করিবেন, লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসাটিও অর্পণ করিবেন মিশনের জনহিতকর কাজে।

স্বামী প্রেমানন্দের কাছে এই প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেন এবং সকাতর অনুনয় জানান এসব গ্রহণের জন্য। প্রেমানন্দ কোমল-হৃদয় সন্ন্যাসী, ধনী ব্যবসায়ীর কথায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়, তখনি ব্রহ্মানন্দকে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলেন।

ব্রহ্মানন্দ কিন্তু বুঝিয়া নিলেন শোকের আঘাতে ধনী ব্যক্তিটির সাময়িক বৈরাগ্য আসিয়াছে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাহাকে বলিতেন, মর্কট বৈরাগ্য। শোক দূরীভূত হইলেই পূর্ব-সংস্কার তাঁহার জাগিয়া উঠিবে, তারপর মনে আসিবে তীব্র অনুশোচনা ও প্রতিক্রিয়া।

মহারাজ দুই হাত জোড় করিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু কহিলেন, "বাবুরামদা একি তুমি বলছো? ক'দিনের সাধুসঙ্গ ক'রে লোকটির মনে ত্যাগ বৈরাগ্যের উদয় হল, আর তার সঙ্গ করার ফলে আমাদের বিষয়বুদ্ধি জেগে উঠবে?"

প্রেমানন্দ মুহূর্তে ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারধারা বুঝিয়া নিলেন। ধনী ব্যক্তিটির প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ করিলেন প্রত্যাখ্যান।

আর একবার একজন বিত্তবান ভক্ত মঠকে বেশ কিছু জমি দান করিতে ব্যগ্র হয়। মঠের সাধু সন্ন্যাসীরা সর্বদাই অর্থাভাবে থাকে, তদুপরি সদাই এখানে রহিয়াছে ভক্ত দর্শনার্থীদের প্রসাদ নেওয়া। আবাদী জমিতে উৎপন্ন চাউল মজুদ করা থাকিলে সাধুদের অনেক ঝামেলা কমিয়া যায়।

ভক্তটির আগ্রহাতিশয্যে প্রেমানন্দ সসঙ্কোচে একদিন ব্রহ্মানন্দকে এই প্রস্তাবের কথা নিবেদন করেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেদিনও উত্তর দিলেন, "বাবুরামদা, তোমরা সিদ্ধসংকল্প সাধুপুরুষ, তোমরা যা মনে করবে তা ফলবে। ঐরূপ সংকল্প ছেড়ে দাও।"

মঠ ও মিশনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিজের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দিয়া এমনিভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিচার করিতেন, নির্ধারণ করিতেন নিজেদের নীতি ও কর্মপন্থা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রভাব ও কর্মের পরিধি যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনি দলে দলে এখানে আসিতে থাকে সাধনপ্রার্থী ও মুমুক্ষু নরনারী। রামকৃষ্ণ-তনয়, মিশনের অধিনায়ক, ব্রহ্মানন্দের কাছে সাধন ও আশ্রয় নিবার জন্য ইহাদের অনেকে ব্যাকুল হয়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতো ব্রহ্মানন্দও দীক্ষা এবং সাধনপ্রার্থীদের আগে হইতে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া নিতেন। তাহাদের আগ্রহ, চরিত্রের ধৃতি ও পবিত্রতার দিকে তীক্ষ্ম, সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তারপর দীক্ষার্থীর ইষ্ট এবং সাধনপথ ধ্যানবলে জানিয়া নিয়া দিতেন তাহাকে পরমাশ্রয়। দীক্ষা দানের পূর্বে প্রায়ই ঠাকুরের ইঙ্গিত

বা নির্দেশ আসিত। তাই একবার তাঁহাকে স্পষ্টভাবে বলিতে শোনা যায় "ঠাকুরের আদেশেই আমি সবাইকে নাম দিচ্ছি।"

ব্রহ্মানন্দ সেবার কয়েকদিনের জন্য বলরাম ভবনে আসিয়াছেন। একদিন দুপুরে শয়নকক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে ধনী ঘরের এক বিধবা কিশোরী ব্যাকুল হইয়া সেখানে উপস্থিত হয়, কাতর কণ্ঠে তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করে।

সেবক ভক্তটি একথা জানাইলে মহারাজ উত্তরে বলেন, "এই বুড়ো বয়সে দিন রাত আর কত বক্‌বো বাবা ?"

তদনুযায়ী মেয়েটিকে জানাইয়া দেওয়া হয়, "মহারাজ বড় ক্লান্ত, তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হবে না।"

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে। আর্ত স্বরে জানায়, "আমি তাঁকে একটুও বিরক্ত করবো না। একটিবার শুধু দর্শন করেই চলে যাবো।"

এবার মহারাজকে অনুমতি দিতেই হইল। মেয়েটি ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করার পর আবার ক্রন্দন শুরু করে, অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়া যায়। এদিকে মহারাজেরও অর্ধবাহ্য অবস্থা, একটা দিব্য ভাবাবেশে আননখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শান্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে ব্রহ্মানন্দ বলেন, "স্থির হও, মা, স্থির হও। কি হয়েছে আমায় বল।'

এ অভয় বাণী শুনিয়া মেয়েটি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়। তারপর দেয়ালস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোটির দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠে, "ঐ উনিই আমায় নির্দেশ দিয়েছেন আপনার কাছে শরণ নিতে। তাইতো আমি পাগলিনীর মতো ছুটে এসেছি।"

অতঃপর মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে মেয়েটি সবিস্তারে সব কথা খুলিয়া বলে। সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা সে, বাল্যকালেই বিধবা হইয়াছে। এখন বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর। দীর্ঘ জীবন সম্মুখে পড়িয়া আছে, অথচ নিজের মনের দিক দিয়া তাহার কোনো অবলম্বন নাই, আশ্রয় নাই। কিছুদিন যাবৎ সে বড় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, নিজের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া মন হইয়াছে নৈরাশ্যে অভিভূত। এই সময়ে সহসা এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন আগে গভীর রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়, চাহিয়া দেখে শয্যার পাশে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন। কৃপাভরে তিনি কহিলেন, 'আমার ছেলে রাখাল বাগবাজারেই তো রয়েছে। তার কাছে তুই চলে যা।'

এই দৈবী আদেশ প্রাপ্তির পর অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া এখানে আসিয়া সে উপস্থিত হইয়াছে।

সদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশের মর্ম বুঝিয়া নিতে মহারাজের দেরি হইল না। সেই দিনই কৃপাভরে এই বিধবা কিশোরীকে তিনি দীক্ষা দান করিলেন।

মহারাজের কৃপায় এই মহিলা অল্পকাল মধ্যে উন্নততর সাধনের অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং উত্তরকালে গ্রহণ করেন সন্ন্যাসজীবন।

ব্রহ্মানন্দের কৃপার ধারা ছিল সকলেরই জন্য উন্মুক্ত। এ কৃপা ধনী নির্ধন সপাপ

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনো তারতম্য করিত না। অভিনেত্রী তারাসুন্দরী এসময়ে মহারাজের পরমাশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁহার নির্দেশিত সাধনপন্থা অনুসরণ করিয়া অপার শান্তি লাভ করেন।

একবার অক্সফোর্ডের কোনো বিশিষ্ট অধ্যাপকের কন্যা কলিকাতায় স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। এই সময়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দিব্য স্পর্শ এই বিদেশিনীর সম্মুখে এক অলৌকিক অনুভূতির দ্বার খুলিয়া দেয়। এ সম্পর্কে তিনি ভগিনী দেবমাতাকে এক পত্র লিখেন—"ভগিনী, আমি যা আশা করেছিলাম তার চাইতেও অনেক বেশী বিস্ময়কর কান্ড। মাত্র পাঁচ মিনিট কাল দর্শন পেয়েছি, কিন্তু তাঁর দুটি হাতের ভেতর আমার হাতটি নিয়ে তিনি এমন কিছু উৎসাহপূর্ণ আশ্চর্যজনক কথা বলেছিলেন যাতে নিশ্চিতরূপে কিছু ঘটে গেল। যখন তাঁর ঘর থেকে বাইরে এলাম আমার মনে হলো, আমার বয়স যেন বিশ বৎসর কমে গিয়েছে। আর নূতন আশা নিয়ে, নূতন বিশ্বাসের ধৃতি নিয়ে আত্মিক সংগ্রাম চালানোর জন্য আমি যেন প্রস্তুত হয়েছি। এ দিনটি আমার কাছে অপূর্ব, এদিন থেকে কত তৃপ্তি আর আনন্দ আমি বোধ করছি। এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, আর যাঁরা এই দর্শন লাভে আমায় সাহায্য করেছিলেন তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ[১]।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যেরা জানিতেন, ব্রহ্মানন্দের মতো অপর কেহই ঠাকুরের নিয়ত সঙ্গ করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া দিনের পর দিন ঠাকুর অজস্র উপদেশ ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিতরণ করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ শিষ্যদের অধ্যাত্মজীবন গড়িয়া তুলিতে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। নানা নিগূঢ় সাধন-নির্দেশ তিনি এ সময়ে তাঁহাদের দিতেন এবং কথাপ্রসঙ্গে নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির কাহিনীও অকপটে বিবৃত করিতেন। এই সব তত্ত্ব ও তথ্যের প্রধান ভান্ডারী ছিলেন তাঁহার আদরের পুত্র, নিত্যকার সঙ্গী, রাখালরাজ। তাই উত্তরকালে ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে শ্রুত এধরনের অনেক কিছু তথ্য সারদানন্দ স্বামী তাহার লীলাপ্রসঙ্গে পরিবেশন করিয়াছেন।

ঠাকুরের নিজমুখের উপদেশবাণী সঠিকভাবে সঙ্কলিত হয় এবং ভক্ত-সাধকদের উপকারে আসে, এ বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ উদ্যোগী হন এবং কাজ অনেকটা অগ্রসরও হয়। সে-বার কাশীতে থাকাকালে মহারাজ একদিন একটি সেবককে দিয়া তাঁহার নিজের কানে শোনা কয়েকটি উপদেশ লিখাইয়া রাখেন।

সেই দিনই নিশীথ রাতে হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। ব্যস্ত হইয়া সেবকটিকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দেন। সে আসিলে বলেন, "ওরে দ্যাখ্‌তো, উপদেশ সঙ্কলনের খাতাটা কোথায়।"

খাতাটি নিয়া আসিলে উহা হইতে একটি উপদেশ বাদ দিবার নির্দেশ তিনি দেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে বলেন, "ঠাকুর নিজে এসে গেলেন,—রাখাল, ওটা কিন্তু আমার কথা নয়।"

এই অলৌকিক ঘটনাটি হইতে বুঝা যায়, অন্তর্ধানের পরও ঠাকুর তাঁহার প্রাণপ্রিয় শিষ্য রাখালরাজের প্রতিটি কার্যের উপর কি সতর্ক দৃষ্টিই না রাখিতেন।

অতীন্দ্রিয় দর্শনের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, রাখাল ব্রজের রাখাল,

---

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ : উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত

কৃষ্ণ-সখা, সহস্রদল কমলের উপর কৃষ্ণের হাত ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। এই সঙ্গে ঠাকুর এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেন, ব্রজের স্বরূপসত্তা যেদিন সে উপলব্ধি করিবে, মরদেহের ঘটিবে অবসান। ঠাকুরের গুরুভাইরা রাখালের কাছে এ কথাটি গোপন রাখিতেন। এ সময়ে স্বামী সারদানন্দ ঠাকুর-রামকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ লিখিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসে তাহা ছাপানো হইতেছে। গুরুভাই প্রেমানন্দ মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হন। আর সারদানন্দ পরম উৎসাহে পাণ্ডুলিপিটি তাঁহাকে পাঠ করিতে দেন।

সেদিন পাণ্ডুলিপির একটি অংশ পড়িতে গিয়া প্রেমানন্দ চমকিয়া উঠেন। রাখাল ব্রজের বালক কৃষ্ণ-সখা—এ সম্পর্কে ঠাকুরের যে অলৌকিক দর্শন ঘটিয়াছিল, সে কথাটি এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রেমানন্দ শঙ্কিত কণ্ঠে কহিলেন, "শরৎ, এ তুমি কি করছো? ঠাকুরের কথা কি তোমার মনে নেই? এসব প্রকাশিত হলে যে মহারাজের দেহ চলে যাবে।"

সারদানন্দ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এখনি এ ভুল অবিলম্বে শুধরানো দরকার। তৎক্ষণাৎ প্রেসে লোক পাঠাইয়া দিলেন। পাণ্ডুলিপির সংশ্লিষ্ট পাতাটি ছিঁড়িয়া ফেলা হইল এবং কম্পোজ করা টাইপের অংশবিশেষও করা হইল অপসারিত।

বাগবাজারস্থ বলরাম বসুর ভবনটি রামকৃষ্ণমণ্ডলীর অন্যতম পুণ্যতীর্থ। বলরাম, তাঁহার পুত্র রাম ও পুরনারীরা সবাই দীর্ঘদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তদের আন্তরিক সেবা করিয়াছেন। ঠাকুর নিজে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসিলে প্রধানতঃ বলরামের ভবনেই অবস্থান করিতেন, এখানেই ভক্তদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতেন। মা সারদামণির পুণ্যস্মৃতিও এস্থানে বিজড়িত। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং অন্যান্য রামকৃষ্ণ ভক্তদেরও প্রিয় বাসস্থান ছিল এই বলরাম ভবন।

সে-বার ব্রহ্মানন্দ কয়েকদিনের জন্য এখানে আসিয়াছেন। কলিকাতার ভক্তদের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী চলিতেছে। এসময়ে একদিন রাত্রে একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। গভীর রাত্রে কি এক কারণে মহারাজের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে হঠাৎ দেখিলেন, তাঁহার বসিবার ছোট খাটটির সম্মুখে ঠাকুর নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। ক্ষণপরেই এই মূর্তি তেমনি আকস্মিকভাবে শূন্যে মিলাইয়া গেল।

সবিস্ময়ে মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন, 'ঠাকুরের এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের কারণ কি? কোনো কথা না বলে, কোনো কিছুর নির্দেশ না দিয়ে এমন নির্বাক-ভাবেই বা চলে গেলেন কেন? এই আবির্ভাব কি কোনো ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত বহন করছে?'

মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ খেলিতেছে। উদাস দৃষ্টিতে ব্রহ্মানন্দ চুপচাপ শয্যায় বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সেবক ভক্তটি তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়ান। ব্রহ্মানন্দ মৃদুস্বরে ঠাকুরের এই অলৌকিক দর্শনের কথা তাঁহার কাছে বিবৃত করেন, সেই সঙ্গে উচ্চারণ করেন স্বগতোক্তি, "এখন আমার মনে কোনো বাসনা নেই। এমন কি তাঁর নাম করবারও আর বাসনা নেই এখন শুধু শরণাগত, শরণাগত।"

সেদিন ভোরবেলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। রামলালকে দেখিলেই ব্রহ্মানন্দের মন শিশুসু-

শ্ববেব পুবাতন দিনেব স্মৃতি জাগিযা উঠিত, ঠাকুব হাসিযা গাহিযা যে মধুময পবিবেশেব সৃষ্টি কবিতেন তাঁহাব উল্লেখ কবিযা উভযে মুখব হইযা উঠিতেন। সদানন্দময ঠাকুব যে বসালাপ কবিতেন, যে ভঙ্গীতে নাচিতেন গাহিতেন, যে আখব দিতেন তাঁহাব অনুকবণ কবা হইত আব হাসিব তুফান উঠিত।

সেদিনও দুজনেব কথাবার্তা এ হাসি গান খুব জমিযা উঠিল। প্রেমানন্দে মাতিযা উঠিযা মহারাজ আব্দাব ধবিলেন, "বামলাল দাদা, এসো সবাই মিলে আনন্দ ক'বে ঠাকুবেব পুবানো দিনেব গান শুনা যাক্। আজ সন্ধ্যায তুমি ঢপ্‌ওযালী সেজে আসব ক'বে বস্‌বে। হ্যাঁ আজই।"

বামলাল বড সবল মানুষ ছিলেন, আব মহাবাজেব প্রতি তাঁহাব ভালবাসাও ছিল অতি গভীব, তাঁহাব কোনো কথা তিনি অমান্য কবিতে পাবিতেন না। সলজ্জভাবে কহিলেন, "মহাবাজ, আপনি বলছেন বটে, কিন্তু এতো মঠ নয, এ যে গৃহস্থ বাড়ি। বিশেষত বাড়িতে মেযেবা বযেছেন। সবাই কি মনে কববেন, বলুন তো।"

মহাবাজ তখন আনন্দেব আবেশে মাতিযা উঠিযাছেন, কহিলেন, "না বামলালদা, তোমাব কোনো ওজব-আপত্তিই আমি শুনছি না। কে কি মনে কববে তাতে বয়েই গেল। হ্যাঁ, আজ কীর্তনওযালীব মতো সেজেগুজে তোমায ঠাকুবেব গান সবাইকে শোনাতেই হবে। সে খুব মজা হবে, ঠাকুবকে ঘিবে যে পুবানো দিনগুলো আমবা কাটিযেছি আবাব তা মনে ঝলমল ক'বে ভেসে উঠবে।"

বৃদ্ধ বামলালদাব কোনো কাকুতি-মিনতিতেই মহাবাজ কান দিলেন না। ঢপ্ আজ তাঁহাকে গাহিতেই হইবে।

অগত্যা বামলালকে বাজী হইতে হইল। সলজ্জ হাসি হাসিযা কহিলেন, "মহাবাজ, তোমাব কথা কে ফেল্‌তে পাবে? বেশ তাই হবে।"

সন্ধ্যাব সময ব্রহ্মানন্দ সেবক ভক্তদেব আদেশ দিলেন, "তোবা ভাল ক'বে বাম-লালদাদাকে সাজিযে নিযে আয।"

বলবাম-গৃহেব বধূদেব কাছ হইতে বঙীন বেশমী শাড়ী ও গহনা আনিযা বাম-লালদাদাকে নাবীব বেশে সজ্জিত কবা হইল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেব শবীব শুক্‌নো, সব গহনা পবানো যাইতেছে না। একথা শুনিযা পুবনাবীবা সোৎসাহে খিল-দেওযা গহনা পাঠাইযা দিলেন। সাবা বাড়িতে তখন আনন্দ কলবব পড়িযা গিযাছে।

বড হলঘবে মহাবাজ আসব জমকাইযা বসিলেন আশেপাশে ভক্ত, কৌতূহলী দর্শকবৃন্দ। বাড়িব মেযেবাও চিকেব আড়াল হইতে এই নাটকীয দৃশ্য দেখাব জন্য উদ্‌গ্রীব হইযা আছেন।

ঢপ্‌কীর্তন শুবু হইল। কীর্তনওযালীব বেশধাবী বৃদ্ধ বামলালদাদা নাচিয়া গান ধবিলেন,—

একবাব ব্রজে চল ব্রজেশ্বব দিনেক দুযেব মত
(ও তোব) মন মানে তো থাক্‌বি সেথা নইলে আসবি দ্রুত।
আগে ছিল এক হেঁটো জল
এখন যমুনা অতল—
সাঁতাব দিতে হবে।
নৈলে যমুনার তীবে বসে ব্রজ নির্বাখবে।

(বল্‌লেও বল্‌তে পারো, আগে রাখাল ছিলে
—এখন রাজা হয়েছো)
না হয় ব্রজগোপীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে।

সভার শোভারূপে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভক্ত এবং সেবকগণ সহ বসিয়া আছেন। রামলালদাদা তাঁহার নিকটে আসিয়া ঢপওয়ালীর ভঙ্গীতে অঙ্গভঙ্গী করিয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া গাহিতেছেন। বার বার দিতেছেন ভাবময় আখর—আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছো।

এই আখর শুনিয়া সহসা মহারাজের হাসি আনন্দ ও কৌতুক চপলতায় ছেদ পড়িয়া যায়। মুহূর্তে তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে এক ভাবগম্ভীর মহিমময় মূর্তি। সমুন্নত দেহ ঋজু হইয়া উঠে। নয়ন দুটি স্থির নিষ্পলক, চোখে মুখে বিস্তারিত দিব্য জ্যোতির ছটা।

এই গুরুগম্ভীর ভাবমূর্তি দেখিয়া রামলালদাদা তাড়াতাড়ি তাঁহার কীর্তন সমাপ্ত করেন। চিকের আড়ালে পুরনারীদের মৃদু গুঞ্জন স্তব্ধ হইয়া যায়। ভক্ত সাধু ও সেবকেরা নির্বাক হইয়া অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকেন মহারাজের দিকে। হঠাৎ ধ্যানের গভীরে কোন্ অতলে তিনি তলাইয়া গিয়াছেন।

আনন্দোজ্জ্বল, হাস্য-কৌতুকে মুখর, কীর্তন-সভা ভাঙিয়া যায়। ধ্যানস্তিমিত নয়ন মহারাজকে ঘিরিয়া ভক্ত ও সেবকের উৎকণ্ঠার অবধি নাই। এক স্তব্ধ গম্ভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে সেখানে।

হঠাৎ কেন ব্রহ্মানন্দের এই অদ্ভুত ভাবান্তর। 'রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছো' —কি জাদু নিহিত আছে এই কথা কয়টিতে? রামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে দেখা ব্রজের রাখাল, রাখালরাজা, আজ কি তাঁহার জন্মান্তরের স্মৃতি খুঁজিয়া পাইয়াছে? ব্রজের খেলা - নিত্যলীলা,—এই নিত্যলীলার উদ্দীপনার মধ্য দিয়াই কি মহারাজ তাঁহার স্বরূপসত্তার অতলে এমনি করিয়া ডুবিয়া গেলেন?

অতঃপর আর বেশীদিন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার নরদেহে অবস্থান করেন নাই। বলরাম ভবনে সে-বার গুরুতর পীড়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। চিকিৎসক ও সেবকদের সমস্ত কিছু প্রাণপণ প্রয়াস বিফল হয়। ভক্ত ও সুহৃদদের অশ্রুসজল নয়নের সমক্ষে এই আপ্তকাম সদানন্দময় মহাপুরুষের চিরবিদায়ের লগ্নটি হয় নিকটতর।

শয্যার পাশে দণ্ডায়মান বিষাদখিন্ন ভক্তদের দিকে চাহিয়া মহারাজ বলেন, "ভয় পেয়ো না। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"।

গুরুভাইদের কাছে বিদায় নিয়া কহিলেন, "রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই, আমি ব্রজের রাখাল—দে দে আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে—, আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচবো—ঝুমু ঝুম্ ঝুম্। কৃষ্ণ এসেছো। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। তোরা দেখতে পাচ্ছিস নে? তোদের চোখ নেই! আহা-হা কি সুন্দর।"

অন্তরঙ্গেরা স্মরণ করিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা—"ব্রজের স্বপ্নে ব্রজের রাখালের জীবনের অবসান হবে।" স্পষ্টতই বুঝা গেল শেষ মুহূর্তের আর বেশী দেরি নাই।

ক্ষণকাল বিরতির পর মহারাজ মৃদু স্বরে আবার বলিয়া উঠেন, "আমার কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ, পীতবসনে কৃষ্ণ। ব্রহ্ম সমুদ্রে বটপত্রে ভেসে যাচ্ছি। এবারের খেলা শেষ হল। ঠাকুরের পা দুখানি কি সুন্দর! দ্যাখো—দ্যাখো, একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে—বলছে, আয়, চলে আয়।"

পরের দিনই ১৯২২ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মহাসাধক ব্রহ্মানন্দ নরলীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন, প্রবেশ করিলেন চিদানন্দময় নিত্য ধামে।

যোগত্রয়ানন্দজী

যোগীরাজ শিবরামস্বামী সেবার হাওড়ার উপকণ্ঠে বালী'তে গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেছেন। গুরুদেবের দেহ মোটেই সুস্থ নাই এবং এবার এটি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। তাই নানা স্থান হইতে শিষ্য ও ভক্তেরা আসিয়া জুটিতেছেন শেষ দর্শনের জন্য। দু-বেলাই চলিতেছে সৎসঙ্গ ও তত্ত্ব আলোচনা।

প্রবীণ শিষ্য কালীনাথও বালীতে থাকেন, গুরুদেবের এখানে নিত্য করেন আসা-যাওয়া। একদিন প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র শশিভূষণকে সঙ্গে নিয়া আসেন। গুরুর চরণে দণ্ডবৎ করার পর যুক্তকরে নিবেদন করেন, "প্রভু, আপনি শশীর প্রতি একটু কৃপা দৃষ্টি করুন। নয় বৎসর বয়সে ওর উপনয়ন হয়। তারপর থেকেই দেখা যায় এক দুরন্ত মূর্ছা রোগ। ডাক্তার কবিরাজেরা সব হার মেনেছেন। এবার আপনার চরণতলে একে রেখে দিচ্ছি, এর প্রাণ রক্ষা করুন।"

বালক শশী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম নিবেদন করে, প্রসন্নমধুর হাস্যে যোগীবর তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করেন। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া স্পর্শ করেন তাঁহার মেরুদণ্ড। ধীরে ধীরে বালক সংবিৎহারা হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে।

কালীনাথ ও অপর ভক্ত-শিষ্যেরা এবার ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়েন। গুরুজী শিবরামস্বামী কিন্তু রহিয়াছেন নির্বিকার। প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কক্ষের একধারে সন্তর্পণে ওকে সরিয়ে রাখো, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুক।"

আদেশ তখনি পালিত হয়। শিবরামানন্দ শুরু করেন তাঁহার তত্ত্ব-আলোচনা। কেনোপনিষদের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া ভক্তদের তিনি বুঝাইতে থাকেন।

ব্যাখ্যান শেষে যোগীবর বলেন, "এবার বালক শশীকে তোমরা একটু দ্যাখো তো। তার বাহ্যজ্ঞান এতক্ষণে এসে গিয়েছে। এখানে আমার সম্মুখে নিয়ে এসো।"

বালককে তুলিয়া আনা হইল। শিবরামানন্দজী হাসিয়া কহিলেন, "শশী, এবার তুমি বলো তো, এতক্ষণ এখানে বসে আমি ভক্তদের কি বুঝাচ্ছিলাম।"

শশী ঋজু হইয়া উঠিয়া বসে, চোখে মুখে বিদ্যুতের দীপ্তি খেলিয়া যায়। শান্ত ধীর কণ্ঠে যোগীবরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সারমর্ম সে বিবৃত করে। উপস্থিত ভক্ত-সাধকদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

কালীনাথের দিকে তাকাইয়া শিবরামানন্দজী কহিলেন, "বৎস, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের রোগ চিরতরে সেরে গিয়েছে, আর কোনো ভয় নেই। মূর্ছারোগে সে আক্রান্ত হতো না। আসলে এটা ছিল তার পূর্বজন্মের সংস্কারজাত একটা ধ্যানাবেশ। নিয়তির পাকে এতকাল এটা চাপা পড়ে ছিল, আজ খুলে দিলাম।

প্রসন্ন কণ্ঠে আরো কহিলেন, 'কালীনাথ, শশীকে আমি দীক্ষা দেবো। বালক হলেও, সে এর যোগ্য আধার।'

অতঃপর বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আর শশী, তুই তো আমার তত্ত্ব আলোচনার মর্ম চমৎকার বুঝিয়ে বলেছিস্। তুই তো তাহলে সত্যিকার পণ্ডিত। যা আজ থেকে তোকে আমি পণ্ডিত বলেই ডাকবো।"

পরদিনই শশিভূষণের দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া যায়। গুরুর কৃপায় দশ বৎসর বয়স্ক এ বালকের জীবনে ঘটিতে থাকে অমানুষী মেধা ও প্রতিভার বিকাশ। যে শাস্ত্রকথা, যে সাধনরহস্য বালক একবার শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ উহা তাহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। মহাসাধক, অশেষ শাস্ত্রবিদ্, সিদ্ধযোগী শিবরামানন্দজীর স্নেহাশিসে জীবন তাঁহার সার্থক হইয়া উঠিতে থাকে।

গঙ্গাতীরে দেহত্যাগের সঙ্কল্প যোগীবর নিয়াছেন। বিদায়ের লগ্নটি এবার তিনি ত্বরান্বিত করিতে চান। শিষ্য ও ভক্তদের সেদিন তাই জানাইয়া দিলেন, "আজ থেকে আমি গঙ্গাজল ছাড়া অপর কোনো কিছু পানীয় বা খাদ্যরূপে গ্রহণ করবো না। অচিরে প্রাণের উৎক্রমণ ঘটিবে, তখন এ দেহটিকে তোমরা পুণ্যতোয়া গঙ্গার গর্ভে বিসর্জন দিয়ো।"

আশ্রিত শিষ্যদের অন্তরে আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়া ঘনাইয়া আসে, অশ্রুসজল চক্ষে দুবেলাই তাঁহারা শিবকল্প গুরুদেবকে দর্শন করিতে আসেন।

ইতিমধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। উপবাসে যোগীরাজের তনু ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। শেষ শয্যায় শায়িত থাকিয়া ইষ্টধ্যানে সদা বিভোর হইয়া আছেন।

বালক শিষ্য শশী সেদিন আসিয়া গুরুর পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়েন, আর্ত কান্নায় বক্ষ তাহার ভাসিয়া যায়।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে থাকেন, "প্রভু, এভাবে স্বেচ্ছায় কেন আপনি দেহ ছেড়ে দিচ্ছেন। আমি প্রাণ পেয়েছি, পরমাশ্রয় পেয়েছি আপনার কৃপায়। সেই আপনি আজ কেন এমন নিষ্ঠুর হচ্ছেন? আপনার বিহনে কি ক'রে আমি জীবন কাটাবো?"

গুরু কহিলেন, "পণ্ডিত, স্থির হও। বয়সে বালক হলেও সত্য বস্তু তোমার ভেতর আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। তুমি কেন এত ধৈর্যহারা হবে? আমি ধ্যানাসনে বসে দেহত্যাগ করবো আগামী কাল। এর কোনো নড়চড় হবার উপায় নেই।"

শশী ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, "আপনার অভাবে কে দেবে আমার মতো হতভাগ্যকে সাধনতত্ত্বের উপদেশ? কে দেবে ইষ্টলাভে সহায়তা?"

"তোমার ভবিষ্যতের জন্য ভেবো না পণ্ডিত, সে ভাবনা আমার। আমার আশীর্বাদে তোমার সাধনসত্তায় তত্ত্ব স্ফুরিত হয়ে উঠবে শাস্ত্রজ্ঞান ও যোগ সিদ্ধি হবে তোমার করতলগত। আমি বিদেহী হয়েও তোমার সঙ্গে থাকবো চিরকাল, আমার আশীর্বাদে উত্তর জীবনে হবে তুমি আপ্তকাম। আরও একটা কথা স্মরণ রেখো আমার সার্থকনামা শিষ্য চিদ্‌ঘনানন্দ রইলো। তার কাছ থেকে শাস্ত্র ও সাধন-সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব কিছু সাহায্য তুমি পাবে।"

কালীনাথ ইতিমধ্যে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। গুরু তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস, আমার দেহান্তের সময় নিকটবর্তী। যাবার আগে তোমায় প্রাণভরে আশীর্বাদ ক'রে যাই। আর বলে যাই তোমায়, তোমার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র শশীর সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী। উত্তরকালে সে কীর্তিত হবে এক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্ সাধকরূপে। অমানুষী প্রতিভা, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি আর অসামান্য যোগসিদ্ধির হবে

সে অধিকারী। যে দীক্ষা ও সাধন সে আমার কাছে লাভ করেছে তার পরিণত রূপে বিস্মিত করবে দেশবাসীকে।"

পরের দিনই তাঁহার পূর্ব নির্ধারিত লগ্নে স্বামী শিবরামানন্দ চিরসমাধিতে মগ্ন হন। সমবেত ভক্ত শিষ্যেরা তাঁহার মরদেহটি এক কাষ্ঠসম্পুটে স্থাপন করিয়া মহা-সমারোহে দেন গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন।

গুরু নরলীলায় ছেদ টানিয়া দিলেন বটে কিন্তু তাঁহার বিদেহী লীলায় ইহার পরেও ছেদ পড়ে নাই। উত্তরকালে তাঁহার কৃপাদত্ত বীজ শশিভূষণের জীবনে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠে। মনীষা, প্রজ্ঞা ও লোকশক্তির বিস্ময়কর সমাহার দেখা যায় তাঁহার জীবনে। নাম হয় যোগত্রয়ানন্দ। বাংলা ও কাশীর অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে এক করুণাঘন আচার্যরূপে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়।

শশিভূষণের জন্ম হয় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। কলিকাতার ওপারে হাওড়া জেলার বালীতে তাঁহার পৈতৃক নিবাস। পিতা রামজীবন সান্ন্যাল ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সরল ও সৎ প্রকৃতির লোক বলিয়া সবাই তাঁহাকে ভালবাসিত। আর শশিভূষণের জননী বিশ্বেশ্বরী দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা উদার স্বভাবা।

ঘরে কুলদেবতা নারায়ণ বিগ্রহ স্থাপিত ছিলেন, প্রতিদিন তাঁহার পূজা না করিয়া রামজীবন জলগ্রহণ করিতেন না। রামজীবনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীনাথ ছিলেন সাত্ত্বিক ধরনের লোক। সাধনভজন, পূজা অর্চনা ও দেবদ্বিজের সেবাতেই দিনের বেশী সময় তিনি নিরত থাকিতেন। যোগীরাজ শিবরামানন্দ স্বামীর অনুগৃহীত ও অন্তরঙ্গ শিষ্যদের তিনি অন্যতম। ইহারই মাধ্যমে বালক শশিভূষণ যোগীরাজের চরণতলে উপনীত হন, লাভ করেন তাঁহার কৃপা-প্রসাদ।

স্বামী শিবরামানন্দের আশিস্ ও ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইতে দেরি হয় নাই। দুই দশকের মধ্যেই শশিভূষণ পরিচিত হইয়া উঠেন একজন অতুলনীয় শাস্ত্রবিদ ও শক্তিধর সাধকরূপে। শত শত আর্ত ও মমুক্ষু তাঁহার শরণ নিয়া কৃতার্থ হয়।

গুরুর অন্তর্ধানের পর হইতে গুরুগতপ্রাণ সাধক নিজেকে শশিভূষণ নামে আর পরিচিত করেন নাই, নিজেকে আখ্যাত করেন শিবরাম-কিঙ্কর নামে। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিন যোগেই ছিল তাঁহার অসামান্য অধিকার, তাই ভক্ত ও শিষ্যেরা তাঁহাকে অভিহিত করিতে থাকেন যোগত্রয়ানন্দ নামে। উত্তরকালে কলিকাতা এবং কাশীতে সারস্বত ও সাধকসমাজে তাঁহার এই নামটিই বেশী প্রচলিত হইয়া উঠে। শশিভূষণের তখন কিশোর বয়স। এই বয়সে লোকে খেলাধূলা ও হাসি-আনন্দেই মত্ত থাকে। কিন্তু তাহার বেলায় দেখা যায় ভিন্নরূপ। গঙ্গাস্নান, পূজা পাঠ ও শাস্ত্র অধ্যয়নেই বেশী সময় সে অতিবাহিত করে। তদুপরি রহিয়াছে গুরু প্রদত্ত মন্ত্রজপ ও ধ্যান-ধারণা। অসাধারণ শ্রুতিধর ও মেধাবী সে, যে কোনো গ্রন্থ একবার পাঠ করে, যে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শ্রবণ করে তখনি উহা তাহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। প্রতিভাধর কিশোরকে আশেপাশে লোকেরা স্বভাবতই কিছুটা সমীহ করিয়া চলে।

তখন শীতকাল। লাল রঙে ছাপানো একটি মোটা চাদর শশিভূষণকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেদিন এটিকে কাঁধে ফেলিতে গিয়া হঠাৎ একটা তামাশা করার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠে। লাল চাদরটি লেংটির মতো পরিধান করিয়া জননীর সম্মুখে উপস্থিত হন, বলেন, "চেয়ে দ্যাখো মা, আমি কেমন সন্ন্যাসী সেজেছি।"

তামাশাটি জননী তখনকার মতো উপভোগ করেন বটে, কিন্তু মনে তাঁহার কি জানি কেন একটা দুর্ভাবনা জাগে। শশী তাঁহার আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়, পূজাপাঠ জপ নিয়াই এ বয়সে বিভোর হইয়া আছে। ভয় হয়, শেষটায় সত্যি সত্যিই ঘর ছাড়িয়া সে সন্ন্যাসী না হয়। স্বামীকে জানাইলেন তাঁহার দুশ্চিন্তার কথা, তারপর কহিলেন, "এ ছেলেকে ঘরে ধরে রাখা কিন্তু দায় হবে। তাড়াতাড়ি এর বিয়ে দাও, সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে যদিবা কিছুটা বদলায়।"

পত্নী বিশ্বেশ্বরীর কথা রামজীবনের মনঃপূত হইল, বড়ভাই-এর অনুমতি নিয়া পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ তিনি করিয়া ফেলিলেন।

গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করিয়া সংসারের জালে আবদ্ধ হইবেন, একথা শশিভূষণ কখনো কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বরং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বর লাভের জন্য তপস্যা করিবেন, ইহা ছিল মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু পিতা ও মাতার আদেশকে তিনি জ্ঞান করেন দেবতার আদেশ রূপে, তাই সেদিন কোনো প্রতিবাদ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

এক শুভ লগ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। শশিভূষণের বয়স তখন তের, আর পত্নী হরিদাসীর নয়।

যৌবনে উপনীত হওয়ার পর শশিভূষণের শাস্ত্রজ্ঞানের পিপাসা ও সাধননিষ্ঠা আরো তীব্র হইয়া উঠে। বেদ আগম স্মৃতি পুরাণের বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলেন, পাঠ করাই শুধু নয়, এই সব গ্রন্থের দুরূহ তত্ত্ব অবলীলায় তাঁহার আয়ত্তে আসিয়া যায়। এই সদ্‌গুরু শিবরামস্বামীর প্রদত্ত সাধনও তাঁহার জীবনে আনিয়া দেয় মূল্যবান অধ্যাত্ম সম্পদ। গুরু মহারাজের প্রধান শিষ্য চিদ্‌ঘনানন্দ-স্বামী মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তাঁহার শিক্ষাধীনে থাকিয়াও দিনের পর দিন শশিভূষণের সাধন প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতে থাকে।

পিতার আয় অতি নগণ্য, শশিভূষণ নিজে তখনও কোনো অর্থকরী বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। অথচ সংসারে অনটন সর্বদা লাগিয়াই আছে। এসময়ে কিছু উপার্জন অবশ্যই করা দরকার। ভাবিলেন, কবিরাজী চিকিৎসা শিখিলে মন্দ কি?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল পুরাতন দিনের এক দুঃখময় স্মৃতি। শশিভূষণ তখন মারাত্মক উদরাময় রোগে ভুগিতেছেন, কবিরাজী চিকিৎসা চলিতেছে, কিন্তু রোগ কিছুতেই সারিতেছে না। ঘরে টাকাকড়ির অভাব, চিকিৎসককে কিছুদিন ঔষধের দাম দেওয়া যায় নাই। তিনি বাঁকিয়া বসিলেন, টাকা না পাইলে ঔষধপত্র আর দিতে পারিবেন না।

শশিভূষণ মিনতি করিয়া, সজল চক্ষে কহিলেন, "কবরেজমশাই আপনি দয়া ক'রে আমার রোগ দূর করুন, আমায় বাঁচিয়ে তুলুন। যে টাকা আপনার পাওনা থাকবে তা গণ্য হবে আমার নিজের ঋণ বলে। আমার উপার্জন শুরু হলে এই ঋণ আমি অবশ্যই শোধ ক'রে দেবো।"

কবিরাজের হৃদয় গলিল না, ঔষধ দেওয়া তিনি বন্ধ করিলেন। তারপর নানা গ্রাম্য টোট্‌কা ঔষধ ব্যবহার করিয়া, দীর্ঘদিন ভুগিয়া, শশিভূষণ ঐ দুরন্ত রোগের হাত হইতে নিস্কৃতি পান।

তখন তিনি ভাবিতে বসেন, 'চিকিৎসকের মনোভঙ্গী যদি এরূপ হয় তবে তো দরিদ্র

সাধারণের কষ্টের অবধি নেই। দুবেলা যাদের অন্ন জোটে না, ঔষধের দাম ও চিকিৎসকের পাওনা টাকা কি ক'রে তারা মেটাবে? না—আমায় তবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পড়তেই হবে। চিকিৎসা-বৃত্তি আমি গ্রহণ করবো, সাধ্যমতো দূর করবো দরিদ্র জনগণের কষ্ট।'

এবার স্থির করিলেন, আগেকার ইচ্ছাটিকেই বাস্তবে রূপ তিনি দিবেন, কবিরাজী শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া চিকিৎসা শুরু করিবেন, ইহার দ্বারা সংসারের ব্যয় নির্বাহ এবং জনকল্যাণ দুই-ই সাধিত হইবে।

অলৌকিক মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন শশিভূষণ। তাই অল্পদিনের মধ্যেই প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেলেন। এই সঙ্গে অথর্ব বেদের রোগনাশক মন্ত্র ও দ্রব্যগুণ সম্পর্কিত জ্ঞানও তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

বিদ্যাবত্তা ও প্রয়োগ নৈপুণ্য তাঁহার অসামান্য। তাই চিকিৎসক হিসাবে সুনাম অর্জন করিতে বেশী দেরি হয় নাই।

জটিল রোগে আক্রান্ত যে সব রোগীকে অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা পরিত্যাগ করিতেন, তাহাদের অনেকেই শশিভূষণের চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইতে থাকে। ফলে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়ে।

চিকিৎসাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিলেও শাস্ত্রপাঠ ও সাধন-ভজনেই দিনরাতের বেশী সময় তিনি ব্যয় করিতেন। এক একদিন দেখা যাইত গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া প্রায় সারা রাত অতিবাহিত করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর গ্রামে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অভ্যুদয় তখন সবে শুরু হইয়াছে। তাঁহার অমৃতময়ী কথা শোনার জন্য, সাধন নির্দেশ নিবার জন্য, জড়ো হইতেছে কৌতূহলী দর্শক ও মুমুক্ষু ভক্তের দল। নবীন সাধক শশিভূষণও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন, আপ্তকাম মহাসাধকের মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়া হইতেন কৃতকৃতার্থ।

বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব দিন দিন বাড়িতেছে, অথচ আয় অতিশয় সীমিত। কারণ যে সব রোগীরা শশিভূষণের কাছে চিকিৎসার জন্য আসে তাহাদের অধিকাংশই দারিদ্র্যক্লিষ্ট - অন্ন বস্ত্রেরই সংস্থান নাই, চিকিৎসার ব্যয় কি করিয়া বহন করিবে? ইহার উপর আছে শশিভূষণের নানা গোপন দান। ফলে পরিবারে অভাব অনটন লাগিয়াই আছে।

অপর দিকে কঠোর সংকল্প নিয়া শশিভূষণ সাধনভজন চালাইয়া যাইতেছেন, কিন্তু আশানুরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি তো তাঁহার হইতেছে না। নৈরাশ্যে এক একদিন মুহ্যমান হইয়া পড়েন। সেদিন তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে ছুটিয়া আসেন।

ঠাকুর তখন ভবতারিণীর মন্দিরে। শশিভূষণ ধীর পদে অগ্রসর হইয়া সিঁড়ির নিচে অপেক্ষায় রহিলেন, নামিয়া আসার সময় ঠাকুরকে ধরিবেন। আজ তাঁহার হৃদয়ের আগুন ঠাকুরকে নির্বাপিত করিতেই হইবে।

মন্দির হইতে অবতরণের সময় ঠাকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন, কহিলেন, "কে গো, আমাদের পণ্ডিত না?" শিবরামানন্দের দেওয়া ঐ উপনামটি ঠাকুরও ব্যবহার করিতেন।

যুক্তকরে শশিভূষণ উত্তর দেন, "আজ্ঞে হাঁ, আমিই বটে। আপনার কাছে নিভৃতে আমার কিছু বলার আছে।"

"তা, কি বলবে বল।"

"দেখুন, প্রাণের জ্বালা কিছুতেই নিবৃত্ত হচ্ছে না। আপনার কৃপা স্পর্শ চাই। পবিত্র চরণখানি আমার বুকে একবার রাখুন, তাহলে যদি শান্তি পাই।"

"পণ্ডিত, জ্বালায় জ্বলছো, এতো ভালো কথা। এর পরেই তো আসে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন, আসে পরম শান্তি, পরম অমৃত।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণের চরণখানি কিছুক্ষণ বক্ষে ধারণ করিয়া শশিভূষণ দিব্য আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে ঠাকুর কহিলেন, "পণ্ডিত, স্থির হও। এবার উঠে বসো। আমি ওপারে, তোমাদের বালীতেই যাচ্ছি বাবা-কল্যাণেশ্বর শিব দর্শন করতে। ভক্তেরাও সঙ্গে যাচ্ছে। তুমিও যাবে চল।"

শশিভূষণ সোৎসাহে রাজী হইলেন। শিব দর্শন উপলক্ষ করিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের পূত সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা পরম আনন্দে কাটিয়া গেল। ঠাকুরের ভাগবতী কথা শুনিয়া ও ধ্যানতন্ময় দিব্যোজ্জ্বল মূর্তি দেখিয়া শশিভূষণের যেন আর আশা মিটে না।

মন্দিরের দর্শনাদি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর নিজে যাচিয়া শশিভূষণের বালীস্থিত ভবনে পদার্পণ করিলেন। আনন্দরঙ্গে সেই অঞ্চলের সবাইকে মাতাইয়া ঠাকুর যখন ফিরিয়া চলিলেন তখন শশিভূষণের হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়াছে, দেহমনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে দিব্য আনন্দের রসধারায়।

বিদায় নিবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ কহিলেন, "পণ্ডিত, তুমি ব্রাহ্মণ সদ্‌বংশীয়। চিকিৎসা বৃত্তি থেকে টাকা রোজগার করছো—ও টাকা ভালো নয়। এ বৃত্তি ছেড়ে দাও।"

ক্ষণপরেই ঠাকুর আবার মন্তব্য করেন, "তাই তো এত বড় সংসারের দায়িত্ব রয়েছে। চিকিৎসার আয় না থাকলে চলবেই বা কেমন ক'রে? আচ্ছা, তুমি চিকিৎসা ক'রে টাকা নেবে কিন্তু সংসার চালানোর জন্য ঠিক যতটুকু দরকার তাই নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই নির্দেশ শশিভূষণ সেদিন শিরোধার্য করিয়া নেন। অতঃপর নিজের দক্ষতায় বহু দুশ্চিকিৎস্য রোগ তিনি নিরাময় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আয় বৃদ্ধি কোনোদিন করেন নাই। ফলে সংসারে দারিদ্র্যের কষ্ট রহিয়াই গেল।

ঈশ্বর-দত্ত প্রতিভা ও মনীষা নিয়া শশিভূষণ জন্মিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে প্রথম জীবনে নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান অধিগত করার স্পৃহাও ছিল প্রচুর। তাই শুধু সংস্কৃতে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়নেই তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজীতে ব্যুৎপন্ন হইয়া আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রধান গ্রন্থগুলিও তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন।

কিন্তু শশিভূষণের জীবনের মূল লক্ষ্য ভারতীয় ঋষিদের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থের মর্ম উদ্‌ঘাটন করা, ঋষিদের জ্ঞানবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পন্থা অনুসরণ করিয়া ঋদ্ধি ও সিদ্ধি করায়ত্ত করা। তাই বেদ বেদান্ত, আগম, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ ও সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি কোনো কিছুর অধ্যয়নই তিনি বাকী রাখেন নাই।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা করিতে গিয়া শশিভূষণ শুধু চরক সুশ্রুত প্রভৃতি বিজ্ঞানী-

দের পন্থা যেমন অনুসরণ করিতেন, তেমনি করিতেন অথর্ব বেদের মন্ত্র ও ঔষধি প্রয়োগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তির উপরই তিনি নির্ভর করিতেন বেশী।

শশিভূষণ তখন বরানগরে বাস করিতেছেন। এক ভদ্রলোক কয়েক বৎসর যাবৎ দুরারোগ্য বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া আছেন, কলিকাতার প্রবীণ চিকিৎসকদের সব কিছু চেষ্টা বিফল হইয়াছে এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার প্রাণের আশা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন সময় ঐ রোগীটি শশিভূষণের শরণ নেয়। আর্তস্বরে জানায়, "মরতে হয় তো আপনার চিকিৎসাধীনে থেকেই মরবো। শেষ চেষ্টা হিসেবে যা কিছু করবার আপনি তা করুন।"

দ্রব্যগুণের সব পরীক্ষাই এ যাবৎ এই রোগীর উপর করা হইয়াছে। ডাক্তার ও কবিরাজেরা সাধ্যমতো সব কিছু করার পর হার মানিয়াছেন। এবার শশিভূষণ এই দুশ্চিকিৎস্য রোগের জন্য ব্যবস্থা করিলেন ঋষিদের উদ্ভাবিত মন্ত্রের প্রয়োগ। "শুধু বৈদিক মন্ত্রের অচিন্ত্য শক্তির আশ্রয় লইয়া তিনি এই রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা অল্প-কালের মধ্যেই পূর্ণভাবে শান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাধারণত তিনি ঋগ্বেদ অথবা অথর্ববেদের মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন। বৈদিক মন্ত্রের উপর তাঁহার এই-রূপ আধিপত্য ছিল যে তিনি যথাবিধ মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারাই অল্পক্ষণের মধ্যে রোগের যন্ত্রণা ও উপসর্গের জটিলতা দূর করিতে সমর্থ হইতেন। এই ভদ্রলোকটির বেলায়ও তিনি সেইরূপ করিয়াছিলেন।

"ভদ্রলোকটিকে সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার মস্তক হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত নিজের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সঞ্চালন করিতে করিতে বিধি অনুসারে তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চারণ ও সঞ্চালন ক্রিয়া কয়েকবার অনুষ্ঠিত হইলে রোগীর অসহ্য বেদনা আশ্চর্যরূপে শান্ত হইয়া যায়, তাঁহার দেহের মধ্যে এক-প্রকার স্নিগ্ধ শান্তিময় ভাব অনুভূত হয়। সুদীর্ঘকাল স্থায়ী এই দেহের যন্ত্রণা নিবৃত্ত হইতে পাঁচ মিনিটের অধিক সময় লাগে নাই। ইহার পর বেদনার আর পুনরাবৃত্তি হয় নাই এবং কয়েকদিন পর্যন্ত ঐ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে রোগীর মুখ্য রোগও নির্মূল-ভাবে অপগত হয়[১]।"

এই রোগীটি উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের বন্ধু ছিলেন। তর্করত্নমহাশয় রোগীর নিজ মুখ হইতে শশিভূষণের এই মন্ত্রচিকিৎসার কথা শুনিতে পান এবং এই তথ্যটি ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের কাছে প্রকাশ করেন।

গুরু মহারাজ শিবরামানন্দ স্বামীর কৃপায় ও জন্মান্তরের অর্জিত পুণ্যবলে শশিভূষণ অনেক সময় সূক্ষ্মলোকচারী মহাত্মা ও দেবদেবীদের দর্শন পাইতেন, শাস্ত্র-তত্ত্বের বহু দুরূহ বিষয় ইঁহাদের কৃপায় জানিতে সমর্থ হইতেন।

এক সময়ে তিনি ঋষি পাণিনির মহাভাষ্য (পতঞ্জলি-কৃত) অধ্যয়ন করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। বাংলায় তখন পাণিনির চর্চা তেমন হইত না এবং উপযুক্ত শিক্ষাদাতারও অভাব ছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত গোবিন্দশাস্ত্রী ভরদ্বাজের তখন খুব নামডাক। বিশেষ করিয়া পাণিনির অধ্যাপনায়

১ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। ভাবিয়া চিন্তায়া শশিভূষণ তাঁহারই কাছে গিয়া উপস্থিত। প্রণাম নিবেদনের পর যুক্তকরে বলেন, "আমার একান্ত অভিলাষ, আপনার মতো মহাপণ্ডিতের কাছে পাণিনি পাঠ করি। আপনি আমায় কৃপা করুন।"

শাস্ত্রী মহোদয় তখন তাঁহার ছাত্রদের নিয়া তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন। কহিলেন, "এখানে যাদের দেখছো এরা সবাই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। আমি তো বাইরের কোনো ছাত্রের অধ্যাপনা করিনে। সে ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই।"

শশিভূষণ কিছুতেই ছাড়িবেন না, বার বার মিনতি করিতে থাকেন, "আমায় পাণিনির মহাভাষ্যের পাঠ আপনাকে দিতেই হবে, একান্তভাবে আমি আপনার শরণ নিচ্ছি।"

শাস্ত্রীজী তাঁহার সঙ্কল্পে অটল। শশিভূষণকে বার বার মিনতি করিতে শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কটূক্তি করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন।

এই রূঢ় প্রত্যাখ্যান শশিভূষণের হৃদয়ে বড় বাজিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অন্নজল ত্যাগ করেন, তীব্র মনোকষ্ট নিয়া বার বার ভাবিতে থাকেন নিজের ব্যর্থতার কথা। সঙ্গে সঙ্গে অন্তস্তল হইতে উদ্‌গত হয় আকুল প্রার্থনা, "হে প্রভু, হে দেবাদিদেব, তুমি তো জান, নিজ স্বার্থের জন্য আমি এমন ব্যাকুল হই নি, ঋষিশাস্ত্র অধ্যয়নের চাবিকাঠিই আমি হাতড়ে বেড়াচ্ছি, যাতে ত্রিতাপ তাপিত মানুষের কল্যাণ হয় তা-ই তো আমি সারা অন্তর দিয়ে চেয়েছি। প্রভু, এবার থেকে আর আমি মানুষের দ্বারে জ্ঞানার্জনের জন্য ভিক্ষা করতে যাবো না, থাকবো একান্তভাবে তোমারই সাক্ষাৎ কৃপার ওপর নির্ভর ক'রে।"

সারা দিনরাত অনাহারে কাটিয়া যায়। গভীর রাতে পূজার ঘরে বসিয়া শশিভূষণ জপে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে চাহিয়া দেখেন ক্ষুদ্র কক্ষটি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে, আর অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন জটাজুটমণ্ডিত এক ঋষিকল্প মহাপুরুষ।

ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়াই তো শশিভূষণ পূজায় বসিয়াছিলেন, তবে কি করিয়া এই বৃদ্ধ তাপস ভিতরে ঢুকিলেন? বিস্মিত হইয়া একথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে স্নেহপূর্ণ স্বরে মহাপুরুষ কহিলেন, "বৎস, তুমি এত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছ কেন? সারাদিন অন্নজলই বা গ্রহণ করো নি কেন? শরীরকে কেন শুধু কষ্ট দিচ্ছ? শাস্ত্রী তোমার জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করে নি, এজন্যই কি তুমি এমন মর্মাহত? প্রকৃত জিজ্ঞাসু, তপস্যাপরায়ণ ও একনিষ্ঠ সাধকেরা ভগবানের কাছ থেকেই তো জ্ঞান আহরণ করে। তুমি হতাশ হয়ো না, আমিই তোমায় শিক্ষা দেবো ব্যাকরণ ভাষ্যের রহস্য। আমি যে গ্রন্থ রচনা করেছি, তা শিক্ষা দেবার সামর্থ্য কি আমার নেই?"

শশিভূষণ উপলব্ধি করিলেন, আবির্ভূত মহাত্মাটি হইতেছেন স্বয়ং পতঞ্জলি দেব, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন।

আর কালবিলম্ব না করিয়া আগন্তুক ঋষিবর শশিভূষণের কাছে পাণিনি মহাভাষ্যের ব্যাখ্যান শুরু করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সকল কিছু তত্ত্ব সকল কিছু রহস্য তিনি বুঝাইয়া দিলেন। শশিভূষণের মনের সংশয় এবার ঘুচিয়া গেল। দিব্য আনন্দে তিনি আপ্লুত হইলেন।

ঋষির আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের মধ্যে ব্যবধান বেশী ছিল না। এই অত্যল্প

সময়েই মহাত্মা দুরূহ মহাভাষ্যটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল ? এই চিন্তা মনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শশিভূষণ উপলব্ধি করিলেন, সাধারণ জীবজগৎ কালের যে মানে অবস্থিত থাকে, বিদেহী শক্তিধর মহাত্মার কালের মান তাহা হইতে সূক্ষ্মতর। মুহূর্তে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার কৃপায় যে কোনো মানুষ আয়ত্ত করিতে সক্ষম।

ঋষি প্রদত্ত জ্ঞান সত্য সত্যই তিনি ধারণ করিতে পারিয়াছেন কিনা, তখনই শশিভূষণ ইহা পরীক্ষা করিতে ব্যগ্র হন। দেখিলেন, ভাষ্য খুলিয়া পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে উহার নিহিতার্থ তাঁহার নিকটে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। ঋষির কৃপার বলে জন্মান্তরের প্রাক্তন বিদ্যা উৎসারিত হইতেছে ইন্দ্রজালের মতো। এই দৈবী বিদ্যা শশিভূষণ কিছু সংখ্যক উত্তরাধিকারীকে উত্তরকালে বিতরণ করিয়াছিলেন।

আর একবার, শিবরাত্রির মহানিশা সাধক শশিভূষণ কৃপা লাভ করেন ঋষি গৌতমের। সমগ্র ন্যায়দর্শনের তত্ত্ব এসময়ে তিনি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন।

পবিত্রতা, ত্যাগ বৈরাগ্য ও তপঃশক্তির সহিত শশিভূষণের জীবনে মিলিত হয় ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের মর্ম উদ্ঘাটনের ব্যাকুলতা। ইহার ফলেই সূক্ষ্মলোকচারী মহাত্মাদের কৃপালীলা এভাবে তাঁহার জীবনে বিস্তারিত হয়।

দৈবী শক্তিসম্পন্ন শাস্ত্রবিদ্ ও সাধকরূপে তাঁহার খ্যাতি এবার কলিকাতা ও শহরতলিতে প্রচারিত হয়। ধীরে ধীরে তাঁহার চারিপাশে গড়িয়া উঠে একটি জিজ্ঞাসু ভক্তগোষ্ঠী। প্রায়ই তাঁহারা শাস্ত্র পাঠের জন্য সাধক শশিভূষণের কুটিরে সমবেত হইতেন। এই জিজ্ঞাসুদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্ত নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ (উত্তরকালের বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ) এবং প্রেমানন্দভারতীকেও দেখা যাইত।

শশিভূষণের তপস্যাময় জীবনে দেখা গিয়াছিল কর্ম, শক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব মিলন। জীবনযুদ্ধের জয় পরাজয় ও লাভ-ক্ষতিতে তিনি ছিলেন নির্বিকার ও নিরাসক্ত। ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, একনিষ্ঠ ভক্তি নিয়া, অযাচকভাবে তিনি তাঁহার সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। বহু ত্যাগী ভক্তের পক্ষে যাহা সম্ভব ছিল না। এই সঙ্গে অধ্যাত্মজ্ঞান ও প্রাচীন শাস্ত্রতত্ত্বের তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট ধারক বাহক। তাঁহার সাধনজীবনে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের এই সমাহার লক্ষ্য করিয়া বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগীরা তাঁহার নাম দেন যোগত্রয়ানন্দ। এখন হইতে দর্শনার্থী ও সাধনকামী ভক্তদের মধ্যে এই নামেই প্রধানত তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

জননী অনেক দিন হয় কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছেন, আর যে আরোগ্যলাভ করিবেন এমন আশা নাই। পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "শশী, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে, বাবা, এবার তুই আমায় কাশীধামে নিয়ে যা। সেখানে প্রভু বিশ্বনাথের পুণ্যভূমিতে শেষ নিঃশ্বাস আমি ত্যাগ করতে চাই। তাড়াতাড়ি এর একটা ব্যবস্থা তোকে করতে হবে।"

মায়ের কথা শিরোধার্য করেন যোগত্রয়ানন্দ, তাঁহাকে আশ্বাস দেন, "মা, তুমি

নিশ্চিত হযে থাকো। যে ক'বেই হোক তোমাব কাশীবাসেব বন্দোবস্ত আমি কববোই।"

জননীকে তো কথা দিলেন, এখন উপায ? সংসাবে যত্র আয তত্র ব্যয, হাতে টাকা কডি কোনো সমযেই কিছু থাকে না। অনেক চেষ্টা কবিযা এক অর্থবান্ বোগীব নিকট হইতে একশত টাকা ধাব কবিলেন।

বাস্তায কাশী প্রত্যাগত এক পবিচিত ব্যক্তিব সহিত তাঁহাব দেখা। যোগত্রযানন্দকে তিনি কহিলেন, "কাশীতে যাচ্ছো যাও, কিন্তু সেখানে গুন্ডাব বড উৎপাত। বটুক পাঁড়ে নামক এক বড় পান্ডা আছে, সেখানে তাব খুব প্রতিপত্তি। আমাব অনেক দিনেব চেনা। তাকে আমাব নাম ক'বে আগে থাকতে চিঠি দিযে দাও। তাব বাড়িতেই উঠবে। কোনো ভয ভাবনা থাক্‌বে না।"

সবাইকে নিযা যোগত্রযানন্দ বটুক পাঁডেব হাবেলীতেই আশ্রয নিলেন। মোক্ষদাযিনী কাশী, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণাব পুণ্যধাম কাশী। জননীকে নিযা এই মহাতীর্থে পেঁৗছিবাব পবই মন তাঁহাব আনন্দে বিভোব হইযা উঠিযাছে।

গঙ্গাস্নান ও বাবা বিশ্বনাথেব দর্শন শেষ কবিযা বাসায ঢুকিতেছেন, এমন সময মহল্লাব কযেকটি বাসিন্দা যোগত্রযানন্দকে নিভৃতে ডাকিযা নেন, বলেন, "মশাই, এ আপনি কি কবেছেন ? শেষটায বটুক পাঁডেব বাডিতে উঠেছেন সপবিবাবে। পাঁডে যে এখানকাব এক গুন্ডা - ডাকাত বিশেষ। শিগ্‌গীব অন্য কোথাও উঠে গিযে সবাব প্রাণ বাঁচান।"

যোগত্রযানন্দেব ললাটেব একটি বেখাও কুঞ্চিত হইল না, কথাগুলি শোনাব পবও বহিলেন পূর্ববৎ ধীব স্থিব অকুতোভয।

যুক্তকব শিবে ঠেকাইযা শুধু কহিলেন, "বাবা বিশ্বনাথেব শবণ নিতেই আমবা এসেছি। সেস্থলে তুচ্ছ এক বটুক পাঁড়েব ভযে ভীত হলে চলবে কেন ? তাছাডা বটুক গুন্ডামি কবছে তাব নির্বুদ্ধিতা বশত। আমি তাব সঙ্গে দেখা কববো, তাব দোষত্রুটি বুঝিযে বলবো। এজন্য আপনাবা ভাববেন না।"

প্রতিবেশী শুভানুধ্যাযীবা বুঝিযা নিলেন, এ নবাগত ব্রাহ্মণেব বুদ্ধিভ্রংশ হইযাছে, ইহাব সঙ্গে তর্ক কবিযা কোনো লাভ নাই। একে একে তাঁহাবা সেখান হইতে প্রস্থান কবিলেন।

বিকালবেলায যোগত্রযানন্দ পাঁডেজীব ছড়িদারকে ডাকাইযা আনেন। হাসিযা বলেন, "বাবাব স্নান তর্পণ ও দর্শণ হযেছে, এবাব তো বাবাব পান্ডাকে একবাব দর্শন কবা চাই। চলুন একবাব বটুক পাঁডেজীকে ভেট ক'বে আসবো।"

ছডিদাব তখনি সোৎসাহে যোগত্রযানন্দকে পাঁড়েব কাছে হাজিব কবিলেন। তেতলাব ছাদেব উপব বটুক পাঁডে একটা চৌপাই-ব উপব উপবিষ্ট। ভাঁটাব মতো চোখ দুইটি সিদ্ধিব শববতেব প্রভাবে ঢুলুঢুলু। নিচে মাদুবে বসিযা কযেকজন বযস্য ও সেবক হাঁডিতে সিদ্ধি ঘোঁটিতেছে। অদূবে ছাদেব উপব দুইজন পালোযান ল্যাঙ্গট পবিযা কুস্তি কসবত কবিতে ব্যস্ত।

নূতন যজমান কলিকাতা হইতে আসিযাছে, পাঁড়ে সৌজন্য সহকাবে যোগত্রযানন্দকে বসিতে বলিল। সম্মুখেব আসনটিতে উপবেশন কবিযাই যোগত্রযানন্দ পাঁড়েব দিকে সঞ্চালিত কবিলেন তীক্ষ্ন দৃষ্টি। গম্ভীব কণ্ঠে বলিলেন, "মহল্লাব অনেকে বলে,

তুমি নাকি একজন দুর্ধর্ষ গুন্ডা ? ধর্মক্ষেত্রে আছো, বাবা বিশ্বনাথের সেবার অধিকার পেয়েছো, তবে গুন্ডামি করো কেন ?

বটুক পাঁড়ের ভাঙের নেশা এই আকস্মিক আঘাতে অনেকটা টুটিয়া গিয়াছে। ভাঁটার মতো চোখ দুইটি যোগত্রয়ানন্দের দিকে সে নিবদ্ধ করে, কিন্তু ক্ষণপরেই তাহা সরাইয়া নেয়, কি জানি কেন মাথা নিচু করিয়া নীরব নিস্পন্দ হইয়া সে বসিয়া থাকে। যোগত্রয়ানন্দের চোখে মুখে কোন্ অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ সে দেখিয়াছে, তাহা কে বলিবে ?

পাঁড়ের ইয়ার-বন্ধু এবং সেবকেরা এই আকস্মিক তিরস্কারে চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে আর কসরত-রত পালোয়ান দুইটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যোগত্রয়ানন্দের ঠিক পিছনে অর্থাৎ পাঁড়েজীর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাহারা প্রস্তুত, হুকুম মিললেই কলিকাতার এই বেকুব আদমীকে তাহারা নিচে ছুঁড়িয়া ফেলিবে।

ইতিমধ্যে গুন্ডাবাজ বটুক পাঁড়ের মুখভাব প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। যুক্তকরে, ধীর কণ্ঠে সে বলিতে থাকে, "আমার ভেতর থেকে কে যেন কেবলি ডেকে বলছে—"আপনি আমার জন্ম-জন্মান্তরের গুরু। আমি তা বিশ্বাস করেছি, মেনেও নিয়েছি। নইলে দুনিয়ায় এমন কোন্ মানুষ আছে যে বটুক পাঁড়েকে গুন্ডা বলে গালি দেবার হিম্মত রাখে ?"

সঙ্গে সঙ্গেই বটুক পাঁড়ে যোগত্রয়ানন্দজীর চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। অনুশোচনায় হৃদয় তাহার দগ্ধ হয়। তারপর অকপটে যোগত্রয়ানন্দের কাছে বিবৃত করে তাহার এতদিনকার অনেক কিছু দুষ্কৃতি ও পাপাচারের কাহিনী। ততক্ষণে দিব্য আনন্দের আভায় যোগত্রয়ানন্দের চোখ মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম ও করুণায় আপ্লুত হইয়া অতঃপর পাঁড়েকে তিনি নানা উপদেশ ও আশ্বাস দেন। ধর্ম জীবন গঠনে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করেন।

পাঁড়ে একান্তভাবে যোগত্রয়ানন্দের শরণ নেয় এবং সেই দিন হইতে ঘটে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল পাপময় জীবনের অবসান।[১]

হাতের টাকা কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরাইয়া গেল। এবার যোগত্রয়ানন্দ কাশীধামে বসিয়াই শুরু করেন তাঁহার আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা। বহু সঙ্কটাপন্ন রোগীকে তিনি এ সময়ে আরোগ্য করেন। এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতনামা হইয়া পড়েন। ভাল উপার্জনও হইতে থাকে। কিন্তু দরিদ্র রোগীদের কাছ হইতে তিনি কোনো অর্থ গ্রহণ করেন না, আর গৃহে সদাব্রত লাগিয়াই আছে, তাই অর্থের অভাব তাঁহার ঘুচিতে চায় না।

জননীর দেহের অবস্থা ক্রমে অবনতির দিকে যাইতেছে, এবার শেষের দিনটি ঘনাইয়া আসে হয়। মাতৃভক্ত যোগত্রয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, "মা, তুমি আদেশ দিয়েছিলে—তাই কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথের চরণতলে তোমায় নিয়ে এসেছি। আমার কথা আমি রেখেছি। তোমার মনের আর কি ইচ্ছে আছে, আমায় খুলে বল। আমি তা পূরণ করবো।"

---

১ সাধক শশিভূষণ : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু-পথযাত্রিণী জননী বলেন, "বাবা শশী, তোকে আমাব একটা শেষ অনুবোধও বাখতে হবে।"

"বল মা, কি তুমি চাও।"

"বাবা, তুই যে অবস্থায আছিস্ তাতে সংসাবে থাকা কষ্টকব তা আমি বুঝি। কিন্তু তুই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হলে পবিবাবেব এতগুলো লোক যে অনাহাবে মববে। তুই আমায় কথা দে—গৃহস্থ থেকেই তুই সাধনভজন কর্বি, সন্ন্যাসী কখনো হবিনে।"

"তাই হবে মা। তোমাব কথাই বাখবো। গৃহীযোগী বূপেই চালিযে যাবো আমাব সাধনা। গুবুকৃপায ও তোমাব আশীর্বাদে পবম প্রাপ্তি যেন আমাব ঘটে।"

এবাব অপাব সন্তোষে পুত্রকে আশীর্বাদ জানাইযা জননী ত্যাগ কবেন তাঁহাব শেষ নিঃশ্বাস।

এ সমযকাব কাশীব পবিবেশটি বড আনন্দময। কযেক জন শিবকল্প মহাত্মাব আবির্ভাবেব ফলে জনজীবনে জাগিযা উঠিযাছে নূতন আধ্যাত্মিক চেতনা। এই সিদ্ধপুবুষদেব অলৌকিক জীবন শক্তি বিভূতি ও কবুণা-লীলাব কাহিনী নিযা সর্বত্র সোৎসাহ আলোচনা চলিতেছে। দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীদেব ভিড় এই সব বিবাট পুবুষদেব আস্থানে লাগিযাই আছে।

যোগত্রযানন্দ অবসব পাইলেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাদেব কাছে গিযা উপস্থিত হন, পুণ্যময সান্নিধ্যে বসিযা দেহ মন প্রাণ তাঁহাব জুডাইযা যায। একদিন তিনি ভাস্কবানন্দ সবস্বতী মহাবাজেব আশ্রমে তাঁহাকে দর্শন কবিতে গেলেন। শহবেব উপান্তে এক বিস্তীর্ণ বাগিচায তাঁহাব আশ্রম। যোগবিভূতিসম্পন্ন এই মহাপুবুষকে দর্শনেব জন্য দর্শনার্থীদেব উৎসাহেব সীমা নাই।

প্রথম দিন জনতাব ব্যূহ ভেদ কবিযা যোগত্রযানন্দ কোনো মতে মহাত্মাব নিকটস্থ হইলেন। প্রণাম কবাব পব তিনি শুধু কহিলেন, "দর্শন হো গিযা, আভি চলা যাও।"

বড মনঃক্ষুণ্ণ হইযা পড়েন যোগত্রযানন্দ। পব পব আবো দুই দিন ভাস্কবানন্দ মহারাজেব কাছে গেলেন, কিন্তু মহাত্মা তাঁহাকে তেমন আমলই দিলেন না।

এবাব তিনি দুঃখিত চিত্তে ভাবিতে থাকেন, 'কোনো স্বার্থসিদ্ধিব উদ্দেশ্য নিযে তো আমি সবস্বতীজীব কাছে যাই নি, গিযেছি জ্ঞান আহবণের জন্য। তবে কেন তিনি এমনভাবে আমায উপেক্ষা কবলেন?'

কযেক দিনেব মধ্যেই ঘটনাব গতিপ্রকৃতি বিস্ময়কববূপে পবিবর্তিত হইযা গেল। প্রবীণ গুবুভ্রাতা চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী এসমযে কিছুদিনেব জন্য কাশী আসিযা উপস্থিত। গুবু শিববামানন্দ স্বামীব হাতে গডা মানুষ তিনি, গুবুকৃপায ও আপন সাধন বলে অশেষশাস্ত্রবিদ্ বূপে তিনি পবিচিত হইযা উঠিযাছেন, যোগবিভূতি অর্জনে হইযাছেন সফলকাম। এই গুবুভ্রাতাকে যোগত্রযানন্দ নিজেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব মতোই শ্রদ্ধা কবেন, প্রযোজনমতো দুবূহ শাস্ত্রতত্ত্ব তাঁহাব নিকট হইতে জানিযা নেন, নিগূঢ যোগসাধনেব নির্দেশাদি গ্রহণ কবেন। কাশীতে আসিযা চিদ্‌ঘনানন্দজী তাঁহাব পবম স্নেহভাজন যোগত্রয়ানন্দেব গৃহেই অবস্থান কবিতে থাকেন।

চিদ্‌ঘনানন্দের নিকট ভাস্করানন্দ সরস্বতী মহারাজ নানাভাবে উপকৃত, তাঁহার আগমনের বার্তা শুনিয়াই তাড়াতাড়ি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। স্বামীজীকে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য দেখানোর জন্য প্রচুর পুষ্পমাল্য ও ফলমূল নিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে রহিয়াছে কতিপয় ভক্ত-শিষ্য।

সরস্বতী মহারাজের আগমনের সংবাদ শুনিয়াই চিদ্‌ঘনানন্দজী চাদর মুড়ি দিয়া কম্বলাসনে শুইয়া পড়িলেন। ভান করিলেন, তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। সরস্বতী মহারাজ নীরবে কক্ষের একপাশে বসিয়া বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। তারপর হঠাৎ চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর কপট নিদ্রা টুটিয়া গেলে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার পদসেবায়।

"ওকে, ভাস্কর এসেছো? তা বেশ, তা বেশ, তোমায় দেখে খুব আনন্দ হলো। কখন এলে?" বলিয়া চিদ্‌ঘনানন্দ সাদরে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, জানাইলেন তাঁহার আশীর্বাদ।

এবার গৃহস্বামী যোগত্রয়ানন্দের দিকে সরস্বতী মহারাজের দৃষ্টি পতিত হয়। সোৎসাহে বলেন, "ধন্য তুমি। কি সৌভাগ্য তোমার। অতুলনীয় শ্রদ্ধা আর প্রেমের ডোরে অনায়াসে তুমি এই শিবকল্প মহাপুরুষকে বেঁধে ফেলেছো। অথচ আমরা কত চেষ্টা করেও এঁকে আমাদের কাছে ধরে রাখতে পারিনে। কেবলই তিনি দূরে দূরে পালিয়ে বেড়ান।"

চিদ্‌ঘনানন্দ স্মিতহাস্যে বলেন, "ভাস্কর, তুমি এই সমর্থ গৃহীযোগীকে, আমার গুরুর আশিস্‌পূত এই সাধককে, ঠিকমত চিনতে পারো নি। একে ভেবেছিলে সংসারাবদ্ধ জীব বলে। তাই তোমার সকাশে দু-তিনবার গিয়েও ইনি তোমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পান নি।"

ভাস্করানন্দ সরস্বতী নিজের ভুল বুঝিতে পারেন, এবার আনন্দে যোগত্রয়ানন্দকে জড়াইয়া ধরেন, বার বার করেন সাধুবাদ।

আনীত ফলমূল চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর সম্মুখে ধরিতেই তিনি বলেন, "না ভাস্কর, আগে তুমি আমার এই গুরুভাইর আতিথ্য গ্রহণ করো, তারপর আমি তোমার উপহার গ্রহণে করবো অঙ্গীকার।"

যোগত্রয়ানন্দের গৃহে বসিয়া দুই চারিটি ফল ভাস্করানন্দ ভোজন করিলেন। তারপর চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীর সহিত নানা নিগূঢ় শাস্ত্রতত্ত্ব সাধনপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা সারিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। গুরুভ্রাতা চিদ্‌ঘনানন্দের কৌশলে যোগত্রয়ানন্দের মনের ক্ষোভ সেদিন এভাবে তিরোহিত হইল[১]।

যোগত্রয়ানন্দের বৃহৎ পরিবারে ব্যয় অনেক। অথচ আয় অতি সামান্য। দুশ্চিকিৎস্য বহু রোগী তিনি আরোগ্য করিতেছেন বটে, কিন্তু পারিশ্রমিক নেন যৎসামান্য। দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার অর্থ গ্রহণ তো করেনই না বরং পথ্য ও অন্নবস্ত্রের জন্য অনেক সময় তাহাদেরই সাহায্য করিতে হয়। তাছাড়া কোন প্রার্থীকে যোগত্রয়ানন্দ ফিরাইতে পারেন না, তাই ছোটখাটো আর্থিক সাহায্য করে [illegible]

১ সাধক শশিভূষণ : সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

দুঃস্থদেব দিতে হয। ফলে সংসাব প্রায অচল, ঋণেব বোঝা দিন দিন বাডিযাই-চলিযাছে।

চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী এ পবিস্থিতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য কবিলেন। ভাবিলেন, দেবপ্রতিম এই গুরুভাইকে তো এবাব বক্ষা কবা দবকাব। অনিশ্চিত আযেব উপব-নির্ভব কবিযা এত বড পবিবাবেব গ্রাসাচ্ছাদন কি কবিযা চলিবে?

আমেটিব বাজা চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামীব খুব ভক্ত। স্বামীজী তাঁহাব কাছে যোগত্রযানন্দেব কথা বিশদ কবিযা লিখিলেন,—"আমাব এই গুরুভাইটি বৈবাগ্যবান্ সাধক, শাস্ত্রজ্ঞান এবং যোগৈশ্বর্যও তাঁহাব প্রচুব। নিস্পৃহ ও অনাসক্ত হইযা সংসাবে আছেন তাই অর্থাভাবে তাঁহাব বৃহৎ সংসাবটি ক্লিষ্ট হচ্ছে। আমাব ইচ্ছা তুমি একে তোমাব কাছে বাখ এবং এব সংসাব প্রতিপালনেব দাযিত্ব নিযে একে ভাবমুক্ত কবো। এতে তোমাব কল্যাণ হবে।"

উত্তবে বাজা জানান "আজ্ঞা পালন কবিতে পাবলে নিজেকে আমি ধন্য মনে কববো। যোগী মহাবাজেব পবিবাবেব খবচ চালানোব জন্য প্রতি মাসে আমাব এস্টেট তিনশত টাকা দেবাব সিদ্ধান্ত নিযেছে। আপনি অবিলম্বে তাঁকে পাঠাবেন এবং তাঁকে সেবা কবাব সুযোগ দিযে আমায কৃতার্থ কববেন।"

বাজাব এই স্বীকৃতি পাইযা স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দেব আনন্দেব অবধি নাই। চিঠিটি যোগত্রযানন্দকে দেখাইযা কহিলেন, "যাক্, এবাব থেকে একটা বড় দুশ্চিন্তা দূব হলো। এই বৃহৎ পবিবাবেব দাযিত্বেব কথা আব তোমায ভাবতে হবে না। যত সত্বব পাব, সবাইকে নিযে তুমি আমেটি যাত্রা কবো।"

যোগত্রযানন্দ ক্ষণকাল চুপ কবিযা থাকেন। তাবপব যুক্তকবে নিবেদন কবেন, "স্বামীজী, এভাবে কোনো ধনী ব্যক্তিব গলগ্রহ হযে থাকাটা আমি বাঞ্ছনীয মনে কবিনে। গুরুদেবেব কৃপায এবং আপনাব আশীর্বাদে সংসাবেব ব্যয নির্বাহ কোনো-মতে হযেই যাবে। আপনাব চবণে আমি মার্জনা ভিক্ষা কবি।"

চিদ্‌ঘনানন্দজী প্রসন্ন হইযা উঠেন, গুরুভাইকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ কবিযা কহেন, "আত্মজ্ঞান পেতে হলে চাই এমনি অনাসক্তি, এমনি ত্যাগ বৈবাগ্য। অচিবে তোমাব তপস্যা জযযুক্ত হোক, আন্তবিক ভাবে এই আশীর্বাদ আমি কবছি।"

বহু কঠিন বোগী যোগত্রযানন্দ আবোগ্য কবিতেছেন, মৃত্যুপথযাত্রী কত লোকেব প্রাণ বক্ষা কবিযাছেন। মাবাত্মক বোগে আক্রান্ত নবনাবী প্রথমেই তাঁহাব কাছে চিকিৎসাব জন্য চলিযা আসে। কাশীব কযেকজন প্রবীণ ডাক্তাব কবিবাজেব এজন্য খেদেব অন্ত নাই।

একদিন এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তাব যোগত্রযানন্দকে প্রণাম জানান, প্রশ্ন কবেন, "বাবা, মাযেব তো গঙ্গা-প্রাপ্তি হলো, এবাব আপনি কবে কোলকাতায ফিবছেন?'

"কেন বলুন তো"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন কবেন যোগত্রযানন্দ।

ডাক্তাব মৃদুহাস্য কবিযা বলেন, "ভাবছি, তাহলে আমাদেব আবো বোগী জুটবে এবং আমবা দুমুঠো খেতে পাবো। আব ওদিকে আপনি ফিবে গেলে আপনাব কোলকাতাব বোগীবাও বাঁচবে।"

যোগত্রযানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "ভয নেই আপনাদেব। সময এসে গেছে। শিগ্‌গীবই আমি কাশী ত্যাগ কববো।"

অল্পদিনেব ব্যবধানেই বৃহৎ পবিবাবটি সঙ্গে নিযা তিনি ববানগবে প্রত্যাবর্তন কবিলেন।

কযেকমাস পবে এক নিদাবুণ দুঃসংবাদ পৌঁছিল যোগত্রযানন্দেব কাছে। কাশী ত্যাগ কবাব পব স্বামী চিদ্ঘনানন্দ নানা তীর্থ পর্যটন কবিযা তীর্থবাজ প্রযাগে আসিযা উপস্থিত হন এবং হঠাৎ প্রাণঘাতী বোগে অক্রান্ত হন। শেষ সময় সমাগত জানিযা স্বামীজী ভক্তগণসহ পবিত্র সঙ্গমস্থলে উপনীত হন, তাবপব পদ্মাসনে আসীন অবস্থায স্বেচ্ছায ববণ কবেন জল-সমাধি!

স্বামী চিদ্ঘনানন্দ শুধু যোগত্রযানন্দেব শ্রদ্ধেয প্রবীণ গুবুভ্রাতাই নন, গুবু শিববামানন্দ স্বামীব পাণ্ডিত্য ও যোগপন্থাব এক শ্রেষ্ঠ ধাবকবাহক তিনি। গুবুদেবেব মহাপ্রযাণেব পব হইতে যোগত্রযানন্দকে সাধনা ও শাস্ত্রতত্ত্ব সম্পর্কে নানা নিগূঢ় উপদেশ এতকাল তিনি দিযা আসিতেছিলেন। তাই তাঁহাব এই আকস্মিক অন্তর্ধানে যোগত্রযানন্দ শোকে অভিভূত হইযা পডেন।

শুধু একজন অশেষ শাস্ত্রবিদ্বুপেই নয, মহাজ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাপুবুষবুপেও কলিকাতা এবং কাশীব সাধকসমাজে যোগত্রযানন্দ পবিচিত ছিলেন।

ববানগবে ও বালীতে থাকাকালে তাঁহাব গৃহটি হয তবুণ শাস্ত্রবিদ্যার্থী ও সাধকদেব এক মর্মকেন্দ্র। বহু প্রবীণ সাধু-সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ ভক্তেবা এসময়ে তাঁহাব কাছে উপনীত হইতেন, অধ্যাত্ম জীবনেব নানা জটিল সমস্যাব সমাধান কবিযা নিতেন।

তাঁহাব প্রতি আকৃষ্ট হইযা যে সব প্রতিভাধব এবং তবুণ জিজ্ঞাসুবা আসিতেন তাঁহাদেব মধ্যে ছিলেন নবেন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসাদ চন্দ্র, প্রেমানন্দ ভাবতী প্রভৃতি। প্রথমোক্ত দুই জন উত্তবকালে প্রসিদ্ধি লাভ কবেন স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ নামে। প্রেমানন্দ ভাবতীও পববর্তীকালে সাধনমার্গে উন্নতি লাভ কবেন এবং আমেবিকায ধর্ম প্রচাবে উদ্বুদ্ধ হন।

যোগত্রযানন্দেব কাছে পাণিনিব মহাভাষ্য ও ন্যাযদর্শনেব ব্যাখ্যা শুনিযা বিবেকানন্দ সোৎসাহে একবাব বলিযাছিলেন, "আমাব ইচ্ছে হয, কোনো নির্জন পাহাডেব গুহায গিযে, আপনাব চবণতলে বসে, ঋষিদেব শাস্ত্রগুলো একান্ত মনে পাঠ কবি।"

একদিন যোগত্রযানন্দ দিব্যভাবে উদ্দীপিত হইযা ঋষিদেব ধ্যানলব্ধ বৈদিক জ্ঞানেব মাহাত্ম্য কীর্তন কবিতেছেন। নিবিষ্ট মনে দীর্ঘসময তাঁহাব ভাষণ শোনাব পব বিবেকানন্দ উল্লসিত হইযা বলিযা উঠেন, "বেদেব পবমতত্ত্ব, বেদেব অপৌবুষেযত্ব যদি এমনি হয, হবে এই পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ আছে যে এই মহাপণ্ডিতেব কাছে মাথা নিচু কববে না?"

জাতীয আন্দোলনেব অন্যতম পথিকৃৎ, ডন পত্রিকাব সম্পাদক, মনীষী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায একবাব মহাত্মা যোগত্রযানন্দেব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে আসেন। আধ্যাত্মিক উন্নতিব আকাঙ্ক্ষা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যাযেব জীবনে বববাবই বলবতী ছিল। উত্তব জীবনে তিনি গোস্বামী বিজযকৃষ্ণেব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেন এবং কাশীধামে কঠোব সাধনাব ব্রতী হইযা এক উচ্চকোটিব সাধকে পবিণত হন। যোগত্রযানন্দ

সহিত আলোচনায প্রবৃত্ত হইযা সতীশচন্দ্র দর্শনতত্ত্বেব কযেকটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপন কবেন।

মহাত্মা এই সব প্রশ্নেব মীমাংসা কবেন গণিতেব সাহায্যে। প্রাচীন ভাবতীয গণিত ও আধুনিক গণিতে তত্ত্ব ও প্রযোগ কৌশল যেবূপ নৈপুণ্যেব সহিত তিনি বুঝাইয়া দেন, তাহাতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায মহাশয বিস্মিত ও মুগ্ধ হইযা যান।

বিদায নিবাব সময তিনি বলেন, "গণিতেব সাহায্যে ধর্ম ও দর্শনেব মর্ম যে এমন ক'বে উদ্‌ঘাটন কবা যায, তা আমাব ধাবণায ছিল না। আমাব প্রার্থনা, আপনি এ ধবনেব ব্যাখ্যাযুক্ত একটি গ্রন্থ কৃপা ক'বে বচনা কবুন। আধুনিক যুগেব মানুষ এব দ্বাবা অশেষভাবে উপকৃত হবে।"

যোগত্রযানন্দ হাসিযা উত্তব দিলেন, "সবই প্রভুব ইচ্ছা।"

অভেদানন্দ মহাবাজ এসময়ে শাস্ত্রপাঠেব জন্য আগ্রহাকুল। প্রাযই তিনি যোগত্রযানন্দেব সকাশে উপস্থিত হইতেন, অলৌকিকী প্রজ্ঞা ও যোগসিদ্ধিব অধিকাবী এই মহাত্মাব কাছ হইতে বহু শাস্ত্রীয প্রশ্নেব সন্তোষজনক মীমাংসা তিনি জানিযা নিতেন। সংস্কৃত এবং ইংবাজীতে যোগত্রযানন্দেব সমান ব্যুৎপত্তি ছিল, কাজেই আধুনিক শিক্ষায শিক্ষিত তবুণেবা তাঁহাব সৎসঙ্গ ও আলোচনায তৃপ্তি পাইতেন, তাঁহাদেব নানা সন্দেহেব নিবসন ঘটিতে।

যোগত্রযানন্দ এসময়ে অযাচক বৃত্তি নিযা বাস কবিতেছেন। বহু দুবাবোগ্য বোগী তাঁহাব চিকিৎসাব ফলে বাঁচিযা উঠিতেছে বটে কিন্তু এজন্য কোনো পাবিশ্রমিক নিতে তিনি অপাবগ। ভগবৎ কৃপায উদ্বুদ্ধ হইযা যখন যে যাহা দেয তাহাতেই তাঁহাব সংসাবেব ব্যয নির্বাহ হয।

এমন বহুদিনই গিযাছে, ঘবে শিশুপুত্রেব জন্য দুধটুকুবও যোগাড কবা যায নাই। গৃহিণী গোপনে নিজেব আঁচলে চোখেব জল মুছিতেছেন। চাল ডাল ফুবাইযাছে, হাট-বাজাব কবাব কোনো সঙ্গতি নাই, অথচ দশ-বাবোটি প্রাণীব অন্ন যোগাইতে হইবে। নিজেব পবিবাবেব লোক তো ছিলই, তদুপবি দুঃস্থ বোগী এবং আত্মীয়-অভ্যাগতেবাও অনেক সময তাঁহাব গৃহে আশ্রয নিতেন। এই গুবু সাংসাবিক দাযিত্বেব সকল কিছু তিনি সমর্পণ কবিযাছিলেন ভগবানেব চবণে। আব লোকে প্রাযই অবাক হইযা দেখিত, শবণাগত সাধকেব সকল কিছু প্রযোজন ভগবান্‌ই দিনেব পব দিন মিটাইযা দিতেছেন।

সে বাব বাধানাথ নামে একটি ছাত্র মবণাপন্ন কাতব হইযা যোগত্রযানন্দেব গৃহে আশ্রয নেয। বোগীব শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধানেব জন্য তাহাব পত্নী ও মাতাপিতাও আসিযা উপস্থিত। বোগীব ঔষধেব ব্যয তো মহাত্মাকে বহন কবিতে হইতেছেই তদুপবি বহিযাছে বোগীব পবিবাবেব সবাইব ভবণপোষণ।

বহু চেষ্টা ও যত্নে যোগত্রযানন্দ বোগীকে ভাল কবিযা তুলিলেন। বোগমুক্ত হইবাব পব মাঝে মাঝে সে যোগত্রযানন্দেব সঙ্গে ভগবৎ তত্ত্বেব আলোচনা কবিতে বসিত।

বাধানাথেব মা ইহা লক্ষ্য কবিতেছেন আব বিবক্তিতে তাঁহাব মন ভবিযা উঠিতেছে। অবশেষে একদিন তিনি ক্রোধে ফাটিযা পডেন। যোগত্রযানন্দকে গালাগালি দিযা

বলিতে থাকেন, "আমার একটি মাত্র ছেলে, এবার এম-এ পরীক্ষা দেবে, রোজগার ক'রে সংসারের সব দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে, তাকে কিনা আপনি সাধু বানিয়ে ফেলছেন। আপনার এ বাহাদুরিতে আর কাজ নেই।"

ক্রোধভরে মহিলাটি সেইদিনই সবাইকে নিয়া প্রস্থান করেন। মহাত্মা যে তাঁহার পুত্রের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, তাঁহার পরিবারের সবাইকে এতদিন ভরণ-পোষণ করিয়াছেন এবং এজন্য যে চিরকাল তাঁহার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এসব কোনো কিছুই তাঁহার অন্তরে ঠাঁই পায় নাই। যোগত্রয়ানন্দ কিন্তু একটি কথাও ইঁহাদের বলেন নাই। নির্বিকার, অভিমানশূন্য মহাপুরুষ তখন বহির্বাটীতে বসিয়া জিজ্ঞাসুদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন।

এই সময়ে যোগত্রয়ানন্দ একদিন গুরুদেব শিবরামানন্দের প্রত্যাদেশ লাভ করেন। গুরু বলেন, "বৎস, অযাচক বৃত্তি নিয়ে সংসার করছো, ত্যাগ তিতিক্ষাময় তপস্যায় আপ্তকাম হয়েছো, ভাল কথা। কিন্তু সাধু যদি জনসমাজে বাস করে, জনকল্যাণের জন্য কিছু করতে হয়। ভগবৎ কৃপায় বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি দ্বারা ঋষিদের তত্ত্ব তুমি উপলব্ধি করেছো। সেই তত্ত্ব এ যুগের মানুষের উপযোগী ক'রে প্রকাশ করো। বেদ, আগম, ভক্তিশাস্ত্র সব কিছুর নির্যাস নিয়ে তুমি রচনা করো একটি মহান্ গ্রন্থ।"

যে চিন্তা মাঝে মাঝে তাঁহার হৃদয়ে দোলা দিত, বিদেহী গুরুদেব আজ দিলেন তাহারই সুস্পষ্ট নির্দেশ। সংকল্প তাঁহার তখনি স্থির হইয়া গেল, যোগত্রয়ানন্দ শুরু করিলেন তাঁহার মহান্ কালজয়ী গ্রন্থের রচনা। এই গ্রন্থ হইতেছে বহু খ্যাত— আর্যশাস্ত্র প্রদীপ। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার খুঁজিয়া, সাধনলব্ধ স্বচ্ছ দৃষ্টির আলোকে, এই অপূর্ব মনীষা-দীপ্ত মহাগ্রন্থ রচিত। সাত্ত্বিক বিচারনৈপুণ্য যেমন ইহাতে আছে, তেমনি আছে চিরন্তন ও সর্বজনীন পরমতত্ত্বের উদ্ঘাটন, বিশেষ করিয়া ঋষি রচিত শাস্ত্রের তত্ত্ব নিরূপণ।

এই গ্রন্থ রচনার সময় যে ত্যাগ তিতিক্ষা ও ধৈর্য যোগত্রয়ানন্দ স্বীকার করিয়াছেন সমগ্র পরিবারকে যে চরম দুর্গতি ও অর্থকষ্টের পরীক্ষায় টানিয়া নিয়াছেন তাহা অকল্পনীয়। কোনো দিন অর্ধাহার জুটিয়াছে, কোনো দিন তাহাও জুটে নাই, বেল-পাতার রস পান করিয়া বাড়ির সবাই দিনাতিপাত করিয়াছে। ঠাকুরঘরে ধ্যান-ভঙ্গের পর যোগত্রয়ানন্দ রত হইতেন তাঁহার এই শাস্ত্রগ্রন্থের রচনায়। প্রতিদিন চৌদ্দ-পনের ঘণ্টা করিয়া অবিরাম পরিশ্রম তাঁহাকে করিতে হইত। হাতে অর্থ নাই, প্রাচীন দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থা নাই, অথচ গুরু কৃপায়, সিদ্ধ মহাত্মাদের সাহায্য ও দৈব যোগাযোগের ফলে প্রয়োজনমতো সব কিছুরই ব্যবস্থা যেন আপনা হইতেই সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে।

গৃহে যাঁহার অন্নের সংস্থান নাই, তাঁহার পক্ষে এই সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করা কি করিয়া সম্ভব? অথচ এ অসম্ভব সম্ভব হইল, প্রয়োজনমতো সব কিছুই ভগবান্ মিলাইয়া দিলেন।

আর্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রকাশিত হইলে সাধকমহলে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের সাধনোজ্জ্বল প্রজ্ঞা, মনীষা ও বিদ্যাবত্তায় সকলে বিস্মিত হন।

এই গ্রন্থের পরিচয় পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন—এমন একটি সদ্-

মুখীন তত্ত্ব-সংবলিত মহাগ্রন্থ যে মানুষ বচনা কবতে পাবেন, তাঁব মেধা ও প্রতিভাব পবিমাপ আমি কবতে পাবছি না। আমাব মনে হয়, এই গ্রন্থ ইংবেজীতে বচিত হলে সাবা পৃথিবীতে এব প্রচাব হতো, সত্যকাব আদব হতো।

মহামহোপাধ্যায ডঃ গোপীনাথ কবিবাজ তাঁহাব যৌবনকালে এই গ্রন্থ পাঠ কবিযা বিস্মযে অভিভূত হন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিযাছেন, "এই মহান্ গ্রন্থে এমন অসাধাবণ পাণ্ডিত্য ও বহু দর্শিতাব নিদর্শন ছিল যাহা দেখিযা তৎকালে আমাব মন স্তব্ধ হইযা গিযাছিল এবং নীববভাবে মহাজ্ঞানী ঋষিকল্প গ্রন্থকাবেব চবণে পুনঃপুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন কবিতেছিলাম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন এবং নবীন দর্শন, বিজ্ঞান সর্ব শাস্ত্রেবই পূর্ণ জ্ঞানেব পবিচয এই গ্রন্থমধ্যে প্রাপ্ত হইযা আমাব একান্ত ইচ্ছা যে ইঁহাকে দর্শন কবিব এবং ইঁহাব চবণে বসিযা জ্ঞানেব অনুশীলন কবিব। গ্রন্থপাঠে মনে হইতেছিল যে গ্রন্থকাব কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সকল মার্গেব সমবূপ অধিকাবী, তিনি ঋষিকল্প এবং বিজ্ঞান মদগর্বিত বর্তমান ইংবেজী শিক্ষিতসমাজেব গুবুস্ববূপ।"

যোগত্রযানন্দজীব উত্তুঙ্গ সাবস্বত প্রতিভাব পবিচয দিতে গিযা ডঃ গোপীনাথ কবিবাজ আবও লিখিযাছেন, "তিনি বহু গ্রন্থ লিখিযাছিলেন কিন্তু তাঁহাব সর্বপ্রথম ও প্রধান গ্রন্থ—আর্যশাস্ত্র প্রদীপ। এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে পৃথিবীব বিশেষ কল্যাণ হইত সন্দেহ নাই। ইহাব ভূমিকায যে অংশটুকু প্রকাশিত হইযাছে তাহাও অতি বিশাল ও অপূর্ব। হার্বার্ট স্পেন্সাব যেবূপ 'সিন্থেটিক ফিলসফিব' পবিকল্পনা কবিযাছিলেন তাহাব চেযেও বিবাট পবিকল্পনা ছিল আর্যশাস্ত্র প্রদীপ-কাবেব। এই পবিকল্পনা কার্যে পবিণত কবিবাব সামার্থ্যও তাঁহাব ছিল। কিন্তু আমাদেব দুর্ভাগ্য ; ইহা হইযা উঠে নাই। তাঁহাব মানবতত্ত্ব ও বর্ণ বিবেক অপূর্ব গ্রন্থ। তাঁহাব পবলোক তত্ত্ব পবলোক ও আবশ্যকীয যাবতীয বিষয সম্বন্ধে বিপুল গ্রন্থ। ইহা বড় বড চাবি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইযাছিল। ইহাব তিন খণ্ড আমি দেখিযাছি, চতুর্থ খণ্ড দেখি নাই। প্রকাশিত হইযাছিল কিনা জানি না। তাঁহাব ভূত ও শক্তি, আযুস্তত্ত্ব, গণিতেব দার্শনিক বহস্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষযক আলোচনা-প্রধান গ্রন্থও আছে। এই সব গ্রন্থ তাঁহাব কাশী আসিবাব পূর্ব সমযকাব বচনা। কাশী আসিবাব পব কাশী অবস্থানেব শেষ দিকে এবং কাশী ত্যাগেব পব তাঁহাব আবও কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইযাছে[১]।"

অযাচক বৃত্তিব উপব একান্তভাবে নির্ভব কবিযা যোগত্রযানন্দ সংসাবযাত্রা নির্বাহ কবিতেছেন। তদুপবি ছিল শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশেব ব্যয, এজন্য তাঁহাকে বহুতব কঠিন পবীক্ষাব সম্মুখীন হইতে হইযাছে। কিন্তু সুখে দুঃখে, জয-পবাজযে, লাভ ক্ষতিতে সমজ্ঞানী মহাপুবুষ সর্বদা হাসি মুখে এই সব পবীক্ষাব সম্মুখীন হইযাছেন।

সেদিন গৃহিণী জানাইযা দেন, গৃহে এক মুষ্টি তণ্ডুল নাই। মুদি বাকীতে মাল দিতে অস্বীকাব কবিযাছে। একটা টাকা কোথাও হইতে সংগ্রহ কবা যায নাই। এখন উপায।

মহাত্মা আকাশেব দিকে অঙ্গুলি দেখাইযা কহিলেন, "আমবা তাঁব চবণে শবণ

---

১ সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ ডঃ গোপীনাথ কবিবাজ

নিয়ে আছি, রাখতে হয় তিনিই রাখবেন, মারতে হয় তিনিই মারবেন। ধৈর্য ধর, একটু কিছু হবেই।"

তার পর তাঁর আদেশে বাড়ির সবাই বিল্বপত্রের রস পান করিয়া সেদিন অতিবাহিত করিলেন। আরো প্রায় দুই দিন অনশনে কাটিয়া গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে যে এই চরম দুর্গতি চলিয়াছে—শিষ্য, ভক্ত, দর্শনার্থীদের কেহই তাহা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই। পাঠকক্ষে বসিয়া যোগত্রয়ানন্দ যথারীতি গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, কখনো বা ভক্ত ও সাধনার্থীদের নিয়া তত্ত্ব আলোচনায় রহিয়াছেন বিভোর।

তৃতীয় দিনের অপরাহ্ণ। কালীপ্রসাদ (অভেদানন্দ) প্রভৃতি জিজ্ঞাসু ভক্ত গৃহে সমবেত হইয়াছেন। আর যোগত্রয়ানন্দ প্রশান্ত কণ্ঠে একটি জটিল দার্শনিকতত্ত্ব তাহাদের বুঝাইতেছেন। এমন সময়ে ডাকপিওন আসিয়া একটি রেজিস্ট্রী করা ইনসিওরড্ খাম বিলি করিয়া গেল।

খামটি খুলিয়া যোগত্রয়ানন্দ উহার ভিতরকার চিঠিটি পাঠ করেন। তারপর ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিস্পন্দ হইয়া যান। কপোল বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরিতে থাকে।

ভক্ত ও শিক্ষার্থীরা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া মহাত্মার দিকে নীরবে, নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া আছেন। এমন দৃশ্য আর কখনো, তাঁহাদের চোখের পড়ে নাই।

প্রায় পনের মিনিট কাল এইভাবে কাটিয়া যায়। অতঃপর কালীমহারাজ (অভেদানন্দ প্রশ্ন করেন, "বাবা, ব্যাপারটি কি, আমরা কেউ তা বুঝতে পারছিনে। আপনার চক্ষে অশ্রুজল তো আমরা কখনো দেখি নি। সমস্ত কিছু শোক দুঃখের অতীত আপনি। এমন কি দুর্দৈব ঘটেছে যার জন্যে আপনি এত অভিভূত হয়ে পড়েছেন। আপনার চোখে জল কেন? আর ঐ চিঠি পড়েই বা এমন স্তব্ধ হলেন কেন আপনি? আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি।"

যোগত্রয়ানন্দ এবার মুখ খুলিলেন। কহিলেন, "তোমরা আজ আমার চক্ষু থেকে যে অশ্রু ঝরতে দেখেছো তা শোকের নয়, আনন্দের।

শোক আমায় কখনো অভিভূত করতে পারে না, কাঁদাতে পারে না। আমি কেঁদেছি শ্রীভগবানের করুণার কথা মনে ক'রে। এই পত্রটা তোমরা পড়ে দেখতে পারো।"

সবাইর সম্মুখে এটি পাঠ করা হইল। লিখিয়াছেন কাশীর চৌখাম্বা মহল্লার অধিবাসী এক সম্ভ্রান্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁহার চিঠির মর্ম এইরূপ.

আগের দিন রাত্রে তিনি এক স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বাবা বিশ্বনাথ তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন—আমি উপবাসী রয়েছি, অন্নজল কিছুই গ্রহণ করি নি, শিগ্‌গীর আমার জন্য অন্নের ব্যবস্থা কর। আমার এক পরম ভক্ত উপবাসী রয়েছে, তাই আমারও কাটাতে হচ্ছে উপবাসী হয়ে। আমার প্রতি তোমার যদি বিন্দুমাত্র ভক্তিশ্রদ্ধা থাকে তবে আমার ঐ ভক্তের অন্ন গ্রহণের ব্যবস্থা ক'রে দাও। এতে তিলমাত্র বিলম্ব যেন না হয়।

শুধু তাহাই নয়, প্রভু বিশ্বনাথ কাশীধামের ঐ ভদ্রলোকটিকে উপবাসী ভক্তের নাম ঠিকানা জানাইয়া দিতেও ভুল করেন নাই—ঐ নাম ঠিকানা স্বপ্নের মধ্যেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় অক্ষরে প্রকট হইয়া উঠে এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিটি তন্দ্রাহারী যোগত্রয়-

নন্দের ঠিকানায় এই খাম পাঠান। ইহার মধ্যে রহিয়া বিস্তৃত একটি চিঠি এবং পাঁচ-শত টাকার নোট।

পত্রপ্রেরক আরও লিখিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস প্রভু বিশ্বনাথের স্বপ্নাদেশ ব্যর্থ হইবে না এবং প্রেরিত অর্থ যথাস্থানে এবং যথাসময়ে পেঁছিবে।

অতঃপর যোগত্রয়ানন্দ তাঁহার গৃহের অবস্থা সবিস্তারে বিবৃত করেন। প্রায় তিন-দিন যাবৎ তাঁহার পরিবারের সবাই উপবাসী রহিয়াছেন। তিনি খুব ভালভাবে জানেন, তাঁহার এমন বহু ভক্ত আছেন যাঁহারা এ সম্পর্কে একটু মাত্র ইঙ্গিত পাইলে তৎক্ষণাৎ সব ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কিন্তু ঘৃণাক্ষরেও একথা কাহারও নিকট তিনি প্রকাশ করেন নাই। একান্তভাবে শ্রীভগবানের উপরই তিনি নির্ভর করিয়াছেন। যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী এবং সর্ব করুণার উৎস, তিনি তো সব কিছুই দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুহূর্তে তাঁহার এ অভাব মোচন হইতে পারে। তবে কেন যোগত্রয়ানন্দ অপরের উপর নির্ভর করিতে যাইবেন।

আজ করুণাময়ের এই দিব্য লীলা দেখিয়া তিনি অভিভূত হইয়াছেন, নয়ন হইতে নামিয়া আসিয়াছে পুলকাশ্রুর ধারা।

এই কাহিনী শুনিয়া সবাই আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিলেন, শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যায় বিরতি দিয়া শুরু করিলেন শ্রীভগবানের নাম কীর্তন।

মহেন্দ্র দাস নামে এক ধনী প্রতিবেশী সেখানে ছিলেন। লোকটি শিক্ষিত, অমায়িক ও ধর্মপ্রবণ। যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গে কোনোদিনই তাঁহার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু দূর হইতে মহেন্দ্রবাবু তাঁহাকে প্রায়ই লক্ষ্য করিতেন এবং গণ্য করিতেন একজন উঁচুদরের মহাত্মারূপে।

তখন যোগত্রয়ানন্দের খুব অর্থ-সঙ্কট চলিয়াছে। প্রায়ই পাওনাদারেরা বাড়িতে তাগাদা দিতে আসে। মহেন্দ্রবাবু সেদিন নিজে যাচিয়া কহিলেন, "বাবাজী আমার কিছু নিবেদন করবার আছে, অভয় দেন তো বলি।"

"বল বাবা, কি তুমি আমায় বলতে চাও" স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন যোগত্রয়ানন্দ।

"দেখুন, আমার বাবা জীবিত থাকতে প্রায়ই বলতেন, 'ভগবান্‌কে বেঁধে রাখার কৌশল আমি জানি।' আমরা ব্যগ্র হয়ে তাঁকে ধরে বসতাম, বলতাম, 'বেশ তো, তাহলে সে কৌশলটা আমাদের শিখিয়ে দিন।' তিনি এড়িয়ে যেতেন, বলতেন, মৃত্যুর সময় বলে যাবো।"

"বলে যেতে পেরেছেন তো তিনি ?" কৌতুকভরে প্রশ্ন করেন যোগত্রয়ানন্দ।

'হ্যাঁ, তিনি তাঁর দেহান্তের আগে শোনালেন সে কৌশলের কথা। বললেন, প্রথমে, তোরা প্রচুর টাকাকড়ি রোজগার ক'রে নিবি। তা' দিয়ে গঙ্গাতীরে তৈরী করবি দেয়াল-ঘেরা বাগান। তারপর সন্ধান নিতে হবে এমন সাধুপুরুষের যিনি সাধনা আর শাস্ত্র চর্চায় সব সময় রত, যিনি সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী, যিনি লোভমোহের অতীত হয়ে ভগবৎ-ভাবে সদা বিভোর হয়ে আছেন। ভগবান্‌কে পাওয়া কঠিন, কিন্তু ভগবানের কৃপা আর অন্তরঙ্গতা পেয়েছেন এমন সাধু পাওয়া তেমন কঠিন নয়। খুঁজলে পাওয়া যায়। এমনতর সাধু ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরের ঐ বাগানে রেখে সেবা করবি। তাঁর মধ্যে দিয়ে ভগবান্‌ও বাঁধা পড়ে যাবেন।"

"বুঝতে পারছি, তোমার বাবা সত্যিকার চতুর লোক ছিলেন। ভগবানকে বাঁধবার কৌশল যে বার করে, তার চাইতে চতুর আর কে? কিন্তু আমায় একথা শোনাচ্ছ কেন, বল তো?"

"আপনাকে দর্শন করবার পর থেকে বাবার সেই কথাগুলো বার বার আমার মনে পড়ছে। আপনার সেবার অধিকার আমার কিছুটা দিন, আমি কৃতার্থ হই। আপনার ওপর ঋণের বোঝা চেপে গিয়েছে। আমি তা লাঘব করতে চাই। আপনি ঋণমুক্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে মানুষের উপকার করতে থাকুন।"

মহাপুরুষের সম্মতি নিয়া এই নূতন ভক্তটি একটা মোটা অঙ্কের ঋণ এ সময়ে পরিশোধ করিয়া দেন।

যোগত্রয়ানন্দের চিকিৎসা পদ্ধতির মূলে ছিল প্রাচীন ভারতের ভেষজবিদ্যা, অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র প্রয়োগ এবং তাঁহার যোগবিভূতি। জীবনের গোড়ার দিক হইতে রোগনিরাময়কে তিনি তাঁহার এক মহান্ ব্রতরূপে গ্রহণ করেন এবং এই ব্রতসাধনে অর্থ-উপার্জনকে কোনোদিনই গুরুত্ব দেন নাই। রোগমুক্তির পর রোগী ও তাহার পরিজনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিলেই নিজেকে তিনি কৃতার্থ বোধ করিতেন। শ্রীভগবানের করুণালীলার জন্য বার বার করিতেন কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

বালীর অন্যতম জমিদার রাজেন্দ্রবাবুর সহিত যোগত্রয়ানন্দের বেশ হৃদ্যতা ছিল। তাঁহার পরিবারের চিকিৎসায় প্রায়ই তাঁহাকে আহ্বান করা হইত। সে-বার রাজেন্দ্রবাবুর মাতার মস্তকে এক ক্ষত হয় এবং ক্রমে তাহাতে দেখা যায় নিক্রোসিস্ বা অস্থিক্ষয় রোগের আক্রমণ। বিখ্যাত সার্জন, ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারীকে আনিয়া রোগিনীকে দেখানো হয়, তিনি শলাকা ঢুকাইয়া দেখেন, ক্ষত অত্যন্ত গভীর। প্রায় মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এ অবস্থায় অস্ত্রোপচার অত্যন্ত বিপজ্জনক এই মত প্রকাশ করিয়া সার্জন চলিয়া গেলেন। রোগিনী ও তাঁহার ছেলে কান্নায় ভাঙিয়া পড়েন, এবং সেইদিন হইতে যোগত্রয়ানন্দ গ্রহণ করেন চিকিৎসার দায়িত্ব।

অথর্ববেদোক্ত কয়েকটি নিগূঢ় প্রক্রিয়া এই রোগিনীর উপর যোগত্রয়ানন্দ প্রয়োগ করিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে দেখা গেল ক্ষত প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে এবং রোগিনীর সুনিদ্রা হইতেছে। অচিরে এই রোগিনী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

সতীশ পাল শুধু যোগত্রয়ানন্দের ভক্তই নয় সে তাঁহার সমগ্র পরিবারের একজন একনিষ্ঠ সেবক। অল্প বয়সে সতীশের মনে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং বেলুড়ে থাকিয়া মঠ ও স্বামীজীদের সেবায় সে আত্মনিয়োগ করে। অতঃপর এক সময়ে মঠে বাবুরাম মহারাজ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং যোগত্রয়ানন্দ দীর্ঘদিন চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। এই সময় সাধক যোগত্রয়ানন্দের তেজোময় শক্তি ও ত্যাগপূত জীবনের প্রতি সতীশ আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার আশ্রয়েই চলিয়া আসে। সে-বার সতীশ তাঁহার নিজের বাড়িতে গিয়া মারাত্মক রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। ডাক্তারদের সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা বিফল হয় এবং বাড়ির লোক তাঁহার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দেন।

যোগত্রয়ানন্দের কাছে এ সংবাদ পৌঁছিল। সতীশ যে তাঁহার অতি প্রিয় সেবক। তাড়াতাড়ি তখনই সতীশের বাড়ি আনন্দবাগানে তিনি ছুটিয়া যান। তাঁহার

দেখিয়াই সতীশ ক্রন্দন করিয়া উঠে, বলিতে থাকে, "বাবা এবার আমি বাঁচবো না, আশীর্বাদ করুন, জন্মে জন্মে যেন আপনার সেবার অধিকার পাই।"

সতীশের অস্থিচর্মসার দেহটি দেখিয়া যোগত্রয়ানন্দ হতাশ হইয়া পড়েন। সেদিন-কার মতো কিছু ওষুধপত্র ব্যবস্থা করিয়া বাড়ির দিকে ফিরিতেছেন, সঙ্গে রহিয়াছেন এক তরুণ ভক্ত, তাঁহার দিকে তাকাইয়া শোকার্ত স্বরে যোগত্রয়ানন্দ বলিয়া উঠেন, "সতীশের যে অন্তিম অবস্থা দেখলুম রে। এখন একমাত্র ভগবান্ যদি কৃপা ক'রে বাঁচান।"

ভক্তটি দৃঢ় স্বরে উত্তর দেয়, "বাবা, এজন্য আপনি এত উতলা হয়েছেন কেন? আপনি ভগবান্‌কে একটু চেপে ধরুন, তাহলেই তো সতীশ বেঁচে যায়।"

যোগত্রয়ানন্দ সমস্তটা পথ একেবারে মৌনী হইয়া রহিলেন। বাড়িতে ফিরিয়াই প্রবেশ করিলেন ঠাকুরঘরে। দ্বার রুদ্ধ অবস্থায় প্রহরের পর প্রহর প্রার্থনা ও ধ্যান জপে কাটিয়া গেল। পূজাকক্ষ হইতে বাহিরে আসিলে দেখা গেল, বদনমণ্ডল দিব্য প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রভাতে সংবাদ নিয়া জানা গেল, সতীশের রোগ-সঙ্কট অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। তীব্র যন্ত্রণারও হইয়াছে উপশম। অতঃপর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সে সুস্থ হইয়া উঠে।

যোগত্রয়ানন্দের শাস্ত্রজ্ঞান ও যোগবিভূতির কথা শুনিয়া রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এক সময়ে তাঁহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হন। স্বয়ং তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করেন, "বাবা, আপনি লোকের কল্যাণের জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ক'রে শাস্ত্রগ্রন্থ লিখেছেন। অর্থের অভাবে অনেক সময় এই কাজে কত ব্যাঘাত হচ্ছে। আপনি অনুমতি দিলে, আমি আপনার সংসার চালানোর ভার নিতে পারি।"

যোগত্রয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "গুরুর আদেশে শাস্ত্রতত্ত্ব প্রচারে আমি ব্রতী। বেশ, যতদিন গ্রন্থ ছাপানোর কাজ চলবে ততদিন আপনার প্রস্তাবিত অর্থ আমি নেব। কিন্তু এটা গণ্য হবে আমার ঋণ রূপে। গ্রন্থ ছাপানো হবার পর বিক্রির টাকা থেকে এই ঋণ পরিশোধ করা হবে।"

কালীকৃষ্ণ এ কথায় রাজী হন এবং তাঁহার প্রদত্ত টাকায় কোনোমতে প্রতিমাসে মহাত্মার সংসার ব্যয় নির্বাহ হইতে থাকে।

কিছুদিন পরের কথা। যোগত্রয়ানন্দ নিজ গৃহে নিভৃতে বসিয়া ধ্যান-জপ করিতেছেন, হঠাৎ এক সময়ে মানসপটে ভাসিয়া উঠে এক দুর্ঘটনার দৃশ্য। দেখেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর নিজের ঠাকুরঘরে সহসা পা ফস্‌কাইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। উঠিয়া দাঁড়ানোর সামর্থ্য নাই। 'আহা। আহা।' বলিয়া যোগত্রয়ানন্দ আর্তস্বরে চেঁচাইয়া উঠেন। নয়ন দুটি করুণায় অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

কিছুক্ষণ পরে ধ্যানকক্ষ হইতে বাহির হইতেই দেখিলেন, ঠাকুর বাড়ির এক কর্ম-চারী গাড়ি নিয়া আসিয়াছে কর্তা বড় অসুস্থ। এখনই একবার বাবার সেখানে যাওয়া আবশ্যক।

সেখানে উপস্থিত হইয়া যোগত্রয়ানন্দ দেখেন, কালীকৃষ্ণের পা হঠাৎ জখম হইয়াছে তাহা নয়, ব্যাপার আরও গুরুতর। আকস্মিক ভাবে পক্ষাঘাতের আক্রমণ ঘটে তাঁহার

দুই পায়ে, ফলে তিনি ভূতলে পড়িয়া আহত হন। এই পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য করা বড় সহজসাধ্য নয়।

কালীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া অসহায়ের মতো কাঁদিয়া ফেলেন। যোগত্রয়ানন্দ সস্নেহে তাঁহার পিঠে কল্যাণময় হস্তটি বুলাইয়া দেন, আশ্বাস দিয়া বলে, "ভয় কি ? ভালো হয়ে যাবেন। শ্রীভগবান্ নিশ্চয় কৃপা করবেন।"

মহাপুরুষের মঙ্গল হস্তের স্পর্শে তখনি এক বিস্ময়কর কান্ড ঘটিয়া গেল। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, কালীকৃষ্ণের পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত আর নাই। ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর দিয়া তিনি দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। এবারও যোগত্রয়ানন্দের কৃপায় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পরিবারের এক মর্মান্তিক দুর্দৈব এড়াইতে সক্ষম হয়।

ঠাকুরের এক ভাইঝির হাতে নিক্রোসিস্ বা অস্থিক্ষয় রোগ দেখা দেয়। প্রবীণ শল্য চিকিৎসক ডাঃ মাউয়াটি রোগিনীর ভার নিয়াছেন। ইতিমধ্যে কয়েকবার অস্ত্রো-পচারও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রোগ সারে নাই। কেবলই চলিয়াছে বৃদ্ধির পথে। অবশেষে অভিজ্ঞ সার্জন বলিয়া দিলেন, কনুইয়ের নিচেকার অংশ কাটিয়া বাদ দিতে হইবে, নতুবা রোগিনীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হইবে না।

কালীকৃষ্ণ বড় ঘাবড়াইয়া যান, তৎক্ষণাৎ গাড়ি পাঠাইয়া যোগত্রয়ানন্দকে বাড়িতে নিয়া আসেন। কাতর স্বরে বলেন, "বিজ্ঞ সার্জনের বিদ্যা বুদ্ধি সব হার মেনেছে। এবার আপনি কৃপা ক'রে এ মেয়েটিকে বাঁচান।"

যোগত্রয়ানন্দ কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে রোগিনীকে পরীক্ষা করেন, তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, "ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি বলছি, দুশ্চিকিৎস্য হলেও এ রোগ অচিরে আরোগ্য করা যাবে। দু সপ্তাহের বেশী সময় লাগবে না।'

কার্যকালে তাহাই ঘটিতে দেখা যায়। প্রাচীন আয়ুর্বেদোক্ত ভেষজের গুণে প্রাণ-ঘাতী অস্থিক্ষয় নিবারিত হয়।

অতঃপর ঠাকুর ভবনের চিকিৎসার সব কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত হইল যোগত্রয়ানন্দের উপর। এইসব চিকিৎসার পারিশ্রমিক বাবদ বহু টাকা তাঁহার পাওনা হয়। কালী-কৃষ্ণ ঠাকুর ভাবিতেছিলেন, এই বাবদ একটা মোটা টাকা একসঙ্গে তাঁহাকে দিয়া দিবেন। কিন্তু যোগত্রয়ানন্দ তাহাতে বাধ সাধিলেন। তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "গ্রন্থ ছাপানোর সময় আপনি প্রতি মাসে আমার সংসারের ব্যয়ের জন্য টাকা দিয়েছেন। সে টাকা আমি ঋণ বলেই এতকাল গণ্য ক'রে আসছি। চিকিৎসার খাতে আমার যে টাকা পাওনা হয়েছে, তা থেকে পূর্বেকার ঐ ঋণ শোধ হয়ে যাক্।

এই ব্যবস্থাই কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে সেদিন মানিয়া নিতে হইল।

ঠাকুরবাড়ির উপর যোগত্রয়ানন্দের কৃপা দীর্ঘদিন ছিল। সেবার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের দৌহিত্রীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে। বিবাহের দিন সারা আকাশ জুড়িয়া মেঘের ঘনঘটা দেখা গেল। সকলেই মহা চিন্তিত, ঝড়-জল বেশী হইলে চরম অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। কালীকৃষ্ণের নাতনী বিবাহের কনে, আতঙ্কিত হইয়া বলে, "দাদু, সব যে লন্ডভন্ড হয়ে যাবে, এখন উপায় ?"

কালীকৃষ্ণ চিন্তিত হইয়া কহিলেন, "তাই তো, এ যে মহাবিপদ দেখছি। এখনই

বাবাজীই এ বিপদে রক্ষা করিতে পারেন। তিনি পাশের ঘরেই বসে আছেন। তোকে তো খুব স্নেহ করেন, তুই তাঁকে চেপে ধর না।"

কালীকৃষ্ণের নাতনী আবদারের সুরে যোগত্রয়ানন্দকে বলিতে থাকে, "আজকের ঝড়-বাদল থামাতেই হবে, নইলে বাবাজী, আপনার মাহাত্ম্য বুঝা যাবে না।"

যোগত্রয়ানন্দ হাসিয়া কহিলেন, "ঝড় বৃষ্টিও চলবে, তোমার বিয়েতে কোনো বাধা হবে না, এই ব্যবস্থাই বরং ভালো।"

নীরবে বারান্দায় বসিয়া দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যোগত্রয়ানন্দ মৃদুস্বরে কতকগুলি মন্ত্র পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইল প্রবল বর্ষণ। এই বর্ষণের শেষে আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া গেল। তারপর সে রাত্রে আর বৃষ্টি হয় নাই, বিবাহসভার কোনো ক্ষতিও সাধিত হয় নাই।

প্রাচীন আয়ুর্বেদ অথর্ববেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী যোগত্রয়ানন্দ যেমন চিকিৎসা করিতেন, তেমনি অতি আধুনিক ডাক্তারী বিদ্যায়ও তাঁহার ব্যুৎপত্তি কম ছিল না। ইংরেজীতে রচিত দেহতত্ত্ব ও চিকিৎসা সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ এক সময়ে তিনি অধ্যয়ন করেন। এগুলি আয়ত্তও করেন আপন সহজাত মেধা ও প্রতিভার বলে। প্রয়োজনবোধে কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে তাঁহাকে অভিজ্ঞ ইউরোপীয় ডাক্তারদের পদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেখা যাইত এবং আধুনিকতম চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া প্রবীণ ডাক্তারেরাও বিস্মিত হইতেন।

কাশীপুরে থাকা কালে একটি জ্বরের রোগী তাঁহার হাতে আসে। স্থানীয় এক বিজ্ঞ ডাক্তার রোগীটিকে দেখাশুনা করিতেছেন। জ্বর বড় অদ্ভুত ধরনের, কোনোমতেই ইহার গতি-প্রকৃতি সঠিকভাবে বুঝা যাইতেছে না। রোগীর অবস্থা ক্রমে সংকটাপন্ন হইয়া পড়ে।

যোগত্রয়ানন্দ রোগ নির্ণয় করেন, সহযোগী ডাক্তারকে বলেন, "আসলে এ রোগটি হচ্ছে বিলিয়াস নিমোনিয়া। লিভারকে আরো বেশী সক্রিয় না করতে পারলে রোগীকে বাঁচানো যাবে না।"

অতঃপর রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা তিনি করিলেন।

সহযোগী ডাক্তারটি অভিজ্ঞ ও প্রবীণ। তিনি মন্তব্য করিলেন, "ইউরোপে এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি বার করা হয়েছে বলে শুনেছি। ভারতবর্ষে অনেক ডাক্তারের কাছে তা অজ্ঞাত।"

সেদিন ঠাকুরঘর হইতে যোগত্রয়ানন্দ বাহিরে আসিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার পায়ে আসিয়া ঠেকিল একটি পুরাতন কাগজের ঠোঙা। হাতে তুলিতেই দেখিলেন, ইউরোপীয় গবেষক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের রচিত কতকগুলি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন উহাতে দেওয়া রহিয়াছে। এই বিজ্ঞাপন-তালিকা হইতে একটি গ্রন্থ বাছিয়া নিয়া তখনি ভক্ত সতীশকে কলিকাতায় পাঠাইলেন। নির্দেশ দিলেন, যে কোনো মূল্যে এটি যেন সংগ্রহ করা হয়।

ঐ ডাক্তারী গ্রন্থটি কিনিয়া আনা হইল, গভীর রাত অবধি যোগত্রয়ানন্দ উহা পাঠ করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসা ঠিক পথেই চলিয়াছে। পরের দিনই রোগীর জ্বর ছাড়িয়া গেল, বাড়ির সবাই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ এবার সহযোগী প্রবীণ ডাক্তারটিকে ডাকিয়া নূতন কিনিয়া-আনা ইউরোপীয় চিকিৎসা-নির্দেশ দেখাইয়া দিলেন।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, "আপনি যত কিছুই বলুন না কেন, আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির যত বই-ই দেখান না কেন, আমি বলবো, আপনার যোগশক্তিই এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনাকে পথ দেখিয়েছে, সঠিক রোগনির্ণয়ের দিকে টেনে এনেছে।

একবার এক পশ্চিম দেশীয় সাধু শহরে আসিয়া উপস্থিত হন। লোক পরম্পরায় যোগত্রয়ানন্দের কথা তাঁহার কানে যায় এবং তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

সাধুকে যথেষ্ট সমাদর করা হইল এবং উভয়ের মধ্যে নানা ধর্ম-প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলিল। এবার যোগত্রয়ানন্দ মৃদুস্বরে কহিলেন, "মহারাজ, বেলা হয়ে গিয়েছে, আমার একান্ত ইচ্ছে আপনি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমার কয়েকটি ভক্ত নিকটেই এক বাড়িতে বসবাস করেন। চলুন, সেখানে আপনার আহার ও বাস-স্থানের ব্যবস্থা করা যাবে।"

সাধুটি গর্বিতভাবে বলিলেন, "আমি তো কোনো গৃহীর আতিথ্য গ্রহণ করিনে। লোকালয়ের বাইরে গিয়ে কোনো একটা জায়গা দেখে নেবো। এজন্য ভাবনার প্রয়োজন নেই।"

"প্রয়োজন আছে বলেই তো ভাবছি মহারাজ। শুধু ভাবছিনে, দুর্ভাবনায়ই পড়েছি আপনাকে নিয়ে।'— সবিনয়ে নিবেদন করেন যোগত্রয়ানন্দ।

"তার মানে? ওসব অবান্তর কথা রাখুন। আমার ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না।" বলিয়া সাধুটি বাড়ির বাহিরে আসিলেন, রাস্তা দিয়া আপন মনে চলা শুরু করিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ তাঁহার পিছনে পিছনে চলিয়াছেন, আর বার বার জানাইতেছেন অনুরোধ। অবশেষে দৃঢ়স্বরে কহিলেন, 'মহারাজ, আপনি অবুঝের মতো ব্যবহার করছেন। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা মারাত্মক ব্যাধি আপনার দেহে প্রবেশ করেছে। এখন কিছুকাল আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। সুচিকিৎসার ব্যবস্থা তো করতেই হবে।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সাধু পূর্ববৎ পথ চলিতে থাকেন। অগত্যা যোগত্রয়ানন্দকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।

কিন্তু দেখা গেল, রাস্তার মোড় পার না হইতেই সাধুটি প্রবল জ্বরের ঘোরে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। যোগত্রয়ানন্দ তখনি আবার ছুটিয়া যান। ধরাধরি করিয়া সাধুটিকে পূর্বকথিত বাড়িতে নিয়া তোলা হয়। যোগত্রয়ানন্দের ব্যবস্থামত অনুরাগী ভক্ত-সেবকেরা গ্রহণ করেন তাঁহার সেবার ভার।

রোগীর জ্বরটি বড় মারাত্মক ধরনের। যোগত্রয়ানন্দ রোজই তাঁহাকে দেখিতে যান, ঔষধপত্রাদি দিয়া আসেন। সেদিন খাওয়ার ঔষধের সঙ্গে বুকে-পিঠে মালিশ করার জন্যও একশিশি ঔষধ পাঠানো হইয়াছে। পূজার ঘরে ঢুকিয়া যোগত্রয়ানন্দ জপে বসিতে যাইবেন, এমন সময় শুনিলেন এক দৈবী আওয়াজ। কে যেন বলিতেছে,

শিগ্‌গীর পীড়িত সাধুটিকে দেখে এসো। শুশ্রূষাকারী ভুল ক'রে তাকে মালিশের ওষুধ খাওয়াতে যাচ্ছে। খাওয়ানোর পরেই বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।"

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যোগত্রয়ানন্দ ত্রস্তপদে সাধুর কাছে গিয়া উপস্থিত হন। সেবক ভক্তটির হাত হইতে ওষুধের গ্লাসটি সাধু নিতে যাইবেন এমন সময় যোগত্রয়ানন্দ উহা কাড়িয়া নিলেন। গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এটা খাবার ওষুধ নয়, মালিশ।"

এ কথা শুনিয়াই সাধুর মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া যায়। সক্রোধে মালিশ এবং খাবার ওষুধ সব কিছুই তিনি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলেন।

যোগত্রয়ানন্দ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন, "অনর্থক আপনি রাগ করছেন। ভুল ক'রে আপনাকে মালিশ খেতে দেওয়া হচ্ছে, ঠাকুর একথা আমায় জানিয়ে দিলেন। তাই তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলাম। আর একটু দেরি হলেই আপনাকে আর বাঁচানো যেতো না।"

এবার সাধুর চৈতন্যোদয় হইল। অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন, "নিজের অভিমান বশতঃ মহাত্মাকে আমি চিনতে পারি নি। আপনি আমার জীবনদাতা। আমায় ক্ষমা করুন, কৃপা করুন।"

প্রায় তিন সপ্তাহ মারাত্মক জ্বরে ভুগিবার পর ঐ সাধুটি সুস্থ হইয়া উঠেন, তারপর নিজের দেশে ফিরিয়া যান।

আশ্রিত ভক্ত-শিষ্যদের মধ্যে যাহারা প্রকৃত অধিকারী তাঁহাদের অনেকে যোগত্রয়ানন্দের যোগবিভূতি ও অলৌকিক শক্তির সহিত পরিচিত ছিলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষের এই শক্তির প্রকাশ ঘটিত নানা ভঙ্গীতে এবং নানা মাধ্যমের ভিতর দিয়া।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পত্নী যোগত্রয়ানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত। ব্যবহারিক জীবন এবং সাধনময় জীবনের অনেক কিছু সমস্যায় এই শক্তিধর মহাত্মার কৃপার উপর তাঁহারা নির্ভর করিতেন।

গোপালবাবু বিচার বিভাগের একজন অফিসার। সে-বার তিনি বদলী হইয়া নূতন চাকুরিস্থল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ শহরে আসিয়াছেন। খড়ের চালযুক্ত একটি বাংলো বাড়িতে তাঁহারা বাস করিতেছেন। একদিন গভীর রাতে কি এক অজ্ঞাত কারণে চালে আগুন লাগিয়া যায় এবং অল্পকাল মধ্যে বাড়ির চারিদিকে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। হঠাৎ এক দৈবী কণ্ঠস্বর শুনিয়া গোপালবাবু ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠেন। দেখেন, লেলিহান আগুনের শিখা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। তখনি পত্নীকে জাগাইয়া তুলিলেন। ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র উভয়ে মিলিয়া উঠানে স্থানান্তরিত করার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত ছাদটি নিচে ধসিয়া পড়িল। আর একটু বিলম্ব হইলে দুজনেই এই অগ্নিদাহে দগ্ধ হইতেন।

গোপালবাবুর পত্নী সবিস্ময়ে দেখিলেন, জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর মূর্তিতে যোগত্রয়ানন্দ ঐ জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার প্রশান্ত কৃপাদৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে আশ্রিত ভক্ত দম্পতির উপর।

সাশ্রুনয়নে এই ভক্তিমতী মহিলা তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন, 'সূক্ষ্মদেহে

আবির্ভূত হয়ে স্বয়ং বাবাই আজ আমাদের দু'জনের প্রাণ রক্ষা করলেন। তাঁকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয় নি।"

১৯০৬ সাল। যোগত্রয়ানন্দ স্থির করিলেন, এবার তিনি কাশীতে বাস করিবেন, প্রভু বিশ্বনাথের পাদপদ্মে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া শুরু করিবেন অধ্যাত্ম জীবনের নূতন পর্যায়। স্বজনবর্গ এবং দুই চারিটি সেবক-ভক্ত সঙ্গে নিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত শিবধামে।

অধ্যাত্ম জগতে সুপরিচিত, উৎসব সম্পাদক অধ্যাপক রামদয়াল মজুমদার এ সময় অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীতে বাস করিতেছেন। শক্তিধর মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দের আগমনে তিনি মহা পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

প্রত্যূষে উঠিয়া যোগত্রয়ানন্দ গঙ্গাস্নান করিতেন, তারপর রুদ্ধ কক্ষে দীর্ঘসময় কাটাইতেন যোগসাধনার ও নিত্যকার পূজা ও জপতপে। বিশ্বনাথ দর্শন, গঙ্গাভ্রমণ ও নাম কীর্তনও ছিল তাঁহার প্রাত্যহিক দিনচর্যার অঙ্গ।

রামদয়াল মজুমদার প্রায়ই গঙ্গাভ্রমণের সময় যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গী হইতেন। মহাত্মার পুণ্যসঙ্গ ও অমৃতময় বচনসুধা পান করিয়া মন তাঁহার দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিত। উত্তরকালে কথাপ্রসঙ্গে মজুমদার মহাশয় যোগত্রয়ানন্দের মহনীয় চরিত্র ও অন্তরঙ্গ আচরণের নানা কাহিনী বর্ণনা করিতেন।

তখন শীতকাল। একদিন বিকালে তিনি যোগত্রয়ানন্দের সঙ্গী হইয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়াছেন। পথের পাশে একটি ভিখারী ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে আসতেই কাতরকণ্ঠে সে সামান্য কিছু ভিক্ষা চায়। যোগত্রয়ানন্দ করুণ নেত্রে তাঁহার অর্ধনগ্ন বেশের দিকে তাকাইয়া নিজের কাঁধের পশমী আলোয়ানটি তাহাকে দিয়া দিলেন। সম্প্রতি এক ধনী ভক্ত এই মূল্যবান বস্তুটি মহাত্মাকে উপহার দিয়াছিলেন।

রামদয়ালবাবু মন্তব্য করেন, "এই দামী আলোয়ানটি না দিয়ে ওকে বাজার থেকে আর একটা গায়ের চাদর কিনে দিলেই হতো।"

স্মিতহাস্যে মহাপুরুষ কহিলেন, "ভগবান্ যদি দামী শীতবস্ত্র আমায় পরাতেই চান তবে তা নিজেই কৃপা করে পাঠিয়ে দেবেন। এ নিয়ে ভাবনার কি আছে?"

সেইদিনই গঙ্গাভ্রমণ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিলে, কনিষ্ঠভ্রাতা যোগত্রয়ানন্দের হাতে একটি পার্শেল দিয়া কহিলেন, "দাদা, এটি কলকাতা থেকে এসেছে।"

পার্শেলটি খুলিয়া দেখা গেল, এক ভক্ত শীতে ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে একটি মূল্যবান পশমী শাল পাঠাইয়াছেন। রামদয়াল বিস্ময়ে মহাত্মার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যোগত্রয়ানন্দের রচিত আর্যশাস্ত্র প্রদীপের খ্যাতি তখন সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহু শিক্ষিত এবং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এই মহান্ গ্রন্থের রচয়িতার সহিত পরিচিত হইতে আসিতেন। তত্ত্ব ও সাধনপ্রণালী সম্পর্কে তাঁহারা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ তখন তরুণ ছাত্র।

আর্যশাস্ত্র প্রদীপকাবেব প্রতিভা তাঁহাকে মুগ্ধ কবিযাছে, তাই তাঁহাকে একবাব দর্শন কবিতে ব্যগ্র হইযাছেন। যোগাযোগ অচিবে ঘটিযা গেল, কাশীতে একদিন যোগত্রযানন্দেব গৃহে গিযা তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন কবিলেন।

মহাত্মা তাঁহাকে স্নেহাশিস্ জানাইলেন, স্নিগ্ধ স্ববে কহিলেন, "বাবা, তোমাব কোনো সংশয বা প্রশ্ন যদি থাকে বল।"

তবুণ বিদ্যার্থী গোপীনাথ একটি সুন্দব প্রশ্ন—যাহা বহু জিজ্ঞাসু সাধকেব প্রশ্ন—উত্থাপিত কবিলেন। কহিলেন, "বাবা, গুবুজনদেব মুখে শুনেছি, সত্য এক ও অখন্ড। মুনি ঋষিবা যদি সত্যেব সাক্ষাৎকাব ক'বে থাকেন তবে তাঁদেব মধ্যে মত বৈষম্য হয কেন? নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ একথাব অর্থ কি? নানা মুনিব নানা মত কেন হবে? ব্রহ্মবিদ্ মুনিবা কি একমত হতে পাবে না? এব তাৎপর্য আমাব বুঝিয়ে বলুন। এ তাৎপর্য বুঝতে পাবলে সাধাবণ জিজ্ঞাসুবা উপকৃত হবে। নানা পথ ও মতবৈষম্যেব মধ্যে পড়ে তাদেব বিভ্রান্ত হতে হবে না।"

এই প্রশ্নেব এক অপবূপ মীমাংসা যোগত্রযানন্দ কবিযা দিলেন। মহামহোপাধ্যায গোপীনাথ কবিবাজেব ভাষাতেই এখানে উহা বর্ণিত হইতেছে। "বাবাজী কহিলেন, বৎস, তোমাব প্রশ্নেব অঙ্গীভূত বাক্যেব মধ্যেই উহাব সমাধান বহিযাছে। মুনি কাহাকে বলে? যিনি মননশীল তিনিই মুনি পদবাচ্য। মত কাহাকে বলে? মনেব দ্বাবা যাহা অঙ্গীকৃত হয অর্থাৎ অখন্ড সত্যেব যে অংশটুকু খন্ড মনেব দ্বাবা গৃহীত হয তাহাই মত। যতক্ষণ পর্যন্ত মনকে অবলম্বন কবিযা সত্যেব সাক্ষাৎকাবেব চেষ্টা কবা যাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত অখন্ড সত্যেব দর্শন লাভ সুদূবপবাহত। অখন্ড সত্যেব ধাবণা কবিতে হইলে মনকে নিবুদ্ধ কবিযা এবং শুধু মনকে নয অন্তঃকবণেব যাবতীয বৃত্তিকেই নিযন্ত্রিত কবিযা অন্তঃকবণেব বাহিবে যাইতে হইবে। অন্তঃকবণেব পৃষ্ঠভূমিতেই আত্মাব স্বযংপ্রকাশ আলোক অবস্থিত। বিকল্প শক্তিব দ্বাবা মন ঐ আলোককে ভাগ কবিযা পৃথক পৃথক ভাববূপে পবিণত কবে। মনেব ইহা দোষ নহে, ইহাই মনেব স্বভাব।

"বিকল্পশূন্য পবম সত্যকে পাইতে হইলে মনেব উর্ধ্বে উত্থিত হইতে হইবে। এই অবস্থায মতামতেব কোনো প্রশ্নই উঠে না। কাবণ মনই যেখানে নাই সেখানে মত কোথায? কিন্তু ঐ সত্যেব প্রকৃত চিত্র অজ্ঞানীকে প্রদর্শন কবানো যায না, কাবণ উহাব সংক্রমণ হয না। যাহাব চিত্ত ঐ স্বযংপ্রকাশ ভূমিতে প্রবিষ্ট হইবে তাহাব নিকট উহা আপনিই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু অজ্ঞান জগতেব জ্ঞানলাভেব কোনো উপায উহা হইতে হয না। ঐ অবস্থা যাহাব হয, শুধু তাহাবই হয। ঐ জ্ঞান অজ্ঞানী পবন্তু অনুবাগী ও আশ্রিত জিজ্ঞাসুজনকে দিতে হইলে মনেব আশ্রয গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। মনেব ধর্মই কল্পনা বিকল্প বৃত্তি। ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে বিকল্পেব সঙ্গে যুক্ত কবিযা জিজ্ঞাসুব নিকট উপস্থাপিত কবা হয। বিকল্প নানা প্রকাব। জিজ্ঞাসুব চিত্তেব প্রকৃতি, বাসনা ও অনুভব প্রভৃতি বিচাব কবিযা তত্ত্বজ্ঞ গুবু তদবূপভাবে শব্দেব সাহায্যে তাঁহাকে ঐ জ্ঞান দান কবেন।

"এইখানেই মনেব সার্থকতা। এখান হইতেই মতেব উদ্ভব হয। যিনি পূর্ণ সত্যকে মনেব দ্বাবা ধাবণা কবিতে যান তাঁহাব তো মত থাকিবেই, কিন্তু যিনি মনকে ত্যাগ কবিযা পূর্ণ সত্যকে গ্রহণ কবিতে সমর্থ হইযাছেন তাঁহাবও মত থাকে। তখন

তিনি মনোভূমিতে বিদ্যমান, বিশিষ্ট অধিকার সম্পন্ন জিজ্ঞাসুর নিকট ঐ জ্ঞান সঞ্চার করেন। এই জন্যই উভয় জ্ঞানীতে স্বরূপতঃ পার্থক্য না থাকিলেও অধিকার ভেদে তাঁহাদের উপদেশের মধ্যে পার্থক্য আসিয়া পড়ে। এই জন্যই বলা হইয়াছে নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

"ইহাই মুনিদের মতভেদের রহস্য। সাধারণ লোকের অর্থাৎ অজ্ঞ লোকের মতভেদ এই প্রকার নহে। কারণ মুনিদের মতভেদ সত্ত্বেও মূলে আছে জ্ঞান কেবল অন্যের উপদেশের জন্য বিকল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়। সাধারণ লোকের মতভেদের মূল অজ্ঞান।"

প্রশান্ত বদনে সৌম্যভাবে বাবাজী এই দুরূহ প্রশ্নটিকে সরল ও সহজবোধ্য করিয়া দিলেন। প্রজ্ঞা ও করুণার প্রতিমূর্তি এই মহাসাধকের চরণধূলি নিয়া তরুণ জিজ্ঞাসু হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন।

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন তখন কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পুত্র বৃন্দাবন এসময়ে এক মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হয়, ক্রমে তাহার অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়া পড়ে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিয়াছেন, কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। এবার দৈব কৃপা ছাড়া গতি নাই।

তর্করত্ন মহাশয় স্থির করিলেন, বৃন্দাবনকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা তিনি এবার করিবেন, যোগত্রয়ানন্দজীর কাছে মাগিবেন তাহার জীবনভিক্ষা।

গোপীনাথ কবিরাজ তর্করত্ন মহাশয়ের অতিশয় স্নেহের পাত্র আবার যোগত্রয়ানন্দ বাবার সঙ্গেও গোপীনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তাই তর্করত্ন মহাশয় সেদিন ভোরবেলায় লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। কহিলেন, "গত রাতে বৃন্দাবনের অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে। আর বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই বাবাজীর এবার শরণ নিতে যাচ্ছি। তুমি আমায় এখনি সেখানে নিয়ে চল।"

গোপীনাথ জানেন, বাবাজী সকালবেলায় দীর্ঘ সময় রুদ্ধদ্বার কক্ষে একান্তে সাধনভজন করেন। কোনো বাহিরের লোকের সঙ্গে তখন দেখাশুনা করেন না। অন্তরঙ্গ সেবকেরাও এসময়ে তাঁহার ঘরে ঢুকিতে সাহস পায় না। কাজেই এখন তর্করত্ন মহাশয়কে নিয়া সেখানে গেলে, হয়তো বাবাজীর কাছে তাঁহার আগমন সংবাদ পৌঁছিবেই না, সাক্ষাৎও হইবে না।

তর্করত্নমহাশয়কে কহিলেন, "বাবাজী অপরাহ্নেই দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখাশুনা করেন, তাই ঐ সময়টাই তাঁর কাছে যাওয়া প্রশস্ত সময়।

তর্করত্নমহাশয় অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শয্যাশায়ী বৃন্দাবনকে দেখাইয়া দিলেন দীর্ঘদিন ভুগিয়া ভুগিয়া সে কংকালসার হইয়াছে, পড়িয়া আছে মৃতের মতো অসাড় হইয়া। শিয়রে বসিয়া তাহার জননী অসহায়ভাবে কাঁদিতেছেন।

গোপীনাথ বুঝিলেন, বৃন্দাবনের জীবনের কোনো আশাই নাই। তর্করত্নমহাশয়

১ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ—যোগত্রয়ানন্দজী · ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "না গোপীনাথ, আর সময় ক্ষেপণ করা যায় না। চল, এখনি গিয়ে বাবাজীর কাছে আমার প্রার্থনা নিবেদন করি।'

যোগত্রয়ানন্দ তখন কাশীর রাজঘাটে বাস করিতেছেন। উভয়ে তাঁহার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইতেই, বাবাজীর প্রিয় সেবক সতীশ কহিল, "এই যে আপনারা এসে গেছেন দেখ্‌ছি। বাবা একটু আগেই আমায় ডেকে বললেন, 'গোপীনাথ আর তর্করত্নমশাই এখনই এখানে আসবেন। বৃন্দাবনের শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। দেখো, ওরা যেন ফিরে না যান। তুমি নিচে গিয়ে অপেক্ষা করবে এবং ওরা এলেই আমার ঘরে নিয়ে আসবে। আমি ওদের জন্য প্রতীক্ষা করবো আর একলাটিই থাক্‌বো। যদিও এসময়ে আমি কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনে, তবুও ওদের সঙ্গে করতেই হবে। কেউ যেন ওদের বাধা না দেয়।"

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীর কৃপার কথা ভাবিয়া তর্করত্ন মহাশয়ের দুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

বাবাজীর সহিত তখনি উভয়ে সাক্ষাৎ করিলেন। তর্করত্নমহাশয় মহাত্মার প্রশস্তি-সূচক এবং ভক্তি-অর্ঘ্য স্বরূপ কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া আনিয়াছিলেন, উহা পাঠ করিয়া ও প্রণাম নিবেদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

যোগত্রয়ানন্দ স্নেহপূর্ণ স্বরে তর্করত্নকে কহিলেন, "গত রাতে ধ্যানাসনে বসবার পরই দেখতে পেলাম বৃন্দাবনের অবস্থা সংকটজনক, আর আপনি চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন। আপনারা আসবেন, তাও জানতে পারলাম। তাই সতীশকে বলে রেখেছি, আপনাদের যেন ফিরিয়ে দেওয়া না হয়।"

তর্করত্নমহাশয় পুত্রের রোগমুক্তির জন্য বাবাজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন, আর তিনি যে কৃপাভরে তাহার জন্য এতটা চিন্তা করিয়াছেন সেজন্য বার বার জানান কৃতজ্ঞতা।

কথাপ্রসঙ্গে তর্করত্নমহাশয় প্রশ্ন করেন, "বাবা, এসব কি আপনার যোগশক্তির ব্যাপার?"

যোগত্রয়ানন্দ স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "যোগশক্তি ছাড়া আর কি! হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হলে স্বভাবতঃ এই রকমই ঘটে থাকে। তখন দূরকেও নিকটে দেখা যায় এবং ভবিষ্যৎকেও বর্তমান-স্বরূপে জানা যায়।"

কিছুকাল মৌনী থাকিয়া আবার বলিলেন, "আপনি বৃন্দাবনের জন্য আর চিন্তা করবেন না। যখন সে আমার দৃষ্টিতে পড়েছে তখন সে অবশ্যই ভাল হয়ে যাবে। আপনারা বাড়ি ফিরে গেলেই দেখতে পাবেন—তার অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে।"

বাবাজীর এই অহেতুক করুণায় তর্করত্নমহাশয় একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। ছলছল নেত্রে বাবাজীকে প্রণাম করিয়া তিনি ঘরে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর বৃন্দাবনের অবস্থার দ্রুত উন্নতি দেখা গেল এবং অনতিবিলম্বে সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

যোগত্রয়ানন্দ প্রায়ই ভক্ত এবং দর্শনার্থীদের বলিতেন, "সাধন-জীবনের উন্নতি সাধন করতে হলে চাই আন্তরিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় না হলে শুধু যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এ পথে এগোনো যায় না।"

আরও বলিতেন, "দ্যাখো, বিশ্বাসের বলে সবই হতে পারে। যা লৌকিক দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়, বিশ্বাসের বলে তাও অনায়াসে সংঘটিত হতে পারে। কিভাবে, কোন্ শক্তির দ্বারা কোন্ কাজ সাধিত হয়, তা মানুষ বুঝে উঠতে পারে না।'

কলিকাতার এক ইন্‌জিনিয়ার ভদ্রলোকের মাতা যোগত্রয়ানন্দের খুব ভক্ত ছিলেন, বাবার যে কোনো কথার উপর তাঁহার অটুট আস্থা ছিল। এই বৃদ্ধা মহিলা তখন হৃদ্‌রোগে খুব ভুগিতেছেন। ডাক্তারদের মতে, যে কোনো সময়ে এই পীড়া আরো বাড়িতে পারে এবং তাঁহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। তাঁহার পক্ষে বেশী নড়াচড়া করা ভাল নয়, এ সতর্কবাণীও তাঁহারা উচ্চারণ করিয়াছেন।

বৃদ্ধা মহিলা একদিন করজোড়ে যোগত্রয়ানন্দকে কহিলেন, "বাবা, আমার এই অবস্থা। বাইরে কোথাও যাওয়া ডাক্তারদের নিষেধ। কিন্তু প্রাণে বড় ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর আগে কয়েকটা তীর্থ দর্শন করবো। এ ইচ্ছা পূর্ণ হয়, যদি আপনি আমায় কৃপা করেন। আরো একটা ইচ্ছে আছে, কাশীতে যেন আমার দেহান্ত হয়।"

বাবা সহাস্যে কহিলেন, "বেশ, আপনার দুটো আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হবে। কাশীপ্রাপ্তি আপনার অবশ্যই ঘটবে। আর আপনাকে তীর্থ দর্শনও করাবো। আপনার কোনো ভয় নেই। কিন্তু আমি অনুমতি দেবো, একটা সর্তে।"

"বলুন বাবা, আমি তা মেনে নিতে রাজী।"

"আমি যে যে স্থানে যেতে নির্দেশ দেবো, যে যে দৃশ্য দেখতে বলবো, তা-ই আপনি করবেন। অতিরিক্ত কোথাও যাবেন না, বা দেখবেন না। আমার কথামতো চললে আপনার জীবনহানির কোনো আশংকা নেই। অন্যথায় বিপদ হবে।

বৃদ্ধার ধর্মবিশ্বাসের আঁট ছিল, বাবাজীর প্রতিও ছিল অবিচল নিষ্ঠা। অনুমতি পাইয়া কয়েকটি তীর্থ দর্শন তিনি সমাপ্ত করিলেন। কিন্তু হঠাৎ ঝোঁকের বশে তিনি এক মস্ত ভুল করিয়া বসিলেন। যোগত্রয়ানন্দের নির্দেশ ছিল, গির্ণার পাহাড়ে বৃদ্ধা যাইবেন না। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে বাবার কথা বিস্মৃত হইয়া তিনি পাহাড়ে উঠিয়া গেলেন। তারপর শুরু হইল হৃৎপিণ্ডে তীব্র যন্ত্রণা ও স্পন্দন।

সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, পা দুটি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা আকুল কণ্ঠে বাবাকে ডাকিতে লাগিলেন। কহিলেন, "বাবা, তোমার কথা না শুনে কি অন্যায়ই না আমি করেছি। যা হোক্ তুমি কৃপাময়, কৃপাই তোমার স্বভাবগত ধর্ম। এবারটি আমায় বাঁচাও। তাছাড়া, বাবা, তুমি তো বলেছো, কাশীতে আমার মৃত্যু হবে, এখন এই গির্ণার পাহাড়ে, বিদেশ-বিভূঁই-এ মৃত্যু হলে যে তোমারই দুর্নাম হবে। দয়া করে আমায় রক্ষা করো।"

বৃদ্ধার কাতর ক্রন্দনের ফল অচিরে ফলিল। দেখিলেন, একটি গৌরকান্তি প্রৌঢ় সাধু, দেখিতে অনেকটা যোগত্রয়ানন্দেরই মতো, তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আর তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য বলিতেছেন।

এই সাধুটিই এবার বৃদ্ধাকে কোলে তুলিয়া নিয়া পাহাড়ের উপরকার মন্দির ও অন্যান্য দর্শনীয় সব কিছু দেখাইয়া দিলেন। অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে নিচে নামাইয়াও আনিলেন। ততক্ষণে তাঁহার হৃৎপিণ্ডের বেদনা ও কাঁপুনিও একেবারে থামিয়া গিয়াছে, তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। অতঃপর বৃদ্ধাটি সকলসহ নিরাপদে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

যোগত্রয়ানন্দকে এই অলৌকিক ঘটনার রহস্য সম্পর্কে জনৈক অন্তরঙ্গ ভক্ত এক সময়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, "আসল কথাটা কি জানো? ভগবান হচ্ছেন বিশ্বরূপ স্বরূপ। তাঁর যে ভক্ত তাঁকে যে রূপ দর্শন করতে ইচ্ছে করে—সেই রূপেই ভগবান্ তাকে দর্শন দিয়েই কৃতার্থ করেন। গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করাই শাস্ত্রের উপদেশ। বৃদ্ধা তা-ই করেছিলেন। আমি তো পাষাণ—কিন্তু পাষাণেও ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি হয়।"

কিছুদিন পরে ঐ বৃদ্ধা ভক্তটির হৃদ্‌রোগ আবার বৃদ্ধি পায়, তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। তাঁহার চিরদিনের ইচ্ছা, অন্ত্যকালে যেন কাশীপ্রাপ্তি হয়। তাই অবিলম্বে কাশীতে যাওয়ার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর এল দত্ত বৃদ্ধার চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "এ অবস্থায় রোগিনীকে যেন নড়াচড়া করতে দেওয়া না হয়। কাশীতে যাওয়া দূরের কথা, দোতলা থেকে একতলায় নামতে গেলেই ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। বৃদ্ধার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও ডাক্তারের কথা মানিয়া নিলেন, বাধা দিলেন কাশী যাওয়ার প্রস্তাবে।

অবশেষে বৃদ্ধার আগ্রহাতিশয্যে কাশীতে যোগত্রয়ানন্দের কাছে তাঁহার মত চাহিয়া তার করা হইল। উত্তরে তিনি নির্দেশ দিলেন, "যে যা বলুক, কোনো ভয় নেই, অবিলম্বে এখানে চলে এসো।"

অতঃপর স্বজনগণসহ বৃদ্ধা কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে কিছুদিনের মধ্যেই ঘটে তাঁহার অভিলষিত কাশীপ্রাপ্তি।

বহু মুমুক্ষু নরনারীকে যোগত্রয়ানন্দ দীক্ষা দিয়াছেন এবং এই সব দীক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকে উচ্চতর সাধনমার্গে প্রবিষ্টও হইয়াছেন। দীক্ষাদানের আগে আপন যোগশক্তি সহায়ে তিনি শিষ্যের জন্মান্তরের সংস্কার এবং তাঁহার সাধনেচ্ছার আসল গতিপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে নির্ণয় করিতেন। তারপর স্থির করিতেন তাঁহার সাধনমার্গ ও ইষ্টতত্ত্ব। শিষ্যের বহিরঙ্গ জীবনের ঝোঁক বা রুচিকে এই প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাপুরুষ কোনো দিনই গুরুত্ব দিতে চাহিতেন না।

খড়দহের এক ভদ্রলোক কাশীতে থাকিয়া সাধনভজন করিতেন। এখানে আসিয়া একটি হরিসভার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। ভক্তিভাবের উদ্রেক হয় তাঁহার হৃদয়ে এবং ক্রমশ বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা-কথা শুনিতে তাঁহার প্রবল উৎসাহ। নিত্য সন্ধ্যায় কীর্তন ও ভাগবত পাঠের আসরে গিয়া না বসিলে মনে তিনি শান্তি পান না। সে-বার এই ভদ্রলোকটি এক সময়ে যোগত্রয়ানন্দের সন্ধান পাইয়া তাঁহার কাছে যাতায়াত শুরু করেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও যোগৈশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া যান।

ভদ্রলোকটি মনে মনে স্থির করেন, এই মহাপুরুষের নিকট হইতেই দীক্ষা নিবেন, তাঁহার চরণেই নিবেন একান্ত শরণ। একদিন যোগত্রয়ানন্দের কাছে নিজের প্রার্থনা তিনি নিবেদন করিলেন।

বাবাজীও সম্মতি দিলেন "বেশ তো, তোমার যখন তীব্র ইচ্ছে হয়েছে, দীক্ষা আমার কাছে পাবে। কিছুদিনের মধ্যেই একটা দিন স্থির করতে হবে।"

দুই চারদিন পরে কথাপ্রসঙ্গে যোগত্রয়ানন্দ তাঁহাকে কহিলেন, "ওহে, তোমার তো দেখছি—শক্তিমন্ত্র। মহাশক্তিকে মাতৃরূপে উপাসনা করে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। এখন থেকেই এজন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নাও। নিজের ভেতর সন্তান ভাবটি জাগিয়ে তুলে জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করো। সব নারীমূর্তি জগজ্জননী মহামায়ার প্রকাশ, এটা অভ্যাস করো।"

ভদ্রলোকটি নীরবে কথাগুলি শুনিলেন কিন্তু কোনো উৎসাহ দেখাইলেন না। মনে তখন তাঁহার একটা ঘোরতর সংশয় আসিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবভাবে তিনি ভাবিত, বৈষ্ণবীয় রুচি তাঁহার। অথচ বাবা তাঁহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিতেছেন। যিনি শিষ্যের অন্তরের গতিপ্রকৃতি বুঝিতে পারেন না, তাহার সংস্কার কি তাহা ধরিতে পারেন না, তিনি আবার কেমন মহাপুরুষ?

বাবাকে তিনি অন্তর্যামী ও সর্বশক্তিমান্ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে তাঁহার প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি নাই। প্রকৃত সাধন-বৈভব যাঁহার নাই এমন সাধকের কাছে তো আত্মসমর্পণ করা যায় না!

ভদ্রলোকটি যোগত্রয়ানন্দের কাছে যাওয়া আসা প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন, ফলে দীক্ষার ব্যাপারটিও চাপা পড়িয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি কাশী ত্যাগ করিয়া খড়দহে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসার পর জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে এবং কাশীতে হরিসভায় যাতায়াত করার ফলে যে ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল তাহা ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসে।

দেশে থাকার সময় সে-বার ভদ্রলোকটি ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের বহু চেষ্টার ফলেও তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেছেন না। বরং এই ব্যাধি ক্রমে মারাত্মক হইয়া উঠে এবং দেহের যন্ত্রণায় তিনি মৃতকল্প হইয়া পড়েন।

সেদিন গভীর রাতে অসহায়ভাবে রোগশয্যায় শুইয়া আছেন, হঠাৎ দেখিলেন—শিয়রে দণ্ডায়মান এক জ্যোতির্ময় মাতৃমূর্তি; এই মূর্তি নির্নিমেষে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন, আর আয়ত নয়ন দুইটি হইতে ঝরিতেছে দিব্য স্নেহ আর করুণার ধারা।

যেমন আকস্মিকভাবে এই মাতৃমূর্তির আবির্ভাব ঘটে, তেমনি তাহা হয় অন্তর্হিত। কিন্তু পরম বিস্ময়ের কথা, এই অন্তর্ধানের পর হইতেই ভদ্রলোকটির রোগ যন্ত্রণার উপশম ঘটে। শুধু তাহাই নয়, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

এবার যোগত্রয়ানন্দের কথা সম্পর্কে তাঁহার চৈতন্যের উদয় হয়। বাবা কেন তাহাকে শক্তিমন্ত্র দিতে চাহিয়াছেন, মাতৃরূপিণী ইষ্টের উপাসনায় কেন উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মর্ম তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। বুঝিলেন, নিজের বহিরঙ্গ জীবনের ঝোঁক ও রুচি দিয়া নিজের আভ্যন্তরীণ সত্তাকে চিনিবার চেষ্টা করিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। বাবার সাধনালব্ধ অন্তর্দৃষ্টি অভ্রান্ত, তাই উহা ঠিকভাবে তাঁহার মন্ত্র ও ইষ্ট নির্দেশ করিয়া দিয়াছে।

অতঃপর ভদ্রলোকটি কাশীতে গিয়া যোগত্রয়ানন্দের চরণতলে পতিত হন। কাতর কণ্ঠে বলেন, "বাবা, আমার অপরাধের সীমা নেই। আপনার বাক্যে আমার সংশয় এসেছিল। আপনার কৃপায় মা নিজে এসে আমার রোগযন্ত্রণা সারিয়ে দিয়েছেন, প্রাণ

রক্ষা করেছেন। আর এই কৃপালীলার মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন আপনার কথার সত্যতা। আপনি আমায় মার্জনা করুন।”

বাবাজী তাঁহাকে সস্নেহে কাছে টানিয়া নেন, নানা প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করেন। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই ভক্তটি অতঃপর সাধনজীবনে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন।

যোগত্রয়ানন্দ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ভারতের সারস্বত সমাজের মুকুটমণি ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন—“নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং—এই শাস্ত্রবাক্য তাঁহার ন্যায় রাগদ্বেষহীন, পূর্ণ বৈরাগ্যসম্পন্ন কর্তব্যনিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।”

আশেপাশের সাধকজনের উপর যোগত্রয়ানন্দের দূর বিস্তারী প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়া ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ লিখিতেছেন :

“বাবাজী জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন ইহাই অনেকের বিশ্বাস। বহু দূর দেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চাঙ্গের বিভিন্ন সাধক তাঁহার নিকট সদ্‌ উপদেশের জন্য উপস্থিত হইতেন। যতি, সন্ন্যাসী, অবধূত, যোগী, কর্মী, ভক্ত অনেকেই তাঁহার নিকট আসিতেন। সকলেই তাঁহার নিকট নিজ নিজ সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রাপ্ত হইতেন। সকল সম্প্রদায়কেই তিনি আপন বলিয়া মনে করিতেন এবং সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশ দান করিতেন। গৃহস্থের নিকট সন্ন্যাসীর জ্ঞানলিপ্সাতে আগমন অপূর্ব, সন্দেহ নাই। কিন্তু জনক ও শুকদেবের কিংবদন্তী এই দেশে এখনও জাগরূক রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও কাশীনিবাসী মহাত্মা ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ীর সান্নিধ্যে বহুসংখ্যক জিজ্ঞাসু ও সাধনপ্রার্থী সন্ন্যাসীর ভিড় প্রায় সর্বদাই লাগিয়া থাকিত।

“আমার ব্যক্তিগত জীবনে বাবাজীর প্রভাব যে কতটা পড়িয়াছিল আজ তাহা ঠিক ঠিক নির্দেশ করা সহজ নহে, তবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব। তাঁহার কৃপাতে অনেক সময় অলৌকিকভাবে আমি দৈহিক রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। তাঁহার অযাচিত করুণার প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই এবং কোনোদিন দিতে পারিব না। বুদ্ধি-সংক্রান্ত জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁহার সাহায্য অতুলনীয়—শুধু তাঁহার জ্ঞানময় জীবনের আদর্শ নহে, সাক্ষাৎভাবেও তিনি বহু জ্ঞান এই আধারে সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ জীবন, পবিত্র হৃদয়, অমায়িক স্বভাব এবং কর্মে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান-ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় আমার প্রথম যৌবনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বুদ্ধির অতীত ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান আমি নত শিরে স্বীকার করিতে বাধ্য।”

১৯২৫ সাল। স্বেচ্ছায় যোগত্রয়ানন্দ এবার কাশীধামের লীলার ছেদ টানিয়া দিলেন। কহিলেন, এবার বিরতির পালা। শিবের কিংকর, রামের কিংকর, এবার থেকে ভাববে শুধু কৈংকর্যের কথা আর মুখে জপ্‌বে সুধাময় নাম।”

কলিকাতার ভক্তেরা সাগ্রহে বাবাজীর এই প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা শিরোধার্য করিলেন। প্রথমে উত্তরপাড়ায় কিছুদিন তিনি অবস্থান করেন, তারপর বরানগরের গঙ্গাতীরের এক উদ্যানে তাঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের একদিন বলেন, “সর্বতীর্থ সার এই গঙ্গাতীর। জীবনের সব কিছু চাওয়া পাওয়া দেবো এবার বিসর্জন।’

কিছুদিনের মধ্যে বাবাজী আতুর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গঙ্গার পবিত্র জল ছাড়া

আর কিছু গ্রহণে তাঁহার আর রুচি নাই, ইচ্ছা নাই। পুত্র ইন্দুভূষণ ও ভক্ত-শিষ্যদের আবেদন ও মিনতি ব্যর্থ হয়। স্বেচ্ছায়, পরম আনন্দে দিনের পর দিন বাবাজী অগ্রসর হন তাঁহার বিদায় লগ্নের দিকে।

একদিন উদাস নয়নে নিস্তরঙ্গ ভাগীরথীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভক্তদের কহিলেন, "যেখানে শ্রীগুরু বাবাকে জলসমাধি দেওয়া হয়েছে, দেহত্যাগের পর এ খোলসটাকে সেখানেই তোমরা রেখে দিও।"

ভক্ত-শিষ্যেরা সাশ্রুনয়নে অনুরোধ জানান, "বাবা, আর কিছুদিন থেকে গেলে হতো না? কৃপা ক'রে তাই করুন।"

মৃদু হাসিয়া যোগত্রয়ানন্দ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "শ্রীগুরু বাবার চরণে নিজেকে এবার একেবারে সঁপে দিয়েছি। আর থাকা যায় না। আমায় এবার যে যেতেই হবে।"

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর। সেদিন গভীর রাতে মহাত্মা যোগত্রয়ানন্দ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হন, তারপর এদিক ওদিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন।

পুত্র ইন্দুভূষণ বাহিরের বারান্দায় নিদ্রিত ছিলেন, কে যেন তাঁহাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া গেল, "আর বিলম্ব না ক'রে বাবার কাছে যাও।"

পুত্র ও ভক্তেরা নিকটে দাঁড়াইতেই প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "এখনি আমায় তোমরা গঙ্গায় নিয়ে চল।"

সবাই মিলিয়া দেহটি বহন করিয়া আনিলেন গঙ্গাতটে। পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া যোগত্রয়ানন্দ কিছুক্ষণ ধ্যানাবিষ্ট রহিলেন। তারপর ভক্ত ও শিষ্যদের শোকসাগরে ভাসাইয়া মগ্ন হইলেন চিরসমাধিতে।

আচার্য মধ্ব

ভারতের আত্মিক সাধনা ও ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের অবদান যেমনি বিপুল তেমনি বৈচিত্র্যময়। জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমভক্তির নানা সাধনা ও দার্শনিকতার ধারা এই প্রাচীন ভূখণ্ড হইতে উৎসারিত হইয়াছে, ছড়াইয়া পড়িয়াছে দেশের দিগ্‌বিদিকে।

দক্ষিণভারত আমাদের উপঢৌকন দিয়াছে তাহার যোগৈশ্বর্যসম্পন্ন শৈবসাধক আর প্রেমভক্তি-সিদ্ধ আড়বার গোষ্ঠী, দিয়াছে শঙ্করের মতো অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য। রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক বিদ্যারণ্য, জ্ঞানদেব, তুকারাম প্রভৃতি সিদ্ধসাধক ও ধর্মনেতার একের পর এক এখানে ঘটিয়াছে অভ্যুদয়।

ত্রয়োদশ শতকে আচার্য মধ্বের আবির্ভাব শুধু দক্ষিণ ভারতেরই নয়, সমগ্র ভারতেরই এক স্মরণীয় ঘটনা। ব্রহ্মসূত্রের ভক্তিবাদী ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া তিনি এক নবতর দ্বৈতবাদী দর্শনের প্রচার করেন। তাঁহার নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবীয় সাধনা, ভাবময় প্রেরণা ও সংগঠনশক্তি ভক্তি-আন্দোলনকে নূতন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরিয়া তোলে। ভারতীয় জনজীবনে আচার্য মধ্ব পরিচিত হইয়া উঠেন ভক্তিবাদী চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে। তাঁহার প্রচারিত তত্ত্ব ও ধর্মাদর্শ যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও বল্লভাচারীদের মতবাদকে অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়াছে একথাও অস্বীকার করার উপায় নাই।

মধ্ব আবির্ভূত হন ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে।[১] ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের কাছাকাছি বেলে গ্রামের পাজকাক্ষেত্র তাঁহার জন্মভূমি। তখনকার দিনে এ অঞ্চল ছিল তুলুবদেশের অন্তর্গত। আজিকার দিনের ধারোয়ার জেলা, উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া এবং মহীশূরে রাজ্যের পশ্চিম অংশ নিয়া গঠিত ছিল ত্রয়োদশ শতকের তুলুব। আজিকার দিনেও ইহার একাংশ তুলুব নামে পরিচিত। শঙ্করের জন্মস্থান শৃঙ্গেরী ও ম্যাঙ্গালোরের দূরত্ব মধ্বের জন্মস্থান হইতে চল্লিশ মাইলের বেশী হইবে না।

পাজকার তিন ক্রোশ দূরেই সারবিধৌত পবিত্র তীর্থ উড়ুপী[২]। শেষশায়ী

---

১ মতান্তরে ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে। দ্রঃ Subba Rao · Bhagabat Gita R G. Bhanderkar Vaishnavism, Saivism and Minor Religous System pp, 59—। স্বরচিত গ্রন্থ 'ভারত তাৎপর্য নির্ণয়'-এ মধ্ব আপন জন্ম সম্বন্ধে যে শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ১১৯৯ খৃষ্টাব্দেরই নির্দেশনা দেয়। শ্রীকূর্ম-এ মধ্বের প্রশিষ্য স্বামী নরহরি তীর্থের এক অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অনুশাসন মধ্বের জীবনকাল নির্ণয়ের সহায়ক।

২ উড়ু অর্থে নক্ষত্র, 'প' হইতেছে পতি। নক্ষত্রপতি অর্থাৎ চন্দ্রের নাম উড়ুপ। চন্দ্রের তপস্যায় প্রসন্ন যে শিব তিনিই এ স্থানে অধিষ্ঠিত। তাই চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবের নাম অনুসারে এ তীর্থের নাম হইয়াছে উড়ুপী। প্রাচীনকালে উড়ুপী রজতপীঠপুর নামেও আখ্যাত হইত।

অনন্তেশ্বর বিষ্ণু ও চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব, এই দুই জাগ্রত বিগ্রহের মন্দির এখানে অবস্থিত। দেশের দূর-দূরান্ত হইতে ভক্ত নরনারী এখানে সমবেত হয়, স্নান তর্পণ ও পূজা শেষে যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যায়। বিষ্ণুভক্ত ও শিবভক্তদের এই মিলনভূমিই উত্তরকালে পরিচিত হইয়া উঠে আচার্য মধ্বের সাধনপীঠ ও লীলাক্ষেত্ররূপে। ভক্তি-সাধনার এক নূতন ধারা তাঁহার মাধ্যমে এখান হইতে উৎসারিত হয়। তাঁহার উত্তরসূরী ও ভক্তশিষ্যদের স্মৃতিও এই পবিত্র তীর্থের সহিত নানাভাবে বিজড়িত রহিয়াছে।

মধ্বের পিতার নাম মধ্যগেহ নারায়ণ ভট্ট। প্রতিভাধর আচার্য হিসাবে ভট্ট তখন এ অঞ্চলে সুপরিচিত। বেদ-বেদান্তে তিনি পারঙ্গম, আবার সাধনজীবনে নিষ্ঠাবান্ বিষ্ণুভক্ত। স্ত্রী বেদবতী যেমন রূপ-লাবণ্যবতী তেমনি মহাভক্তিমতী। গৃহে নারায়ণ-শিলা প্রতিষ্ঠিত। এই শিলাময় দেববিগ্রহের সেবা, ভোগরাগ, ধ্যানজপে অধিকাংশ সময় তাহাদের অতিবাহিত হয়। বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্বণের দিনে উভয়ে ভক্তিভরে গিয়া উপস্থিত হন উড়ুপীতে। কুলদেবতা অনন্তেশ্বর নারায়ণের অর্চনায় প্রাণমন ঢালিয়া দেন।

পণ্ডিত মধ্যগেহ ভট্ট মোটেই বিত্তবান্ নন। সম্বলের মধ্যে রহিয়াছে পৈতৃক একটি বাসগৃহ আর একটি বাগিচা। এই বাগিচার ফসল আর অধ্যাপনার সামান্য কিছু আয় দিয়াই কোনো মতে তাঁহার সংসারের ব্যয় নির্বাহ হয়।

এই ভট্টবংশ খুবই প্রাচীন। কর্মকাণ্ডের বিখ্যাত আচার্য কুমারিল ভট্টের অনুগামী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ইঁহারা। পঞ্চ বা ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়ে বনবাসী কদম্বরাজ ময়ূরবর্মণ এই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণদের কয়েকটি দলকে আমন্ত্রণ জানান। সেই সময় হইতে এই ভট্ট ব্রাহ্মণেরা তুলুব অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। যজ্ঞক্রিয়া, শাস্ত্রনিষ্ঠা ও শুদ্ধতর জীবনচর্যার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে এই আগন্তুকেরা সমাজের নেতারূপে নিজেদের করেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণদের অনেকে দুই এক পুরুষের মধ্যেই শঙ্কর অদ্বৈতবাদের অনুগামী হইয়া পড়েন। সাধারণভাবে তাঁহাদের মধ্যে শিবভক্তির প্রাবল্য দেখা যায়।

কালক্রমে ইঁহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বিষ্ণু-উপাসনার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। আচার্য মধ্বের পিতা মধ্যগেহ ভট্ট ছিলেন এমনি এক ভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।

মধ্যগেহ ভট্টের দুই পুত্র ও এক কন্যা। কিন্তু ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস, নিতান্ত তরুণ বয়সে দুইটি পুত্রই একে একে ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শোকের আঘাতে ভট্টদম্পতি একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন।

কয়েক বৎসর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু পুত্রশোকের মর্মজ্বালা মধ্যগেহ তখনো ভুলিতে পারেন নাই। তাছাড়া, মনে এক নূতন দুশ্চিন্তাও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ তিনি। [illegible] পারেন, অপুত্রক অবস্থায় এদেহ ত্যাগ করিলে পিণ্ডদান করার [illegible] কেহ থাকিবে না। [illegible] তাই উড়ুপীতে অনন্তেশ্বর মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হন, ইষ্টের চরণে নিবেদন [illegible] অন্তরের আকুতি।

সেদিন ছিল দশহরার শেষ দিন [illegible]। মধ্যগেহ ভট্ট উড়ুপীর [illegible] বসিয়া একমনে জপ ধ্যান করিতেছেন। [illegible]

করিয়া কাটিয়া যায় হুঁশ নাই। রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া উঠে। ভক্ত দর্শনার্থীরা একে একে যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। ঠাকুরের শয়ান শেষে দীপ নিভাইয়া পূজারীরা নিজ নিজ কক্ষে বিশ্রামরত। শুধু ভক্তপ্রবর মধ্যগেহ ভট্ট শ্রীমূর্তির সম্মুখে রহিয়াছেন ধ্যানস্থ।

হঠাৎ গর্ভ-মন্দিরটি এক ঝলক শুভ্র স্নিগ্ধ স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ভট্টের ধ্যান ভাঙিয়া যায়। বিস্ময়ে আনন্দে তিনি অভিভূত। এসময়ে কানে আসে এক দৈবী কণ্ঠস্বর। করুণা বিগলিত কণ্ঠে ঠাকুর কহেন, "আমার প্রিয় ভট্ট, তুমি প্রচণ্ড শোক পেয়েছ তরুণ বয়সের পুত্র দুটি হারিয়ে। কিন্তু কি করবে বল? প্রাক্তন খণ্ডিত হয়েছে, তাই তো আর তাদের থাকা সম্ভব হয় নি, মর্ত্য থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। দুঃখ ক'রো না ভট্ট,—শোক যেমন আঘাত হানে তেমনি আনে পরম কল্যাণ। শোক মানুষকে করে আত্মস্থ, করে পবিত্রতর।"

মধুর মোহময় ঝঙ্কার প্রভুর দিব্যকণ্ঠে। কিন্তু ভট্টের বুকে তাহা অনুরণন তোলে কই? উপর্যুপরি দুইটি পুত্রশোকে হৃদয় তাঁহার আজ মরুভূমি। তাহা শীতল হয় কই, শান্ত হয় কই?

প্রভু আবার স্নেহার্দ্রস্বরে বলিতে থাকেন, "ভট্ট জেনে রেখো, মানুষ শূন্য হয় পূর্ণ হবে বলে, রিক্ত হয় সিক্ত হবে ব'লে। শোক বিষাদের কালিমা তুমি ঝেড়ে ফেল। আর খেদ ক'রো না। ঈশ্বরীয় বিধানে এক শুদ্ধাত্মা কুলপবিত্রকারী পুত্র আসবে তোমার গৃহে। নবতর ভক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ সে হবে। আজকে দশহারার শেষ দিন—নবমী। তোমার একটি শিশুপুত্র ভূমিষ্ঠ হবে ঠিক এক বৎসর পরে, এমনি পবিত্র তিথিতে।"

দৈবী বাণীর রেশ ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়, কিন্তু পণ্ডিত মধ্যগেহ ভট্টের হৃদয়ে এই বাণী তুলিয়া দেয় ভাবোচ্ছ্বাসের এক উত্তাল তরঙ্গ। অপার আনন্দে ও তৃপ্তিতে ভরপুর ভট্ট তখনই ছুটিয়া যান পাজকার নিজগৃহে। পুলকভরা কণ্ঠে গৃহিণী বেদবতীর কাছে বর্ণনা করেন মন্দিরের অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার কাহিনী। আনন্দাশ্রু ঝরিতে থাকে দুই নয়নে।

উড়ুপীর অনন্তেশ্বর মন্দিরের দৈববাণী ফলিয়া যায় ঠিক এক বৎসরের ব্যবধানে, ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের নবমী তিথিতে এক শুভলগ্নে ভট্টগৃহিণীর কোল আলো করিয়া আবির্ভূত হয় এক শিশুপুত্র উত্তরকালে যে কীর্তিত হইয়া উঠে মহাসাধক মধ্বাচার্য নামে।

যেমনি অনিন্দ্যসুন্দর, তেমনি সর্বসুলক্ষণযুক্ত এই শিশু। ভক্ত ভট্টদম্পতির আনন্দের আর অবধি নাই। ঠাকুরের কৃপাপ্রসাদরূপে পাইয়াছেন এই পুত্রটিকে—কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাই তাহার নাম রাখিলেন বাসুদেব।

বাসুদেবের বাল্যজীবনের নানা অত্যাশ্চর্য ও অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।[১]

---

১ মধ্ব-শিষ্য পণ্ডিত ত্রিবিক্রম আচার্যের পুত্র নারায়ণ আচার্য মধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরী নামে নানা কাহিনী সংকলিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। পৌরাণিক ভঙ্গিতে রচিত এই দুইটি গ্রন্থে মধ্ব সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। মধ্বজীবনের রূপরেখা অংকনে নারায়ণ আচার্যের রচনা আমাদের সাহায্য

একদিন সাথীদের নিয়া সে তাহার খেলায় মাতিয়া আছে। হঠাৎ দেখা গেল, একটি দুর্দান্ত ষাঁড় নিকটস্থ রাস্তা দিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে। বালক বাসুদেবের কি এক অদ্ভুত ঝোঁক চাপিয়া যায়—তড়িৎবেগে ষাঁড়ের পুচ্ছ ধরিয়া সে ঝুলিয়া পড়ে। ষাঁড়টিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত ও চঞ্চল হইয়া উঠে, দ্রুতবেগে ধাবিত হয় সম্মুখের এক নিবিড় অরণ্যে। সঙ্গী সাথীরা ভয়ে সন্ত্রস্ত, আর্তস্বরে সবাই চিৎকার করিতে থাকে, ভট্টগৃহের আশেপাশে মহা সোরগোল পড়িয়া যায়। ধর্-ধর্ শব্দে সবাই পশ্চাদধাবন করে।

বাসুদেব সেদিন যেন এক উদ্দাম খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। পুচ্ছ হইতে সে যেমন তাহার বজ্রমুষ্টি শিথিল করিবে না, ষণ্ডপ্রবরও কোনোমতে হার মানিতে রাজী নয়। বন-বাদাড় কণ্টকময় পথে কয়েক প্রহর ছুটাছুটির পর ক্লান্তদেহ ষাঁড়টি অবশেষে মধ্যগেহের বাড়ির কাছে আসিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। বালক বাসুদেবের চোখে মুখে তখন তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সকলের উদ্বেগভরা প্রশ্নের উত্তরে সগর্বে সে তাহার অদ্ভুত বন-ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করিতে থাকে।

আর এক দিনের কথা। কোনো একটি বিশেষ পার্বণ উপলক্ষে সন্ধ্যার পর ভট্ট-দম্পতি বাসুদেবকে নিয়া উড়ুপীর অনন্তেশ্বর মন্দিরে গিয়াছেন। স্নান তর্পণ পূজো সমাপন করিতে বেলা গড়াইয়া গেল। তারপর সন্ধ্যার সময় বনপথ দিয়া সবাই গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় এক দুষ্ট অশরীরী প্রেত। পণ্ডিত মধ্যগেহ ও বেদবতী ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়েন, কিন্তু বালক বাসুদেবের মধ্যে দেখা যায় এক অদ্ভুত ধরনের প্রতিক্রিয়া। মুহূর্ত মধ্যে তাহার চোখমুখের ভাব তখন একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যায়। গ্রীবা সমুন্নত, চোখদুটি ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মতো দৃঢ়স্বরে ঐ প্রেতের উদ্দেশে বিড়বিড় করিয়া কি এক মারণ-মন্ত্র সে উচ্চারণ করে। প্রেতটি তৎক্ষণাৎ ভীতভাবে তাঁহাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেবও ফিরিয়া আসে তাহার বালক স্বভাবে। ইষ্টনাম জপিতে জপিতে অতি সন্তর্পণে বালককে বুকে করিয়া ভট্টদম্পতি ঘরে ফিরিয়া আসেন।

কিশোর বয়সে বাসুদেবের উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এবার শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তাঁহাকে পাঠানো হয় গ্রামের টোলে। অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা বাসুদেবের। অধ্যাপকেরা বিস্মিত হইয়া যান। দেখা যায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিভিন্ন শাস্ত্র তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তত্ত্বের নির্ণয় ও বিচার বিশ্লেষণে জন্মিয়াছে তাঁহার অসামান্য অধিকার।

করিলেও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও অযৌক্তিক শংকর-বিরোধিতার ফলে গ্রন্থ দুইটির মূল্যহানি ঘটিয়াছে। আচার্য ত্রিবিক্রম, নারায়ণ প্রভৃতি শিষ্যেরা মধ্বকে বায়ুর অবতার বলিয়া মনে করিতেন। মাধ্ব বৈষ্ণবদের মতে, পৃথিবীতে যখনই নারায়ণ অবতাররূপে আসিয়াছেন, তখনই তাহার সহায়ক হইয়া আসিয়াছেন বায়ু। রাম ও কৃষ্ণ অবতারের সহায়ক হনুমান ও ভীম উভয়েই বায়ুপুত্র। শেষ অবতার মধ্বাচার্য। —প্রজ্ঞানানন্দ ঃ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস।

ক্রীড়া অঙ্গনেও বাসুদেবের সুখ্যাতি কম নয়। অমিত সাহস, বজ্রকঠিন দেহ, আর দুর্জয় সংকল্প নিয়া যে কোনো প্রতিযোগিতায় অনায়াসে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া নেন। দক্ষিণ কানাড়ার ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুস্তী খেলার প্রচলন খুব বেশী। এই খেলায় বাসুদেব অদ্বিতীয়। তাই সঙ্গীরা রহস্য করিয়া তাহার নামকরণ করে ভীম[১]।

যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বাসুদেব পরিণত হইয়াছেন এক পূর্ণাঙ্গ মানবে। ব্যবহারিক ও আত্মিক উৎকর্ষ দুইয়েরই অপূর্ব সমাহার ঘটিয়াছে তাঁহার জীবনে। অসামান্য দৈহিক ও মানসিক শক্তি ও দক্ষতার অধিকারী যেমন তিনি হইয়াছেন, তেমনি অর্জন করিয়াছিলেন শাস্ত্র-জ্ঞান ও ধ্যান তন্ময়তা। বিচারের শক্তিতেও কম দুর্ধর্ষ তিনি হন নাই।

কয়েকশত বৎসর আগে বাসুদেবের পূর্বপুরুষ ছিলেন কর্মকাণ্ডের অনুগামী, যাগযজ্ঞে বিশ্বাসী। একাদশ শতকের কাছাকাছি ইঁহাদের মধ্যে এক দূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়। এ সময়ে আচার্য রামানুজের অভ্যুদয় ঘটে এবং তাঁহার অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়াই পরিণতি লাভ করে প্রেম-ভক্তি-সিদ্ধ আড়বারদের সাধনা ও মতবাদ। রামানুজীয় ভক্তিবাদ সারা দাক্ষিণাত্য প্রবল ভাববন্যা প্রবাহিত করে, শঙ্কর বিরোধী দ্বৈতবাদের প্রভাব নানাস্থানে অনুভূত হইতে থাকে। অনন্তশায়ী বিষ্ণু ও মুরলীধর কৃষ্ণের মহিমা কতকগুলি মঠ মন্দির ও সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে। বাসুদেবের পিতা পণ্ডিত মধ্যগেহ ভট্ট ছিলেন ভক্তি রসাশ্রিত সাধন-ধারার একজন বিশিষ্ট ধারক ও বাহক। তাঁহার ইষ্ট অনন্তেশ্বর নারায়ণ, আর গৃহে পূজিত হইতেন শালগ্রাম শিলা। পুত্রের বাসুদেব নামকরণ হইতেও অনুমান করা যায়, মধ্যগেহ ভট্ট বেদান্তী বা কর্মকাণ্ডী সাধক ছিলেন না, সাধনজীবনে ভক্তিমার্গই তিনি অনুসরণ করিয়া চলিতেন।

বলা বাহুল্য পিতার ঐতিহ্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব আর গৃহের ভজন-পূজনময় পরিবেশ বাসুদেবের ধর্মীয় আদর্শ ও সাধনজীবনকে অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়া তোলে। অতি তরুণ বয়সেই এই প্রতিভাধর পণ্ডিত পরিণত হন এক শুদ্ধাচারী ভক্তিপরায়ণ সাধকে।

উডুপীতে শাস্ত্রবিদ্ আচার্য ও সাধু-সন্ন্যাসীর সংখ্যা কম নয়। ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যাবত্তা ও সাধনার দিক দিয়া বিশিষ্টতম হইতেছেন আচার্য অচ্যুতপ্রকাশ। বাসুদেব মনে মনে স্থির করিলেন, এবার এই মহাত্মার কাছেই বেদ-বেদান্ত ও ষড়দর্শনের উচ্চতম পাঠ গ্রহণ করিবেন।

একদিন অতি প্রত্যূষে উডুপীতে অচ্যুতপ্রকাশের মঠে গিয়া তিনি উপস্থিত। শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া নিজের পরিচয় দিলেন; কহিলেন, "আচার্যবর, অনেক

---

১ অনেকের ধারণা, প্রথম জীবনের এইসব দৈহিক পরাক্রমের কথা স্মরণ রাখিয়াই উত্তরকালে মধ্বের অনুগামীরা তাঁহাকে বায়ুপুত্র বা বায়ুর অবতার বলিয়া প্রচার করিতে শুরু করেন। নারায়ণ ভট্ট রচিত মধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরীতে এই বায়ু-তত্ত্বটি বার বার উল্লিখিত হইয়াছে।

আশা নিয়ে আপনার চরণে শরণ নিতে এসেছি। আপনি আমায় কৃপা করুন, শাস্ত্রতত্ত্বের উপদেশ দিয়ে করুন কৃতকৃতার্থ।"

"বৎস, তোমার পিতা মধ্যগেহ নারায়ণ ভট্টকে আমি জানি। তিনি সুপণ্ডিত এবং বিষ্ণুর উপাসক। তাঁর ছেলে হয়ে আমার মতো অদ্বৈত বেদান্তীর কাছে কেন তুমি শাস্ত্রের পাঠ নিতে এলে? এর রহস্য কি, আমায় তা খুলে বলতো?" জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে থাকেন অচ্যুতপ্রকাশ।

"প্রভু, আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি, অদ্বৈত বেদান্তী হয়েও আপনি ভক্তি-মার্গের উপর মোটেই খড়্গহস্ত নন। চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবের মন্দির আর শেষশায়ী-বিষ্ণু অনন্তেশ্বরের মন্দির, এই দুই পবিত্রপীঠেই রয়েছে আপনার স্বচ্ছন্দ গতায়াত। আর এ কথাও আমি শুনেছি, আপনার গুরু প্রাজ্ঞতীর্থ মহারাজ দশনামী সন্ন্যাসী হয়েও ভক্তিমার্গের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আপনারই আশ্রমে আমি এসেছি।"

সুন্দর-সুঠামদেহ তরুণ ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন অচ্যুতপ্রকাশ। বাসুদেবের দুই নয়ন প্রতিভার দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। আননে রহিয়াছে নিষ্ঠা ও সংকল্পের দৃঢ়তা। অচ্যুতপ্রকাশ অন্তরে মহা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। বাসুদেবের সঙ্গে কিছুক্ষণ শাস্ত্রালাপের পর স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, "বৎস, আমি বুঝতে পারছি, পরমাত্মার কৃপায় তুমি দিব্য প্রতিভা নিয়েই জন্মেছো। একদিন দেশ ও ধর্মের মহা উপকার সাধিত হবে তোমার মনীষায় ও সাধনায়। আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি, আমার এ আশ্রমে থেকে উচ্চতর শাস্ত্রপাঠ তুমি গ্রহণ করতে পারো।"

সেদিন উড়ুপীর মঠে আচার্য অচ্যুতপ্রকাশের কাছে আশ্রয় লাভের পর হইতে বাসুদেবের জীবনে শুরু হইয়া গেল এক নতুনতর অধ্যায়।

ন্যায়, সাংখ্য, বেদ-বেদান্তের অধ্যয়ন শুরু হয়। অপূর্ব নিষ্ঠায় বাসুদেব এগুলি একের পর এক আয়ত্ত করিতে থাকেন। কিন্তু সব সময়েই দেখা যায় গুরু অদ্বৈত-বেদান্তের পাঠ শুরু করিলেই বাসুদেব তাঁহার বিরুদ্ধে তুলিয়া ধরেন ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা, আপন ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অমানুষী মনীষার সাহায্যে প্রয়োগ করেন বিস্ময়কর শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক। ক্রমে উড়ুপীর বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে ও সন্নিহিত অঞ্চলে আচার্য অচ্যুতপ্রকাশের এই প্রতিভাধর ছাত্রের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

পুত্র বাসুদেব এখন শাস্ত্রপারঙ্গম। বিদ্যাবত্তা ও চরিত্রনিষ্ঠায়ও বহু লোকের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করিতেছেন। ভট্টদম্পতির অন্তর তাই গর্বে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে।

একদিন অবসরমতো মধ্যগেহ ভট্ট পুত্রকে নিকটে ডাকিলেন। প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "বাসুদেব, তোমার মতো কৃতী পুত্রকে পেয়ে আমি এবং তোমার জননী পরম সুখী। কিন্তু বাবা, এখন তোমায় আমাদের দুজনার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। এবার তুমি গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করো। সুলক্ষণা একটি পাত্রী আমরা দেখে রেখেছি। তাকে তুমি বিবাহ করো, আর ঘরেই একটি অধ্যাপনার টোল খুলে বসো। সংসার-জীবনে তুমি স্থির হয়ে বসলে আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

নত শিরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাসুদেব উত্তর দেন, "পিতা, আপনি আমায় মার্জনা করুন। গার্হস্থ্য আশ্রম আমার জন্য নয়। তাছাড়া, আমি সঙ্কল্প করেছি—অচিরেই একটি শুভদিন দেখে সন্ন্যাস গ্রহণ করবো, এবং আচার্য অচ্যুত-প্রকাশের কাছ থেকেই নেবো দীক্ষা ও সন্ন্যাস।"

ভট্ট চমকিয়া উঠেন। এ কি অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত সঙ্কল্প তাঁহার পুত্রের? এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত। আর্ত কণ্ঠে কহেন, "বৎস, কেন এমন মর্মভেদী কথা বলছো? ভেবেছিলাম, তুমি সুপণ্ডিত ও ধর্মনিষ্ঠ আচার্য হবে, যশ অর্থ মানের হবে অধিকারী, আর তোমার হাতে ঘর-সংসারের ভার দিয়ে আমরা দিন কাটাবো ধ্যান ভজন নিয়ে—পরম নিশ্চিন্তে। তোমার তো সংসার ত্যাগ করা চলে না বৎস।

"সংসার অনিত্য বলে, মায়া-বিভ্রম বলে আমি সংসার ছাড়ছিনে, বাবা। সংসার ছাড়ছি, এ সংসারের প্রভু শ্রীনারায়ণের সেবায় লাগবো বলে। আপনাকে আর জননীকে যে তিনিই রক্ষা করবেন। আমার জীবনের লক্ষ্য চিরতরে স্থির হয়ে গেছে। সঙ্কল্প করেছি, ভক্তি-সাধনভ্রষ্ট এই পৃথিবীতে ভক্তিবাদ নূতন ক'রে প্রচার করতে হবে। আর সে প্রচার হবে শাস্ত্রভিত্তিক। আমি ভেতর থেকে শক্তি পেয়েছি, উপলব্ধি করেছি—এই দুরূহ ভগবৎ-কর্মে আমার একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।"

আত্মপ্রত্যয় ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠে তরুণ বাসুদেবের চোখে মুখে।

ব্যাকুল কণ্ঠে পিতা কহেন, "বাবা বাসুদেব, তোমায় যে আমরা লাভ করেছি অনন্তেশ্বর নারায়ণের কৃপায়। দীর্ঘদিন ব্রত উপবাস ক'রে প্রভুর চরণে অন্তরের আবেদন জানিয়েছি, প্রসন্ন হয়ে তিনি তোমায় পাঠিয়েছেন আমাদের ঘরে।

"প্রভুর বরে আমার জন্ম। তাইতো আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রভুর আদিষ্ট কর্ম-যজ্ঞেই হবে এ জীবন উৎসর্গিত।"

"সবই তো শুনলাম। কিন্তু বাবা, তুমি যে আমাদের একমাত্র পুত্র। তুমি সন্ন্যাস নিলে, তোমার পিণ্ডদান থেকেও যে আমরা বঞ্চিত হবো। এমনতর অধর্মের কাজ তুমি করো না, বাবা।"

নীরবে দাঁড়াইয়া কিছুকাল আত্মাবগাহন করেন বাসুদেব। তারপর ধীর প্রশান্ত-কণ্ঠে কহেন, "পিতা, আমার দ্বারা আপনার পারলৌকিক কল্যাণের কোনো ক্ষতি না হয়, তা আমি দেখবো। বেশ, আচার্য অচ্যুতপ্রকাশের আশ্রয়ে থাকলেও আমার সন্ন্যাস গ্রহণ আমি আপাতত স্থগিত রাখবো। আমার অন্তরাত্মা বলছে, অদূর ভবিষ্যতে আমার একটি অনুজ জন্মগ্রহণ করবে। তখন আর আপনাদের পিণ্ডলোপের ভয় থাকবে না। সে ভূমিষ্ঠ হবার পরেই আমি প্রবেশ করবো সন্ন্যাস আশ্রমে।"

পিতৃভক্ত বাসুদেব তাঁহার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। উত্তরকালে কনিষ্ঠভ্রাতার জন্মের পরই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাস না নিলেও অচ্যুতপ্রকাশের কাছে দীক্ষা নিতে বাসুদেব বিলম্ব করেন নাই। আচার্যের মঠে থাকিয়া তাঁহার নির্দেশিত পথে অনন্য নিষ্ঠার তিনি উদ্‌যাপন করিয়া চলেন তাঁহার সাধনা ও স্বাধ্যায়। অচিরে সমগ্র কানাড়া অঞ্চলে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন এক অসামান্য পণ্ডিত ও সাধকরূপে।

এভাবে বারো বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মধ্যগেহ নারায়ণ ভট্টের গৃহে আবির্ভূত হয় আর একটি পুত্রসন্তান।[১]

এবার বাসুদেবের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে আর কোনো বাধা থাকে না, জনক ও জননীর সম্মতি নিয়া তিনি চিরতরে গৃহত্যাগ করেন। পঁচিশ বৎসরের সাধননিষ্ঠ প্রতিভাদীপ্ত জীবনে শুরু হয় সন্ন্যাস আশ্রমের সুকঠোর ব্রত।

গুরু এই নবীন শিষ্যের সন্ন্যাস নাম দেন, পূর্বপ্রজ্ঞতীর্থ। পূর্বাশ্রমে বাসুদেব ছিলেন আচার্য মধ্যগেহের পুত্র, এজন্য আচার্য মধ্ব নামেও তিনি সে অঞ্চলে পরিচিত হইয়া উঠেন।

আচার্য অচ্যুতপ্রকাশের মঠে ছাত্র ও সন্ন্যাসী শিষ্যদের ভিড় লাগিয়াই আছে। নিত্যকার সাধনভজনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী ও সাধুরা শাস্ত্রপাঠ ও বিচার বিতর্কে থাকেন সদা তৎপর। আর এ সময়ে নবীন আচার্য মধ্বই ইঁহাদের মধ্যমণি। বিশেষ করিয়া বেদান্তের ভক্তিবাদী আলোচনায়, ভাগবত ও মহাভারত পুরাণের ব্যাখ্যানে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। ন্যায়শাস্ত্রেও মধ্বের দখল অসামান্য। সুযোগ পাইলেই বেদান্তের ভাষ্য নিয়া বর্ষীয়ান্ গুরুর সঙ্গে তিনি বিতর্ক বাধাইয়া বসেন, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও তর্কশক্তির সাহায্যে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উদ্ঘাটন করেন, এই মতবাদের উপর হানেন প্রচণ্ড আঘাত।

গুরু অচ্যুতপ্রকাশ একজন কেবলাদ্বৈতী সন্ন্যাসী হইলেও অন্তরে অন্তরে ভক্তিরসের পরম রসিক। ভক্তি আন্দোলনের একটা নূতনতর স্রোতধারা উড়ুপীর শেষশায়ী নারায়ণ বিগ্রহ অনন্তেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া বিস্তারিত হোক, এই আশা গোপনে এতকাল তিনি পোষণ করিতেছিলেন। এবার প্রতিভাধর নবীন শিষ্য মধ্বকে দেখিয়া, তাঁহার বিরাট প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করিয়া, তিনি মহা উল্লসিত। মনেপ্রাণে সদাই উপলব্ধি করেন, উড়ুপীর মঠে যে উৎস তিনি রচনা করিতেছেন অদূর ভবিষ্যতে তাহার লোকপাবনী কল্যাণধারা ছড়াইয়া পড়িবে ভারতভূমির দিকে দিকে।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই মঠের নেতৃত্ব মধ্বের উপর আসিয়া পড়ে। গুরু তাঁহাকে একদিন ডাকিয়া বলেন, "বৎস, আমার এ দেহ প্রাচীন হয়েছে, অচিরে এটি আরও অপটু হয়ে পড়বে। তাই আমার ইচ্ছে, তুমি এখানকার সন্ন্যাসীদের নেতা হয়ে বসো, আর মঠ পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নাও।"

এক শুভদিনে অচ্যুতপ্রকাশ স্থানীয় সাধু-সন্ন্যাসী ও সজ্জনদের আহ্বান করেন, সকলের সমক্ষে মধ্বের হাতে তাঁহার উড়ুপী মঠের সর্বময় ক্ষমতা সঁপিয়া দেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে কহেন, "বৎস, আজ হতে এই মঠের সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনের ভার তোমার ওপর রইলো। এখানকার মঠাধীশরূপে তোমার নূতন নাম হলো— আনন্দতীর্থ।"

উত্তরজীবনে মধ্বকে তাঁহার সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ ও ভাষ্যে গুরুদত্ত এই মঠাধীশ-নামই ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে।

---

১ উত্তরকালে এই শিশু পরিচিত হন বিষ্ণুতীর্থ নামে। পিতা ও মাতার দেহান্তের পর তিনিও জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুসরণে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

মধ্বের সমকালীন ভারতে, বিশেষত দাক্ষিণাত্যে দার্শনিকতা ও ধর্মীয় মতবাদের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ নিতান্ত কম ছিল না। সারা দেশ তখন বহুতর খন্ডরাজ্যে বিভক্ত। এই সব রাজসভায় তর্কদক্ষ পণ্ডিতদের সমাদর ছিল প্রচুর। ছোট বড় রাজারা যুদ্ধ বা বাদ-বিসংবাদে লিপ্ত। পথ-প্রান্তরের অবস্থাও তেমন নিরাপদ নয়। কিন্তু এই অশান্তিময় পরিবেশেও তর্কশূর বা বিচার-মল্লেরা পরমানন্দে দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের সংবর্ধনায় ও বিচারসভার অনুষ্ঠানে রাজা-প্রজা ধনী-নির্ধন সকলেরই উৎসাহ ও উল্লাসের সীমা থাকিত না।

বিচারমল্লতার জন্য ঐ সব শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের নানা উপাধি দেওয়া হইত। ইঁহাদের কেউ ছিলেন তর্কপঞ্চানন, কেহ বাদীসিংহ, কেউ বা খ্যাত ছিলেন প্রতিবাদী-ভয়ংকর নামে। রাজসভা, মঠ-মন্দির বা ধর্ম অধিবেশনে এই সব তর্কদক্ষ দুর্ধর্ষ পণ্ডিতদের মর্যাদা ছিল অসাধারণ।

উড়ুপীর মঠে মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশখ্যাত ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিতদের আগমন ঘটিত। ইঁহাদের সহিত সংঘর্ষের জন্য আচার্য মধ্ব দীর্ঘদিন যাবৎ নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন। ইতিমধ্যেই সাধু-সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচার নিপুণতার খ্যাতি কম ছড়াইয়া পড়ে নাই। বিদেশী পণ্ডিতেরা উড়ুপীতে আসিলেই আচার্য তাঁহাদের সহিত তর্কযুদ্ধে নামিতেন, ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা ও বিচারের মধ্য দিয়া করিতেন তাঁহাদের পর্যুদস্ত।

তর্কযুদ্ধে জয়ী হইলে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বাড়ে, বিপক্ষকে ধরাশায়ী করিয়া একটা আত্মতৃপ্তিও পাওয়া যায়, একথা ঠিক। কিন্তু আচার্য মধ্ব এইসব দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে উৎসাহী হইতেন আরও একটা বড় কারণে। তাঁহার জীবন একটি গঠনমূলক মহান্ ঐশ্বরীয় কর্মের জন্য উৎসর্গীত। ভক্তি আন্দোলনের একটি নূতন ধারা তিনি প্রবর্তন করিতে চান। একাজ করিতে হইলে প্রথমত চাই শংকরের অদ্বৈতবাদের খণ্ডন, অপর দিকে চাই রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ হইতে একটি পৃথক ও নূতনতর ভক্তিবাদের ধারা উৎসারিত করা।

এজন্য চাই, প্রথমে শাস্ত্র পারঙ্গম ও বিচারদক্ষ পণ্ডিতদের পরাভূত করা ও স্বমতে আনয়ন করা। নতুবা জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিতে চাহিবে কেন? এসময়ে উড়ুপীতে আসিয়া যাঁহারাই তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারাই মধ্বের তর্ক-শরজালে হইয়াছেন ভূতলশায়ী।

প্রিয় শিষ্যের কৃতিত্বে বৃদ্ধ আচার্য অচ্যুতপ্রকাশ আনন্দ ও গর্বে ভরপুর। সেদিন তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া কহেন, "বৎস মধ্ব, যে সংকল্প তুমি গ্রহণ করেছো, তাতো শুধু উড়ুপীর মঠে বসেই সিদ্ধ হবে না। দুর্গ প্রাকারের আড়ালে বসে থেকে ক'টি প্রতি-পক্ষকে তুমি পরাস্ত করবে? এবার দুর্গের বাইরে যাও। আত্মরক্ষার মনোভাব ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে পড়ো আক্রমণ করতে। আগে দাক্ষিণাত্যের রাজসভা ও মঠ-মন্দিরগুলিতে উপস্থিত হয়ে বিচার-যুদ্ধ আহ্বান করো। তারপর বেরিয়ে পড়ো সারা উত্তর ভারতের ধর্ম নেতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে।"[1]

---

১ তখনকার দিনে ভারতের সকল দার্শনিক ক্ষেত্রেই তার্কিকতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ন্যায় ও বেদান্তের ক্ষেত্রে বিচারমল্লতা

গুরুর নির্দেশ মধ্ব সানন্দে মানিয়া নেন। শুরু হয় সদলবলে তাঁহার দক্ষিণ ভারত পর্যটন ও শাস্ত্রবিচারের অনুষ্ঠান। এ সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সাধক ও দার্শনিকদের তিনি তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে উপস্থিত হন বিষ্ণুমঙ্গলম তীর্থে। গুরু অচ্যুতপ্রকাশও এস্থানে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

মধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরীতে বলা হইয়াছে, ঋদ্ধি-সিদ্ধিসম্পন্ন মধ্ব এই সময়ে তাঁহার সঙ্গীদের কাছে কিছু যোগৈশ্বর্য প্রকটিত করেন। পথ চলিতে চলিতে সে-বার সবাই এক নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছেন। নিকটে কোনো জনমানব নাই, আশ্রয় বা খাদ্য সংগ্রহের কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। অথচ সঙ্গীরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিয়াছে। এভাবে আর কিছুক্ষণ চলিতে থাকিলে ক্ষুৎ-পিপাসা ও পথশ্রমে কয়েকজনের জীবনান্ত ঘটিবে সন্দেহ নাই।

এ সঙ্কটে কি করা যায়? ব্যগ্র ব্যাকুল মধ্ব সহযাত্রীদের নিয়া এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হঠাৎ তাঁহার দেহে দেখা দেয় দিব্য ভাবের আবেশ। এক সঙ্গীর ঝুলিতে ভুক্তাবশিষ্ট এক টুকরা শুকনা রুটি পাওয়া যায়। ভাবাবিষ্ট মধ্ব অস্ফুটস্বরে বার বার কি যেন বলিতে থাকেন আর ঐ রুটিটি হাত দিয়া চাপিয়া ধরেন। ক্ষণপরেই সকলে সবিস্ময়ে দেখেন—সঙ্গীদের সবার উদরপূর্তির উপযোগী একরাশ রুটি কোথা হইতে ঐ ঝুলির মধ্যে আসিয়া গিয়াছে।

ভক্ত পণ্ডিত নারায়ণ আচার্যের লেখা গ্রন্থে যোগবিভূতিসম্পন্ন মধ্বের অমানুষী ভোজন সামর্থ্যের একটি চটকদার কাহিনী রহিয়াছে। অনেকের ধারণা, মহাভারতে বায়ুপুত্র ভীমের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে এ কাহিনী অনেকটা তাহারই অনুকরণে রচিত।

নানা অঞ্চলের বিচারসভায় জয়ী হইয়া শিষ্যগণ সহ মধ্ব এবার ত্রিবেন্দ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ভক্তিমান ও বিদ্যোৎসাহী বলিয়া এখানকার রাজার খ্যাতি যথেষ্ট। আচার্য মধ্ব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আগন্তুক সন্ন্যাসীর নবীন বয়স, চোখে মুখে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার দীপ্তি ছড়ানো। প্রথম দর্শনেই রাজা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। সাদর সংবর্ধনার পর কহিলেন, "সন্ন্যাসীবর, আদেশ করুন, আপনার কোন্ সেবায় নিজেকে আমি নিয়োজিত করতে পারি।"

"মহারাজ, আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, নিজের সেবার জন্য আমি মোটেই আগ্রহী নই। এই ভক্তিহীন ভ্রষ্টাচার যুগে ভক্তিবাদ প্রচারের জন্য আমি কৃতসংকল্প। আপনি কালবিলম্ব না ক'রে একটি বিচারসভা আহ্বান করুন সেখানে ভক্তিহীন অদ্বৈতবাদের উপর হানবো আমি চূড়ান্ত আঘাত।"—ধীর গম্ভীর স্বরে বলেন আচার্য মধ্ব।

"আপনি কি রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুগামী?'

"না, মহারাজ, আমার ভক্তিবাদ তা থেকে একেবারে পৃথক। আমার মতে, ব্রহ্ম ও

বেশ চলিয়াছে। এই সময়েই তার্কিক শিরোমণি শ্রীহর্ষ মিশ্র, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, চিৎসুখাচার্য, আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য, লীলাবতীকার বল্লভাচার্য, বেদান্ত দেশিকাচার্য ও বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরের আবির্ভাব। ইহারা সকলেই তার্কিক, এবং এই কয়েক শতাব্দী তার্কিকতারই যুগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।—প্রজ্ঞানন্দ: বেদান্তদর্শনের ইতিহাস

জীব নিত্য পৃথক—অর্থাৎ দুটি পৃথক বস্তু। কারণ, ব্রহ্ম হচ্ছেন স্বতন্ত্র, জীব অস্বতন্ত্র। তাই এই দ্বৈতবাদকে বলা হয় স্বতন্ত্র-অস্বতন্ত্রবাদ। এতে রয়েছে শঙ্কর ও রামানুজ দুই এরই চরম বিরোধিতা।'

"আপনার তত্ত্বের পূর্বসূরী কারা? তাঁদের নাম তো শুনি নি।"

"মহারাজ, সনৎকুমারই এ তত্ত্বের আদি গুরু। ঈশ্বরের কৃপায় আমার মাধ্যমেই এর পুনঃপ্রচার হতে যাচ্ছে।"

"কিন্তু যতিবর, আপনি কি আপনার এই মতবাদের সমর্থনকল্পে ব্রহ্মসূত্রের কোনো ভাষ্য রচনা করেছেন? নইলে দেশের সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতসমাজ এ মতবাদ গ্রহণ করবে কেন?"

"মহারাজ, আমার সূত্রভাষ্য বিরাজিত রয়েছে আমার কণ্ঠেই। আপনি সত্বর বিচারসভার ব্যবস্থা করুন, আর প্রতিপক্ষরূপে আমন্ত্রণ জানান কোনো অদ্বৈতবাদী তর্কযোদ্ধাকে।"

"যতিবর, নিকটেই শৃঙ্গেরীতে বিরাজ করছেন আমার গুরুদেব বিদ্যাশঙ্কর মহারাজ। তিনি শুধু শৃঙ্গেরী মঠেরই অধীশ্বর নন, শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের এক শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ সারা দাক্ষিণাত্যে। বেশ কথা, ওঁরেই আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনার প্রতিপক্ষ হিসাবে।"

দুই আচার্যের বিচারসভা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সাধক ও অগণিত উৎসাহী জনগণের সম্মুখে শুরু হয় শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের সুতীব্র সংঘাত। নবীন সন্ন্যাসী মধ্ব কিন্তু এই বিচার-দ্বন্দ্বে সেদিন তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই। অমানুষী প্রতিভার অধিকারী, বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত ও সাধক শিরোমণি বিদ্যাশঙ্করের শ্রুতিসিদ্ধ যুক্তিজাল তিনি ছিন্ন করিতে পারেন নাই। শেষটায় এই শক্তিধর প্রতিপক্ষের কাছে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

এই পরাজয়ের গ্লানি মধ্বের জীবনে আনে এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া। এখন হইতে শুধু অদ্বৈতবাদের উপরই তিনি খড়্গহস্ত হন নাই, আচার্য বিদ্যাশঙ্কর ও শৃঙ্গেরী মঠকেও জ্ঞান করিতে থাকেন তাঁহার প্রধান বৈরীরূপে।[১] বলা বাহুল্য, ত্রিবেন্দ্রাম সভার সেদিনকার করুণ অভিজ্ঞতাই মধ্বের বিরোধিতাকে তীব্রতর করিয়া তোলে, আর তাঁহার নিজস্ব দ্বৈতবাদ স্থাপনের সঙ্কল্পকে করে দৃঢ়তর।

তথ্য প্রমাণ হইতে দেখা যায় ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে আচার্য তাঁহার দক্ষিণ-ভারত পর্যটন শেষ করেন এবং এই পর্যটনের শেষের দিকেই শৃঙ্গেরীর মঠাধীশ বিদ্যাশঙ্করের সহিত হয় তাঁহার বিচার বিতর্ক।[২] নবীন সন্ন্যাসী আচার্য মধ্বের বয়স তখন প্রায় ত্রিশ বৎসর।

---

১ শৃঙ্গেরী মঠ এবং উড়ুপীর মধ্বমঠের দ্বন্দ্ব, বাদানুবাদ ও শত্রুতা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে। ফলে মধ্ব ও তাঁহার অনুগামীরা নানাভাবে নিগৃহীত হইতে থাকেন। প্রায় এক শতাব্দীর পর মধ্ব-মত ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করিলে উভয় মঠাধীশের মধ্যে মৈত্রী ও সৌজন্যমূলক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে।

২ শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ-পঞ্জী হইতে দেখা যায়, স্বামী বিদ্যাশঙ্কর গদিতে আরোহণ করেন ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে। অনুমিত হয়, ইহার কিছু পরেই মধ্বের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও সংঘর্ষ বাধে।

ত্রিবেন্দ্রাম হইতে মধ্ব সরাসরি চলিয়া যান রামেশ্বরধামে এবং সেখানে চারমাস কাল অতিবাহিত করেন নিভৃত তপস্যায়। এখানেও অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীরা দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে বিচার-বিতর্কে আহ্বান জানাইতে থাকেন। কিন্তু তপস্যাপরায়ণ মধ্বকে এসময়ে তর্কসভায় টানিয়া আনা সম্ভব হয় নাই। আপন মনে ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া তিনি সমাপ্ত করেন তাঁহার চাতুর্মাস্য ব্রত।

অতঃপর সদলবলে তিনি শ্রীরঙ্গমে উপনীত হন। পরম প্রভু নারায়ণের সেবা-অর্চনায় কিছুদিন কাটানোর পর পালর নদীর তীর ধরিয়া বিষ্ণুকাঞ্চীতে প্রবেশ করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসেন উড়ুপীতে।

বিষ্ণুকাঞ্চীতে থাকাকালে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। নারায়ণ আচার্য ইহার বিবরণ দিয়াছেন। এই ঘটনাটির মধ্য দিয়া মধ্বের অলৌকিক প্রতিভার প্রকাশ দেখা যায়। তাঁহার আগমনবার্তা শুনিয়া একদল অদ্বৈতী ও শৈব সন্ন্যাসী তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরেন এবং তাঁহাকে নানাভাবে উত্তেজিত করিয়া টানিয়া আনেন শাস্ত্র বিচারের দ্বন্দ্বে। মধ্বের ভিতরে এ সময়ে দেখা যায় এক দিব্য ভাবের আবেশ। শাস্ত্রের এক একটি শব্দের বহুতর অর্থ ও দ্যোতনা তিনি প্রকাশ করিতে থাকেন তড়িৎবেগে ও অনর্গলভাবে। স্বয়ং সরস্বতী যেন এই নবীন সন্ন্যাসীর কণ্ঠে সেদিন আবির্ভূত। বিচারকামী পণ্ডিতেরা তাঁহার এই অমানুষী প্রতিভা ও অলৌকিক প্রজ্ঞা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যান। বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী উভয় স্থানেই মধ্বের জয়জয়কার ধ্বনিত হয়।

উড়ুপীর মঠে ফিরিয়া মধ্ব গুরুদেব অচ্যুতপ্রকাশের পদবন্দনা করিলেন। সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন নানা তীর্থের নানা বিচার সভার বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

মধ্বের মনোভাব বুঝিতে গুরুর ভুল হয় নাই। প্রশ্ন করিলেন, "বৎস, পর্যটন শেষে তোমার মন এমন ভাবাক্রান্ত হয়ে আছে কেন, বলতো ?"

মৃদু কণ্ঠে মধ্ব নিবেদন করেন, "প্রভু, চলার পথে বহু বিচারসভার সম্মুখীন হয়েছি। জয় পরাজয় দুই-এরই অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং পরাজয় থেকে জয়মাল্যই লাভ করেছি বেশীর ভাগ স্থানে। আমার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, ভক্তি-সাম্রাজ্য স্থাপনের সংকল্পও আরো দৃঢ় হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রভু, ত্রিবেন্দ্রামের সভায় শৃঙ্গেরীর অধ্যক্ষের কাছে যেভাবে আমি পরাস্ত হয়েছি তার গ্লানি যে এখনো ভুলতে পারছিনে।"

"ভালোই হয়েছে বৎস। শক্তিমান্ প্রতিপক্ষের হাতে এ ধরনের আঘাতের তোমার প্রয়োজন ছিল। এ আঘাত থেকে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো, কোথায় কোন্ ত্রুটি-বিচ্যুতি তোমার ভেতর লুকিয়ে রয়েছে। নিজের মতবাদের ভিত্তি আর তার দুর্গ-প্রাকার আরো বেশী সতর্কতার সঙ্গে এবার গড়ে তোলো।"

"হ্যাঁ প্রভু, আমি উপলব্ধি করেছি—একটা নূতনতর ভক্তিপন্থী দ্বৈতবাদ ভারতে আমি স্থাপন করতে চাই, অথচ আমার সপক্ষে নেই আমার এই মতবাদের সমর্থক ব্যাসদেবের বেদান্তসূত্রের কোনো নূতন ভাষ্য।"

"ঠিকই বলেছো, সূত্রভাষ্য ছাড়া দেশের সাধক ও দার্শনিকেরা তোমার নূতন মতবাদ গ্রহণ করবে কেন ? তাই আমি বলছি, তুমি অতি সত্বর তোমার মতবাদের সমর্থক একটি গীতাভাষ্য রচনা করো। তারপর কয়েক বৎসর উড়ুপীতে নিবিষ্ট হয়ে বসে সমাপ্ত করো ব্যাসসূত্রের ভাষ্য।"

"তারপর ?"

"তারপর তুমি হিমালয়ে যাও। মহর্ষি ব্যাসদেবের কৃপালাভের চেষ্টা করো। নূতনতর সূত্রভাষ্য হাতে নিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করো নূতন ভক্তিবাদ এবং তারপর শুরু হোক উত্তর ভারতে তোমার বিজয়-অভিযান। বৎস, স্মরণ রেখো, শৃঙ্গেরী মঠই ভারতবর্ষ নয়। আর শুধু শাঙ্কর মতই তোমার প্রতিপক্ষ নয়। শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ ছাড়াও তোমায় যুঝতে হবে ভাস্কর, রামানুজ প্রভৃতির মতবাদের বিরুদ্ধে। তাই এখন থেকে তোমার প্রস্তুতিকে আরো দুর্ভেদ্য, আরো নিখুঁত ক'রে তোলো।"

গুরুর এই নির্দেশ মধ্ব মানিয়া নেন, রত হন নিজ মতের সমর্থক ভাষ্য রচনায়। কয়েক বৎসরের মধ্যে আরব্ধ কার্য সমাপ্ত হইয়া গেল। এবার তাঁহার দৃষ্টি পড়িল উত্তর ভারতের আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র বারাণসী হরিদ্বারের দিকে।

মধ্ব মনে মনে স্থির করিলেন, প্রথমে স্বরচিত সূত্রভাষ্য নিয়া বারাণসীতে যাইবেন। সেখানকার সন্ন্যাসী, দার্শনিক ও পণ্ডিতসমাজ তাঁহার যে সমালোচনা করিবেন, তদনুযায়ী করা হইবে ভাষ্যের পরিবর্তন। তারপর হিমালয়ে গিয়া মাগিবেন ব্যাস-দেবের আশীর্বাদ। এই আশীর্বাদে বলীয়ান্ হইয়া হরিদ্বারে নামিয়া আসিবেন—ঘোষণা করিবেন তাঁহার নূতনতর ভক্তিবাদ।

মূল্যবান পুঁথিপত্র ঝুলিতে ভরিয়া মধ্ব পদব্রজে উত্তর ভারতের দিকে রওনা হইলেন। সঙ্গে রহিল কয়েকটি অন্তরঙ্গ শিষ্য ও একদল তীর্থযাত্রী।

তখনকার দিনে তীর্থ পর্যটনে আপদ বিপদের অন্ত ছিল না। পথিমধ্যে প্রায়ই অতিক্রম করিতে হইত বড় বড় অরণ্য। এই সব অরণ্যে ছিল হিংস্র বাঘ ও সাপের ভয়, ইহা হইতেও বিপজ্জনক ছিল দস্যু ভয়। পথচারীরা ধনী কি নির্ধন, গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী, কোনো কিছু বিচার তাহারা করিত না। সুযোগ পাইলেই অতর্কিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পথিকের সর্বস্ব লুটিয়া নিত।

এই চলার পথে সঙ্গিগণসহ আচার্য মধ্বকেও বার বার কম বিপদে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু কখনো ঈশ্বরের অনুগ্রহে, কখনো বা তাঁহার নিজের যোগশক্তির বলে আচার্য ও তাঁহার সঙ্গীরা চরম বিপদ ও লাঞ্ছনার হাত হইতে রেহাই পাইয়াছেন। নারায়ণ আচার্য তাঁহার মধ্ববিজয়ে এ ধরনের নানা অত্যাশ্চর্য কাহিনীর বিবরণ দিয়াছেন।

মহারাষ্ট্রের খণ্ডরাজ্য দেবগিরিতে সেবার এক কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটে। এখানকার রাজা মহাদেব অল্প কিছুদিন আগে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তরুণ বয়স তাঁহার, অন্তরে উৎসাহ উদ্দীপনার অবধি নাই, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য এক দীর্ঘ খাল খননের কাজে তিনি হাত দিয়াছেন। প্রকল্প অতি বৃহৎ এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সমাপ্ত করিতে হইবে। তাই রাজা মহাদেব অনেক সময় নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই খননের কাজ পরিদর্শন করেন।

ঢোল শোহরত করিয়া রাজার আদেশ জানানো হইয়াছে। যে কোনো পথচারীই এই খালের নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিবে, খননের কার্যে তাহাকে দিতে হইবে অন্তত একদিনের কায়িক পরিশ্রম। ফাঁকি দিয়া কেহ এই কাজ এড়াইয়া না যায়, এ জন্য রাজার ভারী কড়া ব্যবস্থা।

মধ্ব ও তাঁহার শিষ্যেরা একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সেদিন খালের পাশ দিয়া যাইতেছেন। প্রহরীরা তাঁদের আটক করিল। রাজার আদেশ শুনাইয়া দিয়া কহিল, "এবার তোমাদের ঝোলাঝুলি রেখে, কোদাল হাতে খাদের ভেতর নেমে পড়ো।"

মধ্বের শিষ্য ও সঙ্গীরা বুঝান, "ভাই, আমরা সাধু-সন্ন্যাসী। গঙ্গাতীরের তীর্থ-দর্শনে যাচ্ছি। রাজা যে আইন করেছেন, তাঁর গৃহস্থ প্রজারা তা মেনে চলবে। ভিনদেশী মানুষ, পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসী, এদের ওপর তো এ আইনের প্রয়োগ চলতে পারে না।"

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে? রাজরক্ষীরা জোর চেঁচামেচি ও গালাগালি শুরু করিয়া দিল।

পাত্রমিত্র সঙ্গে নিয়া দেবাগিরিরাজ সেদিন খাল-খননের কাজ নিজেই পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। রক্ষী ও সাধুদলের সোরগোল শুনিয়া সেদিকে তিনি উপস্থিত হন। গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন, "ব্যাপার কি? কাজকর্ম না ক'রে এখানে এত হট্টগোল করা হচ্ছে কেন?"

রক্ষীদের পক্ষ হইতে সব বলা হইবার পর মধ্ব রাজাকে উদ্দেশ করিয়া কহেন, মহারাজ, প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য আপনি এই খাল খননের কাজে হাত দিয়েছেন, খুবই ভাল কথা। কিন্তু এতে সাধু-সন্ন্যাসীদের ধরে টানাটানি কেন?"

"রাজার বিধান সাধু অসাধু সবার ওপরই প্রযোজ্য।"

"কাজের দায়িত্ব প্রধানত রাজার আর তাঁর গৃহস্থ প্রজাদের। সাধু-সন্ন্যাসীরা কেন এতে কায়িক পরিশ্রম দিতে যাবে?"

"কেন, সাধু-সন্ন্যাসীরা কি সমাজ থেকে কিছু পান না? তাঁদের খাওয়া-পরা চলে কোথা থেকে? জনসাধারণ তাঁদের খাবার যোগায়, প্রতিদানে জনকল্যাণের কাজে কিছুটা ভাগ তাঁদের নিতে হবে বৈ কি?"

"মহারাজ, আপনি ভ্রান্ত। সাধু-সন্ন্যাসীদের কাজকে আপনি স্থূল দৃষ্টিতে দেখছেন কেন? আসলে তাঁদের কাজ সম্পন্ন হয় সূক্ষ্ম স্তরে। তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষা, প্রেরণা ও আশীর্বাদ সর্বত্র এনে দেয় প্রকৃত কল্যাণ।"

বিরক্তির সুরে রাজা মহাদেব বলিয়া উঠেন, "আপনার এতো কিছু তত্ত্বকথা শোনবার সময় আমার নেই। রাজ-সরকার থেকে যে আদেশ প্রচার করা হয়েছে, সবাইকে নির্বিচারে তা মেনে চলতে হবে। আর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে খাল খননের কাজে আপনারা সবাই নেমে পড়ুন।"

"বেশ, মহারাজের আদেশমতোই কাজ হবে, কিন্তু তার আগে একটা ক্ষুদ্র নিবেদন আছে।"- বিনীতভাবে বলেন আচার্য মধ্ব।

"কি আপনার সেই নিবেদন?"

"মহারাজ, আপনি এ রাজ্যের অধীশ্বর, প্রজাদের পিতা, রক্ষা-বর্তা। প্রজার মঙ্গলের জন্য পবিত্র অনুষ্ঠান আপনি শুরু করছেন, তাতে আপনার মঙ্গলহস্তের স্পর্শ থাকা উচিত। এতো বড় একটা কাজ হতে যাচ্ছে, কিন্তু তাতে আপনার স্পর্শ পড়েছে কি?"

"না, তা পড়ে নি বটে,"—নরম সুরে স্বীকার করেন দেবাগিরির রাজা।

"সে ভুল আজই এখনি সংশোধন করুন মহারাজ। আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুটা

মাটি কেটে তা মাথায় নিয়ে আপনি দূরে ফেলে আসুন, এতে আপনার কর্তব্য যেমন করা হবে, তেমনি প্রজারাও পাবে উৎসাহ ও প্রেরণা।”

“আপনি ঠিকই বলেছেন, সন্ন্যাসীবর। আমি সানন্দে এখনি খাল খননের কাজে হাত লাগাচ্ছি।” —বলার সঙ্গে সঙ্গে কোদাল ও ঝুড়ি নিয়া রাজা খালের ভিতর নামিয়া পড়েন।

খনন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে রাজা যেন ভূতাবিষ্ট হইয়া যান। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকায় বহিতেছে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস। যন্ত্রচালিত মানুষের মতো কেবলই ঝুড়ি-ঝুড়ি মাটি কাটিয়া চলিয়াছেন, একাজে শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, নাই কোনো বিরতি। প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হইতেছে, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও রাজাকে কেহ থামাইতে পারিতেছে না। তবে কি তিনি উন্মাদ হইয়া গেলেন? অথবা কোনো অশরীরী প্রেত তাঁহার উপর ভর করিয়াছে। মন্ত্রী ও রাজপারিষদেরা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রাসাদে খবর দেওয়া হইল, রানী ও পুরনারীরা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া কান্না জুড়িয়া দিলেন।

তবে ইতিমধ্যে সবাই বুঝিয়া নিয়াছেন, রাজার এই অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য দায়ী সন্ন্যাসীবর মধ্ব। মধ্বের এক শিষ্য অতঃপর ব্যাপারটা ফাঁস করিয়া দেন। মুচকি হাসিয়া কহেন, “রাজার দুর্ভাগ্য, আমাদের আচার্য যে কত বড় মহাপুরুষ তা তিনি বুঝতে পারেন নি। মধ্ব হচ্ছেন বায়ুর অবতার, প্রভু নারায়ণের লীলার প্রধান সহায়ক। রাজার ওপর তিনি রুদ্ধ হয়েছেন, তাই বায়ুর ভর হয়েছে রাজার ওপর। আচার্যকে প্রসন্ন না করলে, এবার রাজার আর রক্ষা নেই, এভাবে দিনরাত, বৎসরের পর বৎসর, তাঁকে মৃত্তিকা খনন ক'রে যেতে হবে।”

অতঃপর সবাই মিলিয়া মধ্বের চরণে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে। আচার্যের ক্রোধ প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে দেবীগিরি-রাজের ভূতাবিষ্ট ভাব কাটিয়া যায়। সম্পূর্ণরূপে তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠেন।

এবার স্বজনগণসহ রাজা মধ্বের চরণে প্রণত হন, তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করেন। প্রসন্ন মনে রাজাকে আশীর্বাদ জানাইয়া মধ্ব বলেন, “মহারাজ, একটা কথা সদাই স্মরণ রাখবেন, সাধু-সন্ন্যাসীরা কর্ম ও ধ্যান মননের ভেতর দিয়েই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন ক'রে যাচ্ছেন। ভগবান্ শ্রীনারায়ণের দর্শন ক'জন পায়? কিন্তু নারায়ণের চিহ্নিত সেবক সাধু-সন্ন্যাসীদের দর্শন সবাই অনায়াসে পেতে পারে। এঁদের ভেতর দিয়েই পৃথিবী আর বৈকুণ্ঠের ভেতর রচিত হয় যোগসূত্র। তাই লক্ষ্য রাখবেন, আপনার রাজ্যে সাধুদের অমর্যাদা যেন না হয়। আশীর্বাদ জানাচ্ছি, আপনার এই খাল খননের কাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হবে।”

অনুতপ্ত দেবীগিরিরাজ মধ্বের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিলেন। এই রাজ্যে কিছুদিন অবস্থানের জন্য তাঁকে সানুনয় অনুরোধও জানাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর ধরিয়া রাখা গেল না।

আচার্য মধ্বের আশীর্বাদ অচিরে ফলিয়া যায়। রাজা মহাদেব স্বহস্তে কোদাল দিয়া সারাদিন খাল কাটিয়াছেন এ সংবাদ বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া পড়ে। সহস্র সহস্র প্রজা উৎসাহে মাতিয়া উঠে, খাল খননের কাজে লাগিয়া যায়। রাজার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

পণ্ডিত নারায়ণ আচার্য মণিমঞ্জরীতে পরমগুরু মধ্বের যোগবিভূতি প্রদর্শনের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন :

পরিব্রাজনের পথে মধ্ব ও তাঁহার শিষ্যগণ সেবার উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক তুর্কী-মুসলমান রাজার সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রাজ্যে প্রবেশ করিতে যাইবেন এমন সময় রক্ষী সেনারা তাঁহাদের বাধা দিল। কিন্তু আচার্য মধ্ব পিছু হটিবার পাত্র নন, সেনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি কতকগুলি বিশেষ মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ সেনাদলটি মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মতো তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িল।

জনশ্রুতি আছে, মধ্ব অতঃপর সরাসরি ঐ মুসলমান রাজার সকাশে গিয়া উপস্থিত হন। আচার্য তুর্কী ভাষা কোনোকালেই শিখেন নাই। কিন্তু সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, বিদেশী ভিন্নধর্মী রাজার সহিত বিদেশী ভাষাতেই অবলীলায় তিনি কথা-বার্তা চালাইয়া গেলেন।

মধ্বের সুগৌর সুঠাম দেহ, দিব্যকান্তি ও প্রখর ব্যক্তিত্বে মুসলমান রাজা একেবারে মুগ্ধ। বার বার তিনি অনুরোধ জানান, আচার্য আরো কিছুকাল তাঁহার রাজ্যে সশিষ্য বসবাস করুন, তাঁহাদের সেবা-পরিচর্যার জন্য যে কোনো পরিমাণ অর্থব্যয়ে রাজা কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু মধ্বের পক্ষে আর সেখানে বিলম্ব করা সম্ভব নয়। তুর্কীরাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইয়া সেখান হইতে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মধ্বের প্রিয় শিষ্য, একান্ত সেবক, সত্যতীর্থ সে-বার এক মহাসংকটে পতিত হন। পথ চলিতে চলিতে সাধুরা সবাই এক বিস্তীর্ণ অরণ্যের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নাই, খানিক বাদেই চারিদিকে নামিয়া আসিবে ঘন অন্ধকার। এই সময়ে এই দীর্ঘ বনের মধ্য দিয়া পথ চলা কঠিন। তাই ভাবিয়া-চিন্তিয়া সবাই স্থির করিলেন, আজিকার মতো এখানেই বিশ্রাম করা যাক, কাল প্রত্যুষে ডেরা-ডাণ্ডা উঠানো যাইবে।

সত্যতীর্থ তাঁহার ঝোলাঝুলি নামাইয়া তাড়াতাড়ি ঐ বনের দিকে চলিয়া গেলেন। গুরু মহারাজের রাত্রের আহারের জন্য কিছু ফলমূল এখনি তাঁহার সংগ্রহ করা চাই।

কিছুকাল পরেই বনমধ্যে শোনা গেল এক হিংস্র বাঘের গর্জন। সকলেই মহা উৎকণ্ঠিত। বেচারা সত্যতীর্থ এই বাঘের মুখে পড়ে নাই তো? দলবল নিয়া আচার্য মধ্ব তখনি সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন।

বনের ভিতর প্রবেশ করিতেই যে দৃশ্য দেখা গেল তাহাতে সকলেরই চক্ষুস্থির। সত্যতীর্থ একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে ফল-পাকড় সংগ্রহ করার জন্য। আর তাহার অনতিদূরেই - থাবা গুটাইয়া বসিয়া আছে এক প্রকাণ্ড হিংস্র বাঘ। ভাঁটার মতো দুই চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। বৃক্ষাস্থিত শিকারের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া মাঝে মাঝে ছাড়িতেছে হুঙ্কার-ধ্বনি।

শমন-সদৃশ এই বাঘকে দেখিয়া সাধুরা সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। এমন সময়ে আচার্য মধ্বের দেহে দেখা গেল এক দিব্য ভাবের আবেশ। ভাবকম্পিত দেহে, ধীরপদে ঐ বাঘের দিকে তিনি অগ্রসর হইয়া গেলেন। সম্মোহিতের মতো বাঘটি কিন্তু স্থির হইয়া বসিয়া আছে, চোখ দুইটি নিষ্পলক, তর্জন গর্জন একেবারে স্তব্ধ। উহার

সম্মুখে দাঁড়াইয়া মধ্ব নীরবে কয়েকবার হস্ত সঞ্চালন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র বাঘ মাথা নত করিল, সে স্থান ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল গভীর বনাঞ্চলে।

সবাই এবার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, সত্যতীর্থকে গাছ হইতে নামাইয়া আনা হইল।

সত্যতীর্থ যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "গুরুদেব, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা আমি করবো না। কারণ আপনার চরণেই নিজেকে আমি বিকিয়ে দিয়েছি! কিন্তু একটি প্রশ্ন আমি না ক'রে পারছিনে। আমার মতো নগণ্য মানুষকে বাঁচানোর জন্য আপনি কেন আপনার অমূল্য জীবন আজ বিপন্ন করতে গিয়েছিলেন ?"

প্রশান্ত কণ্ঠে গুরু কহিলেন, "বৎস, তোমার জীবন যে বিষ্ণু ভগবানের কর্মে উৎসর্গ করা। ঐশ্বরীয় কর্ম সম্পন্ন করার জন্য তোমার বেঁচে থাকা প্রয়োজন আছে। তুমি আমার গীতাভাষ্য ও সূত্রভাষ্যের অনুলিপি লিখেছো। সেবায় ও কর্মে নানাভাবে আমায় সাহায্য করেছো। ঈশ্বরের আদিষ্ট কাজে আরো অনেক সাহায্য তুমি করবে। এই কথাটাই তো হিংস্র বাঘটাকে আকারে ইঙ্গিতে আমি বুঝিয়ে বললাম। তাই তো সে আর কোনো দ্বিরুক্তি না ক'রে তোমায় ছেড়ে চলে গেল।"

নিজের যোগবিভূতির কথা, ঐ অলৌকিক ঘটনার কথা মধ্ব কি সহজভাবেই না বর্ণনা করিলেন। শিষ্য ও সঙ্গীরা সবিস্ময়ে তখন একে অন্যের মুখের দিকে তাকাইতেছেন।

দীর্ঘ পরিব্রাজনের শেষে আচার্য মধ্ব এবার বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানকার প্রধান প্রধান মঠ-মণ্ডলীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। গীতাভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে যে নূতন দ্বৈতবাদী ভক্তিধর্ম তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে স্থানীয় সাধক ও পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার মত বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। অতঃপর নিজের মতবাদের শাস্ত্রীভিত্তিকে আরো দৃঢ় করিয়া নিয়া মধ্ব উপনীত হন পবিত্র সাধন-ধাম হরিদ্বারে।

মধ্বের অনেক দিনের আশা, ব্যাসগুহায় বসিয়া প্রাণ ভরিয়া তপস্যা করিবেন, লাভ করিবেন শ্রীনারায়ণের অবতার ব্যাসদেবের পুণ্যময় দর্শন। তারপর তাঁহার চরণে সমর্পণ করিবেন স্বরচিত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য। সে আশা এবার এতদিনে পূর্ণ হইল। দীর্ঘ ধ্যান-মননের ফলে মহামুনি ব্যাস জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হইলেন তাঁহার নয়নসমক্ষে। মৃদু মধুর হাস্যে সূত্রের ভাষ্য স্বহস্তে তুলিয়া নিয়া তাঁহাকে করিলেন কৃতকৃতার্থ।

মহামুনি অতঃপর কহিলেন, "মধ্ব, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন। তোমার মতবাদ ভারতীয় দর্শনকে পুষ্ট করেছে, এ যুগের ভক্তিধর্মেরও করেছে বিস্তার সাধন। ভক্তি-বাদ প্রচারের দিকে দৃষ্টি রেখে এবার তুমি মহাভারতের তাৎপর্য নির্ণয়কারী একটি গ্রন্থ রচনা করো। এতে তোমার আরব্ধ পুণ্যকর্ম হয়ে উঠবে সহজতর।"

মধ্বের হাতে একটি সম্পুট তুলিয়া দিয়া স্নেহভরে আরো কহিলেন, "বৎস, এতে-

রয়েছে তিনিটি পরম পবিত্র শালগ্রামশিলা। দেশে ফিরে গিয়ে এই শিলা যে-যে স্থানে তুমি স্থাপন করবে সেই সেই স্থান পরিচিত হয়ে উঠবে জাগ্রত পীঠরূপে।"[১]

এই অযাচিত করুণায় মধ্ব একেবারে অভিভূত। দুই নয়নে বহিতেছে আনন্দের অশ্রুধারা। মহামুনির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইয়া, গুহা হইতে তিনি বাহির হইয়া আসেন।

হিমালয় ক্রোড়স্থিত মহাতীর্থগুলি পরিব্রাজন করার পর মধ্ব সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন। এবার হইতে অধ্যাত্ম-ভারতের বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চে আসিয়া তিনি দাঁড়ান, শুরু হয় ভক্তিসিদ্ধ মহাসাধক, দ্বৈতবাদী মহাদার্শনিক, মধ্বাচার্যের অবিস্মরণীয় ভূমিকা।

নানা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের ভিতর মধ্ব-অনুগামীরা হইতেছেন আপোসহীন কট্টর দ্বৈতবাদী।

সারা জীবন মধ্ব শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন, নিজের গ্রন্থসমূহে উপস্থাপিত করিয়াছেন প্রচুর শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি, যুক্তিতর্ক ও তথ্য-প্রমাণ। কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শঙ্করের মতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির উপরই তিনি নির্ভর করিয়াছেন, বেদ-উপনিষদ অপেক্ষা পুরাণ-শাস্ত্রের সহায়তাই নিয়াছেন বেশী।

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বৈষ্ণব আন্দোলনের এক বড় ভিত্তি। মধ্ব কিন্তু তাঁহার এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় পূর্বসূরীর মতবাদের উপরও আঘাত হানিতে পশ্চাদপদ হন নাই।

মধ্ব মতের প্রধান ভিত্তি ভেদবাদ। ঈশ্বর ও জীব, সেব্যবস্তু ও সেবক নিত্য পৃথক, নিত্য ভেদযুক্ত। শুধু তাহাই নয়, ঈশ্বর স্বতন্ত্র, আর সবই অস্বতন্ত্র বা ঈশ্বর-নির্ভর। তাঁহার এই দ্বৈতবাদ দার্শনিক মহলে স্বতন্ত্র-অস্বতন্ত্রবাদ নামে পরিচিত। মধ্বপন্থীরা নিজেদের সম্প্রদায়কে বলেন সদ্‌-বৈষ্ণব।

মধ্বাচার্য ব্রহ্ম বা পরমাত্মার স্থলে স্থাপন করিয়াছেন বিষ্ণু বা নারায়ণকে। তিনি বলেন, সৃষ্টির আদিতে বিরাজিত ছিলেন এক ও অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ভগবান্‌ নারায়ণ, তখন ব্রহ্মা বা শিব কেহই ছিলেন না।[২]

সেই বিষ্ণুর দেহ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে এই বিশ্বচরাচর[৩] এবং এই বিষ্ণু বা নারায়ণই একমাত্র সৎ বস্তু, অশেষ সদ্‌গুণের আধারও তিনি বটেন। তিনি নির্দোষ ও স্বতন্ত্র, তাহা ব্যতীত আর সমস্ত কিছুই অস্বতন্ত্র অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন।[৪]

---

১ এই পরম পবিত্র শিলাত্রয় মধ্বাচার্য সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করেন সুব্রহ্মণ্য, উড়ুপী ও মধ্যতল এই তিনটি মঠে।

২ একো নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ,
আনন্দ এক এবাগ্র আসীন্নারায়ণঃ প্রভু ॥

৩ বিষ্ণোর্দেহাজ্জগৎ সর্বমাবিরাসীৎ।

৪ মহোপনিষদের—"যথা পক্ষী চ সূত্রঞ্চ নানা বৃক্ষরসা যথা'—ইত্যাদি শ্লোকে আচার্য মধ্বের দ্বৈতবাদের কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

জীব ও ঈশ্বরের এই কেবল-ভেদ ছাড়া আচার্য আরও পাঁচ প্রকার ভেদের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জড় ও ঈশ্বরে ভেদ, জড় ও জীবে ভেদ এবং জীবসমূহ ও জড় পদার্থ-সমূহের আভ্যন্তরীণ ও পরস্পর ভেদ—এই পঞ্চ ভেদকে তিনি বলিয়াছেন প্রপঞ্চ।[১]

আচার্যের মতে, জীবের মোক্ষ বা মুক্তি তখনই হয় যখন তাহার জন্ম-মৃত্যুর যাতায়াত বা পুনর্জন্মের অবসান ঘটে এবং সে যখন বৈকুণ্ঠে নারায়ণের কাছে স্থিতি লাভ করে।

তিনি আরও বলেন, মুখ্য প্রাণবায়ুর উপাসনাই শ্রেষ্ঠ—এবং নারায়ণের পুত্র বায়ুর কৃপা ছাড়া জীবের মোক্ষলাভের কোনো সম্ভাবনা নাই। মধ্বের অনুগামী বৈষ্ণবদের বিশ্বাস, এ যুগে মধ্বই হইতেছেন বায়ুর অবতার, তাই তিনিই মানুষের ত্রাণকর্তা। পুণ্যকর্মের জন্য মধ্ব ব্যবস্থা দিয়াছেন অক্ষয় স্বর্গবাস, আর মধ্ব বৈষ্ণববাদের বিরোধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছে অনন্ত নরকবাস।[২]

মধ্বের মতবাদ অনুসারে জীবাত্মা স্বাভাবিকভাবেই অবিদ্যা দ্বারা আবৃত। এই অবিদ্যা দূর হয় এবং মোক্ষলাভ সম্ভব হয় ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের পর। উন্নতশ্রেণীর জীবাত্মারাই এই জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং এজন্য তিনি প্রচার করিয়াছেন আঠারোটি অনুশাসন। এগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে—বৈরাগ্য, শম, গুরুসেবা, ভগবৎ-চরণে ভক্তি, উপাসনা, পূর্বমীমাংসা অনুযায়ী শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান অসত্য মতবাদের বিরোধিতা প্রভৃতি।

তাঁহার মতে, শ্রীবিষ্ণুর সেবার উপায় তিনটি, প্রথম অঙ্কন বা সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র ইত্যাদির চিহ্ন ধারণ। দ্বিতীয়—নামকরণ অর্থাৎ বিষ্ণুর বিভিন্ন নাম অনুসারে পুত্রাদির নাম রাখা। তৃতীয়—কায়িক, বাচিক ও মানসিক, এই ত্রিবিধ ভজন।

জীবনের শেষপাদে আচার্য মধ্ব উড়ুপী ও অন্যান্য স্থানে কৃষ্ণমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অখিলরসামৃত-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ইষ্টরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বা মধুর ভজনের পথ অনুসরণ করিয়াছেন, এমন কোনো প্রমাণ নাই।

কেহ কেহ মনে করেন, মধ্বের মতবাদ হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন উদ্ভূত

---

১ বিশ্বকোষ, পৃঃ ১০২।

২ মধ্ব ছাড়া অপর কোনো প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় দার্শনিক বা সাধক অনন্ত নরকবাসের কথা প্রচার করেন নাই। তাই অনেকের ধারণা, খ্রীষ্টধর্মের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই মধ্ব একথা বলিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের কল্যাণপুর খ্রীষ্টানদের প্রাচীন' উপনিবেশরূপে খ্যাত। ষষ্ঠ শতকেও পর্যটক কস্‌মস্‌ ইন্‌ডিকো প্লয়স্টস্‌ কল্যাণপুরে এমন একজন ধর্মযাজককে দেখিতে পান যিনি পারস্য হইতে এদেশে আসেন। এই কল্যাণপুর ছিল মধ্বের জন্মস্থান পাজকার কাছে, সমুদ্রে উপকূলে। কাজেই নিকটস্থ খ্রীষ্টানসমাজের দুই একটি তত্ত্ব মধ্বের মতবাদের সহিত মিশিয়া গেলে বিস্ময়ের কিছু নাই। দ্রঃ—হেস্টিংস: এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিক্‌স, ভল্যু: ৬।

হইয়াছে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্ব সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। আসলে এ ধারণার কোনো ভিত্তি নাই।[১]

ব্যাসগুহা বদরীনারায়ণ প্রভৃতি হিমালয়ের জাগ্রত তীর্থসমূহে কিছুদিন অবস্থানের পর মধ্বাচার্য সমতল ভূমিতে নামিয়া আসেন। এ সময়ে উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ-নগর তিনি পরিভ্রমণ করেন এবং প্রচার করেন নিজের ব্যাখ্যাত ভক্তিবাদ।

অতঃপর আচার্য প্রত্যাবর্তন করেন দাক্ষিণাত্যে। গোদাবরী তীরের তীর্থ ও জনপদে বহু নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শোভন ভট্ট ও স্বামী শাস্ত্রী নামে দুই পণ্ডিতের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল এই অঞ্চলে। মধ্বের সহিত শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত হইয়া এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও সাধন-ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দুই শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শোভন ভট্টের সন্ন্যাস নাম হয় পদ্মনাভতীর্থ। মধ্বের পরে তিনিই হন উডুপীর অধ্যক্ষ।

মধ্বের গুরু আচার্য অচ্যুতপ্রকাশ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হইলেও ভক্তিবাদের উপর তাঁহার আকর্ষণ ছিল সহজাত। প্রতিভাধর প্রিয় শিষ্যের সাহচর্য ও আকর্ষণ, তাঁহার

---

১ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিজে বা তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্য ও অনুগামীরা কোনো সময়েই মধ্বকে আদিগুরু বলিয়া বর্ণনা করেন নাই বা নিজেদের মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্তও বলেন নাই। বরং নানাস্থানে মাধ্ব বা তত্ত্ববাদীদের সমালোচনাই করিয়াছেন। গৌড়ীয় গণোদ্দেশ দীপিকায় উদ্ধৃত মধ্বমঠের একটি গুরুপরম্পরা এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের উক্তি হইতেই ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। আধুনিক গবেষণায় গৌড়ীয় গণোদ্দেশ দীপিকার শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বলদেব প্রথম জীবনে ছিলেন মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত। পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধক রাধাদামোদর দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয় গোষ্ঠীতে যোগ দেন। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রভাব ও আকর্ষণ বলদেব তখনও ছাড়িতে পারেন নাই। তাছাড়া, জয়পুরে থাকিতে তিনি অপর সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রুতি-অনুগ নয় এবং তাহাদের নিজস্ব বেদান্ত-ভাষ্যই বা নাই কেন, এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়াও তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয়। এই সব কারণে বলদেব গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে উৎসাহী হন।

সাধ্য-সাধন সম্পর্কে চৈতন্য-মত ও মধ্ব মতে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। চৈতন্যের ধর্ম শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূল, আর মধ্বের ধর্ম মহাভারতের দ্বারা প্রভাবিত। চৈতন্য গোপীপ্রেম, গোপীভজনকে উচ্চতম স্থান দিয়াছেন। মধ্ব বলিয়াছেন ইহার বিপরীত কথা। তাঁহার মতে, মহাভারতই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। আরও বলিয়াছেন, কৃষ্ণভক্তিতে ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ, গোপীরা ভক্তির অনেক নিম্নস্তরে অবস্থিত (দ্রঃ মধ্বাচার্যঃ ভাগবত তাৎপর্যম ১১।১২।২২)। তাছাড়া, "মধ্বাচার্য্য ব্রজবধূগণকে স্বর্বেশ্যার সহিত তুলনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতানুগ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পারকীয় সিদ্ধান্তকে হেয় প্রতিপাদন করিয়াছেন'—(দ্রঃ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ১৯৯)। সুতরাং মহাপ্রভুর সুমহান্ গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মধ্বমতাবলম্বী বলার কোনো যৌক্তিকতাই নাই। আসলে চৈতন্য মহাপ্রভু স্বতন্ত্র পুরুষ—তিনি নিজেই নিজের ধর্মসাম্রাজ্যের সংস্থাপক।

ভক্তি-পর শাস্ত্রব্যাখ্যা ও দ্বৈতবাদী নূতন সম্প্রদায়ের প্রবর্তন অচ্যুতপ্রকাশকে নবভাবে উদ্দীপিত করিয়া তোলে। শেষটায় মধ্বের দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপ্রণালী তিনি গ্রহণ করেন।

উপরোক্ত পণ্ডিতদের আগমনে মধ্বের বৈষ্ণব-আন্দোলন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠে। শত শত নরনারী উড়ুপীর মঠে আসিয়া গ্রহণ করে তাঁহার পরমাশ্রয়।

মধ্ব-মতের এই প্রসার ভক্তিবাদীদের সংখ্যাধিক্য শৃঙ্গেরী মঠের কর্তৃপক্ষকে চিন্তিত করিয়া তোলে। নূতন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভক্তিবাদ ভজন-পূজনের সহজ পন্থা জনসাধারণের কাছে অনেক বেশী সহজবোধ্য। ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে নবদীক্ষিত পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের ত্যাগ তিতিক্ষা ও উদ্যম। ফলে দিনের পর দিন আচার্য মধ্বের শিষ্য ভক্ত ও অনুগামীর দল বাড়িয়া উঠিতেছে।

পদ্মতীর্থ তখন শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ। মঠের সন্ন্যাসীদের নিয়া তিনি এক গোপন সভা আহ্বান করিলেন। মধ্বাচার্যের প্রভাব কি করিয়া খর্ব করা যায়, কিভাবে উড়ুপী মঠকে হীনবল করা যায় ইহাই বড় সমস্যা। বহু পরামর্শের পর স্থির হইল, মধ্বের ভক্তি-আন্দোলনকে একযোগে নানা দিক দিয়া আক্রমণ করিতে হইবে, চরম আঘাত হানিতে হইবে। যে সব রাজরাজড়া ও ধনী ব্যক্তিরা মঠের শিষ্য সমর্থক, তাঁহাদের যোগাইতে হইবে অর্থ ও লোকবল। প্রতি জনপদে, উড়ুপীর মঠে, মন্দিরে খণ্ডন করিতে হইবে প্রতিপক্ষের মতবাদ। উড়ুপীর মঠে মধ্বাচার্য ভক্তিশাস্ত্রের এক বিরাট গ্রন্থশালা গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই গ্রন্থশালাটি ধ্বংস করার গোপন ষড়যন্ত্রও এই সভায় করা হইল।

প্রচণ্ড উৎসাহে শৃঙ্গেরীর সন্ন্যাসীরা লড়াই-এ নামিয়া পড়েন। তাঁহাদের মঠ যেমন প্রাচীন, দলেও তেমনি আছে বহুসংখ্যক লোক। এ অঞ্চলে ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অধিকাংশই তাঁহাদের সমর্থক। মধ্ব ও তাঁহার শিষ্যদের লাঞ্ছনা ও পীড়নের সীমা থাকে না। তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় গ্রন্থশালাটি বিনষ্ট করা হয় সুকৌশলে। বাগ্নিযোগে আকস্মিকভাবে একদিন ইহা লুণ্ঠিত হয়। যে সব দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া মধ্ব তাঁহার নূতন মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, ভক্ত শিষ্যদের প্রস্তুতি গড়িয়া তুলিয়াছেন, দুষ্টের চক্রান্তে তাহা কোথায় উধাও হইয়া গেল। আচার্য এবং তাঁহার অনুগামীরা এই চরম আঘাতে একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন।

কিন্তু মধ্ব হার মানিবার পাত্র নন। যে ঈশ্বরীয় কাজের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, চরম দুর্দৈবের আঘাত আসিলেও সে কাজে তিনি বিরত হইবেন না। বিষ্ণুমঙ্গলের রাজা জয়সিংহ শৃঙ্গেরী মঠে যাতায়াত করিতেন, আবার এই রাজা আচার্য মধ্বের উপরও ছিলেন শ্রদ্ধাবান্। ভাবিয়া চিন্তিয়া মধ্ব সেদিন জয়সিংহের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "মহারাজ, প্রাচীন পুঁথিপত্রের এই অপহরণ শুধু বৈষ্ণবদের ক্ষতি নয়, এ ক্ষতি দেশের সকল শাস্ত্রবিদের সকল নরনারীর। ধর্ম ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ গবেষক মাত্রেরই স্বার্থহানি হবে এতে। আপনি একটু উদ্যোগী হয়ে শৃঙ্গেরীর মঠাধীশকে বুঝিয়ে বলুন, অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করুন।"

রাজা জয়সিংহ মধ্যস্থতা করিতে রাজী হন। শৃঙ্গেরীতে গিয়া মঠাধ্যক্ষকে

নানাভাবে তিনি বুঝান, আপন প্রভাব প্রতিপত্তি প্রয়োগ করেন। তাঁহার এই দৌত্যকার্য সফল হয় এবং শাস্ত্রগ্রন্থগুলি তিনি উডুপীর গ্রন্থাগারে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন।

এ ঘটনার পরও বেশ কিছুদিন উভয় মঠের মতবিরোধ ও বৈরিতা চলিতে থাকে। উত্তরকালে অবশ্য এই মতবিরোধের অবসান ঘটে, মাধ্ব বৈষ্ণব ও শৃঙ্গেরীর অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং উভয়ে উভয়ের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় যত্নবান্ হন। এ সময়ে উডুপী ও শৃঙ্গেরী মঠে তীর্থকামী বৈষ্ণব ও অদ্বৈতবাদীরা যাতায়াত করিতেন, ইহার প্রমাণ আছে।

যে সব বৈষ্ণব-বিরোধী প্রভাবশালী পণ্ডিত আচার্য মধ্বের শরণ নিয়া বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদের অন্যতম ত্রিবিক্রম আচার্য। ইনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা শৈব। শুধু মধ্বের যুক্তিতর্ক বিচারমল্লতা দেখিয়াই নয়, তাঁহার ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন ও অপূর্ব সাধননিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়াই ত্রিবিক্রম আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার বৈষ্ণবমত গ্রহণ বহুতর শৈবকে মধ্ব-মতের অনুরাগী করিয়া তোলে। এই নবদীক্ষিত পাণ্ডিতের পুত্র নারায়ণ আচার্যই উত্তরকালে হন মধ্বের জীবন-কাহিনীর রচয়িতা। দীক্ষাদান কালে মধ্ব ত্রিবিক্রম আচার্যকে একখানি নয়নমন-লোভন কৃষ্ণমূর্তি উপহার দেন। কোচিন রাজ্যে, দক্ষিণ কানাড়ায়, আজিও ভক্ত বৈষ্ণবেরা সাগ্রহে এই অনুপম বিগ্রহটি তীর্থযাত্রীদের দর্শন করায়।

১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মধ্বের পিতা দেহরক্ষা করেন। ইহার অল্পকাল মধ্যেই মধ্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দীক্ষার পর তাঁহার নূতন নাম হয় বিষ্ণুতীর্থ। আচার্য মধ্বের বৈষ্ণব আন্দোলনে সুপণ্ডিত বিষ্ণুতীর্থের অবদান প্রচুর।

জীবনের শেষপাদে মধ্বের ভক্তিসাধনা রূপান্তরিত হয়। নৈষ্ঠিক ভক্তিবাদ ধীরে ধীরে ঝুঁকিয়া পড়ে ভাবময়তা ও রসের দিকে। হৃদয়াসনে এতকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন শেষশায়ী বিষ্ণু, এবার তাহা অধিকার করেন অখিলরসামৃতসিন্ধু—বালগোপালমূর্তি —শ্রীকৃষ্ণ।

ধ্যান-সমাহিত মধ্বের নয়নসমক্ষে প্রভু বালগোপাল সেদিন আবির্ভূত হন। আবদারের সুরে কহেন, "আচার্য, এত মঠ-মন্দির তো করলে, কিন্তু আমার জন্য একটা ঠাঁই রাখলে না। তোমার ভক্তি-ভালবাসা কেমনতর গো? আমি শিগ্‌গীরই আসছি, আমার মূর্তি তুমি পাবে। সাগর থেকে ফেরা নৌকোর ভেতর আমি থাকবো। আমায় তুলে নিয়ে স্থাপন করবে তোমাদের মন্দিরে।"

লীলাময় ঠাকুর অন্তর্হিত হন। মধ্বের হৃদয়ে অনুরণিত হইতে থাকে তাঁহার মধুনিষ্যন্দী কণ্ঠের ঝঙ্কার। দিব্য আনন্দে আচার্য মধ্বের দেহ মন-প্রাণ আপ্লুত হয়, দৈবী আশ্বাসের প্রেরণায় নব-চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন।

কয়েকদিন পরের কথা। শিষ্য ও ভক্তদের আমন্ত্রণে মধ্ব সেদিন সমুদ্রতীরে মালপী বন্দরে গিয়াছেন। অতি প্রত্যূষে ধ্যানজপ সারিয়া আচার্য বন্দরের মুখে, নিরালা তটভূমিতে সানন্দে পাদচারণা করিতেছেন। হঠাৎ দূরে নয়নপথে পড়িল একটি সমুদ্রগামী নৌকা। এটি বন্দরে ফিরিতেছে। কিন্তু সাগর-মোহনায় একপ্রান্তে জাগিয়া উঠিয়াছে এক বিস্তৃত চড়া, নদীর উপরিভাগ হইতে সহসা ইহা দৃষ্টিগোচর হয় না।

নৌকার মাঝি এই অদৃশ্য চড়ার কবলে পড়িয়া বড় বিপন্ন। যেদিকে সে নৌকা চালনা করে, চড়ায় ঠেকিয়া যায়, বাহির হইবার কোনো সন্ধানই পাইতেছে না।

দূর হইতে আচার্য মধ্বকে দেখিয়া মাঝি ডাকিয়া কহিল, "সাধুবাবা, আমি মহাবিপদে পড়েছি। চড়া থেকে নৌকা বাঁচাতে পারছিনে, দয়া ক'রে বাঁচবার পথ বলে দিন।"

মধ্ব হাক দিয়া কহিলেন, "ভয় নেই, মাঝি। আমার এই উত্তরীয় যেদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাড়াচ্ছি তা লক্ষ্য ক'রে তুমি নৌকো চালাও। পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।"

বলা বাহুল্য, সিদ্ধপুরুষ মধ্ব তাঁহার অলৌকিক বিভূতির বলে নদীতলের অবস্থা সবই জানিয়া নিয়াছেন। ঠিক কোন্ পথে চলিলে নৌকাটি চড়ার দুষ্টচক্র এড়াইতে পারিবে, গভীর জলে পড়িয়া আবার সচল হইবে, মাঝিকে সে নির্দেশ দেওয়া দরকার। তাই তীরে দাঁড়াইয়া বার বার তিনি উত্তরীয় আন্দোলন করিতেছেন আর মাঝি সেই অনুসারে করিতেছে নৌচালনা। অবশেষে দুঃসহ পরিস্থিতির অবসান ঘটিল, চড়া হইতে মুক্ত হইয়া নৌকাটি বন্দরের একপাশে আসিয়া ভিড়িল।

মাঝির হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ভক্তিভরে মধ্বকে প্রণাম করিয়া কহিল, "প্রভু, আপনার কৃপায় নৌকোটি আজ বাঁচাতে পারলাম, নইলে ধনে-প্রাণে নিজেও মারা যেতাম। আমার বাড়ি এই দক্ষিণেরই আরমা গ্রামে। দ্বারকায় মালপত্র বিক্রি করতে গিয়েছিলাম, ফেরবার পথে এই বিপত্তি। ভাগ্যিস্ এ সময়ে এখানে আপনার দর্শন পেলাম। প্রভু, আমার একান্ত ইচ্ছে, আপনাকে আমি কিছু অর্থ দিই, আর আপনি তা ঠাকুরের সেবায় লাগান।"

"বাবা, তোমার অর্থের লোভে আমি এই ভোরবেলায় বন্দরের মোহনায় এসে দাঁড়াই নি। তুমি এখানে আসবে, আর নৌকাটি চড়ায় ঠেকবে, এসব আগে থেকেই আমার জানা। যাক্ নৌকোর খোলের ভিতর কি আছে বল ?"

মাঝি ভাবিল, 'সাধুবাবা নিশ্চয় ভেবে নিয়েছে, নৌকোর ভেতর বহুতর দামী মালপত্র আছে। তা থেকে তিনি কিছু বাছাই ক'রে নিতে চান।' হাসিয়া কহিল, "প্রভু, নৌকোর খোলে দামী বস্তু কিছুই নেই। রয়েছে শুধু একরাশ মাটির ঢেলা। দ্বারকার সব মালপত্র বিক্রি হয়ে গেল। ফেরবার পথে শূন্য নৌকো কেবলই টাল খাচ্ছে। ভাবলুম, কিছু ভারী জিনিস বোঝাই করা যাক। কাছেই গোপীসরোবর। সেখানকার মাটি গোপীচন্দন যাকে বলে, খুব পবিত্র। তারই কতকগুলো বড় বড় খণ্ড নৌকোর খোলে পুরে নিলাম। ভাবলাম, নৌকোর তলা ভারী করার কাজ এতে হবে, আবার ঐ গোপীচন্দন এখানকার ভক্ত মানুষদের বিলানোও যাবে। আর তো কোনো দামী জিনিসপত্র আমার নেই।"

"ভাই, ঐ বস্তুই যে আমার কাছে মহাদামী, মহাপবিত্র।" প্রসন্ন সুরে উত্তর দেন আচার্য মধ্ব। "তুমি ওর থেকে বেছে সব চাইতে বড় খণ্ডটি আমায় দাও। তোমার মাটির ঢেলার কোন্ পরম বস্তু লুকানো আছে, তা তুমি জানো না, ভাই।"

"বেশ তাই হবে, আপনার যেমন অভিরুচি।" সানন্দে একথা বলিয়া মাঝি একটি বৃহৎ গোপীচন্দন-খণ্ড নৌকার তলা হইতে বাহির করিল, গড়াইয়া দিল আচার্য মধ্বের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়া গেল এক অদ্ভুত কাণ্ড। উহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল শিলাময় এক অনিন্দ্যসুন্দর বালগোপাল মূর্তি। গোপালের দক্ষিণহস্তে দধি-মন্থনের দণ্ড, আর বামহস্তে মন্থনদণ্ডের সূত্র।

সদ্যপ্রকটিত এই শ্রীমূর্তি নিয়া মধ্ব ও তাঁহার ভক্তশিষ্যেরা সাড়ম্বরে উড়ুপীতে আসিয়া পেঁছান। গোপীচন্দনলিপ্ত বালগোপালকে এখানকার বৃহত্তম সরোবরের[১] তীরে নামাইয়া স্নান-অভিষেক করানো হয়, পূজা অর্চনার শেষে স্থাপন করা হয় একটি নব-নির্মিত মঠে।

আটজন প্রধান সন্ন্যাসী-শিষ্যের উপরে মধ্ব ন্যস্ত করেন তাঁহার পরমপ্রিয় বাল-গোপালের অর্চনা, ভোগরাগ ও সর্ববিধ সেবাকার্যের ভার।[২]

মধ্বের দীর্ঘজীবন ত্যাগ তিতিক্ষা ও তপস্যায় ভরা। দার্শনিক মতবাদের বিস্তার ভক্তিধর্মের আন্দোলন এবং বৈষ্ণবগ্রন্থের রচনা[৩] ও প্রচারের মধ্য দিয়া ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির উপর তিনি দূরবিস্তারী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উত্তর-সাধকেরাও তাঁহার দ্বৈত-মতবাদ ও বৈষ্ণব আন্দোলনকে পরিপূর্ণ করার কাজে কম খ্যাতি অর্জন করেন নাই।[৪]

আরব্ধ ঈশ্বরীয় কর্মের এক বিরাট অধ্যায় সমাপন করিয়া আচার্য একদিন অন্তরঙ্গ ভক্ত-শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করেন তাঁহার মর্ত্যলীলায় ছেদ টানার অভিপ্রায়। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে শুক্লানবমী তিথি। এ সময়ে সরিদন্তর নামক স্থানে প্রধান শিষ্যদের কাছে আচার্য ঐতরেয় উপনিষদের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা প্রদানে রত রহিয়াছেন। এই সময়ে লীলা অবসানের পরমমুহূর্তটি অগ্রসর হইয়া আসিল। ইষ্টধ্যানে সমাহিত হইয়া আচার্য মধ্ব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, প্রবিষ্ট হইলেন নিত্যলীলার পরমধামে।

শুধু দাক্ষিণাত্যেরই নয়, সারা ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশ হইতে সেদিন ঘটিল এক ইন্দ্রপাত।

---

১ এই সরোবর আজো স্থানীয় জনসমাজে মধ্ব-সরোবর নামে পরিচিত।

২ পরবর্তীকালে এই আটজন সন্ন্যাসী-শিষ্য বিভিন্ন অঞ্চলে আটটি কৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এই আটটি মঠ আবার দুইটি করিয়া দ্বন্দ্বমঠ নামে পরিচিত হইয়াছে। উড়ুপীস্থিত মূল মধ্ব-মঠকে বলা হয় উত্তরাদি মঠ। আচার্য মধ্বের পরে মূল মঠের অধ্যক্ষ হন তাঁহার মন্ত্রশিষ্য পদ্মনাভতীর্থ।

৩ মধ্বের প্রধান গ্রন্থত্রয়ের নাম—গীতাভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, মহাভারত তাৎপর্য-নির্ণয়। ইহা ছাড়াও আরো ৩৫টি ধর্মগ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

৪ মধ্বমতাবলম্বী দার্শনিক ব্যাসরাজের রচিত 'ন্যায়ামৃত'—অদ্বৈতবাদ বিরোধী এক প্রধান গ্রন্থ। উত্তরকালে ভারতবিশ্রুত বাঙালী মনীষী মধুসূদন সরস্বতীকে এই গ্রন্থের যুক্তিখণ্ডনে প্রচুর আয়াস স্বীকার করিতে হয়।

সনাতন গোস্বামী

নীলাচল হইতে শ্রীচৈতন্য সে-বার নবদ্বীপে আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য, জননীর চরণ দর্শন আর কিছুদিনের জন্য পবিত্র গঙ্গাতীরে বাস। সে কাজ সাঙ্গ হইয়াছে। এবার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে বৃন্দাবনের জন্য। প্রাণগোবিন্দের লীলাভূমিতে গড়াগড়ি দিতে মন হইয়াছে উতল, যমুনায় অবগাহনের লোভও হইয়া উঠিয়াছে দুর্নিবার। প্রভু তাই সাঙ্গোপাঙ্গসহ তাড়াতাড়ি ব্রজের দিকে ছুটিয়া চলিলেন।

কিন্তু একি বিচিত্র কান্ড? ঝাড়খন্ডের পথে না গিয়া তিনি হঠাৎ উত্তরের দিকে বাদশাহ হুসেন শাহের রাজধানী গৌড়ের দিকে চলিলেন কেন? তিনি কি পথ ভুলিলেন? অথবা কি আছে তাঁহার মনে কে জানে?

কৃষ্ণপ্রেমে প্রভু গর্গর মাতোয়ারা। সঙ্গীদের অন্তরেও লাগিয়াছে এই প্রেমের ঢেউ। নৃত্য কীর্তনে সারা পথটি মুখর হইয়া উঠিয়াছে। আর এই দেবপ্রতিম সন্ন্যাসীর পিছে পিছে চলিয়াছে ভাবাকুল এক বৃহৎ জনতা। চলিতে চলিতে সেদিন প্রভুর এই দলটি আসিয়া উপস্থিত হয় গৌড়ের উপকণ্ঠে, রামকেলীর অনতিদূরে।

রাত্রে প্রভু বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় নিতান্ত দীনবেশে সেখানে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন স্থানীয় দুই কৃতী পুরুষ, দুই সহোদর ভ্রাতা। ধর্মনিষ্ঠা আর শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত ভক্তিপ্রেমের অপরূপ মিলন ঘটিয়াছে তাঁহাদের জীবনে।

যুক্তকরে, দন্তে তৃণ নিয়া, উভয়ে প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়েন। ভক্তেরা পরিচয় করাইয়া দেন, "প্রভু এঁরা দুভাই গৌড়ের বাদশা হুসেন শাহের প্রধান অমাত্য। বড় ভাই হচ্ছেন অমরদেব। রাজকীয় উপাধি দবীর খাস। আর ছোটভাই সন্তোষদেব, সাকর মল্লিক বলে ইনি সরকারী মহলে পরিচিত। শাস্ত্রবিদ্যা, ধর্মাচরণ ও দানধ্যানের খ্যাতি যেমন এঁদের আছে তেমনি আছে অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও মান-মর্যাদা। কিন্তু সর্বোপরি রয়েছে সত্যকার কৃষ্ণভক্তি।"

প্রভুর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার দীপ্তি। প্রবীণ ভক্ত অমরদেবকে সস্নেহে টানিয়া তোলেন, আবদ্ধ করেন প্রগাঢ় আলিঙ্গনে। মৃদু মধুর কণ্ঠে কহেন, "তোমার প্রেরিত পত্র আমি যথাসময়ে পেয়েছি তার উত্তরও দিয়েছি। তোমরা দুভাই যে কৃষ্ণ-কৃপার মহা অধিকারী। তাইতো তোমাদের দর্শনে ছুটে এলাম। দ্যাখো আমার কৃপাময় কৃষ্ণের কি অপূর্ব লীলা। ব্রজধামে যাবার জন্য বেরিয়েছি, কিন্তু সোজা সেদিকে না গিয়ে অজ্ঞাত আকর্ষণে ছুটে এলাম এই অঞ্চলে। গৌড়ে আসবার আমার কোনো প্রয়োজনই নেই। এসে পড়েছি শুধু তোমাদেরই জন্য।"

বৃন্দাবনযাত্রী প্রভুর পথভ্রান্তির মর্ম এবার বুঝা গেল। ভক্তেরা নীরবে দাঁড়াইয়া একে অন্যের মুখ চাহিতে লাগিলেন।

প্রভুর একি অপার অনুগ্রহ, একি অহেতুকী কৃপা। অমরদেব ও সন্তোষদেবের নয়ন বাহিয়া ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রুর ধারা। পরিত্রাতা আজ স্বয়ং অযাচিতভাবে দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত। এযে তাঁহাদের কল্পনারও অতীত। কান্না আর আর্তিতে উভয়ে ভাঙিয়া পড়েন।

চরণতলে পতিত হইয়া দৈন্যভরে নিবেদন করেন, "প্রভু, কৃপা ক'রে যদি এলেই, এবার তবে এই অধমদের উদ্ধার সাধন করো। তোমার শ্রীচরণের সেবক ক'রে নাও। বিষয়-বিষে এ জীবন হয়ে উঠেছে দুঃসহ।"

দুই ভাইকে আশিস্ জানাইয়া শ্রীচৈতন্য কহিলেন, "ভয় নেই তোমাদের। অচিরে কৃষ্ণ তোমাদের কৃপা করবেন, তাঁর নিজ কর্মে করবেন নিয়োজিত। তোমাদের যে আমি দেখছি কৃষ্ণের চিহ্নিত সেবকরূপে। আজ থেকে তোমাদের আমি নূতন নামকরণ করলাম। অমর আর সন্তোষ-এখন থেকে পরিচিত হবে সনাতন আর রূপ নামে।"

প্রভুর সেদিনকার দর্শন ও স্পর্শ সনাতন ও রূপের জীবনে বিপ্লব ঘটাইয়া দেয়। তাঁহার আন্তরিক আশীর্বাদ হইয়া উঠে অমোঘ। উত্তরকালে দুই ভাই প্রসিদ্ধি লাভ করেন প্রভুর অন্যতম পার্ষদরূপে। সনাতন গোস্বামী নির্মাণ করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের সুদৃঢ় শাস্ত্রীয় ভিত্তি, স্থাপন করেন ভক্তিময় তপস্যার বলিষ্ঠ আদর্শ। আর তাহার অনুজ রূপ গোস্বামীর মাধ্যমে সাধিত হয় রাধাকৃষ্ণ লীলা-রসের পরিপুষ্টি ও বিস্তার উদ্ঘাটিত হয় গোপীভজনের নিগূঢ় পদ্ধতি।

সনাতনের পূর্বপুরুষের জন্মভূমি দাক্ষিণাত্যে। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে কর্ণাটদেশের পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন সর্বজ্ঞ জগদ্গুরু। ইহার বংশধর রূপেশ্বরদেব এক সময়ে রাজ্যচ্যুত হইয়া গৌড়দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। শাস্ত্রবিদ্যা ও রাজকার্য দুয়েতেই দেখা যাইত এই অভিজাত বংশের সমান পারদর্শিতা। তাছাড়া, দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবীয় সাধনার ধারাও ইহাদের জীবনে কিছুটা বহমান ছিল।

এই বংশের কুমারদেবের গৃহে ভূমিষ্ঠ হন তিন পুত্র—অমর, সন্তোষ ও বল্লভদেব। জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর জন্মগ্রহণ করেন ১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, ইনিই উত্তরকালে বহু বিশ্রুত বৈষ্ণবসাধক—সনাতন গোস্বামী। বৃন্দাবনের ধর্মজীবনের নিয়ন্তারূপে মহাপ্রতিভাধর ভক্তি-শাস্ত্রবিদ্রূপে তাঁহার খ্যাতি সারা ভারতে প্রচারিত হয়। আর গৌড়ীয় সাধকসমাজে তিনি গণ্য হন প্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন-দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকাররূপে।

সনাতনের পিতার নাম মুকুন্দদেব। গৌড় রাজসরকারের এক উচ্চপদে দীর্ঘদিন তিনি নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁহার বাসস্থান ছিল গৌড়ের উপকণ্ঠস্থিত রামকেলীতে। ঐ স্থানটি কানাই-নাটশালা নামেও সে সময়ে পরিচিত ছিল। মুকুন্দদেব নিজে ছিলেন ভক্তিমান্ সাধক। পূজা-পার্বণ, কৃষ্ণকীর্তন ও রাসলীলার উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রাসাদভবন সদাই থাকিত মুখরিত।

বালক পৌত্রদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করিতে মুকুন্দদেব ত্রুটি করেন নাই। সনাতন ও রূপের শিক্ষাদানের ভার পড়ে রামভদ্র বাণীবিলাস নামক পন্ডিতের উপর। প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত হইলে দুই ভ্রাতাকে পাঠানো হয় তখনকার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপে। সেখানে কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা শাস্ত্রে তাঁহারা পারঙ্গম হইয়া উঠেন।

প্রথমে শিক্ষাগুরুর পদে ব্রতী হন প্রখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। পরবর্তী-কালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির টোলে থাকিরা সনাতন ও রূপ

শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বাদি অধ্যয়ন করেন। দুজনেই অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী। তাই নবদ্বীপে থাকিতেই তাঁহাদিগকে সাহিত্য, ব্যাকরণ ও বিবিধ ধর্মশাস্ত্রে অসামান্য অধিকার অর্জন করিতে দেখা যায়।

কিন্তু সে যুগে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র অধিগত করিলেই বৈষয়িক জীবনে উন্নতিসাধন করা যাইত না। বাদশাহের দরবারের ভাষা ছিল ফার্সী। এই ফার্সী ভালভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিলে কোনো দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। পরিবারের কর্তা তাই সনাতন ও রূপের ফার্সী শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা করেন। সপ্তগ্রামে তাঁহাদের পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানকার মুসলমান শাসনকর্তা ফকর উদ্দীন মুকুন্দদেবের বন্ধু। তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া উভয় ভ্রাতা ফার্সী ও আরবী বিশেষজ্ঞ মোল্লাদের কাছে পাঠ গ্রহণ করিতে থাকেন, অচিরে ঐ ভাষা দুইটি ভালভাবে আয়ত্ত করিয়াও ফেলেন।

ফার্সী ও আরবী সাহিত্যের ব্যুৎপত্তি কিন্তু সনাতন ও রূপের ব্যক্তিগত কৃষ্টি ও ধর্মাচরণকে কোনোদিন ব্যাহত করিতে পারে নাই। রাজ-অমাত্যপদ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, মুসলমান বাদশাহ ও আমীর ওমরাহদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও কম করেন নাই, কিন্তু নিজস্ব ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ভাবধারাকে সদাই রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন সতর্কভাবে।

তাঁহাদের রামকেলীর ভবন বরাবরই ছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্মাচার্যদের মিলনস্থল। বিশেষ করিয়া শিক্ষক বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত সনাতনের যোগ ছিল অত্যন্ত বেশী। এই ধর্মনিষ্ঠ আচার্যকে তিনি গুরুর মতোই শ্রদ্ধা করিতেন। পরম সমাদরে প্রায়ই তাঁহাকে রামকেলীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইত। তাঁহার সহিত শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মালোচনায় সনাতন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতেন। উত্তরকালে চৈতন্যচরণে আশ্রয় নেবার পর হইতে সনাতনের শাস্ত্রপাঠের আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয় ভক্তিশাস্ত্রের দিকে।

বৃন্দাবনবাসের প্রথম যুগে পরমানন্দ ভট্টাচার্য নামক এক বিশিষ্ট ভক্তিসিদ্ধ আচার্যের কাছেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব হয় তাঁহার অধিগত।

পিতামহ মুকুন্দদেবের লোকান্তরের পর তাঁহারই পদে সনাতন রাজসরকারে নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর। তারপর ধীরে ধীরে নিজের প্রখর ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও কর্মনিষ্ঠার বলে পাঠান রাজ্যের অন্যতম প্রধান অমাত্যের পদে উন্নীত হন।

রাজ্যের প্রতিরক্ষা, শাসন প্রভৃতি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যেই সুলতান হুসেন শাহকে সনাতনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে দেখা যাইত। সনাতন ক্রমে বাদশাহের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন, তাঁহার অনুজ রূপ এবং অনুপমও তাঁহারই প্রভাবে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হন।

তখনকার দিনে রামকেলীর দেবভ্রাতাদের পদমর্যাদা, প্রভাব ও বিত্ত-বিভবের খ্যাতি ছিল অসাধারণ। তাঁহাদের প্রাসাদের চারিদিকে ছড়ানো ছিল বহুসংখ্যক মন্দির, মণ্ডপ ও নাটশালা। খ্যাতনামা হিন্দু বিদ্বজ্জন আচার্য ও সাধু-সন্ন্যাসী মাত্রেই রামকেলীতে সনাতনের সভাকক্ষে পদার্পণ করিতেন, গ্রহণ করিতেন তাঁহার সেবা ও

পৃষ্ঠপোষকতা। সনাতন ও তাঁহার ভ্রাতাদের বদান্যতায় দেশের দূর দূরান্তস্থিত শাস্ত্র-ব্যবসায়ী বহু ব্রাহ্মণ ও দীন দরিদ্র প্রতিপালিত হইত। এই সব কারণে রামকেলীর খ্যাতি ও সনাতনের প্রভাব প্রতিপত্তি সারা গৌড়দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

সনাতন ছিলেন হুসেন শাহের দরীর খাস—একান্ত সচিব। তৎকালীন যে কোনো শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত মুসলমানের মতো তিনি ফার্সী ও আরবীতে অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। বিধর্মী সুলতান এবং ওমরাহদের সামাজিক জীবন ও রীতিনীতির অনেক কিছু তাঁহাকে অনুসরণ করিতে হইত। গৌড় দরবার বা সুলতানের শিবিরে অবস্থান কালে তাঁহার বেশভূষা ও চালচলন দেখিয়া সাধারণ মানুষ তাঁহাকে ধরিয়া নিত মুসলমান ভাবাপন্ন বলিয়া। কিন্তু দিনান্তের কার্যশেষে রামকেলীতে গেলেই ফুটিয়া উঠিত তাঁহার আর এক রূপ। বাদশাহী দরবারের বাহ্য আচার-আচরণ, হাব-ভাব তিনি ত্যাগ করিতেন। স্নান তর্পণের পর শুরু হইত দানধ্যান পূজো-অর্চনা, শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা।

কিন্তু এত দানধ্যান, ধর্মনিষ্ঠা ও দরবারী পদমর্যাদা সত্ত্বেও সনাতনের পরিবারের ভাগ্যে কিন্তু সামাজিক কৌলিন্য জুটে নাই। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে এই পরিবার ছিল পতিত—মুসলমানের ঘনিষ্ঠতা ও স্পর্শদোষের জন্য অবজ্ঞাত। এই জন্যই বঙ্গীয় কায়স্থদের কুলজীতে ইহাদের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বিধর্মী আচার-আচরণদুষ্ট সনাতন এতদিনে পাইয়াছেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের দুর্লভ দর্শন। সারা দেহ ও মনপ্রাণে আসিয়াছে দিব্য আনন্দের জোয়ার। প্রভুর এই দর্শনের পরে নূতন মানুষে তিনি হইয়াছেন রূপান্তরিত।

সনাতনের জীবনের এ পরিবর্তন শুরু হইয়াছে দীর্ঘদিন যাবৎ, অগ্রসর হইয়াছে প্রসন্ন ধারায়। বিত্ত বিষয় ও দরবারী মর্যাদার চাপে যে জীবন চাপা পড়িয়াছিল, আকুল হইয়া এতদিন তাহা কেবলি মাগিতেছিল বন্ধনমুক্তি। এবার সে মুক্তি সমাগত।

বাহ্যজীবনে সনাতন ছিলেন প্রভাবশালী রাজ অমাত্য, আর অন্তরে দৈন্যময়, ত্যাগব্রতী মহাবৈষ্ণব। আন্তর্জীবনে তাই এতদিন ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিয়াছিল অধ্যাত্ম-সাধনার পরমসম্পদ, একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ভক্তি ও প্রেমধর্মের আদর্শ। তাঁহার এই গোপন প্রস্তুতিই সেদিন আকর্ষণ করিয়াছিল প্রভু চৈতন্যদেবকে। সুদূর রামকেলীতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনের চিহ্নিত পার্ষদ ও লীলা-পরিকর সনাতন ও রূপ এই দুই ভাইকে তিনি অবলীলায় করিয়াছিলেন আত্মসাৎ।

সনাতনের জীবন ছিল বৈষ্ণবীয় সাধনার জন্য উন্মুখ, সদা ভক্তিধৃত। তাঁহার পক্ষে ইহা আকস্মিক কিছু নয়। এ মনোবৃত্তি এবং সাধনধারা তাঁহার পূর্বপুরুষের মধ্যেও বর্তমান ছিল। বংশগত বৈশিষ্ট্যই অপরূপ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল সাধননিষ্ঠ সনাতনের জীবনে। আর প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপায় উত্তরকালে তাহা লাভ করিয়াছিল চরম সার্থকতা।

হুসেন শাহের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন সনাতন। রাজ্যের জটিল কর্মের দায়িত্বভার তাঁহার উপর ছাড়িয়া দিয়া বাদশাহ নিশ্চিন্ত থাকিতেন। শুধু শান্তির সময়েই নয়, যুদ্ধাভিযানে বাহির হইলেও হুসেন শাহ তাঁহার এই প্রতিভাধর অমাত্যকে সঙ্গে রাখিতেন। কিন্তু এই রাজানুগ্রহ, এই দায়িত্বভার ও মর্যাদা ক্রমে ভারস্বরূপ হইয়া

উঠে। বিষয়-কীট হইয়া দিন যাপন করা আর তাঁহার সহ্য হইতে চায় না। বাদশাহের সেনাধ্যক্ষেরা সে-বার নির্মমভাবে উড়িষ্যায় দেব-দেবীর মূর্তি ধ্বংস করে। ভক্ত সনাতনের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শুরু হয় তীব্র অনুতাপের দহন। দিনের পর দিন ভাবিতে থাকেন, একি পাষণ্ডীর জীবন তিনি যাপন করিতেছেন? সদাই অনুসন্ধান করিতে থাকেন উদ্ধারের উপায়।

রামকেলী ও তাহার আশেপাশে সনাতন গড়িয়া তুলিয়াছেন এক অপূর্ব ধর্মীয় পরিবেশ। অজস্র মঠ-মন্দির নির্মিত হইয়াছে, খনন করা হইয়াছে পবিত্র কুণ্ড। প্রায়ই তিনি দেশ-দেশান্তর হইতে এখানে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন বিশিষ্ট শাস্ত্রবিদ্ ও ভক্ত সাধকদের। গৌড় দরবারের কাজ শেষ হইলেই রামকেলীর ভক্তিময় পরিবেশে আসিয়া হৃদয় জ্বালা জুড়াইতে বসেন, সাধন-ভজনে রত হন।

এমনি পরিবেশে বাস করিয়া সনাতনের জীবনে জাগিয়া উঠে ভক্তিপ্রেমের সুপ্ত চেতনা। রামকেলীতে তাঁহার নিজের তৈরি কৃষ্ণ-লীলাস্থলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহরণ করেন দিব্য আনন্দ।

বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে
কদম্ব কানন ধারা শ্যামকুণ্ড তাতে।
বৃন্দাবনলীলা তথা করয়ে চিন্তন,
না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ। (ভক্তি রত্নাকর)

অতঃপর তীব্র আর্তি জাগে জীবনে, আর এই আর্তির মধ্য দিয়া নামিয়া আসে কৃষ্ণপ্রেমের রসস্রোত। সংসারের বিত্ত-বিভব, যশ মান, সব কিছু নিরর্থক হইয়া উঠে। আকুলভাবে চিন্তা করিতে থাকেন কোন্ পথে, কাহার নির্দেশে মিলিবে বহুবাঞ্ছিত কৃষ্ণদর্শন? কবে অপ্রাকৃত লীলারসে অবগাহন করিবেন? কবে এ জীবন হইবে কৃতকৃতার্থ?

এমনি সময়ে সনাতনের কানে পৌঁছিল প্রভু শ্রীচৈতন্যের কথা। নীলাচলে তাঁহার অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। প্রেমভক্তির প্রবল রসতরঙ্গে তিনি ভাসাইয়া নিতেছেন অগণিত ভক্ত সাধককে। এই তরঙ্গ সেদিন সনাতনের হৃদয়তটেও আসিয়া আঘাত করে। জাগিয়া উঠে পরম উপলব্ধি—এই প্রভুই যে জীবের উদ্ধারকর্তা। আর ইনি যে তাঁহারই জীবনপ্রভু।

আকুল আবেদন জানাইয়া সনাতন শ্রীচৈতন্যকে পত্র দিলেন—“প্রভু, তুমি আবির্ভূত হয়েছো জীবের উদ্ধারের জন্য। একটিবার আমার মতো অধমজনের প্রতি কৃপা দৃষ্টি-পাত করো। আমি একে বিষয়-কীট, তদুপরি ম্লেচ্ছাচারী—পতিত। আমার মুক্তির কি কোনো উপায় নেই? মনে প্রবল ইচ্ছা জেগেছে, এ ঘৃণ্য সংসারজীবন ত্যাগ করবো। আমায় অনুমতি দাও, তোমার চরণতলে নিজেকে উৎসর্গ করি, আর সারা জীবন কাটিয়ে দিই তোমার দিব্য মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ ক'রে।”

নীলাচলে অন্তরঙ্গ ভক্তেরা প্রভুকে এই দৈন্যময় পত্র দিলেন। কহিলেন, “গৌড়ের বাদশাহ্, দোর্দণ্ড-প্রতাপ হুসেন শাহের ইনি প্রধান অমাত্য। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকুশলতার দিক দিয়ে এঁর জুড়ি নেই। এমন মানুষও তোমার নর্তনে কীর্তনে পাগল হয়ে উঠেছে; রাজৈশ্বর্য ছেড়ে দিয়ে ভিখারী হতে চাচ্ছে—এ তো তোমার অলৌকিক কৃপালীলা ছাড়া আর কিছু নয় প্রভু।”

প্রভুর অধরে মৃদু মধুর হাসি দেখা দেয়। বার্তাবহের হস্তে তখনি তিনি এক পত্র প্রেরণ করেন। এ পত্রে আর কোনো কথা নাই, আছে শুধু একটি মাত্র শ্লোকের উদ্ধৃতি—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্‌॥

অর্থাৎ, পরপুরুষে আসক্তা কোনো নারী যেমন গৃহকর্মে থেকেও প্রেমিকের স্মৃতি সদাই ধরে রাখতে পারে, তেমনি বিষয়ে লিপ্ত থেকেও চিত্তকে ডুবিয়ে রাখা যায় তাঁর প্রেম-রসে।

সনাতন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, সর্ব দর্শন ও অধ্যাত্মতত্ত্বে পারঙ্গম। তাই প্রভু তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া স্বামী বিদ্যারণ্যের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ পঞ্চদশী হইতে ঐ শ্লোকটি লিখিয়া পাঠান।

প্রভুর এই শ্লোকপত্রের ইঙ্গিত পরিষ্কার। সনাতন বুঝিলেন, মিলনলগ্ন এখনো উপস্থিত হয় নাই, তাই প্রভু তাঁহার সানুনয় অনুরোধ কৌশলে এড়াইয়া গেলেন। হৃদয়ের আগুন চাপিয়া রাখিয়া এখনো কিছুদিন তাঁহাকে সংসারে বাস করিতে হইবে।

প্রভুর কাছ হইতে ঐ পত্র পাইবার পর হইতে সনাতনের ব্যাকুলতা আরো বাড়িয়া যায়। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয় করুণ আর্তি ও কান্নায়।

অবশেষে এই সেদিন রামকেলীতে বসিয়া প্রভুর কৃপা মিলিল। সুদূর পুরীধাম হইতে ছুটিয়া আসিয়া নিজে যাচিয়া সনাতনকে তিনি দর্শন দিলেন। সংসার ত্যাগের অনুমতি সেদিন না মিলিলেও তাঁহার প্রেমস্পর্শ ও আশ্বাসবাণী প্রাপ্ত হইয়া সনাতনের তাপিত হৃদয় কতকটা শান্ত হইল।

সনাতন ও রূপের নিকট বিদায় নেওয়া হইয়াছে, শ্রীচৈতন্য এবার বৃন্দাবনের দিকে রওনা হইবেন। তাঁহার নয়নাভিরাম রূপ, নর্তন-কীর্তন ও ভাবাবেশে এই কদিনের মধ্যেই সমগ্র অঞ্চলে আনিয়া দিয়াছে প্রাণচাঞ্চল্য। অগণিত নরনারী ভিড় করিয়াছে এই পুণ্যদর্শন দেব-মানবের আশে-পাশে। তাহাদের অনেকে প্রভুর সঙ্গী হইতে ব্যগ্র।

সানাতন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ; ব্যাপার দেখিয়া তিনি প্রমাদ গণিলেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপটা চলিতেছে। এ সময়ে এত লোক সঙ্গে নিয়া চলিলে প্রভুর বিপদ হইতে পারে।

করজোড়ে তিনি নিবেদন করেন, "প্রভু, বৃন্দাবনেই যদি যাবে এত লোক কেন সঙ্গে নিচ্ছো? আজকাল রাজা বাদশাদের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ চলছে চারদিকে। এ সময়ে জন-সঙ্ঘট্ট নিয়ে চলা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। তাছাড়া প্রভু, বৃন্দাবন তো একান্তে কাঙাল বেশেই যেতে হয়।"

প্রবীণ রাজ-অমাত্য সনাতনের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত। আবার ভক্তবৃন্দকে সঙ্কুচিত এবং নিরাশ করিতেও প্রভুর মন সায় দেয় না। অগত্যা বৃন্দাবন-যাত্রা ত্যাগ করিয়া রওনা হইলেন শান্তিপুর অভিমুখে। সনাতন হাঁফ-ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

প্রভুর রামকেলীতে আগমন ও দর্শনদান যেন সনাতন ও রূপের নবজন্মের উন্মেষ! তাঁহার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে উভয়ের জীবনে আসিয়াছে কৃষ্ণপ্রেমের নূতন জোয়ার। এই জোয়ারের উচ্ছ্বাসে তাঁহারা এবার ভাসিয়া চলিলেন।

অনতিবিলম্বে রামকেলীর প্রাসাদে বিশিষ্ট একজন শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব সাধককে আমন্ত্রণ

করিয়া আনা হইল। সনাতন ও রূপ তাঁহার সাহায্যে ভক্তিভরে কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিলেন। রাজকর্ম এখন তাঁহাদের কাছে দুর্বহ ভারস্বরূপ। যত তাড়াতাড়ি ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

উভয় ভ্রাতার মধ্যে সেদিন গভীর রাত অবধি গোপন পরামর্শ চলে। সিদ্ধান্ত স্থির হয়, রূপ আগে গৃহত্যাগ করিবেন, আর সনাতন বহির্গত হইবেন কিছুদিন পরে।

সনাতনের উপর বাদশাহের বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজ ন্যস্ত রহিয়াছে, তিনি অকস্মাৎ এখনি পদত্যাগ করিলে সারা দেশে চাঞ্চল্য পড়িয়া যাইবে, রাজকার্যে দেখা দিবে নানা বিশৃঙ্খলা। কাজেই তাঁহার নিষ্ক্রমণ সঙ্গত নয়। রাজকীয় দায়িত্বের বোঝা কিছুটা হালকা করিয়া তবেই তিনি সুযোগমতো একদিন সরিয়া পড়িবেন।

সনাতন ও রূপের আশ্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধু-সজ্জনদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইঁহাদের এবং আত্মীয়স্বজনদের ভরণ-পোষণের মোটামুটি ব্যবস্থার জন্য রূপ তখনই তৎপর হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে একাজ সম্পন্ন হইয়া গেল এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রূপ চিরতরে করিলেন গৃহত্যাগ।

যাওয়ার আগে তিনি বিশ্বস্ত এক মুদির কাছে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়া গেলেন। কথা রহিল জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সনাতন এই অর্থ তাঁহার কাজে লাগাইবেন।

রূপের নিষ্ক্রমণের পর সনাতন আরো নিঃসঙ্গ হইয়া পড়েন। বিষয়বিতৃষ্ণা চরমে উঠে। ক্রমে দরবারে যাতায়াতও বন্ধ হইয়া যায়। বাদশাহকে খবর পাঠান তিনি অত্যন্ত পীড়িত, এখন হইতে স্বাভাবিকভাবে রাজসেবা সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইবে না।

হুসেন শাহ্ বড় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন। রূপ ইতিমধ্যে রাজকর্ম ছাড়িয়া কোথায় উধাও হইয়াছেন। দবীর খাসও তেমনি কোনো মতলব আঁটে নাই তো? রাজ্যের চারিদিকে যুদ্ধবিগ্রহের মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে, ঠিক এসময়ে তাঁহার মতো একজন বিশ্বস্ত ও কুশলী অমাত্য কর্মত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিলে যে মহাবিপদের কথা।

রাজবৈদ্য প্রেরিত হইল সনাতনকে পরীক্ষা করার জন্য। বৈদ্য ফিরিয়া আসিলেন, মুচকি হাসিয়া জানাইলেন, "দবীর খাস শারীরিক বেশ সুস্থই আছেন, তাঁর জন্য জাহাঁপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।"

হুসেন শাহ্ তো চটিয়া আগুন। পরদিনই তিনি অতর্কিতে সনাতনের রামকেলী-প্রাসাদে স্বয়ং উপস্থিত হন। দেখেন, দবীর খাসের দেহে রোগের চিহ্নমাত্র নাই, সাধু-সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিদ্‌দের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে তিনি ধর্মালোচনায় নিরত।

বাদশাহ তাঁহাকে কার্যে যোগদানের জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। অবশেষে ভীতি প্রদর্শন করিতেও ছাড়িলেন না। কিন্তু সনাতন তাঁহার সংকল্পে একেবারে অটল। গৌড়েশ্বরের বদলে পরমেশ্বরের আসন স্থাপিত হইয়াছে তাঁহার জীবনে, কোনো চাওয়া-পাওয়ার প্রয়োজনই যে আজ আর তাঁহার নাই।

দৃঢ়স্বরে স্পষ্ট ভাষায় তিনি হুসেন শাহকে কহিলেন, "জাহাঁপনা, সত্য কথা বলতে কি, দরবারের কাজে আমি যোগদান করবো না বলেই স্থির করেছি। এখন

থেকে আমি কেবলমাত্র শ্রীভগবানের দাস, আর কারুর নই। আমার এ সংকল্প অপরিবর্তনীয়। আমায় আপনি মার্জনা করুন।"

ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান তখনি সনাতনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যে দেখা দিল এক জরুরী পরিস্থিতি। হুসেন শাহের সেনাপতি ইতিপূর্বে উড়িষ্যার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবার তিনি নিজেই সসৈন্যে রাজা প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে চাহেন। প্রয়োজনীয় সকল কিছু ব্যবস্থা প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এসময়ে সনাতনের মতো তীক্ষ্ণধী ও বিচক্ষণ অমাত্যের সাহায্য যে তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য।

কারাগৃহ হইতে ডাকিয়া আনিয়া বার বার সনাতনকে বুঝাইতে লাগিলেন, "দবীর খাস, এখনো তুমি তোমার পাগলামি ছাড়ো। আবার নিজের দায়িত্বপূর্ণ কাজে এসে যোগ দাও। আমার অনুরোধ শোন, আমার সঙ্গে তুমি উড়িষ্যা অভিযানে চল।"

সনাতন চরম কথা শুনাইয়া দিলেন, আপনার অভিযানের দৃশ্য আমি মানসপটে চমৎকার দেখতে পাচ্ছি, জাহাঁপনা। আপনার সেনাবাহিনী সারা পথের দেবমন্দির ধ্বংস করবে, আর পবিত্র বিগ্রহ করবে কলুষিত। না—কোনোমতে আমি আপনার এ পাপকার্যের সঙ্গী হতে পারবো না।"

অমাত্যকে তখনি আবার কারাগারে প্রেরণ করিয়া হুসেন শাহ্ যুদ্ধ-অভিযান শুরু করিলেন।

সনাতনের এখন একমাত্র লক্ষ্য কি করিয়া তিনি মুক্তি লাভ করিবেন, মিলিত হইবেন প্রাণপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে।

হঠাৎ সেদিন রূপের প্রেরিত এক পত্র গোপন পথে তাঁহার নিকট পেঁছিল। তাহাতে নির্দেশ দেওয়া আছে—স্থানীয় মুদির কাছে যে টাকা গচ্ছিত আছে, তাহা হইতে সনাতন যেন এই পত্র দেখাইয়া, সাত হাজার টাকা গ্রহণ করেন এবং উহা দ্বারা ক্রয় করেন নিজের মুক্তি।

প্রভুর সহিত মিলনের জন্য সনাতন উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। তাই উপায়ান্তর অভাবে কারামুক্তির জন্য সেদিন রূপের প্রস্তাবিত পথই তাঁহাকে বাছিয়া নিতে হইল। রক্ষীকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

শ্রীচৈতন্য এসময়ে বৃন্দাবনের পথে বারাণসীতে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। সনাতন আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া ধাবিত হইলেন পশ্চিম ভারতের দিকে। সঙ্গে চলিল বহু দিনের বিশ্বস্ত ও পুরাতন ভৃত্য, ঈশান।

মুক্তির অমোঘ আহ্বান আসিয়া গিয়াছে সনাতনের জীবনে। এই মুক্তির জন্য চরমতম মূল্য দিতে তিনি আজ প্রস্তুত। ধন মান রাজসম্পদ সব কিছু অবলীলায় ত্যাগ করিয়া, নিষ্কিঞ্চন মুমুক্ষু সাধক দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিলেন।

সুলতানের রক্ষীরা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারে, এ আশংকা যথেষ্টই রহিয়াছে। তাই পথ চলিতে লাগিলেন দীন দরিদ্র দরবেশের ছদ্মবেশে।

পথ চলিতে চলিতে সেদিন এক ক্ষুদ্র ভুঁইয়ার অধিকারে তাঁহারা আসিয়া পড়িয়াছেন। কোনো পরিচয় নাই, কিন্তু সাক্ষাৎ মাত্রেই ভুঁইয়া তাঁহাদের মহাসমাদর শুরু করিয়া দিল, যেন সে কত দিনের বান্ধব।

এই আতিশয্য দেখিয়া সনাতন কিন্তু সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। এই শ্রেণীর ভুঁইয়াদের কুকীর্তির কথা আগেই কিছু কিছু তাঁহার শোনা ছিল। ইহারা বিদেশী পর্যটকদের আশ্রয় দেয়, প্রচুর আদর-যত্ন করে, তারপর রাত্রিযোগে সুযোগমতো যথা-সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া করে হত্যা। সনাতনের নিজের জন্য কোনো চিন্তা নাই। তিনি তো কপর্দকহীন। কিন্তু ঈশান? সে তো অর্থাদি লুকাইয়া রাখে নাই?

চাপে পড়িয়া ঈশান স্বীকার করিল—সাতটি মোহর সে সংগোপনে নিজের কাছে রাখিয়াছে। প্রয়োজন হইলে সনাতন বা তাহার নিজের কাজে এগুলি ব্যবহার করা হইবে ইহাই ছিল উদ্দেশ্য।

সনাতন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, কঠোর ভাষায় ভৃত্যকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে, বৈরাগ্যসাধন নিয়ে আমি পথে বেরিয়েছি। আর তুমি আমার সেই সাধনার পথে সৃষ্টি করেছো এমনিতর বিঘ্ন। ছি—ছি।

তখনি ভুঁইয়া সমীপে গিয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গীর কাছে সাতটি সঞ্চিত মোহর রয়েছে। এগুলো আপনি গ্রহণ করুন, আর আমাদের নিরাপদে পার ক'রে দিন সামনের ঐ দুর্গম পাহাড়।"

সনাতনের সততায় ও সত্যভাষণে অর্থগৃধ্নু ভুঁইয়া খুব খুশী। তখনি সে নিজে সঙ্গে করিয়া অতিথিদ্বয়কে সেখানকার বিপজ্জনক অঞ্চল পার করিয়া দিল।

ভুঁইয়া প্রস্থান করিলে ঈশান কথাপ্রসঙ্গে কহিল, "হুজুর, একটা কথা আপনার কাছে গোপন ক'রে আমি আরো অপরাধী হয়েছি। আমার কাছে আসলে আটটি মোহর ছিল। ভুঁইয়াকে সাত মোহর দিয়ে দেবার পর আর একটি মোহর অবশিষ্ট রয়েছে। মিথ্যা বলার জন্য আপনার কাছে আমি মাপ চাইছি।"

সনাতনের আনন মুহূর্তে কঠোর হইয়া উঠে। দৃঢ়স্বরে কহেন, "ঈশান, আমার অনুসরণ করা তো তোমার ঠিক হবে না। এখনো অর্থের ওপর তোমার প্রবল আকর্ষণ রয়েছে। অর্থের উপর নির্ভর ক'রেই তুমি চলতে চাও। আর আমি নিয়েছি বৈরাগ্য সাধনের কঠিন পথ; একান্তভাবে নির্ভর করতে চাই ভগবানের উপর। নিষ্কিঞ্চন হয়ে জীবন যাপন না করলে আমি আমার ব্রত থেকে চ্যুত হবো। তুমি এখনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাও।'

মনিবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ঈশান সাশ্রুনয়নে রামকেলীতে প্রত্যাবর্তন করিল।

দ্রুতপদে পথ চলিতে চলিতে সনাতন সেদিন শোনপুরে আসিয়া উপস্থিত। সেখানে তখন হরিহরছত্রের মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। হঠাৎ মেলাক্ষেত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সঙ্গে। সনাতনের কৃপায় শ্রীকান্ত রাজসরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ছত্রের মেলায় তিনি আসিয়াছেন সুলতানের জন্য কয়েক লাখ টাকার ঘোড়া কিনিতে।

বহু অনুনয়-বিনয়েও শ্রীকান্ত সনাতনকে তাঁহার বৈরাগ্যের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। শেষটায় ধরিয়া বসিলেন, "বেশ, যদি ঘর ছেড়ে যেতেই হয়, ভিখারীর বেশে যেতে দেবো না। অনুমতি দিন, আমি আপনাকে কিছু নূতন পরিচ্ছদ কিনে দিই।"

সনাতন দৃঢ়স্বরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অগত্যা শ্রীকান্ত ধরিয়া বসিলেন, "এখন তো প্রচণ্ড শীত পড়েছে পশ্চিমে। একখণ্ড ভোটকম্বল আপনাকে নিতেই হবে, নতুবা পথে যে কষ্টের অবধি থাকবে না।"

ভগিনীপতির নির্বন্ধাতিশয্যে সনাতনকে ঐ কম্বলটি গ্রহণ করিতে হইল। সেটি কাঁধে ফেলিয়া আবার তিনি শুরু করিলেন পদযাত্রা। কয়েকদিন অবিরাম পথ চলার পর উপনীত হইলেন বারাণসীধামে।

বারাণসীতে পেঁছিয়াই যে সংবাদটি সনাতন শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। প্রাণপ্রভু শ্রীচৈতন্য কিছুদিন যাবৎ এখানেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নর্তন-কীর্তনে কাশীর ভক্তসমাজে এক প্রচণ্ড সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

চন্দ্রশেখর মিশ্রের গৃহে প্রভু তখন অবস্থান করিতেছেন। দীনবেশে যুক্তকরে সনাতন মিশ্রের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া প্রভু ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। হঠাৎ চন্দ্রশেখর মিশ্রকে কহিলেন, "মিশ্র, আজ বড় শুভদিন। বাইরে গিয়ে দ্যাখো, তোমার দ্বারে সমাগত হয়েছেন এক মহাবৈষ্ণব। এখনি পরম সমাদরে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

ভক্তেরা ত্রস্তেব্যস্তে বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু কই, কোনো বৈষ্ণব মূর্তি তো সেখানে নাই? দুয়ারে দণ্ডায়মান ছিন্নবাস পরিহিত এক দরবেশ। কণ্ঠমালা তিলক বা বৈরাগীর উত্তরীয় কোনো কিছুই তাঁহার নাই। প্রভু অপর কাহারো কথা বলেন নাই তো।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর চন্দ্রশেখর মিশ্র দরবেশ-বেশী সনাতনকে বাড়ির ভিতরে নিয়া গেলেন।

প্রভুর দর্শন পাওয়া মাত্র সনাতনের ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। প্রাণপ্রিয় ভক্তের আগমনে প্রভুর আনন্দের আর অবধি নাই। ভাবাবেগে সারা দেহ কম্পিত হইতেছে, নয়নে বহিতেছে পুলকাশ্রু। ভূলুণ্ঠিত সনাতনকে সযত্নে তুলিয়া ধরিয়া তখনি আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন।

দৈন্যভরে সনাতন সরিয়া দাঁড়ান। কাতর স্বরে কহেন, "প্রভু, আমি অতি নীচ, হীনাচারী, তোমার দেবদুর্লভ অঙ্গ দিয়ে আমায় এভাবে আর স্পর্শ ক'রো না।"

চিহ্নিত লীলা-পার্ষদ এতদিন পরে আজ প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। এ আনন্দ রাখার তাঁহার যে ঠাঁই নাই। প্রেমাবেগে বার বার সনাতনকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন—

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে।

অতঃপর প্রেমার্দ্রকণ্ঠে সকলের কাছে সনাতনের নিগূঢ় পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন, তাঁহার ত্যাগ তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য সাধনের প্রশস্তি গাহিতে লাগিলেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে।

মধ্যাহ্ন সমাগত। প্রভু কহিলেন, "সনাতন, বেলা অনেক হয়েছে। এবার তাড়াতাড়ি পতিতপাবনী গঙ্গার পুণ্যধারায় স্নান তর্পণ সমাপন ক'রে এসো। তারপর ভিক্ষা গ্রহণ করো।"

মিশ্রগৃহ হইতে একখণ্ড পুবাতন বস্ত্র সনাতন চাহিযা নিলেন। উহা দ্বিখণ্ডিত কবিযা তৈবি কবিলেন নিজেব কৌপীন ও বহির্বাস।

স্নানেব ঘাট হইতে ফিবিযা আসিতেই এক মাবাঠী ব্রাহ্মণ সনাতনকে তাঁহাব গৃহে ভোজনেব নিমন্ত্রণ জানাইলেন।

কিন্তু সনাতন তাহাতে সম্মত নন। কৃচ্ছ্রব্রত ও কাঙালেব জীবনকেই যে তিনি পবম পথেব প্রস্তুতি হিসেবে আজ প্রাণপণে আঁকডিযা ধবিযাছেন। সাবা জীবন কাটিযাছে বাদশাহী দববাবেব ভোগ-বিলাস ও ঐশ্বর্যেব চাকচিক্যেব মাঝখানে। তাইতো বৈষযিকতাব সূক্ষ্মতম অঙ্কুবটিকে নিঃশেষে দগ্ধ না কবা অবধি তাঁহাব স্বস্তি নাই। চবম বৈবাগ্যেব মধ্য দিযা পেঁীছিবেন কৃষ্ণ-অনুবাগেব মহাসমুদ্রে, ইহাই যে তাঁহাব অভীপ্সা।

যুক্তকবে সনাতন নিবেদন কবিলেন, "আপনাবা আশীর্বাদ কবুন, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব হযে গৃহে গৃহে মাধুকবী ক'বেই যেন আমি দিনাতিপাত কবতে পাবি।"

ভোটকম্বলটি স্কন্ধে নিযা, ভিক্ষাব ঝুলি হস্তে সনাতন উঠিযা দাঁডাইলেন। এবাব বাহিব হইবেন দ্বাবে দ্বাবে ভিক্ষা মাগিতে।

প্রভু তো মহা উল্লসিত, বাব বাব গদ্‌গদ কণ্ঠে সবাইকে কহিতে লাগিলেন, "দ্যাখো, দ্যাখো, সনাতনেব কি অপূর্ব বৈবাগ্যসাধন।"

প্রভু আনন্দ প্রকাশ কবিতেছেন বটে, কিন্তু এই সঙ্গে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঘন ঘন চাহিতেছেন সনাতনেব স্কন্ধস্থিত ভোটকম্বলটিব দিকে।

তাঁহাব এ দৃষ্টিব গূঢ তাৎপর্য বুঝিতে সনাতনেব দেবি হয নাই। মুহূর্তে নিজ সিদ্ধান্ত তিনি স্থিব কবিযা ফেলেন, ছুটিযা যান গঙ্গাতীবে। দীন দবিদ্র এক বৃদ্ধ নিকটস্থ ঘাটে বসিযা তাহাব জীর্ণ কাঁথাটি বৌদ্রে শুষ্ক কবিতেছে। সনাতন তাহাবই শবণ নিলেন। মিনতি কবিযা কহিলেন, "ভাই, তুমি দযা ক'বে আমাব একটা উপকাব কবো। আমাব এই নূতন কম্বলটিব বদলে তোমাব ঐ ছেঁডা কাঁথাখানি আমায দাও। এজন্য চিবকৃতজ্ঞ থাকবো তোমাব কাছে।"

সংশয ও সন্দেহে বৃদ্ধেব ভ্রূ কুঞ্চিত হইযা উঠে। নূতন ভোটকম্বলেব বদলে এই অব্যবহার্য কাঁথা? এ আবাব কি অদ্ভুত প্রস্তাব? এ অচেনা বৈবাগীব মনে কোনো অভিসন্ধি নাই তো? না কি এ তাহাব পবিহাস।

বহুক্ষণ নানাভাবে বুঝাইযা সনাতন লোকটিকে বাজী কবান। তাবপব মহা প্রসন্ন মনে জীর্ণ কাঁথা গাযে জডাইযা ফিবিযা আসেন প্রভুব সমীপে।

প্রভুব চোখে মুখে ফুটিযা উঠে অপাব আনন্দেব দীপ্তি। বিস্মযেব ভান কবিযা জিজ্ঞাসা কবেন, "একি সনাতন। তোমাব সেই ভোটকম্বলটি কোথাব হাবিযে এলে?"

কম্বল বর্জনেব কাহিনী শুনিযা প্রভু আনন্দে ডগমগ। এই তো চাই। তাঁহাব সনাতন যে লোকগুরু হওযাব জন্য আবির্ভূত। যে ভক্তি সাম্রাজ্যেব পত্তন প্রভু কবিতেছেন তিনি যে তাহাব অন্যতম নিযামকরূপে আগে হইতেই চিহ্নিত হইযা আছেন। তাই তো লোকশিক্ষাব জন্য সনাতনেব জীবনে প্রকটিত হওযা প্রযোজন ত্যাগ বৈবাগ্যেব পবাকাষ্ঠা।—

প্রভু কহে ইহা আমি কবিযাছি বিচাব।
বিষয বোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমাব।

সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ
রোগ খণ্ডিত সদ্বৈদ্য না রাখে বিষয় রোগ।

হুসেন শাহের প্রাক্তন প্রধান অমাত্যের, এই সর্বত্যাগী মহাবৈরাগী রূপটি প্রভু শ্রীচৈতন্য সেদিন ইচ্ছা করিয়াই সর্বজন সমক্ষে প্রকটিত করিলেন। বৈষ্ণব সাধক-সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন কৃচ্ছ্রবরণ ও দৈন্যময়তার এক কালজয়ী আলেখ্য।

বারাণসীতে প্রভুর কাছে সনাতন এ সময়ে কিছুদিন অবস্থান করেন। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রাখিয়া প্রভু তাঁহার এই চিহ্নিত পার্ষদকে অনুপ্রাণিত করেন নিজ প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় সাধনার। সাধ্য-সাধনার তত্ত্ব নিরূপণে দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। সনাতন প্রকৃত জিজ্ঞাসু মহাপ্রতিভাধর, সর্বোপরি প্রভুর চরণে সমর্পিত-প্রাণ। পরমোৎসাহে একের পর এক তিনি প্রশ্ন করিয়া চলেন, আর প্রভু প্রসন্নোজ্জ্বল মুখে উত্তর দিতে থাকেন। কিছুদিন আগে গোদাবরী-তীরে প্রভু ও রামানন্দের সংলাপের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নির্যাস-রসতত্ত্ব। আর আজ বারাণসীর গঙ্গাতীরে প্রভু ও সনাতনের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া উদ্‌ঘাটিত হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনার ক্রম ও নিগূঢ় তত্ত্ব। প্রভুর ব্যাখ্যাত এই তত্ত্বের সংবাহকরূপে সনাতন উত্তরকালে ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবসমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

একে একে প্রভু বিবৃত করিলেন কৃষ্ণ অবতার ও বৃন্দাবনলীলার মর্মকথা। প্রকাশ করিলেন যুগলভজনের অপূর্ব পদ্ধতি। প্রথমে শ্রীমুখের বাণী শুনাইয়াই প্রভু সনাতনকে কৃতার্থ করিলেন। তারপর পরম কৃপাভরে তাঁহার মধ্যে করিলেন শক্তি-সঞ্চার। সনাতনের শিরে পদ্মহস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, "সনাতন, আজ দেববাঞ্ছিত যে সব তত্ত্ব তুমি শ্রবণ করলে, আশীর্বাদ করি, অচিরে তা তোমার ভেতর স্ফুরিত হয়ে উঠুক।"

ইতিপূর্বে রূপকেও প্রভু এমনি কৃপা করিয়াছেন। শক্তি সঞ্চার করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন বৃন্দাবনধামে। এবার সনাতনকে সেখানে প্রেরণ করিলেন বিরাট দায়িত্বের ভার দিয়া। নির্দেশ দিলেন—

তুমি করিহ ভক্তিরসের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি স্মৃতি শাস্ত্র করি করহ প্রচার।

আরো কহিলেন, "সনাতন, এর পর থেকে আমার কন্থা করঙ্গধারী কাঙাল বৈষ্ণবেরা দলে দলে ব্রজমণ্ডলে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তুমি তাদের উপর দৃষ্টি রেখো, রক্ষণাবেক্ষণ করো।"

প্রভুর এই আদেশ সনাতন নিষ্ঠাভরে পালন করিয়াছিলেন। প্রভুর ব্যাখ্যাত তত্ত্বের ধারক ও বাহকরূপে উত্তরকালে ব্রজমণ্ডলেই তিনি স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন এবং অচিরকাল মধ্যে সেখানকার বৈষ্ণবসমাজের মুখপাত্ররূপে চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াই প্রবীণ ভক্ত সুবুদ্ধি রায়, লোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ পণ্ডিতের সহিত সনাতন সাক্ষাৎ করিলেন। দৈন্যভরে তাঁহাদের চরণে দণ্ডবৎ করার পর আশ্রয় নিলেন যমুনা-পুলিনের আদিত্যটিলায়।

স্থানটি ঘন অরণ্যময়। এখানকার নির্জন সুগম্ভীর পরিবেশ ধ্যানভজনের বড় অনুকূল। নির্বিঘ্ন সাধক সনাতনের এ জায়গাটি বড় ভাল লাগিল। এখানে বসিয়া একান্ত নিষ্ঠায় তিনি সাধনভজন শুরু করিয়া দিলেন।

সনাতনের এই সময়কার ত্যাগ-বৈরাগ্যময়, ভজননিষ্ঠ জীবনের চিত্র 'ভক্ত পদাবলী' হইতে পাওয়া যায়—

কভু কান্দে কভু হাসে কভু প্রেমানন্দে ভাসে
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা, নেড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা
পরিধানে ছেঁড়া বহির্বাস।
কখনও বনের শাক অলবণে করি পাক
মুখে দেয় দুই এক গ্রাস।

মাঝে মাঝে ভজনতন্ময় সাধকের স্বাভাবিক অবস্থা যখন ফিরিয়া আসে, ঝুলি কাঁধে পদব্রজে মথুরায় চলিয়া যান। যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা সেখানে মিলে, তাহাতেই হয় উদরপূর্তি।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রভুর নির্দেশ মতো সনাতন লুপ্ততীর্থ উদ্ধারে ব্রতী হন। আগে হইতেই লোকনাথ গোস্বামী এ কাজ কিছুটা শুরু করিয়াছেন। সনাতন তাহার সহিত নিজের প্রচেষ্টা যুক্ত করিলেন। যে সব প্রাচীন গ্রন্থে ব্রজমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে সেগুলি ঢুঁড়িয়া লুপ্ত তীর্থের সন্ধান বাহির করা এখন হইতে হয় তাঁহার এক বড় কাজ। এই উদ্দেশ্য নিয়া দিনের পর দিন তিনি অরণ্যে পর্বতে ঘুরিয়া বেড়ান। শাস্ত্র মহাজনবাক্য ও লোকগাথার ভিত্তিতে রাধাকৃষ্ণের এক একটি লীলাতীর্থ উদ্ধার করেন, আর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্থানীয় জনগণকে নিয়া মত্ত হন কীর্তনানন্দে।

বৎসরখানেক বৃন্দাবনে অতিবাহিত করার পর প্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্য সনাতনের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। তাছাড়া, প্রভু তাঁহাকে একবার নীলাচলে ঘুরিয়া আসিতেও বলিয়াছিলেন। তাই হঠাৎ একদিন ঝুলি কাঁধে নিয়া উড়িষ্যার পথে ধাবিত হইলেন।

ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া সনাতন দিন রাত পথ চলিতেছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, দেহে তাঁহার বিষাক্ত কন্ডু রোগের আক্রমণ ঘটিয়াছে। নির্বিঘ্ন সন্ন্যাসী মনে মনে ভাবিতে থাকেন, 'এই দুষ্ট রোগের দুর্ভোগ যে আমার অবশ্য প্রাপ্য। দবীর খাস জীবনে ম্লেচ্ছ সুলতানের অধীনে থাকিয়া যে সব অন্যায়-অনাচার করেছি, এ যে তারই অনিবার্য পরিণতি।' সঙ্গে সঙ্গে নিজ সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন, ঘৃণ্য রোগে আক্রান্ত এই দেহভার আর শুধু শুধু বহন করিয়া বেড়াইবেন না। পুরীধামে পৌঁছিয়া শ্রীজগন্নাথ ও প্রভু শ্রীচৈতন্যের চন্দ্রবদন দর্শন করিবেন, তারপর রথচক্রতলে করিবেন প্রাণ বিসর্জন।

ধামে পৌঁছিয়াই সনাতন উপস্থিত হইলেন হরিদাসের ভজন কুটিরে। হরিদাস নিজেকে মনে করেন যবন, পতিত, দীনাতিদীন। তাই শ্রীজগন্নাথের সেবক ও চৈতন্য-প্রভুর ভক্তদের স্পর্শ এড়াইয়া নগরের এক প্রান্তে নিজের পর্ণকুটির রচনা করিয়াছেন। সনাতনের মনেও এমনি দৈন্যভাব ; নিজেকে মনে করেন আচারভ্রষ্ট ও অপবিত্র। তাই হরিদাসের কুটিরই যে তাঁহার আশ্রয়স্থল। জপসিদ্ধ হরিদাস আর ত্যাগনিষ্ঠ

শাস্ত্রবিদ্ সাধক সনাতন, এই দুয়ের মিলনে বিজন টোটা-মধ্যস্থ কুটির সরগরম হইয়া উঠে।

প্রভুর নিত্যকার এক কাজ ছিল পরম ভক্ত হরিদাসকে দর্শন দান। জগন্নাথের উপল ভোগের পর তিনি সঙ্গোপাঙ্গ সহ এই কুটিরে উপস্থিত হইতেন, দীর্ঘ সময় কাটাইয়া গৃহে ফিরিতেন।

সেদিন চৈতন্যপ্রভু টোটায় পদার্পণ করামাত্র সনাতন দৈন্যভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বাহু প্রসারিয়া প্রভু যতই আলিঙ্গন করিতে যান সনাতন ততই পিছু হঠেন। কাতর স্বরে বলেন, "প্রভু কৃপা করো, আমার মিনতি রাখো। এমন ক'রে তোমার দেবদুর্লভ দেহ দিয়ে আমায় স্পর্শ ক'রো না। আমি অতি হীন, ভ্রষ্টাচারী। তদুপরি সারা অঙ্গে রয়েছে কণ্ডুর ঘৃণ্য ক্লেদ। দোহাই তোমার, এই ক্লেদ তোমার গায়ে মেখে আমায় আর পাপের ভাগী ক'রো না।"

কিন্তু প্রভুকে রোধ করিবে এমন সাধ্য কার ? আনন্দের আবেশে বার বার প্রিয় পার্ষদকে বুকে জড়াইয়া ধরেন, কণ্ডুরস তাঁহার সারা শরীরে লিপ্ত হয়। আর সনাতন কেবলি জ্বলিতে থাকেন অনুতাপের তীব্র দহনে।

সনাতনের আত্মগ্লানি কেবলি বাড়িতে থাকে। ভাবেন—কৃষ্ণ তাঁহাকে একি বিপদে ফেলিলেন। রোজই প্রভু তাঁহাকে এমনিভাবে প্রেমালিঙ্গন দিবেন, আর তাঁহার দেহ হইবে অপবিত্র। এযে নিতান্ত অসহ্য। বরং এ পাপ-দেহ তাড়াতাড়ি বিসর্জন দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সেদিন ভক্তগণসহ শ্রীচৈতন্য হরিদাসের ভজনকুটির আলো করিয়া বসিয়াছেন, ভাবাবেশে ও দিব্য আনন্দে তিনি উদ্দীপিত। শ্রীমুখ হইতে কৃষ্ণকথার অমৃতধারা ঝরিয়া পড়িতেছে।

হঠাৎ প্রভু সনাতনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "সনাতন, একটা কথা সদাই মনে রেখো, দেহত্যাগ করিলেই কিন্তু কৃষ্ণ মিলে না , কৃষ্ণ মিলে কৃষ্ণভজনে। ওসব অশুভ সংকল্প ছেড়ে দাও, ডুব দাও লীলাময়ের লীলারসের মহাপাথারে। আমি আশীর্বাদ করছি, অচিরে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, পাবে পরমপ্রভুর দর্শন।'

প্রভুর ইঙ্গিতের মর্ম সনাতন বুঝিলেন। অন্তর্যামীর কাছে সনাতনের আত্মহত্যার গোপন ইচ্ছাটি অজানা থাকে নাই।

প্রেমাবেগে সনাতন তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "প্রভু, আমি পতিত, তার মহাপাতকী। তবে এ দেহ জিইয়ে রেখে কি লাভ বলো ? শ্রীজগন্নাথের রথচক্রতলে আমি নিজেকে নিক্ষেপ করবো, আমায় তুমি অনুমতি দাও।'

উত্তরে কৃপাময় প্রভু যে কথা কহিলেন, তাহার মধ্য দিয়া অন্তরঙ্গ ভক্ত সনাতনের মূল্যায়ন প্রকট হইয়া উঠে :

প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ।
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।
ধর্মাধর্ম বিচার কিবা না পার করিতে।

তোমাব শবীব মোব প্রধান সাধন।
এ শবীবে সাধিব আমি বহু প্রযোজন। (চৈঃ চঃ)

চিহ্নিত পার্ষদ সনাতনকে দিযা কি ঐশী কর্ম প্রভু কবাইবেন তাহাব আভাস ইতিমধ্যেই কিছুটা ফুটিযা উঠিযাছে। কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণসেবাব প্রবর্তন লীলাতীর্থ উদ্ধাব, বৈবাগ্যময আদর্শেব প্রচাব—এগুলি তাঁহাব সংকল্পে বহিযাছে। একাজে সনাতন তাঁহাব অন্যতম প্রধান সহায। নিজে প্রভু মাতৃআজ্ঞাব নীলাচলে বাস কবিতেছেন, তাই এস্থান ত্যাগ কবাব ইচ্ছা তাঁহাব নাই। এদিকে প্রাণপ্রিয ব্রজেন্দ্রনন্দনেব লীলাধাম বৃন্দাবনেব দিকে তাঁহাব দৃষ্টি বহিযাছে সতত নিবদ্ধ। সেখানকাব নব উজ্জীবিত ভক্তিধর্ম আন্দোলনেব পুবোভাগে প্রিয পাবিকব সনাতনকেই যে তিনি স্থাপন কবিতে চান। সনাতনেব মাধ্যমেই যে তাঁহাব নিজ প্রযোজন অনেকাংশ সিদ্ধ কবিবেন।

ভর্ৎসনাব পব সনাতন শিব নত কবিযা বহিলেন। সত্যিই তো প্রভুব চবণে যে জীবন উৎসর্গ কবিযাছেন, তাহাব উপবে যে তাঁহাব সত্যকাব কোনো অধিকাব নাই। তবে সে জীবন এখন নিজ ইচ্ছায কি কবিযা বিসর্জন দিবেন?

প্রভুব বাণী শুনিযা হবিদাসেব আনন্দ আব ধবে না। প্রেমভবে সনাতনকে আলিঙ্গন কবিযা কহিলেন, "সনাতন, তোমাব সৌভাগ্যেব সীমা নেই। স্বযং প্রভু তোমাব দেহকে নিজ ধন বলে দাবি কবছেন। শুধু তাই নয নিজ দেহ দিযে যে কাজ সম্ভব নয, তা কবাতে মনস্থ কবছেন তোমায দিযে। তাই, তুমি সত্যই ধন্য। আমবা নিতান্ত অধম, তাই প্রভুব কোনো কাজে লাগতে পাবলুম না।"

"এ কি অদ্ভুত কথা তুমি বলছো, শ্রীপাদ?"—সনাতন যুক্তকবে উত্তব দেন। "প্রভুব এই মণ্ডলীতে তোমাব মতো ভাগ্যবান্ আব কে আছে? প্রভুব আবির্ভাব নামধর্ম প্রচাবেব জন্য। এ কাজে তুমিই যে সবাব অগ্রগণ্য। প্রভুব ভক্তেব সবাই সাধনভজন কবছে নিজ নিজ কল্যাণেব জন্য। কিন্তু তুমি হচ্ছো ব্যতিক্রম। নিজেব উদ্ধাবেব জন্য ব্যগ্র না হযে, অবিবাম উচ্চ কণ্ঠে জপ ও কীর্তন ক'বে তুমি জীবেব উদ্ধাবেব জন্য তৎপব হযেছো বেশী। তোমাব প্রেমেব তুলনা কোথায, শ্রীপাদ?"

সনাতন ও হবিদাসেব এমনিতব প্রণয-দ্বন্দ্বে ভজনকুটিব মুখব হইযা উঠিতে থাকে।

শ্রীচৈতন্যেব অন্তবঙ্গ ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত দেশ হইতে নীলাচলে আসিযা পৌঁছিযাছেন। সেদিন তিনি সনাতনেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিতে গেলেন। কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথায অতিবাহিত কবাব পব সনাতন কহিলেন, "পণ্ডিত আপনি প্রভুব একান্ত আপনাব জন। আপনি আমায সদুপদেশ দিন। প্রভু বোজ আমায আলিঙ্গন কবেন, আব তাঁব কনককান্তি দেহে লিপ্ত হয আমাব বীভৎস কণ্ডু-বোগেব বস। এ এক মহা অপবাধে আমি অপবাধী হযে পডেছি। প্রভুকে নিবস্ত কবা অসম্ভব। তাই ভেবেছিলাম, আত্মহত্যা কবে এ সমস্যাব সমাধান কববো, তাও হলো না। অন্তর্যামী প্রভু আগে থেকে সব বুঝতে পেবে তাতে বাদ সাধলেন। এখন আমি কি কবি, বলুন তো।"

জগদানন্দ স্বভাবতই প্রভু-অন্ত প্রাণ। প্রভুব শবীবে বিবাক্ত বোগেব স্পর্শ নিত্য লাগিতেছে শুনিযা তিনি শিহবিযা উঠিলেন। ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "সনাতন, তুমি

এক কাজ করো। বৃন্দাবনধাম থেকে তুমি ছুটে এসেছো প্রভুর দর্শনের জন্য, সেই আসল কাজটি তো ভাই সাঙ্গ হয়েছে। তবে আর এখানে থেকে রোজ বিপদ ডেকে আনছো কেন? সামনেই রয়েছে রথযাত্রা উৎসব—তারপরেই তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে চলে যাও। তোমার আর রূপ গোস্বামীকে প্রভু বৃন্দাবনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, আরো দিয়েছেন কত দুরূহ কাজের ভার। তোমার কি ভাই বৃন্দাবন ছেড়ে অন্যত্র বাস করা সাজে? বৃন্দাবনই যে তোমার স্বস্থান। কালবিলম্ব না ক'রে সেই স্বস্থানেই তো তোমার চলে যাওয়া উচিত।"

পণ্ডিতের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সনাতন তাহাতে সায় দিলেন।

পরদিন হরিদাস ও সনাতনকে প্রভু দর্শন দিতে আসিয়াছেন। অভ্যাসমতো সেদিন তিনি সনাতনকে বক্ষে ধারণ করলেন। তীব্র অনুশোচনার দহন শুরু হইল সনাতনের মনে। করজোড়ে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, রোজ রোজ এই পাপীর দেহ তুমি স্পর্শ করো, বিষাক্ত কণ্ডুর ছোঁয়া তোমার পবিত্র দেহে লাগে, আর আমি জ্বলে-পুড়ে মরি। প্রভু, এবার আমি স্থির করেছি, নীলাচলে আর থাকবো না, রথযাত্রার পরেই বৃন্দাবনে চলে যাবো। তাছাড়া এইতো কাল পণ্ডিত জগদানন্দের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। তিনিও আমায় উপদেশ দিলেন, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাবার জন্য।"

প্রভু রোষে গর্জিয়া উঠেন। হুঙ্কার দিয়া কহেন, "কি বললে তুমি সনাতন! সেদিনকার জগা, সে আসে তোমায় উপদেশ দিতে। এত বড় তার স্পর্ধা। সে কি জানে না বুদ্ধিতে শাস্ত্রজ্ঞানে, ভজন সাধনে তুমি তার গুরু হবার যোগ্য? আমাকেও তুমি শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব শেখানোর শক্তি ধরো। তাছাড়া, তুমি আমার প্রাণাধিক প্রবীণ সুহৃদ্। বালকবুদ্ধি জগা তোমায় উপদেশ দিতে আসে, এ ধৃষ্টতা তার কি ক'রে হলো?"

প্রভুর ক্রোধোদ্দীপ্ত মূর্তির দিকে সনাতন নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন, গণ্ড বাহিয়া ঝরিতেছে প্রেমাশ্রুর ধারা।

ক্ষণপরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "প্রভু আজ আমার পরম সৌভাগ্য – তোমার এই প্রেমমনোহর রূপটি আমার সামনে এমনি ক'রে উদ্ঘাটিত হলো। আরো বুঝলাম, ভক্তপ্রবর জগদানন্দের মতো ভাগ্যবান্ ভক্ত খুব কমই রয়েছেন। তাকে তুমি যে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলে, তা করলে একান্ত আত্মজন জ্ঞানে। তোমার সহজ আত্মীয়তার সে অধিকারী। একি সহজ কথা, প্রভু? আসলে দেখছি, প্রকৃত অন্তরঙ্গ জন জগদানন্দের জন্য তুমি রেখেছ একাত্মতার মধু। আর দূরে ব্যবধান থেকে আমাদের পান করাচ্ছো গৌরবস্তুতির নিম্ব নিশিন্দা রস।"

সনাতনের এই কথায় প্রভু একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। তারপর প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "সনাতন আসল কথাটি শোন। তোমার চাইতে জগদানন্দ আমার প্রিয় নয়। আর জেনে রেখো, কারুর মর্যাদা লঙ্ঘন আমি কখনো সহ্য করতে পারিনে। তোমার উপদেশ দিতে এসে জগদানন্দ তোমার মতো ব্যক্তির মর্যাদাকে লঙ্ঘন করেছে। এই জন্যই আমি তাকে ভর্ৎসনা করেছি। আর বহিরঙ্গ জ্ঞানে আমি তোমার প্রশংসা করেছি, তা মনে ক'রো না। তোমার নিজস্ব গুণেই প্রশংসা উৎসারিত হয়।"

ভক্তদেব লক্ষ্য কবিযা প্রভু আবো কহিলেন, "তোমবা জানো, আমি একজন সর্বত্যাগী সর্ববন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী চন্দন ও পঙ্কে আমাব সমজ্ঞান বাখাই তো উচিত। তবে সনাতনেব কণ্ডুবস আমাব গাযে লাগায তোমবা এত চঞ্চল হচ্ছো কেন, বল তো ?"

প্রবীণ ভক্ত হবিদাস এবাব নিবেদন কবিলেন, "প্রভু, তুমি স্বেচ্ছামব, স্বতন্ত্র ঈশ্বব। তোমাব লীলাব মর্ম আমবা কি বুঝবো। বৈষ্ণবাপবাধ ক'বে বাসুদেব ঠাকুব কুষ্ঠ-বোগে আক্রান্ত হযেছিল, তা সত্ত্বেও তুমি তাব প্রতি কৃপা কবতে কার্পণ্য কবো নি। তোমাব প্রসাদে তাব দুবাবোগ্য কুষ্ঠ হযেছিল নিবামব। অথচ আজ দেখতে পাচ্ছি তোমাতে সমর্পিতপ্রাণ পবমভাগবত সনাতনেব বিষাক্ত কণ্ডু কিছুতেই দূব হচ্ছে না। এব বহস্য শুধু তুমিই জানো, প্রভু।"

মুচকি হাসিযা প্রভু উত্তব দিলেন, "হবিদাস, সনাতন আমায সমর্পণ কবেছে তাব দেহ মন প্রাণ। আব আমি আমাব সব সমর্পণ ক'বে বসে আছি আমাব প্রাণপ্রভু কৃষ্ণেব কাছে। সনাতনকে তিনি নিশ্চযই বক্ষা কববেন।

ভক্তেবা সবিস্মযে লক্ষ্য কবিলেন, কিছুদিনেব মধ্যেই সনাতনেব দুবাবোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণবূপে দূবীভূত হইল, সাবা দেহে ফুটিযা উঠিল অপূর্ব লাবণ্যশ্রী।

ক্রমে পবিত্র বথযাত্রা আসিযা পড়ে। গৌডীযা ভক্তগণ এ সমযে সদলবলে নীলাচলে সমবেত হন, প্রাণপ্রভুকে কেন্দ্র কবিযা তাঁহাদেব আনন্দবঙ্গ উচ্ছল হইযা উঠে। এই সব প্রেমিক এবং প্রভুগতপ্রাণ ভক্তদেব সাথে একে একে সনাতন পবিচিত হন, নিজেকে গণ্য কবেন মহাভাগ্যবান্।

এ সমযকাব আব এক বড আকর্ষণ—শ্রীজগন্নাথেব বথেব অগ্রভাগে ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্যেব নর্তন। এবাব এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিযা সনাতন আনন্দে আত্মহাবা হইযা যান।

চাতুর্মাস্য শেষ হইলে গৌডীযা ভক্তগণ দেশে চলিযা গেলেন। প্রভু কিন্তু সনাতনকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। তাই দোলযাত্রা অবধি সনাতনকে নীলাচলে অবস্থান কবিতে হইল।

বাবাণসীতে থাকা কালে বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাধনাব যে শিক্ষা প্রভু সনাতনকে দিযাছিলেন, এবাব সমাপ্ত হয তাহাব পববর্তী অধ্যায। তাছাড়া, বৃন্দাবনে প্রভু নূতন ভক্তিসাম্রাজ্য গঠন কবিতে চান এবং তাঁহাব ভিত্তি নির্মাণ ও সংগঠনেব ভাব দিযাছেন প্রিয পার্ষদ সনাতনেবই উপব। বিশেষ কবিযা এই দুইটি কাবণে মাসেব পব মাস সনাতনকে প্রভু ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাখেন, দান কবেন বহুতব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

দোলযাত্রা উৎসব সাডম্ববে সমাপ্ত হইযা গেল। এবাব সাশ্রুনযনে প্রভুব চবণে বিদায নিযা সনাতন নীলাচল ত্যাগ কবিলেন।

বৃন্দাবনেব আদিত্য টিলাব পর্ণকুটিবে বসিযা আবাব শুবু হইল তাঁহাব ভজন কীর্তন ও প্রভুব নির্দেশিত কর্মসাধন।

স্থানটি ইষ্ট-ধ্যানেব পক্ষে বড অনুকূল। উপবেব দিগন্তবিস্তৃত নীলাকাশ। নিচে কল্লোলিনী কৃষ্ণপ্রিযা যমুনা বহিযা চলিযাছে অপবূপ লীলাভঙ্গিমায। দূবে বনানীবেষ্টিত সাবি সাবি পাহাডেব গাযে জডানো নীল সবুজেব মাধুবিমা। সমগ্র

পরিবেশে যেন ওতপ্রোত হইয়া আছেন প্রাণপ্রিয় ইষ্টবিগ্রহ—শ্যামসুন্দর। পরমানন্দে দিনের পর দিন এই নির্জন রমণীয় অরণ্যাবাসে সনাতনের তপস্যা অগ্রসর হইয়া চলে।

বৃন্দাবনের আশেপাশে তখন জনমানবের বসতি খুব কম ছিল, তাই ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে হইলে সাধুদের যাইতে হইত মথুরা অঞ্চলে। সনাতনকেও মাঝে মাঝে তাহাই করিতে হইত। হঠাৎ একদিন এই ভিক্ষার মধ্য দিয়া উন্মোচিত হইল তাঁহার সাধন-জীবনের এক নূতন বাতায়ন। ইষ্টদেব প্রকটিত করিলেন তাঁহার কাছে এক নূতনতর সেবালীলা।

মাধুকরী করিতে গিয়া সনাতন সেদিন মথুরার দামোদর চৌবের বাড়িতে উপস্থিত হইয়াছেন। অঙ্গনে পা দিতেই চোখে পড়িল নয়নাভিরাম বিগ্রহ, নাম শ্রীশ্রীমদনগোপাল। দর্শন মাত্রেই সনাতন কি জানি কেন এক অপূর্ব প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া গেলেন। এই শ্রীমূর্তি যেন তাঁহার কত আপনার, কত পরিচিত। কত জন্মের সাধনার ধন আজ যেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ভাবাবিষ্ট সাধকের অন্তরে জাগিয়া উঠে প্রবল আর্তি, আর জাগে এই শ্রীবিগ্রহ সেবার জন্য দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অতি কষ্টে তাঁহাকে আত্মসংবরণ করিতে হয়। নিজে তিনি কন্থাকরঙ্গধারী কাঙাল বৈষ্ণব, শ্রীমূর্তির সেবার সামর্থ্য তাঁহার কই? তাছাড়া, চৌবে-পরিবার তো প্রাণ গেলেও এই ইষ্ট-বিগ্রহ ত্যাগ করিবে না। ভিক্ষা গ্রহণের শেষে, লোভাতুর নয়নে বার বার ঐ শ্রীমূর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন।

আদিত্য টিলার বিজন আবাসে সনাতন ফিরিয়া আসেন, দৈনন্দিন ধ্যানভজনে হন নিবিষ্ট। কিন্তু একি বিপদে আজ তিনি পড়িলেন? যখনি নয়ন মুদিয়া ভজন-আসনে উপবেশন করেন, কোথা হইতে সেই মদনগোপাল মূর্তি মানসপটে ভাসিয়া উঠে, প্রাণ মন কাড়িয়া নিয়া আবার কোথায় মিলাইয়া যায়। সনাতনের মনে আর স্বস্তি নাই, শান্তি নাই। মাঝে মাঝেই কাজে বা অকাজে মথুরায় ছুটিয়া যান, চৌবেজীর অঙ্গনে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষে চাহিয়া থাকেন ঐ নয়নমনবিমোহন ঠাকুরের দিকে।

ক্রমে চৌবে-পরিবারের সঙ্গে সনতেনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। চৌবেজীর বিধবা পত্নীর সেবার ভাবটি বড় সহজ সুন্দর। এই শ্রীবিগ্রহ তাঁহার আদরের বালগোপাল—নিজের বালক জ্ঞানেই দিনরাত তিনি ইহার সেবা-পরিচর্যা করেন। চৌবে গৃহিণীর পুত্রের নাম সদন। এই সদন যেমন তাঁহার এক পুত্র, মদনগোপালজীও তেমনি আর একটি। প্রাণপ্রিয় দুই পুত্রের লালনপালন তিনি সম্পন্ন করেন একভাবে, একই সহজ সরল মাতৃভাবের মধ্য দিয়া।

নিষ্ঠাবান্ ভক্ত সনাতনের মন কিন্তু খুঁতখুঁত করিতে থাকে। ইষ্টবিগ্রহে সেবা-পরিচর্যা চলিবে গৃহেরই একটি বালকের সমপর্যায়ে? প্রকৃত ইষ্টনিষ্ঠা থাকিবে না, ইষ্টের সেবা ও পূজার বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে না, এ কেমন কথা?

সেদিন চৌবের গৃহিণীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা, তুমি পরমস্নেহে মদনগোপালজীর সেবা-যত্ন ক'রে যাচ্ছো, তা ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয়, এতে একটু ত্রুটি রয়ে যাচ্ছে। তুমি মাতৃভাবে, যশোদাভাবে, প্রভুজীকে লালন করছো। কিন্তু মা-যশোদার বাৎসল্য

রস তো সাধারণ জীবের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমার মনে হয়, তুমি প্রভুজীর সেবা সম্পন্ন করো সত্যকার ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে। যে প্রণালীতে ভক্ত বৈষ্ণবেরা ভগবানকে সেবা পূজো করে, সেই প্রণালী তুমি অনুসরণ করো।"

মহিলা সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "তাই তো, বাবাজী। তুমি যে আমায় নূতন করে ভাবিয়ে তুললে। বেশ, তাই হবে, তোমার উপদেশ মতো এবার থেকে ঠাকুরের জন্য বিধিমতো সেবা-অর্চনার ব্যবস্থাই করবো।"

ইতিমধ্যে কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়াছে। মদনগোপালজীর দর্শনের জন্য সনাতন সেদিন মথুরায় গিয়াছেন, অঙ্গনে পদার্পণ করামাত্রই চৌবে পত্নী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। স্মিত হাস্যে কহিলেন, "নাঃ বাবাজী, তোমার কথামতো কাজ আর করা গেল না। মদনগোপালজী বড় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সেদিন আমায় স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন, 'ওগো, তুমি আমার মা হয়ে ছিলে, সেই তো ছিল ভালো। এখন ঠাকুর জ্ঞানে আমায় দূরে সরিয়ে রাখছো, পূজো অর্চনার ভিড় লাগিয়েছো। এ আমার ভালো লাগছে না, বাপু। তোমার দুই ছেলে, সদন আর মদনের ভেতর তফাত রাখা কি ভালো?"

সনাতন চমকিয়া উঠিলেন। তাই তো। সহজাত প্রেম ও প্রাণের স্বাভাবিক টান—ইহাই যে ঠাকুরের সেবার শ্রেষ্ঠ উপচার। চৌবে গৃহিণীর স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে এই মূলতত্ত্বটিই যে মদনগোপাল আজ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। প্রভুজীর এই কৃপা নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়া বার বার সনাতনের নয়ন দুটি অশ্রু সজল হইয়া উঠিতে থাকে।

মদনগোপালজীর আকর্ষণ কিন্তু সনাতনের জীবনে দিন দিনই হইয়া উঠে দুর্নিবার। দৈন্যময় সাধকের অন্তরের অন্তস্তল হইতে নিরত উদ্‌গত হয় কাতর প্রার্থনা—"হে প্রভু, হে দয়াল, তোমার বিরহ যে আর আমি সহ্য করতে পারছিনে। তুমি এসো—এসো, এই দীনহীন কাঙালের কোলে এসো। এই দুর্ভাগার জীবনে যে তীব্র দহন শুরু হয়েছে, তোমায় না পেলে তার নিবৃত্তি আর হবে না।"

অচিরে এই প্রার্থনা ও আর্তির ফল ফলিয়া যায়। দামোদর পত্নী সেদিন ম্লানমুখে সনাতনের কাছে আসিয়া দাঁড়ান। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহেন, "বাবাজী, আজ থেকে তুমিই নাও আমার মদনগোপালের সেবার ভার। গোপাল এখন বড় হয়েছে, মায়ের আঁচলের তলে আর বসে থাকতে চাইবে কেন? তোমার ঝুপড়িতে যাবে বলে বায়না ধরেছে, কাল রাতে স্বপ্নে এ কথা বার বার আমায় জানালে। তাছাড়া আমাদের সাংসারিক অবস্থাও রনে অসচ্ছল হয়ে পড়েছে। ঠাকুরকে পাছে কষ্ট দিতে হয়, এই দুশ্চিন্তায়ই আমি মরছি। বাবাজী আজই এ বিগ্রহ তুমি নিয়ে যাও।"

সনাতনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এভাবে পূর্ণ হইল। পরম আনন্দে শ্রীবিগ্রহ কোলে করিয়া তখনি ছুটিয়া চলিলেন বৃন্দাবনের ভজনকুটির অভিমুখে। সেখানে সযতনে স্থাপন করিলেন তাঁহার প্রাণপ্রিয় এই কৃষ্ণমূর্তি।

চৌবেজীর ঘর হইতে যে মদনগোপাল বিগ্রহ সনাতন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার একটি বিশেষ ঐতিহ্য রহিয়াছে। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র মহারাজ বজ্রনাভ এক সময় সারা ব্রজমণ্ডলে অনুসন্ধান চালাইয়া যে আটটি প্রাচীন বিগ্রহ আবিষ্কার করেন, মদনগোপাল শ্রীমূর্তি তাঁহাদেরই অন্যতম।

প্রাণপ্রিয় বিগ্রহ তো হস্তগত হইল। কিন্তু এখন ইঁহার সেবা পরিচর্যার কি উপায়? সনাতন মহাসমস্যায় পড়িলেন। ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে ভজনকুটিরের নিকটে এক ঝুপড়ি বাঁধিলেন, পরম যত্নে ঠাকুরকে সেখানে করিলেন সংস্থাপিত। সেবার জন্য নূতন উৎসাহে শুরু হইল মাধুকরী। ভিক্ষাস্বরূপ সামান্য যাহা কিছু আটা মিলিত তাহাই পিণ্ডাকৃতি করিয়া আগুনে পোড়াইয়া নিতেন। তারপর প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে দীন ভক্ত রোজ ইহা নিবেদন করিতেন আরাধ্য ঠাকুরের সম্মুখে। অগ্নিদগ্ধ এই আটার পিণ্ডই ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবসমাজে খ্যাতিলাভ করে সনাতন গোসাঁইর আঙাকড়ি-ভোগ নামে। উত্তরকালে বড বড ধনী ব্যক্তিরা মদনগোপালজীর সেবায় প্রচুর অর্থদান করিতে আগাইয়া আসেন। তখনকার সে বিপুল আয়োজন, ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের দিনেও কাঙাল সনাতনের দগ্ধ আটাপিণ্ড ছিল শ্রীবিগ্রহের নিত্যকার ভোগের অপরিহার্য অঙ্গ।

আঙাকড়ি ছাড়া আর একটি বস্তুও সনাতনকে নিবেদন করিতে দেখা যাইত। টিলার সানুদেশে ইতস্তত ছড়ানো ছিল নানা ধরনের বুনো শাক, রোজ তিনি এগুলি তুলিয়া আনিতেন। সৈন্ধব প্রায়ই জুটিত না, দীনহীন বৈষ্ণব অধিকাংশ দিনই অলবণে রান্না-করা ঐ শাক দ্বারা ভোগ চড়াইতেন। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হয়। অতঃপর শ্রীবিগ্রহ একদিন বড গোল বাধাইয়া বসেন। স্বপ্নে সনাতনকে দর্শন দিয়া কহেন, "ওগো, তোমার দেওয়া এই ভোগ আর গলাধঃকরণ করা যাচ্ছে না। তোমার আঙাকড়ি আর সৈন্ধব-মসলাহীন রান্না খেয়ে আর কতকাল চালাবো, বল?'

সনাতনের নয়ন দুটি অশ্রু ছলছল হইয়া উঠে। কাতরস্বরে নিবেদন করেন, "প্রভু, তুমি তো জানো, আমি তোমার এক নিষ্কিঞ্চন অধম সেবক। তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিরাজ, তোমার উপযুক্ত রাজভোগ আমি কি ক'রে যোগাবো? দগ্ধ আটা আর এই শাকসেদ্ধ খেতে রুচি না হয়, তুমি নিজেই নিজের সেবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা ক'রে নাও।"

বড় জটিল, বড দুর্জ্ঞেয় প্রভুর লীলাখেলা। চৌবে গৃহিণীর এত দিনের বাৎসল্য ও সমাদর ছাড়িয়া স্থান নিয়াছেন এই সহায় সম্পদহীন কাঙাল সাধুর ঘরে। আবার এখানে আসিয়া বায়না ধরিয়াছেন রুচিকর আহার্যের জন্য। কিন্তু ডোর-কৌপীন মাত্র সম্বল সনাতন এ ব্যাপারে কি করিতে পারেন? তিনি যে একেবারে নিরুপায়।

দিনের পর দিন সনাতন চিন্তা করেন স্বপ্নে মদনগোপালজীর দর্শনদানের কথা। অন্তর তাঁহার তীব্র ব্যথায় মুহ্যমান হয়, কপোল বাহিয়া ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা।

নিরন্তর আকুতি ও অশ্রুর অর্ঘ্য এবার অন্তর্যামীর অন্তর স্পর্শ করে। ভক্তাধীন ভগবান্ অল্প কয়েক দিনের ভিতরই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

পাঞ্জাবের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রামদাস কাপুর সেদিন রাত্রে নৌকা করিয়া বৃন্দাবনের পাশ দিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে একরাশ মূল্যবান মালপত্র, দূর শহরে গিয়া এগুলি বিক্রি করিবেন। হঠাৎ আদিত্য টিলার নিচে সূর্যঘাটের কাছে আসিয়া নৌকাটি এক বৃহৎ চড়ায় আঠকাইয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে কাত হইয়া পড়ে। মাঝি-মাল্লারা

বহুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর হার মানিতে বাধ্য হয়, মালভর্তি ভারী নৌকা কোনোমতেই নাড়ানো সম্ভব হয় না।

কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রি। বৃন্দাবনের অরণ্যে ও টিলার টিলায় ঘন অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। নিকটে কোথাও জনবসতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। রামদাস কাপুর প্রমাদ গণিলেন। কিছু সংখ্যক স্থানীয় লোকজন সংগ্রহ করিতে পারিলে নৌকাটি চড়া হইতে টানিয়া বাহির করা যাইত। কিন্তু সে আশা দুরাশা। এই নিশুতি রাতে, জনমানবহীন যমুনার তীরে কে আর তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিবে ?

ক্রমে রামদাসের দুশ্চিন্তা বাড়িয়া চলে। নৌকা এরূপে কাত হইয়া থাকিলে অবশ্যই ডুবিবে এবং তাঁহার সর্বস্ব বিলীন হইবে জলগর্ভে। তাছাড়া, না ডুবিলেও বিপদের আশংকা কিছু কম নয়। তীরস্থিত এই বিজন অরণ্যে দস্যুদের আনাগোনা আছে। কখন তাহারা হা-রে-রে করিয়া নৌকায় চড়াও হয়, মালপত্র, টাকাকড়ি লুট-পাট করিয়া নেয়, কে জানে ?

নিরুপায় হইয়া কেবলি ভাবিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়ে, অদূরস্থিত টিলায় এক মৃদু দীপশিখা। সঙ্গে সঙ্গে আশার আলো জ্বলিয়া উঠে রামদাসের অন্তরে। একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা যাক না কেন। হয়তো টিলার উপরে কোনো বসতি রহিয়াছে। ওখানকার কাহাকেও দিয়া কি আশপাশ হইতে লোকজন সংগ্রহ করা যায় না ?

সাঁতরাইয়া তখনি তীরে উঠিলেন, আলো লক্ষ্য করিয়া ত্রস্তপদে আরোহণ করিলেন টিলার শীর্ষদেশে।

সঙ্গে সঙ্গে নয়নপথে পতিত হইল এক পর্ণকুটির। ভিতরে প্রদীপের ক্ষীণ আলো মিটিমিটি জ্বলিতেছে, আর এক পাশে স্থাপিত রহিয়াছেন নয়নাভিরাম কৃষ্ণবিগ্রহ। সম্মুখে এক দেবপ্রতিম বৈষ্ণব সাধক ভজনরত। কি জানি কেন এই সাধককে দর্শন করা মাত্র রামদাসের অন্তরে জাগিয়া উঠিল সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতি ভক্তিভরে সন্তর্পণে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন।

উঠিয়া দাঁড়াইতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সাধক সনাতন আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন। রামদাস করজোড়ে নিবেদন করিলেন তাঁহার বিপদের কাহিনী। কাতর কণ্ঠে মিনতি করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি আজ বড় বিপন্ন, যমুনাগর্ভে আমার সর্বস্ব খোয়াতে বসেছি। ভাগ্যক্রমে এই বিজন স্থানে আপনার মতো মহাপুরুষের দর্শন পেলাম। আমার অন্তরাত্মা থেকে কে যেন কেবলি ডেকে বলছে, আপনার কৃপা ছাড়া আমার উদ্ধারের কোনো আশা নেই। অকপটে চরণতলে আশ্রয় নিলাম, আপনি আমায় বাঁচান।"

আর্তের কাতরোক্তিতে সনাতনের হৃদয় বিগলিত হইল। স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, তুমি এত অধীর হয়ো না, শান্ত হও, আমার মদনগোপালজী তোমায় কৃপা করবেন। এ বিপদ থেকে তুমি মুক্ত হবে। যাও নির্ভয়ে নেমে গিয়ে যমুনা তীরে অপেক্ষা করো।"

আশীর্বাদ ও অভয় লাভে রামদাসের হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। টিলা হইতে অবতরণের আগে কহিলেন, "মহারাজ, আমি সংকল্প করলাম, এ বিপদ থেকে উদ্ধার

পেলে আমার এবারকার বাণিজ্যের সবটা মুনাফা আপনার এই দেববিগ্রহের সেবায় আমি নিয়োজিত করবো।”

সনাতনের শুভেচ্ছায় সেই রাত্রেই রামদাস কাপুরকে বিপদমুক্ত হইতে দেখা যায়। হঠাৎ কোথা হইতে অলৌকিকভাবে যমুনাবক্ষে প্রবাহিত হয় নূতন স্রোতধারা। চড়ায় আবদ্ধ পণ্যবাহী বিপন্ন তরী আবার নিজপথে ভাসিয়া চলে।

বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া রামদাস কাপুর তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে চলিয়া আসেন, সনাতন গোস্বামীর নিকট হইতে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। তাছাড়া, সেবারকার বাণিজ্যের সবটা লভ্যাংশ মদনগোপালজীর সেবায় তিনি উৎসর্গ করেন। সেই বিপুল অর্থে নির্মিত হয় শ্রীবিগ্রহের জন্য সুরম্য মন্দির, জগমোহন ও নাটশালা। প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া ঠাকুরের সেবা ও ভোগ বিতরণের স্থায়ী ব্যবস্থাও এই সঙ্গে করা হয়।

সনাতনের সেবিত এই মদনগোপাল কিন্তু ক্রমে জনসাধারণের কাছে মদনমোহন নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন। উত্তরকালে নানা ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া এই লীলাময় শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন।

ইষ্টদেবের মন্দির নির্মাণ ও সেবাকার্যের চমৎকার বন্দোবস্ত এভাবে আপনা হইতেই হইয়া যায়। সনাতনের সকল দুশ্চিন্তা দূর হয়, প্রাণমন ভরিয়া উঠে অপার তৃপ্তিতে।

প্রেমপুরিত হৃদয়ে, গলদশ্রুনয়নে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ করিয়া কহিতে থাকেন, “ঠাকুর, আগে ছিলে চৌবে ভবনে, তারপর এলে কাঙাল ভক্ত সনাতনের ঝুপড়িতে। এবার তুমি এসে দাঁড়িয়েছো ব্রজমণ্ডলের তীর্থকামী ভক্তসমাজের নয়নসমক্ষে তীর্থরাজরূপে। জীবের কল্যাণের জন্য কৃপাভরে যে সেবালীলা এখানে তুমি প্রকট করছো, তা অব্যাহত থাকুক, এই মোর একান্ত প্রার্থনা। এবার এখান থেকে আমায় ছুটি দাও প্রভু।”

নবনির্মিত সুরম্য ঐ ইষ্ট মন্দিরে সনাতন কিন্তু একদিনও বাস করেন নাই। পূর্ববৎ বৃক্ষতল আর পর্ণকুটিরই হয় সর্বত্যাগী কৃচ্ছ্রব্রতী সাধকের একমাত্র আশ্রয়।

এখন হইতে কখনো গোবর্ধনের পাদমূলে, কখনো রাধাকুণ্ডের তীরে কখনো বা গোকুলের অরণ্য অঞ্চলে ঝুপড়ি বাঁধিয়া একান্ত নিষ্ঠায় তিনি ভজন করিতে থাকেন।

লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের যে নির্দেশ প্রভু শ্রীচৈতন্যের নিকট হইতে সনাতন পাইয়াছেন ক্ষণেকের তরেও তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই। এ সময়ে যখন যেখানে অবস্থান করিতেন তাহার চারিদিকে তীর্থ ও তীর্থবিগ্রহের আবিষ্কার চেষ্টা ছিল তাঁহার সাধনার অন্যতম অঙ্গ। প্রভুর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সনাতন ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি তীর্থকে পুনরুজ্জীবিত করেন, তারপর সেগুলিকে তুলিয়া ধরেন জন-চৈতন্যের সমক্ষে। এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নন্দগ্রামে নন্দ, যশোদা, বলভদ্র ও কৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তিনি ভক্তসমাজের ধন্যবাদভাজন হন।

লোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ পণ্ডিত আগে হইতেই শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ অনুযায়ী ব্রজমণ্ডলে সাধনভজন করিতেছেন। অতঃপর একে একে আসিয়া উপস্থিত হন রূপ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতি। প্রত্যেকেই ভক্তিসাধনার এক একটি দিক্‌পাল। ইঁহাদের অত্যুগ্র সাধনা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রভাব সারা উত্তর ভারতের অধ্যাত্মজীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আর এই

সাধকগোষ্ঠীর মধ্যমণিরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন অশেষ-শাস্ত্রবিদ্ ধীর-গম্ভীর আপ্তকাম মহাপুরুষ সনাতন গোস্বামী।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ ছিল, ভক্তিশাস্ত্র উদ্ধার করিতে হইবে এবং প্রবল উদ্যমে প্রচার করিতে হইবে নব নব বৈষ্ণবীয় দর্শন, স্মৃতি ও সাধনভজনের গ্রন্থ। এই সুস্পষ্ট নির্দেশ সনাতন কোনোদিন বিস্মৃত হন নাই। ভক্ত ও অনুগত বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ইঁহাদের সাহায্যে দিনের পর দিন তিনি সংগ্রহ করেন অজস্র প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থ। শুধু তাহাই নয়, নবতর রচনার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। নিজে কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ যেমন রচনা করেন তেমনি তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ও নেতৃত্বে লিখিত হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, স্মৃতি ও ভজন-পূজনের গ্রন্থ ও নানা ধরনের টীকা ভাষ্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শাস্ত্রভিত্তি নির্মাণে ও গৌরবময় ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে যে অবদান সনাতন গোস্বামী রাখিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা বিরল। এই মহান্ কর্মকে তিনি গণ্য করিয়াছিলেন প্রভু শ্রীচৈতন্যের আদিষ্ট ব্রতরূপে। বলাবাহুল্য এ ব্রত সাফল্যের সহিত তিনি উদ্‌যাপন করিয়া যান।

ত্যাগ তিতিক্ষা, বৈরাগ্যময় সাধনা কৃষ্ণপ্রেমের পরম অনুভূতির সহিত সনাতন গোস্বামীর জীবনে মিলিত হইয়াছিল অসাধারণ প্রতিভা, শাস্ত্রজ্ঞান ও শ্রমনিষ্ঠা। বহুতর নিজস্ব রচনা, সংকলন ও সম্পাদনার মধ্যে তাঁহার এই জীবন-বৈশিষ্ট্যের ছাপ পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

পণ্ডিতের শাস্ত্রচর্চা ও সাধকের প্রত্যক্ষীভূত সূক্ষ্মলোকের অনুভূতি—এই দুইটি পৃথক বস্তু। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে এই দুটির সমাবেশ ঘটে, তাহা হইয়া উঠে এক দুর্লভ সম্পদ। সনাতনের রচনা ও সম্পাদনায় এই বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাদির মধ্যে রহিয়াছে : লীলাস্তব, বৈষ্ণবীয় স্মৃতি, হরিভক্তি বিলাসের 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকা, বৃহৎ ভাগবতামৃত, ভাগবতামৃতের টীকা ও বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকা।

ইষ্ট-বিগ্রহের ভজন-পূজনের সময় আপ্তকাম সাধক সনাতনের শ্রীমুখ হইতে অজস্রধারে নির্গত হইত লীলামাহাত্ম্যের স্তব ও দৈন্যময় প্রার্থনা। ইহারই সংকলন হইতেছে 'লীলাস্তব'।

গোস্বামী গোপাল ভট্টকৃত 'হরিভক্তিবিলাস' এক মহামূল্যবান বৈষ্ণব-স্মৃতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কৃত্য ও আচারসমূহ ইহাতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গোপাল ভট্টের নামে এই গ্রন্থ প্রচারিত হইলেও ইহার সংকলনে সনাতনের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার প্রভাব ছিল দূরপ্রসারী। সনাতন নিজে এই বিরাট স্মৃতিগ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার এই টীকার উদ্দেশ্য, প্রামাণ্য শাস্ত্র বাক্যের উদ্ধৃতি ও যথোচিত যুক্তিতর্ক প্রয়োগের দ্বারা জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান করা। 'হরিভক্তি বিলাস'-এর গ্রন্থকাররূপে বয়ঃকনিষ্ঠ গোপাল ভট্টকে আগাইয়া দিয়া দিক্‌পাল শাস্ত্রবিদ্ সনাতন যে ভাবে বিরাট বনস্পতির মতো ছায়া বিস্তার করিয়াছেন, নানা সিদ্ধান্তময়, বিতর্কবহুল, ঐ স্মৃতিগ্রন্থের পৃষ্ঠরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মতো প্রবীণ সাধক ও মনীষীরই উপযুক্ত।

বৃহৎ-ভাগবতামৃত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সনাতন ভক্তিশাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়াছেন।

একদিকে বৈষ্ণবধর্মের মর্মকথা যেমন ইহাতে উদ্ঘাটিত হইযাছে, অপরদিকে তেমনি বিস্তারিত হইযাছে বিভিন্ন অবতারের তত্ত্ব ও প্রেমভক্তি-ধর্মের সাধনপ্রণালী। বৈষ্ণব সাধকদের কাছে এই গ্রন্থ অমৃতের খনি বিশেষ। এ গ্রন্থের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সহজতর করার উদ্দেশ্যে সনাতন একটি বিস্তৃত টীকা প্রণযন করেন, তাহা 'দিগ্দর্শিনী' নামে পরিচিত।

সনাতনের শাস্ত্রসাধনার চরম অবদান—বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী নামক ভাগবতের টীকা। বেদান্তের নিগূঢ় পরমতত্ত্ব ও ভগবৎ ভক্তির অমৃতময ব্যাখ্যার মিলন ঘটিযাছে মহামুনি বেদব্যাস রচিত শ্রীমদ্ভাগবতে। বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক ও টীকা-ভাষ্য-কারেরা প্রধানত প্রেমভক্তিশাস্ত্রের এই অমৃতনির্ঝর হইতেই পরম পথের পাথেয সংগ্রহ করিযাছেন, যাঁর যাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও সাধনার ধারা উন্মুক্ত করিযা নিযাছেন। গৌড়ীয বৈষ্ণবসমাজের পক্ষ হইতে প্রবীণ সাধক সনাতন এই মহান্ আকরগ্রন্থের দশম স্কন্দ বা কৃষ্ণ জন্মখণ্ডের এক বিস্তীর্ণ টীকা প্রণযন করেন। পাণ্ডিত্য ও রসমাধুর্যের দিক দিযা সনাতনের বৈষ্ণবতোষণী ভক্তিশাস্ত্রের জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিযা আছে। বিশিষ্ট গবেষকদের মতে, সনাতনের 'বৈষ্ণবতোষণী' যে ভাবে ভাগবতের দুরূহ স্থলের ব্যাখ্যায আলোকপাত করিযাছে, অনেক প্রাচীন টীকাযও তাহা পাওযা যায না।

বৈষ্ণবতোষণী টীকা রচনা করার কালে সনাতন ছিলেন অতিশয বৃদ্ধ, প্রায চলৎ-শক্তিহীন। এসমযে বযঃকনিষ্ঠ ও অনুগত গোস্বামীদ্বয রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস সর্বদা তাঁহার সেবক ও সহকারীরূপে সঙ্গে থাকিযা এই গ্রন্থ প্রণযনে নানাভাবে সাহায্য করেন। বৈষ্ণবতোষণীই সনাতন গোস্বামীর শেষ রচনা, যে বৎসর এই মহাগ্রন্থ সমাপ্ত হয, সেই বৎসরই তাঁহার জীবনদীপ হয নির্বাপিত। সনাতনের দেহান্তের প্রায পঁচিশ বৎসর পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, শিষ্যপ্রতিম শ্রীজীব গোস্বামী, সুবিস্তৃত বৈষ্ণব-তোষণীর এক সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার নাম দেওযা হয 'লঘুতোষণী'।

অনুজ রূপ গোস্বামীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উপরও সনাতন গোস্বামীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। গোপাল ভট্টের হরিভক্তিবিলাস-এর মতো রূপের এই গ্রন্থখানির পশ্চাতেও রহিযাছে সনাতনের অধ্যাত্ম-প্রেরণা, ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য ও পরম-তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। ভক্তিসাধনার নিগূঢ় ভাবরসের মাধুর্য প্রভৃতি যাহা কিছুই ইহাতে প্রকটিত হইযাছে, অনেকাংশে তাহা সনাতনেরই প্রতিভা ও সাধনানুভূতির স্বাক্ষর বহন করে।

সমকালীন ব্রজমণ্ডলে গৌড়ীয সাধক ও শাস্ত্রবিদদের মধ্যে সনাতন ছিলেন বযঃ-জ্যেষ্ঠ। তাছাড়া কৃচ্ছ্রব্রত, সাধনা, পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার দিক দিযাও তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। তাই দেখা যায, এই মহাপুরুষের সুদীর্ঘ জীবনকালে সারা ব্রজ-মণ্ডল তাঁহার ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও সিদ্ধির কাছে মস্তক অবনত করিযা রাখিযাছে। ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে যিনিই যে গ্রন্থ এ সমযে লিখিতেন, যে সিদ্ধান্ত ও মতবাদ স্থাপন করিতেন, সনাতনের সম্মতি ও সমর্থন ছাড়া তাহা ভক্তসমাজে গৃহীত হইতে পারিত না।

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে অপ্রকট হন ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই দুঃসংবাদ শোনার পর

হইতেই সনাতনের বহিরঙ্গ জীবনে ছেদ পড়িতে দেখা যায়। কর্মজীবন হইতে নিজেকে প্রায় গুটাইয়া নিয়া ইষ্ট বিগ্রহের নিরন্তর ধ্যান ও ভজনে তিনি তন্ময় হইয়া যান। তারপর ধীরে ধীরে মহাসাধক প্রবিষ্ট হন ভক্তি সাধনার গভীরতম স্তরে।

সনাতনের ত্যাগ, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য ও প্রেমভক্তি সাধনার ঐশ্বর্যের কথা ইতিমধ্যে শুধু ব্রজমণ্ডলেই নয়, সারা উত্তর ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। দূর দূরান্ত হইতে ভক্ত-সাধকেরা দলে দলে আসিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য ভিড় জমায়। কুঞ্জকুটির আলো-করা এই দেবমানবের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া সকলে হয় কৃতকৃতার্থ।

সনাতনের এ সময়কার সাধনৈশ্বর্য সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। সে-বার বারাণসী হইতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হন্তদন্ত হইয়া সনাতনের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত। বর্ধমান জেলার মানকরে তাঁহার বাড়ি, নাম জীবনঠাকুর। সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ বলিয়া লোকে তাঁহাকে জানে, চির জীবন কাটাইয়া আসিয়াছেন দারিদ্র্যের সহিত নিরন্তর যুঝিয়া। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে আর যেন দমে কুলাইতেছে না। সেদিন আর্তভাবে বিশ্বনাথের চরণে বার বার প্রার্থনা জানাইলেন, "বাবা, দারিদ্র্যের এ জ্বালা আর যে সহ্য হচ্ছে না, এবার কৃপা ক'রে আমায় রক্ষা করো, অর্থ প্রাপ্তির কোনো সন্ধান বলে দাও।"

নিশারোগে প্রত্যাদেশ মিলিল —"ওরে, তুই শিগ্‌গীর ব্রজমণ্ডলে চলে যা। সেখানে গিয়ে সনাতন গোস্বামীর শরণ নে। মহার্ঘ বস্তু পড়ে রয়েছে তার সন্ধানে। তার করুণা হলে তোর সর্ব দারিদ্র্য-দুঃখ চিরতরে দূর হবে।"

কালবিলম্ব না করিয়া জীবনঠাকুর ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হন। সনাতন গোস্বামীর পদতলে পড়িয়া সবিস্তারে নিবেদন করেন স্বপ্নাদেশের কথা।

এ কাহিনী শুনিয়া গোস্বামী প্রভু তো মহা বিস্মিত। নিজে তিনি কাঙাল বৈষ্ণব, রিক্ত সন্ন্যাসী। ব্রাহ্মণের এই দুঃখ দারিদ্র্য তিনি কি করিয়া ঘুচাইবেন? আজকাল ভজন-পূজন সারিবার পর যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহা অতিবাহিত হয় ইষ্টদেবের ধ্যান জপে। বাহিরের কাহারো সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না। এ ব্রাহ্মণের সাহায্যের জন্য কাহাকে ধরিবেন, কাহার কাছে উপস্থিত হইবেন, ভাবিয়া পান না।

সহসা তাঁহার স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠে পুরাতন একটি ঘটনার কথা। তাই তো! দারিদ্র্যক্লিষ্ট এই মানুষটির সাহায্য তো তিনি করিতে পারেন। সে অনেক দিন আগের কথা। যমুনার বালুকা-তট ধরিয়া সনাতন আপন মনে ভজন করিতে করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ পায়ে ঠেকিল এক দুর্লভ রত্ন। মৃত্তিকা হইতে তখনি তাড়াতাড়ি উহা তুলিয়া নিলেন। পরক্ষণেই মনে খেলিয়া গেল চিন্তার ঝলক। সর্বত্যাগী কৃচ্ছ্র-ব্রতী সন্ন্যাসী তিনি, এ রত্ন দিয়া তাঁহার কোন্ কাজ? বরং যত শীঘ্র এটিকে যমুনায় বিসর্জন দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। আবার ভাবিলেন, শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা তাহা কে জানে? হয়তো এই রত্ন দিয়া কোনো দুঃখী বা বিপন্ন মানুষের প্রাণ বাঁচিতে পারে। জলে ফেলিয়া না দিয়া তটের বস্তু তটে রাখিয়া দেওয়াই সমীচীন। সামনেই একটি চিহ্নিত স্থানে রত্নটি প্রোথিত করিয়া সনাতন আপন কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন।

এতকাল সেই রত্নের কথা তাঁহার স্মরণে ছিল না। এবার মহা উৎফুল্ল হইয়া ভাবিলেন, ভালই হইল, এই অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণই তবে উহা গ্রহণ করুক।

যেস্থানে উহা প্রোথিত আছে তাহার সন্ধান তখনি বলিয়া দিলেন, প্রসন্ন মধুর

কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, ঐ বস্ত্র তুমি এখনি তুলে নিয়ে যাও, দারিদ্র্যক্লেশ তোমার দূর হোক।" কথা কয়টি বলার পরই গোস্বামী প্রভু আবার মগ্ন হইলেন ইষ্টধ্যানে।

জীবনঠাকুর সোৎসাহে তখনি যমুনার তীরে ছুটিয়া যান। নির্দেশিত গোপন স্থান হইতে উদ্ধার করেন সেই দুর্লভ সম্পদ।

হস্তস্থিত বস্ত্রখণ্ড সূর্যকরে ঝলসিয়া উঠে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে হন হতবাক্। একি অদ্ভুত দৈবী লীলা প্রকটিত তাঁহার জীবনে? সাত রাজার ধন মানিক আজ যে তাঁর মতো চির কাঙালের মুঠোর মধ্যে। এই মহার্ঘ বস্তু বিক্রয় করা মাত্র মিলিবে অগণিত অর্থ, ঐশ্বর্যের তাঁহার সীমা থাকিবে না।

সনাতনের কৃপাতেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আজ এই বিপুল সম্পদের অধিকারী। তাই তাঁহার কথা মনে হইতেই কৃতজ্ঞতায় নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া আসে।

হঠাৎ জীবনঠাকুরের চেতনার দ্বারে এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে। সমগ্র সত্তায় জাগে আলোড়ন। সবিস্ময়ে ভাবিতে বসেন, ধন-সম্পদের লোভে পুণ্যধাম বারাণসী হইতে বৃন্দাবন অবধি তিনি পদব্রজে ছুটিয়া আসিয়াছেন, আর সনাতনের কৃপার ফলে করায়ত্ত হইয়াছে রাজভোগ্য বস্ত্র। অথচ সেই সনাতন গোস্বামীর বিন্দুমাত্র হুঁশ নাই এই মহার্ঘ বস্তুটির দিকে। এতকাল এটির কথা বিস্মৃতই ছিলেন, যদিই বা আর্তের কাতর ক্রন্দনে সে কথা মনে পড়িয়াছে, তাহার সন্ধানটি বলিয়া দিয়াই আবার ডুবিয়া গেলেন ধ্যান ভজনে। কোন্ অমৃত ভুঞ্জনের ফলে গোস্বামী এমন বিভোর হইয়া আছেন? কোন্ পরম ধনের অধিকারী তিনি যাহা এমন রাজবাঞ্ছিত বস্ত্রকে তুচ্ছ জ্ঞান করায়? অতুল বিত্তবৈভব, রাজসম্মান ত্যাগ করিয়া আসিয়া সনাতন ভজনানন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া আছেন, রূপান্তরিত হইয়াছেন দেবমানবরূপে। আর জীবনঠাকুর দৈবীকৃপায় সেই দেবমানবেরই সান্নিধ্য ও কৃপাপ্রসাদ পাইয়া তুচ্ছ বস্ত্রের মোহে হইয়াছেন আচ্ছন্ন, ঘৃণ্য বিষয়কীটের জীবন আঁকড়াইয়া ধরিতে চলিয়াছেন আরো দৃঢ়হস্তে।

পরম ধন লাভের তীব্র আকুতি জাগিয়া উঠে ব্রাহ্মণের অন্তরে, এক অভূতপূর্ব দিব্য চেতনায় হন উদ্বুদ্ধ। মুহূর্তমধ্যে সেই মহার্ঘ বস্ত্র লোষ্ট্রবৎ নিক্ষেপ করেন যমুনায়। তারপর ত্রস্ত পদে সনাতনের কুঞ্জে ফিরিয়া যান। দণ্ডবৎ করিয়া গলদশ্রু-লোচনে নিবেদন করেন, "প্রভু, আমি জীবাধম। তাই নিজের তুচ্ছ ঘর-সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে আছি। দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট হয়ে সদাই উদগ্র হয়ে আছি অর্থলাভের জন্য। আজ আপনার সান্নিধ্যে এসে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে। যে ধনে ধনী হয়ে মণিকেও আপনি মণি বলে গণ্য করছেন না, কৃপা ক'রে তারই কিছুটা আমায় দিন। অর্থের বদলে দিন পরমার্থ। আজ থেকে আপনার চরণেই নিজেকে উৎসর্গ করলাম।"

সনাতনের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর শুরু হয় জীবনঠাকুরের অধ্যাত্মজীবনের অভিযাত্রা। নূতন মানুষে তিনি রূপান্তরিত হন। উত্তরকালে তাঁহার বংশ খ্যাত হইয়া উঠে কাঠমাণ্ডুরার গোস্বামী পরিবার নামে।

জীবনের শেষ পর্যায়ে সনাতন নন্দীশ্বরের মানসগঙ্গা নামক পুণ্য সরোবরের তীরে আসিয়া সঙ্গোপনে অবস্থান করিতে থাকেন। উত্তরকালে এ স্থানটি বৈঠান বলিয়া খ্যাত হয়। নিকটেই চক্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই স্থানে এক বৃক্ষতলে বসিয়া

মহাসাধক ব্রতী হন তাঁহার চরম অধ্যাত্ম-সাধনায়। স্নানাহারের স্থির বেলা ঠিক নাই, একেবারে অজগর বৃত্তি। অন্তরে সদা চলিয়াছে কৃষ্ণভজন আর কৃষ্ণলীলার অনুধ্যান।

সনাতন এ সময়ে অতিবৃদ্ধ, বয়স সত্তর বৎসরের কাছাকাছি। কথিত আছে, এই বয়সে প্রাণপ্রিয় ভক্তের এই কৃচ্ছ্রসাধন দেখিয়া ইষ্টদেব নিজেই বালকভাবে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন। গোপ বালকের ছদ্মবেশে ভার গ্রহণ করেন তাঁহার দৈনন্দিন আহার্যের। 'ভক্তিরত্নাকর' এই বালকের লীলার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণ গোপবালকের ছলে দুগ্ধ লৈয়া।
দাঁড়াইলা গোস্বামী সম্মুখে, হর্ষ হৈয়া।
গোরক্ষক বেশ, মাথে উষ্ণীষ শোভয়।
দুগ্ধভাণ্ড হাতে করি গোস্বামীরে কয়।
আছহ নির্জনে, তোমা দেখি নাহি জনে।
দেখিনু তোমারে আসিয়া গোচারণে।
এই দুগ্ধ পান কর, আমার কথায়।
লইয়া যাইব ভাণ্ড, রাখিও এথায়।
কুটীর রচিলে, মো সভার সুখ হয়।
ঐছে কহি, চলিলা ব্রজবাসী সুখ পায়। (৫ম তরঙ্গ)

ক্রমে ভক্ত ভগবানের এই প্রেমলীলার কথা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া পড়ে। সনাতনের ভক্ত ও শুভার্থীরা ব্যাকুল হইয়া উঠেন কুটীর তুলিতে। ইহাদের অনুরোধ উপরোধে সনাতন কৃচ্ছ্রসাধন হ্রাস করিতে বাধ্য হন। সবাই মিলিয়া ঐ বৃন্দাবনে তাঁহার জন্য এক কুটীর বাঁধিয়া দেন। এ কুটীর ত্যাগ করিয়া সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে আর ফিরিয়া যান নাই, শেষের দিন কয়টি এখানেই অতিবাহিত করেন। রূপ, রঘুনাথ প্রভৃতি বৃন্দাবনের গোস্বামীরা, সারা ভারতের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও সর্বত্যাগী সাধকেরা, প্রায়ই আসিয়া উপস্থিত হইতেন সেখানে এই নিভৃত পর্ণকুটীরে। অতিবৃদ্ধ সাধক সনাতনকে স্পর্শ করিয়া তাঁহারা ধন্য হইতেন, তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া হইতেন উপকৃত।

গিরি-গোবর্ধনের পরিক্রমা ছিল সনাতনের জীবনের এক প্রধান ব্রত। এই পুণ্য-গিরি বৃন্দাবন হইতে বেশী দূর নয়। প্রথম প্রথম জরাজীর্ণ অশক্ত দেহ নিয়াও সনাতন পরিক্রমা সম্পন্ন করিতেন। পরে কিন্তু আর দৈহিক সাধ্য তেমন কুলাইয়া উঠিত না। তখন তাঁহার সারা মনপ্রাণ পড়িয়া থাকিত ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপূত ঐ গিরির প্রদক্ষিণ পথের দিকে। অনুশোচনা ও বেদনায় সদা তাঁহার অন্তর হইয়া উঠিত ভারাক্রান্ত।

ভক্ত হৃদয়ের আর্তি আবার সেদিন জাগিয়া তুলে ইষ্টদেবকে। বালকবেশে মধ্যাহ্নে গিরিধারীজী আবির্ভূত হন সনাতনের সমক্ষে। প্রসন্ন মধুর হাসিয়া কহেন, "সনাতন, তোমার অন্তরে দুঃখ জেগেছে, আর গোবর্ধন গিরির পরিক্রমা আর তুমি করতে পারছো না। সেই জন্যেই তো আমি ছুটে এলাম। এই নাও, আমার হাতে রয়েছে গোবর্ধনের শিলাখণ্ড। আর এতে অঙ্কিত রয়েছে আমার পদচিহ্ন। এই

চরণ-পাহাড়ী ভক্তিভরে তোমার কুটিরে স্থাপন করবে, আর ভজন শেষে রোজ করবে এটিকে প্রদক্ষিণ। তাতেই হবে তোমার গোবর্ধন পরিক্রমণের ব্রত উদ্‌যাপন। এতে এই জীর্ণ দেহে তোমার শ্রম লাঘব যেমন হবে, তেমনি আমারও বাড়বে আনন্দ।'[১]

এখন হইতে এই চরণ-পাহাড়ীকে কেন্দ্র করিয়াই সনাতনের ভজন ও তপস্যার ধারা বহিয়া চলে। অতঃপর ধীরে ধীরে সমাগত হয় ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ়ী পূর্ণিমার তিথি। সনাতন গোস্বামীর জীবনদ্বারে সেদিন ধ্বনিত হয় তাঁহার প্রাণাধিক নওল-কিশোরের পরম আহ্বান। চরণ-পাহাড়ীর পুণ্যময় বেদীতে দণ্ডায়মান হইয়া জ্যোতির্ময় মূর্তিতে ইষ্টদেব তাঁহার পরম ভক্তকে দর্শন দেন। মায়িক জগতের যবনিকা ভেদ করিয়া সনাতন গোস্বামী প্রবিষ্ট হন শাশ্বত লীলাধামে।

এই মহাপ্রয়াণের ফলে উত্তর ভারতের বৈষ্ণবীয় সাধনার, সারস্বত সাধনার, এক তুঙ্গ শিখর যেন সেদিন ধসিয়া পড়ে। সারা ব্রজমণ্ডলে নামিয়া আসে করুণ শোকের ছায়া। আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ তাহার প্রেমভক্তির মহান্ আলোকস্তম্ভটি হারাইয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে।

সহস্র সহস্র শোকার্ত ব্রজবাসীর সম্মুখে, প্রভু মদনমোহনজীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে সনাতন গোস্বামীর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়। অগণিত ভক্তের শ্রদ্ধার্ঘ্য আজিও নিবেদিত হয় সেই পবিত্র ভূমিতে।

---

১ অলৌকিকভাবে লব্ধ সনাতনের এই চরণ-পাহাড়ী একটি বটপত্রাকৃতি শিলাখণ্ড। গৌড়ীয় ভক্তেরা মনে করেন, ইহা পুণ্যগিরি গোবর্ধনের প্রতীক এবং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। সনাতন মর্ত্যলোক ত্যাগ করার পর শ্রীজীব গোস্বামী ঐ চরণ-পাহাড়ী নিজের ইষ্টবিগ্রহ রাধাদামোদরজীর মন্দিরে স্থাপন করেন ও পূজা অর্চনার ব্যবস্থা করেন। আজ অবধি এই পবিত্র শিলা সেখানেই রহিয়াছে।

সমর্থ রামদাস

ছোট ছেলে নারায়ণকে নিয়া রাণুবাঈ বড় বিপদে পড়িয়াছেন। গ্রামের স্কুলে তাহার লেখাপড়া সমাপ্তপ্রায়; এবার সে দাদা গঙ্গাধরের সঙ্গে থাকিয়া কাজকর্ম করিবে, ঘর-সংসার করিবে, ইহাই রাণুবাঈ চান। কিন্তু নারায়ণ এ কথায় কান পাতে না। সাধু-সন্তের খোঁজ পাইলেই তাঁহাদের পিছনে করে ঘোরাঘুরি, মাঝে মাঝে মঠে-মন্দিরে গিয়াও চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। আর গঙ্গাধরের কাছে বলিয়া বেড়ায়, ঘরে তাহার মন মোটেই টিকে না, সন্ন্যাস নিয়া হইবে সে দেশত্যাগী।

জননী সেদিন নারায়ণকে নিকটে ডাকিলেন। যা হোক একটা বুঝাপড়া আজ তাহার সঙ্গে করিতেই হইবে। আর দেরি করা সঙ্গত নয়। কোমল স্বরে কহিলেন, "বাবা নারায়ণ, এখন তুই বড় হয়েছিস, লেখাপড়াও কিছুটা শিখেছিস। তোর দাদা গঙ্গাধর তো সংসারের জন্যে খেটে খেটে সারা হ'ল, তোর কি উচিত নয় তাকে সাহায্য করা, তার সংসারের ভার লাঘব করা? আরও একটা জরুরী কথা। আমার বয়স হয়েছে, শরীর খারাপ হচ্ছে দিন দিন। বড় বউ পার্বতীর উপর অন্যায় রকমে সংসারের কত চাপ পড়েছে। তাকে সাহায্য করবার জন্য বাড়িতে আর একটি বউ আনা দরকার। তাই আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি, আসছে মাসেই তোর বিয়ে দেবো। ইতিমধ্যে ভালো ঘরের সুলক্ষণা একটি পাত্রীও আমি মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছি।"

"মা, তোমার দুটো ইচ্ছের কোনোটিই যে আমি পূরণ করতে পারছিনে। আমি বলি কি, আমার আশা বরং তুমি ছেড়েই দাও।" অবলীলায় উত্তর দেয় নারায়ণ।

"এসব কি তুই বাজে বকছিস? এ শুধু তোর দায়িত্ব এড়ানোর একটা ছুতো।"

"না, মা, সত্যি কথাই বলছি। গৃহস্থী আমায় দিয়ে কখনো হবে না। জানিনে, কেন এক অজানা রাজ্যের হাতছানি কেবলই আমায় ডাকছে। আর দ্যাখো মা, প্রায়ই আমি স্বপ্নে প্রভু রামজীকে দেখি, ভক্তবীর মারুতিকেও দেখি। শুধু তাই নয়, কি এক অদ্ভুত শূন্যতায় আমার হৃদয় ছটফট করে। আর ভেতর থেকে কে যেন বার বার অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে—ওরে সাবধান, সাবধান সংসারের জালে যেন জড়িয়ে পড়িসনে —সদ্‌গুরুর কাছে তুই ছুটে যা, মন্ত্র নে তাঁর কাছ থেকে, আর এই মন্ত্রের ভেলায় চড়ে পৌঁছে যা প্রভু রামচন্দ্রজীর চরণে।"

পুত্রকে হারানোর আশঙ্কায় জননীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। নিজেকে সামলাইয়া নিয়া রাণুবাঈ বলেন, "বেশ তো বাবা, মন্ত্র নিতে হয়, রামজীর ধ্যান-জপ করতে হয় —তা বাড়িতে বসেই তো ওসব করা যায়। এজন্য সংসার ছাড়া কেন, বল্‌তো?"

"না, মা। সন্ন্যাসীর মুক্ত জীবনই আমি নেবো। গ্রামে যখন সাধু-সন্ন্যাসীর জমায়েত আসে, আমি তাঁদের দেখে দেখে মুগ্ধ হই। কোনো পিছুটান নেই, সঞ্চয় নেই। নেই কোনো বন্ধন বা জটিলতা। একমনে ইষ্টধ্যান করার পরম সুযোগ রয়েছে তাঁদের। এই জীবনই আমার বড় ভালো লাগে।"

"বাবা নারায়ণ, শুধু নিজের ভালো লাগার পিছনেই চলতে নেই, বাপ মায়ের ভালো লাগার দিকেও যে চাইতে হয়। ভেবে দ্যাখ্, প্রভু রামজী তাঁর বাপ-মায়ের কি বাধ্যই না ছিলেন। তাঁদের তৃপ্তির জন্য কি-ই না করতে পারতেন তিনি। তুইও তোর অভাগিনী মায়ের দিকে একটু ফিরে তাকাস্, বাবা। সাত বছর আগে তোদের বাবা স্বর্গে গেছেন, দুটি নাবালক পুত্র আমার হাতে সঁপে দিয়ে। তোর তখন মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স। কত দুঃখে কষ্টে তোদের দু'ভাইকে আমি এতকাল মানুষ করেছি। তোর বাবার কথা মনে ক'রে, এই দুঃখিনী মায়ের মুখ চেয়ে, তুই ঘর-সংসারে থাক্, আমাদের দুঃখের ভার লাঘব কর, বাবা। আর জেনে রাখিস্, তুই যদি আমাদের দুঃখ না বুঝিস্, কথার অবাধ্য হোস্, তবে আমিও আমার নিজের পথ দেখবো। হবো আত্মঘাতিনী।" –সাশ্রুনয়নে কাতর কণ্ঠে একথা বলিতে বলিতে জননী নারায়ণের হাত দুটি চাপিয়া ধরিলেন।

মায়ের নয়নের অশ্রু, পিতার মৃত্যুর করুণ স্মৃতি, নারায়ণের সংকল্প টলাইয়া দেয়। মন তাহার কোমল হইয়া আসে। ছলছল নয়নে উত্তর দে, "মা, তুমি এমন ক'রে কাঁদাকাটি ক'রো না। বেশ তো তোমার ইচ্ছে অনুসারেই আমি কাজ করবো।"

"তা হলে, তোর বিয়ের সম্বন্ধ আমি পাকাপাকি ক'রে ফেলি, কি বলিস্? আসন্ গাঁও-এ এক সৎ গৃহস্থ রয়েছেন, নাম তাঁর ভানুজিপন্থ চোরাল্পুরকর। তাঁর একটি মেয়ে আছে, যেমন সুন্দরী, সুলক্ষণা, তেমনি স্বভাবটিও সুন্দর। প্রস্তাব নিয়ে তারা ঘোরাফেরা করছে অনেকদিন ধরে। আমরা সম্মতি দিলেই হয়।" জননী রাণুবাঈ এবার স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিনই কন্যাপক্ষের সহিত কথা পাকা করার জন্য লোক পাঠান, দিনক্ষণওধার্য করা হয়।

বিবাহের রাত। বরযাত্রীরা সাড়ম্বরে কনের বাড়িতে উপস্থিত হইয়াছেন। বরকর্তা গঙ্গাধর মহা উৎসাহে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছেন। আত্মীয়-কুটুম্বদের হাসি গান আনন্দ-কলরবে কান পাতা দায়। বাদ্যভাণ্ড, মশালের আলো আর আতস-বাজীতে আকাশ বাতাস সরগরম।

অল্পকাল মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হইয়া যায়। সুসজ্জিত কনেকে নিয়া আসা হয় বিবাহ-সভায়। বরকনের মাঝখানে আড়াল রচনা করিয়া আছে শুধু একটি পর্দা, এখনি সেটি উত্তোলন করা হইবে, চার চোখের হইবে শুভ মিলন।

এমন সময় জ্বলন্ত মশালধারীদের সতর্ক করিতে গিয়া কে যেন গম্ভীর আওয়াজে বলিয়া উঠে সাবধান। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো হঠাৎ শিহরিয়া উঠে বরবেশী নারায়ণ। চিন্তার ঝলক্ খেলিয়া যায় তাহার অন্তরে। সাবধান? সে কি। এ কথাটি যে তাহার পূর্বেকার শোনা, অন্তর্লোক হইতে উদ্গত এই বাণী আরো কয়েকবার যে তাহার নিকট পৌঁছিয়াছে। আজো এই বাণী তাহারই উদ্দেশেই উচ্চারিত। ভ্রান্তিবশে সংসারের জালে আজ সে জড়াইতে যাইতেছে। আর তো কোনো দিনই এই জাল ছিন্ন করিয়া সে বাহির হইতে পারিবে না। নাঃ, এই মুহূর্তেই ইহার একটা প্রতিবিধান সে করিবে। বিবাহের শৃঙ্খল এড়াইয়া এখনি এই মুহূর্তে এখান হইতে করিবে পলায়ন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিতে দেরি হয় না। তৎক্ষণাৎ বরের টোপর ও উত্তরীয়

নারায়ণ ভূতলে নিক্ষেপ করে, 'জয় রামজী' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি দেয়, বিবাহের অঙ্গন হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে। তারপর বাড়ির পিছনের রাস্তা দিয়া ধাবিত হয় নিকটস্থ জঙ্গলের দিকে।

বিবাহ-সভায় উপস্থিত লোকজন এ কাণ্ড দেখিয়া হতবাক্ হইয়া যায়। ক্ষণপরেই তাহাদের চমক ভাঙে—'ধর্-ধর্' শব্দে সবাই করিতে থাকে পলাতক বরের পশ্চাদ্‌ধাবন।

চারিদিকে অন্ধকার, রাস্তাঘাট কিছুই দেখা যায় না, ইতিমধ্যে সবার অলক্ষ্যে নারায়ণ কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে। অবশেষে উৎসাহী অনুসরণকারীরা নিবৃত্ত হয়, হতাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। আলো হাসি গানে ভরা বিবাহ-বাড়িতে নামিয়া আসে নৈরাশ্যের অন্ধকার। ভগ্নদূতের মতো গঙ্গাধর গৃহে ফিরিয়া আসেন, জননীর কাছে বর্ণনা করেন এই দুর্দৈবের কথা। মর্মভেদী কান্নায় জননী ভাঙিয়া পড়েন। পুত্র নারায়ণ প্রায়ই যে তাঁহার কাছে প্রকাশ করিত গৃহত্যাগের সংকল্প। জননী বুঝিলেন, বিবাহ-বাসর হইতে পলায়ন করিয়া সেই সংকল্পই আজ সে সিদ্ধ করিতে চলিয়াছে। সংসারে সে আর কোনোদিন ফিরিয়া আসিবে না।

এদিকে বিবাহ-বাসর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নারায়ণ উর্দ্ধশ্বাসে চলিয়াছে। গ্রামের চেনা রাস্তা তাহার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়, অনুসরণকারীরা যে কোনো সময়ে ধরিয়া ফেলিতে পারে, তাই অন্ধকার বনপথ দিয়াই সে অগ্রসর হইতেছে। দুই পা ক্ষত-বিক্ষত, গাছের গুঁড়ির আঘাতে মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। উন্মাদের মতো কেবলি সে ছুটিয়া চলিয়াছে।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর তাহার মনে হইল, এবার সে অনেকটা নিরাপদ। শরীর তাহার বড়ই শ্রান্ত, ক্ষত ও আঘাতের বেদনায় কাতর। এবার কিছুটা বিশ্রাম না নিলে আর চলে না। কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে, দুর্গম বনের মধ্যে আশ্রয় কোথায়?

সম্মুখে দণ্ডায়মান এক বিশাল বটবৃক্ষ। নারায়ণ স্থির করিল, এই বৃক্ষশাখে উঠিয়া এই রাতটা কাটাইয়া দিবে। শয়নের অসুবিধা হইলেও এ ব্যবস্থায় অন্তত হিংস্রজন্তুর আক্রমণের ভয় নাই। বৃক্ষের প্রশস্ত শাখায় অবসন্ন দেহটি এলানোর সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রায় সে অভিভূত হইয়া পড়ে।

পরদিন আবার শুরু হয় পথ চলা। বনের প্রান্তদেশে গিয়া এক ব্রাহ্মণের কুটিরে নারায়ণ আশ্রয় পায়। সেখানে স্নানাহার-সম্পন্ন করার পর শরীর অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠে।

ভাগ্যক্রমে ঘটে একদল তীর্থ যাত্রীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ। দলটি যাইতেছে পঞ্চবটী দর্শনে। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যময় লীলাভূমি এই স্থান। নারায়ণের মনপ্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে, তীর্থচারীদের দলে তখনই সে ভিড়িয়া পড়ে। তারপর এগারো দিনের পদযাত্রা শেষে উপনীত হয় পঞ্চবটীতে।

এই পরম পবিত্রতীর্থে অবস্থানের সময়ই নারায়ণের জীবনে হয় নব অরুণোদয়, গুরুকৃপা ও অনন্য সাধনার বলে সে পরিণত হয় প্রভু-রামচন্দ্রের কৃপাধন্য এক মহান্ সাধকে। তাঁহার নব নামকরণ হয় রামদাস। শাস্ত্রবিদ্, যোগবিভূতিসম্পন্ন

মহাপুরুষ, সমর্থ রামদাস শুধু এক সিদ্ধ রামাইৎ সাধুই নন, মহারাষ্ট্রের উজ্জীবনে ও দক্ষিণ ভারতে রামভক্তির প্রচারকর্মে তাঁহার অবদান অসামান্য। ছত্রপতি শিবাজীর নব মহারাষ্ট্র নির্মাণের, ধর্মরাজ্য স্থাপনের, প্রেরণা ও পরিকল্পনাও উদ্ভূত হইয়াছিল এই মহাত্মারই সিদ্ধজীবন হইতে। বৈরাগীর উত্তরীয়কে রাষ্ট্রের পতাকারূপে চিহ্নিত করিয়া দিয়া রামদাস ভারতের জনজীবনের পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন ত্যাগ-বৈরাগ্য ও অধ্যাত্মশক্তির কালজয়ী মাহাত্ম্য।

হায়দ্রাবাদ নগরীর পনের মাইল দূরে জাম্‌বা নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। মহারাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এ স্থানটি রুক্ষ ও পিঙ্গল নয়, চারদিকে রহিয়াছে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র দিয়া ঘেরা। এই গ্রামে বাস করিতেন সূর্যজী পন্থ নামে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ। তাঁহার পত্নী রাণুবাঈ-ও পরিচিতা ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলারূপে।

পন্থজীর বয়স যৌবনের কোঠা পার হইতে চলিয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ কোনো সন্তানাদি হয় নাই। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মনে বড় অশান্তি। তাই ভগবৎ অনুগ্রহ লাভের জন্য নানা ধর্মানুষ্ঠান ও ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁহারা ব্রতী হন, দেববিগ্রহের সেবায় করেন আত্মনিয়োগ। অতঃপর কয়েক বৎসরের ব্যবধানে ইঁহাদের দুইটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। প্রথমটির নাম গঙ্গাধর, দ্বিতীয়টি নারায়ণ। এই নারায়ণই ভারতবিশ্রুত মহাসাধক—সমর্থ রামদাস।

দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে রাণুবাঈর অন্তর্জীবনে নানা ভাবান্তর দেখা যায়। রামদাসের অন্যতম জীবনীকার গিরিধর লিখিয়াছেন, এই সময়ে প্রায়ই রাণুবাঈয়ের দেহে দেখা দিত দিব্য ভাবের আবেশ। লোকের সঙ্গ এড়াইয়া তিনি নির্জনে আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

একদিন রাণুবাঈ স্বামীকে কহিলেন, "দ্যাখো, আজকাল প্রায়ই আমি বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে থাকি। আর সেই সব স্বপ্নদৃশ্যে আবির্ভূত হন প্রভু রামচন্দ্র, মা-জানকী, লক্ষ্মণ প্রভৃতি। কখনো বা সামনে দাঁড়িয়ে অপূর্ব কণ্ঠে স্তবগান করছেন রামদাস মারুতি। একই ধরনের এই দৃশ্য কেন বার বার দেখ্‌ছি, বলতো ?"

"ভালোই তো। এতে বোঝা যাচ্ছে, প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হয়েছে আমাদের ওপর। তোমার কোলে হয়তো আসছে রামজীরই কোনো চিহ্নিত সেবক। যাক, এসব কথা যেন কারুর কাছে প্রকাশ ক'রো না, আর খুব সাবধানে থেকো।'

অল্পকাল মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হয় সূর্যজী পন্থের বহু প্রত্যাশিত এই দ্বিতীয় তনয়—রামদাস। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের এই শুভ জন্মদিনটি, ১৫৩০ শকাব্দের চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীর এই পবিত্র তিথিটি, মহারাষ্ট্রের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে সংযোজন করিয়াছে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

পিতা সূর্যজী পন্থ ছিলেন একজন আচারনিষ্ঠ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ। রামদাসের যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন তিনি তাঁহার উপনয়ন সংস্কার করান। তারপর পুত্রকে প্রেরণ করেন গুরুগৃহে। বিস্ময়কর মেধা ও প্রতিভা বালকের। অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠশালার বিদ্যা সে আয়ত্ত করিয়া ফেলে।

স্বল্পবিত্ত হইলেও রামদাসের পরিবারে এতদিন সুখ শান্তির অভাব ছিল না। কিন্তু এবার একদিন তাহাদের উপর পতিত হয় দৈবের নিষ্করুণ আঘাত। নারায়ণ

রোগে ভুগিয়া সূর্যজী পন্থ হঠাৎ পরলোকে গমন করেন। দ্বিতীয় পুত্র রামদাসের বয়স তখন মাত্র সাত বৎসর।

এই দারুণ বিপদে রাণুবাঈ একেবারে ধৈর্যহারা হন নাই। কিছুদিনের জন্য শক্ত হাতে সংসারের দায়িত্ব ভার তিনি গ্রহণ করেন। তারপর বড় ছেলে গঙ্গাধর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রোজগার শুরু করিলে তাঁহাকে বিবাহ করান। ইহার কয়েক বৎসর পরে জননী রামদাসকে গৃহস্থীতে প্রবেশ করাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন। কিন্তু ভবিতব্য ছিল অন্যরূপ। পুত্রের সেদিনকার পলায়নের সংবাদ জননীর হৃদয়ে বিদ্ধ হয় শেলের মতো, দুঃসহ শোকের ভারে একেবারে তিনি মুহ্যমান হইয়া পড়েন।

বিবাহ-সভা হইতে নাটকীয় অন্তর্ধানের পর প্রায় একপক্ষকাল কাটিয়া গিয়াছে। পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া রামদাস এবার উপনীত হইয়াছেন গোদাবরী তীরে, নাসিকের নিকটে, পঞ্চবটীর মহাতীর্থে।

এখানে পেঁছানোর পর দীর্ঘ পথের শ্রম যেন মুহূর্তে দূর হইয়া গেল। স্বর্গীয় আনন্দের শিহরণ তখন রামদাসের সারা দেহে-মনে। পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলেন রামচন্দ্রজীর মন্দিরে। শ্রীবিগ্রহের দর্শন পাওয়া মাত্র নিমজ্জিত হইলেন দিব্য আনন্দের সাগরে।

পঞ্চবটীর আশেপাশে রামচন্দ্রজীর স্মৃতিপূত বহু স্থান রহিয়াছে। কয়েকমাস রামদাস মনের আনন্দে এই সব লীলাস্থল দেখিয়া বেড়ান। পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসীদের জমায়েত এখানে লাগিয়াই আছে। তরুণ রামদাস সোৎসাহে ইঁহাদের সঙ্গ করেন, সাধ্যমতো রত হন সাধুদের সেবায়। কোনো কোনো মহাত্মার কাছে ভজনের উপদেশ তিনি প্রাপ্ত হন, নিষ্ঠাভরে তাহাই অনুসরণ করিয়া চলেন।

যত দিন যায় রামদাসের মনের ব্যাকুলতা বাড়িতে থাকে। ভাবিতে থাকেন—পরমার্থের জন্য, রামচন্দ্রজীর জন্য, ঘর-সংসার তিনি ছাড়িয়াছেন, জননীর স্নেহ-মমতার বন্ধন করিয়াছেন ছিন্ন, কিন্তু সেই পরমবস্তু মিলিবার উপায় কই?

বালক বয়স হইতেই সাধু-সন্তদের কাছে শুনিয়া আসিয়াছেন, ইষ্টলাভের জন্য চাই অমোঘ দীক্ষামন্ত্র, চাই কঠোর সাধনা। তাই তাঁহার জীবনে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সদ্‌-গুরুর আবির্ভাব। কিন্তু তাহা তো এ যাবৎ সম্ভব হইল না। এ সংকটে কি করিবেন, কোথায় যাইবেন ভাবিয়া কোনো কূল-কিনারা পান না।

কিন্তু নিজের যাহা সাধ্য তাহা তো রামদাস করিতে পারেন। প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গোদাবরীর পবিত্র সলিলে তিনি স্নান করেন, তারপর অনন্যনিষ্ঠায় শুরু হয় ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের নামজপ ও কীর্তন। জপে নিবিষ্ট হইয়া কোনো কোনো দিন একেবারে বেহুঁশ হইয়া পড়েন, সেদিন আর মাধুকরীতে যাওয়া হয় না। উপবাসেই দিন রাত কাটিয়া যায়।

এই ব্যাকুলতা, কৃচ্ছ্র ও নামসাধনের ফল অচিরে ফলিল। সদ্‌গুরুর আবির্ভাব ঘটিল তাঁহার জীবনে।

পঞ্চবটীর নির্জন অরণ্যের একপ্রান্তে, বৃক্ষমূলে বসিয়া তরুণ সাধক সেদিন সারা রাত নিবিষ্ট মনে জপ করিয়া চলিয়াছেন। ক্রমে রাত্রির অন্ধকার তরল হইয়া আসে। বনানীর শিরে দেখা দেয় ঊষার অরুণ রাগ, প্রভাত পাখির কাকলী ছড়াইয়া পড়ে

আকাশে বাতাসে। দেব-দেউলের কাঁসর ঘণ্টা আর সাধু-সন্তজনের ভজনের দূরাগত ঝঙ্কার অন্তরলোকে উৎসারিত করে দিব্য আনন্দের ধারা। এমনি সময়ে বৃক্ষমূলে আসিয়া দাঁড়ান এক বৈরাগী মহাপুরুষ। গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ ধ্বনিত হয়, "বৎস, চোখ মেলে চাও, তোমার আর্তি আর ভজন নিষ্ঠায় রামজী প্রসন্ন হয়েছেন। সেই আনন্দ সংবাদ দিতেই আজ এখানে আমার আগমন।"

চোখ মেলিতেই রামদাস দেখেন সমুন্নত দেহ, জটাজুটসমন্বিত এক মহাত্মা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। গলে বিলম্বিত একছড়া তুলসীর মালা। কোমরে এক-ফালি কৌপীন ছাড়া আর কোনো আচ্ছাদন নাই। বয়সে প্রাচীন হইলেও দেহের গৌরকান্তি এখনো অপরিম্লান। আয়ত নয়ন দুইটি দিব্য আনন্দের দ্যুতিতে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে।

দর্শন মাত্রেই রামদাসের সর্বসত্তায় উঠে প্রবল আলোড়ন। অন্তরাত্মা হইতে উত্থিত হয় আশ্বাস বাণী—'ওরে ভয় নেই, রামজীর কৃপাপ্রসাদ পেতে আর দেরি নেই, এই যে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন সদ্‌গুরু, ইষ্টদেবের চরণে ইনিই যে তোকে দেবেন পেঁছে।'

মোহাবিষ্টের মতো এগিয়ে যান তরুণ সাধক রামদাস। মহাত্মার চরণে লুটিয়ে পড়েন, সাশ্রুনয়নে আবেদন জানান, "কৃপা ক'রে যদি এসেছেনই, প্রভু, দিন আপনার পরমাশ্রয়। জীবন আমার কৃতার্থ হয়ে উঠুক।"

"হ্যাঁ, বৎস, তোমায় আমি মন্ত্র দেবো, সন্ন্যাস দেবো। আর দেরি ক'রো না। তাড়াতাড়ি গোদাবরীর পবিত্র নীরে তুমি স্নান সমাপন ক'রে এসো।"

দীক্ষা ও সন্ন্যাস সমাপ্ত হইয়া গেল।[১] গুরু তাঁর শিষ্যের নাম দিলেন রামদাস। কহিলেন, "বৎস, এখন থেকে শুধু নামেই রামদাস নও, কর্মেও সতত করবে শ্রীরামচন্দ্রজীর দাসত্ব। নিজের আদর্শরূপে রাখবে মহাবীর হনুমানজীকে, মারুতি মহারাজকে। মহাশক্তিধর ছিলেন মারুতি, আর নিজের সর্বশক্তি তিনি নিয়োজিত করেছিলেন অবতার পুরুষ রামজীর ধর্মসংস্থাপনের মহান্ কর্মে। কত দুষ্কৃতের বিনাশ করেছিলেন এই রামভক্ত, আর কত সাধুদের করেছিলেন রক্ষণ। বহিরঙ্গ জীবনে মারুতিজীর এই কর্মসাধনা তুমি অনুসরণ ক'রে চলবে। এই ভক্তবীরের অন্তর্লোকের সাধনতত্ত্বও তোমার অনুধাবন করা দরকার।"

"কৃপা ক'রে, এ তত্ত্বটি বিশদ ক'রে বলুন, মহারাজ।"

---

১ এই গুরুর নামধাম আজো অজ্ঞাত। রামদাসের চিঠিপত্র, রচনা ও সংলাপ অজস্র প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায়, সর্বত্রই তিনি গুরুর পরিচয় গোপন রাখিয়াছেন। হয়তো গুরুর নির্দেশেই তাঁহাকে এই গোপনীয়তা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, গুরুকরণ, গুরুদত্ত মন্ত্র ও গুরুশক্তিকে রামদাস অপরিহার্য মনে করিতেন।

গবেষকেরা মনে করেন, রামদাসের গুরু ছিলেন একজন বিশিষ্ট রামাইৎ সাধু, তিনি রামানুজী বা রামানন্দী সাধক ছিলেন না। সাধ্য সাধন সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব মত ও আদর্শ ছিল। অবতার রামচন্দ্রের তত্ত্ব এবং অদ্বৈত বেদান্ত, এই দুইয়ের সমন্বয় বাণী তিনি প্রচার করিতেন।

"মহাযোগী মাব্ুতিব অন্তর্লোকে বামজী দীপ্যমান ছিলেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহব্ুপে। শ্রীবামচন্দ্রেব এই অবতাবব্ুপ আব সচ্চিদানন্দব্ুপ দুই-ই বিভাসিত ছিল বামভক্ত মহাসমর্থ মাব্ুতিজীব সাধনজীবনে। এ কথাটি সব সময়ে স্মবণ বেখো, বৎস।"

গুব্ু মহাবাজ সেদিন বিদায় গ্রহণ কবিবেন। চবণতলে পতিত হইযা বামদাস ডুকবিযা কাঁদিযা উঠিলেন। সস্নেহে গুব্ু কহিলেন, "বৎস, অধীব হ'যো না, ধৈর্য ধবো। পবমার্থ লাভ কবতে হলে চাবটি কৃপা চাই। এ চাবটি হলো—গুব্ু কৃপা, আত্ম কৃপা, শাস্ত্র কৃপা ও ইণ্ট কৃপা। গুব্ু কৃপাব দ্বাব তোমাব সাধনজীবনেব সম্মুখে উন্মুক্ত হযেছে। এবাব তোমাব চাই আত্মকৃপা, অর্থাৎ নিজের অনুষ্ঠিত কঠোব তপস্যা, যাব ভেতব দিযে সর্ব অহমিকা ও দেহবোধ যাবে লুপ্ত হযে।"

একটু থামিযা আবাব কহিলেন, "আব চাই শাস্ত্র কৃপা। শাস্ত্রেব নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ ভেতব থেকে উদ্ভাসিত হবে তোমাব অন্তব সত্তায। তাবপব ইণ্ট কৃপাব অবতবণ হতে দেবি হবে না, বৎস। তোমায প্রাণভবে আমি আশীর্বাদ কবছি—অচিরে তুমি সিদ্ধকাম হও। আমাব অদর্শনে খেদ ক'বো না। প্রয়োজনমতো আবাব এই পুণ্য-ধামেই তুমি আমাব সাক্ষাৎ পাবে।"

গুব্ু পবদিনই পঞ্চবটী ত্যাগ কবেন, সাধক বামদাসও শুব্ু কবেন তাঁহাব মবণ-পণ তপস্যা। দৈন্য ও কৃচ্ছ্রসাধন হয তাঁহাব এই তপস্যাব বড অবলম্বন। ক্ষুধা তৃষ্ণাব বালাই নাই, আকাশবৃত্তি নিযা দিনাতিপাত কবেন। ঈশ্ববেব বিধানে যেদিন যেটুকু আহার্য উপস্থিত হয তাহা দিযাই কবেন ক্ষুৎপিপাসাব নিবৃত্তি।

মাথা গুঁজিবাব একটি ঝুপডি বা পর্ণকুটিবও তাঁহাব নাই। একমাত্র আশ্রয বৃক্ষতল। গুব্ুব মতো একফালি কৌপীন সম্বল কবিযা সেখানেই দিনবাত থাকেন, মাথাব উপব দিযা ঋতুব পব ঋতু গডাইযা যায। শীত-গ্রীষ্ম সম্বন্ধে যেমন বামদাসেব হুঁশ নাই, তেমনি নাই বর্ষাব ঝড জলেব নির্যাতনে বিন্দুমাত্র অসুবিধাব বোধ। নবীন সন্ন্যাসীব এই ত্যাগ তিতিক্ষা, একনিষ্ঠা ও দুশ্চব সাধনা দেখিযা পঞ্চবটীব ভজনশীল প্রবীণ সাধকেবাও বাব বাব সাধুবাদ কবিতে থাকেন।

অবশেষে বামদাসেব সাধনা সফল হইযা উঠে, ইণ্টদেব প্রভু শ্রীবামচন্দ্রেব জ্যোতির্ময মূর্তি উদ্ভাসিত হইযা উঠে তাঁহাব নযনসমক্ষে। দিব্য আনন্দেব বসতবঙ্গে সর্বসত্তা তাঁহাব প্লাবিত হয, বাহ্যজ্ঞান হাবাইযা দেহখানি ভূমিতলে লুটাইযা পডে।

সংবিৎ ফিবিযা আসিলে দেখিলেন, গুব্ু মহাবাজ তাঁহাব শিযবে উপবিষ্ট। চোখে মুখে তাঁহাব আনন্দেব আভা। স্নিগ্ধকণ্ঠে বামদাসকে তিনি কহিলেন, "বৎস, তুমি ভাগ্যবান্, ইণ্টদর্শন তোমাব হযেছে, তপস্যাব এক প্রধান ধাপ তুমি অতিক্রম কবেছো।"

তাডাতাডি ভূমিশয্যা ছাডিযা সাধক বামদাস উঠিযা বসিলেন। আনন্দাশ্রুধাবায স্নাত হইযা সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন গুব্ু মহাবাজেব চবণতলে।

পবেব দিন গুব্ুজী ভক্ত বামদাসকে নিকটে ডাকিযা কহিলেন, "বৎস, তোমাব

ইষ্টদর্শনেব প্রাক্কালেই আমি উপস্থিত হযেছিলাম। তোমাব সাফল্য দেখে আমি প্রসন্ন হবেছি।"

"প্রভু, এসবই আপনাব কৃপা। আপনাব প্রদত্ত মন্ত্র সাধনাই হচ্ছে আমাব বড় সম্বল।" নিবেদন কবে বামদাস।

"না বৎস, তোমাব সাধনাব ঐকান্তিকতা আব কৃচ্ছ্র, তোমাব দৈন্য আব আত্মাভিমানেব বিলুপ্তি আমায আনন্দ দিযেছে। সাধনা ও আত্মশুদ্ধিব বলে আত্মকৃপা তুমি পেযেছো, শাস্ত্রেব গূঢ় তত্ত্বসমূহ স্ফুবিত হযেছে তোমাব সাধনসত্তায। এবাব সেই অনুভূত তত্ত্বকে শাস্ত্র অধ্যযনেব মধ্য দিযা যাচাই ক'বে নাও। আবো একটা কাবণ আছে যে জন্য তোমায শাস্ত্রপাবঙ্গম হতে হবে।"

"বুঝিযে বলুন, মহাবাজ।"

"বামদাস, তুমি বামজীব দাস সর্বতোভাবে, অন্তবঙ্গ ও বহিবঙ্গ এই দুইদিক দিযে। আশীর্বাদ কবি, অচিবে তোমাব অন্তর্লোকে স্ফুবিত হোক প্রভু বামচন্দ্রেব অদ্বৈত ব্রহ্মস্ববূপ। আব বাইবে তুমি অবতাব শ্রীবামেব ধর্মবাজ্য সংস্থাপনে তৎপব হও।'

"বামবাজ্য তো ত্রেতাযুগেব প্রভু। এ যুগে তো তাঁব আসবাব কথা নব।" প্রশ্ন কবেন বামদাস।

"বৎস, শ্রীবামচন্দ্র হচ্ছেন পবম ঈশ্বব, পবব্রহ্ম। প্রতি যুগেই বযেছে তাঁব অধিকাব, বযেছে তাঁব বাজ্যস্থাপনেব কর্মসূচী। নামে কি আসে যায, বামদাস। বামবাজ্য, ধর্মবাজ্য, এ যুগেও প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।"

"এ বৃহৎ ঐশ কর্মে আমাব মতো ক্ষুদ্র মানুষকীটেব কি কববাব আছে, প্রভু?"

"ভুল কবলে বামদাস। তিনি মহাযোগী হনুমানজীকে যেমন নিযোজিত কবেছিলেন, তেমনি কি কাঠবেড়ালীব সাহায্যও নেন নি? তিনি আসছেন—তোমাব আমাব কাজ হচ্ছে, যে পথ দিযে তাঁব বথ আসবে সে পথকে কণ্টকমুক্ত কবা।"

"এক্ষেত্রে আমাব কি কববাব আছে?"

"শোনো বামদাস, বিধর্মীব অত্যাচাবে জাতি পঙ্গু হযে গিযেছে। ধর্মবুদ্ধি আজ বিলুপ্ত, নোংবা জঞ্জালে ভবা সর্বস্থান। পবম প্রভুব আসন পাতবাব মতো ঠাঁই কোথাও নেই। এ সংকটে তুমি তোমাব কাজ শুবু কবো। মহাবাষ্ট্র হোক তোমাব কর্মক্ষেত্র। ধর্মবোধ ও অধ্যাত্মশক্তিকে ভিত্তি ক'বে জাগিযে তোল এ দেশটাকে।"

"প্রভু, ভাবছি, আমাব মতো কাঙাল অসহায ব্যক্তি, কি ক'বে এ কাজে এগোবে।" দৈন্যেব সুবে বলেন বামদাস।

"বৎস, ভেবো না। আমি তোমায বব দিচ্ছি, অচিবে ঋদ্ধিসিদ্ধি হবে তোমাব কবতলগত। দেশেব শক্তিধব বাজা থেকে শুবু কবে সাধাবণ মানুষ সবাই দেবে তোমাব এ মহান্ কর্মে সহাযতা।"

"নির্দেশ দিন প্রভু, কিভাবে এ কাজে অগ্রসব হবো।"

"এ ঐশ কর্মেব দাযিত্ব ও গুবুত্ব অনেক, বামদাস। তাই এজন্য প্রস্তুতি দবকাব। এই প্রস্তুতি ঐশ কর্মেবই অঙ্গ ব্যতীত আব কিছু নয। এখানে পঞ্চবটীব ভিড়ে একাজ হযে উঠবে না। গোদাববীব অপব তীবে তাকেবুলীতে তুমি চলে যাও। সেখানে নির্জনে বাস কবো দশ বৎসব কাল। সমাপ্ত কবো তোমাব অবশিষ্ট সাধনা ও শাস্ত্র অনুশীলন। জনগণেব ভেতব তোমায কাজ কবতে হবে, সেখানে শুধু ভক্ত ও

প্রেমিক সাধক হলেই চলবে না, আচার্য হয়েই তোমায় বসতে হবে। এজন্য চাই অসামান্য শাস্ত্র ব্যুৎপত্তি। রামজীর কৃপায় ভক্তিশাস্ত্র ও অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ দুইয়েতেই থাকবে তোমার অনায়াস অধিকার। যাও বৎস, রামজীর উপর সকল ফলের আশা ছেড়ে দিয়ে, অনাসক্ত যোগীরূপে তুমি এখন থেকে বিরাজ করো।"

বার বার রামদাসকে উৎসাহিত করিয়া অন্তরের গভীর আশীর্বাদ জানাইয়া, গুরু মহারাজ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তাকের্লীতে রামদাস একাদিক্রমে অবস্থান করেন প্রায় বারো বৎসর। এই দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া একদিকে অগ্রসর হন গুরু প্রদর্শিত নিগূঢ় যোগসাধনার মার্গে—অপর দিকে আয়ত্তে আনিতে থাকেন জটিলতর শাস্ত্রতত্ত্ব।

পঞ্চবটীর দুই মাইল দূরেই তাকের্লী। তন্বী স্রোতস্বিনী নন্দিনী এই স্থানটি বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, অদূরে গিয়া পতিত হইয়াছে পুণ্যতোয়া গদাবরীতে। পিছনে রহিয়াছে একটি অনুচ্চ নির্জন পাহাড়। এখানকার নৈসর্গিক সুষমা আর শান্ত পবিত্র আবহাওয়া হইতে আধ্যাত্মিক প্রেরণা সহজে লাভ করা যায়। তাকের্লী পাহাড়ের এক প্রান্তে একটি পর্ণকুটিরে রামদাস অতিবাহিত করেন তাঁহার সাধনজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়।

অল্পকাল মধ্যে এই শাস্ত্রবিদ্ ভজনশীল সাধকের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। নবাগত ভক্ত ও গুণমুগ্ধদের সহায়তায় বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রামদাস সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। এই সব গ্রন্থের অনুশীলন ও বিচার বিশ্লেষণের পর তিনি ব্রতী হন তাঁহার নিজস্ব ভক্তিবাদের ভিত্তি গঠনে।

বারো বৎসরের শাস্ত্রচর্চা ও ভক্তিসাধনা রামদাসের জীবনে আনিয়া দেয় বিপুল আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তি। এবার গুরু নির্দেশিত ঐশ কর্মের উদ্‌যাপনের কথাও বার বার মনে পড়িতে থাকে। এই সময়ে একদিন ধ্যানসমাহিত থাকাকালে রামদাস আবার ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করেন। দিব্য করুণাধারায় হৃদয়কুম্ভটি কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে।

ইহার অব্যবহিত পরেই আবার ঘটে গুরু মহারাজের আবির্ভাব। স্নেহপূর্ণ স্বরে প্রিয় শিষ্যকে তিনি কহেন, "রামদাস, তোমার প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্তপ্রায়। আর যেটুকু বাকী আছে তাও এবার শেষ ক'রে ফেল। ঐশ কাজ শুরু করার আগে সারা দেশটাকে একবার ঘনিষ্ঠভাবে দেখে নাও। পদব্রজে বেরিয়ে পড়ো, প্রধান তীর্থগুলো দর্শন ক'রে এসো। এই সঙ্গে হৃদয়ে তোমার গ্রথিত হোক সারা ভারতের মর্মন্তুদ বাস্তব চিত্র।"

অতঃপর একদল সন্ন্যাসী সঙ্গীর সহিত রামদাস পরিব্রাজনে বাহির হন। উত্তরে হিমালয়-তীর্থ কেদারবদরী হইতে শুরু করিয়া দক্ষিণে রামেশ্বর ও সিংহল এবং পশ্চিমে দ্বারকা বৃন্দাবন হইতে শুরু করিয়া বারাণসী গয়া জগন্নাথধাম প্রভৃতি দর্শন করিয়া আবার পঞ্চবটীতে তিনি ফিরিয়া আসেন।

এবার শুরু হয় তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আচার্যের

ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রামাইৎ বৈষ্ণবধর্মের একটি নব সম্প্রদায় তিনি গড়িয়া তোলেন। রামদাসী সম্প্রদায় নামে তাহা খ্যাত হইয়া উঠে।

রামদাস ও তাঁহার ধর্মান্দোলনের প্রকৃত মূল্যায়ন করিতে হইলে তখনকার মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদ্‌পট জানিয়া নেওয়া দরকার। ইতিপূর্বে প্রায় তিনশত বৎসর কাল দাক্ষিণাত্য মুসলমান অধিকারে ছিল। চৌদ্দ শতক হইতে সতের শতক কাল অবধি দেখা যায়, আমেদনগর ও বিজাপুর এই দুইটি রাজ্য উত্তরাগত মুঘল শক্তির প্রতিরোধে ব্যস্ত। রামদাসের সময়ে দক্ষিণাঞ্চলে মুঘল শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল আমেদনগর, সম্রাট ঔরংজের ইতিমধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ নগরটি দখল করিয়া নিয়াছিলেন।

মুসলমান রাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও অত্যাচার মারাঠার জন-জীবনে আনয়ন করে ঘোরতর অশান্তি ও উপদ্রব। হিন্দুদের দেবদেউলের উপর বিধর্মীদের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না, সুযোগ পাইলেই দেববিগ্রহ তাহারা কলুষিত করিত, মঠ ও মন্দির করিত বিনষ্ট। ফলে হিন্দুদের মধ্যে দেখা দেয় হীনমন্য ও অসহায়ের মনোভাব। সামরিক সংঘর্ষ প্রায়ই ঘটিতে থাকে, ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পড়িয়া থাকে অনাবাদী অবস্থায়। দরিদ্র জনগণ ও চাষীরা পতিত হয় ঘোর সংকটে। সরকারী ও বেসরকারী স্তরে উৎকোচ ও অন্যান্য দুর্নীতি চলিতে থাকে অবাধে। সমাজজীবন তাই ধীরে ধীরে হইয়া উঠে পঙ্গু ও নৈরাশ্যবাদী।

সব ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে, মহারাষ্ট্রেও তাহার ব্যত্যয় দেখা যায় নাই। মারাঠার দূর দুর্গম স্থানগুলিতে মুঘলশক্তি তেমন দৃঢ় হইয়া বসিতে পারে নাই, এই সব স্থানে হিন্দু জাগৃতির চিহ্ন এবার দেখা যাইতে থাকে। এই নব জাগৃতির মুখপাত্র শিবাজী ভোঁসলে। অসাধারণ নেতৃত্বশক্তি, সংগঠনপ্রতিভা ও রণচাতুর্য ছিল এই তরুণ নেতার। এই সঙ্গে ছিল ধর্ম-ভিত্তিক হিন্দুরাজ্য গঠনের মহান্ পরিকল্পনা।[১] সিদ্ধপুরুষ রামদাসের অধ্যাত্ম-প্রেরণা শিবাজীকে যোগাইয়াছিল নূতনতর সঞ্জীবন-শক্তি ও উদ্দীপনা।

স্বামী রামদাসের সমকালীন মহারাষ্ট্রে পন্ধারপুর অঞ্চলের বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাবও বড় কম ছিল না। এই বৈষ্ণবেরা ছিলেন কৃষ্ণবিগ্রহ বিঠ্‌ঠলজীর ভক্ত। অভঙ্গ-পদ কীর্তন ও নাম প্রচারের মধ্য দিয়া মারাঠার জনজীবনকে অনেকাংশে ইঁহারা আত্মস্থ করেন, নূতনতর আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন।[২]

পন্ধারপুরের বৈষ্ণবদের প্রধান ছিলেন জ্ঞানেশ্বর। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দ তাঁহার অভ্যুদয় কাল। এই মহাপুরুষের লিখিত জ্ঞানেশ্বরীগীতায় যোগ ও ভক্তিবাদের সমন্বয়

---

১ রানাডে : রাইজ অব দ্য মারাঠা পাওয়ার—পৃঃ ২৭-৩৪

২ অনেকের ধারণা, মারাঠী বৈষ্ণব ও সাধক কবিরা মারাঠার জাতীয় অভ্যুদয়ে কোনো সাহায্য করেন নাই, তাঁহাদের দৈন্য ও ত্যাগ তিতিক্ষা বরং দেশবাসীকে হীনমন্য ও হীনবল করিয়াছে। কিন্তু রানাডে তাঁহার 'রাইজ অব্ দ্য মারাঠা পাওয়ার' গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন—এ ধারণা ভিত্তিহীন, ঐ সব বৈষ্ণব কবিরাই বরং মারাঠী জাগৃতির ভিত্তি গড়িয়া তোলে। স্যর যদুনাথ, কিনকেড, রেভারেন্ড এডওয়ার্ডস প্রভৃতি এক্ষেত্রে রানাডের মতবাদের সমর্থক।

দেখা যায়। নামদেব, তুকারাম প্রভৃতির উপর সাধক জ্ঞানেশ্বরের প্রভাব প্রচুর। জ্ঞানেশ্বরের পরে চতুর্দশ শতকে আবির্ভূত হন নামদেব। তাঁহার ভক্তিবাদের ধারা মারাঠা হইতে শুরু করিয়া পাঞ্জাব অবধি বিস্তারিত হয়।

সমর্থ রামদাস এবং ভক্ত তুকারাম প্রায় সমসাময়িক। ঐতিহাসিক তথ্যাদি হইতে দেখা যায়, কর্মক্ষেত্র ও বৈষ্ণবীয়তায় পার্থক্য থাকিলেও এই দুই মহাত্মা পরোক্ষ ভাবে উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিয়াছেন। মারাঠার উজ্জীবনকে করিয়াছিলেন ত্বরান্বিত।

বারো বৎসর ব্যাপিয়া সমগ্র ভারত পরিব্রাজনের পরে স্বামী রামদাস ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে ফিরিয়া আসেন। দেশের যে চিত্র এই পরিব্রাজনের মধ্য দিয়া তাঁহার নয়নসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয় তাহা মর্মান্তিক। এই ধর্মধৃত মহান্ দেশে ধর্মবোধ সেদিন অনেকাংশে স্তিমিত। বিধর্মীর প্রতাপের সম্মুখে দেশবাসী হারাইয়া বসিয়াছে তাহাদের আত্মবোধ, তাহাদের জাতীয় গৌরব। দেব-দেবীর মূর্তি নানা স্থানে হইতেছে কলুষিত। সমাজ হইতে নীতিবোধ প্রায় লোপ পাইয়াছে। দারিদ্র্যের নির্যাতনও মানুষের মনুষ্যত্বকে কম অবনমিত করে নাই। এই পরিস্থিতিতে সদ্‌গুরুর নির্দেশ রামদাসের মানসপটে জাগিয়া উঠিল। নিজ দেশকে লাঞ্ছিত পদদলিত মহারাষ্ট্রকে তিনি নির্বাচিত করিলেন তাঁহার কর্মকেন্দ্ররূপে। নূতনতর উজ্জীবন ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য হইলেন কৃতসংকল্প।

নানা স্থান পরিভ্রমণের পর সাতারা অঞ্চলকে রামদাস বাছিয়া নিলেন তাঁহার কাজের প্রধান ক্ষেত্ররূপে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কাছে শস্যশ্যামল নদী-উপত্যকার এক নয়নলোভন স্থান এই সাতারা। প্রাকৃতিক শোভায় ভরপুর—নদী, পাহাড় ও অরণ্যে ঘেরা এই অঞ্চলটিতে আসিয়া ভক্ত রামদাসের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। পাহাড়ের বুকে বসানো, নিভৃতি ও শান্তির নীড়, ছাফল গ্রাম। পাদদেশ দিয়া ক্ষীণকায়া এক তটিনী কুলুকুলুরবে বহিয়া চলিয়াছে। এই গ্রামটির একপ্রান্তে কিছুকালের জন্য স্থাপিত হইল স্বামী রামদাসের সাধন-আশ্রম।

আশ্রম তো করা গেল কিন্তু আশ্রমের বিগ্রহ কই? ইষ্টদেবের বিগ্রহ স্থাপন না করা অবধি রামদাসের মনে শান্তি নাই।

অল্পকাল মধ্যেই এ সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। সেদিন গভীর রাতে ধ্যানাসনে বসিয়া স্বামী রামদাস এক অপূর্ব নির্দেশ পাইলেন। ইষ্টদেব রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিতেছেন, "বৎস রামদাস, তোমার আশ্রমমন্দিরে প্রবেশের জন্য যে আমি বহুকাল ধরে উৎসুক হয়ে আছি। তোমার স্নানের ঘাটের একপাশে নদীগর্ভে প্রোথিত রয়েছে আমার বিগ্রহ। কাল প্রত্যূষে এটিকে নদী থেকে উদ্ধার ক'রো, স্থাপন ক'রো তোমার আশ্রমে।"

শ্রীরামজীর এই প্রস্তরবিগ্রহ পরদিনই নদী হইতে উঠাইয়া আনা হইল, স্বামী রামদাস পরম আনন্দে ইঁহার সেবা-পূজা শুরু করিলেন। কিছুদিন পর জাঁকজমক সহকারে মারুতিজীর একটি মূর্তিও এখানে স্থাপন করা হয়।

ছাফলের আশ্রমে রামদাস একাদিক্রমে বেশী দিন বাস করেন নাই। ইহার পর শিবথর নামক একটি অতি নিভৃত স্থানে তিনি উপনীত হন। লোকালয়-বর্জিত এই নির্জন অঞ্চলে প্রায় দশ বৎসর কাল অবস্থান করেন। বিশিষ্ট জীবনীকার ও শিষ্যদের

মতে, এই স্থানটিতেই সমাপ্ত হয় রামদাসের অধিকাংশ জনপ্রিয় ধর্মসংগীত ও তত্ত্ব-গ্রন্থের রচনা।

অতঃপর রামদাস আর নিভৃতি বা অবকাশ খুঁজিয়া বেড়ান নাই। বিপুল উদ্যম, কর্মশক্তি ও সৃজনীপ্রতিভা নিয়া ঝাঁপাইয়া পড়েন ধর্ম সংগঠনের কাজে, মারাঠার জন-জীবনে তোলেন অভূতপূর্ব আলোড়ন।

রামদাসের ব্যক্তিত্ব, আচার আচরণ ও ধর্মপ্রচার ছিল বড়ই আকর্ষণীয়। ভক্ত-শিষ্যগণসহ কৌপীনধারী এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আর ভজন কীর্তনে তাঁহার ধর্মসভা জমজমাট হইয়া উঠিত। রামদাস একাধারে যেমন ছিলেন ভাবুক ভক্তকবি ও কীর্তন গায়ক, তেমনি বেদ-বেদান্ত, পুরাণশাস্ত্র ও যোগমার্গে ছিল তাঁর অনায়াস অধিকার। বিশেষ করিয়া তাঁহার ভজন কীর্তন ও ধর্মরাজ্য স্থাপনের আশ্বাসবাণী শত-শত ভক্ত নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করিত নব প্রেরণায়।

গ্রামের উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন সকলেই পরম উৎসাহে ভিড় করিত রামদাসের ধর্মসভায়। তাঁহার উজ্জল ব্যক্তিত্বকে ঘিরিয়া নানাস্থানে গড়িয়া উঠিত সুসম্বন্ধ ভক্তগোষ্ঠী। শুধু ভাবাবেগের বন্যা উৎসারিত করিয়া, ভক্তদের হাসাইয়া কাঁদাইয়াই কিন্তু রামদাসের কর্তব্য শেষ হইত না, অসামান্য গঠনপ্রতিভা বলে অল্পকাল মধ্যে ভক্তদের নিয়া তিনি স্থাপন করিতেন এক একটি মঠ বা সাধনকেন্দ্র। ইষ্টদেব রামচন্দ্র আর মহাযোগী মারুতিজীর মূর্তির পূজা হইত সেখানে সাড়ম্বরে। এইভাবে এই মঠগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বহিয়া চলিত নব ভক্তিধর্মের স্রোতধারা।

গুরুজী রামদাসকে বর দিয়াছিলেন, ঋদ্ধিসিদ্ধি দুই-ই তাঁহার করায়ত্ত হইবে। এবার সে বর ফলিয়া উঠিতে থাকে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই রামদাসী রামাইৎ সম্প্রদায়কে মহারাষ্ট্রের নানা অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতে দেখা যায়। মঠ-মন্দিরও নির্মিত হয় অজস্র সংখ্যায়। সহস্র সহস্র মারাঠীর দৃষ্টিতে রামদাস গণ্য হন রামজীর শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে, মহাবীর মারুতিজীর অবতাররূপে।

রামদাসের জীবনসাধনায় ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম এই তিনটির সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। অবতার পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা ও অর্চনার কথা তিনি সারা জীবন ভরিয়া বলিয়া গিয়াছেন। আজো ষোড়শোপচারে এই ইষ্টদেবের পূজা তাঁহার সম্প্রদায়ে প্রচলিত। আবার প্রভু, রামজীকেই তিনি স্থাপন করিয়াছেন পরম ব্রহ্মরূপে। সে স্থলে দেখা যায়, অদ্বৈতবাদের তত্ত্বও তিনি নিষ্ঠাভবে বিশ্লেষণ করিতেছেন। রামরাজ্য অথবা ধর্মরাজ্য স্থাপনার যে মহান্ ব্রত তিনি গ্রহণ করেন তাহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে ঐশ কর্ম উদ্‌যাপনের আন্তরিক প্রয়াস। তাঁহার রচিত ভক্তিসংগীত ও ধর্মগ্রন্থগুলিও সেদিনকার জনজীবনে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রের পন্ধারপুরকে কেন্দ্র করিয়াও ভক্তি-সাধনার স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। জ্ঞানেশ্বর, একনাথ, নামদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণ ছিলেন এই ভক্তিধারার উৎস। মহারাষ্ট্রের প্রতি জনপদে ইঁহাদের প্রভাব বর্তমান ছিল, তাই রামদাসও এই প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার ভক্তির আন্দোলন ছিল পন্ধারপুর হইতে অনেকটা পৃথক। বিঠ্‌ঠলজী বা কৃষ্ণবিগ্রহ তাঁহার ইষ্ট নয়, তাঁহার

ইষ্ট হইতেছেন রামচন্দ্র। অবতাররূপী এই রামজীর পূজা ও তাঁহার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই নিরন্তর তিনি করিয়া গিয়াছেন, আর রামজীর মধ্য দিয়াই সাধনজীবনের শেষে পৌঁছিতে চাহিয়াছেন, সত্যম্‌-শিবম্‌-অদ্বৈতম্‌-এ—অদ্বৈত-ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে।

রামদাসের গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায়, বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বের উপর তাঁহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। মনে হয়, তাঁহার রামাইৎ গুরু ভক্তিবাদী হইয়াও অদ্বৈত-বেদান্তে পারঙ্গম ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাব শিষ্য রামদাসের উপর পতিত হয়। তখনকার দিনে শৃঙ্গেরী মঠে বহু সাধক অদ্বৈতবেদান্তী হইয়াও রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। এমনও হইতে পারে, ইঁহাদের কাহারো সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইবার পর রামদাসের মধ্যে রামভক্তি ও অদ্বৈতবাদের এই সমন্বয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাকেরলী ও ছাফলের নির্জন আবাসে থাকার কালে রামদাস দীর্ঘকাল গভীরভাবে বেদান্ত, জ্ঞানেশ্বরী-গীতা ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ অধ্যয়ন করেন। স্বভাবতই এই সব ধর্ম-গ্রন্থের জ্ঞানমার্গীয় তত্ত্ব তাঁহার অধ্যাত্মজীবনে দৃঢ়রূপে প্রবিষ্ট হয় এবং উত্তর জীবনে তাঁহার ভক্তিবাদ অদ্বৈতবোধের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

অধ্যাত্মজীবনের উপাদান রামদাস যেখান হইতেই আহরণ করুন, নিজ মতবাদ ও তত্ত্বাদর্শকে তিনি যে একটি বিশিষ্ট রূপ দিতে সক্ষম হন। প্রধানতঃ তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই যে এই রামভক্তিবাদের পরমতত্ত্ব বিকশিত হইয়া উঠে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

দার্শনিক ব্যাখ্যা অথবা তত্ত্ববাদ সম্পর্কে রামদাস যাহাই বলুন, ব্যবহারিক জীবনে জনসাধারণের আচার্য ও উপদেষ্টারূপে তিনি রামভক্তি ও রাম উপাসনার উপরই বেশী জোর দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের মঠ মন্দিরের ভক্তি সাধনা, পূজা অর্চনা ও নাম কীর্তনের প্রাধান্যই বেশী চোখে পড়ে। তাঁহার অজস্র ভক্তি-গাথায় রহিয়াছে ইষ্টের কৃপাভিক্ষা, শরণাগতি ও অনুশোচনার আকুতি। করুণাষ্টকের একটি পদে সাধক কবি রামদাস প্রভুর চরণে সখেদে নিবেদন করিতেছেন ·

হে রাম, নিতি নিতিই যে হৃদয় আমার
যাচ্ছে জ্বলে অনুতাপের দহনে।
ঘোর চঞ্চল আমার এই মন,
আমি পারছিনে তাকে বশে রাখতে।
হে প্রভু, হে করুণাময়,
ছিঁড়ে ফেলো আমার এই মায়ার বন্ধন,—
যা সৃজন করে মরীচিকার মোহ।
এসো, এসো, আমার হৃদয় কুটিরে,
তোমা-হারা জীবনে এসেছে অবসাদের শূন্যতা,
তোমার আরাধনা বিনা কেটেছে মোর দিন,
বন্ধুজন আর বিত্তবিভবের মাঝে
নিজেকে হারিয়েছি ঈর্ষা আর স্বার্থান্ধতার।
হে রঘুপতি, হে করুণাময়,
দাও আমায় তোমার মনের উদারতা,

যেন অক্লেশে বিলিয়ে দিতে পারি আমার সর্বস্ব—
একান্ত বিশ্বাসে নিতে পারি তোমার চরণে ঠাঁই।
ইন্দ্রিয়ের সেবায় কি ক'রে পাবো পরমানন্দ ?
হে রঘুনাথ, তোমা বিনা
আমি যে হয়েছি রিক্ত, হতভাগ্য।
হে প্রভু তাই আশিস্ মাগি চরণে—
জীবন যেন মোর হয় ব্রহ্মময়।[1]

অপর একটি সংবেদনময় প্রার্থনায় রামদাস তাঁহার শরণাগতি জানাইতেছেন :

হে প্রভু, কোটি কোটি জনম ধরে
হৃদয় আমার যাচ্ছে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে
তাইতো হে কৃপালু রাম চাইছি তোমায়
বন্যার বিপুল প্লাবনে ছড়িয়ে পড়ো আমার বুকে।
ছয়টা শত্রু ভেতর থেকে করছে প্রতিরোধ—
ভেঙে চুরে দাও ভাসিয়ে দাও তাদের।
হে রাম, তুমি বিনা কেই বা আছে আমার ?
কেই বা জানে আমার মর্মভেদী দুর্দশার কথা ?
হে রাঘব, শ্রান্ত ক্লান্ত আমি সাধনে সমরে
এসো, এসো প্রভু করো আমার পরিত্রাণ।

আবার প্রাপ্তির পরমানন্দে উচ্ছল হইয়া দাস রামদাসকে আর একটি অভঙ্ পদে বলিতে শুনি

হে দয়াল রঘুনাথ, হে আমার প্রভু,
কত পাপই যে করেছি এ জীবনে—
তার কোনটিই বা পায়নি তোমার ক্ষমা ?
গুণরাশি তোমার খচিত রয়েছে
অসীম আকাশের লক্ষ কোটি নক্ষত্রের মত—
তার কোনটি রাখা যায় স্মৃতিপটে ?
কি ক'রেই বা শুধবো তোমার অপার ঋণ ?
দীনের শরণ তুমি প্রভু, তুমি পরমাগতি—
আর এই পরিচয়ই যে তোমার আসল পরিচয়।
সুখ দিয়েছো তুমি, পরম সুখও চাই তোমার কাছে,
এই কাঙালের যা কিছু আছে চাওয়া আর পাওয়া
সবই যে তোমার জানা।
অন্তর যে আমার দিয়েছো দানে ভরে
হে প্রভু, হে রঘুনাথ, বলতো এ অভাগা—
কি দিবে শুধবে তোমার ঋণভার ?

রামদাসের প্রধান গ্রন্থ 'দাসবোধ' তাঁহার অনুগামীদের কাছে গীতার মতো নিত্য

১ উইলবার এস ডেমিং · রামদাস অ্যাণ্ড রামদাসীজ্।

পাঠ্য। এই গ্রন্থে ও অন্যান্য রচনায়[১] রামদাস ভক্তিমার্গের সাধককে শ্রবণ, স্মরণ, অর্চনা প্রভৃতি নব প্রকার অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। গুরুসেবা নামজপ ও নাম-কীর্তনের উপর রামদাসকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে দেখা যায়। তাঁহার মতে ভক্তি মুক্তির মূলে রহিয়াছে সদ্‌গুরুর কৃপা। সদ্‌গুরুই আপন শক্তিবলে শিষ্যের অধিকারকে পরিশুদ্ধ করেন, প্রস্তুত করেন তাঁহাকে ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য। তিনি বলেন গুরু সেবার মধ্য দিয়া শিষ্যের অহমিকা যেমন ক্ষীণ হইয়া আসে তেমনি নামিয়া আসে গুরুকৃপার অমিয়ধারা।

নামজপ ও কীর্তন সম্বন্ধে তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা শ্রীশ্লোক মনাচে-তে তিনি বলিয়াছেন :

হে মন, ভ্রান্ত বুদ্ধিবশে এই নামকে ক'রো না ত্যাগ,
শ্রদ্ধাভরে নিরন্তর করো এর অনুধ্যান।
যা কিছু দেখছো এই প্রপঞ্চে,
সবই রয়েছে বিধৃত, প্রভুর নামে বলে।
কোন কিছুরই হয় না তুলনা এর সাথে

আপন ইন্টনাম, রামনামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া ভক্ত সাধক রামদাস প্রেম-ভরে কহিতেছেন

ভজন ও জপের নাম তো রয়েছে অনেক,
কিন্তু ভাই, রামনামের তুল্য কোন্ নাম ?
হীন আর দুর্ভাগা যারা
কি ক'রে জানবে, তারা এই পরম বস্তুর মহিমা ?
বাসুকীর হলাহল পান ক'রে
পার্বতীনাথ শঙ্কর জপেছিলেন এই মহানাম,
হয়েছিলেন তিনি মৃত্যুঞ্জয়—
তবে ছার মনুষ্য কেন করবে না জপ
আমার প্রভুর এই অমৃতময় নাম ?

ভক্তি-মার্গীয় সাধনার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বহুতর মঠ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন রাম-দাস স্বামী। এইসব মঠকে তিনি পরিণত করেন তাঁহার ধর্মরাজ্যের এক একটি সুদৃঢ় ঘাঁটিরূপে। ভক্তিধর্ম প্রচার করিলেও রামদাস কিন্তু অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রশ্রয় কখনো দেন নাই। রামচরিত্রের সংযম, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতাকে সতত তিনি ভক্তদের নয়নসমক্ষে তুলিয়া ধরিতেন। মঠ ও মন্দিরের মোহান্ত বা পরিচালকদের করিতেন

---

১ সমর্থ রামদাস স্বামীর প্রধান রচনাগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইতেছে ;

(১) দাসবোধ—৭৭৫২ কবিতা সংবলিত এই গ্রন্থটিকে রামদাসী সম্প্রদায়ের ভক্তজনেরা সম্মান করিয়া বলেন 'গ্রন্থরাজ'। (২) শ্রীশ্লোক মনাচে—মনকে বশে রাখার উপদেশে এই পদগুলিতে নিহিত। সাধুরা ভিক্ষা করার সময় এগুলি গাহিয়া থাকেন। (৩) করুণাষ্টকে—অনুশোচনা ও প্রার্থনার ভরা এই সমস্ত শ্লোক সান্ধ্য ভজনের সময় গীত হয়। (৪) রামদাসের রামায়ণ (সুন্দরকান্ড, যুদ্ধকান্ড ও কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড)। (৫) শতক পঞ্চক ও ভূপালী নামক প্রার্থনামূলক অভঙ্গপদ।

কঠোবভাবে নিযন্ত্রণ। একবাব তাঁহাব এক মঠে মোহান্ত নীতিবিগর্হিত কোনো কাজ কবেন। বামদাস এজন্য তাঁহাব শাস্তিবিধান কবেন—বেত্রাঘাত। অপর একজন মঠাধীশ উপযুক্ত প্রস্তুতিব আগেই তাঁহাব এক অনুগত ভক্তকে মন্ত্র প্রদান কবেন। দীক্ষাব আগে কেন সতর্কতা অবলম্বন কবা হয় নাই, এই দোষে বামদাস মঠাধীশকে কঠোবভাবে প্রহাব কবেন। কযেকটি বিশিষ্ট কীর্তনিযা শিষ্যকে একবাব তিনি দুশ্চবিত্রা স্ত্রীলোকেব সঙ্গ কবিতে দেখিতে পান। কীর্তনসভা হইতে ইহাদেব তিনি তিন বৎসরেব জন্য বহিস্কৃত কবিয়া দেন। বামদাসেব মঠ-মন্দিবেব এই নীতিগত আদর্শবাদ ও নিযমশৃংখলা মাবাঠাব পুনর্গঠনে ও আত্মিক শক্তিব উজ্জীবনে কম সাহায্য কবে নাই।

আচার্য জীবনেব শুরু হইতেই বামদাসেব কাছে আশ্রয গ্রহণ কবেন একদল সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ গুরুগতপ্রাণ শিষ্য। ইঁহাদেব মধ্যে প্রথম সাবিতে বহিযাছেন—কল্যাণ, শ্রেষ্ঠ (বামদাসেব ভ্রাতা), উদ্ধব গোসাবি, দিবাকব, বেনাবাঈ, আকাবাঈ প্রভৃতি।

শিষ্য কল্যাণ শুধু ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাধনাব দ্বাবাই গুরুব অনুগ্রহ লাভ কবেন নাই, ডোমগাঁও মঠে বামদাসী সম্প্রদাযেব অন্যতম প্রধান মঠ স্থাপন কবিযা গুরুব আবব্ধ মহান্ কার্যকে তিনি অনেকাংশে সফল কবিযা তোলেন।

কল্যাণ ছিলেন বামদাসেব সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত পবিকব। তাঁহাব গুরুভক্তিব একটি আখ্যাযিকা মহাবাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। বামদাস মাঝে মাঝে নানা অভিনব উপাযে তাঁহাব শিষ্য ও ভক্তদেব ভক্তিব দৃঢ়তা ও আনুগত্যেব পবীক্ষা নিতেন।

একদিন শিষ্যদেব তিনি নিকটে ডাকিলেন। হাতে একটি তববাবি নিযা গম্ভীব স্ববে কহিলেন, "দ্যাখো, আজ থেকে কেউ আব আমাব ভোববেলাব ধ্যানজপেব পব যেন প্রণাম ক'বো না। যে কববে, আমি তাব মস্তক ছেদন কববো। বামদাস কোনো মানুষেব সঙ্গই যেন সহ্য কবিতে পাবিতেছেন না। সকলেই মহা শঙ্কিত। স্বামীজী মহাবাজকে তাঁহাবা যতটা পাবেন এডাইযা চলিতেছেন।

কযেকদিন পবে বামদাস আশ্রম ত্যাগ কবিলেন। পবনে মাত্র একখানি কৌপীন, হাতে একটি তীক্ষ্ম তববাবি। এই বেশে তিনি প্রবেশ কবিলেন নিকটস্থ গহন অবণ্যে। ইতিপূর্বে শিষ্যদেব শাসাইযা গিযাছেন, "সাবধান, কেউ যেন এই নির্জনবাসেব সময আমাব সামনে না যায, আব আমাব চবণ স্পর্শ না কবে।"

আশ্রমিকবা তো ভযে জডোসডো। কেহই তাঁহাব সঙ্গ নিতে সাহসী হইলেন না। চাবিদিকে সংবাদ বটিযা গেল, স্বামী বামদাস পাগল হইযা গিযাছেন। একথা অচিবে স্বামীজীব শিষ্য ডোমগাঁও-এব মোহান্ত কল্যাণেব কানে গেল। তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত-সমস্ত হইযা তিনি ছুটিযা আসিলেন আশ্রমে। কহিলেন, "এ কেমনতবো কথা? স্বামীজী মহাবাজ একলা অবণ্যে বাস কবছেন, আব তোমবা কেউ তাঁব সঙ্গে গেলে না? আমবা থাকতে তাঁব সেবাব ব্যবস্থা হবে না? বেশ, তোমবা না যাও আমি যাবো সেখানে।

"কিন্তু ভাই, খোলা তলোযাব নিযে স্বামীজী বনে বনে ঘুবে বেডাচ্ছেন, কেউ প্রণাম কবতে গেলেই নিশ্চয হবে তাব শিবচ্ছেদ। আশ্রমেব একজন সতর্ক কবিযা দেয।

কল্যাণ উত্তবে বলেন, "বেশতো, গুরু মহাবাজেব সেবায এগিযে যাবাব ফলে যদি তাঁব হাতে আমাব প্রাণ যায, তবে তা হবে আমাব পবম সৌভাগ্য।'

আত্ম বলিদানের জন্য প্রস্তুত হইলেন কল্যাণ। রক্ত-চন্দন ললাটে লেপন করিলেন, মুখে গুঁজিয়া দিলেন পর্ণপত্র, তারপর গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন করজোড়ে।

রামদাস স্বামী প্রথমে রোষ-কষায়িত নেত্রে, রুদ্ধস্বরে বেশ খানিকটা তর্জন-গর্জন করিলেন, বার বার আন্দোলিত করিলেন তাঁহার তরবারি। কল্যাণ কিন্তু নির্বিকার। গুরু উন্মাদই হোন আর যা-ই হোন, তিনি তাঁহার চরণে প্রণাম নিবেদন করিবেনই, তাঁহার সেবায় হইবেন তৎপর।

মুহূর্তমধ্যে রামদাস মহারাজের ক্রোধের অভিনয় বন্ধ হয়। হাতের তলোয়ার দূরে নিক্ষেপ করিয়া পরম স্নেহে কল্যাণকে করেন আলিঙ্গন। ভাব-বিহ্বল কণ্ঠে কহেন, "বৎস, তোমার মতো বীর আত্মোৎসর্গে সদা প্রস্তুত শিষ্যই যে আমার চাই। তাছাড়া, কি ক'রে হবে প্রভু রামজীর ধর্মরাজ্য স্থাপন?"

নীলোপন্থ নামে রামদাসজীর এক গৃহী শিষ্য ছিলেন। একবার পরিব্রাজনের পথে ভক্ত সঙ্গে স্বামীজী তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। নীলোপন্থ তখন গ্রামের বাহিরে কি কাজে গিয়াছেন। তাঁহার পত্নী নিরুবাঈ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিলেন। স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গীদের জন্য তাড়াতাড়ি কিছু ভোজনের ব্যবস্থা করা চাই। এ অঞ্চলে উপর্যুপরি কয়েকদিন ঝড়-জল হইয়া গিয়াছে, ঘরে জ্বালানী কাঠ এক টুকরাও অবশিষ্ট নাই। অথচ স্বামীজী মহারাজকে বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখা যাইবে না, এখনি গ্রামান্তরে যাইবার জন্য তিনি তাড়া লাগাইতেছেন।

নিরুবাঈর মাথায় জ্বালানির এক বিকল্প বাহির হইল। তৎক্ষণাৎ নিজের তোরঙ্গ খুলিয়া জামা কাপড় শাড়ি ও মূল্যবান শাল প্রভৃতি স্তূপীকৃত করিলেন, ঢুকাইয়া দিলেন উনুনে। জ্বালানিরূপে এগুলি ব্যবহার করিয়া পরমানন্দে প্রস্তুত করিলেন স্বামীজীর আহার্য।

কিছুকাল পরেই নীলোপন্থ ঘরে ফিরিয়া আসেন। স্বামীজী মহারাজকে গৃহে পাইয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা নাই। বিদায় কালে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ভক্তিভরে গুরুর চরণে প্রণাম করিতেছেন, এমন সময় রামদাসজী প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, নীলোপন্থ, তুমি ভাগ্যবান্ এমন সাধ্বী স্ত্রী তোমার ঘরে রয়েছে। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, আমার আহার্য তৈরি করতে গিয়ে মাতাজী নিরুবাঈ তোমাদের মূল্যবান পরিচ্ছদ সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। ভালোই করেছে, প্রপঞ্চের মায়া কিছু কেটেছে।"

নীলোপন্থ তো মহাখুশী। যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, শত শত ভক্তশিষ্য আপনার সেবার জন্য প্রাণপাত করছে। নিরুবাঈ সে তুলনায় তেমন কি আর করেছে? যাক্, যাবার আগে আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন। আপনার আশীর্বাদই যে হবে আমাদের পরম পাথেয়।"

ঝুলি হইতে রামদাসজী একটি ডাব তুলিয়া নিলেন, নীলোপন্থের হাতে এইটি দিয়া কহিলেন, "বৎস, নাও, এই রইলো আমার আশীর্বাদ। আমি জানি দীর্ঘদিন তোমরা অপুত্রক রয়েছো। আমার বরে মাতাজী নিরুবাঈর কোল জুড়ে আসবে একটি শিশুপুত্র। প্রভু রামজীর প্রতি থাকবে তার অচলা ভক্তি।"

অতঃপর সঙ্গীগণসহ স্বামীজী মহারাজ ধীরে ধীরে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যথাকালে নিরুবাঈ একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। উত্তরকালে এই পুত্র রামদাস মহারাজের কাছে দীক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হয়।

ভক্তবীর কল্যাণের গুরুভক্তির আরো একটি কাহিনী রহিয়াছে। সেবার রামদাস মহারাজ স্থির করিলেন, কিছুদিনের জন্য নির্জনবাসে যাইবেন এবং একটি নিগূঢ় সাধনা সেখানে সমাপ্ত করিবেন। নদীর ওপারে রহিয়াছে এক দুর্বারবিস্তার্য অরণ্য, ইহারই এক কোণে পর্ণকুটির বাঁধিয়া স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন।

কয়েকদিন পরেই ডোমগাঁও হইতে কল্যাণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। গুরুদেবের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তিনি তো মহা চিন্তিত। বুঝিলেন, একান্তে সাধনভজন তাঁহার হয়তো ঠিকই চলিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নিত্যকার আহার্যের ব্যবস্থা কি? এজন্য নিশ্চয় তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইতেছে।

কল্যাণ স্থির করিলেন, এখন হইতে কিছুদিন একবার করিয়া তিনি নদীর ওপারে স্বামজীর ধ্যানকুটিরে যাইবেন, নিত্যকার খাবার দিয়া আসিবেন।

আগের দিন রাত্রে এ অঞ্চলে বর্ষার ঢল নামিয়াছিল। আশ্রমের সম্মুখস্থ মহনা নদী তাই স্ফীতকায়া হইয়া উঠিয়াছে, স্রোত বহিয়া চলিয়াছে খরবেগে। গুরুগতপ্রাণ কল্যাণ মোটেই দমিবার পাত্র নন, আহার্যের পাত্র মাথায় বাঁধিয়া নিলেন, তারপর, জয় জয় রঘুবীর, জয় সমর্থ রামদাস স্বামী, বলিয়া বর্ষা-প্লাবিত নদীগর্ভে দিলেন ঝাঁপ। ওপারে গিয়া অনেক খোঁজাখুঁজির পর গুরুজীর সন্ধান তিনি পান, সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমাপ্ত করান তাঁহার ভোজন। রামদাসজীর অরণ্যবাসের প্রতিটি দিন কল্যাণকে এই খরস্রোতে বিপজ্জনক নদী সাঁতরাইয়া পার হইতে হইত। হনুমন্ত স্বামীর রামদাস-চরিতে সমর্থ রামদাস স্বামীর বহুতর যোগবিভূতির বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাদের একটি শিষ্য-প্রধান কল্যাণ সম্পর্কিত।

সেদিন গভীর রাত্রি অবধি স্বামীজী মহারাজ কতকগুলি অভঙ্পদ রচনা করিয়াছেন। শিষ্য সেবকদের অনেকেই তখন নিদ্রায় অভিভূত। পান-সুপারী চর্বণের অভ্যাস স্বামীজীর বরাবরই ছিল। সেবকদের ডাকিয়া তুলিয়া কহিলেন, "দ্যাখো তো, কৌটার ভিতরে পান-সুপারী আছে কিনা। খানিকটা না চিবুতে পারলে আর ভালো লাগছে না।"

খুঁজিয়া দেখা গেল, কৌটায় সুপারী যথেষ্টই আছে কিন্তু পান একটিও নাই। "পান ছাড়া সুপারী কি ক'রে খাওয়া যায়—" এই বলিয়া রামদাস মহা হৈচৈ তুলিয়া দিলেন।

এত রাত্রে পাহাড়ে পান কোথায় পাওয়া যাইবে? যদি সংগ্রহ করিতেই হয়, নিচে নামিয়া গ্রামের অভ্যন্তরে যাইতে হইবে, যদি কোনো গৃহস্থ বাড়িতে সন্ধান মিলে। সেবকেরা সবাই এ উহার মুখ চাহিতেছেন, কিন্তু কল্যাণ তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমি নিচের গ্রাম থেকে এখনি কয়েকটি পান সংগ্রহ ক'রে আনছি।"

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার পাহাড়ী পথ দিয়া তিনি দ্রুত পদে নিচে নামিতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট পরেই শোনা গেল কল্যাণের আর্ত চিৎকার। একটি মিস কালো কেউটে সাপের গায়ে পা দিতেই তৎক্ষণাৎ উহা তাহাকে ছোবল মারিয়াছে। রামদাস ও শিষ্য সেবকেরা মশাল নিয়া তখনি সেখানে ছুটিয়া গেলেন। সর্পদষ্ট কল্যাণ তখন

ভূমিতে লুটাইয়া পড়িযাছে। চোখ মুখে অসহ্য যন্ত্রণাব ছাপ। মুখ দিয়া অবিবাম ফেনা নির্গত হইতেছে।

রামদাস হাঁটু গাড়িয়া শিষ্যেব সম্মুখে বসিযা পড়েন। অস্ফুট স্ববে মন্ত্র উচ্চাবণ কবিযা বাব বাব কল্যাণেব দেহে কবেন কবসঞ্চালন, তাবপব স্নেহপূর্ণ স্ববে বলিতে থাকেন, "বৎস কল্যাণ, এবাব ওঠো ওঠো।"

অল্পকাল মধ্যেই কল্যাণ চোখ মেলিযা তাকান এবং ধীবে ধীবে উঠিযা বসেন। বাহ্যজ্ঞান ফিবিযা পাইযা আবাব উদ্যত হন গুরু মহাবাজেব পান সংগ্রহেব জন্য।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে শিষ্যেব দিকে চাহিযা গুরুজী বলেন, "বৎস, আব তোমায কোথাও যেতে হবে না। এবাব আশ্রমে ফিবে চল।"

পথ চলিতে চলিতে একটি তরুণ শিষ্য মৃদুস্ববে মন্তব্য কবেন, "এত গভীব বাতে এভাবে একলা এমন ক'বে চলে আসাটা কল্যাণেব উচিত হয নি।"

রামদাস স্বামী সহাস্যে উত্তব দেন, "দ্যাখো, যা ঘটেছে বামজীব কৃপাতেই ঘটেছে। আমবা নিমিত্ত মাত্র। বামজী আমায ইঙ্গিত দিযেছিলেন, কল্যাণেব আযু আব নেই।"

"সেকি প্রভু, তা জেনেও আপনি এই অন্ধকাবেব ভেতব বনপথে ওকে যেতে দিলেন?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন কবেন এক সেবক।

"সর্পাঘাতে ওব জীবনান্ত হবাব কথা। অথচ ঈশ্ববেব কাজে ওকে অনেক কিছু কবতে হবে। তাইতো পান-সুপাবীব জন্য চেঁচামেচি ক'বে ওকে পথে নামালাম। কালসাপ ওকে দংশন কববে তা আমি জানতাম। আমাব কাছাকাছি থাকা কালে এই দুর্ঘটনা হযে ভালোই হলো। বামজীব কৃপায ওকে বাঁচাতে পাবলাম।"

বামদাস স্বামীব অন্যতম জীবনীকাব ভীমস্বামী শিবগাভকাব একটি মনোবম আখ্যাযিকা বর্ণনা কবিযাছেন—

সেবাব বাবাণসীব এক প্রখ্যাত পণ্ডিত ঘুবিতে ঘুবিতে মহাবাষ্ট্রে আসিযা উপনীত হন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বিচাব-মল্ল, যেখানেই যান সোৎসাহে সাধুদেব তর্কযুদ্ধে আহ্বান কবেন। আত্মবিশ্বাস ইহাব অত্যন্ত বেশী। সদাই গলদেশে উপবীতেব সঙ্গে প্রকাশ্যে ঝুলানো থাকে একটি তীক্ষ্ন ছুবিকা, দম্ভভবে এটি সবাইকে দেখাইযা বলেন, "শাস্ত্র বিচাবে যখনি কেউ আমায় পবাস্ত কববে, তক্ষুনি তাব সম্মুখে এই ছুবিকা দিযে নিজেব হাতে আমি কেটে ফেলবো আমাব জিহ্বা।"

মহাবাষ্ট্রেব লোকেব ঘবে ঘবে তখন বামদাস স্বামীব 'দাসবোধ' পঠিতে হয, স্বামীজীব বিদ্যাবত্তা ও সাধন-বিভূতিব প্রসিদ্ধিও নবাগত পণ্ডিতটি শুনিযাছেন। একদিন তিনি সদলবলে ছাফলে আসিযা উপস্থিত। সংবাদ দিলেন, স্বামীজীব সহিত অবিলম্বে তিনি তর্কদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে চান।

বামদাস ব্যস্ত-সমস্ত হইযা ভক্ত শিষ্যদেব কহিলেন, "যাও যাও, এখনি তোমবা ঐ মহাত্মাকে সসম্মানে আশ্রমে নিযে এসো। মশাল আব বাদ্যভাণ্ড সঙ্গে নিতে ভুলো না। বাবাণসীব এমন একজন কৃতী পণ্ডিত। দেখো, কোনো দিক দিযে যেন তাঁব অমর্যাদা না হয।"

সাড়ম্ববে শোভাযাত্রা কবিযা বাবাণসীব তর্কশূবকে আশ্রমে আনযন কবা হয়। বামদাস স্বামীজী স্বযং অগ্রসব হইযা তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও অভিবাদন জ্ঞাপন কবেন।

কিন্তু স্বামীজীর অভিবাদনের দিকে পণ্ডিতের কোনো লক্ষ্যই নাই। দর্পভরে, কহেন, "আমার সময় অতি মূল্যবান। আর বিলম্ব না করে, আপনি আমার প্রশ্ন-গুলোর উত্তর দিন, অবশ্য যদি সমর্থ হন।"

রামদাস সহাস্যে কহিলেন, "বিদ্যা মানেই সেই পরমবস্তু যা হৃদয় কন্দরকে আলোকিত করে। তবে শাস্ত্রপারঙ্গম হয়েও আপনি এমন অন্ধকারে ডুবে রয়েছেন কেন, বলুন তো ?"

রোষে পণ্ডিতের দুই চোখ জ্বলিয়া উঠে, হুংকার দিয়া বলেন, "বটে, এতো ঔদ্ধত্য তোমার ? এখানে কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলছো জানো ?"

"খুব জানা আছে, পণ্ডিতবর। এবার একটু অনুগ্রহ ক'রে আপনি আপনার শাস্ত্রতত্ত্বের প্রশ্ন উত্থাপন করুন, যথাযথ সব উত্তর এখনি পাবেন।" সবিনয়ে নিবেদন করেন রামদাস।

ক্রুদ্ধ উত্তেজিত পণ্ডিত তাঁহার প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী রামদাস প্রদর্শন করিলেন তাঁহার এক যোগবিভূতি। বহুলোক তাঁহাদের সম্মুখে ভিড় করিয়া আছে। এই ভিড়ের ভিতর হইতে একটি নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত মানুষকে রামদাস কাছে ডাকিয়া নিলেন। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার মধ্যে করিলেন শক্তি সঞ্চালন। এবার দৃঢ় কণ্ঠে দিলেন নির্দেশ, "বৎস, পণ্ডিতজীর সব ক'টা শাস্ত্রীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তুমি দিয়ে দাও।"

সর্বসমক্ষে ঘটিতে দেখা যায় এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। অর্ধশিক্ষিত লোকটির মুখ দিয়া অবিরলধারে নিঃসৃত হইতে থাকে শাস্ত্রের নানা দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। বারাণসীর পণ্ডিত মহারাজ তো বিস্ময়ে হতবাক্। ইতিমধ্যে তিনি বুঝিয়া নিয়াছেন, রামদাস একজন সিদ্ধ মহাত্মা। অলৌকিক প্রজ্ঞা এবং অলৌকিক শক্তির তিনি অধিকারী। এ হেন ব্যক্তির সমক্ষে বিদ্যার দম্ভ প্রকাশ করিয়া পণ্ডিতজী মারাত্মক ভুল করিয়াছেন।

এবার রামদাসের চরণে পতিত হইয়া বার বার তিনি ক্ষমা ভিক্ষা মাগিতে থাকেন। নিজের জিহ্বা কর্তনের জন্যও উদ্যত হন।

উপবীতে ঝুলানো তীক্ষ্ম ছুরিকাটি তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়া রামদাসজী পণ্ডিতকে কহিলেন, "আপনাকে অনেক আগেই আমি ক্ষমা করেছি পণ্ডিতবর। মনে রাখবেন, আপনার জিহ্বা, আপনার দেহ, সবই রামজীর। ছেদন করিতে হয় তিনি করবেন। আপনার দেহ-মন-আত্মা কোনো কিছুর ওপরই তো আপনার অধিকার নেই। ভালোই হলো, আপনার দর্প এবার ভূমিসাৎ হলো, এবার সত্যকার বিদ্যা এলো আপনার আধারে।"

এই পণ্ডিত অতঃপর দীনভাবে রামদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বারাণসীতে ফিরিবার সময় সাগ্রহে রামদাসের রচনা দাসবোধের একটি প্রতিলিপি তিনি সঙ্গে নিয়া যান।

সিদ্ধপুরুষ বলিয়া রামদাসের তখন খ্যাতি রটিয়াছে ; একটি সুসংবদ্ধ ভক্তিবাদী সম্প্রদায়ের নেতারূপেও মহারাষ্ট্রে তাঁহার বিরাট মর্যাদা। এই সময়ে এক শুভলগ্নে

বামদাসেব সহিত মিলন ঘটে বাজা শিবাজী ভোঁসলেব। এই মিলন যেন মণিকাঞ্চনেব সংযোগ। বামবাজ্য, ধর্মবাজ্য, স্থাপনেব যে স্বপ্ন বামদাস এতদিন দেখিযা আসিতেছেন যে স্বপ্নকে বূপাযিত কবাব জন্য জীবন উৎসর্গ কবিযাছেন, বাজা শিবাজী হন সেই মহান্ ঐশ কর্মেব ধাবক ও বাহক। এই দুই ব্যক্তিত্বেব মিলনে সাবা মাবাঠায প্রবাহিত হয আত্মিক শক্তি ও ক্ষাত্রশক্তিব যুগ্মধাবা। সাবা ভাবতেও ইহাব ফল হয সুদূব-প্রসাবী। এক ও অখণ্ড ধর্মবাজ্যেব বিপুল সম্ভাবনাব আশা ছডাইয়া পডে দেশেব দিকে দিকে।

শিবাজীব অভ্যুদযেব দিকে স্বামী বামদাস নিযত তাঁহাব দৃষ্টি নিবদ্ধ বাখিযাছেন। লক্ষ্য কবিযাছেন ঔবংজেবেব নগণ্য 'পার্বত্য মূষিক' শিবাজী ভোঁসলে ধীবে ধীবে গডিযা তুলিযাছেন একটা সুদৃঢ় স্বাধীন বাজ্যেব বনিযাদ। শুধু তাই নয, এই বাজ্য যাহাতে ধর্মধৃত হয, উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হয, সেজন্য তাঁহাব ব্যাকুলতাব সীমা নাই। অন্তবে অন্তবে বামদাস বুঝিযা নিযাছেন, শিবাজীকে তাঁহাব সাহায্য নিতেই হইবে, তাঁহাব কাছে আসিতেই হইবে। কিন্তু এখনই নয, আবো কিছুকাল বামদাসকে অপেক্ষা কবিতে হইবে, লগ্ন সমাগত হইলেই শিবাজী আকুল আগ্রহ নিযা ছুটিযা আসিবেন, গ্রহণ কবিবেন তাঁহাব পবমাশ্রয।

সৈন্যবল ও বাজ্যপবিধিব বিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী ভোঁসলেব অন্তবেও জাগিযাছে পবম কল্যাণেব ভাবনা। আত্মিক উজ্জীবনেব জন্য তিনি ব্যগ্র হইযা উঠিযাছেন। যখন যে সাধু মহাত্মাব সন্ধান পান, সাগ্রহে তাঁহাব দর্শন কবেন, সাধ্যমতো কবেন সেবা পবিচর্যা। পবিব্রাজনবত সাধু-সন্ন্যাসী হইতে শুবু কবিযা পন্ধাবপুবেব সিদ্ধ তুকাবামজীব সঙ্গ, কোনো কিছুই শিবাজী বাদ দেন নাই। কিন্তু মনেব মানুষেব সন্ধান, চিহ্নিত সদ্গুবুব সন্ধান, এখনও তিনি প্রাপ্ত হন নাই।

বামদাস স্বামীব আদর্শ ও সংগঠনেব নানা সংবাদ শিবাজী বাখেন, তাঁহাব মাহাত্ম্য ও যোগৈশ্বর্যেব খ্যাতিও তাঁহাব অজানা নয। এবাব এ মহাপুবুষেব আশ্রয গ্রহণেব জন্য অন্তব তাঁহাব বড ব্যাকুল হইযা পডিয়াছে। বামদাস তখন কোনো মঠেই স্থাযি-ভাবে বাস কবিতেন না, স্বেচ্ছামতো ঘুবিযা বেডাইতেন। তাই কিভাবে কোথায মহাত্মাব দর্শন কবা যায শিবাজী প্রাযই ভাবিতেছিলেন।

নবুসোমলু নাথ নামে শিবাজীব এক কর্মচাবী সেবাব খবব দেন, – স্বামীজী এখন ছাফলেব মঠে অবস্থান কবিতেছেন। কযেকজন পার্শ্ববক্ষী নিযা শিবাজী তখনি সেখানে ছুটিযা যান। কিন্তু সাক্ষাৎ হইল না। শুনিলেন, বামদাস স্বামী ইতিমধ্যে সে স্থান ত্যাগ কবিযা অন্যত্র চলিযা গিযাছেন।

ছাফলেব মঠটি ছোট হইলেও বড মনোবম। শিবাজী সাধুদেব জিজ্ঞাসা কবিলেন, কিভাবে কাহাব আনুকূল্যে, এই সুন্দব মঠটি নির্মিত হইযাছে?

সাধুবা সবিস্ময়ে কহেন, "সে কি মহাবাজ, আপনি কি জানেন না, এটি যে আপনাব প্রদত্ত অর্থেই তৈবি হযেছে। কযেক বৎসব আগে পুনাতে, আপনাব পুবোহিতেব ভবনে গিবি গোসাবি নাসিখব নামে এক কীর্তনিযা বামলীলা কীর্তন কবছিলেন। কীর্তন শুনে খুশী হযে আপনি তাঁকে কিছু অর্থ দান কবতে চান! ঐ কীর্তনিযা বামদাস মহাবাজেব একজন পবম ভক্ত। তিনি অনুবোধ জানান – মহাবাজেব প্রতিশ্রুতি অর্থ যেন বামদাস স্বামীজীকেই দেওযা হয ছাফলেব প্রস্তাবিত বামমন্দিব নির্মাণেব

জন্য। এটিই তো সেই মন্দির। আপনার সরকার থেকে তিন শত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হয়েছিল এই পবিত্র কাজের জন্য।"[১]

এ সংবাদে শিবাজী হৃষ্ট হইলেন। মন্দিরের চারপাশে ঘুরিয়া দেখিলেন, নদীর খরস্রোত উহার ভিত্তির দিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে। সরকারী পূর্ত অধিকর্তাকে ডাকিয়া তখনি তিনি হুকুম দিলেন, "যে কোনো উপায়ে এই নদীর স্রোতধারাকে ঘুরিয়ে দাও, স্বামীজীর এই মন্দিরকে রক্ষা করো। এ জন্য যে কোনো অর্থব্যয়ে কার্পণ্য ক'রো না।"

নির্দেশমতো কার্য সম্পন্ন হইতে বিলম্ব হয় না। ফলে ছাফলের ঐ মন্দির ধ্বংসের হাত হইতে রেহাই পায়।

রামদাস স্বামীর কাছে মহারাজ শিবাজীর সব সংবাদই যথাসময়ে পেঁাছিল। ইহার কিছুদিন পরে শিবাজী মাহুলীতে একটি ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়াছেন, সেখানে এক শুভ মুহূর্তে তাঁহার হাতে আসিল রামদাস স্বামীর এক ক্ষুদ্র লিপি। এ লিপি পাইয়া রাজা মহা উৎফুল্ল। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাকে উত্তর দিলেন :

"হে মহাতাপস, আমি আপনার চরণে অপরাধী। আপনার হৃদয়ে রয়েছে অসীম করুণা—আপনার আশিস্ লিপি আমায় ভরপুর ক'রে দিয়েছে পরম আনন্দে। কি ভাষায় আমি তার বর্ণনা দেব? আপনি কৃপা ক'রে আমার গুণগান করেছেন, কিন্তু আমি জানি, আমি মোটেই তার উপযুক্ত নই। বহুদিন যাবৎ আপনার দর্শনের অভিলাষী রয়েছি, এবং সুযোগ পেলে এখনই আমি উপস্থিত হতে পারি আপনার সকাশে। হে প্রভু, আপনি কি আমায় গ্রহণ করবেন? আমার তৃষ্ণা কি করবেন দূর?"

এই পত্র পাঠাইয়া দিয়া পরদিনই শিবাজী তাঁহার রক্ষীদল নিয়া উপনীত হন ছাফলে। সেখানে গিয়া শুনিতে পান, রামদাস মহারাজ তখন সিংগন-বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। মঠের সাধুরা তাঁহাকে বলেন, "মহারাজ, এই সময়ে স্বামীজীর কাছে আপনার যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ, এখন তিনি হনুমানজীর মন্দিরে একটি বিশেষ পূজা অনুষ্ঠানে ব্যস্ত। পূজা অর্চনা সমাধা ক'রে স্বামীজী মহারাজ নিজের হাতে বহুতর ভোগরাগ প্রস্তুত করবেন। তারপর মারুতিজীকে তা নিবেদন ক'রে দিনশেষে বসবেন প্রসাদ গ্রহণের জন্য। আপনি বরং পরে আর কোনোদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।"

শিবাজী একথা মানিলেন না। কহিলেন, "হৃদয় বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, আর ধৈর্য ধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, আজ তো বৃহস্পতিবার—গুরু-বার, এই শুভদিনেই স্বামীজীকে আমি দর্শন করবো।"

রক্ষীদল পশ্চাতে রাখিয়া তাড়াতাড়ি তিনি অগ্রসর হন। দুইজন পার্শ্বচর নিয়া সিংগন-বাড়ির মঠে উপস্থিত হন, লুটাইয়া পড়েন স্বামী রামদাসজীর চরণতলে।

রামদাস স্বামীর হস্তে তখনো ধৃত রহিয়াছে শিবাজীর সদ্যপ্রাপ্ত লিপি। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "রাজা, আপনি যে আসবেন তা আমি জানতাম। কিন্তু নিজের

১ টকাখার অ্যান্ড কেলুসকর : লাইফ অব্ শিবাজী মহারাজ

করি, সাক্ষাতের জন্য আপনি এত ব্যগ্র, কিন্তু আরো আগে কেন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি ?”

“দুর্ভাগা আমি, তাই অভিলাষ থাকলেও এতদিন বঞ্চিত ছিলাম আপনার দর্শনে। প্রভু, এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমায় আপনি মার্জনা করুন। এখন দর্শন যখন মিলেছে, আর আমায় দূরে সরিয়ে রাখবেন না। অবিলম্বে দীক্ষা দিয়ে আমায় উদ্ধার করুন।'

শাস্ত্রীয় বিধান মতো দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। চৈতন্যময় মন্ত্র গ্রহণের পর গুরু মহারাজের কাছে শিবাজী চিরতরে আত্মসমর্পণ করিলেন। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এই শুভদিন, রামদাস ও শিবাজীর মিলনের দিন, মহারাষ্ট্রের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে।

গুরুর ধর্মরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনায় শিবাজীর অবদান যথেষ্ট। এই পরিকল্পনার পিছনে স্বামী রামদাস যোগাইয়াছেন অধ্যাত্মশক্তি, আর শিবাজী উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহার অমিত ক্ষাত্রতেজ ও অর্থবল। শিষ্যত্ব গ্রহণের পর হইতে মহারাজ শিবাজী তাঁহার কোষাগার উন্মুক্ত করেন নব নব মঠ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠায়। বড় বড় জায়গীর দিয়া এই ধর্ম কেন্দ্রগুলিকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে তিনি সাহায্য করেন। গুরু ও শিষ্যের এই মহান্ যৌথ প্রয়াস সারা ভারতের রাষ্ট্রচিন্তা ও ধর্মাদর্শের সম্মুখে উন্মোচন করে এক নূতন দিগন্ত, লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ আদর্শবাদী মানুষের বুকে জাগাইয়া তোলে বিরাট প্রত্যাশার আলো।

রামদাস স্বামী একদিন শিবাজীকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, “শিবাজী, গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ তুমি অসম্পূর্ণ রেখেছো, এবার সেটা শেষ করতে হবে।”

“কি সে কাজ, প্রভু আদেশ করুন, সর্বশক্তি দিয়ে আমি তা পালন করবো।”—বদ্ধকরে নিবেদন করেন শিবাজী।

“তোমার রাজ্যাভিষেক তো এখনো হয় নি। শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে। ধর্মরাজ্যের অধীশ্বর তুমি। শুধু মারাঠাই নয়, সারা ভারতভূমি আজ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তোমার এই শাসনকে শাস্ত্রীয় সমর্থনের ভিত্তিতে আমি দাঁড় করাতে চাই। তোমার শক্তি সত্যকার ক্ষাত্রশক্তি বলে গণ্য হোক, তাও আমি চাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ, সাধু মহাত্মা, সমাজনেতা ও জনগণের সমক্ষে—প্রাচীন ভারতীয় প্রথায়—তোমার অভিষেক হোক। পবিত্র যজ্ঞ হোম সম্পন্ন হোক। তুমি অবিলম্বে এর উদ্যোগ আয়োজন করো।”

গুরুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া শিবাজী ভোঁসলে অচিরে এ কাজে ব্রতী হন। কাশীধামে তখন অশেষ-শাস্ত্রবিদ্ গাগা ভট্টের প্রবল প্রতাপ। বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দুইয়েতেই তিনি মহা পারঙ্গম। তাঁহাকেই শিবাজীর অভিষেক ক্রিয়ার প্রধান আচার্য রূপে মনোনীত করা হইল। ভারতের সর্ব অঞ্চলের ধর্মসংস্কৃতি ও সমাজের নেতাদের কাছে প্রেরিত হইল আমন্ত্রণ পত্র। শুভ লগ্নে সাড়ম্বরে ও শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুযায়ী শিবাজী মহারাজের অভিষেক উৎসব সুসম্পন্ন হইল। কাজকর্ম শেষ হইয়া গিয়াছে, পণ্ডিতবর গাগা ভট্ট আগামী এক সপ্তাহের ভিতর বারাণসীর

দিকে রওনা হইবেন। হঠাৎ একদিন ভট্টজী দেখেন, প্রত্যুষে উঠিয়া শিবাজী ভক্তিভরে সর্বপ্রথমে মারাঠী ভাষায় লিখিত এক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন।

"মহারাজ, এই মারাঠী পুঁথি কি রোজই আপনি এ সময়ে পাঠ করেন?"—প্রশ্ন করেন ভট্টজী।

"হ্যাঁ, পণ্ডিতবর, এটি যে আমার প্রাত্যহিক কাজ এবং প্রধান কৃত্য।"

"কি নাম এ গ্রন্থের? কার রচিত? কোন্ তত্ত্ব আছে এতে, খুলে বলুন তো?"

"এ গ্রন্থ মারাঠীতে লেখা, নাম—দাসবোধ। মহাত্মা রামদাস স্বামী, আমার গুরু মহারাজ, এর রচয়িতা।"

"এ বড় অদ্ভুত কথা মহারাজ। আপনার মতো বিচক্ষণ, শাস্ত্রপ্রেমিক ব্যক্তির একি রুচিহীনতা? আপনার পক্ষে এ গ্রন্থপাঠ তো মোটেই শোভন নয়। বৈদিক ভাষা, সংস্কৃত ভাষা, তাই তো হবে আপনার আমার উপজীব্য। বেদ-বেদান্ত উপনিষদ সব কিছু ছেড়ে, শেষটায় আপনি মারাঠী দাসবোধ নিয়ে মেতে উঠলেন? ছিঃ।"

মহারাজ শিবাজী সবিনয়ে উত্তর দেন, "পণ্ডিতবর, এ পুঁথি মারাঠীতে লেখা হলেও আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র থেকেই এর তত্ত্ব সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া, আমি মনে করি—প্রজ্ঞাবান্ যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের রচিত এ গ্রন্থ সব মানুষেরই কল্যাণ-সাধনে সক্ষম। তাই এটি আমার নিত্য পাঠ্য।"

গাগা ভট্ট শিবাজীর কথা শুনিয়া শ্লেষাত্মক হাসি হাসিলেন। এ প্রসঙ্গ নিয়া আর ঘাঁটাঘাঁটি করিলেন না।

শিবাজী কিন্তু ভট্টজীর কথাগুলি বিস্মৃত হইলেন না। মনে মনে স্থির করিলেন, পণ্ডিতবরকে অচিরে সমুচিত শিক্ষা দিয়া তবে মহারাষ্ট্র হইতে ছাড়া হইবে।

দুই দিন পরেই রাজপ্রাসাদের চত্বরে স্বামী রামদাসের এক ধর্মসভার অনুষ্ঠান বসিল। এই সভার প্রধান অঙ্গ—দাসবোধের ব্যাখ্যা ও রামলীলা কীর্তন। গাগা ভট্ট এবং অন্যান্য বড় পণ্ডিতদেরও এই সভায় নিমন্ত্রণ করা হইল।

সভা শুরু হইয়াছে। ইষ্টনাম ও ইষ্টলীলা গাহিতে গাহিতে স্বামী রামদাস দিব্যভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। কখনো তিনি হাসিতেছেন, কখনো বা কাঁদিতেছেন—এ হেন মহাভাবের উৎসারক এক অনির্বচনীয় অবস্থা। অগণিত শ্রোতা ও দর্শনার্থী এই কৌপীনবন্ত সর্বত্যাগী মহাপুরুষের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। তাঁহার ভাবরসের উত্তাল তরঙ্গ দুলিতেছে, উঠিতেছে নাচিতেছে। রামদাসের এই লীলা বর্ণনা যেন জীবন্ত। ভাববিহ্বল শ্রোতাদের নয়নসম্মুখে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত আর মারুতি এক একটি মূর্তি যেন ভাস্বর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাব ও তত্ত্বের মিশ্রণে রচিত হইয়াছে দিব্যলোকের অপরূপ পরিমণ্ডল।

গাগা ভট্ট অনিমেষ নয়নে এই ভাবময় ইন্দ্রজালের দিকে তাকাইয়া আছেন, আর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উদ্গত হইতেছে এক দুর্নিবার আকুতি। কোনোমতে পণ্ডিত ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। তারপর সভার অন্তে আবেগভরে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন স্বামী রামদাসকে। গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, "স্বামীজী, আমি আপনার কাছে মার্জনা ভিক্ষা চাই।"

"পণ্ডিতবর না-না, এসব কথা বলে আমায় পাপের পঙ্কে ডোবাবেন না।" বিনয়-নম্র বচনে বলেন স্বামী রামদাস।

"না স্বামীজী, আমি সত্যই অপরাধী। আপনি যে কত বড় জ্ঞানী, কত বড় প্রেমিক পুরুষ, তা আমি বুঝতে পারি নি। আপনার মূল্য বুঝতে আমি ভুল করে-ছিলাম, আজ এই সভায় আপনার সত্যকার রূপ আমি চিনতে পেরেছি।"

বারাণসীতে ফিরিয়া গিয়াও স্বামী রামদাসের দিব্যোজ্জ্বল স্মৃতি গাগা ভট্ট দীর্ঘদিন ভুলিতে পারেন নাই। এই মারাঠী সাধকের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আজীবন অটুট ছিল।

রামদাস স্বামীর অন্যতম জীবনীকার ভীমস্বামী শিবগাভ্‌কার স্বামীজীর যোগ-বিভূতির এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েকটি শিষ্যসহ স্বামীজী তখন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিব্রাজন করিতেছিলেন। সেদিন একটি গ্রামের উপান্তে তাঁহারা বিশ্রাম করিতেছেন। পাশেই রহিয়াছে একটি শ্মশান। হঠাৎ এক সদ্য বিধবার আর্ত কান্না ও চিৎকার স্বামীজীর কানে গেল। বড় মর্মভেদী এই কান্না। তাড়াতাড়ি শিষ্যদের নিয়া তিনি শ্মশানে ছুটিয়া যান, গিয়া দেখেন স্থানটি লোকে লোকারণ্য—গ্রামের পাটেল মারা গিয়াছে। এইমাত্র মৃতদেহ সেখানে আনা হইয়াছে। পাটেলের স্ত্রীর ললাট সিন্দুরলিপ্ত, পরিধানে লালপেড়ে একটি নূতন শাড়ী, সতীরূপে স্বামীর সহমরণে যাইতে তিনি প্রস্তুত। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান শেষে চিতায় আরোহণ করিতে যাইবেন, এমন সময় সদ্য বিধবা কান্নায় ভাঙিয়া পড়েন, স্বামীর মৃতদেহটি জড়াইয়া ধরিয়া বিলাপ করিতে থাকেন।

বড় মর্মন্তুদ এই দৃশ্য। অসহায়া বিধবার ক্রন্দনে রামদাস স্বামীর হৃদয় বিগলিত হইল, মুহূর্তে প্রকাশিত হইল করুণাঘন রূপ। অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "মায়ী, তুমি শান্ত হও। ভয় নেই, রামজীর কৃপায় তোমার স্বামী আবার তাঁর প্রাণ ফিরে পাবেন।"

শবের পাশে কিছুক্ষণ ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে রামদাস উপবিষ্ট থাকিলেন, তারপর কমণ্ডলু হইতে ছিটাইয়া দিলেন এক অঞ্জলি পবিত্র বারি। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য। মৃত পাটেল ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়াছেন।

জনতা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্বামী রামদাসকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। আর স্বামীজীর শিষ্যগণ বার বার উচ্চারণ করিতেছে জয়ধ্বনি—জয় জয় কৃপালু রঘুবীর—জয় জয় সমর্থ রামদাস।

পাটেলের স্ত্রী এবার স্বামীজীর পা'দুটি জড়াইয়া ধরেন। সজল চক্ষে মিনতি করেন, "প্রভু, দয়া যদি একবার করেছেনই, তবে এই দাসীর উদ্ধারও আপনাকেই করতে হবে। আমার স্বামী আর আমাকে আপনি দীক্ষা দিন। আপনার পরমাশ্রয়ে থেকে রামজীর নামজপ ক'রে বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে দিই।"

রামদাস প্রশান্ত স্বরে কহেন, "কিন্তু মা, আমি তো প্রস্তুতি ছাড়া কাউকে দীক্ষা দিইনে। আমার পা ছাড়ো, শান্ত হয়ে উঠে বসো। জরুরী কাজ আছে আমার, এখনি আমায় যেতে হবে।"

"প্রভু, প্রস্তুতি কাকে বলে আমি জানিনে। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা কেবলি ডেকে বলছে, আপনিই আমার উদ্ধারকর্তা। বেশ, আপনি চলে যাচ্ছেন – যান। আমি বাধা দেবো না। কিন্তু জানিয়ে রাখছি আজ থেকে আমি আমরণ উপবাসের ব্রত গ্রহণ

করলাম। যে ক'টা দিন বাঁচি, কাটাবো প্রভু রামজীর ধ্যানে। আমি যদি সত্যকার সতী হই, আপনাকে আমায় উদ্ধার করতে আবার আসতেই হবে।"

রামদাস স্বামী অতঃপর কার্যান্তরে চলিয়া যান। কিন্তু ভানুমতী পাটেলের স্ত্রীর সংকল্প আবার তাঁহাকে এ গ্রামে টানিয়া আনে। একমাস পরে এখানে আসিয়া পাটেল ও তাহার স্ত্রীকে তিনি দীক্ষা দান করেন।

নিজের এক জন্মদিনে শিবাজী মহারাজ ছাফল মঠে রামদাসজীর আশীর্বাদ নিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে আনিয়াছেন গুরুর জন্য কয়েকটি মূল্যবান আঙরাখা ও শাল।

প্রণাম ও কুশল প্রশ্নের পর উভয়ে নানা কথাবার্তা বলিতেছেন। বিশিষ্ট ভক্ত ও শিষ্যেরা আশেপাশে দণ্ডায়মান। হঠাৎ শিবাজী লক্ষ্য করিলেন গুরুদেবের গায়ের উত্তরীয় কৌপীন সব একেবারে ভেজা। মনে হয়, এইমাত্র তিনি যেন নদীতে স্নান সমাপন করিয়া আসিয়াছেন। সেবকেরা সবাই বিস্ময়ে হতবাক্। স্বামীজী তো স্নান তর্পণ সূর্যোদয়ের অনেক পূর্বেই সারিয়াছেন, তারপর পরিধান করিয়াছেন তাহাদের দেওয়া শুষ্ক আঙরাখা ও কৌপীন। এমনভাবে কি করিয়া হঠাৎ তাহা জলসিক্ত হইল?

কৌতূহলী হইয়া শিবাজী প্রশ্ন করিলেন, "প্রভু, বলুন তো কি এর রহস্য? নদীর জল এলো কোথা থেকে, কি করেই বা আপনার শুষ্কবস্ত্র ভিজিয়ে দিল?"

"না, মহারাজ নদীর জল নয়। এ সব ভিজেছে সমুদ্রের জলে। এই দ্যাখো।" মুচকি হাসি হাসিয়া রামদাসজী মহারাজের অঞ্জলিতে ঢালিয়া দিলেন উত্তরীয় নিংড়ানো কিছুটা জল।

এ জল মুখে দিতেই শিবাজী চমকিয়া উঠিলেন। তাই তো, এ যে ঘোর লবণাক্ত, নদীর জল তো নয়—সমুদ্রের জলই বটে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গুরুর দিকে তাকাইতেই তিনি কহিলেন, "মহারাজ, আজকের তারিখটা তুমি বিশেষভাবে মনে ক'রে রেখো। ঠিক পনের দিন পরে এই সাগরজলের রহস্য উন্মোচিত হবে। তখন আশ্রমে এলে সব টের পাবে।'

নির্ধারিত দিনে শিবাজী আবার ছাফলে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলেন, একটি ধনী বণিক স্বামীজীর সহিত নিভৃতে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন। শিবাজীকে দেখাইয়া গুরু স্নেহভরে তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন। সহাস্যে কহিলেন, "মহারাজ, সেদিনকার সাগরজলের রহস্য, আজ বুঝা গেল। ইনি হচ্ছেন রাজাপুরের মুৎসুদ্দী আমার একজন আশ্রিত শিষ্য। এঁর মুখেই শোন সব কথা।"

মুৎসুদ্দী এতক্ষণ স্বামীজীকে যে কাহিনী বলিতেছিলেন, শিবাজীর কাছে কহিলেন তাহারই পুনরাবৃত্তি। মারাঠার উপকূল-বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান বণিক এই মুৎসুদ্দী। পনের দিন আগে জাহাজভর্তি মালপত্র নিয়া তিনি সমুদ্রপথে চলিতেছিলেন, হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়িয়া জাহাজটি জলমগ্ন হইতে থাকে। মুৎসুদ্দী এই সময়ে গুরুদেব রামদাসজীর কথা স্মরণ করিয়া প্রাণপণ চিৎকারে তাঁহাকে ডাকিতে থাকেন, ধনপ্রাণ রক্ষার প্রার্থনা জানান। এই সময় জাহাজের খোলের উপর জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হন সমর্থ রামদাস স্বামী। বরাভয় দানে আশ্বস্ত করেন আশ্রিত শিষ্যকে।

ক্ষণকাল পরেই ঝড়ের তাণ্ডব হ্রাস পায়, সমুদ্র শান্ত হইয়া আসে। মুঞ্জের দৃঢ় বিশ্বাস গুরুমহারাজের করুণাবলেই এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছেন, জাহাজটিও রক্ষা পাইয়াছে ভরা-ডুবি হইতে। বন্দরে বন্দরে মাল পৌঁছাইয়া দিয়া মাত্র গতকালই মুঞ্জে দেশে ফিরিয়াছেন। আজ আসিয়াছেন স্বামীজীর চরণ দর্শনে।

শিবাজী প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, পক্ষকাল আগে যে তারিখে ও যে সময়ে স্বামী রামদাসজীর বসন তিনি সিক্ত দেখিয়াছেন, ঠিক সেই সময়েই বণিকের জাহাজটি ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সাগরে বিপন্ন হইয়া পড়ে।

শিবাজীর জীবনে এখন একটানা সাফল্যের কাল। দুর্গের পর দুর্গ মুঘলের হাত হইতে তিনি ছিনাইয়া নিতেছেন, রাজ্যের পরিধি হইতেছে বিস্তৃততর। সেনাবল ও অর্থবলও বিপুল। প্রবীণ নৃপতি শিবাজীকে কিন্তু এই জাগতিক সমৃদ্ধি বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। বরং ধর্মরাজ্যের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে তিনি আরো তৎপর হইয়াছেন, গুরু রামদাস স্বামীর পরমাশ্রয় আঁকড়াইয়া ধরিতেছেন আরো দৃঢ় হস্তে। স্বামীজীও বিশ্বাস করেন, যে ঐশ কার্যের ভার তিনি নিয়াছেন তাহার প্রধান সহায় হইতেছেন শিবাজী। তাই শিবাজীর জীবনকে অধ্যাত্মরসে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে তাহার প্রয়াসের অন্ত নাই। বিপুল আশা নিয়া, সদা সতর্ক দৃষ্টিতে এই রাজ-শিষ্যের দিকে দিনের পর দিন তিনি চাহিয়া আছেন।

সে-বার পদব্রজে ঘুরিতে ঘুরিতে রামদাস স্বামী সাতারায় আসিয়াছেন। শিবাজী রাজধানীর দুর্গেই অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু গুরুজীর আগমন সংবাদ তখনো পান নাই। রামদাসজী স্থির করিয়াছেন, অপর শিষ্যদের সহিত কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া তারপর দর্শন দিবেন শিবাজী মহারাজকে।

পদব্রজে পরিব্রাজন আর মাধুকরী, দুইটিই স্বামী রামদাসের পরম প্রিয়। সাতারায় আসিয়া প্রতিদিনই তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেন।

শিবাজী সেদিন দুর্গের বারন্দাবারীতে বসিয়া অনুচরদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছেন, হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল সন্নিহিত মহল্লার এক কুটির দ্বারে। দেখিলেন, গুরুজী রামদাস স্বামী ভিক্ষাপাত্র হাতে সেখানে দণ্ডায়মান।

মুহূর্তে চিন্তার ঝলক খেলিয়া যায় তাঁহার মনে, একি অদ্ভুত কাণ্ড! রাজ্যের অধীশ্বর যাঁর পদানত যাঁর বিশ্বস্ত সেবক, সেই রাজগুরু মহাসমর্থ রামদাস স্বামী রাজ্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরিবেন দীন কাঙালের বেশে, ভিক্ষান্নে করিবেন জীবনধারণ? না-না, শিবাজী কিছুতেই তা আর চলিতে দিবেন না।[১]

বিশ্বস্ত অনুচর বালাজীকে ডাকিয়া তখনি তাঁহার হাতে এক পত্র দিলেন। কহিলেন, "গুরুজী ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বেরিয়েছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন দুর্গদ্বারে। তুমি আমার এই পত্র তাঁর চরণতলে রেখে দিও।"

দুর্গ তোরণে দাঁড়ানো মাত্র শিবাজীর পত্র রামদাসজীকে দেওয়া হইল। কৌতূহল-ভরে তিনি এটি পাঠ করিলেন। মহারাজ শিবাজী লিখিয়াছেন—"প্রভু, আপনার এই

১ স্যার যদুনাথ: শিবাজী অ্যান্ড হিজ টাইমস্, অ্যাকওয়ার্থ: মারাঠী ব্যালাড্স্: ভূমিকা: রবীন্দ্রকাব্যেও ঘটনাটি অমর হইয়া আছে।

ভিক্ষাবৃত্তির দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। এই সমগ্র রাজ্য, আর আমার যা কিছু ব্যক্তিগত বিত্তবিভব আছে সবই আমি আপনার চরণে উৎসর্গ করলাম। আপনি কৃপা ক'রে এসব গ্রহণ করুন, ক্ষান্ত হোন ভিক্ষাবৃত্তিতে।"

মৃদু হাস্যে পত্রটি হাতে নিয়া রামদাস সেদিন সেখান হইতে চলিয়া যান। পরের দিনই সাক্ষাৎ করেন শিবাজীর সঙ্গে। বলেন, "মহারাজ, তোমার সবই তো দান করেছো আমায়, তোমার নিজের বলতে আর তো কিছু অবশিষ্ট নেই। এবার তবে আমার সঙ্গে দুর্গের বাইরে এসে দাঁড়াও। আমার প্রকৃত চেলা হয়ে আমার সঙ্গে শুরু করো মাধুকরী।"

সানন্দে ভিক্ষাঝুলি কাঁধে নিয়া শিবাজী গুরুর অনুসরণ করেন, দ্বারে দ্বারে মাগিয়া ফিরেন। ভিক্ষুকের বেশে শিবাজী মহারাজ উপস্থিত। ঘরে ঘরে মহা সোরগোল পড়িয়া যায়, সসঙ্কোচে, কম্পিত হস্তে রাজভিখারীকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া গৃহস্থেরা সরিয়া দাঁড়ায়।

দিন শেষে রাজধানীর উপান্তে এক অরণ্যে বসিয়া গুরু শিষ্য উভয়ে ভিক্ষান্ন ভোজন করিলেন। প্রসন্ন হাসি হাসিয়া রামদাস এবার কহিলেন, "বৎস শিবাজী, পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছো। তোমার রাজ্য ও রাজৈশ্বর্য আমায় দান ক'রে তুমি ভিক্ষুক হয়েছিলে। আজ সব কিছু আবার আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম। তুমি আবার রাজসিংহাসনে বসবে বটে, কিন্তু চিরদিনই রবে আমারই প্রতিনিধি রূপে। আমার গেরুয়া গাত্রবাস তোমায় দান করছি, বৈরাগীর এই উত্তরীয়ই হবে তোমার রাষ্ট্র-পতাকা।"

এই গেরুয়া পতাকা বা ভগোয়া ঝাণ্ডা মহারাজা শিবাজীর রাজ্যে যতদিন উড্ডীয়মান ছিল, ভারতবাসীর হৃদয়পটে ততদিন ত্যাগবৈরাগ্যের পরম আদর্শ ছিল দীপ্যমান। আজো সে আদর্শের কথা এদেশ বিস্মৃত হয় নাই।

একদল ভক্ত ও শিষ্য নিয়া রামদাসজী একদিন দূরে গ্রামের এক মঠে যাইতেছেন। দীর্ঘ দুর্গম পথ। চলিতে চলিতে সঙ্গীরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সম্মুখেই একটি ভুট্টার ক্ষেত। ভক্তেরা নিবেদন করে, "প্রভু, এখানে তো কাছাকাছি কোনো লোকালয় দেখছিনে। আমরা সবাই শ্রান্ত অবসন্ন। ক্ষুধার জ্বালায় পথ চলা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা বলছি কি, ক্ষেত থেকে কিছু ভুট্টা তুলে আমরা প্রাণ বাঁচাই, তারপর অন্য সময়ে ক্ষেতের মালিককে এর দাম দিয়ে দিলেই হবে।'

শিষ্যদের দুর্দশা দেখিয়া স্বামীজী এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। প্রয়োজনীয় ভুট্টা সংগৃহীত হইল, সামনের এক বটগাছের নিচে আগুন জ্বলাইয়া, দগ্ধ ভুট্টা ভোজনের পর সকলে সুস্থ হইলেন।

এমন সময়ে যমদূতের মতো গ্রামের পাটেল সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভুট্টার ক্ষেতটি তাহারই। সাধুদের কাণ্ড দেখিয়া সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। অবধ্য ভাষায় দলের নেতা রামদাসজীকে গালিগালাজ করিতে থাকে। ভুট্টার কয়েকটি অবশিষ্ট ডাঁটা সম্মুখে পড়িয়াছিল, সেগুলি উঠাইয়া নিয়া পাটেল সজোরে রামদাসজীকে আঘাত করিতে থাকে। স্বামীজীর দেহের নানা স্থানে কাটিয়া যায়, রক্ত ঝরিতে থাকে।

আঘাতকারীকে কোনো প্রকার বাধা না দিয়ে স্বামী রামদাস প্রশান্ত বদনে রহেন দণ্ডায়মান।

স্বামীজীর এই সমদর্শিতা ও নির্বিকার ভাব ভক্ত-শিষ্যদের থাকিবে কেন ? তাহারা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে, সবাই মিলিয়া পাটেলকে জাপটাইয়া ধরে, মুষ্ট্যাঘাতে করে তাহাকে ধরাশায়ী।

রামদাসজীকে এবার উত্তেজিত হইতে দেখা যায়। শিষ্যদের হটাইয়া দিয়া পাটেলকে তিনি মুক্ত করেন, তিরস্কারের সুরে কহেন, "এ তোমাদের অন্যায়। ভূট্টার ক্ষেতের মালিক এই পাটেল। তার ভুট্টা খেয়ে, আবার তাকেই ধরে মারবে এ কেমন কথা ? না একে তোমরা কিছু ব'লো না, অপরাধ তো বরং আমাদেরই। পরদ্রব্য না বলে আমরা নিয়েছি।"

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে শিবাজী মহারাজ একদিন গুরুর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। কৌপীনবন্ত রামদাসজী খালি গায়ে নিজ আসনে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপে রত, হঠাৎ তাঁহার দেহের কাঁচা ঘায়ের দিকে শিবাজীর দৃষ্টি পড়িল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু স্বামীজী একেবারে নিরুত্তর।

পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক সেবক কিন্তু মূল কথাটা ফাঁস করিয়া দেয়। ভুট্টা ক্ষেতের মালিক পাটেলের মারধোরের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে।

আনুপূর্বিক সব শুনিয়া শিবাজী তো মহারুষ্ট। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "রাজগুরুর প্রতি এই অত্যাচার। আচ্ছা, এখনি এই পাটেলের সমুচিত দণ্ডবিধান আমি করছি।"

স্বামী রামদাস সহাস্যে বলেন, "বৎস, মনে রেখো, তুমি রাজসিংহাসনে বসলেও আসলে তুমি হচ্ছো ধর্মের প্রতিনিধি, ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর প্রতিনিধি। এ স্থলে অপরাধ হয়েছে আমাদেরই, পাটেলের নয়। ভক্তেরা ভুট্টা খাবার প্রস্তাব করার সময় আমি ভেবেছিলাম, পরে এসে ক্ষেতের মালিককে এর মূল্য দিয়ে যাবো। তুমি বরং আমায় হয়ে তাই দাও এই পাটেলকে। তাকে কয়েক বিঘা জমি তুমি পুরস্কারস্বরূপ দান করো, তবেই আমি লাভ করবো অপার সন্তোষ।"

বলা বাহুল্য, গুরুর এই নির্দেশ প্রতিপালিত হইতে সেদিন বিলম্ব হয় নাই।

গুরুর প্রতি শিবাজীর আত্মসমর্পণ ও ভক্তিপ্রেমের তথ্য গবেষকেরা কতকগুলি চিঠিপত্র হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। রাজা শিবাজীর একটি পত্রের অনুবাদ নিম্নরূপ :

শ্রীস্বামীজী মহারাজ ! মহত্তম গুরো !

আমি শিবাজী হচ্ছি আপনার শ্রীচরণের ধূলি। শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন ক'রে জানাচ্ছি আমার এই আবেদন। হে পরমপূজ্য, আপনি আমায় দীক্ষা দান ক'রে ঢেলে দিয়েছেন কল্যাণবহ আশীর্বাদ। একটি স্বাধীন রাজ্যগঠন, ধর্ম সংস্থাপন, দেবদ্বিজের আরাধনা, জনগণের রক্ষণ ও দুঃখ দূরীকরণ - এইসব মহৎ কার্য সাধনের নির্দেশ আপনি আমায় দিয়েছিলেন। তাছাড়া পরম বস্তুর অন্বেষণেও আপনি আমায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, আর আশ্বাস দিয়েছিলেন—আমার সকল কিছু প্রচেষ্টা সফল হয়ে উঠবে প্রভু শ্রীরামজীর কৃপায়। তদনুসারে আমিও এগিয়ে চলেছি আমার কর্মসূচী নিয়ে। সফল হয়েছি দুষ্ট মুসলমান শক্তির দমনে, বিপুল ধনরত্ন

এসেছে আমার অধিকারে, নির্মাণ করেছি দুর্জয় দুর্গসমূহ। এ সবই, প্রভু সম্ভব হয়েছে আপনার আশীর্বাদের বলে।

—বোধ হয় আপনার মনে আছে, একদিন আমি আপনার চরণে সঁপে দিয়েছিলাম আমার সমগ্র রাজ্য ও বৈভব। বলেছিলাম—আমি আপনার সেবায় নিজেকে করবো উৎসর্গ। আপনি তখন উত্তরে বলেছিলেন, আমি যদি আমার রাজকর্তব্য নিষ্ঠাভরে পালন ক'রে যাই, তবে তাই গণ্য হবে আপনার শ্রেষ্ঠ সেবাকার্যরূপে।

—আর এক প্রার্থনা ছিল, শ্রীরামজীর মন্দির যেন আমার কাছাকাছি কোথাও নির্মিত হয়, তাহলে আমরা পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারবো, আর রামদাসী সম্প্রদায়ও ছড়িয়ে পড়তে পারবে দিকে দিকে। হে আমার পরমপূজ্য, আপনি আমার সে প্রার্থনা শুনেছিলেন। আমার নিকটবর্তী পর্বতগুহায় এসে আপনি বাস করতে থাকেন, ছাফল-এ প্রভু রামজীর মন্দিরও নির্মিত হয়, এরপর সম্প্রদায়ের ভক্ত শিষ্যদের প্রভাবও বেড়ে চলে দিনের পর দিন। তাছাড়া, আরো একটা আন্তরিক অনুরোধ আমার ছিল। আমার আরো আবেদন ছিল, শ্রীরামজীর পূজায়, উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহে, ছাফল মন্দিরের নির্মাণকাজে এবং অন্যান্য স্থানের মূর্তির সেবায় আমি যেন কিছু পরিমাণ জমি দান করতে পারি। তার উত্তরে আপনি আমাকে জানিয়েছিলেন - এজন্য আমি যেন চিন্তিত না হই, যেসব জমি আমি এ উদ্দেশ্যে দান করা প্রয়োজন মনে করি তা যেন দিই, এবং সম্প্রদায়, রাজ্য এবং জাতির কল্যাণে যেন আত্মনিয়োগ করি। তারপর আমি আমার রাজকীয় নির্দেশনামা প্রদান করি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সরকার হইতে জমি অর্পণের ব্যবস্থা করা হয়। ছাফলের চারপাশে যে ১২১টি গ্রাম রয়েছে, তাদের প্রত্যেকটি থেকে ১১ বিঘা জমি দান করার নির্দেশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গিয়েছে।[1]

অভিষেকের পর হইতেই শিবাজীর জীবনে অধ্যাত্ম-তৃষ্ণা বাড়িয়া উঠিতে থাকে, স্বামী রামদাসের উপরও আসে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভরতা। যে কোনো প্রশ্ন, তাহা সাধনতত্ত্ব সম্পর্কেই হোক, সামাজিক বা রাজনীতি সম্পর্কেই হোক, গুরুকে দিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া না নিলে শিবাজীর চলে না। তাছাড়া, এখন হইতে গুরুর সঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের জন্যও তাঁহার মন বড় বেশী ব্যাকুল হইয়া উঠে।

কিন্তু রামদাসকে কোনো একটি বিশেষ স্থানে ধরিয়া রাখিবার যো নাই। তীর্থে তীর্থে মঠে মঠে স্বেচ্ছামতো ঘুরিয়া বেড়ান।

পরলী দুর্গটি শিবাজীর অধিকারে আসার পর তিনি স্থির করেন গুরুর জন্য এখানে একটি স্থায়ী সুন্দর আবাস নির্মাণ করিয়া দিবেন। অনেক অনুনয় করিয়া রামদাসজীকে রাজী করানো হয়। শিবাজীর নির্দেশমতো দুর্গ-শীর্ষে রামদাসজীর এই নূতন ভবনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে সাধু-সন্ন্যাসীদের একটি মঠ এবং উপনিবেশ। সাধু-সজ্জনের আবাসভূমি—তাই ইহার নাম দেওয়া হয় সজ্জনগড়। দুর্গের চারিদিকের গ্রামগুলির আয় শিবাজী দান করেন এই সাধু-উপনিবেশের জন্য। রামদাসজীর প্রবর্তিত বড় বড় ধর্ম-উৎসবগুলি সাড়ম্বরে এখানে পালন করা হইত এবং সে ব্যয়ও নির্বাহ হইত সরকারের প্রদত্ত নজরানা হইতে।

১ উইলবার এস্ ডেমিং : রামদাস, পৃঃ ৬১

সজ্জনগড় সাতাবা হইতে বেশী দূবে নয়। শিবাজীব প্রিয় দুর্গ বায়গডও খুব কাছাকাছি। শিবাজী প্রায়ই বাযগডে যাইতেন এবং নিকটবর্তী গুবুস্থান সজ্জনগড ছিল তাঁহাব এক বড আকর্ষণ। অবসব পাইলে সেখানে গুবুজীব সমীপে গিয়া উপস্থিত হইতেন, গ্রহণ কবিতেন সাধনভজন ও বাজকার্যেব নানা গুবুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

অনেকেব ধাবণা, বামদাস স্বামী তাঁহাব শিষ্য শিবাজীব বাজনৈতিক জীবন ও বাষ্ট্রচিন্তাব নিযামক ছিলেন, এবং ইহাই স্বামীজীব বড় পবিচয। কিন্তু এ ধাবণা একেবাবেই যুক্তিসহ নয। শিবাজী বামদাসজীব আশ্রযে আসেন জীবনেব শেষপাদে। ধর্মধৃত বাজ্যেব যে সংকল্প তাঁহাব মনে ছিল, বামদাসজীব শিষ্যত্ব গ্রহণেব পব সে সংকল্প আবো দৃঢ হইযা উঠে। প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধপুবুষ বামদাসজী ছিলেন বাজা শিবাজীর অধ্যাত্মজীবনেব আলোকদিশাবী এবং তাঁহাব সাধন জীবনেবই নিযন্তা। উত্তব জীবনে শিবাজীব মুমুক্ষা তীব্রতব হইযা উঠে এবং গুবুব চবণে পূর্ণবূপে কবেন তিনি আত্মসমর্পণ।

এ সম্পর্কে বামদাস স্বামীব জীবনীকাব ডেমিং যাহা বলিতেছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহাব মতে, "শিবাজীব উপব বামদাসেব আধ্যাত্মিক প্রভাবই ছিল মুখ্য, বাজনৈতিক প্রভাব গৌণ। তথ্য প্রমাণ হইতে পবিষ্কাবভাবে দেখা যায, শিবাজীব বাজনৈতিক ও সামবিক জীবনে বামদাস খুব একটা গুবুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কবেন নাই। কাজেই বামদাসেব বাজনৈতিক প্রভাবকে বড় কবিযা তোলাটা শুধু যে ঐতিহাসিক তথ্যদ্বাবা অসমর্থিত তা-ই নয, ইহা দ্বাবা মহাবাজ শিবাজী এবং স্বামী বামদাস উভযকেই খাটো কবা হয। ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনাব ক্ষেত্রে স্বামীজী ছিলেন সর্বময প্রভু, এবং ইতিহাস নিশ্চযই তাঁহাব এই প্রভুত্বকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য থাকিবে। কাবণ ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনা সম্পর্কে তাঁহাব জ্ঞান ছিল সুগভীব এবং সেখানকাব সমস্যাব সমাধানে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায দক্ষ। প্রধানত ধর্মগুবুবূপে স্বীকৃতি না দিযা তাঁহাকে যদি বাজনৈতিক গুবু বলিযা আমবা প্রচাব কবি তবে তাঁহাব প্রকৃত স্ববূপ নির্ণযে ভুল কবিব। একথা সত্য যে জীবনেব শেষ ভাগে প্রিয শিষ্য ও আদর্শবাদী বাজা শিবাজীব কাজকর্মেব ধাবা দেখিয়া তিনি পবিতুষ্ট হন এবং বাষ্ট্রীয ব্যাপাবে প্রযোজন মতো মাঝে মাঝে নির্দেশও তিনি দিতেন। তাঁহাব ধর্মগ্রন্থ দাসবোধেব শেষ অংশে সামাজিক ও বাজনৈতিক উপদেশ কিছুটা বহিযাছে। শিবাজী মহাবাজ শেষজীবনে গুবুজীব কাছে আসিযা বাষ্ট্রীয চিন্তা ও কাজকর্ম সম্বন্ধেও তাঁহাব মতামত জানিযা নিতেন, কাবণ স্বামীজীব জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাব উপব তাঁহাব গভীব শ্রদ্ধা ছিল। এই দিক দিযা দেখিতে গেলে স্বামী বামদাস ভক্ত-তুকাবাম বা অন্যান্য বৈষ্ণব সাধক হইতে ভিন্ন ধবনেব ছিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও স্বীকাব কবিতে হইবে যে বাষ্ট্রীয কর্ম, সম্প্রদাযেব সংগঠন-কর্ম প্রভৃতি ব্যবহাবিক ক্ষেত্রেব গুবুত্ব স্বীকাব কবিলেও স্বামী বামদাস মুখ্যত ছিলেন একজন সিদ্ধসাধক ও জনকল্যাণকব অধ্যাত্ম-আন্দোলনেব নেতা।"[১]

সজ্জনগডেব পবিবেশ ছিল বড় পবিত্র, বড বমণীয। চাবিদিকে শস্যশ্যামল উপত্যকা বিস্তাবিত। নদী নালাব বঙ্কিম বেখায বেখায প্রকৃতি যেন ক্ষীণ-শুভ্র আলপনা

---

১ উইলবাব এস্ ডেমিং: বামদাস, পৃঃ ৭১-৭২

আঁকিয়া রাখিয়াছে পরম প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায়। ঊর্ধ্বাকাশের মহাবিস্তারে তাকাইলেই প্রাণমন মুহূর্তে কোথায় যেন উধাও হইয়া যায়। এই অনুকূল পরিবেশে আসিয়া রামদাস ধ্যান-ভজনে বিভোর হইয়া পড়েন, পাহাড়ের চূড়ায় ঘনিষ্ঠ ভক্তশিষ্যদের নিয়া বাস করিতে থাকেন।

মঠ এবং মণ্ডলীর সংখ্যা ও পরিধি বাড়িয়াছে, কাজও অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু স্বামী রামদাসের জীবনেও আসিয়াছে প্রচুর অবসর। বিশ্বস্ত, কর্মকুশল ও ত্যাগব্রতী শিষ্যেরা মঠ-মন্দিরগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতেছেন, তদুপরি রাজশিষ্য শিবাজীর জনবল ও কোষাগার সতত রহিয়াছে গুরুর সেবায় নিয়োজিত। প্রয়োজনবোধে মঠের মোহন্তেরা শিবাজী ও তাঁহার উচ্চকর্মচারীরা, সজ্জনগড়ের শীর্ষে ছুটিয়া আসেন, স্বামী রামদাসের নির্দেশে ও আদেশে হয় তাঁহাদের নানা সমস্যার সমাধান।

স্বামীজীর সজ্জনগড়ের এই পরিবেশটি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই নেপথ্যের মহানাট্যকার তাঁহার জীবনলীলাকে ঠেলিয়া দেন শেষ অঙ্কের দিকে।

১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে শিবাজী একবার গুরুর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। নানা প্রসঙ্গের পর গুরু রহস্যময় হাসি হাসিয়া কহেন, "মহারাজ, মাটির মানুষ আমি, রঘুনাথজীর এক দীন সেবক। তাকে তুমি পাহাড়ের শীর্ষে আকাশে তুলে এনে রেখেছো। আকাশ হাতছানি দিচ্ছে বার বার। মহারাজ, স্পষ্টই বুঝতে পারছি, মরজীবনে ছেদ পড়তে বেশী বাকী নেই।"

"তা কি ক'রে হয় গুরুদেব? লক্ষ লক্ষ লোক যে আপনার মুখ চেয়ে আছে, আপনার অভয় বাণী শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। এত তাড়াতাড়ি আপনার চলে যাওয়া কি ক'রে হয়? তাছাড়া, ধর্মরাজ্য স্থাপনের অনেক কিছুই যে এখনো বাকী।"—যুক্তকরে নিবেদন করেন শিবাজী।

"মহাকালের বুকে আমরা বুদ্বুদ্ মাত্র, আমরা শুধু একটা ক্ষীণতম ক্ষীণ স্পন্দন তুলতে পারি। যা করবার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রই করবেন। তবে তাঁর ভক্ত ও অনুচর হিসেবে আমায় তোমায় তাঁর পুনরাবির্ভাবের পটভূমি কিছুটা রচনা করতে হবে। তাঁর আসন পাততে হবে। ধর্মরাজ্যের আদর্শ আমরা তুলে ধরলাম, বীজ ছড়িয়ে গেলাম—এই তো ছিল আমাদের কর্তব্য।'

নতশিরে মহারাজ শিবাজী গুরুর চরণসমীপে বসিয়া আছেন। মুখে একটি শব্দ নাই।

গুরু আবার কহিলেন, "বৎস, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তোমার শরীর দুর্বল হয়েছে, অপটু হয়েও পড়েছে। খুব সাবধানে থেকো। রায়গড়ে গিয়ে তুমি পূর্ণ বিশ্রাম করো।"

শিবাজী রায়গড়ে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু উপর্যুপরি কয়েকটি সামরিক অভিযান চালানোর ফলে স্বাস্থ্য তাঁহার একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আর তাহা জোড়া লাগে নাই।

১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল শিবাজী মহারাজ চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বামী রামদাসের দক্ষিণবাহুটি এবার যেন ভাঙিয়া পড়িল, ধর্মরাজ্যের স্থাপনা ছিল রামদাসজীর কাছে এক মহান্ ঐশ ব্রত। আদর্শবাদী পরমধার্মিক মহারাজ শিবাজীর

আনুগত্য ও সেবা ছিল তাঁহার এই কর্মের বড় সহায়। বিধির বিধানে আজ তাহা অন্তর্হিত হইল।

রামদাস-শিষ্য শিবাজীর প্রকৃত মূল্যায়ন বিদেশী ঐতিহাসিকেরা করিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে এ দেশের মনীষী গবেষকেরা তাঁহার আত্মিক জীবন ও ধর্মীয় জীবনের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায়ও মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে শিবাজীর ধর্মধৃত জীবনের পরম বৈশিষ্ট্য। একাধারে বিপুল আশা, আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি বিশ্বকবির অমর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে

সেদিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন
দারিদ্র্যের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।

এবার পরপারের ডাক আসিয়া গিয়াছে সমর্থ রামদাসস্বামীর অন্তরসত্তায়। প্রাণ-প্রভু রামজীর চরণকমলে নিজেকে এবার তিনি বিলীন করিতে চান। দিনরাতের অধিকাংশ সময় তাঁহার অতিবাহিত হয় ইষ্টধ্যানে। ধ্যানতন্ময়তা ভাঙাইয়া সেবকেরা মাঝে মাঝে চেষ্টা করেন খাওয়ানোর জন্য, কিন্তু প্রায়ই তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। উপবাসে তনু দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে।

বিশিষ্ট শিষ্য কল্যাণ ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। কয়েকটি নিগূঢ় নির্দেশ নিয়া গুরু মহারাজের আদেশে ফিরিয়া গেলেন আপন কর্মকেন্দ্রে। অন্যান্য মঠ-মন্দিরের পরিচালক ও ভক্ত-শিষ্যেরা শেষবারের মতো স্বামীজীকে দর্শন করিয়া গেলেন।

প্রধান শিষ্য উদ্ধব ও ভক্তিমতী আক্কাবাঈ গুরুজীর শয্যাপার্শ্বে সদা উপস্থিত। প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়া চলিয়াছেন, শঙ্কাকুল চিত্তে অপেক্ষা করিয়া আছেন বিচ্ছেদের মর্মন্তুদ মুহূর্তটির জন্য।

কয়েকদিন আগে স্বামীজী তাঁহার অন্তরের অভিলাষ অনুযায়ী রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও মারুতিজীর নূতন নূতন নয়নলোভন বিগ্রহ গড়াইয়া আনিয়াছেন। এই বিগ্রহ-গুলি এবার তাঁহার শয়নঘরে স্থাপন করিতে বলিলেন। বহুক্ষণ ইঁহাদের সম্মুখে রহিলেন ধ্যানাবিষ্ট।

শয়নগৃহে তখন উপস্থিত একনিষ্ঠ সেবিকা আক্কাবাঈ আর প্রিয় শিষ্য উদ্ধব। ধ্যান হইতে ব্যুত্থিত হইয়া আক্কাবাঈ-এর হাত হইতে গুরু গ্রহণ করিলেন একপাত্র চিনির শরবত। তারপর প্রসন্নমধুর হাস্যে কহিলেন, "বৎসে, এবার তবে তোমরা আমায় বিদায় দাও।"

কান্নায় ভাঙিয়া পড়িলেন আক্কাবাঈ। সান্ত্বনা দিয়া গুরুজী কহিলেন, "চির

আনন্দধামে যাচ্ছি, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীরামজীর লীলা নিকেতনে আমি রওনা হচ্ছি। পরম মধুর মিলন ক্ষণে এই কান্না কেন ?”

“প্রভু, নরদেহ ছেড়ে যাচ্ছেন, আর তো শুনতে পাবো না আপনার অমৃতবাণী, আর পাবো না আপনার পরম আশ্রয়।”

“এতদিন কি আমার কাছে থেকে তোমরা শুধু এই শিখলে ? প্রপঞ্চস্বরূপ এ দেহ একদিন তো ত্যাগ করতেই হবে। প্রাণপ্রভুর নির্দেশ এসেছে, সানন্দে তাই আমি চলে যাচ্ছি। ভয় কেন গো, তোমাদের ? এ মুখের কথা নাই বা শুনলে, কিন্তু 'দাসবোধ' তো আছে। তাই রইল আমার মর্মকথা রূপে। 'দাসবোধ' তোমরা সবাই নিত্যপাঠ করবে, থাকবে রামজীর নিত্যদাস হবে।”

ইষ্টবিগ্রহের দিকে প্রেমাপ্লুত নয়নে তাকাইয়া রামদাস স্বামী মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, “হর হর—রাম রাম, জয় সমর্থ রঘুবীর।” তারপর সিদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মহাপুরুষের প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র পথ দিয়া করিল উৎক্রমণ।

১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দের এই মহাপ্রয়াণের দিনে সারা মারাঠার ভক্তসমাজে পতিত হয় গভীর শোকের ছায়া। রামদাসী সম্প্রদায়ের শত শত লোক সাশ্রুনয়নে আসিয়া উপস্থিত হয়। উদ্ধব গোসাবী ও অন্যান্য প্রধান শিষ্য ও মোহান্তেরা ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে গুরুর শেষকৃত্যের আয়োজন সম্পূর্ণ করেন। পবিত্র তুলসীতরু জ্বালাইয়া রামদাস স্বামীর নরদেহ করা হয় ভস্মীভূত।

প্রভু রঘুবীরজীর নিত্যদাস—সমর্থ রামদাস ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্মরাজ্যের রামরাজ্যের, ধ্যানকল্পনার বীজ ছড়াইয়া দিয়া গেলেন সারা ভারতের আকাশে বাতাসে।

একনাথ স্বামী

মারাঠার ভক্তি আন্দোলনের আদি ও প্রধান উৎস পন্ধারপুর। এখানকার জাগ্রত বিগ্রহ বিঠ্‌ঠলজীকে কেন্দ্র করিয়া ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে প্রেমভক্তির যে প্লাবন উৎসারিত হয় তাহার নায়ক ছিলেন জ্ঞানদেব ও নামদেব। এই দুই মহাত্মার প্রয়াণের পর ভক্তি আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হইয়া আসে, সমাজজীবনে দেখা যায় অনাচার, বিশৃঙ্খলা ও ধর্ম বিমুখতা। এই অবনতি ও অবক্ষয়ের দিনে, জ্ঞানদেব ও নামদেবের প্রায় দুইশত বৎসর ব্যবধানে, আবির্ভূত হন একনাথ স্বামী। মারাঠার বৈষ্ণব আন্দোলনে তিনি সঞ্চারিত করেন নূতন প্রাণপ্রবাহ, ভক্তি ও প্রপত্তির পরম পাথেয় পৌঁছাইয়া দেন সমাজের উচ্চনীচ ধনী নির্ধন সকল মানুষের অঙ্গনে।

পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় পাদের কথা। এসময়ে পৈঠান বা প্রতিষ্ঠানপুরে অভ্যুদয় ঘটে সাধকপ্রবর ভানুদাসের। একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া এ অঞ্চলের সর্বত্র তিনি পরিচিত ছিলেন। পন্ধারপুরের বিঠ্‌ঠলজী বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও তাঁহার সেবা পূজার প্রবর্তন করিয়াও ভানুদাস প্রসিদ্ধ হন। মুসলমান রাজাদের অত্যাচারে পন্ধারপুরের মন্দির দুইবার বিধ্বস্ত হয়। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায় তাই বিঠ্‌ঠলজী বিগ্রহের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তৎপর হইয়া উঠেন এবং নিজের রাজধানী হাম্পি নগরে এক নূতন মন্দিরে করেন ইহাকে সংস্থাপিত। রাজনৈতিক অশান্তি ও উপদ্রব অতঃপর কমিয়া যায় এবং পন্ধারপুরের ভক্তসাধক ভানুদাসের নেতৃত্বে বিঠ্‌ঠলজীকে দেশে ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা হয়। কথিত আছে, সাধক ভানুদাসই বিজয়নগর হইতে এই শ্রীমূর্তি বহন করিয়া আনেন এবং প্রবর্তন করেন সেবা পূজার নবপর্যায়ের ব্যবস্থা।

এই ভানুদাসেরই বংশে তাঁহার প্রপৌত্ররূপে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন সার্থকনামা ভক্তসাধক একনাথ।

একনাথের পিতার নাম সূর্যনারায়ণ, মাতা রুক্মিণী বাঈ। একনাথ যখন ছোট শিশু, তখন তাঁহার পিতা মাতা উভয়েরই প্রাণবিয়োগ ঘটে। অতঃপর পিতামহ ও পিতামহীর যত্নে সে পালিত হইতে থাকে।

অত্যন্ত শুভ সংস্কার নিয়া জন্মিয়াছে, তাই বালককাল হইতেই একনাথের জীবনে প্রকাশ পায় ভগবদ্-ভক্তি। খেলাধুলায় কোনো উৎসাহ নাই, স্বভাবে চাপল্য নাই—সৌম্য শান্ত বালক অবসর পাইলেই গ্রামের উপান্তে শিব-মন্দিরটিতে গিয়া উপস্থিত হয়, সারাদিন সেখানে কাটাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে।

অপূর্ব মেধা একনাথের। মন্দিরে পুরাণ পাঠ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ যাহা হয়, সবই তাঁহার কণ্ঠস্থ। ধর্মজীবনের কাহিনী শুনিতে বসিলেই সে মাতিয়া উঠে, ধ্রুব প্রহ্লাদের পুণ্য কথা ভাবিতে ভাবিতে মন কোথায় উধাও হইয়া যায়।

একনাথের বয়স তখন বারো বৎসরের বেশী নয়। একদিন জনবিরলপথে শিবমন্দির হইতে সে বাড়িতে ফিরিয়া আসিতেছে, হঠাৎ কানে আসে এক দৈবী প্রত্যাদেশ, "ওরে,

বৃথা কেন আর কাল ক্ষেপণ করছিস, চলে যা দেবগড়ে জনার্দন স্বামীর কাছে। তিনিই যে তোর চিহ্নিত সদ্‌গুরু, তোর জীবনের চাবিকাঠি রয়েছে তাঁরই হাতে।

বালকের মর্মমূলে কে যেন এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া যায়। অলৌকিক লোকের অদৃশ্য ইঙ্গিত মনকে বার বার উচ্চকিত, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। সেইদিনই পিতামহীর স্নেহনীড় ছাড়িয়া, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া পদব্রজে সে বাহির হইয়া পড়ে দেবগড়ের উদ্দেশে।

কে এই জনার্দন স্বামী, কি তাঁহার পরিচয়, কিছুই একনাথের জানা নাই। পথ চলিতে চলিতে লোকের মুখে শোনে, তিনি দেবগড়ে কেল্লাদার, মুসলমান রাজার এক অতি বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। যুদ্ধকুশল ও রাজনীতিবিদ্ বলিয়া যেমন তাঁহার খ্যাতি আছে, তেমনি খ্যাতি আছে সিদ্ধ সাধকরূপে। সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ নৃসিংহ সরস্বতী তাঁহার গুরু। সমর্থ গুরুর কৃপা ও আপন সাধনবলে জনার্দনের সাংসারিক জীবন আর অধ্যাত্মজীবনের ঘটিয়াছে এক বিস্ময়কর সমাহার। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে আন্তরিকভাবে।

কেল্লার ভিতরে জনার্দন স্বামীর দর্শন ঘটিল। সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া একনাথ কহেন, "প্রভু, আমি পৈঠানের লোক, ভানুদাসজীর প্রপৌত্র—একনাথ। ঈশ্বর কি বস্তু কি ক'রে তা লাভ করা যায়, কিছুই আমি জানিনে। কিন্তু কি জানি কেন, এক প্রচণ্ড ব্যাকুলতার বেগ আমায় কেবলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

"ভানুদাসের প্রপৌত্র তুমি? অতি আনন্দের কথা। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব, আমাদের সকলের নমস্য। তা বৎস, এত সাধু সন্ত থাকতে আমার মতো কেল্লাদারের কাছে তুমি এলে কেন বলতো?" প্রশ্ন করেন, জনার্দন স্বামী।

"প্রত্যাদেশ শুনেছি, আপনিই আমার গুরু, আমার ইহকাল পরকালের চাবিকাঠি আপনারই হাতে।"

"কি ক'রে বুঝলে, বালক, এ প্রত্যাদেশ সত্য?"

"আমার অন্তরাত্মা কেবলই ডেকে বলছে, এ দৈবী আদেশ এসেছে আমারই পরম কল্যাণের জন্য।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অশ্রুসজল চক্ষে একনাথ বলেন, "প্রভু, শৈশবে পিতামাতা হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ি, ঈশ্বরের কৃপায় পিতামহীর আশ্রয় পাই। আজো আবার তেমনি অসহায় হয়ে এই বালক আপনার আশ্রয় চাচ্ছে, আপনি কি কৃপা করবেন না?"

"বৎস, শান্ত হও। আমি তোমায় আশ্রয় দেবো। সত্য বলতে কি তোমার আগমন আমার অপ্রত্যাশিত নয়। তোমার ছবি আগে থেকেই আমার মানসপটে ফুটে উঠেছে। জন্মান্তরের ভালো সংস্কার আছে তোমার ভেতর। তাইতো এ অল্প বয়সে ঈশ্বরের জন্যে এমন ব্যাকুল হয়েছো।"

পরম যত্নে জনার্দন স্বামী একনাথকে দীক্ষা দেন, সেই সঙ্গে দেন নিগূঢ় ভক্তি-সাধনার উপদেশ। বালক শিষ্যের শাস্ত্র পুরাণ অধ্যয়নের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। জ্ঞানেশ্বরী গীতা ও ভাগবতের তত্ত্বসমূহ অচিরে একনাথের আয়ত্তে আসিয়া যায়। তাছাড়া, একনিষ্ঠ সাধনার ফলে ভক্তির নবধা লক্ষণও তাহার সাধনসত্তায় প্রকট হইয়া উঠিতে থাকে।

গুরুগৃহে একাদিক্রমে ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়। বালকশিষ্য তখন পদার্পণ করে

যৌবনে। শাস্ত্রজ্ঞান, প্রেমাবেগ ও কাব্য প্রতিভার অপরূপ স্ফুরণ দেখা যায় তাঁহার মধ্যে। অপার স্নেহ মমতা দিয়া গুরুজী একনাথকে গড়িয়া তুলিযাছেন, তাঁহার এই রূপান্তর দেখিয়া সেদিন তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, "বৎস একনাথ, তোমার সাধনা ও শিক্ষা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। এবার তোমায় শুরু করতে হবে জীবনের একটা দুরূহ পর্যায়। সাধনজীবন ও অধ্যাত্মজীবনকে নিয়ে দূরে নিভৃতে সরে থাকলে চলবে না। এ সাধন দৃঢ়মূল হয়েছে কিনা, তা যাচাই হবে নিত্যকার ব্যবহারিক জীবনে। উপলব্ধিতে আনতে হবে শ্রীমদ্ভাগবতের পরম তত্ত্ব। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই রূপায়িত হয়ে আছেন সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুতে। সর্বঘটে ব্যাপ্ত রয়েছে মহাকাশ, তেমনি সর্ববস্তুর সর্ব ঘটে—কৃষ্ণ বিরাজিত। তাই তোমার কৃষ্ণসেবা হবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই তত্ত্ব ও সাধনকে জীবনে রূপায়িত করতে হলে ব্যবহারিক জীবন বা সাংসারিক জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম করতে হবে কৃষ্ণের কর্ম বলে। আমি ভাবছি, তোমার অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের শিক্ষাও তোমাকে দেবো। দুটোকে মিলিয়ে যদি চলতে পারো, তবেই সার্থক হয়ে উঠবে তোমার এই ভাগবত-ভিত্তিক ধর্মসাধনা।"

অতঃপর একনাথকে গুরু সরকারী কাজকর্মের নানাবিধ শিক্ষা দান করেন। দুর্গের কিছু কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজও ধীরে ধীরে তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়।

জনশ্রুতি আছে, এই সময়কার একটি ঘটনায় তরুণ একনাথ যে সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় দেন, তাহার ফলে দেবগড় কেল্লা রক্ষা পায় এবং কেল্লাদার জনার্দন স্বামীও এক ভয়ংকর বিপদ এড়াইতে সক্ষম হন।

সেদিন গভীর রাত্রির অন্ধকারে নিতান্ত আকস্মিকভাবে শত্রুর এক সেনাবাহিনী দেবগড় আক্রমণ করিয়া বসে। জনার্দন স্বামী তখন কেল্লার অভ্যন্তরে একটি নির্জন কক্ষে রহিয়াছেন ধ্যানাবিষ্ট। শত্রুসেনা রণহুঙ্কার দিয়া প্রাণপণে গুলীবর্ষণ করিতেছে, দুই একটি দল পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠার চেষ্টাও করিতেছে। এই সঙ্কট সময়ে কেল্লার নায়কের দেখা নাই, কেল্লার রক্ষীদল কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছে।

তরুণ একনাথ চকিতে এ বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া নিয়াছেন। গুরুদেবকে ধ্যানাসন হইতে উঠানোর উপায় নাই, অথচ শত্রুর প্রতিরোধ এখনই করিতে হইবে। তড়িৎবেগে তিনি জনার্দন স্বামীর কক্ষে ঢুকিয়া পড়েন, নিজেকে সজ্জিত করেন তাঁহার বর্ম, শিরস্ত্রাণ ও অস্ত্রশস্ত্রে। তারপর দুর্গপ্রাকারে দাঁড়াইয়া দক্ষ নায়কের মতো দেন প্রতি-আক্রমণের নির্দেশ। রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধের হাঁকডাক ও উত্তেজনায় একনাথকে কেহই চিনিতে পারে নাই, ভাবিয়াছে দুর্গের নায়ক জনার্দন স্বামীই তাঁহার দুর্ভেদ্য বর্ম শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া দিতেছেন কৌশলপূর্ণ সামরিক নির্দেশ।

তীব্র প্রতিরোধের ফলে শত্রুসেনার মনোবল সেদিন ভাঙিয়া পড়ে, পরাস্ত হইয়া তাহারা পলায়নপর হয়।

ইতিমধ্যে জনার্দন স্বামী ধ্যানাসন হইতে ব্যুত্থিত হইয়াছেন। বাহ্যজ্ঞান পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার গুরুত্ব বুঝিয়া নিতে তাঁহার দেরি হইল না। এ ঘোর বিপদে একনাথের উপস্থিত বুদ্ধি, বীরত্ব ও নেতৃত্বই আজ অসাধ্য সাধন করিয়াছে। শত্রু সেনা যেমন বিধ্বস্ত হইয়াছে তেমনি দুর্গবাসীদেরও হইয়াছে প্রাণরক্ষা।

একবার জনার্দন স্বামী সরকারের একটি জটিল হিসাব নিয়া বড় বিপদে পড়েন। হিসাবে একটা মারাত্মক ভুল রহিয়াছে কিন্তু সে ভুলের সূত্রটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কয়েকদিন ধরিয়া অবিরত চেষ্টা চলিল, কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। একনাথের একটা বিশেষ গুণ, যখনি যে কাজে তিনি হাত দেন, নিষ্ঠা ও দায়িত্ব নিয়া তাহা সম্পন্ন করেন। জনার্দন স্বামী তাঁহার এই হিসাবের গরমল সংশোধনের ভার শিষ্যের উপরই দিলেন।

একনাথ একাগ্র হইয়া এই হিসাবের খাতা নিয়া পড়িলেন এবং বহু পরিশ্রমের পর ভুলের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া গেল। জনার্দন স্বামী তো মহা আনন্দিত। কহিলেন, "বৎস, একনাথ, তোমার নিষ্ঠা ও মনঃসংযম প্রশংসনীয়। মনে রেখো এমনিভাবে অধ্যাত্ম-সাধনের উপরেও মনকে করতে হবে কেন্দ্রীভূত। তোমায় আমি একটি নিগূঢ় সাধন এবার দেবো। কেল্লার বাহিরে যে গহন অরণ্য রয়েছে, সেখানে বসে এই প্রক্রিয়াটি তুমি দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠান করো। আশীর্বাদ করি, তোমার সাধনা অচিরে জয়যুক্ত হয়ে উঠুক।"

গুরুর এই আশীর্বাদ সফল হইয়া উঠে, ভক্তিপ্রেম-সিদ্ধ একনাথ শ্রীহরির দর্শন-লাভে হন কৃতকৃতার্থ।

শিষ্যের এই সাফল্যে জনার্দন স্বামীর আনন্দের অবধি নাই। স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "বৎস, একনাথ, আমার এখানে আর তোমার অবস্থান করার প্রয়োজন নেই। ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করে, বেরিয়ে পড়ো, দর্শন করো দেশের প্রধান প্রধান দেবমন্দির ও তীর্থগুলি।"

পিতৃসম মমতায় গুরুদেব এ কয়টি বৎসর একনাথকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন, গুরুরূপে তাঁহার সাধনজীবনকে করিয়াছেন উদ্দীপিত। এবার আসিয়াছে বিচ্ছেদের পালা।

সজলচক্ষে করজোড়ে একনাথ কহেন, "প্রভু, এ ক'টি বৎসর এমন নিবিড় ক'রে আপনাকে পেয়েছিলাম, কোনোদিন ভাবতেও পারি নি, এভাবে আপনি আমায় দূরে সরিয়ে দেবেন।"

"না, বৎস, দূরে আমি কোনোদিনই থাকবো না, দীক্ষামন্ত্রের মধ্যেই যে থাকে গুরুর নিবাস, ইষ্টধ্যানে জড়িয়ে থাকেন তিনি ওতপ্রোত হয়ে। তোমায় আমায় বিচ্ছেদ কোনোদিনই হবে না, আর শোন—তীর্থ পরিক্রমার একটা বড় লাভ আছে।"

"বুঝিয়ে বলুন আমায়, প্রভু।"

"হ্যাঁ, এই পরিক্রমা উপলক্ষে পথে প্রান্তরে বনে জঙ্গলে কত ঘুরে বেড়াতে হবে, সাধু তস্কর, যোগী ভোগী সবারই মুখোমুখি তোমায় হতে হবে। পর্যটনের জীবনে আসবে কত সুখ-দুঃখ, কত উত্থান-পতন, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এই উত্থান-পতনের মধ্যে নামজপ আর ইষ্টধ্যান ঠিক থাকে কিনা, ইষ্টের উপলব্ধি আরো দৃঢ় হয় কিনা, সঠিকভাবে তা যাচাই করা হয়ে যাবে।

পরিব্রাজন ও তীর্থদর্শনে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়, তারপর একনাথ দেবগড়ে গুরুর সকাশে আসিয়া উপনীত হন। গুরু ও শিষ্যের পুনর্মিলনে দিব্য আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠে।

স্নেহপূর্ণ স্বরে জনার্দন কহেন, "বৎস, তোমার উপর আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। ঈশ্বর উপলব্ধি তোমার দৃঢ়তর হয়েছে, সাধনায় হয়েছো তুমি সফলকাম। এবার নিজের ঘরে ফিরে যাও। বিবাহ ক'রে সংসারী হও।"

একথা শোনা মাত্র আঁতকিয়া উঠেন একনাথ। তিনি কিছু বলার আগেই জনার্দন স্বামী হাসিয়া কহেন, "এতে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হবার কিছু নেই, একনাথ। সাধন-জীবনে জ্ঞান ভক্তি কর্মের সমন্বয় ফুটিয়ে তোলার উপদেশ দিয়েছিলেন আমার গুরুদেব শ্রীনৃসিংহ সরস্বতী। তার কিছুটা নিদর্শন তুমি দেবগড়ে অবস্থান ক'রে প্রত্যক্ষ করেছো। তোমাকেও তেমনি জীবন যাপন করতে হবে। হ্যাঁ, তুমি বিবাহ করো,— যাপন করো অনাসক্ত কৃষ্ণভক্তের জীবন। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের রচিত এই বিশ্বসংসার এই উভয়কেই অবলম্বন করে থাকো। কৃষ্ণময় হও তুমি, আর প্রতি ভক্ত-মানুষের হৃদয়ে গড়ে তোলো এক একটি কৃষ্ণমন্দির। আমার আর একটা নির্দেশ সাধারণ ভক্তমানুষের উপযোগী সুখবোধ্য ভক্তি-গ্রন্থাদি তুমি রচনা করো, পুরাণ শাস্ত্রের তত্ত্ব ও কাহিনীকে জনমানসের গ্রহণীয় ক'রে দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও।"

গুরুর নির্দেশ একনাথ শিরোধার্য করিয়া নেন। পৈঠানে ফিরিয়া গিয়া মিলিত হন বৃদ্ধ পিতামহ ও পিতামহীর সঙ্গে। অতঃপর বিজাপুরের এক সৎ ব্রাহ্মণের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। নাম তাঁহার গিরিজাবাঈ। একনাথের সাধনা ও ধর্মাচরণে পতিব্রতা গিরিজাবাঈ চিরকাল অকুণ্ঠ চিত্তে সহযোগিতা করিয়া গিয়াছেন।

এবার পৈঠানে বসিয়া একনাথ রচনা করেন বহুতর ভক্তিমূলক গ্রন্থ। ইহাদের মধ্যে সাহিত্য, দর্শন ও ভাবসম্পদের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা গরীয়ান্ তাঁহার ভাগবতের ব্যাখ্যা। একাদশ স্কন্ধকে ভিত্তি করিয়া এটি রচিত। মারাঠী জনসাধারণ এ গ্রন্থকে বলে একনাথী ভাগবত। বিশহাজার পদ-সমন্বিত এই মহান্ গ্রন্থ মারাঠী সাহিত্যের এক অক্ষয় কীর্তি।

'ভাবার্থ রামায়ণ' একনাথের অন্যতম সার্থক আধ্যাত্মিক সাহিত্যকীর্তি। একনাথ নিজে বলিয়া গিয়াছেন—রামভক্তির এক দৈবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই গ্রন্থ রচনা তিনি শুরু করেন। কিন্তু যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায় অবধি গিয়া আর এটি তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অন্যতম প্রিয় শিষ্য গাবোবা এটি সমাপ্ত করেন। রুক্মিণী স্বয়ম্বর একনাথের আর এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কৃষ্ণ-রুক্মিণীর সুমধুর প্রেমরসের ভিয়ান চড়ানো হইয়াছে ইহাতে। ইহা ছাড়া, তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে রহিয়াছে চতুঃশ্লোকী ভাগবত, স্বাত্মসুখ ও কয়েক শত মনোজ্ঞ অভঙ্পদ। এই সব রচনায় একনাথের অধ্যাত্ম-অনুভূতি ও জীবনদর্শনই শুধু প্রকাশিত হয় নাই, তাঁহার কবিত্বশক্তির মহিমাও চমৎকার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উত্তরসূরী জ্ঞানদেব ও নামদেবের প্রভাব একনাথের মধ্যে যথেষ্টই আছে, কারণ, জ্ঞানদেবের জ্ঞানেশ্বরী গীতা, অমৃতানুভব এবং নামদেবের প্রেম-ভক্তি-আপ্লুত অভঙের দ্বারা তিনি অনেকাংশে অনুপ্রাণিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিজ সাহিত্য-কৃতিতে একনাথের স্বকীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভক্তিরসাত্মক সাহিত্য সৃষ্টি করিলেও জ্ঞানদেব ও নামদেব তাঁহাদের গুরু নাথযোগীদের দার্শনিক মতবাদ এড়াইতে পারেন নাই কিন্তু একনাথের সময়ে মারাঠার ভক্তি-আন্দোলনের রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ শাস্ত্রের প্রচার বাড়িয়াছে, ভক্তিধর্ম তাহার উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছে সনাতন ধর্ম ও অবতার

পুরুষদের লীলা কাহিনীতে। এই উৎস হইতেই, বিশেষ করিয়া ভাগবত পুরাণ হইতে একনাথ সংগ্রহ করিলেন তাঁহার অধ্যাত্মসাহিত্যের মূল রস। তারপর গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী সহজ ভাষায়, সর্বজনীন সংবেদনে, তাহা পরিবেশন করিলেন ভক্ত সাধারণের কাছে। ফলে অল্পকালের মধ্যে একনাথ চিহ্নিত হইয়া উঠিলেন এক ভক্তি-সিদ্ধ আচার্যরূপে। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এক নবতর খাতে হরিকথা ও হরিভক্তির রসপ্রবাহ সারা দেশে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। পৌরাণিক ভক্তিধর্ম মারাঠায় পুনরু-জ্জীবিত হইয়া উঠিল তাঁহারই জীবন সাধনা ও সাহিত্যকৃতির মধ্য দিয়া।

অধ্যাপক পটবর্ধন একনাথের সাধনজীবন ও কবিত্ব শক্তির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন—একনাথের রচনায় অন্তরের আবেগধর্মিতা ও ভাবরসের সহিত মিলিত হইয়াছে ভক্তি-সাধনার পরমতত্ত্ব। তাই দেখা যায়, একনাথ শুধু একজন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ মাত্র ছিলেন না, এইসঙ্গে তিনি ছিলেন অতি উচ্চশ্রেণীর একজন ভাবুক কবি। প্রধানত এই কারণেই একনাথ কীর্তিত হন একজন অতিশয় জনপ্রিয় ধর্মগুরুরূপে।[১]

ভক্ত কবি, সিদ্ধপুরুষ, একনাথের খ্যাতি পৈঠান ও পন্ধারপুর অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শত শত লোক আসিয়া ভিড় জমায় তাঁহার কীর্তনের অঙ্গনে। মহারাষ্ট্রের সর্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন একনাথ স্বামী নামে।

একনাথের রচিত অভঙ্গপদে গুরুভক্তি ও গুরুর পদে আত্মসমর্পণের তত্ত্ব বার বার প্রচারিত হইয়াছে। একটি অভঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তিনি বলিতেছেন—

গুরুর দেওয়া বিপুল ঋণ—
কি ক রে একনাথ শুধবে তার এই জীবনে ?
গুরু দেখিয়েছেন এক চমকপ্রদ ইন্দ্রজাল—
শিষ্য একনাথের অহমিকার তীব্র বিষ
নিঃশেষে করেছেন তিনি পান,
দৃষ্টি টেনে নিয়েছেন অন্তরের গভীরে,
যেখানে রয়েছে সেই দিব্য আলোকের উদ্ভাসন—
নেই কখনো যার উদয় আর অস্ত। (অভঙ ৪)

গুরুদেবের কৃপা হইতেছে পরশ-পাথর, যাহার স্পর্শগুণে শিষ্য ধন্য হয়, তাহার সর্বসত্তায় ঘটে রূপান্তর। একনাথ আর একটি পদে তাঁহার গুরু জনার্দন স্বামীর মহিমা জ্ঞাপন করিতেছেন :

এ কি পরম বিস্ময় ঘটালেন গুরু আমায় দিয়ে,
হৃদয় কন্দরে করালেন শ্রীভগবানের দর্শন।
আর এমনি কৃপালু তিনি
ত্যাগ দুঃখের চরম মূল্য থেকে
দিলেন আমায় অব্যাহতি।

---

১ অধ্যাপক পটবর্ধন উইলসন ফিলসফিক্যাল লেকচারস।

শোন তবে গুরু-কৃপার গোপন রহস্য।
এই কৃপার আলোয় সর্ব বস্তু সর্ব চরাচর
হয়ে ওঠে ঈশ্বরময়।
চোখে যা দেখি, কানে যা শুনি,
যে আস্বাদ গ্রহণ করি জিহ্বায়,
সব কিছুতেই পাই ঈশ্বরের পরিচয়। (অভঙ্গ ৮)

ভক্তি আর নাম-সাধনা সম্পর্কে একনাথের বাণী মর্মস্পর্শী। তাঁহার মতে জীবন-প্রভু ঈশ্বরের নিরন্তর স্মরণই জীবন, আর ঈশ্বরের বিমুখতা ও বিস্মরণ হইতেছে মায়া-বিভ্রম।

স্মরণ মনন ও জপ কীর্তনের যে কোনো সাধনই শ্রীভগবান্‌কে অমোঘ শক্তিতে আকর্ষণ করে, তিনি ছুটিয়া আসেন এই ধূলার ধরণীতে। একটি পদে একনাথ গাহিতেছেন—'সদা অনুধ্যানের ফলেই তো তিনি ত্রাণ করলেন যখন কোপন স্বভাব ঋষি ও তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্যেরা এসে চাইলেন ক্ষুধার অন্ন, অর্জুনের ভাবনায় সদা জাগ্রত ছিলেন কৃষ্ণ, তাই তো প্রভু বাঁচিয়েছিলেন তাঁকে বার বার। ভক্তিতে শুধু শ্রীভগবান্ দান করেন না, ভক্তের বশ্যতাও তিনি স্বীকার করেন। এমনি তার মহত্ত্ব আর এমনি চিরায়ত ভক্তি-সাধনার মাহাত্ম্য':

সদা ভক্ত-বশ আমার পরম প্রভু—
দ্রৌপদীকে করেন উদ্ধার তার চরম বিপদে,
সুদামার দারিদ্র্য দুঃখ মুহূর্তে করেন দূর।
পরীক্ষিৎকে মাতৃজঠরে বাঁচাতো কে
যদি না হতো তাঁর কৃপাঘন দৃষ্টিপাত ?
গোবর্ধন ধারণ ক'রে তার নিচে গিরিধর
রক্ষা করেন গাভী আর গোপগোপীদের।
গোরা কুমোরের সাথে বসে প্রভু আমার
শুকিয়ে তোলেন ভেজা মাটির ভাণ্ড।
চোখা মেলার সাথে চরান পশুর দল,
সাওতা মালীর পাশে কাটেন বুনো ঘাস।
কবীরের সাথে টানা-পোড়েনে বুনেন কাপড়,
রুইদাসের সঙ্গী হয়ে চামড়ার রং লাগান,
সজন কসাইর মাংস বিক্রয়
আর স্বর্ণকার নরহরির সোনা গালানোর কাজে
হাত এগিয়ে দেন কৃপালু প্রভু।
জনাবাঈর গোবর সানন্দে বহন করেন তিনি,
আবার ভূমিকা নেন দামাজীর পারিয়া দূতের।

মহারাষ্ট্রের জনগণ পৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিল না। একনাথ স্বামী এই পরিচয় সাধিত করিলেন প্রধানত তাঁহার একনাথী ভাগবত ও রামায়ণ ভাষ্যের মধ্য দিয়া।

জ্ঞানদেবের জ্ঞানেশ্বরী গীতার প্রভাব একনাথের সাধনজীবন ও সাহিত্যকর্মের উপর যথেষ্ট ছিল। একনাথ নিজে তাহা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করিয়াও গিয়াছেন। কিন্তু তথ্য প্রমাণ হইতে দেখা যায়, গুরুর আদেশে ভাগবত-অনুকূল ভক্তিপ্রেমের যে সাধনা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, গুরুকৃপায় যে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, উত্তর কালে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও জীবনদর্শনে তাহাই প্রতিফলিত হইয়া উঠে অধিক পরিমাণে।

নিজের প্রেমভক্তি সাধনার অন্যতম উৎস ভাগবত সম্পর্কে একনাথের উক্তিটি বড় মনোরম। তিনি বলিতেছেন " শ্রীভাগবত হচ্ছে একটি বড় ক্ষেত। ব্রহ্মা প্রথমে এর জন্য প্রদান করেন শস্যবীজ। নারদ এই ক্ষেতের অধিকারী, ঐ শস্য-বীজ তিনিই বপন করেন তাঁর নিপুণ হস্তে। ব্যাসদেব করেন ঐ ক্ষেতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা - দশটি বাঁধ দিয়ে বেঁধে দেন এর চারিদিকে। ফলে সে স্থান ভরে ওঠে দিব্য আনন্দ আর শান্তির ফসলে। শুক এই ফসল পাহারা দেবার ভার গ্রহণ করেন। হরিনাম অবিরত নিক্ষেপ করেন তিনি, আর পাপরূপ পাখিরা যায় দূরে পালিয়ে। ভক্ত উদ্ধব করেছিলেন কেটেআনা শস্যের ঝাড়-বাছাই। কৃষ্ণজীর পরম বাণীর মূল্যবান শস্যকণা বার ক'রে রেখেছিলেন তা' থেকে। এ থেকে তৈরি হয়েছে দিব্যলোকের সৌরভ মাখানো কত আহার্য। পরীক্ষিৎ এলেন তারপর। সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে, শুকদেবের মুখে পবিত্র ভাগবত কথা শুনে পান করেন তিনি ভাগবতী আনন্দের সুধা। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে শ্রীধর ভাগবতের নিগূঢ় মর্মকথার ওপর করেন আলোকপাত, দিব্য আনন্দ লাভ ক'রে নিজে হন কৃতকৃতার্থ। জনার্দন স্বামীর প্রিয় মক্ষিকা, একনাথ, তাঁর মারাঠী ভাষার দুটি পাখনা মেলে উড়ে গিয়ে বসেছে সেই লোভনীয় সুধার ওপর, প্রাণভরে ভোজন ক'রে হয়েছে ধন্য।"

ভক্তি-সাধনকে একনাথ স্বামী বলিয়াছেন পরম ধামে গমনের প্রশস্ত রাজকীয় পথ। শ্রীহরি স্বয়ং এপথের রক্ষণাবেক্ষণকারী, পথে তিনি চক্র হস্তে দাঁড়িয়ে থাকেন। আক্রমণকারী দস্যু বা বৈরীদের করেন হনন। নিজস্ব অস্ত্র দিয়ে প্রভু আরো একটি বড় কৃপার কাজ করেন। সাধনপথের বড় শত্রু—সাধকের অহংবোধ। এই অহংবোধকে কৃপালু প্রভু চূর্ণ করেন তাঁর গদার আঘাতে। তাঁর মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনিতে শুচিশুভ্র হয়ে ওঠে ভক্তের অন্তর, জ্ঞানালোক প্রবেশ করে তাতে। আর শ্রীহস্তের প্রস্ফুটিত কমল দিয়ে আপ্তকাম ভক্তের করেন তিনি সংবর্ধনা।

আদর্শ ভক্ত ও তাঁহার ভক্তিসিদ্ধির যে বর্ণনা একনাথ দিয়াছেন তাহা ভাগবত হইতেই নেওয়া :

—এই চরম অবস্থায় পথ ও লক্ষ্যবস্তু এক হয়ে ওঠে—ঈশ্বরের বরণীয়, কৃপাপ্রাপ্ত দুই-চারটি সাধকের ভাগ্যেই এটা ঘটতে দেখা যায়। একৈকনিষ্ঠা আর শরণাগতির ফলে, সাধক গুরুর কৃপা লাভে ধন্য হন, উপলব্ধি করেন আত্মার স্বরূপ। তিনি দেখতে পান সব মানুষের হৃদয়েই বিরাজিত হয়েছে শ্রীহরির মন্দির। শ্রীহরিকে দেখেন তিনি ভিতরে ও বাইরে, সর্বত্র সর্ববস্তুতে। তারপর ধ্যাতা আর ধ্যেয়ের ভেতর থাকে না কোনো পার্থক্য। ভক্ত নিজেই হয়ে যান ভগবান্—যিনি সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছেন ওতপ্রোত। এখন থেকে অবস্থান, চলাফেরা সব কিছু ভগবানের মধ্যে ভগবানের সারূপ্য লাভ করেন তিনি। নাম রূপ, কার্য কারণের বিভেদ ঘুচে যায়, এ অবস্থায়

সর্ববস্তুর মধ্যে প্রকৃত ভগবৎ-সত্তাকে তিনি দেখতে পান। সৃষ্টির এত কিছু বৈচিত্র্য, বৈষম্য ও ভেদের মধ্যে—এক ও অদ্বিতীয় পরমবস্তু শ্রীভগবান্‌কে নিরন্তর করেন তিনি প্রত্যক্ষ। একনাথ বলেন, সর্বভূতে ভগবৎ-দর্শন—এই হচ্ছে ভক্তি-সাধনার চরম কথা। কিন্তু এ অবস্থা ভক্ত লাভ করতে পারে না—যদি না প্রভুর কৃপার আলোয় তাঁর হৃদয় হয় উদ্ভাসিত।[1]

গুরু জনার্দন স্বামীর কৃপায় ও নিজের সাধনবলে একনাথ স্বামী পরিণত হন এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে। নিজ জীবনে এই সিদ্ধি কি ভাবে আসিল, কি ছিল তখনকার অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা এ তথ্য তাঁহার কতকগুলি অভঙ্গপদে নিহিত রহিয়াছে।

একটি পদে তিনি গাহিতেছেন :

অন্তরাত্মায় অধ্যাত্ম-সূর্যের ঘটলো দীপ্তিময় প্রকাশ—
দেখলাম আমি, এ প্রকাশের নেই ঊষা,
নেই মধ্যাহ্ন বা অস্তাচল।
নেই এর কোনো আদি বা অন্ত।
সম্মুখে আমার আত্মিক সূর্যের চির উদ্ভাসন,
পূর্ব-পশ্চিমের পার্থক্য চিরকালের মতো গেছে ঘুচে।
কর্ম আর নৈষ্কর্ম দুই-ই হয়ে গেছে অর্থহীন
দিনের আকাশে চাঁদের ছায়ার মতো।

একনাথ স্বামী ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ। বহুজনের বন্দিত, বহুজনের সাধনপথের আলোকদিশারী তিনি। কিন্তু শ্রদ্ধেয় গুরুদেব জনার্দন স্বামীর নির্দেশে, চিরদিন তিনি লোকালয়েই বাস করিয়াছেন, যাপন করিয়াছেন সাধারণ ভক্ত বৈষ্ণবের গৃহস্থ-জীবন। ঘৃতের প্রদীপের মতো এই জীবন পবিত্রতা আর স্নিগ্ধতায় ভরা। এই প্রদীপের আলো বিকীর্ণ হয় প্রায় চল্লিশ বৎসর ব্যাপিয়া। মহারাষ্ট্রের সহস্র সহস্র ভক্তের সাধনজীবন এই কল্যাণময় আলোকের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

পৈঠানে একনাথের দিনচর্যা ছিল এইরূপ প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি কিছুটা সময় ধ্যান-ভজনে অতিবাহিত করিতেন। তারপর নদীতে গিয়া সমাপন করিতেন স্নান তর্পণ। এবার শাস্ত্রপাঠের পর্ব। ভাগবত ও গীতার পাঠ ব্যাখ্যার আসরে সমবেত হইত অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী। দিব্যভাবে আবিষ্ট পরম বৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত বাণী ও উপদেশ সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল অতিথিসৎকার। অতিথিদের সঙ্গে নিয়া মিতাহারী একনাথ আহারক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। বিশ্রামের পর অপরাহ্নে আবার ভক্তিগ্রন্থ পাঠ। জ্ঞানেশ্বরী গীতা বা ভাগবত এই দুইটি প্রিয় গ্রন্থ প্রধানত তিনি আলোচনা করিতেন। শ্রোতাদের মধ্যে তখন বহিয়া যাইত প্রেমভক্তি রসের অমৃতপ্রবাহ। সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল একনাথের সান্ধ্য সংকীর্তন। নিজের রচিত অভঙ্গ পদ গাহিয়া গাহিয়া একনাথ স্বামী ভাবরসে উদ্বেল হইয়া উঠিতেন। ভক্তদের মধ্যে জাগিয়া উঠিত ভক্তিপ্রেমের প্রবল উদ্দীপনা। দূর-দূরান্ত হইতে বহু দর্শনার্থীদের আগমন ঘটিত পৈঠানের এই বৈষ্ণব মহাত্মার দর্শনের জন্য।

---

১ রানাডে ' মিস্টিসিজম ইন মহারাষ্ট্র—পৃঃ ২৮৯

একনাথ ছিলেন প্রকৃত বৈষ্ণব, ভক্তেরা শ্রীভগবানের আপনজন, প্রিয়জন, তাঁহাদের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য থাকিবে, তাঁহার কাছে এই চিন্তা ছিল অসহনীয়। কীর্তনের আসরে উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ, সকলের সঙ্গে তিনি এক সঙ্গে উপবেশন করেন, নির্বিচারে যে কোনো জাতির ভক্ত অতিথিদের নিয়া ভোজনে বসেন, গ্রামের ব্রাহ্মণেরা ইহা সুচক্ষে দেখেন নাই। কঠোর ভাষায় তাঁহারা একনাথের এই আচরণের বিরুদ্ধে বলাবলি করিতে থাকেন।

একনাথ কিন্তু এবিষয়ে একেবারে নির্বিকার। স্বরচিত অভঙ্গ পদে তিনি গাহিলেন[1]—

হো কাঁ বর্ণমাজী অগ্রণী
যো বিমুখ হরিচরণী।
ত্যাহুনি শ্বপচ শ্রেষ্ঠ মানী—
জো ভগবদ্ ভজনী প্রেমল।

—শ্রীহরির চরণকমল থেকে যে বিমুখ, বর্ণের দিক দিয়া অগ্রণী হয়েও সে যে নিষ্ফল, ব্যর্থ। তার থেকে সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ যদি সে প্রেমভরে করে ভগবদ্ ভজন।

পৈঠান ও তাহার কাছাকাছি গ্রামের উচ্চবর্ণের লোকেরা ছিলেন স্বভাবত রক্ষণশীল। একনাথ স্বামীর নৃত্য কীর্তন ও ধর্ম উপদেশ সমাজে বিশৃঙ্খলা আনিতেছে, সমাজকে ধ্বংসের পথে টানিয়া নিতেছে বলিয়া তাহারা সোরগোল তুলিলেন। জনগণের মধ্যে একনাথের প্রভাব দিন দিনই বৃদ্ধির পথে, ইহাতেও অনেকের ঈর্ষার অবধি নাই। শুরু হইল নানা নিন্দাবাদ। বিরোধীরা রটাইলেন, একনাথের গুরুকরণ হয় নাই। সত্যকার কোনো সাধনা ও সিদ্ধিও তাঁহার নাই। যশ ও অর্থের লোভে তিনি ভুয়া আচার্যগিরি করিতেছেন, লোক ঠকাইয়া বেড়াইতেছেন।

এই সব দুর্নাম একনাথ স্বামী শুনিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত হইতে দেখা গেল না। উদার ক্ষমাসুন্দর সাধক ইহার উত্তরে যাহা লিখিলেন যে কোনো সাধক বা সমাজ-সংস্কারকের কাছে তাহা চিরকাল স্মরণ রাখার মতো।

নিন্দক কামাচা কামাচা
গড়ী আত্মারামাচা।
নিন্দক আমুচী গঙ্গা।
আমুচী পাতকেঁ নেতে ভঙ্গা।
নিন্দক আমুচী সখা।
আমুচী বস্ত্রে ধুনো ফুকা।
নিন্দক আমুচী কাশী।
আমুচী পাতকেঁ অবধী নাশী—
নিন্দক আমুচা গুরু
একা জনার্দন থোরু।[2]

—নিন্দুকেরা আমার অতি প্রিয়, কারণ তারা যে সৃষ্ট একই আত্মারামের দ্বারা। নিন্দুকেরা যেন গঙ্গার পবিত্র ধারা, আমাদের যত কিছু পাপরাশি করছে তারা বহন।

১ উজ্জীবন, আষাঢ় ১৩৭৫, মধ্যযুগের ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য।

২ ঐ

নিন্দুকেৰা আমাদেৰ সখা, আমাদেৰ কলুষিত বস্ত্র বিনামূল্যে দিচ্ছে ধুয়ে। নিন্দুকেৰা আমাৰ কাশী, সব কিছু পাপ কৰছে বিনষ্ট। নিন্দুকেৰা আমাৰ গুৰু, কাৰণ তাৰাই যে আমায গড়ে তুলেছে জনার্দন স্বামীৰ শিষ্যৰূপে।

সাধক-কবি হিসাবে একনাথ স্বামীৰ দুইটি অবদান ধর্মসংস্কৃতিৰ ইতিহাসে অমৰ হইযা থাকিবে। প্রথমত, আপন ৰচনাৰ মাধ্যমে বেদান্তেৰ তত্ত্বকে তিনি সাধাৰণ মানুষেৰ কাছে সহজবোধ্য কৰিযা তুলিযাছেন। দ্বিতীযত, তাঁহাৰ ভক্তিসাহিত্য মাৰাঠী ভাষায ৰচিত হওযাৰ ফলে মাৰাঠী জনগণেৰ অশেষ কল্যাণ সাধিত হইযাছে।

বেদান্তেৰ উচ্চতৰ তত্ত্বেৰ আলোচনা আগে শুধু সংস্কৃতে শিক্ষিত মুষ্টিমেয মানুষেৰ মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবাৰ তাহাৰ জনপ্রিযতা বৃদ্ধি পায, সমাজেৰ স্তৰে স্তৰে ছড়াইযা পড়িতে থাকে। একনাথেৰ অভঙপদ গ্রামে গ্রামে নগৰে নগৰে গীত হইত, একনাথী ভাগবত ও ৰামাযণ পঠিত হইত বহুতৰ ধর্মসভায। কাজেই তাঁহাৰ তত্ত্ব ও আদর্শেৰ প্রচাৰ দ্রুতবেগে বাড়িযা চলে।

পূর্বসূৰী জ্ঞানদেৰ তাঁহাৰ গীতাভাষ্যে বেদান্তেৰ তত্ত্ব আলোচনা যথেষ্টই কৰিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানদেৰেৰ দার্শনিক তত্ত্ব ও তাঁহাৰ ভাষা ছিল জটিল ও দুর্বোধ্য। তাঁহাৰ দর্শন ব্যাখ্যা ছিল মেঘলোকেৰ মতো ধোঁযাটে, সাধাৰণ মানুষেৰ ধৰা ছোঁযাৰ অনেক ঊর্ধ্বে। কিন্তু একনাথেৰ ব্যাখ্যা ছিল অতি প্রাঞ্জল, গ্রাম্য মানুষেৰ পক্ষেও তাহাৰ ৰসস্বাদ গ্রহণ কৰা কঠিন হইত না। মর্তেৰ মানুষেৰ কাছে স্বর্গীয সুধা তিনি যেন নির্বিচাৰে অকৃপণ কৰে বিলাইযা গেলেন।[১]

মাৰাঠীতে ৰচিত একনাথেৰ ধর্মসাহিত্যেৰ প্রশংসায মুখৰ হইয়া অধ্যাপক পটবর্ধন লিখিযাছেন: "পণ্ডিতদেৰ জন্য লিখে নাম-যশেৰ অধিকাৰী হবাৰ ইচ্ছে একনাথেৰ ছিল না। তিনি লিখেছিলেন সমাজেৰ সর্বস্তৰে সত্যবোধ ও জ্ঞানেৰ আলোক বিস্তাৰেৰ জন্য। স্ত্রীলোক, শূদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধাৰণেৰ কল্যাণেই লেখনী ধাৰণ কৰেছিলেন তিনি। পণ্ডিতেৰ ঘৃণাকে তিনি কৰিতেন ঘৃণা, আৰ লক্ষ লক্ষ নিৰক্ষৰ দেশবাসীৰ দাবিকে অগ্রাধিকাৰ দিযে সদাই লিখে চলতেন দেশজ ভাষায।

"দেশজ ভাষাৰ জন্য তাঁকে অসম সাহসে যুঝতে হযেছিল—এবং এতকালেৰ ব্যবধানেও আজকেৰ দিনেও, দেশজ ভাষাৰ লড়াই আমাদেৰ কম চালিযে যেতে হচ্ছে না। তখনকাৰ দিনে সংস্কৃত জানা পণ্ডিতেৰা ছিলেন গর্বস্ফীত—মাৰাঠী ভাষা হচ্ছে অশিক্ষিত, নিম্নস্তৰেৰ গ্রাম্য লোকেৰ ভাষা, এ ভাষায় লিখে নিজেদেৰ হেয কৰবো কেন —এই ছিল তাঁদেৰ মনোভাব। একনাথ তাঁৰ মহান্ পূর্বসূৰী জ্ঞানদেৰেৰই অনুসৰণ ক'ৰে চললেন। অন্ধ মূক জনগণেৰ জন্য তাঁৰ হৃদয কেঁদে উঠেছিল। তিনি উপলব্ধি কৰেছিলেন—ঐ হতভাগ্য জনগণেৰ হৃদযে প্রবেশেৰ পথ হচ্ছে তাদেৰ মাতৃভাষা। তাই সেই ভাষাতেই নিজেৰ ভক্তিসাহিত্য তিনি ৰচনা কৰলেন।"

দেশজ ভাষায ধর্মগ্রন্থ ৰচনাৰ জন্য কাশীৰ শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেৰা একনাথকে তীব্র ভাষায ধিক্কাৰ দিযাছিলেন। মহাৰাষ্ট্রেৰ ৰক্ষণশীল বিৰোধিতাও বাৰ বাৰ তাঁহাৰ বিৰুদ্ধে উদগ্র হইযা উঠে। এমনকি ঘৰেৰ মধ্যে নিজেৰ পুত্রেৰ গঞ্জনাও তাঁহাকে কম

---

১ ৰানাডে: মিস্টিসিজম ইন মহাৰাষ্ট্র, পৃঃ ২৫০

সহ্য করিতে হয় নাই। এই প্রতিকূল পরিবেশে যে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় নিয়া তিনি নিজের আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর।

পুত্র হরি শাস্ত্রী সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। একদিন পিতাকে তিনি খুব চাপিয়া ধরিলেন, কহিলেন, "পিতা, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশে আমাদের জন্ম। সারা দেশের এক শ্রেষ্ঠ সাধকরূপে—সুপণ্ডিত ও আদর্শবাদী আচার্যরূপে আপনার কত সুনাম! আপনার মতো লোক মারাঠী ভাষায় ধর্মগ্রন্থ লিখবেন, ভাষণ দেবেন? উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা এ নিয়ে আপনার কত নিন্দাবাদ করছেন।"

"এসব তো আমার অজানা নয়, বৎস, তা এখন তোমার মূল বক্তব্যটা কি বল দেখি?" প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন একনাথ স্বামী।

"আমার নিজের বক্তব্য আর সারা দেশের পণ্ডিতসমাজের বক্তব্য একই। এখন থেকে আপনি সংস্কৃত ভাষাতেই রচনা করুন আপনার ধর্মগ্রন্থ। প্রয়োজন-মতো মারাঠী সাহিত্যিকেরাই তা থেকে অনুবাদ ক'রে নেবেন। হ্যাঁ, আমাদের বিশেষ অনুরোধ, মারাঠী ভাষায় আপনি আর লিখবেন না, ভাষণও দেবেন না।'

"অনুরোধ অন্যায়, জাতির পক্ষে দেশের পক্ষে অকল্যাণকর, বৎস।"

অতঃপর স্বরচিত একটি অভঙপদে একনাথ দেশবাসীকে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন .

সংস্কৃত বাণী দেবেঁ কেলী—
প্রাকৃত ওরী চোরাপাসুনী ঝালী
অসোত যা অভিমান ভুলী।
বৃথা বোলী কায় কাজ—
আতাঁ সংস্কৃতা অথবা প্রাকৃতা।
ভাষী ঝালী জে হরি কথা
তে পাবাচে তত্ত্বতাঁ
সত্য সর্বথা মানলী—
দেবাসি নাহীঁ বাচাভিমান
সংস্কৃত প্রাকৃত তায় সমান।
জ্যা বাণী জাহলে ব্রহ্মকথন
ত্যা ভাষা শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষে॥

—সংস্কৃত ভাষা কি দেবতার সৃষ্টি
আর প্রাকৃত সৃষ্টি করছে চোরেরা?
আসলে অহমিকার জালে
ভুল করে বলা হয় এমনতরো কথা।*
আসলে সংস্কৃত বা প্রাকৃত যা-ই হোক,
যে ভাষা বর্ণনা করে হরিকথা—
পবিত্র আর সত্য বাণীরূপে
সবাই মোরা দিই তার সম্মান।

ভাষা নিয়ে দেবতাব নেই পক্ষপাত,
সংস্কৃত আব প্রাকৃত দুই-ই তুল্য তাঁব কাছে।
ব্রহ্মবাণী, ব্রহ্মজ্ঞান যে ভাষাতে বর্ণন
তাতেই যে হয প্রভু শ্রীকৃষ্ণেব সন্তোষ।

পৈঠান এবং পন্ধাবপুবকে কেন্দ্র কবিযা একনাথ স্বামী অতিবাহিত কবেন প্রায় চল্লিশ বৎসব। কর্মময ও সাধনময এই দীর্ঘ জীবনে তাঁহাকে ঘিবিবা গঠিত হয একটি বিবাট ভক্ত দল। শত শত ভক্ত সাধককে অন্তবেব ভক্তিসাধন দিযা তিনি কৃতার্থ কবেন, আব সহস্র সহস্র সাধাবণ মানুষ তাঁহাব ভাবসমৃদ্ধ কীর্তন, ভাষণ ও ধর্মসাহিত্য হইতে লাভ কবে প্রেমভক্তিব উদ্দীপনা।

১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬৬ বৎসব বয়সে পৈঠানে নিজ গৃহেব অঙ্গনে হবিকথা বলিতে বলিতে এই হবিময ভক্তিসিন্ধু মহাপুবুষ সজ্ঞানে অমবলোকে প্রযাণ কবেন।

বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী

উত্তর ভারতের সাধক ও সারস্বত সমাজের এক অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে শুরু করিয়া অর্ধশত বৎসরের অধিককাল অধ্যাত্ম ভারতের প্রাণকেন্দ্র বারাণসীতে এই মহাত্মা বিরাজিত থাকেন বিস্তারিত করেন তাঁহার তপস্যার আলোক। সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ দুই-ই দলে দলে শরণ নিত তাঁহার চরণতলে। ত্যাগ বৈরাগ্য ও জ্ঞানের হরিহর-মূর্তি এই মহাসাধকের জীবন হইতে সংগ্রহ করিত মুক্তিপথের পাথেয়।

বিশুদ্ধানন্দের পূর্বাশ্রমের পিতার নাম সংগমলাল, মাতা যমুনাদেবী। উত্তর-প্রদেশের বৌড়ী গ্রামে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ বংশে সংগমলালজীর জন্ম। সংসারের আর্থিক সচ্ছলতা তেমন ছিল না। ভাগ্য অন্বেষণে দেশের নানাস্থানে ঘোরাফেরা করিয়া অবশেষে তিনি হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের কল্যাণী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। সরসুখরাম এখানকার নবাব সরকারের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, ইহারই আশ্রয়ে থাকিয়া সংগমলাল সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে সরসুখরামের ভগিনী যমুনাদেবীকে তিনি বিবাহ করেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমীর পুণ্যদিনে মাতুলগৃহে বিশুদ্ধানন্দের জন্ম হয়। গৌরকান্তি, অনিন্দ্যসুন্দর এই নবজাত শিশুটিকে পাইয়া সকলের সেদিন আনন্দের অবধি নাই।

জন্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে জন্ম, তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া শিশুর নাম রাখা হইল—বংশীধর। পিতা সংগমলালজী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া শহরের এক জ্যোতির্বীকে ডাকাইয়া আনিলেন। ইতিপূর্বে পর পর দুইটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্পকাল মধ্যে মারা গিয়াছে। তাই নবজাত শিশুটিকে নিয়া তাঁহার মহা দুশ্চিন্তা। কিন্তু জন্মলগ্ন বিচার করিয়া জ্যোতিষী কহিলেন, "আপনারা ঘাবড়াবেন না। আমি দেখতে পাচ্ছি, এ শিশু দীর্ঘজীবী হবে, শুধু তাই নয় সহস্র সহস্র মানুষকে সে দেবে আশ্রয়।"

বৎসরখানেক পরে ধুমধাম করিয়া বংশীধরের অন্নারম্ভ উৎসব সম্পন্ন হয়। শিশুর কল্যাণের জন্য পূজা হোম যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানও কম করা হয় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পকালের মধ্যে বংশীধর আক্রান্ত হয় দুশ্চিকিৎস্য রোগে। তাহার দেহে দেখা দেয় মূর্ছা বা অপস্মার রোগ। এ রোগের আক্রমণের শেষে দেহটি প্রায়ই দুর্বল ও অসাড় হইয়া পড়িত।

দিন দিন শিশুর দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে। সকলেরই ধারণা হয়, এ মৃগী রোগ আর সারিবার নয়। সারা গৃহে নামিয়া আসে বিষাদ ও হতাশার অন্ধকার।

মাতুল সরসুখরাম বড় ভালবাসেন বংশীধরকে। অবসর পাইলেই মাঝে মাঝে তাহাকে নিয়া বেড়াইতে বাহির হন, নানা গল্পকথায় তাহাকে উৎফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করেন।

বংশীধরের বয়স তখন চার বৎসর। মাতুলের সঙ্গে একদিন সে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ দেখা যায় বালকের অদ্ভুত ভাবান্তর। চোখদুটি বিস্ফারিত, ভাবাবেশে সারা দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মাতুলের হাতটি সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া হঠাৎ সে থামিয়া পড়ে। ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া সরসুখরাম প্রশ্ন করেন, "কিরে বংশীধর, কি হয়েছে তোর ? অমন করছিস কেন ? আমায় কিছু বলবি ?"

"মামাজী, মামাজী। আমার কেতাব কোথায় ?" উত্তেজিত স্বরে বলিতে থাকে বালক বংশীধর।

"কোন্ কেতাব, কিসের কেতাব, ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্, এখনই তোকে আমি তা কিনে দিচ্ছি।"

"আমার নিজের সেই কেতাবটি এনে দাও। তা পেলেই আমার ব্যারাম সেরে যাবে। আমি ভালো হয়ে উঠবো।" মোহগ্রস্তের মতো কথাটি সে বার বার আওড়ায়।

সরসুখরাম ভাবেন, রোগে ভুগিতে ভুগিতে বালকের মস্তিষ্কের ধারণশক্তি কমিয়া গিয়াছে। মাথায় হঠাৎ খেয়াল চাপিয়াছে একটা বই চাই। তাই নিয়াই আজ সে এমন উত্তেজিত। বাড়িতে ফিরিয়া রংবেরং-এর বই দুই চারটি আনিয়া দিলেন, কিন্তু বংশীধরের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নাই। এগুলি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে কাঁদিতে বসে তাহার কোন্ এক কাল্পনিক বই-এর জন্য।

মাতুল সান্ত্বনা দেন, "বেশ তো, বংশী, এনে দেবো তোর বই। কিন্তু কোথায় রয়েছে, তা তো বলবি।"

সজলচক্ষে বালক উত্তর দেয়, "তা রয়েছে আমার কুঠিয়ায়। শিগ্গীর তোমরা খুঁজে নিয়ে এসো। নইলে আমি বাঁচবো না।"

এ অদ্ভুত কথার কি রহস্য তা কে জানে ? বাড়ির লোকেরা আর ইহা নিয়া মাথা ঘামান নাই।

অসুখ কি করিয়া ভালো হইবে, এই চিন্তায় জননীর মনে কিন্তু একটুও শান্তি নাই। সাধুসন্তের সন্ধান পাইলেই তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটিয়া যান। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাঁহাকে ঘরে আনাইয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করান, কিন্তু কোনো কিছুতেই কাজ হইতেছে না। যমুনাদেবী ক্রমে একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন।

কল্যাণীতে সে-বার এক সতীদাহ অনুষ্ঠিত হইবে। একটি ক্ষত্রিয় নারী পতির জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করার সংকল্প নিয়াছেন, সংবাদ পাইয়া দলে দলে লোক ছুটিয়া চলিয়াছে শ্মশানের দিকে।

সাধারণ মানুষের ধারণা, চিতাশয্যায় উপবিষ্টা সতী নারীর আশীর্বাদ একেবারে অমোঘ, তাহা কখনো ব্যর্থ হয় না। যমুনাদেবী স্থির করিলেন, বালক বংশীধরকে নিয়া সতীর কাছে যাইবেন, রোগমুক্তির জন্য মাগিবেন তাঁহার আশীর্বাদ।

চিতাশয্যার কাছে গিয়া সাশ্রুনয়নে পুত্রের জটিল রোগের কথা নিবেদন করা মাত্র সতী বলিয়া উঠেন, "বহিন, তুমি তোমার এ ছেলের জন্য মোটেই ভেবো না। সিদ্ধযোগীর চিহ্ন রয়েছে এর দেহে। অকালমৃত্যু কখনো এর ঘটবে না। তবে একে হয়তো তোমরা ধরে রাখতে পারবে না, ঘর ছেড়ে এ ছেলে সন্ন্যাসী হবে।"

পুত্রকে নিয়া যমুনাদেবী গৃহে ফিরিয়া আসেন। যে কারণেই হোক বেশ কিছু-

দিন বংশীধর মূর্ছা-রোগে আক্রান্ত হয় নাই। কিন্তু বৎসরখানেক বাদে আবার ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে শুরু করে। আত্মীয়স্বজনদের উদ্বেগ আরো বাড়িয়া যায়।

কল্যাণীর কাছেই কীর্ণা ও মঞ্জিরা নদীর পবিত্র সঙ্গমস্থল। প্রতি বৎসর হাজার হাজার নরনারী এখানে স্নান করিতে আসে। একটি বৃহৎ মেলা উৎসবও এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

সরসুখরাম আত্মপরিজন ও বন্ধুদের নিয়া সে-বার এই মেলায় আসিয়াছেন। স্নান-তর্পণের শেষে একজন সঙ্গী কহেন, "এখানে ঘাটের খুব কাছেই একটা পর্ণকুটিরে একান্তে বাস করেন এক বড় মহাত্মা। যাবে তাঁকে দর্শন করতে?"

সাধুদর্শনের কথায় সবাই মহা উৎসাহী হইয়া উঠে। সরসুখরাম বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি বলেন, "না, এত লোক নিয়ে গিয়ে মহাত্মার শান্তিভঙ্গ করা কখনো ঠিক নয়। ছোট ছেলেমেয়েরা এই ঘাটে বসে থাকুক। চল, আমরা আর সবাই সেখানে যাই।"

সঙ্গীরা সবাই এ কথায় সায় দেয়—কিন্তু গোল বাধাইয়া বসে পাঁচ বৎসরের বালক বংশীধর। সে বায়না ধরে, "না— আমি যাবোই সাধুজীকে দেখতে। আমায় নিয়ে চল। আমি এখানে থাকবো না।"

বালককে বুঝাইয়া নিরস্ত করা যায় না, তখনি সে শুরু করে তুমুল চিৎকার আর কান্না। মাতুলকে হার মানিতে হয়, বংশীধরসহ সবাইকে নিয়া উপস্থিত হন সাধুর আশ্রমে।

প্রণাম নিবেদনের পর সাধু একে একে সবাইকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। এবার বালকের দিকে সহাস্যে তাকাইয়া মাতুল সরসুখরাম কহেন, "বংশী, এখানে আসবার জন্য তো এতো কাঁদাকাটি করলি। কিন্তু এসে কি তোর লাভ হলো, বলতো?"

বালক কিন্তু ইতিমধ্যে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই পর্ণকুটিরের এদিক ওদিক তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে কি যেন সে খুঁজিয়া বেড়ায়। হঠাৎ দৃঢ়স্বরে সে বলিয়া বসে, "মামাজী, এই তো, এই কুঠিরার ভেতরেই আছে আমার সেই কেতাব। আমার নিজের হাতে লেখা সেই কেতাব। হ্যাঁ, এখানেই রয়েছে।"

মহাত্মার দিকে ফিরিয়া সরসুখরাম করজোড়ে বলেন, "প্রভু, দেখুন এ বালক কি বলছে। তার নিজের হাতে লেখা একটা বই নাকি এখানে রয়েছে। এ বইয়ের কথা আগেও ওর মুখে আমরা শুনেছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি, এর ভেতরে কোনো রহস্য আছে কিনা, তা আমরা কি ক'রে বুঝবো।"

মহাত্মা শান্ত স্বরে কহেন, "আর কি বলে এই বালক, আমায় খুলে বল তো?"

"প্রভু, আমার এই ভাগ্নেটি মূর্ছারোগে ভুগছে অনেকদিন। শরীর বড় দুর্বল, আর বেশী দিন বাঁচবে বলে তো মনে হয় না। এই বই প্রসঙ্গে বালক কিন্তু একটা অদ্ভুত কথা বলে। এই বই ওর নিজস্ব বই, আর এটা খুঁজে পেলে ওর রোগ নাকি সেরে যাবে। এখন আপনার আশ্রমে এসে তো দৃঢ়স্বরে বলছে বইটি এখানেই রয়েছে।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সাধু মহারাজ কহেন, "দ্যাখো, এ বালক কিন্তু ঠিক বালকভাব থেকে কথাগুলো বলছে না, একটা দিব্যভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েছে। তোমরা তন্ন তন্ন ক'রে আমার কুটিরে অনুসন্ধান করো। কোনো পুরানো হাতে-লেখা পুঁথি আছে কিনা, দ্যাখো।"

ছোট খডোঘব। গ্রন্হপেটিকা ছাড়া অন্য আসবাবপত্র তেমন বেশী কিছু নাই। অনুসন্ধানেব কাজ শেষ হইল, কিন্তু বালকেব কথিত বই-এব পান্ডুলিপি কোথাও পাওযা গেল না।

এবাব ভাবাবিষ্ট বংশীধবেব দেখা গেল নূতন বূপ। কি এক অজ্ঞাত আনন্দে সে ভবপুব। সাবা দেহ বোমাঞ্চিত, কম্পমান। দুই চোখ বাহিযা ঝবিতেছে পুলকাশ্রু, নাসিকাব ঘন ঘন বহিতেছে দীর্ঘশ্বাস। আত্মপ্রত্যযেব সুবে সে বলিযা ওঠে, "কুটিবেব চালেব বাতা ভালো ক'বে খুঁজে দ্যাখো। ওখানেই পাবে আমাব বই। হ্যাঁ, আব ভয নেই, এবাবে আমাব বোগ যাবে পালিয়ে, তোমাদেবও আব থাকবে না কোনো কষ্ট।"

বালকেব নির্দেশিত সেই স্থানটিতেই পাওযা গেল একখানি পুবাতন হস্তলিখিত জীর্ণ পুঁথি। একখন্ড কাপড দিযা সযত্নে জড়ানো।

বংশীধবেব হাতে বইযেব মোডকটি দেওযা মাত্র চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইযা উঠে, ভাবাবেশ অন্তর্হিত হয। স্বাভাবিক বালক-ভাব আবাব ফুটিযা উঠে তাহাব দেহ-মনে।

সাধুজী গ্রন্হটি সতর্কভাবে পবীক্ষা কবেন, বিস্মযে তাহাব চোখ দুইটি বিস্ফাবিত হইযা উঠে। সজল চক্ষে আবেগভবা কণ্ঠে কহেন, "এ যে আমাব গুবুদেবেব স্বহস্ত লিখিত গ্রন্হ। গীতাব নির্যাস এতে তিনি লিখেছেন, এ গ্রন্হ তাঁব বডই প্রিয ছিল। পাঁচ বৎসব আগে, তাঁব দেহান্তেব প্রাক্কালে বাব বাব এটি তিনি চেযেছিলেন তখন খুঁজে পাওযা যায নি এবং এ জন্য মর্মাহত হযে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কবেন।"

উপস্থিত সকলে তো এ কাহিনী শুনিযা মহা বিস্মিত। সবসুখবাম কৌতূহলভবে প্রশ্ন কবেন, "মহাবাজ, সেই গ্রন্হেব সঙ্গে এ বালকেব কি সম্পর্ক তাতো বুঝতে পাবছিনে। একটু বিশদ ক'বে বলুন।"

"ভগবান্ গীতাতে বলেছেন, মৃত্যুব সময় মানুষ যে ভাবে ভাবিত হয, পববর্তী জীবনে সেই ভাব ও সেই সংস্কাব উদ্গত হতে দেখা যায তাব ভেতবে। তোমাদেব বংশেব এই জাতিস্মব বালক পূর্বজন্মে ছিলেন আমাদেব গুবুদেব। এ আশ্রমেবই অধ্যক্ষ তিনি ছিলেন। এখন থেকে এঁব দেহ বোগমুক্ত হলো। তোমবা লক্ষ্য বেখো, অদূব ভবিষ্যতে এঁব সাত্ত্বিক সংস্কাব জেগে উঠবে। আব পূর্বজন্মেব মতো ইনি এ জন্মেও গ্রহণ কববেন সন্ন্যাস-জীবন।"

অতঃপব বাড়িব সবাব সঙ্গে বালক বংশীধব কল্যাণীতে ফিবিযা আসে। এই ঘটনাব পব হইতে আব কোনোদিন কিন্তু মূর্ছা-বোগে সে আক্রান্ত হয নাই। ধীবে ধীবে সে একটি সুস্থ সবল কিশোবে পবিণত হয।

কিশোব-বংশীধবেব জীবনে এবাব আসে আব এক বড দুর্দৈব। অল্পদিনেব ব্যবধানে পিতামাতা উভযেই ইহলোক ত্যাগ কবিযা চলিযা যান। মাতুল সবসুখবাম এই কিশোব ভাগ্নেটিকে বড ভালোবাসেন। এখন হইতে তিনিই গ্রহণ কবেন বংশীধবেব সকল কিছু দাযিত্ব। শিক্ষাব সর্বপ্রকাব সুযোগ দিযা প্রকৃত মানুষবূপে তাহাকে গডিযা তোলাব জন্য তিনি সচেষ্ট হন।

ভট্টজী নামে এক বিখ্যাত পন্ডিত নিকটেই থাকেন, তাঁহাব টোলে বংশীধবকে পডিতে দেওযা হয। বালক অতি অল্প সমযে সংস্কৃত ব্যাকবণ, কাব্য, অলংকাব

প্রভৃতির পাঠ শেষ করিয়া ফেলে। স্মৃতিশক্তি তাহার অতিশয় প্রখর, একবার যাহা অধ্যয়ন করে, আর কখনো বিস্মৃত হয় না। শিক্ষাগুরু ভট্টজী এজন্য তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন, ডাকিতেন শ্রুতিধর বলিয়া।

কয়েক বৎসর সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ বেদান্ত পাঠে অতিবাহিত হয়। অতঃপর সরসুখরাম বংশীধরের ফার্সী ও মারাঠী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই দুইটি ভাষার উপর দখল না থাকিলে তখনকার দিনে দাক্ষিণাত্যে কেহ সরকারী দপ্তরে উন্নতি করিতে পারিত না। তাই সরসুখরাম তাড়াতাড়ি ভাগ্নেকে এই ভাষা দুইটি শিখাইয়া নিতে চেষ্টিত হন। প্রতিভাধর বংশীধরও অনতিবিলম্বে ইহাতে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন।

বংশীধর তখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। সুন্দর সুঠাম দেহ ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খেলার মাঠে দৈহিক শক্তি ও মনোবলের দিক দিয়া কেহই তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

মাতুল সরসুখরাম নবাব সরকারের সেনাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাছাড়া, তাঁর দক্ষতায় নবাব মমতাজুল ওমরাহ্ তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন। তাই সরসুখরাম ভাবিলেন, ভাগ্নেকে সেনা বিভাগে ভর্তি করাইয়া দিবেন। দৈহিক বল, সাহস ও দক্ষতা বংশীধরের যথেষ্ট। কাজেই এ বিভাগের কাজে তাড়াতাড়ি সে উন্নতি করিতে পারিবে। এসব ভাবিয়া বংশীধরকে অশ্বচালনা ও বন্দুকবিদ্যায় নিপুণ করিয়া তুলিতে তিনি উদ্যোগী হন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায়, বংশীধর একজন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর সুযোগমতো মাতুল তাঁহাকে সেনাদলের শিক্ষা-নবীশের কাজে ভর্তি করিয়া দিলেন।

নবাবের সেনা শিবিরে সেদিন একটি তেজী আরবী ঘোড়া কেনা হইয়াছে। বড় দুরন্ত ও চঞ্চল এই ঘোড়াটি, সহজে বশে আসিতে চায় না। সওয়ার তেমন দক্ষ নয় বুঝিলেই ঝাঁকুনি দিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেয়। তাই এ ঘোড়াটি নিয়া কর্তৃপক্ষ বড় সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছেন। বংশীধর কহিল, "আপনারা যদি অনুমতি দেন, আমি এই দুষ্টু ঘোড়াটাকে সায়েস্তা করতে পারি।"

দুর্ধর্ষ ঘোড়াটি নিয়া শিবিরের অধ্যক্ষের দুশ্চিন্তার অবধি নাই। কহিলেন, "এতো খুব ভালো কথা। বংশীধর, তুমি এখনই ঘোড়াটাকে কিছুক্ষণ ছুটিয়ে নিয়ে এসো।'

বংশীধরের অপর দুই শিক্ষানবীশ বন্ধু সেখানে দণ্ডায়মান। ইহাদের একজন নবাবের পুত্র মেহেদি হুসেন, অপরজন কবীর হুসেন—নবাবের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র। সেনাবিভাগের নূতন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বংশীধর সাহস, কৌশল ও দক্ষতায় শীর্ষস্থানীয়। তাই উপরোক্ত দুই কুমারের কিছুটা ঈর্ষা আছে তাহার প্রতি। বংশীধরকে কোনো কৃতিত্বের সুযোগ দিতে তাহারা ইচ্ছুক নয়। ভয় দেখাইয়া তাহারা বলে, "এই পাগ্‌লা ঘোড়াটার সওয়ার হবে, কেন ভাই শুধু শুধু প্রাণটা খোয়াবি ?"

বংশীধর নিরস্ত হওয়ার পাত্র নয়। হাসিয়া বলে, "দেখি একবার কে জেতে, ঘোড়া না তার সওয়ার।'

এই আরবী ঘোড়ার উপর অবলীলায় সে চড়িয়া বসে। অদ্ভুত কৌশলে তাকে আয়ত্তে আনে, তারপরে সপাসপ চাবুক চালাইয়া [illegible]

যায়। ঊর্ধ্বশ্বাসে কয়েক ঘণ্টা অবিরাম দৌড়ানোর পর ঘোড়াটি ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শিবিরে ফিরিলে দেখা যায় – পূর্বের সে অবাধ্যতা আর নাই, দুর্ধর্ষ আরবী ঘোড়া সম্পূর্ণরূপে তাহার সওয়ারের বশে আসিয়া গিয়াছে। উপস্থিত অনেকেই বংশীধরকে সাধুবাদ করিতে থাকে।

ঘোড়াটিকে দানাপানি দিয়া আদর জানাইয়া বংশীধর ঘরে ফিরিয়া যায়। পরের দিন ভোরে উঠিয়াই কিন্তু শুনে এক দুঃসংবাদ। এত পরিশ্রম করিয়া যে ঘোড়াটাকে সে আয়ত্তে আনিয়াছে, গত রাত্রে সেটি হঠাৎ মারা গিয়াছে।

শিবিরের অধ্যক্ষ বড় ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। নবাব বাহাদুর নিজে সখ করিয়া, বহু অর্থব্যয়ে এই তেজী আরবী ঘোড়াটি বিদেশী বণিকদের কাছ হইতে কিনিয়াছেন। এটির মৃত্যু হইয়াছে শুনিলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিবে না।

এদিকে বংশীধরের সাফল্যে নবাবের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরও শুরু হইয়াছে গাত্রদাহ। তাড়াতাড়ি নবাবকে তাহারা ঘোড়াটির মৃত্যু-সংবাদ দেয়। আরো জানায়, "এজন্য দায়ী বংশীধর। অবিরাম চাবুক মেরে ঘোড়াটাকে অনর্থক সে দূর দূরান্তে ছুটিয়েছে। অতিরিক্ত শ্রান্ত হবার ফলেই ঘটেছে এর মৃত্যু।"

নবাব বাহাদুর ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন। বংশীধরকে তখনি সেখানে ডাকাইয়া আনা হয়। অভিযোগ শুনিয়া শান্তস্বরে সে বলে, "হুজুর কাল সন্ধ্যার পর আস্তাবলে ফিরে এসে এ ঘোড়া আমার হাত থেকে সাগ্রহে দানাপানি খেয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় পশুরা সহজে কোনো কিছু খেতে চায় না। কিন্তু এ ঘোড়াটি খেতে তখন কোনো অনিচ্ছা প্রকাশ করে নি কাজেই বহুক্ষণ ছুটাছুটির পরেও সে বেশ সুস্থই ছিল। মৃত্যু ঘটেছে গভীর রাতে। হয় কোনো সংক্রামক রোগে, নয় তো সহিসদের দোষে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এজন্য আমাকে দায়ী করা কি সঙ্গত?"

নবাব রুষ্ট হইয়াই আছেন, এ কথায় কোনো কান দিলেন না। বংশীধরের জন্য ব্যবস্থা হইল হাজতবাসের। মাতুল সবসুখরাম দরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তি, তিনি কাছে থাকিলে নবাবকে বুঝাইয়া নরম করিতে পারিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারী কাজে কয়েকদিনের জন্য তিনি হায়দাবাদে গিয়াছেন। কাজেই ইতিমধ্যে বংশীধরকে হাজতে প্রবেশ করিতেই হইল।

কয়েকদিনের মধ্যেই সবসুখরাম কল্যাণীতে ফিরিয়া আসিলেন। আনুপূর্বিক সব ঘটনা শুনিয়া তিনি তো স্তম্ভিত। অতঃপর নবাব বাহাদুরকে অনেক বুঝাইয়া তিনি শান্ত করেন, ভাগিনেয়কে মুক্ত করেন হাজতবাস হইতে।

এদিকে এ কয়দিন কারাকক্ষে বাস করার ফলে বংশীধরের অন্তরে জাগিয়াছে নির্বেদ, সংসারের সব কিছুতে আসিয়াছে চরম বিরক্তি। বসিয়া বসিয়া কেবলই ভাবেন, যেখানে প্রতি পদে ঈর্ষা, স্বার্থবুদ্ধি আর বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গীন উঁচানো, সেখানে কোথায় আনন্দ, কোথায় শান্তি? নাঃ, এমন স্থানে বাস করার কোনো সার্থকতা নাই। এর চাইতে সন্ন্যাসী হইয়া পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ানো অনেক ভালো।

কল্যাণীর একপ্রান্তে লোকালয় হইতে দূরে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মনে শান্তি নাই, নানা দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত বংশীধর আজকাল প্রায়ই সেখানে ছুটিয়া যান, নির্জনে আপনমনে চুপচাপ বসিয়া থাকেন। সেদিন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন

জটাজুটমণ্ডিত সৌম্যদর্শন এক প্রবীণ সন্ন্যাসী। পরমহংসজী নামে এ অঞ্চলে তিনি খ্যাত। পূর্বাশ্রমে ছিলেন পেশোয়া বংশের সন্তান। মোক্ষলাভের আশায় বহুদিন আগে ঘর ছাড়িয়া বাহির হন, কঠোর তপস্যায় হন আপ্তকাম।

পরমহংসজীকে দেখা মাত্র বংশীধর উচ্চকিত হইয়া উঠেন, নিকটে গিয়া নিবেদন করেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

আশিস্ জানাইয়া পরমহংসজী কহেন, "বৎস, দেখছি, অন্তরে তোমার শান্তি নেই। এক দুঃসহ জ্বালা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছো। কি তোমার সংকট, আমায় খুলে বল।"

"প্রভু, আপনি সর্বজ্ঞ, ঠিকই ধরেছেন। অন্তরের জ্বালা আমার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সংসারের সব কিছুই হয়ে গিয়েছে তিক্ত, বিস্বাদ অর্থশূন্য। স্থির করেছি, মনের দুঃখ-জ্বালা এড়াবার জন্য গ্রহণ করবো সন্ন্যাসীর জীবন।"—কাতর স্বরে নিবেদন করেন বংশীধর।

"এই তরুণ বয়সে, কেন সংসারের প্রতি তোমার এই বিরক্তি, বৎস?"

"সাত বৎসর বয়সে পিতামাতা দুই-ই হারিয়েছি। বালক-জীবনের ওপর পড়েছে বিধাতার নির্মম আঘাত। তারপর মাতুলের আশ্রয়ে দিন মোটামুটি ভালোই কাটছিল। কিন্তু এবার যেন জীবনের বাস্তব রূপ, নিষ্ঠুর রূপটাই, আমার অভিজ্ঞতায় বেশী ধরা পড়েছে।"

"বিশদ ক'রে সকল কথা আমায় বলো, বৎস।"

"যাদের আমি অকৃত্রিম বন্ধু বলে জানতাম, তাদের চক্রান্তে আমায় যেতে হয়েছে কারাগারে। দেশের শাসক ও প্রতিপালক মতিচ্ছন্ন হয়েছেন, ঘোরতর অবিচার করেছেন আমার প্রতি। কয়েকদিনের কারাবাসই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে। বুঝেছি, গোটা গৃহস্থ-জীবনই আসলে একটা বন্দী-জীবন। শান্তি নেই, আনন্দ নেই, এখানে পড়ে পড়ে অদৃষ্টের মার খাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। তাই তো সন্ন্যাস নেবো বলে সংকল্প করেছি। কৃপা ক'রে আপনি আমায় এ বিষয়ে সাহায্য করুন।"

"বৎস, যিনি তোমার আমার প্রভু, সবার প্রভু, তিনি আগে থেকেই তোমার অবস্থার কথা আমায় জানিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই ঠিক এই সময়ে তোমার সমক্ষে আমার আগমন।"

"আশা হচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে, আপনার কথা শুনে। এবার কৃপা ক'রে বলুন, কি আমায় করতে হবে।"

"বৎস, সন্ন্যাস বড় কঠিন ব্রত। এ ব্রত নেবার আগে যথেষ্ট প্রস্তুতি চাই। শুধু গৃহত্যাগ করলেই হবে না। সন্ন্যাসীকে এ জন্যেই ব্রহ্মলাভ করতে হবে এবং এজন্য সর্বাগ্রে চাই ত্যাগ, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য—চাই শাস্ত্রাভ্যাস ও কঠোর সাধনা। প্রস্তুতির এই ধাপগুলি পেরিয়ে যেতে পারলে তবেই আসবে পরাশান্তি ও পরাজ্ঞান—যেজন্য অজান্তিতে তোমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

"বেশ প্রভু, আপনার কথিত মতো দীর্ঘ-প্রস্তুতির পথই আমি বেছে নেবো। কিন্তু একটা প্রার্থনা। কৃপা ক'রে যখন এসেছেনই, আপনি আমায় দীক্ষা দিন, সন্ন্যাস দিন এ জীবন কৃতার্থ হোক।"

"না—বৎস, আমি তোমার গুরু নই। তোমার চিহ্নিত গুরু রয়েছেন উত্তর ভারতে। যথা সময়ে তাঁর দর্শন পাবে। হ্যাঁ, এবার শোনো আমার কথা। প্রথমে তুমি পুণ্যতীর্থ নাসিকে যাও। সেখানে বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন ক'রে বেদ বেদাঙ্গের অধ্যয়ন শুরু করো।"

"আপনার দর্শন ও উপদেশ আবার কবে পাবো, প্রভু?" সজল চক্ষে প্রশ্ন করেন বংশীধর।

"প্রয়োজনমতো আমি নিজেই আবির্ভূত হবো তোমার সকাশে।' একথা বলার পর পরমহংসজী মন্দিরচত্বর ছাড়িয়া প্রবেশ করেন সন্নিহিত অরণ্যে। তারপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া যান।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বংশীধর মাতুল সবসুখরামের উদ্দেশে এক চিঠি লিখিলেন। সতের বৎসরের বালকের সেই চিঠির মর্ম

"জীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা এই অল্প বয়সে আমার হয়েছে, তাতে দেখেছি—এ সংসার নিতান্ত দুঃখময়। এর জটিল জালে জড়িয়ে অসহায়ের মতো কেবলি নির্যাতন সহ্য করতে হয়। আর এটাও আমি বুঝেছি—সংসারের সব কিছুই নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী একমাত্র ঈশ্বরই অবিনশ্বর, তাঁর ধামেই রয়েছে পরম শান্তি, পরম আনন্দ। আমি ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই চিরতরে গৃহত্যাগ ক'রে যাচ্ছি। আমার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবেন না, কারণ ঘরে ফেরা আমার কোনো মতেই সম্ভব নয়। পুত্র-নির্বিশেষে আপনি আমায় পালন করেছেন, মাতা পিতার অভাব বুঝতে দেন নি কোনোদিন, আপনার স্নেহ মমতা ও কল্যাণেচ্ছার ঋণ কখনো শোধ করার নয়। আমায় আপনি মার্জনা করবেন, গ্রহণ করবেন আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম।

সেই রাত্রেই গোপনে বংশীধর কল্যাণী ত্যাগ করিলেন। পদব্রজে চলিলেন নাসিকের উদ্দেশে। পরের দিন তাঁহার চিঠি পড়িয়া মাতুল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন। সারা গৃহে নামিয়া আসে নৈরাশ্যের অন্ধকার।

নাসিকের এক নিষ্ঠাবান্ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে থাকিয়া বংশীধর বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ প্রতিভা ও ধীশক্তি তাঁহার। তিন বৎসরের মধ্যে শিক্ষা-গুরুর গ্রন্থাদি তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে তপস্যার জন্য, প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভের জন্যও তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কোথায় তাঁহার চিহ্নিত সদ্গুরু, কবে তাঁহার কৃপা পাইবেন, কোন্ সাধন নিয়া অগ্রসর হইবেন, ভাবিয়া কূল-কিনারা পান না।

বিষাদ-খিন্ন হৃদয়ে গোদাবরীর তটে সেদিন বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দ্বিতীয়বার দর্শন দিলেন কল্যাণকামী সন্ন্যাসী পরমহংসজী। স্নেহ মাখা স্বরে কহিলেন, "বৎস বংশীধর, তুমি এবার পদব্রজে বেরিয়ে পড়ো উত্তর ভারতের দিকে। পথে ওঙ্কারনাথের জ্যোতির্লিঙ্গ আর উজ্জয়িনীর মহাকাল দর্শন ক'রে যেও। ব্রহ্মচারীদের পক্ষে মহাকাল মন্দিরে ব'সে শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্রের জপ অত্যন্ত কল্যাণকর। তুমি এই জপ-সাধন সেখানে সম্পন্ন ক'রো।"

ওঙ্কারনাথ তীর্থ লক্ষ্য করিয়া বংশীধর চলিতে থাকেন। তখনকার দিনে পথঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল না। মারাঠা শক্তির সবে মাত্র পতন ঘটিয়াছে, তাই চারি-

দিকেই রাজনৈতিক অশান্তি আর সামাজিক বিশৃঙ্খলা। পথে ঠগী ও ডাকাতদের উপদ্রবও বৃদ্ধির পথে। এ অবস্থায় একাকী কোথাও যাওয়া বিপজ্জনক। একদল বণিকের সঙ্গে মিলিত হইয়া বংশীধর পথ চলিতেছেন।

এই দলে কখন যে কয়েকজন ডাকাত কারবারীর বেশে ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। বংশীধরের কান্তি সুগৌর, সুন্দর সুঠাম দেহ, চোখে মুখে আভিজাত্যের ছাপ। ডাকাতরা ভাবিল, নিশ্চয়ই এ যুবক কোনো সম্ভ্রান্ত জমিদারের পুত্র, কোনো জরুরী কাজে দূরদেশে যাইতেছে। কোমরের পেটিতে প্রচুর অর্থ যে লুকানো আছে তাহাতেও কোনো সন্দেহ নাই। স্থির করিল, পথের মধ্যে কোথাও তাহাকে হত্যা করিয়া টাকাকড়ি ও সোনাদানা লুটিয়া নিবে।

যাত্রিদল সেদিন দৌলতাবাদের কাছে আসিয়া পেঁছিয়াছে। এ সময়ে এক চটিতে অবস্থান করার সময় দুর্বৃত্তেরা বংশীধরের খাদ্যে বিষ মিশাইয়া দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে, দেহটি হয় নীলবর্ণ, অসাড়—মুখ দিয়া ঘন ঘন ফেনা নির্গত হইতে থাকে। সঙ্গীরা প্রমাদ গণিতে থাকে। এই মুমূর্ষু যুবক সম্বন্ধে আর মাথা না ঘামাইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে তাহারা প্রস্থান করে। ডাকাতেরা দেহ তল্লাস করিয়া দেখে টাকাকড়ি বংশীধরের কাছে কিছুই নাই। অগত্যা তাহারাও সেখান হইতে চম্পট দেয়।

স্থানীয় এক বিত্তবান্ পাটেল এই সময়ে দৌলতাবাদের দিকে যাইতেছিলেন। চটির সম্মুখে আসিয়া দেখেন, এক সুদর্শন যুবক মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছে। ব্যাকুল হইয়া তখনি তিনি গ্রাম হইতে এক চিকিৎসক ডাকাইয়া আনেন, চিকিৎসা ও পরিচর্যার ফলে বংশীধর অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠেন। যুবকটির উপর পাটেলের ইতিমধ্যে বড় মমতা পড়িয়া গিয়াছে। পরম যত্নে তাঁহাকে তিনি এবার দৌলতাবাদে নিজ গৃহে নিয়া যান, সেবা ও শুশ্রূষার যথোচিত ব্যবস্থা করেন। অতঃপর কয়েকদিনের মধ্যেই বংশীধরকে অনেকটা ভালো হইয়া উঠিতে দেখা যায়।

পাটেলের স্ত্রী সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন বংশীধরকে। মায়ের মমতা ও স্নেহ দিয়া সদাই তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিতে তিনি ব্যস্ত। বংশীধরকে তিনি জানাইয়া দেন, "শোনো বাবা, ভগবানের দয়ায় মৃত্যুর মুখ থেকে তুমি উঠে এসেছো। স্বাস্থ্য তো একেবারেই ভেঙে পড়েছে। সাফ কথা বলে দিচ্ছি তোমার শরীর না সারলে আমরা তোমায় কোথাও যেতে দেবো না। মনের আনন্দে আমাদের কাছে কয়েকমাস থাকো, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করো, তারপর যাবার কথা ভাববে।"

শুধু স্নেহময়ী গৃহকর্ত্রীই নয়, বাড়ির আর সকলেও বড় ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে বংশীধরকে, কেহই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নয়। অগত্যা কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে স্থান ত্যাগের সংকল্প ত্যাগ করিতে হয়।

পরম আনন্দ ও আরামে দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে। এভাবে প্রায় তিন মাস অতিক্রান্ত হইল। পাটেলের বৃদ্ধা জননী বংশীধরকে নিজের নাতির মতোই স্নেহ করেন, বংশীধরও তাঁহার প্রতি কম শ্রদ্ধাবান্ নয়। প্রতিদিন সকালে [illegible] তিনি ভাগবত পাঠ করিয়া শুনান। সেদিনও পাঠ চলিতেছে। [illegible] শুরু হয়। রাজ্য বিত্তবিভব ও আত্মপরিজন সব কিছু ত্যাগ করিয়া [illegible]

রাজা শেষটায় আবদ্ধ হন এক হরিণশিশুর মায়ায়। অদৃষ্টের একি নিদারুণ পরিহাস! এই করুণ কাহিনীটি বর্ণনা করিতে গিয়া বংশীধর ক্রন্দন করিতে থাকেন, গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা।

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠেন, ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করেন, "বংশী, কি হয়েছে তোমার? এমন ক'রে তুমি কাঁদছো কেন? কেউ কি তোমায় গালমন্দ দিয়েছে, দুঃখ দিয়েছে?"

"না—দাদী, দুঃখ আমিই দিয়েছি আমার নিজেকে। দুঃখের সাগরে পড়ে এখন হাবুডুবু খাচ্ছি। আমার অবস্থা ভরত রাজারই মতো অথবা তাঁর চাইতে আরো শোচনীয়। সন্ন্যাস নেবো বলে আত্মীয়স্বজনের স্নেহ প্রেম ঠেলে ফেলে চলে এসেছিলাম। কিন্তু কি চরম দুর্ভাগ্য আমার—এখানে দৌলতাবাদে এসে ও গৃহপরিজনের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। নাঃ—আর নয়। আজই আমি এ স্থান ত্যাগ করবো, সিদ্ধ করবো নিজের পবিত্র সংকল্প।"

বৃদ্ধা দাদী অনেক করিয়া বুঝাইলেন। প্যাটেলের স্ত্রী আসিয়া শুরু করিলেন করুণ ক্রন্দন। কিন্তু বংশীধর নিজ সিদ্ধান্তে রহিলেন অচল অটল।

আঁচলে চোখ মুছিয়া প্যাটেলের স্ত্রী কহিলেন, "বেশ বেটা, সন্ন্যাসের পথে তুমি যখন যাবেই যাও। আর তোমায় আমরা বাধা দেবো না। কিন্তু তোমায় আমি নিজ সন্তানের মতো দেখি, এভাবে কপর্দকহীন অবস্থায় তুমি যেতে পারবে না। আমার নিজের কাছে জমানো রয়েছে পঞ্চাশটি সোনার মোহর। এগুলো তোমার সঙ্গে নিতে হবে। খাওয়া পরা আর আরামের জন্য এগুলো তুমি খরচ করবে। হ্যাঁ, এতে তুমি আপত্তি ক'রো না, বেটা।"

"ঘোর আপত্তি আছে আমার। ঘর-সংসার ছেড়ে কাঙাল সন্ন্যাসীর জীবন যে গ্রহণ করতে চলেছে, একগাদা মোহর সে কি ক'রে কোমরে বেঁধে রাখবে? কেনই বা রাখবে? ছি-ছি এ প্রলোভন আমার আপনারা যেন দেখাবেন না। তাছাড়া, এই তো সেদিন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখলাম। সঙ্গে একটি কানাকড়িও নেই, অথচ ডাকাতেরা আমায় বিষ খাওয়ালো। সোনার মোহর সঙ্গে থাকলে কি আর রক্ষে আছে? না—এসব দেবেন না?"

সাশ্রুনয়নে বাড়ির সবাই বংশীধরকে বিদায় দেন। স্নেহান্ধ প্যাটেল গৃহিণী কিন্তু এক সময় এক কান্ড করিয়া বসেন। সামনেই আসিতেছে প্রচন্ড শীত ঋতু। তাই ঝুলিতে ভরিয়া বংশীধরের জন্য একটি জীর্ণ কাঁথা দেওয়া হয়। প্যাটেল গৃহিণী গোপনে এই কাঁথাটির ভাঁজে পঞ্চাশটি মোহর তাড়াতাড়ি সেলাই করিয়া দেন। মনের একান্ত ইচ্ছা, পথে অর্থের প্রয়োজন হইলে বংশীধর ইহার সদ্ব্যবহার করিবেন।

অনেকটা দূর পথ চলিয়া আসিয়াছেন। হঠাৎ একসময়ে বংশীধরের হাতে ঠেকিল ঐ জীর্ণ কন্থার একপ্রান্ত। স্থানটি যেন বড় ভারী ঠেকিতেছে। ভাঁজ খুলিয়া তো তাঁহার চক্ষুস্থির। দেখেন, পঞ্চাশটি মোহর পাশাপাশি করিয়া সেখানে সেলাই করিয়া রাখা হইয়াছে।

মাতৃরূপিণী মহিলার এই স্নেহ নিদর্শন দেখিয়া চোখ দুটি তাঁহার শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসজল হইয়া আসে। কিন্তু কোনোমতেই যে তাঁহার পক্ষে এগুলি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পথ চলিতে চলিতে স্থির করিলেন, অচিরে কোনো দরিদ্র এবং যোগ্য-পাত্রকে মোহরগুলি দান করিবেন।

কয়েকদিন পথ চলার পর বংশীধর ওঙ্কারনাথে আসিয়া পৌঁছেন। পুরাণে বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্লিঙ্গ এখানে বিরাজিত। দর্শন করিয়া বংশীধরের আনন্দের সীমা নাই। দীর্ঘ সময় মন্দিরে ধ্যানজপ করিয়া কাটাইয়া দিলেন, নিবেদন করিলেন প্রাণের আকুতি। করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, অদৃশ্যলোক থেকে তোমার হাতছানিই আমায় ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়েছে। দেখো, ত্যাগ-বৈরাগ্য থেকে, তোমার আরাধনার পথ থেকে কোনোদিন যেন বিচ্যুত না হই।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া যায়, কাঁথায় সেলাই করা স্বর্ণমুদ্রাগুলির কথা। সানুনয়ে মহেশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানান, "প্রভু, এ সোনার শৃঙ্খল আর যে সহ্য হবে না পারছিনে। তোমার সত্যকার কোনো দরিদ্র ভক্তকে এগুলো দিয়ে দাও।"

মন্দির হইতে বংশীধর নামিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ প্রাঙ্গণের একপাশে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভাবাবেগে জড়িতকণ্ঠে শিবস্তোত্র পাঠ করিয়া চলিয়াছেন -জ্যোতির্ময়ায় পুনর্ভবভবাবণায়, দারিদ্র্য-দুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়।

বংশীধরের অন্তর হইতে কে যেন ডাকিয়া বলে, ওরে এই তো তোর স্বর্ণমুদ্রার ভার লাঘব করার সুযোগ উপস্থিত, যোগ্যপাত্র যে সামনেই রয়েছে।

নীরবে ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পাশে কিছুক্ষণ তিনি বসিয়া থাকেন। তারপর স্তোত্র-পাঠ সাঙ্গ হইলে সবিনয়ে নিবেদন করেন—

"দ্বিজবর, দেবাদিদেব আপনার প্রার্থনা শুনেছেন। দারিদ্র্য-দুঃখ থেকে আপনাকে ত্রাণ করার জন্য আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন কিছু অর্থ। আপনি তা গ্রহণ করুন।"

উত্তরে ব্রাহ্মণ কহেন, "দেখুন, নিজে আমি পরম আনন্দে আছি। শিবধামে বাস করি, আকাশবৃত্তিই আমার সম্বল। প্রভু নিজেই তাই নিত্যকার আহার জুটিয়ে দেন। আমার স্তোত্রপাঠ ও ধন-প্রার্থনা সেজন্য নয়।"

"তবে কিসের জন্য।"

"আমার একটি কন্যা অনেকদিন বিবাহযোগ্যা হয়েছে। সম্প্রতি একটি পাত্রের সন্ধানও মিলেছে। কিন্তু আমার মতো ভিক্ষুকের পক্ষে বিবাহের ব্যয় নির্বাহ করার মতো টাকাকড়ি কই? তাই তো রোজ এখানে এসে মহেশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি।"

"আপনার প্রার্থনা সফল হয়েছে, দ্বিজবর।" বলিয়াই বংশীধর জীর্ণ কাঁথার সেলাই খুলিয়া ঝক্‌ঝকে একরাশ স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণের কোঁচড়ে ঢালিয়া দেন।

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে ব্রাহ্মণ তাঁহার কোঁচড়ের দিকে তাকাইয়া আছেন। মুখে কোনো কথা সরিতেছে না।

বংশীধরের চোখে মুখে তৃপ্তির হাসি। কহিলেন, "দ্বিজবর, নিশ্চিন্ত মনে এগুলো গ্রহণ করুন। এ অর্থ অতি শুদ্ধ, কোনো অসৎ উপায়ে অর্জিত হয় নি। কোনো সম্পন্ন সৎ-গৃহস্থ এই মোহরগুলো জমিয়েছিলেন। পুত্রাধিক স্নেহে তা আমায় দান করেছেন। আমি কাঙাল, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের পথে বেরিয়েছি। এসব নিয়ে আমি কি করবো? বরং এ অর্থ আপনার মতো ভক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাজে লাগুক। প্রভু জ্যোতির্লিঙ্গের কৃপাতেই আমাদের এ যোগাযোগ সাধিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।"

অপার ঐশ কৃপার এই স্পর্শ পাইয়া, দারিদ্র্য-দুঃখ দহনের এই চমৎকারিতা দেখিয়া ব্রাহ্মণ একেবারে স্তব্ধ, আবেগ বিহ্বল। দুই নয়নে তাঁহার কেবলি ঝরিতেছে পুলকাশ্রু।

অতঃপর কয়েকদিন পদব্রজে পথ চলার পর বংশীধর উজ্জয়িনী তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রাচীনকাল হইতেই এখানকার মহাকাল মন্দিরের প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। তাছাড়া সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত গৃহস্থেরা মহাকাল বিগ্রহকে পরম জাগ্রত বলিয়াও মনে করেন। পরমহংসজী বংশীধরকে এখানকার মন্দিরে শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপের নির্দেশ দিয়াছিলেন। বংশীধর পরমনিষ্ঠার সে নির্দেশ প্রতিপালন করেন। জপসিদ্ধির ফলে অন্তর তাঁহার পরম শান্তিতে ভরিয়া উঠে, নূতনতর অধ্যাত্ম-চেতনায় উদ্দীপিত হয়।

প্রায় একমাস কাল তিনি মহাকাল মন্দিরচত্বরে অবস্থান করেন। কৃচ্ছ্র সাধন ও কঠোর তপস্যার জন্য মন তাঁহার আকুল। একাদিক্রমে পাঁচদিন কাটে নিরম্বু উপবাসের মধ্য দিয়া। অবশিষ্ট দিনগুলি আকাশবৃত্তি করিয়াই অতিবাহিত করেন। এই সময়ে এক বৃদ্ধা চানাওয়ালী দিনান্তে বংশীধরকে একমুঠা ভিজা ছোলা দিয়া যাইত, তাহা দিয়াই বৈরাগ্যবান্ তরুণ সাধক করিতেন ক্ষুধার নিবৃত্তি। দেবাদিদেব মহেশ্বরের ধ্যানজপে এসময়ে এমন গভীরভাবে তিনি নিমগ্ন থাকিতেন যে দিনরাত কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, হুঁশ থাকিত না।

এই সময়ে আর একবার ঘটে তাঁহার জীবনের অন্যতম পথ-প্রদর্শক পরমহংসজীর আবির্ভাব। পরমহংসজী কহেন, "বৎস, এখানে আর তোমার থাকার প্রয়োজন নেই। তাড়াতাড়ি উত্তর ভারতের গঙ্গাতীরের দিকে অগ্রসর হও। বিঠৌরে বাল্মীকি তপোবনে রয়েছেন অশেষ শাস্ত্রবেত্তা, প্রবীণ সাধক রাঘবেন্দ্র স্বামী। তাঁর আশ্রয়ে কিছুকাল বাস ক'রে শাস্ত্রের উচ্চতর পাঠ তুমি আরম্ভ ক'রে নাও। তোমার সাধন প্রস্তুতির এ হবে একটা বড় অঙ্গ। আরও একটা কথা। পথে আজকাল নানা গোলযোগ হচ্ছে, হঠাৎ কোনো বিপদে পড়লে ঘাবড়ে যেয়ো না। প্রভু মহেশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন।"

কয়েকজন পথচারীর সহিত মিলিত হইয়া বংশীধর সিন্ধিয়া রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। এখানকার শাসনব্যবস্থার তখন চরম বিশৃংখলা ও গোলযোগ। উত্তরাধিকারীরা সিংহাসনের দাবি নিয়া উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে চলিয়াছে চক্রীদের ষড়যন্ত্র, গ্রেপ্তার ও নির্যাতন। সন্দেহবশে পথচারী বংশীধরও কয়েকজন সঙ্গীসহ ধৃত হন। নিক্ষিপ্ত হন কারাগারে। কয়েকদিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের মুক্ত করিয়া দেন। ইহার কয়েকদিন পরেই বিন্ধ্যাচলের তীর্থাদি পরিক্রমা করিয়া বংশীধর কানপুরের কাছে বিঠৌরে উপনীত হন।

সুপ্রাচীন যুগে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম বিরাজিত ছিল আধুনিক বিঠৌরের সংলগ্ন পবিত্র ভূমিতে। আদিকবির পুণ্যময় স্মৃতিকে জনমানসে চির উজ্জ্বল রাখার জন্য পণ্ডিতবর রাঘবেন্দ্রজী এখানে একটি উচ্চতর শাস্ত্র অধ্যয়নের চতুষ্পাঠী খুলিয়াছেন, নাম বাল্মীকি তপোবন।

এখানে পৌঁছিয়াই বংশীধর রাঘবেন্দ্রজীর চরণে প্রণত হইলেন, নিবেদন করিলেন

অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। দিব্যকান্তি, বৈরাগ্যবান্ এই ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া আচার্য প্রীত হইলেন। দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, এ আশ্রমে তোমায় আমি আশ্রয় দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এ আশাও পোষণ করছি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন সমাপ্ত ক'রে তুমি তৈরি করবে তোমার অধ্যাত্মজীবনের শাস্ত্র-ভিত্তি।"

বিঠৌরের এই আশ্রমে বংশীধর তিন বৎসরকাল অধ্যয়ন করেন। তাঁহার অসামান্য মেধা, প্রতিভা ও শ্রমনিষ্ঠা দেখিয়া আচার্যের বিস্ময়ের অবধি নাই। পরম যত্নে নিজের অধীত বিদ্যা তাঁহাকে তিনি শিখাইতে থাকেন।

এই সময়ে ঘটনাচক্রে একদিন বংশীধর তাঁহার অসাধারণ গুরুভক্তির পরিচয় দেন। আচার্য রাঘবেন্দ্রজী সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই শিষ্যদের নিয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাইতেন। সেদিনও গিয়াছেন। বর্ষার প্লাবন দেখা দিয়াছে কিছুদিন যাবৎ। স্ফীতকায়া গঙ্গা খরবেগে বহিয়া চলিয়াছে। আশ্রমের কয়েকটি ছাত্র আনন্দ কলরব করিতে করিতে স্নান শুরু করিয়া দিল। একটু পরেই দেখা গেল, ইহাদের একজন প্রবল স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিয়াছে। রক্ষার কোনোই উপায় নাই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সবাই শঙ্কিত হৃদয়ে ঐ অসহায় ছাত্রটির দিকে তাকাইয়া আছে।

চরম বিপদের আর দেরি নাই। ক্ষণকালপরেই অবসন্নদেহ ছাত্রটি গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া যাইবে। রাঘবেন্দ্র আচার্য উত্তেজিত স্বরে ছাত্রদের কহিলেন, "পুরাণে তোমরা তো গুরুভক্তির কত কথাই পড়েছো। তোমাদের ভেতর এমন একজনও কি নেই যে গুরুর আশ্রিত এ যুবকটিকে উদ্ধার ক'রে আনতে পারে?"

বংশীধর নীরবে উঠিয়া দাঁড়ান, মুহূর্ত মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন বর্ষা-বিক্ষুব্ধ উত্তাল গঙ্গায়। সন্তরণে চিরদিনই তিনি পটু, দেহের শক্তি ও সাহসও যথেষ্ট। স্রোতের অনুকূলে প্রায় এক ক্রোশ সাঁতরাইয়া গিয়া শেষটায় বিপন্ন ছাত্রটিকে ধরিয়া ফেলিলেন, টানিয়া আনিলেন তীরের দিকে।

ইতিমধ্যে রাত্রির অন্ধকার গঙ্গার দুই কূল ছাইয়া ফেলিয়াছে। আচার্য রাঘবেন্দ্রজী মশাল হাতে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে নিয়া, বংশীধর ও তাঁহার সহপাঠীকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। অবশেষে তাহাদের দেখা মিলিল। সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

বার বার আশীর্বাদ জানাইয়া গুরু কহিলেন, "বংশীধর, তুমি ধন্য। তোমার মতো অন্তেবাসী পেয়ে আচার্য হিসাবে আমি গর্ব বোধ করছি। তোমার এই গুরুভক্তি, পরহিতে প্রাণ বিপন্ন করবার এই মহৎ প্রয়াস সবাইকে উদ্বুদ্ধ করুক, এই আমার কামনা।"

শাস্ত্রচর্চায় অনেক দিন অতিবাহিত হইয়াছে, এবারে বংশীধরের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে যোগসাধনার আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞান সাধনার উপর বেশী ঝোঁক থাকিলেও ঈশ্বর-লাভের অন্যান্য শাস্ত্রসম্মত পথের অভিজ্ঞতাও তিনি পাইতে চান। এবার তাই বিঠৌর ত্যাগ করিয়া তিনি উপনীত হন হিমালয়ে, উচ্চকোটির যোগীমহাত্মাদের অনুসন্ধান শুরু করেন। কয়েকদিন হরিদ্বার, কনখল ও হৃষীকেশে কাটাইয়া অবশেষে আসিয়া পৌঁছান কেদারবদরীর মহাতীর্থে।

এখানে থাকাকালে সংবাদ পান, নিচে বিষ্ণুপ্রয়াগের পর্বতগুহায় হঠযোগে সিদ্ধ এক মহাপুরুষ বাস করেন। বড় দুর্গম ও জনহীন সেই অঞ্চল। বহু দুঃখ কষ্ট ও পথশ্রম স্বীকার করিয়া সাধক বংশীধর যোগীবরের গুহায় গিয়া উপস্থিত হন। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদনের পর ব্যক্ত করেন মনের অভিলাষ। এই যোগীর কৃপায় ও নিজের অনন্য নিষ্ঠায় কয়েক বৎসরের মধ্যে হঠযোগে তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন।

হঠযোগের ফলে বংশীধরের দেহকান্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, দেহে মনে উদ্ভূত হয় এক অভূতপূর্ব শক্তি। সিদ্ধাই ও যোগসামর্থ্যও ধীরে ধীরে দেখা দেয়। কিন্তু এসব কোনো কিছুতেই বংশীধরের শান্তি নাই, আনন্দ নাই। এতকালের পরিব্রাজন, তপস্যা ও শাস্ত্রচর্চার মধ্য দিয়া ঈশ্বরলাভের জন্য, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য মন তাঁহার উদগ্র অধীর হইয়া উঠিয়াছে—পরমপ্রাপ্তির সংকল্প হইয়াছে দৃঢ়তর। কিন্তু হঠযোগের সাধনক্রমের মধ্য দিয়া জীবনের সেই লক্ষ্যে তো পেঁীছিতে পারিতেছেন না।

নিরপেক্ষ মন নিয়া দিনের পর দিন ভাবিয়া দেখিলেন, নিজের সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণও কম করিলেন না। চিত্তের যে শুদ্ধতা, প্রশান্তি ও স্থৈর্য সাধিত হইলে পরা চৈতন্যের উদয় হয়, হঠযোগের সাধনায় তাহা লাভ করা দুষ্কর। বরং এই যোগসাধনার ফলে যে সিদ্ধাই ও বিভূতির স্ফুরণ হয়, তাহার ফলে নবীন সাধকের আত্মাভিমান বাড়িবারই আশঙ্কা থাকে। হৃদয়ে তাঁহার এবার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, রাজযোগের পথ ছাড়া পরমপ্রাপ্তির অন্য পথ নাই। এবার সেই রাজযোগের রাজপথই তিনি অনুসরণ করিবেন একান্ত নিষ্ঠায়।

অতঃপর শিক্ষাদাতা হঠযোগী মহাত্মাকে অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বংশীধর বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে বাহির হইয়া পড়েন। উপস্থিত হন হৃষীকেশে।

হৃষীকেশে তখন গোবিন্দ-গুরুজী আশ্রমের খুব প্রসিদ্ধি। এই আশ্রমে স্বামী পূর্ণাশ্রম ও সতুয়া স্বামী নামে দুই মহাত্মা অবস্থান করিতেছেন। বেদান্তের ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ও রাজযোগের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ইঁহারা পারঙ্গম। ইঁহাদের সান্নিধ্য ও সাহায্য পাইবার জন্য বংশীধর গোবিন্দ-গুরুজী আশ্রমে আশ্রয় নিলেন।

সুদর্শন, শাস্ত্রবিদ্ বংশীধর অল্পদিনের মধ্যেই প্রবীণ স্বামীজীদ্বয়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন হইয়া উঠেন। নবীন সাধক হঠযোগে পারদর্শী হইয়া আসিয়াছেন, এজন্য স্বামীজীরা আদর করিয়া তাঁহার নাম দেন বীরভদ্র। এখানকার শাস্ত্রচর্চা ও সাধন-অনুকূল পরিবেশে পরমানন্দে বংশীধর প্রায় তিন বৎসর কাটাইয়া দেন।

এই সময় আবার একদিন তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন তাঁহার চিরকল্যাণকামী পরমহংস মহারাজ, প্রদান করেন তাঁহাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ।

প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে পরমহংসজী বলেন, "বৎস বংশীধর, তোমার ব্রহ্মলাভের আকুতি দেখে, শাস্ত্রব্যুৎপত্তি দেখে, আমি আনন্দিত হয়েছি। ইতিমধ্যে হঠযোগ-সাধন তুমি নিয়েছো ভালোই করেছো। হঠযোগে ব্রহ্মলাভ হয় না, কিন্তু ব্রহ্মলাভের জন্য দুশ্চর তপস্যা করতে হয়—তাতে অবশ্যই সাহায্য হয়। দেহ হঠযোগ-কুশল ও দৃঢ় থাকলে কৃচ্ছ্র ও ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রস্তুতি ভালভাবে গড়ে ওঠার অবকাশ পায়। কিন্তু বৎস, সদাই দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হবে মূল লক্ষ্যের ওপর। আর সে দৃষ্টি যে তোমাদের আছে, তা আমি জানি। রাজযোগই তোমার আসল পথ, এ পথ নিজেই তুমি খুঁজে

নিতে বেরিয়েছো এটা বড় আনন্দের কথা। হ্যাঁ বৎস, এবার তোমায় আমি একটা নূতন নির্দেশ দেবো।"

"মহারাজ, আপনার আশীর্বাদই আমায় এগিয়ে দিচ্ছে ধাপে ধাপে। আপনার কল্যাণ কামনা আমায় সতত রক্ষা করছে বর্মের মতো। আপনার যে কোনো নির্দেশ আমার শিরোধার্য। যুক্তকরে নিবেদন করেন বংশীধর।

"বৎস, সময় হয়ে এসেছে। তোমার চিহ্নিত সদ্গুরু তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। অবিলম্বে তুমি কাশীধামে যাও। সেখানে গুরুর কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করো। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ক'রে জীবন তোমার সফল হয়ে উঠুক।"

পরমহংসজীর নির্দেশপালনে বংশীধর আর বিলম্ব করেন নাই। দীর্ঘ দিনের তিতিক্ষা, তপস্যা ও প্রত্যাশা সফল করার জন্য তিনি উপনীত হন কাশীধামে।

আনন্দদায়িনী কাশী বিদ্যাদায়িনী কাশী—মোক্ষদায়িনী কাশী। যুগ যুগ ধরিয়া শাশ্বত ভারতের ললাটে শুচিশুভ্র তিলকস্বরূপে জ্বলজ্বল করিতেছে এই পুণ্যময়ী তীর্থনগরী। বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণার লীলানিকেতন এই কাশীকে বেষ্টন করিয়া বহিয়াছে গঙ্গার পবিত্র ধারা, আর বহিয়াছে অগণিত ব্রহ্মবিদ্ পুরুষদের তপস্যার অনন্ত প্রবাহ। তেজঃপুঞ্জকলেবর ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মা, ব্রহ্মচারী সাধকদল ও মুমুক্ষুদের দর্শন যেমন এখানে পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় শাস্ত্রবিদ্ আচার্য আর সনাতন ধর্ম ও সমাজের বিশিষ্ট ধারক বাহকদের। এখানকার কত মঠে মন্দিরে সোৎসাহে চলিতেছে বেদান্ত ও ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন, আবার কত বড় বড় ধর্মসভার অনুষ্ঠিত হইতেছে নানা দেশ হইতে আগত তর্ক-শূরদের বিচারদ্বন্দ্ব। অধ্যাত্ম-জীবন আর সারস্বত জীবনের মিলিত আলোকচ্ছটায় এই পুণ্যময় নগরীর দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত। তাই এই কাশীধামে উপনীত হইয়া বংশীধরের আনন্দের অবধি নাই।

কয়েকদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি নগরীর শ্রেষ্ঠ মঠ মন্দির পীঠস্থান ও বিদ্যাকেন্দ্রগুলি দর্শন করিয়া বেড়ান। আশ্রয়ের স্থান কোথাও মিলে নাই, ব্রহ্মচারীবেশে যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ান, সত্রে একবেলা আহার জুটিয়া যায় তারপর নিশাযোগে দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে ঘাটিয়ালদের ছাতার নিচে শয়ন করিয়া গভীর নিদ্রায় ঢলিয়া পড়েন।

কাশীতে তখন শক্তিধর মহাত্মাদ্বয় তৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দের খুব প্রসিদ্ধি। বংশীধর সাগ্রহে ইঁহাদের দর্শন করিলেন, ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

অন্তরে তাঁহার বড় প্রশ্ন—কোথায় তাঁহার চিহ্নিত সদ্গুরু, যাঁহার নিকট হইতে নিবেন সন্ন্যাসদীক্ষা, যাঁহার চরণে চিরতরে করিবেন আত্মসমর্পণ। মনপ্রাণ তাঁহার রাজযোগের সাধন গ্রহণে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এ সাধন যিনি দিবেন তাঁহাকে একাধারে হইতে হইবে বৈরাগ্যবান্, তপস্যাপরায়ণ, বেদান্তের অদ্বৈতবিচারে পারঙ্গম এবং রাজযোগের নিগূঢ় সাধনার সিদ্ধকাম। যে সাধন প্রস্তুতি এ যাবৎ বংশীধরের জীবনে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে এমনি এক মহাত্মাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

পরমহংসজী আশ্বাস দিয়াছেন এই কাশীধামের গুরু তাঁহার জন্য অপেক্ষমান।

ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের এ আশ্বাসবাণী তো কখনো মিথ্যা হইবার নয়। আশায় আশায় দিন গুণিতে থাকেন বংশীধর।

ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলেন, গঙ্গাতীরে মহারাণী অহল্যাবাঈর প্রতিষ্ঠিত মঠে এক পরমজ্ঞানী অশেষ শাস্ত্রবেত্তা মহাপুরুষ অবস্থান করেন। বিশেষ করিয়া বেদান্ত বিচারে ও রাজযোগের সাধনায় তাঁহার তুল্য ব্যক্তি সমকালীন উত্তর ভারতে কেহ নাই।

প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান সারিয়া ভস্ম-ভূষিত ললাটে, প্রদীপ্ত ভাস্করের মতো সন্ন্যাসীবর গৌড়স্বামী অহল্যাঘাটে শিষ্যগণ সহ বসিয়া আছেন। দুরূহ শাস্ত্রতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও আলোচনা চলিয়াছে। আর প্রবীণ অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো স্বামীজীর অমৃতবাণী শ্রবণ করিতেছেন।

অনেকক্ষণ যাবৎ এই তত্ত্বালোচনা শুরু হইয়াছে। মন্ডলীর এক কোণে বংশীধর নীরবে নির্নিমেষে প্রজ্ঞানঘন দিব্যোজ্জ্বল মূর্তির দিকে চাহিয়া আছেন। সর্ব অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতেছেন, যে পরম বস্তুলাভের জন্য তিনি সংসার ছাড়িয়াছেন, ভিখারীর মতো দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া মরিতেছেন, তাহা এই মহান্ পুরুষের করায়ত্ত। আত্মসমর্পণ করিতে হয় তো এমন মহাত্মার চরণেই করিতে হয়।

শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও আলোচনার শেষে বংশীধর উঠিয়া দাঁড়ান, আচার্য গৌড়স্বামীর পদপ্রান্তে ভক্তিভরে লুটাইয়া পড়েন। তারপর নিজের পরিচয় দিয়া করজোড়ে নিবেদন করেন তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা—"প্রভু, সারা দক্ষিণ ও উত্তর ভারত পরিক্রমা ক'রে এই অভাগার জীবনতরী আজ আপনার চরণপ্রান্তে এসে ঠেকেছে। আপনি এর ভার নিন। কৃপা ক'রে আমায় সন্ন্যাস দান ক'রে, খুলে দিন মোক্ষপথের দ্বার।"

অনিন্দ্যসুন্দর যুবক, চোখে-মুখে প্রতিভা ও সাধন-নিষ্ঠার ছাপ। আচার্য গৌড়স্বামী মুগ্ধনয়নে কিছুক্ষণ বংশীধরের দিকে চাহিয়া আছেন। তারপর প্রশান্ত স্বরে প্রশ্ন করা শুরু করেন। কি তাহার নাম, বংশপরিচয়, কোথায় কোন্ আচার্যের কাছে কোন্ কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কোন্ সাধন নিয়া কতটা অগ্রসর হইয়াছেন, খুঁটিনাটি সকল তথ্যই স্বামীজী মহারাজ জানিয়া নিলেন।

শাস্ত্রালাপ শুরু করিতেই দেখা গেল, বয়সে তরুণ হইলেও বংশীধর একজন অসামান্য শাস্ত্রবেত্তা। দীর্ঘদিনের ত্যাগ বৈরাগ্যের সহিত জ্ঞানানুশীলন তাঁহার জীবনে যুক্ত হওয়ায় ব্রহ্মাকারবৃত্তির এক বিরাট আধাররূপে সে পরিণত হইয়াছে। বহুদিন যাবৎ অন্তরে অন্তরে ব্রহ্ম-সাধনার এমনি এক উপযুক্ত অধিকারী পুরুষের, এমনি এক উত্তরসূরীর প্রতীক্ষায় ছিলেন গৌড়স্বামী।

তৃপ্তি ও প্রসন্নতায় আচার্যের সুগৌর আননখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বংশীধরকে তাঁহার এ ভাবান্তর বুঝিতে দিলেন না। কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "বৎস, উত্তম কথা। আমি তোমায় আমার কাছ থেকে সন্ন্যাস নেবার সুযোগ দেবো। কিন্তু তার আগে কয়েকটা মাস আমার কাছে নূতন ক'রে তোমায় বেদান্তের পাঠ নিতে হবে। তোমার গ্রহণ ক্ষমতা যদি সন্তোষজনক হয়, তবেই তোমায় দীক্ষা দেবো, নতুবা আর কোথাও তোমায় যেতে হবে।"

বংশীধর তো আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। বুঝিলেন, আচার্য তাঁহাকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়া নিতে চান। বেশ, তাহাতেই তিনি সম্মত।

আচার্য গৌড়স্বামী আবার কহেন, "হ্যাঁ বৎস, আর একটা কথা। আমার এ

আশ্রমে এখন কিন্তু তোমার স্থান হবে না। তুমি যেমনভাবে দিনাতিপাত করছো, তাই ক'রে যাবে। আর প্রতিদিন দুই বেলা আশ্রমে এসে গ্রহণ করবে তোমার পাঠ।"

"যে আজ্ঞে মহারাজ। আপনার নির্দেশ আমার শিরোধার্য।" আচার্যকে প্রণাম জানাইয়া নির্বিকার চিত্তে বংশীধর স্থান ত্যাগ করেন।

এবার গোঁড়স্বামীর ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে শুরু হয় মৃদু গুঞ্জন। আচার্য কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করেন, "তোমরা কি আমায় কিছু বলতে চাও?"

"হ্যাঁ, প্রভু, আমাদের একটা নিবেদন আছে।" সবিনয়ে বলেন এক প্রধান শিষ্য। "আপনার এই বৃহৎ আশ্রমে স্থানের অভাব বিন্দুমাত্র নেই, রাজকীয় ভাণ্ডারা তো প্রায়ই লেগে আছে। তবে নবাগত ব্রহ্মচারীটিকে এখানে স্থান দিলেন না কেন, বুঝতে পারছিনে। ওকে তো বৈরাগ্যবান্ ও তপস্যাপরায়ণ বলেই মনে হলো।"

"ঠিকই বলেছো। এ যুবকটির ভেতর বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। আধার বড় শুদ্ধ বলেই তো পরীক্ষা হবে কঠোরতর। সত্রের শুকনো রুটি খেয়ে আর ঘাটিয়ালের ছাতার নিচে রাত্রিবাস ক'রে আরো কিছুদিন কাটিয়ে দিক। ত্যাগ বৈরাগ্যের শোধন ওকে পাকা সোনায় পরিণত করুক। এটাই আমি চাই।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গোঁড়স্বামী আপন মনে কহিতে থাকেন, "ভালো মন্দের কথা নয়—তবে একটা পরিবর্তনের সূচনা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। কাশীর মঠ-মন্দির ও বিদ্যাকেন্দ্রে এতদিন দাক্ষিণী দণ্ডী সন্ন্যাসীদেরই ছিল একচেটিয়া নেতৃত্ব। উত্তর ভারতের এই প্রতিভাধর যুবকটি সেই ধারা একবারে পাল্টে দেবে বলে মনে হচ্ছে।"

পরের দিন হইতেই বংশীধর গোঁড়স্বামীর কাছে পাঠ নেওয়া শুরু করেন। ত্যাগ বৈরাগ্যময় পথে জীবনযাত্রা তাঁহার আগেকার মতোই চলিতে থাকে।

গৌরকান্তি, সমুন্নত দেহ, প্রতিভা-সমুজ্জ্বল বংশীধরের প্রতি এ সময়ে অনেক মঠ-মণ্ডলীর মোহান্তের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নানা প্রলোভন দেখাইয়া এই শাস্ত্রবিদ্ তরুণকে তাঁহারা দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই হয় ব্যর্থ। গোঁড়স্বামী এখন বংশীধরের জীবন-আকাশের ধ্রুবতারা, অনন্যনিষ্ঠার এই কৃপালু আচার্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অধ্যাত্মপথের অভিযাত্রায় তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।

উত্তর ভারতে তখন সিপাহী যুদ্ধের ঘোর তাণ্ডব চলিয়াছে। বারাণসীতে এই সময়ে বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ দেখা দিতে থাকে। শান্তিরক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ এ অঞ্চলে একদল গোরা সৈন্য মোতায়েন রাখেন। কিছু সংখ্যক সেনা মাঝে মাঝে গঙ্গাবক্ষে টহল দিয়া বেড়ায়। সেদিনও তাঁহারা নদীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইংরেজ সেনার আবির্ভাব দেখিয়া ঘাটের লোকজন ভয়ে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে বংশীধর ঘুরিতে ঘুরিতে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত।

নির্জন ঘাটে কে এই লোকটি, কি তাহার অভিসন্ধি? বজরার ইংরেজ সৈনিকরা সন্দিহান হয়, তাড়াতাড়ি তীরে নামিয়া আসে। বহির্বাস-পরা অর্ধনগ্ন বংশীধরের সম্মুখে তাহারা সঙ্গীন উঁচাইয়া ধরে, ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে নানা প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিতে থাকে। বংশীধরও যথাযথ উত্তর দেন। এই প্রশ্নোত্তরের মর্মার্থ—

"ওহে, একলাটি এখানে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন, বলতো?" গোরা সৈনিকেরা জিজ্ঞাসা করে।

"কেন, আমায় দেখে কি বিদ্রোহী বলে মনে হচ্ছে? পরিচ্ছদ দেখে বুঝতে পারছো না যে আমি একজন ভিক্ষাজীবী সাধু?"—বংশীধর মুচকি হাসিয়া উত্তর দেন।

বংশীধরকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার সপ্রতিভ হাসি দেখিয়া, গোরারা একটু আশ্বস্ত হয়, বলে—"না, তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বদমায়েস নও। তুমি সাধু—জ্যোতিষী। আচ্ছা, তুমি জ্যোতিষী গণনা করতে পারো?"

"কি তোমাদের প্রশ্ন বলই না সাহেব, একবার চেষ্টা ক'রে দেখি পারি কিনা।" সকৌতুকে বলেন বংশীধর।

"দ্যাখো, সাধু, এলাহাবাদে এখন জোর লড়াই চলছে। বিদ্রোহী সিপাইরা ইংরেজ সরকারের কেল্লা ঘিরে ফেলেছে। আমরা বড় দুশ্চিন্তায় আছি। বলতে পারো ঐ কেল্লার পতন ঘটেছে কিনা?"

"খুব পারি। আচ্ছা তোমরা আমার পায়ের কাছে মাটির দিকে তাকিয়ে দেখতো। কি দেখছো? পিঁপড়ের সারি মাটির একটা উঁচু চক্রের চারপাশ ঘিরে রয়েছে, ভেতরে ঢুকছে না,—তাই না? এলাহাবাদ দুর্গের অবস্থাও এমনি। সিপাইরা দুর্গ অবরোধ করেছে, কিন্তু ঢুকে পড়ার মতো শক্তি সঞ্চয় এখনো করে নি।"

গোরা সৈনিকেরা এ সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। বলে, "সাধু, তুমি বড় ভালো লোক। আচ্ছা যাও, তুমি তোমার খুশী মতো নদীর ঘাটে চলাফেরা করতে পারো।"

নির্বিকার চিত্তে বংশীধর ঘাটের এক কোণে বসিয়া পড়েন, তারপর ধ্যান-ভজনে রত হন।

কয়েকমাস গত হইয়াছে। সাধনা, স্বাধ্যায়, ও গুরুসেবার মধ্যে দিয়া বংশীধর আচার্য গৌড়স্বামীর আরো ঘনিষ্ঠ আরো প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। পরীক্ষায় কয়েকটি পর্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। গুরু এবার নবীন তপস্বীকে সন্ন্যাস দীক্ষাদানের সিদ্ধান্ত করিলেন। উত্তরায়ণের পূর্ণিমায় শুভ নক্ষত্রে, এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। বংশীধরের সন্ন্যাস নাম হইল—বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী।

অলৌকিক মেধা প্রতিভার অধিকারী, সৎ ব্রাহ্মণকুলে জাত এই নবীন শিষ্য। গুরু মনে মনে স্থির করিয়াছেন তাঁহাকেই করিবেন গদির উত্তরাধিকারী, তাঁহার সন্ন্যাসী-মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ-নেতা। কাশীধামের সারস্বত সমাজে ও শাস্ত্রবিদ্ সন্ন্যাসীসমাজে যাহাতে সে শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠে, সে প্রস্তুতি সাধনেও গৌড়স্বামী কোনো ত্রুটি রাখিলেন না। প্রাচীন শাস্ত্র ও অধিবিদ্যায় তাঁহাকে পারঙ্গম করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

মীমাংসা দর্শন, বেদান্ত, প্রাচীন ও নব্যন্যায়, কপিল দর্শন, শৈবতন্ত্র প্রভৃতির মূল প্রকরণ টীকা ভাষ্য বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী একে একে আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে গুরু তাঁহাকে নিজস্ব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অধ্যাপনার কার্যেরও দায়িত্ব অর্পণ করেন।

কাশী ও উত্তর ভারতের শাস্ত্রার্থ বিচারসভাগুলিতে অশেষ শাস্ত্রবিদ্ বিশুদ্ধানন্দ

মহারাজ আবির্ভূত হইতেন জ্বলন্ত পাবকের মতো। শাস্ত্রের নিহিতার্থ উদ্ঘাটনে, সনাতন ধর্মের বিজয়কেতন সংস্থাপনে তিনি ছিলেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। কাশীর মঠ মণ্ডলী আখড়া ও গৃহীমণ্ডল যেখানেই বিশুদ্ধানন্দ যাইতেন, লাভ করিতেন সকলের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম। শিষ্যের এই সাফল্যে আচার্য গৌড়স্বামীর আনন্দের সীমা নাই।

এ সময়ে মণ্ডলীর সকল সন্ন্যাসীকে একদিন তিনি সমবেত করিলেন, ঘোষণা করিলেন,— তাঁহার দেহান্তের পর বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীই হইবেন মঠ-মণ্ডলীর মোহান্ত এবং পরিচালক। তাই যতদিন এই মহাত্মা জীবিত ছিলেন, মঠের ভাবী উত্তরাধিকারী বিশুদ্ধানন্দের আচার-আচরণ ও আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে ছিল তাঁহার সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি। প্রিয় শিষ্যের অন্তরে আত্মাভিমান যেন কখনো না আসে এ জন্য তাঁহার সতর্কতার অবধি ছিল না। মঠের একদিনকার একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় ইহার প্রমাণ মিলে।—

বিশুদ্ধানন্দের আগমনের কয়েক বৎসর পূর্বে আচার্য গৌড়স্বামী তিনজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস দেন। ইহাদের মধ্যে স্বামী বিশ্বরূপ ছিলেন প্রবীণতম এবং গুরুদেবের সর্বাপেক্ষা স্নেহভাজন। সেদিন একটি তত্ত্বের মীমাংসা নিয়া বিশুদ্ধানন্দের সহিত স্বামী বিশ্বরূপের বিতর্ক উপস্থিত হয়। উভয়েই দক্ষতার সহিত শাস্ত্র প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে থাকেন এবং অবশেষে বিশুদ্ধানন্দই জয়ী হন। কিন্তু বিতর্কের কালে হঠাৎ এক সময়ে বিশুদ্ধানন্দ শান্তভাব হারাইয়া ফেলেন, রূঢ়স্বরে প্রধান গুরুভ্রাতাকে কিছু কড়া কথাও তাঁহাকে বলিতে শুনা যায়।

এভাবে বিশুদ্ধানন্দ তাঁহার চিত্তের প্রশান্তি হারাইবেন, গুরু তাহা ভাবিতে পারেন নাই। তাই দুঃখিত অন্তরে তাঁহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, দীর্ঘ সময় কাহারো সহিত কোনো বাক্যালাপ করিলেন না।

বিশুদ্ধানন্দ বুঝিলেন, সাময়িক উত্তেজনাবশে গুরু-মহারাজের অন্তরে আজ তিনি আঘাত দিয়াছেন। তখনি ছুটিয়া গিয়া আচার্য গৌড়স্বামীর পদতলে পতিত হইলেন, ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন অকুণ্ঠ চিত্তে। দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "প্রভু, আপনি প্রসন্ন হোন। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, স্বামী বিশ্বরূপজীকে এখন থেকে আমি পরম-পূজ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতোই দেখবো, আজীবন গুরুজ্ঞানে তাঁর সেবা করে যাবো। এতে কোনোদিনই অন্যথা হবে না।"

এ অঙ্গীকার বিশুদ্ধানন্দ কোনোদিন বিস্মৃত হন নাই, উত্তরকালে অক্ষরে অক্ষরে ইহা পালন করিয়া গিয়াছেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য গৌড়স্বামী ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। সন্ন্যাসী-মণ্ডলীর সবাই সর্বসম্মতিক্রমে বিশুদ্ধানন্দকে তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করেন, কিন্তু আপত্তি উঠে বিশুদ্ধানন্দজীর দিক হইতে। প্রবীণ গুরুভ্রাতা বিশ্বরূপজীর চরণে প্রণাম করিয়া তিনি বলেন, "মণ্ডলীর সবাকার স্নেহ ও সমর্থন আমার [illegible] আছে জেনে আমি আনন্দিত, গৌরবান্বিত। কিন্তু আপনি বর্তমান থাকতে আমি এ পদাধিকার গ্রহণ করতে পারি নে। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনিই এ পদের উপযুক্ত। তা ছাড়া, আপনি নিজেই অবগত আছেন, আপনার [illegible] এই

বৎসর যাবৎ আমি সেবা ক'রে আসছি। আপনাকে মঠের মোহান্তরূপে রেখে সেই সেবাকর্ম'ই অব্যাহত রাখতে চাই।"

বিশ্বরূপ স্বামী চমকিয়া উঠেন। বললেন, "এ তুমি কি অদ্ভুত প্রস্তাব করছো বিশুদ্ধানন্দ। গুরু মহারাজ স্বয়ং তোমায় ঘোষণা ক'রে গেছেন তাঁর উত্তরাধিকারী বলে। আমরা সবাই সাগ্রহে আজ সে মনোনয়ন সমর্থনও করছি। আর তুমি বলতে চাচ্ছো - আমি বয়োবৃদ্ধ। তাহলে কি হয়, আমি তো জানি আমার চাইতে বয়সে ছোট হলেও তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ। তাছাড়া, গুরুজীর অবর্তমানে তুমি যদি আমাকেই গুরু বলে মানতে চাও, তবে তোমায় আমি আদেশ দিচ্ছি। অবিলম্বে তুমি মোহান্তের গদিতে অধিষ্ঠিত হও, সবার অভিলাষ পূর্ণ করো।"

বিশুদ্ধানন্দজী গুরু গৌড়স্বামীর গদিতে আরোহণ করিলেন। কিন্তু যতকাল তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা ও গুরুপ্রতিম বিশ্বরূপ স্বামীর পরামর্শ না নিয়া কোনো কর্মে ব্রতী হন নাই, কোনো গুরুতর সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন নাই।

একাদিক্রমে দীর্ঘ উনচল্লিশ বৎসরকাল কাশীর অধ্যাত্ম-সমাজে ও সারস্বত সমাজে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী একাধিপত্য করেন। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান ও ধ্যান-জপের পর ভস্ম তিলকাঙ্কিত ললাটে এই সন্ন্যাসী ভাস্কর শিষ্য ও ভক্ত দর্শনার্থীদের সম্মুখে পরমতত্ত্বের উপদেশ দিতেন। তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত বেদান্তের অদ্বৈত বিচার ও রাজ-যোগের নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব শুনিয়া শত শত শ্রোতা হইত কৃতকৃতার্থ।

সনাতন ধর্মের দুর্গ শিখরে শীর্ষপতাকা ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী। উত্তর ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রণী সাধক ও শক্তিধর নেতা। ধর্ম ও সমাজের বহুতর সমস্যা, বহুতর বিচার বিতর্ক উপস্থাপিত করা হইত এই মহাপুরুষের সম্মুখে। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির সাহায্যে সব কিছু সমস্যা, সংশয় ও বিতর্কের সমাধান অনায়াসে তিনি করিয়া দিতেন।

শাস্ত্রার্থ বিচারসভায় অনুগামী সন্ন্যাসীদের নিয়া বিশুদ্ধানন্দ বিরাজিত থাকিতেন শাস্ত্রমূর্তিরূপে, ব্রহ্মসাধনার নিশ্চল দীপশিখারূপে। সাধু সন্ন্যাসী, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও নিরক্ষর জনগণ সকলেরই সহজ শ্রদ্ধা, প্রেম ও আনুগত্য কি করিয়া তিনি অনায়াসে লাভ করিতেন তাহা ছিল এক পরম বিস্ময়।

পুরীধামের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী নাঙ্গাবাবার সহিত বিশুদ্ধানন্দজী দীর্ঘদিনের সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কাশীতে আসিলেই নাঙ্গাবাবা মহারাজ প্রায়শ তাঁহার মঠে আসিয়া দর্শন দিতেন। দুই ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মার মিলনে আনন্দের তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া উঠিত। অসিঘাটের হরিহরবাবা ও বনপুরোয়ার বীতরাগানন্দজী তখন নবীন সাধক। এ সময়ে প্রায়ই তাঁহারা বিশুদ্ধানন্দজীর চরণতলে গিয়া উপবেশন করিতেন, লাভ করিতেন, শাস্ত্র ও সাধনার নিগূঢ় উপদেশ।[১] মণ্ডলী

১ নাঙ্গাবাবা, হরিহরবাবা ও বীতরাগবাবার সহিত বিশুদ্ধানন্দজীর যোগা-যোগের কাহিনী লেখক বীতরাগবাবার নিকট হইতে জানিয়াছেন। কাশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বনপুরোয়ার এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মা বাস করিতেন। ১৯৬০ সালে দেড়শত বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত ঘটিয়াছে।

ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু সন্ন্যাসীরা বিশুদ্ধানন্দজীকে সর্বদা দর্শন করিতে আসিতেন, জানিয়া নিতেন পরম তত্ত্বের রহস্য।

সন্ন্যাসী শিরোমণি বিশুদ্ধানন্দজীর সারস্বত-প্রতিভা দেশবিদেশ হইতে বহু বিদ্যার্থীকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। উত্তরকালে ইঁহাদের এক একজন চিহ্নিত হইয়াছেন দিক্‌পাল পণ্ডিতরূপে।[১]

উত্তর ভারতের রাজরাজড়াদের মধ্যে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠা ছিল অসামান্য। ইঁহাদের কেহ কেহ ছিলেন তাঁহার গুণমুগ্ধ কেহ বা ভক্ত শিষ্য। কিঙ্করের মতো তাঁহার আদেশ পালনে ইঁহাদের অনেকে যত্নবান ছিলেন।[২] স্বামীজীর আদেশে বহু সত্র, সন্ন্যাসী-মঠ ও আখড়ায় এই রাজারা অন্নবস্ত্রের যোগান দিতেন।

আর্য সমাজের প্রবর্তক, সংস্কারপন্থী নেতা, দয়ানন্দ স্বামী তখন সনাতন ধর্মের উপর প্রবল আঘাত হানিতেছেন। উত্তর ভারতের সর্বত্র সফর করিয়া পণ্ডিত ও সাধু-মণ্ডলীকে স্বমতে আনয়নের জন্য তাঁহার প্রয়াসের অন্ত নাই। সেবার কাশীতে আসিয়াও তিনি বহু ভাষণ দিতে থাকেন। কাশীর মহারাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ের জন্য এক বিচারসভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় দয়ানন্দের প্রতিপক্ষরূপে উপস্থিত থাকেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও তাঁহার ছাত্র কাশীরাজের সভাপণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্ন। বিচারে দয়ানন্দের পরাজয় ঘটে, এবং ইহার পর উত্তর-পূর্ব ভারতে তাঁহার নূতন মতবাদ আর বেশী বিস্তারিত হওয়ার সুযোগ পায় নাই।

১৮৯০ সালের কুম্ভমেলায় যোগদান স্বামীজীর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ধর্মমেলায় যোগদান তো নয়, এ যেন এক বিজয় অভিযাত্রা। সন্ন্যাসী, ভক্ত ও শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের এক বিরাট বাহিনী মন্থরগতিতে অগ্রসর হয় বিশুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে। চলার পথে যেখানেই যান, কাশীধামের এই বহুলখ্যাত মহাত্মার শিবিরের চারি-পাশে দেখা যায় ভক্ত জনতার ভিড়। রাজরাজড়া ও শেঠের দল থাকেন স্বামীজী মহারাজের সেবায় সদা তৎপর।

মেলাক্ষেত্রে শাস্ত্রমূর্তি, ব্রহ্মবিদ্ এই মহাপুরুষ প্রতিভাত হন এক দর্শনীয় পুরুষরূপে। সহস্র সহস্র মুমুক্ষু নরনারী সদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। আর্ত ভক্তেরা সমাগত হয় দলে দলে। স্বামীজীর কৃপাপ্রসাদ লাভ করিয়া তাহারা আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হয়।

মেলা হইতে ফিরিবার পথে কাশ্মীরের মহারাজা রণবীরসিংজীর অনুরোধে স্বামীজী শ্রীনগরে পদার্পণ করেন। এই কাশ্মীর যাত্রাকে উপলক্ষ করিয়া স্বামীজী

---

১ ইঁহাদের মধ্যে আছেন—দ্বারভাঙ্গার বাচ্চা ঝা, ভাটপাড়ার তারাচরণ তর্করত্ন (কাশীরাজের সভাপণ্ডিত) ও তাঁহার স্বনামধন্য পুত্র প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহারাষ্ট্রের সখারাম ও কাকারাম ভট্ট, বোম্বাইএর নানুরাম, রাজস্থানের [illegible], [illegible] ব্যাসজী, লাহোরের গুরুপ্রসাদ, নীরাটের সেবকরাম, [illegible] মিশ্র, [illegible] প্রভৃতি। দ্রঃ শিবম্, আশ্বিন ১৩৭২, বিশুদ্ধানন্দ (অধ্যাপক বটুনাথ ভট্টাচার্য)

২ কাশ্মীর, সিন্ধিয়া, জয়পুর, ইন্দোর, বুন্দী, দ্বারভাঙ্গা, [illegible] প্রভৃতি রাজারা স্বামীজীর পরম অনুগত ছিলেন। দ্রঃ শিবম্, আশ্বিন ১৩৭২

সে-বার উত্তর-পশ্চিম ভারতের সহস্র সহস্র নরনারীকে দর্শন দেন, সর্বত্র সঞ্চারিত করেন নূতনতর আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা।

অতঃপর আটবৎসর স্বামীজী মরদেহে অবস্থান করেন এবং এই সময়ে কাশীধাম ত্যাগ করিয়া আর কোথাও তিনি গমন করেন নাই।

ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মপীঠ ও বিদ্যাকেন্দ্রে সন্ন্যাসীসমাজের এই মহাপুরুষ বিরাজিত থাকেন এক অত্যুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভরূপে।

বিধি নির্দিষ্ট কর্ম প্রায় উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এখন শেষ লগ্নটির জন্য স্বামীজী প্রতীক্ষমাণ। শরীর প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে, আজকাল মঠের বাহিরে কোথাও তাঁহার যাওয়া হয় না, চিত্তবৃত্তি সদাই থাকে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন। মাঝে মাঝে স্বেচ্ছামতো সন্ন্যাসী শিষ্যদের স্বাধ্যায়ে তিনি সহায়তা করেন।

গঙ্গাতীরে অহল্যাবাঈ ঘাটের উপরেই স্বামীজীর মঠ। মঠের দ্বিতলকক্ষে বসিয়া উদাস নেত্রে সেদিন গঙ্গার স্রোতধারার দিকে তাকাইয়া আছেন। এক নবীন সন্ন্যাসী শিষ্য একখণ্ড কঠোপনিষৎ নিয়া চরণতলে উপবেশন করেন। প্রসন্নমধুর হাস্যে গ্রন্থটি হাতে তুলিয়া নিয়া স্বামীজী ধীরে ধীরে শুরু করেন তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যান। ক্রমে আসিয়া পড়ে সেই প্রসিদ্ধ কারিকাটি যাহাতে বলা আছে—সুষুম্না নাড়ীর কথা। দেহের শত শত নাড়ীর মধ্যে এই নাড়ীটি মূর্ধস্থলে গিয়া সংলগ্ন হয় এবং এই পথেই আপ্তকাম যোগীর প্রাণ উৎক্রমণ করে।

কারিকাটি ব্যাখ্যা করার সময় নবীন সন্ন্যাসী ছাত্রটি হঠাৎ একটু উনমনস্ক হইয়া পড়ে। বড় বিরক্তি বোধ করেন স্বামীজী মহারাজ। দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠেন, "এখন তো এ নাড়ীর কথায় কান দিচ্ছো না, দেখো অতি শীঘ্রই এই নাড়ী পথে হবে আমার দেহান্ত। তারপর এই নাড়ীর কথা আর হয়তো তোমার স্মৃতি থেকে মুছে যাবে না।"

নবীন সন্ন্যাসী বড় লজ্জিত হন, বার বার করজোড়ে গুরু মহারাজের ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকেন।

কয়েকদিন পরেই বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের প্রতীক্ষিত শেষ লগ্নটি আসিয়া পড়ে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের চন্দন একাদশীর পুণ্যতিথি। সময় আসন্ন জানিয়া স্বামীজী শিষ্যদের আদেশ দেন, "আর কালবিলম্ব না ক'রে আমার দেহটি স্থাপন করো গঙ্গা বিধৌত ঐ বুরুজের ওপর। তোমরা সবাই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।"

শিষ্যেরা শোকবিহ্বল হইয়া পড়েন। মৃদু কণ্ঠে স্বামীজী তাঁদের আশ্বাস দেন, "শোক কেন বলতো? আত্মজ্ঞানীর জন্মই বা কই, মৃত্যুই বা কই? তোমরা চিত্তের স্থৈর্য অটুট রাখো।"

বুরুজের উপর নিয়া যাওয়া হইলে জরাজীর্ণ দেহটি নিয়া স্বামীজী ঋজু হইয়া উপবেশন করেন। তারপর সজ্ঞানে প্রাণবায়ুকে চালিত করেন সুষুম্নার মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের পথে।

তৎক্ষণাৎ চারিদিকে এ সংবাদ রটিয়া যায়। দশাশ্বমেধ ঘাটে সমবেত হয় সহস্র সহস্র ভক্ত ও দর্শনার্থী নরনারী। ব্রহ্মলীন মহাত্মার মরদেহটি পুষ্পচন্দনে সুসজ্জিত করিয়া বিসর্জন দেওয়া হয় পূতসলিলা ভাগীরথীর গর্ভে।

স্বামী বিবেকানন্দ

ভাগীরথীর দুই তীরে নামিয়া আসিয়াছে সন্ধ্যার অন্ধকার। আকাশের বুকে দুই চারটি তারা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। নদীবক্ষ স্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ, নোঙর করা বজরাখানিতেও তেমনই অখণ্ড নীরবতা। একটি সুদর্শন যুবক দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসেন, নিভৃত কক্ষের দ্বারে বার বার করেন করাঘাত।

সৌম্য, প্রশান্ত মূর্তি এক বৃদ্ধ ধ্যানকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করেন, "কি বাবা, কি চাই তোমার ?"

যুবকের চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ। ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "মশাই, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ? আমায়ও কি দর্শন করাতে পারেন ?"

ধ্যানোত্থিত বৃদ্ধ তাপস সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম নেতা—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গঙ্গার উপরে এই হাউস বোটে নিভৃত তপস্যায় কিছুদিন যাবৎ দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান মুমুক্ষু তরুণ—নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

যুবকের হৃদয়োচ্ছ্বাস ও ব্যাকুলতার মর্ম বুঝিতে দেবেন্দ্রনাথের বিলম্ব হইল না। সস্নেহে নিকটে বসাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন, দিলেন নানা আশ্বাস ও উপদেশ। তারপর নিষ্পলক নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার চোখ দুটি ঠিক যোগীদের মতো। একনিষ্ঠ হয়ে সাধন করো। তুমি সফলকাম হবে।"

নরেন্দ্রনাথ বজরা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও প্রবোধবাক্য তাঁহার উত্তেজনা হ্রাস করিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রাণের অদম্য পিপাসা মিটিল কই ? মূল প্রশ্নের উত্তর তো তিনি সাধক দেবেন্দ্রনাথের কাছে পাইলেন না।

নরেন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসার আর এক চিত্র। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গা তীরে দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে সন্ধ্যারতি কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। ঝড়ের আলোড়ন তাঁহার অন্তরে। ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "মশাই, আপনার কি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়েছে ?"

বহু সাধু-পুরুষকে একথা বার বার তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কেহই তো এ পর্যন্ত 'হাঁ' বলেন নাই। ইনিও যদি আজ তাঁহাকে নিরাশ করেন ?

সহজ কণ্ঠে, প্রত্যয়ের সুরে অবিলম্বে রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "সে কি গো ! দেখেছি বই কি ? এই যেমন তোমাদের দেখছি—এমন করেই তো দেখে থাকি। শুধু তাই নয় তোমাকেও দেখাতে পারি। কিন্তু আমার কথামতো চলতে হবে।" সঙ্গে সঙ্গে স্মিতহাস্যে বটুয়া হইতে কিছুটা সুপারী তুলিয়া লইয়া ঠাকুর চিবাইতেছেন। নরেন্দ্রনাথ অপার বিস্ময়ে এই দেব-মানবের দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া আছেন। বাক্য মনের অতীত ঈশ্বরকে এমন করিয়া পাওয়া যায়, এই দুঃসাহসের কথা এমন সহজ প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে কেহ তো আজ অবধি বলে নাই।

যে প্রশ্ন তিনি আজ দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ব্রাহ্মণের পদতলে বসিয়া করিলেন,

তাহা শুধু তাঁহার নিজ জীবনেরই প্রশ্ন নয়, তাহা যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল বুদ্ধিজীবীদেরই সংশয়-পীড়িত প্রশ্ন। যুক্তি বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যার জটিল গ্রন্থি ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও দর্শনের কামনা ইহাতে নিহিত।

দীর্ঘদিনের সেই প্রশ্নের উত্তর আজ মিলিয়াছে। সে উত্তর বাস্তব অনুভূতিতে প্রোজ্জ্বল, সহজ প্রত্যয়ে পূর্ণ। ঠাকুর অকুণ্ঠ কণ্ঠে দাবি করিতেছেন, তিনি তাঁহাকে ভগবৎ দর্শন করাইয়া দিবেন, যেমন নিজে দর্শন করিয়াছেন তেমন করিয়াই দিবেন।

এবার বলিবার পালা নরেনের। আত্মসমর্পণের প্রয়োজন সর্বাধিক, সে প্রস্তুতি আজ তাঁহার কোথায়? রামকৃষ্ণের তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে কই? এই অর্ধোন্মাদ অর্ধশিক্ষিত সাধকের পদে তাঁহার সমস্ত কিছু ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা-দীক্ষা উৎসর্গ করিতে পারিতেছেন কই?

কিন্তু নরেনকে পারিতে হইয়াছিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই আত্মসমর্পণকে আমরা সম্ভব হইতে দেখি। এই পাঁচ বৎসরের ইতিহাস ঠাকুরেরই করুণালীলার এক নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। দিনে দিনে পলে পলে সহজ স্বচ্ছন্দ ভালবাসার মধ্য দিয়া রামকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপটিকে, তাঁহার পরমতত্ত্বকে নরেন্দ্রনাথের জীবনে প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছেন। ঠাকুরের এই আত্মসাৎক্রিয়াই নরেনের আত্মসমর্পণকে সহজতর করিয়া তোলে, অধ্যাত্মশিল্পী রামকৃষ্ণের মহান্ সৃষ্টি তাঁহারই মধ্যে ধীরে ধীরে রূপায়িত হইয়া উঠে। আচার্য বিবেকানন্দের ঘটে চমকপ্রদ অভ্যুদয়। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-জীবনে এ অভ্যুদয় ঘটায় কল্যাণকর উজ্জীবন, ত্বরান্বিত করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আত্মিক সেতুবন্ধন।

এক দুর্জ্ঞেয় ঐশীশক্তির আকর্ষণে যুবক নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই একই ঐশীশক্তির লীলা তাঁহার বাল্য ও কৈশোর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, স্রোতধারার গতিপথের মোড় ঘুরাইয়াছে বার বার— উত্তরণ ঘটাইয়াছে মুক্তির মহাসাগরে।

শিমুলিয়ার অভিজাত দত্ত-পরিবারে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশের রামমোহন দত্ত ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠাবান্ উকিল। বিপুল বিত্তবিভব তিনি রাখিয়া যান, কিন্তু পুত্র দুর্গাচরণ ইহাতে আকৃষ্ট হন নাই, পঁচিশ বৎসর বয়সে পত্নী ও একমাত্র শিশু-পুত্র বিশ্বনাথের মায়া কাটাইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই বিশ্বনাথ দত্তই স্বামী বিবেকানন্দের জনক।

বিশ্বনাথ কলিকাতার প্রসিদ্ধ এটর্নী রূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। ধনজনপূর্ণ বিশাল ভবনে রাজসিকতার সহিত বাস করিতে তিনি অভ্যস্ত হন। উদার ও আশ্রিত জনের পালক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। আর পত্নী ভুবনেশ্বরী ছিলেন এক ধর্মপ্রাণা প্রাচীনপন্থী মহিলা। প্রতিদিন স্বহস্তে শিবপূজা না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করিতেন না। ইষ্টনিষ্ঠা, তেজস্বিতা কর্মকুশলতায় তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ।

একদিন ভুবনেশ্বরী শিবার্চনায় বসিয়াছেন। সেদিন কি জানি কেন এক গভীর ধ্যানতন্ময়তা তাঁহাকে পাইয়া বসে। প্রায় সমস্ত দিনই ধ্যানাবেশে কাটিয়া যায়, তারপর রাত্রিতে ক্লান্ত দেহে পূজা-কক্ষেই নিদ্রার অভিভূত হইয়া পড়েন।

এই সময়ে তিনি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেন। জটাজূটমণ্ডিত রজতগিরিসন্নিভ

মহেশ্বর তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া সন্তানরূপে ক্রোড়ে আসিতে চাহিতেছেন। 'শিব-শিব' উচ্চারণ করিতে করিতে ভুবনেশ্বরী নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন।

ইহার পরের বৎসর, ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী ভুবনেশ্বরী দেবীর অংক আলো করিয়া আসে এক সুদর্শন শিশু। সেদিন ছিল পৌষ-সংক্রান্তি মকর-বাহিনী পূজার দিন। এই নবাগত শিশুপুত্রই নরেন্দ্রনাথ, উত্তরকালের শক্তিধর সন্ন্যাসী, -স্বামী বিবেকানন্দ।

বাল্যকাল হইতেই নরেন দুরন্ত, প্রাণচঞ্চল। কি যেন এক অব্যক্ত অধীরতা নিয়া সে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। আবার এই অশান্ত বালকের আধারে কখনো কখনো এক দুর্জ্ঞেয় ধ্যানের ধারা নামিয়া আসে, অকস্মাৎ কি করিয়া সে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

বালক তাহার সাথীদের সহিত একদিন পূজো-অর্চনার খেলায় রত। চক্ষু মুদিয়া ধ্যানজপের অভিনয়ও বেশ শুরু হইয়াছে। হঠাৎ কোথা হইতে এক গোখুরা সাপ ফণা নাচাইয়া আসিয়া উপস্থিত। খেলার সঙ্গীরা তো ভীত ত্রস্ত হইয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। নরেনের কিন্তু কোনোই হুঁশ নাই। দুই চক্ষু মুদিয়া অচঞ্চলভাবে উপবিষ্ট, সম্মুখে সাপটিও ফণা মেলিয়া স্থির হইয়া আছে। বালকের খেলার অভিনব কোন্ অজানা মুহূর্তে ধ্যানের গভীরে তলাইয়া গিয়াছে কে জানে? বাড়ির লোক মহা সন্ত্রস্ত, পাছে বালকের অনিষ্ট হয় এই ভয়ে সবাই চুপ করিয়া আছে। কিছুকাল পরে সাপটি ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল, আর আত্মীয়-স্বজনেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

নরেন পরে বলিয়াছেন, "বালক বয়সে একদিন ধ্যান করিতেছিলাম। ধ্যান শেষে চুপ করিয়া বসিয়া আছি, হঠাৎ দেখিলাম - ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ করিয়া এক জ্যোতির্ময় দিব্য মূর্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান। মুণ্ডিত মস্তক, হাতে দণ্ড ও কমণ্ডলু, নয়নে অপরূপ স্নিগ্ধতা। জ্যোতির্ময় পুরুষ কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন। অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে এতক্ষণ চাহিয়াছিলাম। হঠাৎ যেন ভয় হইল—দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।' কোন্ এক দিব্য পুরুষ যেন তাঁহার উপর লক্ষ্য রাখিতেছেন।

বালক নরেনের নিদ্রার ভঙ্গিটিও বড় অদ্ভুত। উপুড় হইয়া তাঁহার শয়নের অভ্যাস। নিদ্রা আকর্ষণের সময়ে, বহির্জগতের চেতনা ধীরে ধীরে কমিয়া আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় এক অলৌকিক অনুভূতি। দেখেন, আলোকোজ্জ্বল পথ বাহিয়া একটি দিব্য বালক একটি গোলাকার জ্যোতির্ময় পিণ্ড ঠেলিয়া নিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। জ্যোতি-গোলক ক্রমে তাঁহার ভ্রূমধ্যে আসিয়া স্থির হয়, তারপর জ্যোতির রাশি অজস্রধারায় তলাইয়া গিয়া অতঃপর ধীরে ধীরে সে নিদ্রার অভিভূত হয়।

নরেনের নিজের কিন্তু ইহা বিস্ময়কর মনে হইত না। ভাবিতেন, এ তো সকলেরই নিদ্রার অভিজ্ঞতা। শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরকালে এই অনুভূতির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "এটা যে ধ্যান-সিদ্ধের লক্ষণ গো।'[১]

১ প্রমথ বসু: স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড

নরেনের তখন চৌদ্দ বৎসর বয়স, রায়পুরে পিতার সঙ্গে বায়ু পরিবর্তনে আসিয়াছেন। একদিন একাকী গো-শকটে বিন্ধ্য পাহাড় দেখিতে যাইতেছেন। এইখানে হঠাৎ তাঁহার এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়। পাহাড়ের গায়ে তৈরি হইয়াছে একটি মৌমাছির চাক। সেদিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িতেই অন্তরে জাগিয়া উঠে এক অভূতপূর্ব আনন্দের শিহরণ। উত্তরকালে তিনি নিজে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিকা রাজ্যের আদি অন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন জগৎ-নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনন্ত উপলব্ধিতে এমনভাবে তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের জন্য বাহ্য-সংজ্ঞার লোপ হইল। কতক্ষণ যে ঐভাবে গো-যানে পড়িয়াছিলাম, স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দেখিলাম উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।" প্রথম জীবনে নরেনের ধ্যানাবেশের ইহা এক অপূর্ব নিদর্শন।

১৮৭৯ সালে নরেন্দ্রনাথ এনট্রান্স পাস করিয়া কলেজে ঢুকিলেন। ব্যক্তিত্ব, মেধা ও প্রাণশক্তি তাঁহার প্রচুর, তাই ক্লাসের ছেলেদের নেতা হইয়া উঠিতে দেরি হইল না। অধ্যাপকেরাও তাঁহাকে চিনিয়া নিলেন এক অসাধারণ ছাত্ররূপে। জেনারেল এসেম্বলীতে তখন প্রতিভাবান্ ছাত্রের অভাব ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও তখন এখানেই পড়িতেন, নরেন্দ্রনাথের এক ক্লাস উপরে। একবার এক বিতর্কসভায় নরেনের উপর খুশী হইয়া দর্শনবেত্তা অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেব বলেন, "এই তরুণ দর্শনশাস্ত্রের এক প্রতিভাধর ছাত্র। আমার মনে হয়, জার্মানী ও ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়েও এর মতো একটি ছাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

নরেন তখনও এফ-এ পরীক্ষা দেন নাই। কিন্তু ডেকার্ট, হিউম ও বেন-এর সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব তিনি পড়িয়া ফেলিয়াছেন। ডারুইন ও স্পেন্সারের চিন্তাধারার সহিতও তাঁহার পরিচয় নিবিড়। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের যুক্তিবাদ ও বিচার বিতর্কের মধ্যে সত্যের প্রকৃত পথটি তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের মতো অবস্থা তাঁহার।

বাংলার সংস্কার আন্দোলন চলিতেছে প্রায় সাত বৎসর যাবৎ। রামমোহনের ধর্ম দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবের দ্বারা কিছুটা রূপান্তরিত। নৈতিক জীবনের দৃঢ় আদর্শও সমাজজীবনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু তাহাতে নরেনের প্রাণের পিপাসা মিটিতেছে কই? অধ্যাত্মসাধনার রসে জীবনের শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইয়া উঠে, প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্য দিয়া সাধকের প্রাণে আসে পরম শান্তি। কই সে শান্তি তো পাওয়া যাইতেছে না?

পাশ্চাত্য দর্শনের বিচার-বিশ্লেষণে নব্য শিক্ষিত নরেন দিশেহারা। ব্রাহ্মসমাজের ছায়াতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ভাবিলেন, শাশ্বত সত্যের সন্ধান এবার হয়তো মিলিবে, কিন্তু কোথায় তাহা? সংশয় জাগে মনে, ঈশ্বর কি সত্যই আছেন? জীবনপথের শেষে অমৃত কুম্ভটি হাতে নিয়া যে জীবনপ্রভু প্রসন্নমধুর হাসি হাসেন, তিনি কি শুধু কবির কল্পনা?

সন্দেহ সংশয় যাহা কিছু আসুক না কেন নরেন্দ্র কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের পবিত্রতা বিশুদ্ধতা একই ভাবে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। বড় হইয়াও উচ্চতর প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ—ত্যাগী সাধকের জীবনই যাপন করিতেছেন।

সংশয় ও বিচারবুদ্ধির গহন অরণ্যে কিন্তু একটা দিব্য অনুভূতি মাঝে মাঝে স্ফুরিত হইয়া উঠে। ধ্যান করিতে যখন বসেন, তখন তো কোনো অবিশ্বাস অসন্তোষের ছায়াপাত অন্তরে হয় না? স্বচ্ছন্দ ধ্যানাবেশে তিনি অন্তর্লীন হইয়া যান।

প্রায় একটা জ্যোতিঃপুঞ্জ আবির্ভূত হয়, আর তাঁহার নয়নসমক্ষে এক দ্বিভুজ বন্ত্রের অপরূপ ছবি রচনা করে। অজানা আনন্দে নরেন্দ্রনাথের হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠে। ভাবেন, এ কোথাকার ইঙ্গিত? অতীন্দ্রিয়লোকের অন্তরালে তবে তো তাঁহার জীবনপ্রভু বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু কে তাঁহাকে এই পরমধন মিলাইয়া দিবে? অন্তর মথিত করিয়া প্রশ্ন উঠিতে থাকে কোথায় সেই সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ যিনি ভগবৎ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, এবং অভীপ্সিত পথে তাঁহাকে যিনি চালনা করিবেন?

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস। শিমুলিয়া পল্লীতে একটি ক্ষুদ্র আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে। নরেনের প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র পরম ভক্তিভরে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়া আসিয়াছেন। ভক্তিসংগীত গাওয়া হইবে, তাই নরেনের ডাক পড়িল। নরেন যেমন নানা বৈঠকে ঘুরিয়া বেড়ান—তেমনই আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার কণ্ঠে গান শুনিয়া পরমহংসদেবের আনন্দের অবধি নাই। সস্নেহে নিকটে ডাকিয়া এই প্রিয়দর্শন যুবকের দেহলক্ষণ মিলাইয়া দেখেন। পরিচয় গ্রহণের পর আমন্ত্রণ জানান, "দক্ষিণেশ্বরে একবার যেয়ো, কেমন?

এফ এ পরীক্ষার ব্যস্ততায় কয়েক মাস নরেন দক্ষিণেশ্বরের কথা ভুলিয়াই ছিলেন। আত্মীয় রাম দত্ত ও প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্ত। তাঁহাদের কথায় সেদিন ঠাকুরের কথা মনে পড়িল, কয়েকজন বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।

উত্তরকালে রামকৃষ্ণ এই ঐতিহাসিক সাক্ষাতের বিবরণ দিয়াছেন—"দেখলাম, নরেনের নিজের দেহের দিকে কোনোই লক্ষ্য নেই। মাথার চুল ও বেশভূষার বাহার নেই। বাইরের কোনো জিনিসেই ইতর সাধারণের মতো আঁট নেই। সবই যেন আলগা। চোখ দুটো দেখে মনে হয়, ওর মনের অনেকটা কে যেন ভেতর থেকে টেনে রেখেছে। মনে হল, বিষয়ী লোকের জায়গা কলকাতায় এতবড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব।'

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সম্মুখে নরেন উদাস সুরে গান ধরিলেন—

মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে?
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ
সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলেছ আপন জনে?

নিজের অজ্ঞাতসারে এ কি গান নরেন গাহিলেন? যাঁহার কাছ হইতে আসিয়াছেন, যাঁহার কাছেই আবার ফিরিতে হইবে, এ যে সেই পরমাত্মীয় পরমাত্মার কথা।

সেই পরমাত্মারই আনন্দঘন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের

নরেন চিনেন নাই, কিন্তু ঠাকুর নরেনকে তখনি চিনিয়াছেন। মন প্রাণ ঢালিয়া নরেন গাহিলেন—আর ঠাকুর ততক্ষণে হইয়াছেন ভাবাবিষ্ট। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান তাঁহার তিরোহিত হইল।

নবপরিচিত রামকৃষ্ণ সেদিন 'আপনজনের' মতই তাঁহার সহিত ব্যবহার করিলেন। লৌকিক জীবনের চেনা-পরিচয়ের ঊর্ধ্বে, জন্ম-জন্মান্তরের যোগসূত্রে গাঁথা রহিয়াছে এক আত্মীয়তার বোধ।

নরেনকে হাতছানি দিয়া ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় নিভৃত স্থানে নিয়া যান। দুই নয়নে তাঁহার দরবিগলিত প্রেমাশ্রুর ধারা। ঘনিষ্ঠ সুহৃদের মতো বলিতে থাকেন, "এতদিন পরে আসতে হয়? আমি যে এতকাল অপেক্ষা ক'রে আছি তা ভাবতে নেই? বিষয়ী লোকের বাজে কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝলসে যাচ্ছে। প্রাণের কথা বলতে না পেরে পেট ফুলে গেল!"

তারপর ঠাকুরের অবিশ্রান্ত কান্না। নরেন তো বিস্ময়ে হতবাক্। আবার এই উন্মাদ ব্রাহ্মণ হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে, সাশ্রুনয়নে, বলিতেছেন, "জানি, জানি প্রভু, তুমি সেই ঋষি, জীবের দুর্গতি দূর করতে তুমি এসেছ!"

বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ তরুণকে এই ব্রাহ্মণ কি বলিতে চাহিতেছেন? যেন কোন্ এক প্রচ্ছন্ন দেবতার উদ্বোধনের জন্য তাঁহার এই আকুতি। অথবা এক কল্পনাবিলাস? নরেনের চিন্তাধারা বিপর্যস্ত হইয়া যায়!

ঠাকুর ক্ষণকাল পরেই নিজের ঘরে ছুটিয়া যান। কিছু মাখন মিছরি ও সন্দেশ আনিয়া নরেনকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে থাকেন। নরেন তাঁহার সঙ্গীদের সহিত এসব ভাগ করিয়া খাইতে উৎসুক কিন্তু তাহা শুনে কে?

রামকৃষ্ণ স্নেহমাখা স্বরে বলেন, "ওরা খাবে এখন। তুমি আগে খেয়ে নাও।"

সবটা ভোজন করাইয়া ঠাকুর হাত ধরিয়া অনুনয় করিতে থাকেন, "বল শিগ্গির আর একদিন এখানে আসবে, একলাটি আমার কাছে আসবে!' নরেনকে কথা দিতেই হয়। তারপর সঙ্গীদের কাছে ফিরিয়া গিয়া হাঁফ ছাড়েন।

নরেনের অন্তরে তখন চিন্তার ঝড় বহিতেছে। এই ব্রাহ্মণ কি উন্মাদ? আর তাই বা কি করিয়া হয়? ঈশ্বরের জন্যই তো সর্বস্ব ছাড়িয়াছেন। উত্তরকালে তিনি বলিয়াছেন, "নির্বাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উন্মাদ হইলেও ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ত্যাগ জগতে খুব কম লোকই করিতে সক্ষম। উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহাপবিত্র, মহাত্যাগী এবং ঐজন্য মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী। ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন তাঁহার চরণ বন্দনার পর তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ-পূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।"

নরেন চলিয়া গেলে ঠাকুরের কি অবস্থা? তাঁহার নিজের বর্ণনায় "নরেন চলে গেলে, তাকে দেখবার জন্যে প্রাণের ভেতরটা চব্বিশ ঘন্টা এমন ব্যাকুল হয়ে রইল যে বলবার নয়। সময় সময় এমন যন্ত্রণা হত যে মনে হত বুকের ভেতরটা যেন কে গামছা নিংড়ানোর মতো জোর ক'রে নিংড়াচ্ছে। নিজেকে তখন সামলাতে পারতুম না। ঝাউতলায় নির্জনে গিয়ে ডাক্ ছেড়ে কাঁদতুম,—ওরে তুই আয়রে তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না।"

এ আহ্বান আত্মার আত্মীয়ের। এ আহ্বান ঈশ্বরীয় কর্মযজ্ঞের। এ অমোঘ আহ্বান নরেনকে চুম্বকের মতো ঠাকুরের কাছে আকর্ষণ করিয়া নিয়াছিল।

মাসখানেক পর নরেন আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। রামকৃষ্ণ একাকী তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন। নরেনকে দেখামাত্র তিনি আনন্দে অধীর। পরম স্নেহে শয্যার একপাশে তাঁহাকে বসাইলেন। ইহার পরই একেবারে ভাবাবিষ্ট। কিছুক্ষণ অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে নরেনের কাছে আসিয়া দক্ষিণ পদ দিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল নরেনের দিব্য ভাবান্তর।

তিনি নিজেই ইহা বিবৃত করিয়াছেন, "আমার এক অপূর্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে। তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত লইয়া পড়িলাম, মনে হইল—আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুখে, অতি নিকটে। সামলাইতে না পারিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ওগো, তুমি আমার একি করলে, আমার যে বাপ মা আছেন।' অদ্ভুত পাগল আমার ঐকথা শুনিয়া খল্‌খল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং হস্তদ্বারা আমার বক্ষ স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "তবে এখন থাক্‌। একবারে কাজ নেই, কালে হবে।"[1]

ইহার পরই নরেন্দ্র আত্মসংবিৎ ফিরিয়া পান। স্থির হইয়া তিনি ভাবিতে থাকেন, এই উন্মাদ ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন্‌ বিরাট শক্তি বিরাজিত? নরেনের মতো স্বাতন্ত্র্যবাদী দৃঢ়চেতা, বিচারশীল যুবকের ইচ্ছাশক্তিকে অবলীলায় ইনি চূর্ণ করিতে পারেন। শুধু তাহাই নয়, একতাল কাদার মতো তাহাকে ছানিয়া স্বেচ্ছামতো রূপ দান করিতেও তিনি সক্ষম। দিব্যশক্তিসম্পন্ন এমন মানুষকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াই বা যায় কি করিয়া?

আর এক দিনের অলৌকিক অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। দক্ষিণেশ্বরের নিকটে যদু মল্লিকের বাগানে ঠাকুর ও নরেন সেদিন বেড়াইতেছেন। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর ধ্যানাবিষ্ট হইয়া পড়েন। তারপর অকস্মাৎ নরেন্দ্রকে স্পর্শ করা মাত্র তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পায়।

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নরেন দেখেন, রামকৃষ্ণ তাঁহার বক্ষে মৃদুভাবে হাত বুলাইতেছেন, আননখানি তাঁহার দিব্য আনন্দের আভায় সমুজ্জ্বল। এই দিনকার বাহ্যজ্ঞান লোপের অবস্থায় নরেনের সহিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের এক অলৌকিক প্রশ্নোত্তর চলিয়াছিল। অতীন্দ্রিয় রাজ্যের এ কথোপকথনের সারমর্ম ঠাকুর উত্তরকালে ভক্তদের কাছে নিজেই বর্ণনা করিয়াছিলেন।

বিলুপ্ত সংজ্ঞা নরেনকে সেদিন তিনি তাঁহার স্বরূপ ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কোথা হইতে, কেন সে আসিয়াছে এবং কোন্‌ কর্মসাধনের দায়িত্ব তাঁহার, এই প্রশ্ন তাহাকে করা হয়। নরেন ঠাকুরকে যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, "এ থেকেই জেনেছিলাম, নরেন যেদিন জানতে পারবে সে কে, সেদিন আর [illegible]

১ স্বামী সারদানন্দ : লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড

থাকবে না। দৃঢ়সঙ্কল্প সহায়ে যোগমার্গে সে তার দেহ ত্যাগ ক'রে চলে যাবে। নরেন যে ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।"

ঠাকুরের দিব্য দেহের এতটুকু স্পর্শ তার ফলেই একি বিচিত্র অধ্যাত্ম-অনুভূতি। নরেন ভাবিতে থাকেন, তবে কি এই মহাসাধকের করুণাসম্পাতে অসম্ভবও সম্ভব হয়? মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কাররাশি হয় অপসৃত? তাঁহার নিজ দেহের গবেষণাগারেই যে ইহার কিছুটা সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

এই সঙ্গে যুক্তিবাদী মনের নানা সন্দেহও দেখা যায়। এই দিব্যকান্তি ব্রাহ্মণ কোনো সম্মোহন বিদ্যা আয়ত্ত করে নাই তো? নরেনের আত্মবিশ্বাসের মূলে এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে। স্থির করেন,—বেশ কিছুদিন খুঁটিয়া খুঁটিয়া না দেখিয়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা না চালাইয়া, রামকৃষ্ণকে তিনি গ্রহণ করিবেন না।

ঠাকুর কিন্তু দিব্যদৃষ্টি বলে জানিয়া বসিয়া আছেন, নরেন তাঁহারই বাণীবাহক, তাঁহার ঐশ-নির্দিষ্ট লীলার সে প্রধান পরিকর। নরেন যে তাঁহার চোখে এক সহস্রদল কমল – করে এটি ফুটিয়া উঠিবে রঙে রসে সৌগন্ধে, এ জন্যই যে তিনি প্রতীক্ষমাণ। একথাটি মাঝে মাঝে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়াও বসেন।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি পরিবৃত হইয়া রামকৃষ্ণ ধর্মকথা কহিতেছেন। সহসা ভাবাবিষ্ট হইয়া কেশব, বিজয় ও নরেনের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। কি যেন তিনি ইঁহাদের মধ্যে খুঁজিতেছেন।

এই সভা ভাঙিয়া গেলে কহিলেন, "দেখলাম, কেশবের ভেতরে একটা শক্তি, যার ফলে সে জগৎবিখ্যাত হয়েছে। আর নরেনের ভেতর সেরকম আঠারোটা শক্তি বর্তমান। আবার দেখলাম, কেশব ও বিজয়ের হৃদয়ে প্রদীপের মতো জ্ঞানালোক জ্বলছে, কিন্তু নরেনের দিকে চেয়ে দেখি—তার ভেতর জ্ঞান-সূর্য উদিত হয়ে রয়েছে। মায়া মোহের লেশ পর্যন্ত নেই।"

নরেন চমকিয়া উঠেন। প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "মশাই কি সব বললেন? লোকে যে আপনাকে উন্মাদ বলবে। কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব ও মহামনা বিজয়কৃষ্ণ, আর কোথায় আমার মতো এক নগণ্য ছোঁড়া।"

ঠাকুর অসহায়ের মতো উত্তর দেন, "কি করবো রে, তুই কি ভাবিস যে আমি এসব বলেছি। মা যে আমাকে সমস্ত দেখালেন, তাই তো বল্লুম। মা তো আমাকে সত্যি বই মিথ্যা কখনো দেখান নি, তাই তো আমি একথা বলেছি।"

তেজস্বী, তর্কবিশারদ নরেন সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। বলিয়া বসেন, "এসব অতীন্দ্রিয় রূপ-টুপ, মা কালীর দর্শন, নির্দেশ, আপনার নিজের মাথার খেয়াল। দেহ-বিজ্ঞান বলচে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিকার অনেক সময় আমাদের প্রতারিত করে।"

ঠাকুর যেন ছোট বালকটি, ভীত হইয়া ভাবেন—তাই তো। সত্যনিষ্ঠ নরেন তাঁহাকে ভুল বলাইতে যাইবে কেন?

মা জগদম্বার নিকট সব কিছু জিজ্ঞাসা করিবা তবে তিনি আশ্বস্ত হন। বলিতে থাকেন, "মা আমাকে বলে দিলেন, ওর (নরেনের) কথা শুনিস কেন? কিছুদিন পরে ও সব কথাই সত্য বলে মানবে।"

তরুণ ভক্তদের কথা উঠিলেই রামকৃষ্ণ নরেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলেন, "নরেনের মতো একটি ছেলেও দেখতে পেলুম না। যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়,

তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্ম বিষয়ে। সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না।—আমার নরেনের ভেতর এতটুকু মেকি নেই। বাজিয়ে দেখ, টং টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোখ কান টিপে কোনো রকমে দু-তিনটে পাস করছে, ব্যাস্, এই পর্যন্ত। ঐ করতেই যেন তাদের সব শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেনের কিন্তু তা নয়—হেসে খেলে সব কাজ করে, পাস করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়! সে ব্রাহ্মসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্য সকল ব্রাহ্মের মতন নয়—সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতি দর্শন হয়। সাধে কি তাকে ভালবাসি।'

নরেনের সম্বন্ধে ঠাকুরের বড় সহজ প্রত্যয়। প্রায়ই বলেন,—"ও খাপ খোলা তলোয়ার, ও অখণ্ডের ঘর, ধ্যানসিদ্ধ ঋষি।'

নিজের আচার-ব্যবহারেও এই তরুণ ভক্তের অসামান্যতাকে সকলের সামনে ফুটাইয়া তুলেন। দক্ষিণেশ্বরে বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক ভক্ত যাওয়া-আসা করিত, ঠাকুরের জন্য নিয়া যাইত ফলমূল মিষ্টি। এই সব সকাম নিবেদনের বস্তু ঠাকুর নরেনকেই খাইতে দিতেন। বলিতেন, "ওর কোনো হানি হবে না।"

নরেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, বাহবাস্ফোট তাঁহার বড় কম ছিল না। একদিন ভক্তমণ্ডলীপরিবৃত ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া দর্পভরে বলেন, "মশায়, আজ হোটেলে সাধারণে যাকে অখাদ্য বলে তাই খেয়ে এসেছি।' ঠাকুর এ কথায় গুরুত্ব না দিয়া উত্তর দেন, "ওরে তোর ওতে দোষ লাগবে না। শোর গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে তা হবিষ্যান্নের তুল্য, আর শাকপাতা খেয়ে যদি কেউ বিষয় বাসনায় ডুবে থাকে তবে তা শোর গরু খাওয়ারই সমান।"

সমাগত ভক্তদের দিকে চাহিয়া বলিতেন, "নরেনের ব্যতিক্রমে দোষ নেই। ওর ভেতরে জ্ঞানাগ্নি সব সময়ে জ্বলছে, আহারের সব রকম দোষকে ভস্ম করে দিচ্ছে। এসব অনাচারে ওর মন কলুষিত হবে না।"

তার পর সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া ঠাকুর এই চিহ্নিত ভক্ত সম্বন্ধে বলেন, "ও জ্ঞান-খড়গ সহায়ে মায়াময় সব বন্ধনকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলেছে। মহামায়া তাই তো ওকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারছে না।'

নরেন কিন্তু মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, মতবিরোধ সবকিছু সকলের সাক্ষাতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার তীব্র শ্লেষে, যুক্তি আর বাক্যবাণে সকলে জর্জরিত হন।

নরেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য, নিয়মিত প্রার্থনায় সেখানে যোগ দেন। ঠাকুরের সাকার আরাধনা, তাঁহার অদ্বৈত উপলব্ধির কথা অবজ্ঞাভরে হাসিয়া উড়াইয়া দেন। রামকৃষ্ণের কিন্তু তাঁহার এই ভাবী উত্তরসাধকের উপর স্থির বিশ্বাস। এই রাজকীয় শিকারকে, লক্ষ্যবস্তু এই সিংহকে, আয়ত্তে আনার সুযোগের প্রতীক্ষা তিনি করিতেছেন।

শীঘ্রই এক আকস্মিক ঘটনায় তাঁহার ও নরেনের সম্পর্ক নিকটতর হইল। নরেন ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন।

নরেন কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন না। ঠাকুর তাঁহার দর্শনের জন্য অধীর।

তাই এক রবিবার তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য সোজা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে গিয়া তিনি উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া কেশব, বিজয়, চিরঞ্জীব প্রভৃতি ব্রাহ্ম-নেতাদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে।[১] শিবনাথ প্রভৃতি একদল ব্রাহ্ম আচার্য তাই তাঁহার সংস্রব তেমন পছন্দ করিতেছেন না। তাঁহার সংস্পর্শ সযত্নে এড়াইয়া চলিতেই তাঁহারা চান। কিন্তু আগ্রহাকুল রামকৃষ্ণের এতকিছু ভাবিবার অবসর কোথায়? নরেনের খোঁজে, বৎসহারা গাভীর মতো সেদিন তিনি সমাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত।

সমাজ মন্দিরে ঢুকিয়াই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। দেহ রোমাঞ্চিত, পা দুটি টলিতেছে। এই অবস্থায় বেদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। নরেন্দ্র প্রতি রবিবারে সমাজ-গৃহে আসেন। সেদিনও উপস্থিত। ঠাকুর কেন আসিয়াছেন, বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

বেদীর আচার্য বা আর কোনো ব্রাহ্ম নেতাই কিন্তু ঠাকুরকে অভ্যর্থনা জানাইলেন না। শিষ্টাচার বর্জিত এক বিরূপ পরিবেশ। ঠাকুরের কিন্তু কোনো হুঁশই নাই, অচিরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কৌতূহলী জনতার ভিড় এড়ানোর জন্য মন্দিরের গ্যাসের আলোক নিভাইয়া দেওয়া হইল। অতিকষ্টে ঠাকুরকে নিয়া নরেন মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, উপনীত হইলেন দক্ষিণেশ্বরে।

তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্যই ঠাকুরের এই অপমান বরণ! নরেনের মর্মে এ ঘটনাটি তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ হইল। ভালোবাসা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও কম হয় নাই। রামকৃষ্ণের এই দুর্বলতার জন্য তাঁহাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিলেন। তারপর ভয় দেখাইয়া বলিলেন, 'মশায়, শেষটায় এই মায়ার জন্য আপনাকে বিপদে পড়তে হবে। পুরাণে আছে, ভরত রাজা হরিণের কথা ভাবতে ভাবতে—হরিণ হয়ে যান, আপনারও ভাগ্যে আছে তেমনি পরিণাম!'

রামকৃষ্ণ যেন জগদম্বার বালক পুত্রটি। বিষণ্ণ মনে তখনই মায়ের নিকট ছুটিয়া যান। আবার তাহার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া যখন ফিরিয়া আসেন, আননখানি আনন্দের আভায় উজ্জ্বল। স্মিত হাস্যে নরেনকে বলিতে থাকেন, "যা শালা! আমি তোর কথা শুনবো না। মা বলে দিলেন,—তুই যে ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস। তাই এত ভালোবাসিস। যেদিন ওর ভেতর সেই নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি নে।"

এই দেব-শিশুর কাছে, জগন্মাতার চরণে সমর্পিত প্রাণ সন্তানের কাছে, নরেন্দ্রনাথকে সেদিন হার মানিতে হইয়াছিল।

নরেন দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই ঠাকুরের আনন্দ উথলিয়া উঠে। মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিয়া এমন উদ্দীপনা হয় যে তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়েন।

সামনেই বি-এ পরীক্ষা। পড়া তৈরি করার জন্য নরেন কিছুদিন যাবৎ ব্যস্ত, দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারিতেছেন না। ঠাকুর তাঁহার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। একদিন নরেনের সহিত সাক্ষাতের জন্য নিজেই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত।

---

১ মাক্স্ মুলের: রামকৃষ্ণ—হিজ্ লাইফ্ এন্ড সেইংস্

পড়াশুনা ও ধ্যান ধারণার সুবিধার জন্য নরেন্দ্র তখন তাঁহার মাতামহীর বাসাবাড়ির এক নিভৃত কক্ষে বাস করিতেছেন। দোতলার এই ক্ষুদ্র ঘরটির নামকরণ করিয়াছেন "টং"। একটি ক্ষুদ্র তক্তপোশের উপর মাদুর পাতা, চারিদিকে ছড়ানো রহিয়াছে বইখাতা। মেঝের একদিকে স্তূপ করা তামাকুর গুল ও ছাই। অপর দিকে তানপুরা ও বাঁয়া-তবলা। এ পরিবেশ ঘরের মালিকের অশান্ত মনেরই যেন এক হুবহু প্রতিচ্ছবি।

ঠাকুর নিচ হইতে 'নরেন, নরেন' বলিয়া চিৎকার করিতে থাকেন। নরেন ছুটিয়া আসিয়া, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরে নিয়া যান। সাশ্রুনয়নে, গদ্গদ স্বরে ঠাকুর বলিতেছেন, "তুই এতদিন যাস নি কেন রে? তুই এতদিন যাস নি কেন?"

প্রেমলীলার শেষ এইখানেই নয়। দক্ষিণেশ্বর হইতে গামছায় বাঁধিয়া নরেনের জন্য সন্দেশ আনিয়াছেন। ব্যগ্রভাবে তাহা খুলিয়া বলিলেন, "ধর খা, খা।'

স্নেহপূর্ণ স্বরে কহেন, "একটা গান শোনা দেখি, অনেকদিন তোর কণ্ঠ শুনি নি।"

বড় অযাচিত এ আগমন আর বড় অহেতুক এ কৃপা। নরেন অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। তানপুরা লইয়া ধীর কণ্ঠে সংগীত শুরু করিলেন—

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী।
(তুমি) নিত্যানন্দ স্বরূপিণী,
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা
আধার-পদ্ম-বাসিনী।

ঠাকুরের মন তখন ঊর্দ্ধতর চেতনায় উঠিয়া যাইতেছে। ক্রমে সমাধিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

নরেন ঠাকুরের ধরন-ধারণ আজকাল কিছুটা বুঝিয়া নিয়াছেন। ভজন গানের মাধ্যমেই ঠাকুরকে বাহ্য-জ্ঞানের ভূমিতে অবতরণ করাইতে হইবে। তাই গাহিতে লাগিলেন, 'একবার তেম্নি তেম নি তেম্নি ক'রে নাচ মা শ্যামা।'

ধীরে ধীরে ঠাকুর সহজ অবস্থায় আসেন। তারপর আদরের ধন নরেনকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়া গিয়া তবে শান্ত হন।

স্বার্থগন্ধহীন এই অপার্থিব প্রেমের বন্যা দিনের পর দিন যেন নরেনের জীবনের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দিতেছে। ইহারই উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে বলিতেন, "ঠাকুরের এই ভালোবাসাই আমাকে চিরকালের মতো বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। একা তিনিই ভালোবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারের অন্য সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালোবাসার ভানমাত্র করিয়া থাকে।'

দিব্য প্রেমের চুম্বকাকর্ষণে নরেন ধীরে ধীরে ঠাকুরের অস্তিত্বের সহিত মিশিয়া যাইতেছেন। কিন্তু ইহার পরই আসে ঠাকুরের আর এক রকম পরীক্ষা। কিছুদিন পর্যন্ত তিনি নরেনের দিকে মোটেই দৃষ্টি দেন না। অহেতুক কৃপার ধারাটি হঠাৎ যেন প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছেন। নরেন্দ্রকে দেখা মাত্র আগে উল্লসিত হইয়া উঠিতেন। এখন আর সেরূপটি দেখা যায় না। ডাকিয়া একবার একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতেছেন না। নরেন্দ্রনাথেরও যেন এই ভাবটি লক্ষ্য আজকাল তেমন আর কিছু মনে

আসে না। পূর্ববৎ নিয়মিতভাবে ঠাকুরকে গিয়া তিনি দর্শন করেন। তারপর ভক্তদের সহিত বাক্যালাপ করিয়াই ফিরিয়া আসেন নিজগৃহে।

এই অবহেলা ও ঔদাসীন্যের পালা প্রায় একমাস চলিল। ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমি তো তোকে ডেকে আজকাল একটা কথাও বলি না। তবে তুই এখানে কি করতে আসিস বল দেখি?"

নরেন্দ্র অবলীলায় উত্তর দিলেন, "আপনার কথা শুনতে তো আসি না। আপনাকে ভালোবাসি, সব সময়ে দেখতে ইচ্ছা করে—তাই আসি।"

দুর্ধর্ষ সিংহ এইবার ধরা পড়িয়াছে শিকারীর জাল-বেষ্টনীতে। নরেনের এই অকপট স্বীকারোক্তিতে ঠাকুরের তাই আনন্দের অবধি নাই। স্মিত হাস্যে বলিলেন, "আমি তোকে বিড়ে (পরীক্ষা করে) দেখছিলাম আদর-যত্ন না পেলে তুই পালিয়ে যাস্ কিনা, তোর মতো আধারই এতটা তাচ্ছিল্য সহ্য করতে পারে।"

রামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া নরেনকে অদ্বৈত তত্ত্বের মর্মকথা বুঝাইতেছেন। বলিতেছেন, জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। নরেন ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রভাবিত, এমন কট্টর অদ্বৈতবাদের কথায় তাঁহার মন সায় দেয় না। মন্দির চত্বরের একপাশে প্রতাপ হাজরা থাকেন। নরেন সেখানে বসিয়া মাঝে মাঝে গল্প গুজব করেন তামাক খান। কথাপ্রসঙ্গে নরেন হাজরার সম্মুখে বসিয়া সেদিন বলিতেছেন, "আচ্ছা মশাই, এও কি কখনো হতে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যা কিছু দু'চোখে দেখছি সকলই ঈশ্বর!"

হাজরাও এ কথার উপর ব্যঙ্গ করিয়া এক মন্তব্য করেন। উভয়ের মধ্যে হাসির রোল উঠে। ঠাকুর তাঁহার কক্ষে ভাবাবিষ্ট। নরেনের হাস্যরব কানে যাইতেই বাহিরে চলিয়া আসেন। নয়ন আধ-নিমীলিত, পরনের কাপড়খানি বালকের মতো বগলে ধরা। নিকটে আসিয়া স্মিত হাস্যে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তোরা কি বলছিস রে? তারপর একটু কাছে ঘেঁষিয়া নরেনকে স্পর্শ করিতেই ঘটে এক অদ্ভুত কাণ্ড! নরেন সমাধিমগ্ন হইয়া যান।

এ যেন ঐন্দ্রজালিকের স্পর্শ। হাস্য-পরিহাসরত নরেনের সত্তায় বিপ্লব ঘটিয়া গেল। মুহূর্তে মধ্যে সমস্ত চেতনার, সমস্ত অস্তিত্বের যেন এক বিরাট রূপান্তর সাধিত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নরেনের উপলব্ধি হইল, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুরই কোনো অস্তিত্ব নাই। এই অপূর্ব দিব্য অনুভূতি জাগ্রত রহিল সারাদিন ব্যাপিয়া।

তারপর বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেও দেখা গেল এই চৈতন্যময় অবস্থা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আহারে বসিয়া তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন. অন্ন, থালা, পরিবেশনকারী, সব কিছুই সেই এক পরম ব্রহ্মেরই রূপায়ণ। রাস্তা-ঘাটে, কলেজে সেই একই অভিজ্ঞতা। শুধু দুই একদিন নয়, কয়েকদিন এই চিন্ময় অনুভূতি সর্বসত্তায় ওতপ্রোত রহিল।

স্বামীজী বলিয়াছেন, যখন আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কমে যেত তখন জগৎটাকে মনে হত স্বপ্ন। হেদুয়া পুকুরে বেড়াতে গিয়ে তার চারদিকের লোহার রেলিঙে মাথা ঠুকে দেখতাম, যা সব দেখছি তা স্বপ্নময় না বাস্তব। হাত পা অসাড়তার জন্য

মনে হত, পক্ষাঘাত হবে না তো? বেশ কিছুকাল এই ভাবের ঘোর ও আচ্ছন্নতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাই নি। যখন প্রকৃতিস্থ হলাম তখন ভাবলাম—এই হচ্ছে অদ্বৈত বিজ্ঞানের আভাস। তবে তো শাস্ত্রে যা লেখা আছে, তা মিথ্যে নয়। সেই অবধি অদ্বৈততত্ত্বের ওপর আর সন্দেহ জাগে নি।

শুদ্ধতম প্রেমের দুর্ভেদ্য বেড়াজালে ঠাকুর নরেনকে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। এইবার বাস্তব অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে চৈতন্যের তোরণ-দ্বারে উপস্থিত করিয়া দিলেন। পরিহাস ও অস্বীকৃতির মধ্য দিয়া স্বাধীনচেতা যুক্তিবাদী নরেন পরম সত্যের অনুসন্ধান শুরু করিয়াছিলেন। পূর্ণ প্রত্যয়ের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আজ তাহারই ঘটিল আত্মপ্রকাশ।

সিংহ একবার এক লম্ফে লক্ষ্যবস্তুর উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে—বায়ুবেগে তত্ত্বজ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়াছে নরেনের সর্বসত্তায়।

নরেনের স্বীকৃতি ও শরণাগতির এক অপূর্ব চিত্র শরৎ মহারাজ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৪ সালের শীতকাল। শরৎ ও শশীর সহিত হেদুয়ার বেড়াইতে বেড়াইতে নরেন তাঁহার প্রত্যয়ভরা মর্ম-কথা উদ্‌ঘাটন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশ নির্দিষ্ট কর্মলীলার আভাস তখন তিনি পাইয়াছেন। তাঁহার কৃপাবলে কত শরণাগত ভক্তের কত সংস্কার বন্ধন কাটিতেছে, দিব্য আনন্দের অধিকারী তাঁহারা হইতেছেন, ইহার অপূর্ব বর্ণনা দিলেন। প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভে তিনি নিজেও যে আজ ধন্য। তারপর সজল নয়নে প্রেম গদ্‌গদ স্বরে নরেন গান ধরিলেন—

প্রেমধন বিলায় গোরা রায়,
চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয়,
(তোরা কে নিবিরে আয়।)
প্রেম কলসে কলসে ঢালে
তবু না ফুরায়!

তরুণ সাধকের হৃদয়ের কপাটখানি সেদিন উন্মুক্ত। আপন মনে অস্ফুট স্বরে তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "হ্যাঁ, সত্য সত্যই তিনি বিলাচ্ছেন। যা কিছু প্রেম, প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায় যা ইচ্ছে তাকে তাই বিলাচ্ছেন। কি অদ্ভুত শক্তি। রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছি, সহসা আকর্ষণ করে দক্ষিণেশ্বরে হাজির করালেন—শরীরের ভেতরে যেটা আছে সেইটাকে। তারপর কত কথা কত উপদেশের পর আবার ফিরিয়ে দিলেন। সব করতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সত্যিই সব করতে পারেন।'

অতীন্দ্রিয়লোকের অভ্যন্তরে, পরম চেতনা ও শক্তির মর্মকেন্দ্রে মহাসাধক রামকৃষ্ণ সমাসীন। তাঁহার সহিত নরেন্দ্রনাথের পরিচয় এইবার সাধিত হইতেছে। সেই নিগূঢ়, অধ্যাত্মলোকের চমকপ্রদ বার্তারই আভাস তাঁহার সেদিনকার কথায় ফুটিয়া উঠে।

সাধনপথের দিগ্‌নির্ণয় হইয়াছে—নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার জীবনপ্রভুরূপে স্বীকার করিয়াছেন। তাই বুঝি এবার ঠাকুর শুরু করিলেন নরেনের পরীক্ষা ও জীবনমন্থন। দারিদ্র্যের পীড়ন আসে বার বার। তারপর ঘটে পিতার আকস্মিক মৃত্যু।

এই দুর্দৈবময অধ্যাযেব সূত্রপাত হয ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দেব প্রথমভাগে। ইহাব কিছুকাল আগে নবেন বি. এ. পবীক্ষা দিযা উঠিযাছেন।

পিতা বিশিষ্ট এটর্নী হইলেও তিনি ছিলেন অমিতব্যযী। সঞ্চয দূবেব কথা ঋণেব বোঝাই কিছুটা বাখিযা গিযাছেন। আব সেই সঙ্গে বহিযাছে মা ও কয়েকটি ভাইবোনেব খাওযা-পবাব দাযিত্ব। মাতা ও পুত্র সাহসেব সহিত এই সংগ্রামে বত হইযাছেন। যে সংসাবেব মাসিক ব্যয হাজাব টাকা, আজ তাহা ত্রিশ টাকায চালাইতে হইতেছে। কিন্তু এই টাকাবই বা সংস্থান কোথায?

এই সমযকাব সঙ্কটেব বাস্তব চিত্রটি উত্তবকালে বিবেকানন্দেব নিজেব ভাষাযই ফুটিযা উঠিযাছে, "মৃতাশৌচেব অবসান হইবাব পূর্ব হইতেই কর্মেব চেষ্টায ফিবিতে হইযাছিল। অনাহাবে নগ্নপদে চাকুবিব আবেদন হস্তে লইযা মধ্যাহ্নেব প্রখব বৌদ্রে অফিস হইতে অফিসান্তবে ঘুবিযা বেড়াইতাম—অন্তবঙ্গ বন্ধুগণেব কেহ কেহ দুঃখেব দুঃখী হইযা সঙ্গে থাকিত, কোনোদিন থাকিতে পাবিত না, কিন্তু সর্বত্রই বিফল হইয়া ফিবিতে হইযাছিল। সংসাবেব সহিত এই প্রথম পবিচযেই বিশেষভাবে আমাব হৃদযঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিবল – দুর্বলেব, দবিদ্রেব এখানে স্থান নাই। দুইদিন পূর্বেও যাহাবা আমাকে সাহায্য কবিতে পাবিলে ধন্য হইত, সময বুঝিযা তাহাবাই এখন আমাকে দেখিযা মুখ বাঁকাইতেছেন। যেদিন বুঝিতাম গৃহে সকলেব প্রচুব আহার্য নাই এবং হাতে পযসা নাই সেদিন মাতাকে 'আমাব নিমন্ত্রণ আছে' বলিযা বাহিব হইতাম এবং সামান্য কিছু খাইযা, কোনোদিন বা অনশনে, কাটাইযা দিতাম।"

এত কিছু দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনেব উপব ছিল জ্ঞাতিদেব শত্রুতা। বাড়ি হইতে উচ্ছেদ কবাব জন্য তাহাবা জোব মামলা শুরু কবিযা দিযাছে।

এইসব উৎপীড়নেব সঙ্গে আছে আব এক ধবনেব উৎপাত, এক ধনী মহিলাব দৃষ্টি আগে হইতেই সুদর্শন তরুণ নবেনেব উপব পড়ে। সুযোগ বুঝিযা এবাব তিনি লোভ দেখাইতে থাকেন, তাঁহাকে গ্রহণ কবিলে নবেন অচিবে এই অর্থকষ্ট হইতে নিষ্কৃতি লাভ কবিতে পাবেন। নবেন্দ্র কিন্তু ঘৃণাভবে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবেন।

এক ধনী বন্ধু আমোদ প্রমোদেব জন্য এই সমযে নবেনকে তাঁহাব বাগানবাড়িতে নিযে যায। নবেন গিযা দেখেন, সুবা এবং বাবাঙ্গনাবও ব্যবস্থা সেখানে বহিযাছে। সকলে যুক্তি কবিযা স্ত্রীলোকটিকে হঠাৎ নবেনেব বিশ্রাম-কক্ষে প্রেবণ কবে। যুবতীব দিকে স্থিব দৃষ্টিতে তাকাইযা তেজস্বী নবেন প্রশ্নেব পব প্রশ্ন কবিতে থাকেন,- কেন সে এই পাপেব পথে নামিযাছে? সত্যকাবেব সুখ তাঁহাব জীবনে কখনো মিলিযাছে কি?

তাবপব তীক্ষ্ন পৌবুষদৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বলিযা উঠেন, "বাছা এই ছাইভস্ম দেহটাব তৃপ্তিব জন্য তো কত কিছু কবলে। কিন্তু মৃত্যু কি তোমায ছাড়বে? সে তো ক্রমেই এগিযে আসছে। পাবেব সম্বল কিছু কবেছ কি? এসব ছেড়ে, ভগবানকে ডাকো।"

বমণী লজ্জিতা ও অনুতপ্তা হয, ফিবিযা আসিযা অনুযোগেব সুবে বলে, "ছিঃ এমন লোকেব কাছেও কি আমায পাঠাতে হয।"

সাহস ও অকপটতা নরেনের আজন্ম বৈশিষ্ট্য। বাগানবাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সবাইকে বলিতে থাকেন, "জানো, আজ বাগানে গিয়ে খুব আমোদ-প্রমোদ করে এসেছি। তাছাড়া, মদ, মেয়েমানুষ সবই সেখানে ছিল।"

এসব কথা পল্লবিত হইয়া পরমহংসদেবের কানে পৌঁছিল। নরেন [illegible] গিয়াছে। রামকৃষ্ণ গর্জিয়া উঠিলেন, "চুপ কর্, শালারা। মা বলেছেন, সে [illegible] অমন হতে পারে না। যোষিৎ-সংসর্গ ওর হবে না। আর কখনো আমাকে [illegible] কথা বললে আমি তো মুখ দেখবো না।'

নরেনের জীবনপ্রভু তাঁহার জ্যোতির্নিরন্দ্রী তৃতীয় নয়নটি যে সতত [illegible] দিকেই নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। সে নয়নের দৃষ্টি-সীমা এড়াইয়া চলার উপায় [illegible] কই ?

কখনো অভিমানে, কখনো বা দারিদ্র্যের পেষণে নরেন তাঁহার উষ্মা প্রকাশ করেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ জানান। কিন্তু ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি তিনি লাভ করিয়াছেন, যে অপ্রাকৃত দর্শন তাঁহার হইয়াছে, তাহা তো বিস্মৃত হইবার নয়। অন্তঃসঞ্চারী আলোকস্রোত ধীরে ধীরে তাঁহার [illegible] গভীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আর ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপার উৎস হইতেই যে সে প্রবাহ নামিয়া আসিতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় কই ?

নরেন্দ্রনাথ তখন বেকার। সেদিন ভগ্ন হৃদয়ে অবসন্ন দেহে গৃহে ফিরিতেছেন। শেষটায় রাস্তার পাশে এক বারান্দায় শুইয়া পড়িতে তিনি বাধ্য হন। চেতনা [illegible] বিলুপ্ত প্রায়। এই সময়ে জাগিয়া উঠে এক বিস্ময়কর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। উত্তরকালে নিজেই তিনি ইহা বিবৃত করিয়াছেন,—"সহসা উপলব্ধি করিলাম, [illegible] এক দৈবশক্তি প্রভাবে একের পর এক—এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দা [illegible] উত্তোলিত হইল। তখন শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর [illegible] ও অপার করুণার সামঞ্জস্য কোথায়—এই শ্রেণীর যে সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন [illegible] ও শান্তিতে পূর্ণ, এবং রজনী অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।

ইহার পর অন্তরে শুরু হয় এক নূতনতর আলোড়ন। তীব্র বৈরাগ্য [illegible] থাকে। জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি, নিন্দা-প্রশংসায় তাঁহার কি আসে যায় ? [illegible] দৃঢ় প্রত্যয়,—সংসারের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া থাকার জন্য তো তাঁহার [illegible] মুক্তির আস্বাদ তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। স্থির করিলেন, সংসার ত্যাগ করিয়া নিবেন সন্ন্যাসজীবন।

কয়েকদিন পরে রামকৃষ্ণ কলিকাতার এক ভক্তগৃহে আসিয়াছেন। [illegible] একরকম জোর করিয়াই তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিয়া গেলেন। [illegible] সমাগম। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ নরেনের [illegible] একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকেন। তারপর [illegible] গান ধরেন,—

কথা কহিতে ডরাই,
না কহিতেও ডরাই,
[আমার] মনে সন্দ হয়
বুঝি তোমায় হারাই, হা—রাই।

এ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের মর্ম বুঝিতে নরেনের দেরি হইল না। সর্বজ্ঞ ঠাকুর তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্পটি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা তাঁহার এই গানের পদে লুকানো।

নরেনের মনের রুদ্ধ ভাবপ্রবাহ যেন মুহূর্তে অর্গলমুক্ত হইয়া গেল। ঠাকুরের মতো তাঁহার চোখ দুটিও অশ্রু ছলছল।

উভয়েরই এই রহস্যময় আচরণে বিস্মিত হইয়া সবাই নীরবে বসিয়া আছেন। ঠাকুর সহাস্যে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমাদের ভেতরে একটা ব্যাপার হয়ে গেল।"

সেই রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে নরেনকে ডাকিয়া রামকৃষ্ণ গোপনে বলিলেন, "ওরে আমি জানি, তুই মায়ের কাজের জন্যই এসেছিস্। সংসারে থাকা তোর হবে না। কিন্তু আমি যতদিন আছি, আমার জন্য থাক্।" কথা কয়টি নরেন্দ্রনাথের জীবনে যেন আলোক-সংকেত। সরাসরি মর্মমূলে গিয়া এগুলি বিদ্ধ হইল। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল ঠাকুরের ছলছল দুটি আয়ত নয়ন আর অন্তরের প্রেমপ্রবাহ। এ প্রবাহ নরেন্দ্রনাথের মতো ঐরাবতকেও ভাসাইয়া নিবার পক্ষে যথেষ্ট।

বাড়ির মামলা ক্রমে আরো জটিল হয়। জ্ঞাতিরা উৎখাতের মামলায় তাঁহাকে কাবু করিতে চাহিতেছে। পুস্তক প্রকাশক ও এটর্নীর অফিসে চূড়ান্ত পরিশ্রম করিয়া এই সময়ে কিছু কিছু উপার্জন করেন বটে, কিন্তু তাহাতে মা ও ভাই-বোনদের অন্ন সংস্থানই হয় না। তদুপরি মোকদ্দমার ব্যয়। অর্থাভাব ক্রমে চরমে উঠিল।

আত্ম-পরিজনের অন্নকষ্ট আর তো সহ্য হয় না। নরেন একদিন ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। স্থির করিলেন, যে ঠাকুরের উপর জীবনের সমস্ত ভার চাপাইয়া তিনি বসিয়া আছেন, আজ মা ও ভাই-বোনের অন্নসংস্থানের জন্য তাঁহারই কৃপা ভিক্ষা মাগিয়া নিবেন। সর্ব অন্তর খুঁজিয়া দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল। ঐহিক পারত্রিক যাহা কিছু চাহিবার তাঁহার নিকট ছাড়া আর কাহার কাছে চাহিবেন? আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক দুই জীবনেরই বোঝা আজ তিনি ঠাকুরের পদে সমর্পণ করিতে পারিলে বাঁচিয়া যান। আত্মবিশ্বাস তাঁহার চিরতরে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

তখনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরকে চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন, "মশায়, সংসারের ভাবনা আর আমি ভাববো না। আপনি মাকে বলে যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।"

"ওরে, আমি যে ওসব কথা বলতে পারি না। তুই নিজে মাকে জানাস্ না কেন? মাকে যে মানিস না, তাই এত বিপদ হচ্ছে। কালীঘরে গিয়ে মায়ের কাছে আজ তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন। মা যে আমার চিন্ময়ী, ব্রহ্মশক্তি। ইচ্ছেমাত্র সবকিছু করতে পারেন। তুই যা না তাঁর কাছে।"

গভীর রাত। নরেন ধীর পদে দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়া বসেন। নিবিড় ভাবের ঘোরে তিনি আবিষ্ট। সেদিনকার অনুভূতি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ পরে

বলিয়াছেন, "যাইতে যাইতে একটা গাঢ় নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম, পা টলিতে লাগিল। মাকে সত্য সত্য দেখিতে ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব এইরূপ স্থির বিশ্বাসে মন অন্য সকল বিষয় ভুলিয়া অত্যন্ত একাগ্র ও তন্ময় হইয়া ঐ কথাই ভাবিতে লাগিল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই মা চিন্ময়ী, সত্য সত্যই তিনি জীবিতা এবং অসীম প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রস্রবণরূপিণী। ভক্তি ও প্রেমে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, বিহ্বল হইয়া বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাতে তোমার অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি, এইরূপ ক'রে দাও।' শান্তিতে প্রাণ আপ্লুত হইল, জগৎ সংসার নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া একমাত্র মা-ই হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিলেন।"

পাষাণ প্রতিমায় ঘটিয়াছে চিন্ময়ী জগজ্জননীর দিব্য আবির্ভাব। নরেনের সমগ্র সত্তার মূলে জাগিয়াছে প্রচণ্ড আলোড়ন। অন্নবস্ত্রের নগণ্য সমস্যা তিনি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাই মায়ের কাছে তাহা জানাইতে পারেন নাই। ঠাকুরের নির্দেশে তিন তিন বার মন্দিরে গিয়া বসিলেন। কিন্তু সে প্রশ্নটি আর উঠাইতে পারিলেন কই?

বার বারই ভাবেন, কোন্ লজ্জায় এই তুচ্ছ কথা জগজ্জননী আদ্যাশক্তিকে তিনি জানাইতে যাইবেন? ঠাকুরের মূল্যবান কথাটি অমনি তাঁহার মনে পড়িয়া যায়। ভক্তদের প্রায়ই তিনি বলিতেন, "রাজার প্রসন্নতা লাভ ক'রে তাঁর কাছে তুচ্ছ লাউ-কুমড়ো চাওয়া সে যে নির্বোধের কাজ রে।"

মায়ের কাছে সেদিন শুধু জ্ঞানভক্তি প্রার্থনা করিয়াই নরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন।

সহসা এই ঘটনার অর্থ তাঁহার নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠিল। বুঝিলেন, ইহা ঠাকুরের এক রহস্যময় লীলা। নতুবা যে সমস্যার কথা বলিতে তিনি ব্যাকুল হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন, মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে এমন ভুল বার বার হইবে কেন?

বাড়ির অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য এবার তাই ঠাকুরকেই ধরিয়া বসিলেন। উপায়ান্তর অভাবে রামকৃষ্ণকেই সেদিন বলিতে হয়, "আচ্ছা, যা মোটা ভাত-কাপড়ের কষ্ট কখনো হবে না।"

সব কিছু ভাল-মন্দ ঠাকুরের পায়ে নরেন ইতিপূর্বে বিলাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মা ভাই-বোনের কর্তব্যের বোঝাকেও সেখানে নামানোর কথা তো কখনো ভাবেন নাই? রামকৃষ্ণ আজ যেন নিজেই কৃপা করিয়া এ বোঝা কাড়িয়া নিলেন। দায়িত্ববোধ ও আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে একটা সূক্ষ্ম অহংবোধ। তাও ঠাকুর নরেনের জীবন হইতে বুঝি মুছিয়া ফেলিতে চাহিলেন।

চিন্ময়ী জননীর অপরূপ দর্শন। এ দর্শন নরেনের অন্তরে সেদিন অবিরাম আনন্দের প্রস্রবণ বহাইয়া দেয়। ঠাকুরকে ধরিয়া তখনই জগজ্জননীর এক স্তুতি-গান শিখিয়া নেন। আনন্দাবেশে সারা রাত তাঁহার ঘুম হয় না, গানের ধ্বনি কেবলই কণ্ঠে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতে থাকে—

তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী,
[আমার] মা ত্বংহি তারা।
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।

তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা।

নরেন ব্রহ্মময়ীকে দেখিয়াছেন, ব্রহ্মের সাকার রূপ মানিয়া নিয়াছেন, তাই রামকৃষ্ণের আজ আনন্দের অবধি নাই। বালকের মতো তিনি হাস্যমুখর। সবাইকে ডাকিয়া বার বার বলিতেছেন, "জানো, নরেন মাকে মেনেছে। বেশ হয়েছে—না ?'

পরদিন নরেন কলিকাতায় ফিরিবেন। প্রণাম করিতেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। ছোট ছেলেটির মতো নরেনের কোলে উঠিয়া বসেন, ভাবজড়িত কণ্ঠে কহেন, "দেখছি কি—এটা [নিজের দেহ] আমি, আবার ওটাও [নরেনের দেহ] আমি। সত্যি বলছি, কিছুই তফাৎ বুঝতে পারছি না। যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে—সত্য সত্য কিছু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে।—তা, মা ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন ?"

অর্ধবাহ্য অবস্থায় ঠাকুর এবার তামাক খাইতে শুরু করিলেন। তারপর কল্‌কেটি নরেনের মুখের সামনে নিয়া কহিতে লাগিলেন, 'খা, আমার হাতেই খা।" নরেন সসঙ্কোচে মুখ ফিরাইয়া নেন, কিন্তু ছাড়া পাইবার উপায় নাই। ঠাকুরের হস্তে তাঁহাকে এই তামাক খাইতেই হইল। কিন্তু কল্‌কেটি ঠাকুর যেই নিজ মুখে লাগাইতে যাইবেন নরেন শিহরিয়া উঠিলেন, হাত চাপিয়া ধরিলেন। খাবারের অগ্রভাগ কাহাকেও দেওয়া হইলে ঠাকুর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিতেন না। এখন যেন সবই বিপরীত।

ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "দূর শালা! তোর বড় ভেদ বুদ্ধি। তুই আর আমি কি আলাদা ?"

ঠাকুরের এই আচরণ গুরু ও শিষ্যের একাত্মকতা ও অভেদত্ব যেমন বুঝাইতে চাহিতেছে, তেমনি সামনে তুলিয়া ধরিতেছে অদ্বৈত অনুভূতির আদর্শ।

আর একদিনের কথা। রামকৃষ্ণ সেদিন নিভৃতে নরেনকে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে ডাকিয়া নিয়া যান, তারপর স্নেহপূর্ণ স্বরে কহেন, "দ্যাখ্, তপস্যার ফলে আমার ভেতর অনেককাল হল অণিমাদি বিভূতি সব এসে গেছে। কিন্তু আমি তা দিয়ে আর কি করবো ? যার পরনের কাপড় ঠিক থাকে না, এসব সে কি করে কাজে লাগাবে ? কিন্তু মা তো বলেছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করতে হবে। তোর ভেতরে শক্তি সঞ্চার করে ওগুলো এবার দিয়ে দি, তুই কাজে লাগাতে পারবি। কি বলিস ?"

ঈশ্বর লাভের দৃঢ় সঙ্কল্প তখন নরেনের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। যোগ বিভূতির ঐশ্বর্য প্রলোভন তাঁহাকে টলাইতে পারিবে কেন ? উত্তর দিলেন, "কিন্তু মশায়, এসব তো আমার ঈশ্বর দর্শনে সাহায্য করবে না। তবে এতে আমার কি লাভ ? আগে ভগবৎ-দর্শনরূপ আসল কাজটি হয়ে যাক, তারপর এর কথা ভাবা যাবে।"

প্রিয় ভক্তের এই নিস্পৃহতায় ঠাকুরের চোখে-মুখে সেদিন ফুটিয়া উঠে অপার প্রসন্নতার দীপ্তি।

ভক্তজন পরিবৃত শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন স্বীয় কক্ষে বসিয়া ধর্মকথা কহিতেছেন। 'সর্বজীবে দয়া' এই কথাটি বলিতে বলিতেই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তারপর

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আবেশজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটাণুকীট তুই—জীবে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে সেবা!

নরেন সকলের সঙ্গে বসিয়া ঠাকুরের অমৃতবাণী শ্রবণ করিতেছিলেন। এক মুহূর্তে তাঁহার অন্তর্লোক হইতে একটা পর্দা যেন উঠিয়া গেল। ঠাকুরের প্রজ্ঞানঘন বাণীতে আত্মপ্রকাশ করিল সেবাধর্মের মহিমা।

বিবেকানন্দ উত্তরকালে মুমুক্ষু গুরুভ্রাতাদের কহিয়াছিলেন, "কি অদ্ভুত আলোকই সেদিন ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্ত জ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই তিনি প্রদর্শন করিলেন। অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ও ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মতো দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঠাকুর আজ যাহা ভাবাবেশে বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল - বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতিমুহূর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ - তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।

"ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেরও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ-জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক স্বল্পকালেই কৃতকার্য হইবে, একথা বলা বাহুল্য। কর্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যে সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ কর্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও থাকিতে পারে না, তখন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-রূপ কর্মানুষ্ঠানই যে কর্তব্য এবং উহা করিলেই তাহারা আশু লক্ষ্যে পৌঁছাইবে, একথা আর বলিতে হইবে না। যাহা হউক ভগবান্ যদি কখনো দিন দেন তো আজ যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব,—পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।[১]

১ স্বামী সারদানন্দ : লীলা প্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড

ঠাকুরের কথাগুলি নরেনের জীবনে সেদিন উপস্থিত হয় নূতন দিগ্‌দর্শনরূপে। উত্তরকালে প্রধানত এই দিগ্‌দর্শনকেই তিনি কাজে লাগাইয়া ছিলেন।

ভক্ত শিষ্যদের ঠাকুর সাধারণত ভক্তিশাস্ত্র পড়িতে বলিতেন। কিন্তু নরেনের জন্য অন্য ব্যবস্থা। জানিতেন, নরেন উত্তরকালে চিহ্নিত হইবেন এক বিশ্বখ্যাত আচার্যরূপে, বিশ্বজনীন অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাতা রূপে। তাই অদ্বৈতভাবের উদ্দীপক শাস্ত্রাদি যখন নরেন পড়িতে বসিতেন, ঠাকুর বরং আনন্দিতই হইতেন। নরেনকে এসময়ে প্রায়ই উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে দেখা যাইত।

সহজাত জ্ঞান বৈরাগ্যের অধিকারী ছিলেন নরেন, কিন্তু তাঁহার সত্তার গভীরে লুকানো ছিল প্রেমভক্তির এক বিপুল উৎস। ঠাকুর তাই বলিতেন, "এ রকম চোখ কি শুষ্ক জ্ঞানীর কখনো থাকে রে? জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির ভাবও যে তোর ভেতরে রয়ে যাচ্ছে।" বাহিরে জ্ঞানমার্গী হইলে কি হয়. ঠাকুর যখন কীর্তনানন্দে মাতিতেন, দেখা যাইত—নরেনও সকলের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ভাবাবেগে নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ জানিতেন, নরেন নিত্যসিদ্ধ, মন্ত্রপুরুষ, সর্ব মায়ামোহের ঊর্ধ্বে সে অবস্থিত। তাই কেবলি তাঁহার ভয় হইত মায়ার প্রভাব নরেনের উপর কিছুটা না থাকিলে ঐশ নির্দিষ্ট কর্ম তো সে সম্পন্ন করিতে পারিবে না। নিজের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া যে কোনো মুহূর্তে দেহটি ছাড়িয়া দিবে, চলিয়া যাইবে স্বস্থানে। সজল নয়নে ঠাকুর তাই জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা জানান, "মাগো, ওর ভেতর তুই একটুখানি মায়া প্রবেশ করিয়ে দে, নতুবা কোনো কাজই তো করতে পারবে না।"

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নরেন ও অন্যান্য ভক্তদের জীবনে আসে চরম দুর্দৈব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের আক্রমণ ঘটে। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কিছুদিন কলিকাতায় রাখা হয়, তারপর নিয়া যাওয়া হয় কাশীপুরের বাগানে।

ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষা ও সান্নিধ্যকে কেন্দ্র করিয়াই এই সময়ে ভক্তমণ্ডলীর পরম প্রস্তুতিটি গড়িয়া উঠিতে থাকে। তরুণ সাধকদল নরেনের নেতৃত্বে ঠাকুরের সেবায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আর গুরুর অধ্যাত্ম শক্তি ধীরে ধীরে তাঁহাদের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। বীজাকারে রামকৃষ্ণমণ্ডলীর সূচনা এইখানে।

যুবক ভক্তেরা পালাক্রমে ঠাকুরের সেবা করেন আর অবসর পাইলেই জপ ধ্যান ও কীর্তনে নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে ঈশ্বর লাভের জন্য একান্ত ব্যাকুল। পরমহংসদেবের অনুমতি নিয়া এ সময়ে পঞ্চবটীতলে প্রায়ই তিনি সাধন করিতেন। বিল্ববৃক্ষতলে রাতের পর রাত ধুনি জ্বালানো থাকিত, আর তিনি উহার সম্মুখে নয়ন নিমীলিত করিয়া থাকিতেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। এ সময়ে ধ্যান করিতে করিতে প্রায়ই দর্শন করিতেন একটা ত্রিকোণাকৃতি জ্যোতি। ঠাকুরকে এই দর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে সংক্ষেপে উত্তর দেন, "ওরে, ওটা ব্রহ্মযোনী।"

এক একদিন নরেনের ধুনির ধারে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অপূর্ব দর্শন সব ঘটিতে থাকে। চিন্ময়লোকের দেবদেবীরা অনেকে সেখানে আবির্ভূত হন। এই সময়কার

সাধনকালে সাধক নবেনেব প্রাণে বিবাজিত ছিল অপূর্ব শান্তি ও স্থৈর্য। শক্তির প্রকাশও মাঝে মাঝে দেখা যাইত।

একদিন কালী তপস্বী (স্বামী অভেদানন্দ) ও তিনি পাশাপাশি বসিয়া ধ্যান কবিতেছেন। হঠাৎ নবেনেব ইচ্ছা হইল, কালীকে তিনি স্পর্শ করিবেন। এ ইচ্ছা কাবে পবিণত কবাব সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল এক চাঞ্চল্যকব কাণ্ড। স্পর্শ করা মাত্রই গুরুভ্রাতাব দেহে বৈদ্যুতিক তেজেব মতো এক শক্তি সঞ্চারিত হইয়া গেল, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া দিব্য চেতনায় তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

সদা সজাগদৃষ্টি শ্রীবামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ নবেন্দ্রনাথকে ডাকাইলেন। তাঁহাকে সতর্ক কবাব জন্য সহাস্যে কহিলেন,—"কি কচ্ছিস্ বে। এ যে দেখছি, না জমতেই খরচ?'

কাশীপুবে ও দক্ষিণেশ্ববেব পঞ্চবটীতে নবেনেব সাধন চলিয়াছে। ধীরে ধীরে তিনি ধ্যানলোকেব গভীব স্তবে ডুবিয়া যাইতেছেন। এক এক দিন বিচিত্র অনুভূতি ও অপ্রাকৃত দর্শনাদিও হইতেছে। ধ্যানাবস্থাব পব একদিন দেখিলেন, তাঁহারই এক অবিকল প্রতিমূর্তি চিন্ময় দেহে সম্মুখে আবির্ভূত। এই অপ্রাকৃত মূর্তি প্রায়ই বহুক্ষণ ধবিয়া তাঁহাব সম্মুখে অবস্থান কবিত। তাঁহারই হাবভাব ও কথাবার্তা অনুকবণ কবিয়া যাইত। শ্রীবামকৃষ্ণ ইহা শুনিলেন। নবেনকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "এতো ধ্যানেব উচ্চাবস্থাব লক্ষণ বে।"

এই সময়ে একদিন নবেনেব মন গৌতম বুদ্ধেব তপস্যাক্ষেত্র, বুদ্ধগয়া দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। স্থিব কবেন, সেখানে গিয়া কয়েকদিন সাধনা করিবেন। গুরুভাই তাবক ও কালীসহ তিনি হঠাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বব ত্যাগ করিলেন, কাহারেও কিছু বলিয়াও গেলেন না। ব্যস্ত হইয়া সকলে ঠাকুবকে এ সংবাদ জানাইলেন। স্মিতহাস্যে তিনি উত্তব দিলেন, "তোবা ভাবিস নি, নবেন কোথাও যাবে না, তাকে এখানে আসতেই হবে।—এদিক ওদিক এখন যাচ্ছে বটে, কিন্তু এখানে যে রস পেয়েছে সে রস ছেড়ে যাবে কোথায়?"

বুদ্ধগয়াব পবিত্র পবিবেশে ধ্যান কবাব সময় নবেন এক দিব্য অনুভূতি লাভ কবেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মন সেখানে টিকে নাই। অল্প কিছুদিন পরেই পবমহংসদেবেব জন্য ব্যাকুল হইয়া নবীন সাধকেরা দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন।

ঠাকুবেব ভক্ত বুড়োগোপাল নানা তীর্থ দর্শন করিয়া কাশীপুরে প্রত্যাবর্তন কবিয়াছেন। তাঁহাব অভিলাষ এই উপলক্ষে সাধুদিগকে ভোজন করান ও কিছু দান করেন। শ্রীবামকৃষ্ণেব কাছে এ ইচ্ছা ব্যক্ত কবিলে বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় আর সাধু খুঁজে খুঁজে বেড়াবি, বল্‌তো? এই সব ছেলেদের খাইয়ে দে। তাতেই তোর কাজ হবে।'

নির্দেশ মতো ব্যবস্থাদি কবা হইল। প্রত্যেক তরুণ ভক্তকে এই উপলক্ষে ঠাকুর নিজ হাতে একটি কবিয়া গৈরিক বস্ত্র, বহির্বাস, মালা ও কমণ্ডলু দান করিলেন। আনুষ্ঠানিক কৃত্যে ঠাকুব সেদিন, দান নাই, কিন্তু এই গৈরিক দানের মধ্য দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে সূচনা কবিলেন তাঁহাব গৈরিকধারী সাধক-বাহিনীর।

সমাধিব গভীরে ডুব দিবাব জন্য নবেন এবার ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। নির্বিকল্প সমাধিব জন্য বাব বার ঠাকুবকে এজন্যে তিনি ধরিয়া বসেন, উত্যক্ত করিতে থাকেন।

পবমহংসদেব একদিন আশ্বাস দিলেন, "ওবে আমি ভাল হযে উঠলে, তুই যা চাইবি তাই দেব।"

নবেন্দ্রনাথ তখন পবম প্রাপ্তিব আগ্রহে অধীব চঞ্চল। অবুঝ বালকেব মতো বলিযা বসেন, "কিন্তু, আপনি যদি আব ভাল না হন, তবে আমাব দশা কি হবে?"

অস্ফুটস্ববে ঠাকুব মন্তব্য কবেন, "শালা বলে কি?"

দেহী বা বিদেহী যে কোনো অবস্থাযই থাকুন, ঠাকুব তাঁহাব আশ্বাসবাণীকে রূপাযিত কবিবেন, এই সহজ প্রত্যয থাকাই তো নবেনেব পক্ষে স্বাভাবিক। নবেনেব কথায ইহাব ব্যতিক্রম দেখা গেল। ঠাকুব বুঝিলেন, শিষ্যেব ব্যগ্রতা সীমা ছাড়াইযা যাইতে বসিযাছে। ধীব প্রশান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "আচ্ছা, ঠিক ক'বে বল দেখি তুই কি চাস্?"

নবেন্দ্রনাথ এবাব সোৎসাহে বলিযা উঠিলেন, "আমাব ইচ্ছা হয, শুকদেবেব মতো একেবাবে পাঁচ ছয দিন সমাধিতে ডুবে থাকি। তাবপব শুধু শবীব বক্ষাব জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবাব সমাধিতে চলে যাই।"

বামকৃষ্ণ এইবাব উত্তেজিত হইযা উঠিযা বসেন। তিবস্কাবেব সুবে নবেনকে বলেন, "ছি। ছি। তুই এত বড আধাব তোর মুখে এই কথা? আমি ভেবেছিলুম, বটগাছেব মতো হবি, তোব ছাযায হাজাব হাজাব লোক আশ্রয পাবে, তা না হযে তুই কিনা নিজেব মুক্তি চাস্। এতো তুচ্ছ কথা, অতি হীন কথা বে। না না অত ছোট নজব কবিস্ নি। আমি বাপু সব ভালবাসি—মাছ খাবো তো ভাজাও খাবো, সিদ্ধও খাবো, ঝোল অম্বলও খাবো। তাঁকে সমাধি অবস্থায নির্গুণভাবে উপলব্ধি কবি, আবাব নানা মূর্তিব ভেতব ঐহিক সম্বন্ধেব বোধেও ভোগ কবি। একঘেযে ভাল লাগে না—তুইও তাই কব। একাধাবে জ্ঞানী আব ভক্ত দুই-ই হ।"

কিন্তু এই তিবস্কাবেব কযেক দিন পবে পুবস্কাবেব ব্যবস্থাও ঠাকুব কবিযাছিলেন। নবেন এক বাত্রিতে কাশীপুবেব নিভৃত কক্ষে বসিযা ধ্যানমগ্ন। সঙ্গে অপব এক বযস্ক ভক্তও সাধন নিবত—ইঁহাকে নবেন গোপালদা বলিযা ডাকেন। নিবিড় ধ্যানে আবিষ্ট নবেন হঠাৎ এক সমযে চিৎকাব কবিযা বলিতে থাকেন, "গোপালদা, ও গোপালদা। আমাব শবীব কোথায় গেল?"

গোপালদা বাব বাব তাঁহাব অঙ্গে কবাঘাত কবিতেছেন, কিন্তু দেহে চেতনাব কোনো লক্ষণই নাই। ক্রমে অন্য গুরুভ্রাতাবাও সেখানে উপস্থিত হইলেন।

এই সংবাদটি শুনাব পব পবমহংসদেবেব সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হইল, "বেশ হযেছে, থাক্ খানিকক্ষণ ঐবকম হযে।. ওবই জন্য যে আমায জ্বালাতন ক'বে তুলেছিল।"

গভীব বাত্রে বাহ্যজ্ঞান ফিবিযা আসে, নবেন ধীবপদে ঠাকুবেব শয্যাপাশে গিযা উপস্থিত হন। ঠাকুব বলেন, "কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিযে দিলেন। চাবি কিন্তু আমাব হাতে বইল। এখন তোকে কাজ কবতে হবে—যখন আমাব এই কাজ শেষ হযে যাবে তখন আবাব চাবি খুলবো।"

নবেন নির্নিমেষে দিব্যলোকেব এই ঐন্দ্রজালিকেব দিকে চাহিযা বহিলেন। তাবপব অসীম শ্রদ্ধায শক্তিধব গুরুব চবণে নিবেদন কবিলেন তাঁহাব প্রণতি, চিবতবে কবিলেন আত্মসমর্পণ।

উত্তরকালে বিবেকানন্দ বলিযাছিলেন, "সেদিন দেহাদিব বুদ্ধি একেবাবে তিবোহিত

হয়েছিল। প্রায় লয় হয়ে গিয়েছিলুম আর কি। একটু 'অহং' ছিল, তাই সেই সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরূপ সমাধিকালেই 'আমি' আর ব্রহ্মের ভেদ চলে যায় —সব এক হয়ে যায়। যেন মহাসমুদ্রে জল, জল ছাড়া আর কিছুই নেই। ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়।"

সমাধি হইতে ব্যুত্থানের পর সেদিন নরেনের মনে হইয়াছিল—যেন মস্তক ব্যতীত তাঁহার দেহের আর সমস্ত কিছুরই অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

তারপরই অর্ধবাহ্য অবস্থা আসার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বে উপবিষ্ট গোপালদাকে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিয়াছিলেন।

আর একদিনের কথা। গিরিশ ঘোষের সহিত নরেন এক বৃক্ষতলে ধ্যানে বসিয়াছেন। মশার দংশনে গিরিশচন্দ্র তো অতিষ্ঠ। খানিক বাদেই তিনি আসন ত্যাগ করিলেন। ততক্ষণ নরেন্দ্রনাথ ধ্যানের গভীরে ডুবিয়া গিয়াছেন। শরীরে এত মশা বসিয়াছে যে মনে হয়, দেহখানি কালো কম্বলে আবৃত। গিরিশ উচ্চ স্বরে নরেনকে ডাকিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহার দেহে চেতনার কোনোই লক্ষণ নাই। অবশেষে আসন ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া ফেলা হইল। দেখা গেল, দেহ একেবারে বাহ্যজ্ঞানহীন —মৃতবৎ কঠিন। বহুক্ষণ পরে সেদিন নরেনের জ্ঞান সঞ্চার হয়।

সাধন ভজন ও ধ্যানের মধ্য দিয়া নরেন গুরুকৃপার বহুতর নিদর্শন পাইতেছেন। দিব্য আনন্দে হইতেছেন ভরপুর। এই সঙ্গে মনে তাঁহার জাগিতেছে প্রবল আশঙ্কা। পরম কারুণিক শ্রীরামকৃষ্ণ যে আর বেশীদিন এই নরদেহে থাকিবেন না, এই দুশ্চিন্তা এবার তাঁহাকে পাইয়া বসে।

একদিন মনে এক দৃঢ় সংকল্প করিলেন। কালরোগের কবল হইতে শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্ধার করিতে পারে এমন এক ঐশী শক্তির আবাহন তিনি করিতে চান। সেদিন সন্ধ্যার পর হইতে সমস্ত রাত্রি তিনি উন্মাদের মতো 'রাম' নাম উচ্চারণ করিতে থাকেন। বাগানের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তখন তিরোহিত প্রায়।

উন্মত্ত অধীর নরেনের 'রাম রাম' শব্দ ক্রমশ উচ্চতর হইতেছে। গভীর রাতে ঠাকুরের কানে পশিল এই নামের ধ্বনি। তাঁহার আদেশে অর্ধবাহ্য অবস্থায় নরেনকে ধরিয়া আনা হইল। স্নেহমধুর কণ্ঠে পরমহংসদেব কহিলেন, "ওরে, কেন তুই এসব ক'রে এত কষ্ট পাচ্ছিস? তোর মতো এমন উন্মত্ত যে আমি বারো বছর ছিলাম। এক রাত্তিরে তুই আর কতটা করবি, বাপু?"

ঠাকুরের দিব্য সান্নিধ্য ও প্রশান্ত মুখচ্ছবি নরেনের হৃদয়ে সান্ত্বনার স্নেহ প্রলেপ বুলাইয়া দেয়, তিনি শান্ত হন।

দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব হইতে প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিতেন। গুরু-শিষ্যের এই মিলন ছিল বড় রহস্যময়। অপর ভক্তেরা তখন ঠাকুরের নির্দেশে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেন, আর সন্ধ্যার কক্ষে ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথ দুই তিন ঘণ্টা কাল নিমজ্জিত থাকিতেন অধ্যাত্ম-চেতনার গভীরে।

শেষের দিনটি আসন্ন। ঠাকুর সেদিন নরেনকে আহ্বান করিয়া কাছে বসাইয়াছেন। নিষ্পলক দৃষ্টিটি নরেনের দিকে স্থির নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেনের সত্তার গভীরে তখন চলিয়াছে অভিনব স্পন্দন।

উপলব্ধি করিতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর হইতে তড়িৎ কম্পনের মতো একটা সূক্ষ্ম তেজরশ্মি তাহার দেহের ভিতরে সঞ্চালিত হইতেছে।

নরেন ক্রমে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়েন। চৈতন্য লাভের পর তিনি দেখেন, নীরবে উপবিষ্ট ঠাকুরের চোখে অশ্রুধারা।

"একি রহস্য, কিছুই যে আমি বুঝতে পারছিনে।" প্রশ্ন করেন নরেন্দ্রনাথ।

ঠাকুর ধীর কণ্ঠে কহেন, "ওরে, আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে তারপর ফিরে যাবি।"

নরেনের দুই চোখও অশ্রু ছলছল হইয়া উঠিয়াছে। জীবনপ্রভুর দিকে তাকাইয়া অসহায় বালকের মতো তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের নরলীলা সংবরণের দুইদিন পূর্বেকার কথা। ঠাকুর সেদিন ব্যগ্রভাবে নরেনকে নিজের কক্ষে আহ্বান করিলেন। কহিলেন, "দ্যাখ্‌ নরেন, তোর হাতে আমি এদের সবাইকে দিয়ে যাচ্ছি। তুই সবার চাইতে বুদ্ধিমান, শক্তিধর। এদের ভালবাসা দিয়ে বেঁধে রাখবি। যাতে এরা ঘরে ফিরে না গিয়ে সাধন-ভজন নিয়ে পড়ে থাকে, তার ব্যবস্থা কিন্তু তোকেই কত্তে হবে।"

নরেন্দ্রনাথ নত মস্তকে স্তব্ধ হইয়া ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছেন। বুঝিলেন, ঠাকুরের দেহত্যাগের দিনটি প্রায় সমাগত। যে ঐশ কর্মের আভাস ঠাকুর মাঝে মাঝে তাঁহাকে দিতেন, আজ কি তাহাই করিলেন স্পষ্টতর ? অনেক কিছুর দায়িত্বভার কি তাঁহাকে দিয়া গেলেন ? নরেনের মনে পড়ে, কিছুদিন আগের কথা। ঠাকুরের সামনে বসিয়া ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার নরেনের প্রশংসা করিতেছিলেন। ইহার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ সোৎসাহে বলিয়া উঠেন, "ওগো, কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় এসেছিলেন—সেই রকম নরেনের জন্যই তো সব গো। ওর জন্যই তো এবার আমার আসা।"

ঠাকুর শুইয়া আছেন। দর্শনার্থী ও ভক্তেরা মাঝে মাঝে তাঁহার কক্ষে আসা-যাওয়া করিতেছে। হঠাৎ ঠাকুরের কি খেয়াল হইল, এক টুকরা কাগজ চাহিয়া নিয়া ধীরে ধীরে লিখিলেন—"নরেন লোকশিক্ষা দিবে।"

আধ্যাত্মিক মণ্ডলীর নায়করূপে প্রিয়তম শিষ্যকে তিনি নির্বাচন করিয়া রাখিয়া গেলেন, ভক্তদের মধ্যে এ তথ্যটিই কি তিনি সেদিন জানাইয়া দিলেন ? কিন্তু নরেনের অন্তরের সম্মতি ইহাতে মিলিতেছে কই ? তিনি বলিয়া উঠেন, আমি কিন্তু ওসব পারবো না।"

দৃঢ়কণ্ঠে রামকৃষ্ণের আদেশ উচ্চারিত হইল, "তোকে কত্তেই হবে, তোর ঘাড করবে।"

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট। ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের দিন। ভক্তদল চরম মুহূর্তটির কথা চিন্তা করিয়া মুহ্যমান। এই সংকটে নরেন বিষাদখিন্ন হৃদয়ে চুপচাপ বসিয়া আছেন। হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎঝলকের মতো খেলিয়া গেল একটা বড় প্রশ্ন। ঠাকুর তাঁহার ভগবৎসত্তা সম্বন্ধে নানা ধরনের ইঙ্গিত এযাবৎ জানাইয়াছেন। কিন্তু নরলীলা অবসানের পূর্ব মুহূর্তে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপটি কি স্পষ্টরূপে জানাইয়া যাইবেন না ? এই ভক্তদল যাঁহার সহিত নিবিড় যোগসূত্রে আবদ্ধ, শেষের দিনে সেই

দেবমানবেব পবিচষ তাঁহাবই শ্রীমুখে ধ্বনিত হইযা উঠুক, ইহাই নবেনেব অন্তবেব আকুল প্রার্থনা।

সর্বজ্ঞ সদ্‌গুবু সমস্তই বুঝিযাছেন। বোগযন্ত্রণা বিস্মৃত হইযা তিনি নবেনেব দিকে মুখ ফিবাইলেন। অনুচ্চ, তীক্ষ্ম কণ্ঠে কহিলেন, "ওবে এখনও তোব জ্ঞান হলো না? সত্যি সত্যি বলছি, যে বাম যে কৃষ্ণ, সে ই ইদানীং এ শবীবে বামকৃষ্ণ— তবে তোব বেদান্তেব দিক দিযে নয।"

নবেন তো বিস্মযে একেবাবে হতবাক্‌। ভাবাবেগে তাঁহাব নযন দুটি অশ্রুসজল হইযা আসিল।

ঠাকুব বামকৃষ্ণেব মুখোচ্চাবিত এই কথা কযটি উত্তবকালেব মহান্‌ আচার্য, স্বামী বিবেকানন্দকে যোগায দিব্য প্রেবণা, উদ্বুদ্ধ কবে তাঁহাকে বিশ্বব্যাপী ধর্মসাধনায।

ঠাকুব চলিযা গিযাছেন। শিষ্যদেব তাপিত হৃদয তখন শুধু মরু প্রান্তবেব মতো খাঁ খাঁ কবিতেছে। জীবনেব পবমাশ্রয দূবে সবিযা গিযাছে। আশা আনন্দ ও উৎসাহেব লেশমাত্র কাহাবো জীবনে অবশিষ্ট নাই।

নবেন ও তাঁহাব এক গুবুভাই সেদিন শোকাকুল হৃদযে কাশীপুবেব বাগানে ঘুবিযা বেড়াইতেছেন। হৃদযে তাঁহাদেব প্রচন্ড শূন্যতা। ভাবিতেছেন, ঠাকুব কেন দেহ ত্যাগ কবিযা তাঁহাদেব এ কোন নিবালম্ব অবস্থায বাখিযা গেলেন? এমন সময অদূবে ভাসিযা উঠে এক অভাবনীয দৃশ্য? নবেন দেখেন, গুবুদেবেব দিব্যদেহ অদূবে দন্ডাবমান। সর্বশবীব তাঁহাব অব্যক্ত আনন্দে শিহবিযা উঠে। তবে কি মহাপ্রযাণেব পবেও ঠাকুব তাঁহাব ভক্তদেব উপব পূর্ববৎ কৃপাদৃষ্টি বাখিতেছেন। চিন্ময দেহে আবির্ভূত হইযা দিতেছেন পবম আশ্বাস।

হৃদযেব চাঞ্চল্য দমন কবিযা নবেন মৌন হইযা আছেন। মনে আশংকাও কম নাই। ওই অলৌকিক দর্শন তাঁহাব নিজেব দুর্বল মনেব ভ্রান্তি নয তো?

সর্ব সন্দেহেব নিবসন কবিযা সঙ্গীয গুবুভাই এবাব চিৎকাব কবিযা উঠেন, "নবেন, ঐ দ্যাখো, ঐ দ্যাখো!"

জ্যোতির্ময দেহে ঠাকুবেব এই আবির্ভাব! অধ্যাত্ম-সন্তানদেব এ আবির্ভাবেব মধ্য দিযা বুঝাইযা দিলেন—শিষ্যেবা যেমন আছেন, তেমনি আছেন তাঁহাদেব সদ্‌গুবু। আনন্দে অধীব হইযা উচ্চকণ্ঠে তাঁহাবা অপব গুবুভাইদেব ডাকিতে লাগিলেন। ঠাকুবেব অলৌকিক মূর্তি ততক্ষণে অন্তর্হিত হইযা গিযাছে!

শ্রীবামকৃষ্ণেব তিবোধানেব পব কাশীপুবেব বাগান ছাড়িযা দেওযা হইযাছে। কিন্তু এবাব তবুণ সন্ন্যাসীদেব মাথা গুঁজিবাব ঠাঁই হইবে কোথায?

ঠাকুবেব পবমভক্ত সুবেন মিত্র এ সংকটে আগাইযা আসেন। কহেন, "একটা বাড়ি ভাড়া ক'বে একত্রে থাকো, ঠাকুবেব স্মৃতি বুকে নিযে সাধনভজন কবো। এ বাড়ির ভাড়া আমি চালিযে যাবো।' নবেন প্রভৃতি যুবক-ভক্তেবা হাঁফ ছাড়িযা বাঁচেন।

ববাহনগবে গঙ্গাব ধাবে যৎসামান্য ভাড়ায একটি বাড়ি নেওযা হয। জবাজীর্ণ বাড়িটি পুবাতন এবং দীর্ঘদিন মনুষ্য পবিত্যক্ত। ইহাই ববাহনগব মঠ।

এইবার নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের পালা। ভক্তদের কেহ কেহ তখন পরীক্ষার পড়া তৈরীর জন্য স্বগৃহে বাস করিতেছিলেন। নরেন এক একদিন ঝড়ের মতো তাঁহাদের উপর নিপতিত হন, তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, "তোরা এই অমূল্য জীবনটা কি একজামিন দিয়েই কাটাবি, ঠিক করেছিস? এই কি ঠাকুরের উপদেশ পালন করা? এ জন্যই তিনি জগতে এসে এত কষ্ট ক'রে গেলেন? তোরা সন্ন্যাসী, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত—তবু একজামিন পাস ক'রে সংসারের উন্নতি কামনা করিস? ত্যাগ আর ভোগ-বাসনা কি এক সঙ্গে থাকতে পারে? ধিক্ ধিক্ তোদের! শিগ্গীর ও সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে মঠে চল্।"

নরেনের সাহস, প্রেরণা ও বৈরাগ্যের আহ্বান তরুণদলকে প্রভাবিত করে। একে একে তাঁহারা মঠে যোগ দিতে থাকেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই ভক্তদল নিয়া যে নবগঠিত সঙ্ঘ আত্মপ্রকাশ করে, নরেন হন তাহার অধিনায়ক।

এই গুরুভ্রাতাগণ অতি সহজেই নরেনের হাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছিল। কারণ, তাঁহারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিত—নরেন ঠাকুরেরই প্রতিনিধি, তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া চলা, তাঁহাকে আনুগত্য দেওয়া মানেই ঠাকুরের সন্তুষ্টি বিধান করা।

ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল ভক্তদল এবার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছেন। একান্ত নিষ্ঠায়, দুশ্চর সাধন-পথ অতিক্রম করিতে তাঁহারা কৃতসংকল্প। এই পথের কোনো বাধা কোনো দুঃখদহনই তাঁহারা আমল দিতে চায় না।

বিবেকানন্দ উত্তরকালে বলিতেন, "বরাহনগরে এমন কত দিন গিয়েছে যে খাবার কিছুই নেই, ভাত জোটে তো নুন জোটে না। দিন কয়েক হয়তো নুন-ভাত চললো, কিন্তু কারুরই গ্রাহ্য নাই। জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখন কখন শুধু তেলাকুচো পাতাসিদ্ধ ও নুন-ভাত—এই মাসাবধি চলছে। আহা, সেসব কি দিনই গেছে! সেদিনের কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত।"

কৌপীন-সম্বল এই ভক্তদের একযোগে ঘরের বাহিরে যাইবারও উপায় ছিল না। দেওয়ালে একখানা মাত্র কাপড় টাঙানো থাকিত, যে যখন মঠবাড়ির বাহিরে যাইত, এই কাপড়খানিই থাকিত তাহার কোমরে জড়ানো।

এই চরম দুরবস্থার মধ্যেই কিন্তু তাঁহাদের ধর্মালোচনার বা দর্শনের কূটতর্কের বিরাম ছিল না। কঠোর সাধনায় রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত। তপস্যার অগ্নিতে প্রদীপ্ত এক এক জনের চক্ষু হইতে যেন অগ্নি বর্ষিত হইত। মঠে দেখা করিতে গিয়া ঈশ্বরোন্মাদ এই তরুণদল ও তাঁহাদের দলপতিকে দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না।

এই সময়ে এক একদিন রামকৃষ্ণের স্মৃতিতে উদ্দীপিত হইয়া নরেন কহিতেন, "সত্যের প্রচারকার্যে অনেকেই ব্যস্ত হয় কিন্তু তারা না জেনেই তা করে। আমি সেটা জেনে—তারপর করবো।"

ইহার অব্যবহিত পরেই নরেনের জীবনে দেখা যায় এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত। সারা ভারত পর্যটন ও তীর্থ পরিক্রমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পাইয়া বসে। পরিধানে গৈরিকবাস, হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু, দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী সেদিন মঠের বাহির হইয়া পড়েন। কখনো 'নারায়ণ হরি' বলিয়া গৃহস্থদের দ্বারে ভিক্ষার জন্য দাঁড়ান,

কখনো বা কবেন আকাশবৃত্তি। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বৈচিত্র্যে এই পরিব্রাজন ভবপুব হইযা উঠে।

সে-বাব নবেন্দ্রনাথ বৃন্দাবনেব পথে চলিযাছেন। ক্ষুৎপিপাসা ও পরিশ্রমে দেহ অবসন্ন। পথপার্শ্বে বসিযা এক দবিদ্র, নীচ জাতীয ব্যক্তি ধূমপান করিতেছে। নবেন তাহাব নিকট কলিকাটি চাহিলে সে ব্যস্তসমস্ত হইযা বলিল, "মহারাজ, ম্যায় ভাঙ্গী হুঁ।"

উত্তব শুনিযা সন্ন্যাসীবব নিবস্ত হন কিন্তু কিছুদূবে গিযাই ভাবিতে থাকেন, 'নাঃ এতো ঠিক নয। ঠাকুবেব এত আশীর্বাদ, অদ্বৈতবাদের এত বিচাব-বিশ্লেষণ - তাব পবও দেখছি আমাব ভেদজ্ঞান তিবোহিত হয নি। জাতিভেদের সংস্কাব যে মনের অন্তস্তলে আজও তেমনি উদগ্র হযে আছে।' তৎক্ষণাৎ তিনি ফিরিযা আসেন। সেই মেথবেব হাত হইতে কলিকাটি টানিযা নিযা ধূমপান কবেন। তাবপব তাঁহাব হৃদয শান্ত হয।

স্বামীজী বৃন্দাবনে আসিযাছেন। বাধাকুণ্ডেব তীবে কৌপীনটি বাখিযা উলঙ্গ হইযা তিনি স্নানে নামিলেন। জল হইতে উঠিযা দেখেন, একটি বানর এটি টানিযা নিযা দূবে পলাইযা গেল। বহু চেষ্টাব পব ইহা পুনবুদ্ধাব কবা গেল বটে, কিন্তু তখন কৌপীনটি একেবাবে ছিন্নভিন্ন। লজ্জা নিবাবণেব কোনোই উপায নাই। বড অভিমান জাগে এবাব স্বামীজীব মনে। মনে কুঞ্জেশ্বরী বাধা-বাণীব নিকট সংকল্প জানান, লোকালযে আব না আসিযা বনাঞ্চলেই তিনি বাস কবিবেন। দেখা যাক্ তাঁহাব জন্য কোনো সুব্যবস্থা হয কিনা।

অবণ্যে প্রবেশ কবামাত্র ঘটে এক অদ্ভুত কাণ্ড। স্বামীজী দেখেন—এক ব্যক্তি তাঁহাকে পিছন দিক হইতে ডাকিতেছে, ছুটিযা আসিতেছে দ্রুতবেগে। উলঙ্গ স্বামীজী ধাবিত হইযাছেন সম্মুখেব দিকে। কিছুক্ষণ পবে লোকটি নিকটে হইযা হাঁপাইতে হাঁপাইতে লোকটি নিবেদন কবিল, "মহাবাজ, এই জঙ্গল পাবেই আমাব ঘব। কৃপা কবে আপনি সেখানে পদার্পণ করুন, আপনাকে নববস্ত্র ও ভোজ্য নিবেদন কবে আমবা কৃতার্থ হই।'

বলা বাহুল্য স্বামীজী সানন্দে স্বীকৃত হইলেন, ভোজন ও নববস্ত্র পরিধানের পব বাহিব হইলেন লোকালযে।

আব একবাব গাজীপুবেব অপব পাবে তিনি এক স্টেশনে বসিযা আছেন। পথশ্রমে ও ক্ষুধাতৃষ্ণায বড কাতব, দেহভাব আব যেন বহিতে পারিতেছেন না। নিকটস্থ বৃক্ষচ্ছাযায বসিযা এক শেঠজী সোৎসাহে প্রচুর পুরী-কচুরী-হালুযা উদরস্থ কবিতেছে। ভোজন শেষে লোকটি বিদ্রূপ শুরু করে, সংসাব-ত্যাগী মহারাজ অর্থ-হীন, আব তাহাব মতো সংসারীবা খাইযা-পরিযা কেমন আবামে সুখে দিনযাপন কবিতেছে।

হঠাৎ কিন্তু এক বিস্মযকব কাণ্ড ঘটিল। এক ব্যক্তি হন্তদন্ত হইযা ছুটিযা কিছু মিষ্টদ্রব্য ও এক বদনা জল নিযা স্বামীজীর সম্মুখে উপস্থিত। সযত্নে খাদ্যাদি নিবেদন কবিযা সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবে। স্বামীজীর প্রশ্নেব উত্তবে জানায, নিকটেই তাহার একটি খাবারের দোকান আছে—হালুইকর। আজই প্রত্যুষে সে দেখে এক বিচিত্র স্বপ্ন। এক সন্ন্যাসী তাহাকে

কহিতেছেন – স্টেশনের একপ্রান্তে এক সাধু অনাহারে রহিয়াছেন অবিলম্বে সে যেন তাঁহার সেবা নির্বাহ করে। প্রথমবারের স্বপ্ন-দর্শনকে হালুইকর তেমন গুরুত্ব দেয় নাই। তারপর শয্যায় শুইয়া আরও দুইবার সে একই রকমের স্বপ্নাদেশ পায়। তাই এমন ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

স্বামীজীর দুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠে। পরমাশ্রয়দাতা ঠাকুরের কৃপার ধারা মরজগতের পরপার হইতেও তাঁহার জন্য এমনিভাবে বহিয়া আসিতেছে!

গাজীপুরে উপনীত হইয়া স্বামীজী পওহারীবাবার সান্নিধ্যে আসেন। সিদ্ধপুরুষ বলিয়া এ অঞ্চলে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি। তা ছাড়া পওহারীবাবার গুহায় শ্রীরামকৃষ্ণের একখানা ছবি টাঙানো রহিয়াছে দেখিয়া তিনি এই সাধুর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

স্বামীজী এই সময়ে অজীর্ণ ও কোমরের বাতরোগে ভুগিতেছিলেন। ভাবিলেন, পওহারীবাবার নিকট হঠযোগ ও রাজযোগের শিক্ষা কিছুটা গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি?

তাছাড়া এই মহাত্মার কাছে দীক্ষা নিবেন বলিয়াও তিনি স্থির করিলেন। পওহারীবাবা সানন্দে তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং অনুষ্ঠানের দিনক্ষণও স্থির হইয়া গেল।

দীক্ষার পূর্বদিন রাত্রে এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দের আত্মজীবনে এ ঘটনাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

স্বামীজী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। অকস্মাৎ লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার কক্ষটি দিব্যালোকের শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, আর উহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি। ঠাকুরের করুণাভরা নয়ন দুইটি স্বামীজীর দিকে নিবদ্ধ, অপরিমেয় স্নেহ মমতা উহা হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।

গুরুদেবের এই অলৌকিক আবির্ভাব সেদিন তাঁহার সমগ্র সত্তায় জাগাইয়া তোলে প্রচণ্ড আলোড়ন। তাছাড়া আত্মগ্লানির আগুনেও হৃদয় জ্বলিতে থাকে। এ তিনি কি করিতে যাইতেছেন? ঠাকুরের প্রতি যে অনন্যা ভক্তি, যে আত্মসমর্পণ এতকাল ছিল তাহা কি লোপ পাইয়াছে? তিনি কি গুরুদেবের অবিশ্বাসী শিষ্য? উত্তেজনায় তাঁহার শরীর কম্পিত ও ঘর্মাক্ত হইয়া উঠে। তারপর স্বামীজী উচ্চস্বরে স্বগতোক্তি করিয়া উঠেন, "না, না, কখনোই তা হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউ এ হৃদয়ে ঠাঁই পাবে না। প্রভু, এ দাস যে চিরদিন তোমারই চরণে বিক্রীত। জয় রামকৃষ্ণ।"

ইহার পরেও কয়েকদিন ধরিয়া ঠাকুরের দর্শন তিনি প্রাপ্ত হন। সবিস্ময়ে ভাবিতে থাকেন, সত্যিই তো, বিদেহী রামকৃষ্ণের সদাজাগ্রত চক্ষু দুইটি আজিও তাঁহার প্রিয় শিষ্যের সতর্ক প্রহরায় নিরত। স্বামীজী শিহরিয়া উঠেন, ঠাকুরের করুণার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া দুই নয়নে ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রু।

ইহার পর নৈনিতালের নিকটে, হিমালয় ক্রোড়ে স্বামীজীর এক দুর্লভ অধ্যাত্ম-অনুভূতি লাভ হয়। সঙ্গী গঙ্গাধর মহারাজকে ডাকিয়া সেদিন তিনি আবেগোচ্ছল হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, "গঙ্গাধর, আজ এই অশ্বত্থবৃক্ষের তলে আমার জীবনের এক অমূল্যক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল। এর ফলে আমার জীবনের একটা প্রধান সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে।"

তখনকার দিনলিপিতে স্বামীজী তাঁহার নিগূঢ় সাধন-অনুভূতির কথা লিখিয়া- ছিলেন—"আমি আজ ক্ষুদ্র দেহপিণ্ড আর বিরাট মহাসৃষ্টির একাত্মতা অনুভব করেছি। বিশ্বের যা কিছু সব এই ক্ষুদ্র দেহমধ্যেই রয়েছে। উপলব্ধি করলাম, প্রতি পরমাণুর মধ্যেই বিশ্বসংসার রয়েছে বিরাজমান।"

হৃষীকেশের বিখ্যাত বেদান্তী সাধু ধনরাজগিরির আশ্রমে স্বামীজী কিছুদিন ছিলেন। কয়েকজন গুরুভ্রাতাও এই সময় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। হিমালয়ে বসিয়া কঠোর তপস্যায় কিছুদিন কাটাইবেন বলিয়া স্বামীজী মনে মনে স্থির করিয়াছেন। কিন্তু কোথা হইতে এক আকস্মিক দুর্দৈব আসিয়া উপস্থিত হয়, তিনি এক দুশ্চিকিৎস্য ধরনের জ্বরে আক্রান্ত হন। একদিন অবস্থা নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। দেখা যায়, সর্বশরীর হিম হইয়াছে, নাড়ীর গতি স্তব্ধপ্রায়। অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া গুরুভ্রাতারা শোকে মুহ্যমান, কেহ কেহ ইষ্টনামও স্মরণ করিতেছেন।

হঠাৎ তাঁহার কুঠিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়ান জটাজুটমণ্ডিত এক বৃদ্ধ সাধু। তরুণ সন্ন্যাসীদের এই সঙ্কটের কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়। গুহুরো চাকি। মৃতকল্প স্বামীজীকে তিনি কিছুটা মধু ও পিপুল চূর্ণ খাওয়াইয়া দিলেন। অতি সাধারণ একটি ওষুধ কিন্তু তাহার ক্রিয়া যেন অমোঘ মন্ত্রৌষধির মতো। রোগী ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ সাধুটি পাহাড়িয়া পথে নামিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। সুস্থ হইয়া উঠিয়া স্বামীজী গুরুভাইদের কাছে ডাকিলেন, কহিলেন, "বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে থাকবার সময় কি দেখেছিলাম জানিস? দেখলাম, আমি যেন জগতে বিধাতার এক বৃহৎ কাজের ভার নিয়েই এসেছি। সে ঐশ কাজ যতদিন শেষ না হবে, আমার যেন বিশ্রাম নেই—শান্তি নাই।'

এখন হইতে গুরুভাইরা স্বামীজীর জীবনে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। তাঁহার কর্মজীবনে আসে নূতনতর উৎসাহ, প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা, আর অধ্যাত্মজীবন হইয়া উঠে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইরা স্পষ্টতই বুঝিতে পারিলেন মৃত্যুর দ্বারে গিয়াও নরেন এক অদৃশ্য কল্যাণময় শক্তির ইঙ্গিতে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন সেই অদৃশ্য নিয়ন্তাশক্তিরই দূত। স্বামীজীর জীবনে ঐ ঘটনাটির মধ্যে দিয়া এক নূতন পরিবর্তন ঘটিয়া গেল।

ইহার পর হইতে স্বামীজী একাকী সমগ্র ভারত পরিব্রাজন করিতে থাকেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শুরু করিয়া কয়েক বৎসর তিনি গুরুভ্রাতাদের হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নেন, নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে থাকেন। এই সময় তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত, "গুরুভাইদের মায়াও মায়া বরং তা আরও প্রবল। এ মায়ার পাকে পড়লে সাধনার পথে বিঘ্ন ঘটে। আমি আর কোন মায়ার বেড়া-ই রাখতে চাইনে।"

ত্যাগী দণ্ডী সন্ন্যাসীর বেশে স্বামীজী ভারতবর্ষের দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়ান। এ দেশের অগণিত পল্লী ও জনপদে ভাস্ট, দোকান ও নিরন্নদের পর্ণ কুটীর নৃপতির রাজপ্রাসাদে, ভারত-আত্মার সন্ধানে তাঁহার এই অভিযান। ভারতের মাটির বুকে কান পাতিয়া শুনিলেন তাঁর হৃদস্পন্দন, ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে রূপায়িত দেখিলেন পরমাত্মার ছায়া। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর জীবন সংগীতে আসিল নূতন স্পন্দন, নূতন গতিবেগ।

এই ভাবত পবিক্রমা স্বামীজীব অধ্যাত্মজীবনেব এক বড প্রস্তুতি। বেদান্তবাদেব নব প্রচাবক, সন্ন্যাসী-সৈনিক বিবেকানন্দেব যোদ্ধ্ব-জীবনেব পাথেয এই সমযেই সঞ্চিত হইযা উঠে।

আলোযাব খেতডি, পোববন্দব, বামনাদ প্রভৃতি বাজাদেব শ্রদ্ধা ও আন্বগত্য তিনি এই সমযে প্রাপ্ত হন। এই নিস্প্ৃহ, তেজস্বী সন্ন্যাসীব পদপ্রান্তে এই বাজন্যদেব শিব সেদিন ল্বটাইযা পডে।

স্বামীজী সে সমযে খেতডিব মহাবাজেব সম্মানীয অতিথি। একদিন মহাবাজাব জবপব্বিস্থিত রাজ-উদ্যানে বসিযা নানা ধর্মকথা হইতেছে। এমন সময এক স্বকণ্ঠী বাঈজীকে আহ্বান কবিযা আনা হইল, বাজ-অতিথিব সম্ম্বখে সে ভজন সংগীত গাহিবে।

স্বামীজী কিন্ত্ন এই বমণীকে দেখিযাই স্থান ত্যাগেব জন্য উঠিযা দাঁডান। তব্বণী সংগীত-ব্যবসাযিনীব সম্ম্বখে বসিযা গান শ্বনিতে তাঁহাব সংস্কাবে বাধিল। খেতডিব ন্পতি সান্বনযে বলেন, "স্বামীজী, এ কিন্ত্ন চমৎকাব ভজন গায, এব গান শ্বনে অনেকেই ম্বগ্ধ হযেছেন। আপনি দযা ক'বে একট্ন শ্বন্বন।"

এ নাবীব কণ্ঠে বৈষ্ণব-সাধক স্ববদাসেব প্রার্থনা ঝংকৃত হইযা উঠে—

প্রভু মেবা অওগ্বণ চিত না ধবো,
সমদবশী হ্যায নাম তুমহাবো।
এক লোহা প্বজামে বহত হ্যায।
এক বহে ব্যাধ ঘব পব
পবশকে মন দ্বিধা নাহি হোয
দ্বহ্ব এক কাঞ্চন কবো।

স্বব-ম্বর্ছনা বাব বাব ঘ্ববিযা ফিবিযা একই তত্ত্বকে উদ্ঘাটিত কবিতে চাহিতেছে আব বলিতেছে "অজ্ঞানোসে ভেদ হ্যায, জ্ঞানী কাহে ভেদ কবো।"

স্বামীজী উচ্চকিত হইযা উঠেন। ম্বহ্বর্তে চক্ষ্বব সম্ম্বখ হইতে একটি পর্দা সবিযা যায। সংস্কাব হয বিদ্ববিত। সত্যিই তো। সমদর্শী তিনি কাযমনোবাক্যে হইতে পাবেন নাই। ভেদব্বদ্ধি ও সংস্কাবেব ম্বল অন্তস্তল হইতে উৎপাটিত আজিও হয নাই। সর্বভূতে ব্রহ্মান্বভূতিব জন্য, পবম উপলব্ধিব জন্য, তপস্যা শ্বব্ব কবিযাছেন। কিন্তু সে তপস্যাব ম্বলেই যে আপন ভেদব্বদ্ধি দিযা কুঠাবাঘাত হানিযা বসিযাছেন। এই বাঈজীব ভজন গানেব মধ্য দিযা তাই ঠাকুব তাঁহাব জীবনে অভেদজ্ঞানেব সাডা ন্বতন কবিযা আজ জাগাইযা তুলিলেন।

তখনি গাযিকা নাবীব কাছে অগ্রসব হইযা কহিলেন, "মা, আমি তোমাব নিকট ঘোব অপবাধ কবেছি। তোমাকে ঘ্বণা ক'বে আমি এস্থান ত্যাগ কবতে চেযেছিলাম। কিন্ত্ন তোমাব এই গানেব মধ্য দিযে তুমি আমাব চৈতন্য জাগ্রত কবেছো।"

দেশীয বাজবাজড়া ও অমাত্য যখনই যিনি স্বামীজীব দর্শনে আসিতেন, তিনি তাঁহাব সম্ম্বখে নিজেব নবাবিষ্কৃত ভাবতকেই তুলিযা ধবিতেন। স্বদেশেব পবিচয তাঁহাব নিকট এইব্বপে পবিস্ফুট হয। একটি তাহাব শাশ্বতব্বপ—প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক সম্পদেব গবিমায ভাস্বব। আব একটি তাহাব বর্তমানেব ব্বপ—যাহা

ভারতের আত্মিক পরিচয়ের মধ্য দিয়াই দেশাত্মবোধ ও আত্মমর্যাদাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, ঋষিদের শিক্ষাদীক্ষার পুনঃপ্রবর্তন করিতে হইবে, দেশীয় রাজসভাগুলির নিকট ইহাই ছিল তাঁহার বক্তব্যের নির্যাস। আরো কহিতেন, "ধর্ম ভারতের বর্তমান দুর্দশার কারণ নয়, ধর্মের অভাবই দায়ী এই দুর্দশার জন্য। ধর্মের শক্তি তখনই বাড়ে যখন তা মানুষের কর্মজীবনে হয় রূপায়িত।"

দেশীয় রাজাদের অনেকে তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইয়াছেন, কেহ কেহ গুরুজ্ঞানে পদসেবাও করিয়াছেন। কিন্তু কখনো এই রাজসেবার আকর্ষণ বা মোহে তিনি পড়েন নাই। এই তেজস্বী অপ্রতিগ্রাহী রাজ-সন্ন্যাসীর পদে রাজাদের শির বার বার লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার অকুতোভয়তা ও বৈরাগ্য দর্শনে তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছেন।

একবার মহীশূররাজ স্বামীজীকে একটি উপহার গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। সন্ন্যাসীকে মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করিতে নাই বলিয়া স্বামীজী এড়াইতে চান, কিন্তু মহারাজও ছাড়িবেন না। অগত্যা স্বামীজী সকলকে বিস্মিত করিয়া সামান্য একটি হুঁকা চাহিয়া বসিলেন। শর্ত থাকিল—উহাতে কোনো ধাতুর সংস্রব থাকিবে না। মহারাজ অবিলম্বে দেশীয় শিল্পীদের কারুকার্যে খচিত একটি সুদৃশ্য হুঁকা তাঁহাকে উপহার দিলেন। মাদ্রাজে পৌঁছিবার পরই কিন্তু এই হুঁকার সদ্গতি হইয়া গেল। এক ভদ্রলোকের বাড়িতে স্বামীজী আশ্রয় নিয়াছেন। লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ এই হুঁকাটির দিকে বার বার লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন। স্বামীজী এই হুঁকাটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দিয়া দিলেন। মহারাজের উপহারের মূল্য তাঁহার নিকট যেন এক কানাকড়িও নয়।

গুজরাটের পোরবন্দর রাজসভায় স্বামীজী উপস্থিত হইয়াছেন। শংকর পাণ্ডুরাং সেখানকার এক প্রখ্যাত পণ্ডিত। তিনি তখন বেদের অনুবাদ করিতেছিলেন। স্বামীজী নয় মাস কাল সেখানে থাকিয়া তাঁহার কাজের সহায়তা করেন এবং বেদ এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্য এই সময়েই পাণ্ডুরাং এর সাহায্যে তিনি আয়ত্ত করিয়া নেন।

নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতশিরোমণি পাণ্ডুরাং বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী, আমার মতে আপনার মনীষা ও প্রতিভার উপযুক্ত মর্যাদা শুধু পাশ্চাত্য দেশেই হতে পারে। আপনি সেখানে আমাদের সনাতন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দেশেরই কল্যাণ হবে।

পাশ্চাত্য দেশ পর্যটনের চিন্তা বীজাকারে স্বামীজীর অন্তরে এই সময় হইতেই প্রবেশ করে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী—জীবরূপী শিবের সেবা—বার বার তাঁহার মনে পড়ে। ভাবেন, মাতৃভূমি ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন শিক্ষাদীক্ষাহীন মানুষের অন্ন যোগাইতে হইবে—আধ্যাত্মিক চেতনায় তাহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন জনগণের দারিদ্র্য ও তামসিকতা দূর করা।

কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল করবার উপকরণ কই? মনে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল—পাশ্চাত্যদেশে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। ভোগসর্বস্ব ঐশ্বর্যময় [illegible] কেন্দ্রে তিনি ভারতের অধ্যাত্মবাণী প্রচার করিবেন আর ইহার পরিবর্তে আনিবেন সে দেশের সাহায্য, যাহা দ্বারা এ দেশ হইবে সমুন্নত।

ঐশ নির্দিষ্ট ব্রতের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়া গিয়াছিলেন। তাহারই উদ্যোগপর্ব যেন এই সময়ে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতেছি। এই সময়ে গুরুভাই অভেদানন্দজীর সহিত বোম্বাইতে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর অন্তরলোকের প্রস্তুতির কথাটি স্বামী অভেদানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন—"এই সময়ে স্বামীজীর হৃদয়টি যেন অগ্নিকুণ্ডের মতো হইয়াছিল। আর কোনো চিন্তা নাই। কেবল কি করিয়া ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়—অহর্নিশ তাহাই ভাবিতেন। স্বামীজীকে তখন দেখিলে মনে হইত যেন একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত! আমাকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—দ্যাখ কালী, আমার ভেতর এমন একটা শক্তি জমেছে যে, ভয় হয় পাছে ফেটে যাই।"

এই সময়ে মাদ্রাজে স্বামীজীর প্রকাণ্ড এক ভক্তদল জুটিয়া গেল। ইহাদের উৎসাহে ও নিজ অন্তরের প্রেরণায় তিনি পাশ্চাত্য দেশে ধর্মপ্রচারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন। সিকাগোতে বিশ্বধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। সেখানে তাঁহাকে প্রেরণের জন্য সকলেই অত্যন্ত ব্যগ্র।

স্বামীজীর ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমল প্রভৃতির চেষ্টায় জনসাধারণ হইতে চাঁদাও কিছু উঠিল। মাদ্রাজী শিষ্যদের কাছে স্বামীজী নিজের অভিপ্রায় স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিলেন,—"এখন হিন্দুধর্মকে জগৎবাসীর কাছে প্রচার করার সময় এসে গিয়েছে। ঋষিদের এই মহান্ ধর্মকে আর সংকীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখলে চলবে না, জগৎময় একে ছড়িয়ে দিতে হবে। সনাতন ধর্মের প্রাচীন দুর্গ জীর্ণ হয়েছে, শুধু বৈদেশিক আক্রমণ থেকে তাকে কোনোরকমে রক্ষা ক'রে জড়ের মতো বসে থাকলে চলবে না। এর পুনঃসংস্কার ক'রে জগতের সমক্ষে বার হতে হবে, পূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে চারদিকে প্রচার করতে হবে এর মহিমা।"

আমেরিকা যাওয়ার জন্য চাঁদা তোলা হয়। কিন্তু স্বামীজী পতিত হন মহা সমস্যায়। অন্তরে প্রশ্ন জাগে, কেন তিনি বিদেশে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন? দেশের কাজে? ধর্মের কাজে? না নিজের প্রচ্ছন্ন অহংবোধ তাঁহাকে এদিকে ঠেলিয়া নিতেছে?

ভগবানের নিগূঢ় উদ্দেশ্য যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তাহা জানিবার উপায় কই? এযাবৎ কোনো স্পষ্ট নির্দেশ তো তিনি পান নাই। এক্ষেত্রে বিদেশ গমনের পরিকল্পনা স্থগিত রাখাই সমীচীন। ভক্ত ও বন্ধুবান্ধবদের এ সিদ্ধান্ত তখনি জানাইয়া দিলেন। সংগৃহীত চাঁদার অর্থ দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মাদ্রাজের ভক্ত শিষ্যেরা দমিবার পাত্র নন। কিছুদিন পরেই তাঁহাদের উদ্যম ও হৈচৈ আবার শুরু হয়। তাঁহাদের উৎসাহের স্রোতে পড়িয়া স্বামীজীও আবার ভাবিতে বসেন। ঠাকুর সশরীরে নাই, তাঁহার নির্দেশ পাইবার আশা আর কোথায়। কিন্তু শ্রীমা তো রহিয়াছেন। তিনি তো তাঁহারই অংশস্বরূপিণী। মায়ের অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়? স্থির করিলেন তাঁহার নির্দেশ চাহিয়া এখনি পত্র দিবেন। ইতিমধ্যে সেদিন এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

স্বামীজী রাত্রে শয়ন করিয়া আছেন, ঘুম আসিতেছে না। এমন সময়ে হঠাৎ এক অতীন্দ্রিয় দৃশ্য উদ্ঘাটিত হয় তাঁহার নয়নসমক্ষে। দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ঘন দিব্যমূর্তি ভারত সাগরের তীর হইতে দেশান্তর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

সোজাসুজি সমুদ্রের উপর দিয়া ঠাকুর অপর পারে চলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীকেও আদেশ দিতেছেন তাঁহাকে অনুসরণ করার জন্য। বিস্মিত স্বামীজী শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। তবে কি এটাই ঠাকুরের অভিপ্রেত? ঠাকুরের অস্ফুট ধ্বনি তখনও তাঁহার কানে বাজিয়া চলিয়াছে—"আয়, আয়।" তবে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ আর কোথায়?

অবিলম্বে স্বামীজী সারদা দেবীকেও একখানা পত্র লিখিলেন। তখন আর মতামত চাওয়া নয়, ঠাকুরের নির্দেশে সংকল্প তিনি স্থিরই করিয়াছেন। এবার মাতা ঠাকুরাণীর আশীর্বাদটি তাঁহার চাই।

লিখিলেন, "মাগো, মহাবীর যেমন রামনাম স্মরণ করিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন, আমিও তেমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম লইয়া সমুদ্রের পরপারে চলিলাম।"

নরেন অনেকদিন হয় একলা নানা স্থান ঘুরিতেছেন, সারদামণি বেশ কিছুদিন তাঁহার সংবাদ পান নাই। পত্র পাইয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। নরেন তাঁহার দৃষ্টিতে শুধু ঠাকুরের প্রধান শিষ্যই নয়—এই শিষ্যের মাধ্যমে ঠাকুর একটা বড় ঐশকার্য সম্পন্ন করিবেন ইহাও সারদাদেবী মনেপ্রাণে জানেন। ঠাকুরের নরদেহ ত্যাগ করার পর অলৌকিক অনুভূতির মধ্য দিয়া এ তত্ত্বটি তাঁহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন—ঠাকুরের জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম দেহ ধীরে ধীরে নরেনের দেহে প্রবেশ করিতেছে। ঠাকুর একদিন নরেনের দেহের মাধ্যমেই তাঁহার মহা লীলার বিস্তার সাধন করিবেন, এ বিশ্বাস এখনো তাঁহার আছে

আজ সেই নরেন ঠাকুরের কর্মযজ্ঞের ঋত্বিক রূপে পাশ্চাত্যদেশে যাইতে অনুমতি চাহিতেছে। আর এই সম্বন্ধে প্রত্যাদেশও যে ইতিমধ্যে শ্রীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনিও ধ্যানাবেশে দেখিয়াছেন, সমুদ্রতরঙ্গের উপর দিয়া ঠাকুর অগ্রসরমান, আর নরেন তাঁহার অনুগামী। নরেনকে তাঁহার নিজের এই অলৌকিক দর্শনের কথা জানাইয়া তিনিও তখনই পত্র দিলেন। জানাইলেন অন্তরের পরিপূর্ণ আশীর্বাদ।

স্বামীজী তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের আহ্বান করিলেন সানন্দে। কহিলেন, "আমেরিকায় যেতে এবার আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। মার আশীর্বাদ আমি পেয়ে গেছি।"

মাদ্রাজের ভক্তদের উৎসাহ এবং স্বামীজীর শিষ্য খেতড়ি-রাজের অর্থানুকূল্যে স্বামীজীর যাত্রার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইল।[১]

১৮৯৩ সালের ৩০শে মে তারিখ। বোম্বাই হইতে জাহাজে তিনি স্বদেশভূমি ত্যাগ করিলেন। পরিধানে রঙীন রেশমী আংরাখা ও উষ্ণীষ। পরিচয়ের জন্য গ্রহিলেন নূতন একটি নাম—স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পর শিষ্যেরা আঁটপুরে বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস নেন। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের নাম হয়—বিবিদিষানন্দ। হিমালয়ে ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে পরিব্রাজন কালে স্বামীজী মহারাজ নানা সময়ে নানা নাম গ্রহণ করিতেন। এবার বিদেশে যাওয়ার প্রাক্কালে কি নাম নিবেন ভাবিতেছিলেন। প্রিয় শিষ্য খেতড়িরাজ

---

১ বেণীশংকর শর্মা, স্বামী বিবেকানন্দ—জীবনের বিস্মৃত অধ্যায় (ইং)

বলিলেন, "স্বামীজী, আপনি জগতের বিবেক উন্মেষ করার জন্য তৈরি হচ্ছেন—আপনার এবারকার নাম হোক, বিবেকানন্দ।"

সিকাগোতে তখন বিশ্বমেলার অধিবেশন বসিয়াছে। এইখানেই বিশ্ব-ধর্মসভা বসিবার কথা। সেখানে পেঁছিয়া খবরাখবর করার পর তো স্বামীজীর চক্ষুস্থির। প্রতিনিধি নির্বাচনের শেষ তারিখ গত হইয়াছে। তাছাড়া, তখন জুলাই মাস—সেপ্টেম্বরের আগে ধর্মসভার অধিবেশনও বসিবে না। তিনি নিজে বা তাঁহার উৎসাহী ভক্তেরা কেহই আগে হইতে এ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আগামী কয়েক মাসের ব্যয় নির্বাহ কি করিয়া হইবে তাহাই এক বড় সমস্যা।

আমেরিকায় পদার্পণ করিবার সময় তাঁহার নিকট মাত্র ১৭৯ পাউন্ড অবশিষ্ট ছিল। সামান্য পুঁজি, আর দেশটিও ব্যয়বহুল। অর্থ যা কিছু ছিল তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া আসিতেছে। সম্মুখে মার্কিন দেশের নিদারুণ শীত। পর্যাপ্ত শীতবস্ত্রও তিনি সঙ্গে আনেন নাই। এই দেশ ভারত নয়, জড়বাদী ডলার পূজারীদের দেশ। এখানে সন্ন্যাসীর ভিক্ষা মিলে না—স্বামীজী বিষম বিপদে পড়িলেন।

কিন্তু এ অবস্থায় হাল ছাড়িবার পাত্রও তিনি নহেন। খরচ কমানোর জন্য কিছুদিন সিকাগো ছাড়িয়া বোস্টন শহরে গিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়েই আকস্মিক-ভাবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক মিঃ রাইটের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। স্বামীজীর লোকোত্তর প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা দর্শনে অধ্যাপক তো বিমুগ্ধ। সোৎসাহে তখনি তাঁহাকে ধর্মসভায় গ্রহণ করিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন।

হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করার কোনো নিদর্শনপত্র স্বামীজীর কাছে নাই, একথা রাইট সাহেবকে তিনি জানাইলেন। সুবিজ্ঞ অধ্যাপক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "স্বামীজী, আপনার কাছে এই নিদর্শন চাওয়া, আর সূর্যকে তার কিরণ দেবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা—একই কথা।"

যে সংস্থা ধর্মসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করেন তার সভাপতি ছিলেন মিঃ রাইটের বন্ধু। স্বামীজীর পরিচয়পত্রে তিনি সেই বন্ধুকে লিখিলেন, "ইনি এমনি একজন মনীষী যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সব কটি বিজ্ঞ অধ্যাপকের বিদ্যা একত্রে করলেও তা এঁর পাণ্ডিত্যের সমতুল হয় না।"

স্বামীজীর অর্থাভাব রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া সহৃদয় অধ্যাপক তাঁহাকে সিকাগো শহরের একখানি টিকিট আর মেলা অভ্যর্থনা কমিটির নামে একটি পরিচয়পত্র দিয়া রওনা করিয়া দেন।

কিন্তু স্বামীজীর পরীক্ষার যেন আর শেষ নাই। সিকাগো শহরে পেঁছিয়া দেখেন, মেলা স্থানের ঠিকানাটি তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শীতের রাত্রি ঘনাইয়া আসিয়াছে, এ অপরিচিত স্থানে আশ্রয় পাইবারও কোনো সম্ভাবনা নাই।

ধনী লোকের দরজায় গেলেই পরিচারকেরা তাঁহাকে নিগ্রো ভাবিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতেছে। রাত্রির জন্য মাথা গুঁজিবার একটা স্থানও মিলিতেছে না। অনন্যোপায় হইয়া সে রাত্রির মতো স্টেশনের এক খালি প্যাকিং বাক্সের ভিতরে আশ্রয় নিতে হয়।

---

১ রমাঁ রলাঁ : লাইফ অব বিবেকানন্দ

পরদিন প্রভাতে ক্ষুধার্ত হইয়া দুই এক স্থানে ভিক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে দেশে ভিক্ষা দিবার রীতি নাই। শ্রান্ত ক্লান্ত মলিন বেশধারী এই বিদেশীকে বহু ধনী গৃহস্থই তাড়াইয়া দেন। এক বর্ষীয়সী মহিলা ঘরের জানালা দিয়া দেখিতে পান নিরাশ্রয় বিদেশী তরুণ অর্থের জন্য ঘোরাঘুরি করিতেছেন, কিন্তু কোথাও কিছু মিলিতেছে না। মনে তাঁহার জাগিয়া উঠিল সহানুভূতি। তখনি নিচে নামিয়া আসিয়া স্বামীজীকে দোর খুলিয়া দিলেন—দিলেন আহার ও আশ্রয়। এই মহিলার নাম মিসেস হেইল।

স্বামীজী সুস্থ হইলে এই সহৃদয়া মহিলা তাঁহাকে ধর্মমেলায় পৌঁছাইয়া দিলেন। পরম কারুণিক ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর সতত নিবদ্ধ রহিয়াছে, অনেকবারের মতো এবারও স্বামীজী এই ঘটনায় তাহা উপলব্ধি করিলেন।

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। সিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রাসাদোপম ভবনে সাড়ম্বরে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। কার্ডিন্যাল গিবন্সকে কেন্দ্র করিয়া সারা পৃথিবীর ধর্মপ্রতিনিধিরা উপস্থিত। শ্রোতাদের মধ্যে রহিয়াছেন ইউরোপ আমেরিকার বহু মনীষী অধ্যাপক ও শ্রেষ্ঠ নাগরিক।

তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ মঞ্চোপরি উপবিষ্ট। গৈরিক রঙে রঞ্জিত রেশমী আংরাখা ও উষ্ণীষে ভূষিত এই হিন্দু প্রতিনিধির আকর্ষণ যেন সবাইকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সুন্দর সুঠাম তাঁহার দেহ, চোখে মুখে প্রতিভার দীপ্তি। আভিজাত্য ও আত্মপ্রত্যয়ে ভরা এই সন্ন্যাসী যেন এক স্বতন্ত্র পুরুষ। মুখভঙ্গী ও তেজ দেখিয়া মনে হয়, আদর্শবাদ ও ধর্মের ক্ষেত্রে ইনি যেন এক দুর্ধর্ষ ক্লান্তিহীন যোদ্ধা—চিহ্নিত অধিনায়ক।

স্বামীজীকে তাঁহার জীবনে এমন গুরুগম্ভীর, এমন গুরুত্বপূর্ণ সভার মঞ্চে কখনও দাঁড়াইতে হয় নাই। পাশ্চাত্য সমাজের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ধর্ম-নেতাগণ ইহাতে ভাষণ দিতেছেন। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতবাদ তাঁহারা অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার সহিত বিশ্লেষণ করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দকেও তাঁহার ধর্মের তত্ত্ব, পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বৃহত্তম ধর্মের তত্ত্ব জানাইতে হইবে—এবং এখনই তাহা জানাইতে হইবে। অন্যান্য প্রতিনিধিদের মতো পূর্ব হইতে কোনো কিছু লিখিয়া বা তৈরি হইয়াও তিনি আসেন নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মাধিবেশনের সভামঞ্চে বসিয়া এই ত্রিশ বৎসর বয়স্ক দুঃসাহসী যুবকের হৃদয় আজ যেন হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

এবার স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণের পালা। সভাপতি আহ্বান জানাইলেন তাঁহাকে। স্বামীজী কিন্তু এড়াইয়া গেলেন, কহিলেন, ইহার পরে তিনি বক্তৃতা করিবেন। কিছুক্ষণ পরে আবার তাঁহার ডাক পড়ে, ঘণ্টা বাজাইয়া ইঙ্গিত জানানো হয়। কিন্তু এবারও বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন—এখন নয়। সভাপতি আর তাঁহাকে এড়াইতে দিতে রাজী নন। দৃঢ়স্বরে বলিয়া বসিলেন, ইহাই এই প্রতিনিধির বক্তৃতা প্রদানের শেষ সুযোগ। কি আর করা যায়, স্বামীজীকে এইবার উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়।

ইষ্টনাম গ্রহণ করিয়া সমবেত নরনারীকে তিনি আহ্বান জানান, "আমেরিকাবাসী ভগ্নি ও ভ্রাতৃবৃন্দ!" মুহূর্ত মধ্যে যেন এক ইন্দ্রজাল ঘটিয়া যায়। এই [illegible]

আন্তরিকতা অভিভূত করিয়া ফেলে সভার প্রতিনিধি ও দর্শকদের। যুবক সন্ন্যাসীর অভিনন্দন আর শ্রোতাদের করতালি ধ্বনি যেন থামিতে চাহে না। শত শত লোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া জানায় বিপুল সংবর্ধনা।

ক্ষণকাল মধ্যেই স্বামীজীর আত্মবিস্মৃতি কাটিয়া গেল। বুঝিলেন এই অভিনন্দন ও এই স্বীকৃতি শ্রীরামকৃষ্ণেরই ইচ্ছায়। জগজ্জননী আদ্যাশক্তির এ এক নিগূঢ় লীলা। এ লীলারই ক্রীড়নক হিসাবে আজ তিনি এখানে দণ্ডায়মান। স্বভাবসিদ্ধ সাহস ও নেতৃত্ব ফিরিয়া পাইতে স্বামীজীর বিলম্ব হইল না। অতঃপর হৃদয়ের অনর্গল উৎস হইতে বহিতে থাকে তাঁহার চাঞ্চল্যকর ভাষণ।

অমোঘ শক্তিমত্তায় মণ্ডিত হইয়া স্বামীজী সেদিন ধর্মসভার চিত্ত জয় করিলেন। সমগ্র পৃথিবীর ধর্মপ্রচারক ও দার্শনিকদের সমক্ষে ইহা যেন এক চাঞ্চল্যকর বিস্ফোরণ। শ্রোতাদের মধ্যে মার্কিন সমাজের বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাই অধিক। ইঁহাদেরই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া মার্কিনদেশের সম্মুখে সেদিন ফুটিয়া উঠিল বিবেকানন্দের ভাস্বর মূর্তি। বেদান্তধৃত সনাতন হিন্দুধর্মের সংবাহকরূপে পাশ্চাত্য দেশের প্রাণকেন্দ্রে ঘটিল তাঁহার অভ্যুদয়। এক বিরাট সম্ভাবনা সূচিত হইল ইহার মাধ্যমে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের লীলা-জীবনে সেদিনকার এই ঘটনাটি ছিল বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সচ্চিদানন্দ সাগরবিহারী এক রাজহংস। ধ্যানময় প্রশান্ত মহাকারণে তাঁহার সত্তা সদা ভাসমান। আর বিবেকানন্দ সেই রাজহংসেরই পক্ষ-বিধূনন। ধর্ম-মহাসভার সেদিনকার এই আলোড়ন—গতি-চঞ্চলতা কি এই পক্ষ বিধূননেরই প্রথম প্রতিক্রিয়া?[১]

বিবেকানন্দ তাঁহার আনন্দচঞ্চল শ্রোতাদের নিকট ঘোষণা করিলেন, "পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসীসঙ্ঘের পক্ষ থেকে আমি আজ আপনাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। সর্বধর্মের জননী-স্বরূপা সনাতন ধর্মের প্রতিনিধিরূপে, সকল শ্রেণীর সকল মতের কোটি কোটি হিন্দুর পক্ষ থেকে আপনারা গ্রহণ করুন আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।"

সনাতন ধর্মের সমন্বয়কারী রূপটি উদ্‌ঘাটন করিয়া তিনি আরও বলেন, "যে ধর্ম সমগ্র জগৎকে পরমতসহিষ্ণুতা এবং সকল মতের সর্বজনীন স্বীকৃতি শিক্ষা দিয়েছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে গৌরব করে থাকি। আমরা কেবল সর্বজনীন পরমত-সহিষ্ণুতারই বিশ্বাসী নই, আমরা সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সর্বদেশের উৎপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থীদের জাতিবর্ণ নির্বিশেষে আশ্রয় দিয়েছে, আমি সেই জাতির অন্যতম মানুষ বলে মনে মনে গর্বিত। আমি আপনাদের গর্বের সঙ্গে বলবো, যে বৎসর রোমানরা ইহুদীদের পবিত্র দেবালয়গুলো ধ্বংস করে ফেলে, সেই বৎসর হতাবশিষ্ট ইস্‌রাইল বংশীয়দের আমরাই দক্ষিণ ভারতবর্ষে স্থান দিয়েছিলাম। যে ধর্ম জরথুস্ট্রপন্থী মহান্ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে আশ্রয় দিয়েছে, অদ্যাবধি লালন-পালন করছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে গৌরব বোধ করছি।"

ধর্ম-মহাসভার বিরাট কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া স্বামীজীর উদাত্ত-কণ্ঠে নির্গত

---

১ রম্যাঁ রল্যাঁ: লাইফ অব বিবেকানন্দ।

হইল সেই পবিত্র শ্লোক। অগণিত ভারতবাসী শৈশবকাল হইতে যাহা আবৃত্তি করে—

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল
নানাপথ জুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি
পয়সামর্ণব ইব।।

—নদ-নদী সকল যেমন নানা ধারায় নানা পথে সাগর অভিমুখে বহিয়া যায়, তেমনি রুচির বৈচিত্র্যহেতু, সরল ও কুটিল নানা পথগামী মানব ধারার, হে প্রভো, তুমিই একমাত্র গন্তব্যস্থল।

গীতার প্রচারিত মহান্ সত্যের কথাও তিনি শুনাইলেন। পুরুষোত্তম বলিয়া গিয়াছেন,—যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে আমি তাহার নিকট সেইভাবেই প্রকাশিত হই—হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার নির্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে।

ভারতধর্মের মূল সুরটি ব্যাখ্যা করার পর ধর্মসভার সম্মুখে অপূর্ব আশার বাণীও তিনি ধ্বনিত করিলেন - "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার মৃত্যুকাল আসন্ন। আমি সর্বান্তঃকরণে ভরসা করি, এই মহাসমিতির উদ্বোধনে আজ প্রভাতে যে ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠলো তা ধর্মোন্মত্ততার মৃত্যুবার্তা জগতে ঘোষণা করুক। একই রকম লক্ষ্যে মানবজাতি আজ এগিয়ে চলেছে, এবার তার ভেতরকার পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হোক, তরবারি বা লেখনীর দ্বারা পরপীড়নের দুর্নীতির ঘটুক অবসান।"

মনীষী রম্যাঁ রল্যাঁর ভাষায়,—সম্মেলনের অপর বক্তারাও প্রত্যেকেই ভগবানের কথাই বলিয়াছিলেন—কিন্তু সে ভগবান ছিলেন তাঁহাদের স্ব-সম্প্রদায়ের ভগবান। কিন্তু বিবেকানন্দ—একা বিবেকানন্দ, সকলের ভগবানের কথা বলিলেন, সকলের ভগবানকে বিশ্বসত্তায় মিলাইয়া দিলেন। ইহা ছিল রামকৃষ্ণেরই উদার বিশ্বাস, যাহা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যের মাধ্যমে উদ্গত হইল। আর বিশ্বধর্ম সম্মেলন এই তরুণ সন্ন্যাসীকে জ্ঞাপন করিল তাহার স্বতোৎসারিত অভিনন্দন।

ইহার পর স্বামীজীকে প্রায় দশ বারটি বক্তৃতা এ সম্মেলনে দিতে হয়। যুক্তি, প্রেরণা এবং আদর্শবাদিতার শক্তিতে তাহা অমোঘরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সম্মেলনের সদস্যদের ডিঙাইয়া তাঁহার প্রচারিত এই শাশ্বত সত্যের মহাবার্তা অচিরেই দেশটিকে আলোড়িত করিয়া তুলে। বিশ্বধর্ম মহাসভার প্রখ্যাত মনীষী ও জনসাধারণ এর সাথে উভয়ের চিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ অবলীলায় অধিকার করিয়া বসেন। এই বিবেকানন্দ কিন্তু তাঁহারই শিষ্য যিনি ব্যবহারিক শিক্ষার কোনো ধারই ধারিতেন না, যিনি নাম দস্তখত করিতে গিয়া লিখিতেন 'রামকেষ্ট' স্বামীজীর সবকর্মের পিছনে ছিলেন সেই রামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণেরই তিনি যেন একটি ক্ষুদ্র রাজদণ্ড। দণ্ডধারী ঠাকুর সেদিন বুঝিবা সবার অলক্ষ্যে মিটিমিটি হাসিতেছিলেন।

মার্কিন সংবাদপত্রগুলি স্বীকার করিয়া নেয়, স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে ধর্মমেলার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। নিউইয়র্ক হেরাল্ড এই সময় লিখে, 'ইঁহার [illegible]

শুনিবার পর মনে হইবে, ভারতবর্ষের মত জ্ঞানৈশ্বর্যমন্ডিত দেশে আমাদের দেশের ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা নির্বুদ্ধিতার কাজ।”[১]

মার্কিনদেশের মনীষী সমাজনেতা ও ধনকুবেরগণ স্বামীজীর প্রজ্ঞা পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার এই জনপ্রিয়তাকে ধর্মসম্মেলনের সভাপতিও তাঁহার কাজে লাগাইতে ছাড়িতেন না। নীরস তত্ত্বালোচনার আসরে যখন শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে থাকিত তিনি তখন ঘোষণা করিতেন, অধিবেশনের শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ভাষণ দিবেন। জনমন্ডলী অমনি আগ্রহী হইয়া উঠিত, স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার আকর্ষণে ধৈর্য ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিত।

স্বামীজীর ভক্ত ও অনুরাগী পাশ্চাত্য দেশীয় চরিতকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন, “সিকাগোর বিরাট ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজী যে মহাসত্য প্রচার করেন, যে বিস্ময়কর আশার বাণী শ্রবন করান, খ্রীষ্টের পর আর কোনো প্রাচ্যবাসীর মুখ থেকে পাশ্চাত্য দেশ তেমন কথা শ্রবণ করে নাই। তাঁর ভাবরাশি চিরদিন পাশ্চাত্যের ধর্মোন্নতি ও ধর্ম বিস্তারের সহায়করূপে গণ্য হবে, গৃহীত হবে জগতের ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রধান অবলম্বনরূপে।”[২]

শুধু মাত্র কয়েকটি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা এবং ব্যক্তিত্বের বলে জনমানসের এমন দিগ্বিজয় পৃথিবীতে খুব কমই দেখা গিয়াছে।

এই অপ্রত্যাশিত সম্মান ও খ্যাতির প্লাবন স্বামীজীর অন্তরে সেদিন কিরূপ প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে? প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রগুলির স্তম্ভে স্তম্ভে তখন তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসীর বিজয়গাথা। এই জয়গৌরব কিন্তু স্বামীজীর হৃদয়কে ভিতরে ভিতরে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। ভাবিতে থাকেন, খ্যাতির একি বিড়ম্বনা আজ শুরু হইয়াছে তাঁহার জীবনে? ত্যাগী এবং একান্তচারী সন্ন্যাসীজীবনে মুক্ত বিহঙ্গের মতো তিনি ছিলেন স্বাধীন, স্বতন্ত্র। সে জীবন কি আর ফিরিয়া পাইবেন না? তপস্যাময় জীবন, ঈশ্বরধৃত জীবন—তাহারও ঘটিতেছে অবসান। আশংকা আসে অন্তরে। আমেরিকায় আসিয়া এ যাবৎ পদে পদে দারিদ্র্য ও প্রত্যাখ্যানের সহিত তাঁহাকে যুঝিতে হইয়াছে—এইবার বুঝি ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য তাঁহাকে গ্রাস করিতে চায়।

স্বামীজী রাতারাতি সমগ্র মার্কিনদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। কোটিপতি গুণগ্রাহিগণ তাঁহার যে কোনো আজ্ঞা নিমেষে পালন করিতে সমুৎসুক। এক রাত্রে এক ধনীর প্রাসাদে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। চারিদিকে বিলাসের প্রাচুর্য। রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্যদ্রব্যের অবধি নাই। ভোজন ও আপ্যায়ন শেষে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন। কিন্তু ঘুম আসিল না। এই বিলাস বৈভবের পরিবেশে তাঁহার দুঃখিনী জন্মভূমির স্মৃতি বৃশ্চিকের মতো দংশন করিয়া উঠিল। নিরন্ন শিক্ষা-দীক্ষা-হীন কোটি কোটি দেশবাসীর দুঃখে তিনি মুহ্যমান হইলেন। সমস্ত রাত্রি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিলেন নিদ্রা আসিল না।

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতা তখন সম্মোহনের কাজ করিতেছে। এই

১ ডঃ আর. সি. মজুমদার বিবেকানন্দ ইন্ আমেরিকা

২ স্বামী বিবেকানন্দ : ইস্টার্ন এন্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপল্স

সময়ে এক গুণগ্রাহিণী ধনাঢ্য তরুণী স্বামীজীকে নিবেদন করিতে চান তাঁহার বিত্ত-বিষয় ও রূপযৌবন। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর দেন, "আমার কাছে এসবের প্রস্তাব করতে নেই। আমি যে সন্ন্যাসী। নিখিল বিশ্বের সমস্ত নারীই যে আমার মা।"

আমেরিকার বক্তৃতা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়া স্বামীজী যেন ঝটিকাবেগে বিভিন্ন অঞ্চলে নিপতিত হইতে থাকেন। বেদান্ত ও মানবধর্মের শাশ্বতরূপ ফুটিয়া উঠে তাঁহার শক্তিদৃপ্ত ভাষণে। সংবাদপত্রে তাঁহাকে অভিহিত করা হয় 'সাইক্লোনিক হিন্দু' নামে।

গৌতম বুদ্ধের আড়াই হাজার বৎসর পর ভারত বহির্দেশে এই তাহার প্রথম প্রচারক ও বাণীবাহককে প্রেরণ করিয়াছে। প্রতীচ্য সভ্যতার অগ্রদূত মার্কিনদেশ তাঁহার সেই বাণী এবার কান পাতিয়া শুনিল।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে তাহার সত্যাবিষ্কারের অপূর্ব উপহার লইয়া আজ পশ্চিমের দ্বারে উপস্থিত। আর সেই বিবেকানন্দ হইতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান—শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসত্তার তিনি প্রাণময় প্রকাশ। এই শক্তিধর দূতকে সহসা ফিরাইয়া দিবার উপায় কই ?

প্রতীচ্য সভ্যতার ধর্মকেন্দ্র, আমেরিকা তাই বিবেকানন্দকে গ্রহণ করিল। শুধু তাঁহার বাগ্মিতার মধ্য দিয়া নয়—ব্যক্তিত্ব, সত্যনিষ্ঠা ও ত্যাগধৃত জীবনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াই তাঁহাকে গ্রহণ করিল।

ইহার জন্য কিছুটা প্রাথমিক প্রস্তুতিও মার্কিনদেশের ছিল, এবং তা অস্বীকার করিবার যো নাই। বিবেকানন্দ ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে আমেরিকায় উপস্থিত হন। মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তখন যে মানসিকতা বর্তমান, তাহা তাঁহার ধর্ম প্রচারের পক্ষে কিছুটা অনুকূলই ছিল। মনীষী এমার্সন এবং থোরো ইতিপূর্বে তাঁহাদের রচনায় ভারতীয় ব্রহ্মবাদ ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সমর্থন জানাইয়া গিয়াছেন। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স-এর সমর্থকেরা ও কবি হুইট্‌ম্যানের আধ্যাত্মিকতাও যেন একটা কিছুটা ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

কবি হুইট্‌ম্যানের কবিতায় বুঝি ভারতদূত বিবেকানন্দেরই আগমন পদধ্বনি ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছিল :

"হে মোর নগরী ..
ঐ দ্যাখো, আমাদেরই দ্বারে
আসছে ঐ আদি-মাতা।
ভাষার প্রথম কাকলী
শোনা গিয়েছিলো তাঁর নীড়ে,
আর, সমস্ত কাব্যের ছিল সে উৎস-মুখ,
সুপ্রাচীন তাঁর বংশধারা ..
ঐ শোন, আসছে সে,
— ব্রহ্মের সঙ্গীত।"

আবার অপর দিকে দেখি, মার্কিন-সমাজে সাধারণ মানুষ ভোগসর্বস্ব জীবনে

পিছনে ছুটিয়া হইতেছে দিশাহারা, মানসিক ভারসাম্য সে হারাইয়া বসিয়াছে। এই উদ্‌ভ্রান্ত, শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষদের সামনে স্বামীজী তুলিয়া ধরিলেন আত্মিক জীবনের আদর্শ, প্রচার করিলেন ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণী। রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম-শক্তির স্পন্দনে তাহা প্রাণবন্ত, বিবেকানন্দের নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতির প্রত্যয়ে তাহা প্রোজ্জ্বল—মন্ত্রচৈতন্যময়।

স্বামীজী তখন প্রচারের উৎসাহে মত্ত। প্রতি সপ্তাহে বার চৌদ্দটি করিয়া বক্তৃতা তাঁহাকে দিতে হয়। এক এক দিন শরীর ও মন ক্লান্তিতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। নূতন বক্তব্যও অনেক সময় যেন খুঁজিয়া পান না। ভয় হয়, তবে কি তাহার জ্ঞানের পুঁজি নিঃশেষিত? আবার এই সংশয় ও নৈরাশ্যের মুহূর্তে হঠাৎ হৃদয়ে জাগিয়া উঠে অলৌকিক অনুভূতি, প্রত্যয় ও প্রাণের আবেগে উচ্ছল হইয়া উঠেন। এক এক দিন রাত্রে তন্দ্রাবেশে শুনিতে পান পরবর্তী দিনের ভাষণটি কে যেন তাঁহার কানের কাছে পরিষ্কাররূপে বলিয়া যাইতেছে। পরের দিনের বক্তৃতায় এই অলৌকিক ভাষণের স্মৃতিই তাঁহাকে সাহায্য করিত।

বিবেকানন্দের চতুর্দিকে এবার আরো ভিড় জমিয়া উঠে। এ ভিড় মুমুক্ষু অধ্যাত্মপন্থী, সংশয়বাদী, আর অজস্র হুজুগ-প্রিয় নরনারীর। সত্যানুরাগী তেজো-দৃপ্ত সন্ন্যাসীর যেন রবাহূত জন-সংঘট্ট ভাল লাগে না। জনসভায় দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করেন, "খ্রীষ্টান বলে তোমরা পরিচয় দাও, কিন্তু খ্রীষ্টের ভাবের কি সন্ধান তোমরা দিয়েছো? যীশু আবার যদি আসেন তাঁর শয়নের জন্য একখণ্ড প্রস্তরও কি আজ তাঁর জুটবে?"

তীব্র কশাঘাতে পাদ্রীদল ক্ষেপিয়া যায়। শ্রোতাদের কাহারো কাহারো চৈতন্য সত্য সত্যই জাগিয়া উঠে, স্বামীজীর কাছে তাহারা করে আত্মসমর্পণ।

স্বাধীনচেতা স্বামীজী কিছুদিনের ভিতর বক্তৃতা-প্রতিষ্ঠানের বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া নিলেন। ইহার ফলে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হইল, কিন্তু তিনি তাহাতে দৃক্‌পাত করিলেন না। ধনী বন্ধুরা তাঁহার কাজের জন্য এই সময় অজস্র অর্থ দিতে চান, কিন্তু শর্ত—তাঁহাদের অনুমোদিত সমাজ ছাড়া স্বামীজী অপর কোথাও মিশিতে পারিবেন না। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন, "শিব! শিব! কখনো দেখেছো কি, পৃথিবীর কোনো বিরাট কাজ ধনীরা করতে সক্ষম হয়েছে? হৃদয় আর মস্তিষ্কই সৃষ্টি করে—টাকার থলির সে ক্ষমতা নেই।[1]

গঠনমূলক কাজ এখন হইতে শুরু হয়। স্থির করেন, সত্যকার মুমুক্ষু নরনারী যাঁহারা, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়া, তাঁহাদের মধ্যে বিতরণ করিবেন তত্ত্ব উপদেশ। কয়েকজন বিত্ত ভক্তের আর্থিক সহায়তা নিয়া কাজ শুরু করেন। নিউইয়র্কের এক সাধারণ অঞ্চলে দুটি কক্ষ ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। আসবাবপত্রহীন কক্ষে পাশ্চাত্য ভক্তগণ পা মুড়িয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকেন। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বহু লোক সিঁড়িতে বসিয়াও শোনেন তাঁহার ভাষণ ও ব্যাখ্যা। কিছুদিন পরে বেদান্ত শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটি প্রশস্ততর ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

এই সময়ে ধীরে ধীরে স্বামীজীর চারিদিকে আসিয়া জুটেন একদল বিশিষ্ট ভক্ত

---

১ মেরী লুই বার্ক: স্বামী বিবেকানন্দ ইন্ আমেরিকা

ও কর্মী। ইঁহাদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ম্যাডাম মেবী লুইস (স্বামী অভয়ানন্দ), ডাঃ স্যাণ্ডস্‌বার্গ (স্বামী কৃপানন্দ), মিসেস ওলি বুল, মিস ওযাল্ডো, গুডউইন, মিঃ লিগেট মিস মেবী ফিলিপ, মিসেস আর্থাব স্মিথ, মিসেস গুডইযাব প্রভৃতি।

ইঁহাদেব উপলক্ষ কবিযা স্বামীজী যে ভাষণ দেন তাহা হইতে সংকলিত হয় তাঁহাব বাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এই গ্রন্থ কযটি প্রকাশের পব পাশ্চাত্য সমাজে আলোডন পডিযা যায।

শিষ্য ও শিষ্যাদেব শুধু প্রেবণা দিযাই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। আধ্যাত্মিক সাধনেব পথে ইঁহাদেব তিনি সতর্কভাবে পবিচালিত কবিতেন। এই সময় বিবেকানন্দের জীবনে ঐশী শক্তিব নানা প্রকাশ ঘটিতে দেখা যায। সিস্টাব ক্রিস্টিনেব স্মৃতিকথায় ইহাব কিছু কিছু উল্লেখ বহিযাছে। স্বামীজীব বিশ্বস্ত শিষ্য ও লিপিকাব গুডউইন সম্পর্কিত এব ঘটনাতে ইহাব প্রমাণ মিলে। একদিন গুডউইন জডবাদের সমর্থন কবিযা স্বামীজীব সহিত তুমুল তর্ক জুডিযা দিযাছেন। কিছুতেই বিতর্কের অবসান হইতেছে না। হঠাৎ স্বামীজীব মনশ্চক্ষে গুডউইনেব অতীত জীবনের চিত্র-গুলি একেব পব এক ভাসিযা উঠিতে থাকে। স্বামীজীব সেই ঘটনাবলীর উল্লেখ কবিযা দৃঢস্ববে গুডউইনকে বলিলেন, "তুমি তো এই ধবনেব জীবন যাপন করে এসেছো? তোমাব বুদ্ধিতে আব কত ধববে বল?"[১]

অতীন্দ্রিয শক্তিব সাক্ষাৎ পবিচযে প্রচণ্ড ধাক্কা খাইলেন গুডউইন। জডবাদ সমর্থন কবিযা যে গলাবাজী কবিতেছিলেন, তখনি তাহা নীবব হইযা পডিল।

নিউইযর্কে স্বামীজী তাঁহাব স্থাযী সংগঠন 'বেদান্ত সমিতি' স্থাপন করিলেন। বিশ্বস্ত কযেকটি শিষ্য-শিষ্যাব উপব কর্মভাব ন্যস্ত কবিযা অতঃপব তিনি প্রচার কার্যের জন্য উপনীত হন ইংল্যাণ্ডে। ইংল্যাণ্ড সতর্ক ও বক্ষণশীল দেশ। কিন্তু এখানেও স্বামীজীব ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট আলোডনেব সৃষ্টি কবে। বহু ইংবেজ সাধক স্বামীজীর উপদেশ নিযা অধ্যাত্মপথে অগ্রসব হন।

স্বনামখ্যাত বাজনীতিক নেতা ও মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইংল্যাণ্ডে অবস্থান কবিতেছিলেন। তাঁহাব এক চিঠিতে লেখনীতে সমাজে বিবেকানন্দেব কর্মসাফল্যেব পবিচয বহিযাছে। তিনি লিখিযাছেন, "আমি ইতিপূর্বে 'দি ডেড পুলপিট' নামক প্রবন্ধ থেকে 'বিবেকানন্দ-ইজম' সম্বন্ধে যে অংশটি উদ্ধৃত কবেছি, তা থেকেই আপনি অবগত হযেছেন যে, বিবেকানন্দের প্রচারিত মতবাদের প্রসাবহেতু বহুশত ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে খ্রীষ্টান চার্চেব বন্ধন ছিন্ন করেছেন। এছাডা আমি বহু শিক্ষিত ইংবেজ ভদ্রলোককে দেখেছি যাঁবা ভাবতকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন এবং ভাবতীয ধর্মমত ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শ্রবণ কববাব জন্য সততই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।

ইংল্যাণ্ডে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলেব এবং জার্মানীতে দার্শনিক পল ডয়সন সহিত স্বামীজীব গভীব সৌহার্দ্য স্থাপিত হয। কিন্তু স্বামীজীর ইউরোপ ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ ফল হইতেছে তাঁহাব একদল একনিষ্ঠ ভক্তেব আত্মনিবেদন। মিস মার্গারেট নোবেল (ভগিনী নিবেদিতা) মিঃ স্টার্ডি ও সেভিয়ার দম্পতি ইঁহাদের অন্যতম।

---

১ সিস্টাব ক্রিস্টিন: আনপাবলিশড বেমিনিসেন্স

এই শিষ্য-শিষ্যাগণ স্বামীজী ও ভারতবর্ষের জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হন।

আমেরিকার রামকৃষ্ণ মিশন ও শিক্ষাকেন্দ্রের কাজ তখন দিন দিন বাড়িতেছে। প্রধান ভক্তেরা গুরুর পতাকা একান্ত নিষ্ঠায় বহন করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের সম্মুখে যেন নূতনতর জীবনের দৃশ্যপট খুলিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের জন্য, বিদেশ হইতে সাহায্য সংগ্রহের জন্য আমেরিকায় তাঁহার আগমন। কিন্তু উদ্দেশ্য তাঁহার তো সফল হয় নাই। তাই এবার দেশে ফিরিতে তিনি ইচ্ছুক। ভারতে বসিয়াই যে ভারতকে আজ বাঁচাইতে হইবে। রোগীর সঞ্জীবনী শক্তি রহিয়াছে তাহার অন্তঃসঞ্চারী প্রাণধারায়, সেই শক্তি দিয়াই তাহাকে উজ্জীবিত করিতে হইবে। বিবেকানন্দ এবার ভারত-ভূমির দিকেই দৃষ্টি ফিরাইলেন। কিন্তু সেই স্বভাব-যোদ্ধার অন্তর্লোকে আজ যেন নূতনতর নিগূঢ়তর জীবনের আস্বাদ।

১৮৯৬ সালের ৬ই জুলাই তারিখে স্বামীজী তাঁহার ভক্ত মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটকে এক পত্র লিখেন। তাঁহার জীবনধারার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত ইহাতে ফুটিয়া উঠিতে দেখি,—"প্রেমময় ভগবান্ লীলাময়, আমি তাঁহার লীলার সঙ্গী। তাঁহার এই জগতের না আছে যুক্তি, না আছে ছন্দ। আর কোন্ যুক্তিই বা তাঁহাকে বাঁধিতে পারে? তিনি লীলাময়, তাঁহার খেলার আগাগোড়াই হাসি-কান্নার খেলা। কি মজা, কি আনন্দ। এই পৃথিবীর খেলার মাঠে স্কুলের ছেলেমেয়েদের যেন তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। কাহাকে প্রশংসা করিবে, কাহাকে তিরস্কার করিবে? তাঁহাদের না আছে মাথা, না আছে বুদ্ধি। তিনি আমাদের মাথায় একটু বুদ্ধি ঢুকাইয়া দিয়া আমাদিগকে লইয়া তামাশা করিতেছেন। এবার কিন্তু আর তামাশা চলিবে না। দুই একটা জিনিস আমি এবার শিখিয়াছি। জ্ঞান ও যুক্তি তর্কের উপরে আছে, 'অনুভূতি', 'প্রেম', আর 'প্রেমময়'। সেই প্রেম রসে পাত্র পূর্ণ করিতে পারিলে আমরা আনন্দে ভরপুর হইব, পাগল হইব।"

বিবেকানন্দ নিজ দেশে ফিরিয়া আসিলেন। 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'।' পাশ্চাত্যের শিক্ষিতমহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার পর বীর সন্ন্যাসী ভারতের নিস্তরঙ্গ জীবনে তুলিলেন এক প্রচণ্ড আলোড়ন। সুপ্তিমগ্ন জাতির উপর পড়িল ঝটিকার আঘাত। আত্মবিস্মৃত, পরনির্ভর ভারতবর্ষের সম্মুখে সেদিনকার স্বামী বিবেকানন্দ যেন এক পরম বিস্ময়। এই দেশেরই মধ্যে সেদিন এমন এক বিরাট পুরুষ অভ্যুত্থিত হইয়াছেন, যাঁহার কণ্ঠ-নির্ঘোষ সারা পাশ্চাত্য দেশকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছে, যাঁহার চরণ-ধূলি নিবার জন্য আধুনিক সভ্যতাগর্বী মানুষের দল ভিড় করিয়া দাঁড়াইতেছে। জয়-গৌরবদীপ্ত এই সন্ন্যাসীর ললাটে রহিয়াছে ভারতের আত্মপরিচয়ের তিলকচিহ্ন। ভারতের অধ্যাত্মচেতনার মহিমায় তাহা সমুজ্জ্বল। ত্যাগী সন্ন্যাসী, বীর সন্ন্যাসী, বিবেকানন্দের জীবনে জীবন লাভ করিয়া সমগ্র দেশ সেদিন জাগিয়া উঠিল।

ঐন্দ্রজালিক রামকৃষ্ণের জাদুদণ্ড দেশে ও বিদেশে নূতন নূতন দৃশ্যপট উন্মোচন করিয়া চলিয়াছে।

অগণিত দেশবাসী বিবেকানন্দের সংবর্ধনায় সেদিন উন্মত্ত। স্কুল কলেজের ছাত্র আর দেশীয় রাজারাজড়া সবাই হাত মিলাইয়াছে, একযোগে টানিতেছে তাঁহার শোভা-

যাত্রার গাড়ি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ধনী-নির্ধন রাজা প্রজা সকলেরই মধ্যে দেখা দিয়াছে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উচ্ছ্বাস। এই সন্ন্যাসী প্রতিনিধির জয়গৌরবের পটভূমিকায় ভারতবাসী তাহার নিজের রূপ, নিজের পরিচয়, যেন নূতন করিয়া দেখিয়া নিতে চাহিতেছে। জাতীয় উল্লাস ও গর্বে যে বিস্ফোরণ সেদিন ঘটিয়া গেল, তাহার মধ্য দিয়া আমাদের নবজাগৃতির ইতিহাসে দেখা দিল এক নূতন পদক্ষেপ।

এই রাজোচিত সম্মান ও সংবর্ধনার উত্তরে বিবেকানন্দ কহিলেন, "এ সংবর্ধনা আমার নয়, আমার মধ্য দিয়া দেশবাসী আজ সংবর্ধনা জানাইয়াছে ভারতের সন্ন্যাস ধর্মকে, ত্যাগপূত জীবনকে, আর নিজের অধ্যাত্মশক্তিকে।'

রুগ্ন-ক্লান্ত দেহে তিনি স্বদেশে ফিরিয়াছেন—দীর্ঘ অবকাশ ও বিশ্রাম এবার তাঁহার প্রয়োজন। কিন্তু যোদ্ধা সন্ন্যাসীর সত্যকার অবসর কোথায়? জীর্ণ অপটু দেহ নিয়াই কর্মস্রোতে তাঁহাকে আবার ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইল। তাঁহার দেশই যে তাঁহার ঐশব্রত উদ্‌যাপনের প্রধান ক্ষেত্র।

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, আমেরিকায় গিয়া ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ সেখানে বিলাইবেন, পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব জীবনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবেন আত্মিক জীবনের বার্তা। আর ইহার পরিবর্তে ব্যবহারিক জীবনে দক্ষ, বিত্তবান্, মার্কিন-সমাজ হইতে এদেশের জন্য আনিবেন আর্থিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। নিরন্ন মৃতকল্প জনগণকে বাঁচাইয়া তুলিবেন অন্নবস্ত্র ও প্রাণ-প্রাচুর্য দিয়া। সে উদ্দেশ্য তাঁহার ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকাণ্ড জয়গৌরব নিয়া তিনি দেশে ফিরিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশে অধ্যাত্ম-ভারতের জয়পতাকা তিনি প্রোথিত করিয়া আসিয়াছেন। ফলে জাতির লাভ হইয়াছে—দুইটি বিরাট বস্তু। একটি, নিদ্রিত ভারতের জাগরণ—অপরটি, ধর্ম-মহাসভার বিজয় ও পাশ্চাত্য ভ্রমণের মধ্য দিয়া আধুনিক ভারতের জনমনে বিবেকানন্দের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্যের জয়মাল্য লাভের ফলে দেশের জনমানসের অধিকার অবলীলায় তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছে। জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁহাতেই কেন্দ্রীভূত হইতে চাহিতেছে। আর এই কেন্দ্রস্থল হইতেই স্বামীজী তাঁহার অধ্যাত্মশক্তির উষ্ণ ধারাস্রোত সমগ্র সমাজদেহে সঞ্চালিত করিলেন।

দেশকে জাগাইয়া তুলিতে, তাহার প্রাণশক্তির উদ্বোধন করিতে, যে প্রয়াস এতদিন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা কি এবার সার্থক হইবে? মহান্ হিমগিরির তুষার স্তূপ এবার তবে কি গলিয়া ঝরিয়া পড়িবে?

দেশবাসী উৎকর্ণ হইয়া বিবেকানন্দের বাণী শুনিল। এ বাণী ভারতাত্মার বাণী, রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম সন্তানের বাণী—পাশ্চাত্যের ধর্মযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ইহা সমৃদ্ধ। ভারতবর্ষের প্রতি ধূলিকণার প্রতি শ্রদ্ধায় ইহা ভরপুর, আধ্যাত্মিক ভারতের চেতনায় ইহা মহিমময়। আধুনিক ভারত এমন শক্তিদৃপ্ত এমন উদ্দীপনাময় ভাষণ আর কখনও শুনে নাই।

স্বামীজী আহ্বান জানাইলেন, "হে আমার ভারত! জাগ্রত হও। কোথায় তোমার জীবনী শক্তি? সে শক্তি যে তোমারই আত্মায়। —প্রত্যেক জাতির মতই প্রত্যেক জাতির জীবনেও একটি করিয়া মূল সুর বর্তমান থাকে। ইহাই তাহার প্রধান ও কেন্দ্রীয় সুর, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে তাহার সকল জীবনের একতান। ভারতবর্ষের এই মূল সুর রহিয়াছে তাহার অধ্যাত্মসত্তায়। ইহারই

ধারণ করিয়া জাতির পুনরুজ্জীবন সাধনের নির্দেশ তিনি দিলেন। কহিলেন, "তোমার ধর্মের প্রাণশক্তির মধ্য দিয়েই সমাজ সংস্কার আর রাজনীতির কথা প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের পথটি বেছে নিতে হয়, যেমনি প্রত্যেক জাতিও তার নিজের পথ গ্রহণ করে। আমরা ভারতবাসী, আমাদের পথ অনেক আগেই বেছে নিয়েছি। সে পথ হলো – অবিনশ্বর আত্মার প্রতি বিশ্বাস।"

ভাষণ শুনিয়া মনে হয়, জাতির চৈতন্য উদ্বোধনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ডুব দিয়াছেন প্রাচীন ভারতের আত্মার গভীরে। সেখান হইতে প্রাণরস আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নবজাগ্রত ভারতবাসীর মানসক্ষেত্রে ভারতধর্মের বীজ বপন করিয়া চলিয়াছেন।

ভারতের এই আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ শুধু তাহার নিজের জাগরণের জন্য, নিজের ঋদ্ধি সিদ্ধির জন্য নয়। সারা পাশ্চাত্য জগৎও রহিয়াছে ইহারই প্রতীক্ষায়। এই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া স্বামীজী ডাক দিলেন, "তোমার হাতে যে শক্তি আছে তা ব্যবহার করো। সে শক্তি এত বিরাট যে, যদি তুমি শুধু তাহা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করো ও নিজেকে তার যোগ্য ক'রে তোল, তবে তুমি বিশ্বের আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারবে। কারণ, ভারতবর্ষ হচ্ছে—বিশ্বজগতের মানস-গঙ্গা।"

এদেশের সমাজজীবনে তখন সংস্কার আন্দোলন প্রবল বেগে চলিতেছে। কিন্তু এ আন্দোলন ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা হইতে উদ্ভূত। স্বামীজী মনেপ্রাণে বুঝিয়াছিলেন, এ সংস্কার আন্দোলন জাতির মর্মমূলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ভারতের ঐতিহাসিক ধারা এবং সনাতন ধর্মের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সংস্কারকামীরা বুঝিতে পারেন নাই। তাই ইঁহাদের সহিত পার্থক্য জানাইয়া নিজ আদর্শ তিনি ঘোষণা করিলেন—"সমাজকে ভেঙে-চুরে সংস্কারকেরা উন্নয়নের যে পথ দেখালেন, তা সাফল্যের পথ নয়। এই সংস্কারকদের আমি বলতে চাই, তাদের চাইতে আমি আরও বড় সংস্কারক। তাঁরা এক-আধটুকু সংস্কার চান – আমি সেস্থলে চাই আমূল সংস্কার। আমাদের পার্থক্য সংস্কারের কর্ম-পদ্ধতিতে। তাঁদের প্রণালী ভেঙেচুরে ফেলা – আমার প্রণালী সংগঠন। আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আমি স্বাভাবিক এবং মূলগত উন্নতিতে বিশ্বাসী।"

ধ্বংসমূলক সংস্কার আর যুক্তিহীন রক্ষণশীলতা – এই দুইটি হইতেই বিবেকানন্দ নিজেকে পৃথক করিয়া নিলেন। বেদান্তের তত্ত্বকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়া দিয়া এক অখণ্ড অধ্যাত্মসমাজ তিনি গড়িয়া তুলিতে চান। তামসিক জড়বুদ্ধি ও সামাজিক ভেদ-বৈষম্য এই দেশে এক চরম বিপর্যয় আনিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে স্বামীজী ঘোষণা করিলেন বৈদান্তিক অভেদ-তত্ত্ব। সর্বজীবের অভ্যন্তরে অনুস্যূত রহিয়াছেন শিব। এই শিবের পূজার জানাইলেন আহ্বান—"যিনি তোমার অন্তরে বাহিরে, তুমি যাহার স্থূলদেহ ও যিনি 'সর্বত পাণিপাদো', শুধু সেই বিরাট আত্মার পূজা করো।" জাতি সংগঠনের জন্য চাই বৈরাগ্যবান্ তেজস্বী কর্মিদল। এ জন্যও তিনি সেদিন জানান তাঁহার উদাত্ত আহ্বান।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-তত্ত্বে শক্তি, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনেরই সমন্বয় রহিয়াছে। সর্ব মত ও পথকেও ঠাকুর মিলাইয়া নিয়াছেন। কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে যেন তাহার কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। বিবেকানন্দ তাঁহার পরম প্রিয় অধ্যাত্ম-সন্তান। অদ্বৈতবাদের

প্রতি তাঁহার আত্যন্তিক নিষ্ঠা যেন একদেশদর্শিতার পরিচয় দিতেছে। ঠাকুরের সমন্বয়ের বাণীর মূলকথা কি তাঁহার শ্রেষ্ঠতম শিষ্য ভুলিয়া বসিয়াছেন?

স্বামীজীর 'বেদান্তের আদর্শ' নামক বক্তৃতায় এ প্রশ্নেরই উত্তর সেদিন পাওয়া গেল। "আমি অভিযোগ শুনেছি যে, আমি অদ্বৈতবাদের কথা খুব বেশী ক'রে বলি আর দ্বৈতবাদের কথা খুব কম বলি। হ্যাঁ, আমি খুব ভাল ক'রেই জানি, দ্বৈতবাদের মধ্যে কি অপরিমেয় ভাব রসের উন্মাদনা, কি অসীম আনন্দোচ্ছ্বাস রয়েছে। সবই আমি জানি। কিন্তু এখন আমাদের কাঁদবার সময় নয়—এখন কোমল হবার সময় নয়। এই কোমলতা এদেশে যুগ যুগ যাবৎ বর্তমান—আর আমরা যেন তুলার মতোই নরম হয়ে গিয়েছি। আজ আমাদের দেশ যা চায়, তা হলো লৌহের পেশী, ইস্পাতের স্নায়ু, বিপুল ইচ্ছাশক্তি, যা অপ্রতিরোধ্য, যা অমোঘ। এতে যদি সমুদ্রের অতল গভীরে নামতে হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। তাই আজ আমাদের একান্ত প্রয়োজন দৃঢ়তা। এ দেশকে গড়ে তুলবার জন্য, শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, আবশ্যক অদ্বৈতবাদের আদর্শ উপলব্ধি করা—একত্বের আদর্শকে উপলব্ধি করা, আয়ত্ত করা। আমাদের চাই বিশ্বাস, বিশ্বাস—প্রবল আত্মবিশ্বাস।"

১৮৯৭ সালের ১লা মে স্বামীজী বলরামবাবুর ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও সাধু ভক্তদের এক সভা আহ্বান করিলেন। সকলের অনুমোদনক্রমে স্থাপন করা হইল 'রামকৃষ্ণ মিশন'। বিবেকানন্দ হইলেন ইহার মূল সভাপতি আর স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি।

মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু গুরুভাইদের অনেকে প্রথমটায় স্বামীজীর আদর্শ ও কর্মসূচী সোৎসাহে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। কাহারও কাহারও মনে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসে, প্রশ্ন জাগে 'জীবসেবা, লোকশিক্ষা, সভা-সমিতি এসব কি শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত ছিল। নিজের কথাবার্তায়, উপদেশে, আচরণে ঠাকুর কি ঈশ্বর উপলব্ধির উপরই সর্বদা জোর দিতেন না? স্বামীজীর পথে চলতে গিয়ে ঠাকুরের পথ থেকে কি তারা দূরে সরে যাচ্ছেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের নূতন ভাষ্য করিতেছেন বিবেকানন্দ। কেউ কেউ এ ভাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন।

স্বামীজী উত্তেজনায় ফাটিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাখতে চাস্? তা হবে না। আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। আমাকে তিনি কখনো তাঁর পূজা প্রচার করতে বলেন নি। ধ্যান ধারণা আর ধর্মের যে সব উঁচু তত্ত্ব আমাকে শিখিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জগৎকে শিক্ষা দিতে হবে। মনে করিস কি আমি আর একটা নূতন দল স্থাপন করতে বসেছি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা সবাই ধন্য হয়েছি। এবার ত্রিজগতের লোকের কাছে তাঁর ভাব বিলিয়ে দিতে হবে। একাজের জন্যই যে আমাদের জন্ম।'

ইহার পর স্বামীজী দৃঢ়কণ্ঠে যাহা বলিলেন, তাহা আত্মপ্রত্যয়ে [illegible] আর ঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রেরণার সমুজ্জ্বল। বলিলেন, "শোন, প্রভু [illegible] নির্দেশ আমি এ জীবনে পেয়েছি। বেশ অনুভব করেছি, তিনি আমার পেছনে থেকে [illegible]

কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন খেতে না পেয়ে আমি গাছতলায় পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন বাঁধবার কাপড় পর্যন্ত ছিল না, যখন এক পয়সাও সম্বল নেই অথচ পৃথিবীটা ঘুরবো মনে করেছি, তখনও দেখেছি তাঁর দয়ায় যেখানে আমি গিয়েছি, সেখানেই সাহায্য পেয়েছি। আবার যখন বিবেকানন্দকে দেখবার জন্য সিকাগোর রাস্তায় মেয়ে মদ্দর গাঁদি লেগে যেত তখনও তাঁরই দয়ায় তত মানসম্ভ্রম—যার শতাংশের একাংশ পেলেও সাধারণ লোক একেবারে ক্ষেপে যায়—অনায়াসে হজম করেছি। প্রভুর ইচ্ছায় যেখানে গেছি, বিজয় লাভ করেছি। এখন চাই এই দেশের জন্য কিছু করতে। তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কাজে সাহায্য কর্ দেখবি তাঁর ইচ্ছায় সকলেরই কল্যাণ হবে।”

আর একদিনের বাদানুবাদেও স্বামীজী গর্জিয়া উঠিয়া ধ্যান ভজন-পরায়ণ, ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল গুরুভাইদের বলেন, “মনে করেছিস এতেই তোদের মুক্তি আসছে হাতের মুঠোয়? আর শেষের দিনে রামকৃষ্ণঠাকুর এসে তোদের হাতে ধরে একেবারে গোলোকে টেনে নিয়ে যাবেন। আর জ্ঞানের চর্চা, লোকশিক্ষা এবং আর্ত অনাথের সেবা, এ সব মায়া—কেননা পরমহংসদেব ওসব করেন নি। আর কাকে কাকে নাকি বলেছিলেন, ‘আগে ভগবান্ লাভ কর্—তারপর আর সব।’ পরের উপকার করতে যাওয়া অনধিকার চর্চা যেন ভগবান্ লাভ করা মুখের কথা। ভগবান্ একটা খেলনা কিনা যে খুঁজলেই মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে।”

বিবেকানন্দ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐশ কর্মের মহানায়ক। ঠাকুরের করুণাঘন রূপটিই তাঁহার অন্তরে চিরভাস্বর হইয়া রহিয়াছে। তাই তাঁহার শ্রীমুখের বাণী - শিবজ্ঞানে জীবের সেবা—স্মরণ রাখিয়াই ব্যাকুল হইয়াছেন সেবাকর্ম অনুসরণের জন্য, কর্মযোগের একটা ভিত্তিভূমির জন্য। করুণাঘন ঠাকুরের জীবপ্রেমের ভিত্তিতে স্বামীজী তাঁহার সেবাধর্মের নব ব্যাখ্যা—কর্মযোগ অনুষ্ঠানের নব পরিকল্পনা স্থির করিলেন।

গুরুভ্রাতারা বিশ্বাস করিতেন, ঠাকুর তাঁহার প্রিয়তম সন্তান স্বামীজীর মধ্য দিয়াই তাঁহার লীলা প্রকটিত করিতেছেন। অপার স্নেহ ভালবাসার ও নেতৃত্ব শক্তিতে স্বামীজীও তাঁহাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তবুও সন্দেহের যে ছায়াপাত মাঝে মাঝে হয়, এবার তাহা দূরীভূত হইল।

ইহার পর দেখা যায়—দৃশ্যপট একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। যে রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের পূজা ও ভোগরাগ ছাড়িয়া বার বৎসরের মধ্যে একদিনও মঠের বাহিরে যান নাই, তিনি মাদ্রাজে প্রচারকার্যে বাহির হইলেন। অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। সারদানন্দ এবং অভেদানন্দ ইতিপূর্বে প্রচারের উদ্দেশে ভারতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। লোকহিতে ব্রতী ‘মিশনের’ প্রকৃত ভিত্তি এইবার ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল।

আমেরিকা হইতে স্বামীজী যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন, মঠ নির্মাণের উদ্দেশ্যে তাহাদ্বারা পঁয়তাল্লিশ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। অথচ এই মঠ ও সেবা-সংস্থার এই ভিতটিকে গোড়াতেই তিনি কিন্তু প্রয়োজনবোধে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কলিকাতায় তখন প্লেগের মহামারী শুরু হইয়াছে। জনগণ আতঙ্কে অস্থির। মঠের কর্মীদের স্বামীজী সেবাকার্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন প্রশ্ন তোলেন,

প্রচুর অর্থ ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। কিন্তু সে অর্থ কোথা হইতে পাওয়া যাইবে?

মহাবৈরাগী বিবেকানন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "প্রয়োজন হলে এখনি মঠের জায়গা জমি বিক্রি করে দেবো, কাজ চালিয়ে যাবো। আমরা ফকির, মুষ্টিভিক্ষা করে আবার গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা জমি বিক্রয় করলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারি, তবেই তো এসব সার্থক। নইলে কিসের এই জায়গা, কিসের জমি?" সারা জীবনের আদর্শকে নিঃশেষে অবলুপ্ত করার এমন সাহস ও মনোবৃত্তি কয়েকজনের আছে? ভাগ্যক্রমে সেবাব্রতীদের কর্ম উদ্‌যাপনে এই চরম ব্যবস্থার প্রয়োজন সেই সংকটে দেখা দেয় নাই।

সেদিন বিবেকানন্দ এক ভক্তকে বেদান্ত পড়াইতেছেন। এমন সময় গিরিশ ঘোষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। স্বামীজী তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া রহস্যচ্ছলে কহিলেন, "জি-সি, তুমি তো এসব কিছুই পড়লে না, শুধু কেষ্টো বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।"

গিরিশচন্দ্র উত্তর দিলেন—"স্বামীজী, ওসবে তোমারই বেশী প্রয়োজন। কারণ, তোমাকে দিয়েই যে ঠাকুর লোকশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।"

তারপর গিরিশচন্দ্রের কৌশলে এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা হইল। গিরিশ মুচকি হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আচ্ছা নরেন, তুমি তো বেদবেদান্ত ঢের পড়েছ, কিন্তু তাতে অগণিত দুঃখীর দুঃখ, বুভুক্ষুর আর্তনাদ, আর পাপাচারগুলো নিবারিত হয় কি?" সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাবান্ নাট্যকার তাঁর অনন্য ভাষায় দুঃখ দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাস্তব জগতের এক দুঃসহ, বীভৎস চিত্র আঁকা শুরু করিলেন। স্বামীজীর হৃদয় ততক্ষণে বেদনায় বিক্ষোভে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। নয়নের উদ্‌গত অশ্রু গোপনের জন্য তিনি দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যান। গিরিশ তখন উপস্থিত ভক্তটিকে যে কথাটি বলিলেন, বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-জীবনের তাহা এক চমৎকার ভাষ্যস্বরূপ। বলিলেন, "দেখলি তো তোর গুরুর হৃদয়টা। এই যে পরের দুঃখে এমন অশ্রুমোচন, এই যে মহাপ্রাণতা—এই জন্যই আমি ওকে বড় বলে মানি, তাঁর বিদ্যেবুদ্ধির জন্য নয়। দুঃখ-দুর্দশার কথা যেই শোনা, অমনি বেদ-বেদান্ত ফেলে উঠে যাওয়া। সমস্ত বিদ্যে-বুদ্ধি যেন প্রেমে গলে গেল। [illegible] স্বামীজী যেমন জ্ঞানী ও পণ্ডিত, তেমনি ঈশ্বরভক্ত ও লোকসেবক।

১৮৯৮ সালের জুলাই মাস। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করার পর স্বামীজী অমরনাথ দর্শনে রওনা হইলেন। সঙ্গে রহিয়াছেন স্নেহধন্যা শিষ্যা নিবেদিতা। বৃটেন-কন্যা মিস্ মার্গারেট নোবেল একদিন স্বামীজীর আহ্বানে [illegible] উদ্বুদ্ধ হন এবং তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করেন। তারপর গুরুর মাতৃভূমি [illegible] সেবায় নিজেকে করেন নিবেদন। নাম হয় তাঁর নিবেদিতা। এ কালে স্বামীজীর [illegible] ও প্রেরণায় সাধিকা নিবেদিতার আত্ম-নিবেদনের সার্থকতা রূপটি [illegible] উঠিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যারূপে ঘটিতেছে তাঁহার [illegible]।

নিবেদিতার আগে কোনো পাশ্চাত্য রমণী হিন্দুধর্মের সন্ন্যাসাশ্রম [illegible] নাই। এদিক দিয়া তিনি অনন্যা। এই পাশ্চাত্য-শিষ্যার জীবনে [illegible] ভাবালুতার স্পর্শ বর্তমান ছিল স্বামীজীর কঠোর নির্দেশ [illegible] নিষ্করুণভাবে মুছিয়া দিয়াছিল।

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, নিবেদিতা হিন্দু নারীদের শিক্ষায় ব্রতী হোক্, কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারিণী হিন্দু নারীরূপে গড়িয়া উঠুক। এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশও দিয়াছিলেন—"তোমায় এখন চিন্তায়, ভাবে, অভ্যাসে ও প্রয়োজনে সম্পূর্ণ হিন্দু হইতে হইবে। তোমার জীবনকে এখন ভিতরে বাইরে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারিণীর আদর্শে গঠিত করিতে হইবে। যদি তোমার খুব প্রবল আগ্রহ থাকে তবে উপায় ঠিক জুটিয়া যাইবেই। কিন্তু তোমার অতীত জীবনটাকে ভুলিতে হইবে—এমন কি তার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত তুমি রাখিতে পারিবে না।"

নিবেদিতা ছিলেন স্বামীজীর চরণে উৎসর্গীত পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। গুরু তাঁহার এই শিষ্যাকে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের সেবায় এক যোগিনীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

অমরনাথে যাওয়ার কালে দেখা যায় স্বামীজীর এক অদ্ভুত রূপান্তর। অদ্বৈতবাদের পতাকাবাহী সেই যোদ্ধা সন্ন্যাসী আর নাই। এখন তিনি এক তীর্থচারী ভক্ত সাধক, প্রভু অমরনাথের নিষ্ঠাবান্ উপাসক। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তি-আপ্লুত সত্তাখানি যেন তাঁহাতে এবার সঞ্চারিত হইয়াছে। গুরুদেবের এই নতুন মূর্তি ও দিব্য কমনীয়তা দর্শনে সেদিন শিষ্যা নিবেদিতার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।

স্নানান্তে অমরনাথের তুষার-লিঙ্গের সম্মুখে স্বামীজী সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। গুহামধ্যে শত শত ভক্তের কণ্ঠে উদ্‌গীত হইতেছে স্তবগান। এই স্তবগানের অনুরণন চলিয়াছে আগ্রহাকুল দর্শনার্থীদের হৃদয়ে। শিব বিগ্রহের দর্শনে ভাগ্যবান্ সাধকেরা লাভ করিতেছেন দিব্য অনুভূতি।

প্রভু অমরনাথের দিব্য দর্শন পাইলেন স্বামীজী, ধ্যানাবিষ্ট দেহ হারাইয়া ফেলিল বাহ্যজ্ঞান। বহুক্ষণ পরে চেতনা ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল, চোখ মুখ স্বর্গীয় আনন্দের ছটায় উদ্ভাসিত।

সঙ্গীরা বার বার প্রশ্ন করেন, অতীন্দ্রিয় লোকের কোন্ দর্শন কোন্ অভিজ্ঞতা স্বামীজীর হইয়াছে। কিন্তু উত্তরে তিনি কোনো কিছুই সেখানে প্রকাশ করিলেন না।

উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ মহলে স্বামীজী এই প্রসঙ্গে বলিতেন—স্বয়ং অমরনাথ তাঁহাকে কৃপা করিয়া এই সময়ে দর্শন দেন এবং প্রভু তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যুর বরও প্রদান করেন। সমাধিমগ্ন মহাযোগী শঙ্কর চিরদিনই বিবেকানন্দের উপাস্য। তাঁহার দিব্য দর্শন সেদিন স্বামীজীর সর্বসত্তায় আনন্দময় অনুভূতির তরঙ্গ তুলিয়া দেয়। অন্তর্লোকে 'শিব শিব' ধ্বনি নিরন্তর ধারায় স্পন্দিত হইতে থাকে।[১]

অমরনাথ হইতে নামিয়া আসিয়া বিবেকানন্দ আবার এক নূতনতর ভাবময় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। আদ্যাশক্তির ধ্যানে দেহ-মন প্রাণ তখন তন্ময় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিতেছেন, চারিদিকে জগজ্জননী মহামায়ার লীলা প্রকটিত আর তিনি যেন তাঁহারই অঙ্কের ক্ষুদ্র শিশুটি হইয়া রহিয়াছেন। মুখে নিরন্তর রামপ্রসাদী সুরের গুনগুনানি, আর অন্তরে স্বর্গীয় আনন্দের উচ্ছ্বাস।

শিষ্যদের একদিন কহিলেন, "যেদিকে ফিরছি, কেবলই মায়ের বরাভয় মূর্তি

১ সিস্টার নিবেদিতা : দ্য-মাস্টার অ্যাজ আই স' হিম্।

দেখছি। তিনি যেন আমায় ছোট ছেলের মতো ক'রে, নিজের হাতে ধরে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

মাতৃসাধকের অন্তরে তখন ভক্তির প্রবল প্রস্রবণ বহিতেছে। কাশ্মীরের ডাল-হ্রদের উপর হাউসবোটে তখন বাস করিতেছেন। মুসলমান মাঝির কন্যাটিও তাঁহার চোখে যেন আদ্যাশক্তির এক কল্যাণময়ী প্রকাশ। জননী উমা জ্ঞানে যখন এই বালিকা মুসলমান কুমারীটিকে তিনি অর্চনা করিতে বসিতেন, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠিত।

ধ্যান তন্ময়তার মধ্য দিয়া ক্রমে বিবেকানন্দের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে ব্রহ্মময়ী মহাকালীর উপলব্ধি। "জননী মহাকালী" নামক কাব্য-বন্দনাটি এই সময়ে তাঁহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হয়। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় এটি রচনা করিবার পরই স্বামীজীর বাহ্য চেতনা দীর্ঘ সময়ের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

অদ্বৈতবাদী, বেদান্তকেশরী স্বামীজীর অন্তর এখন মাতৃধ্যানে ভরপুর। আদ্যাশক্তির প্রলয়ংকরী মূর্তির উপাসনা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। এই সময়ে প্রায়ই বলিতেন, "ভীমার উপাসনা দ্বারাই যে ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, অনন্ত জীবন লাভ করা যায়। মৃত্যুকে চিন্তা কর—লোলরসনা কালীতে ধ্যান কর। মা-ই স্বয়ং ব্রহ্ম। তাঁর আঘাত, অভিশাপও যে আশীর্বাদ। হৃদয়টিকে শ্মশান ক'রে ফেল। তবেই না মার দেখা পাবে।"

'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় স্বামীজীর অন্তর্লোকে উদ্ভাসিত এই সংহাররূপিণী তত্ত্বটি উঠিয়াছে :—

সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী,
সুখ বনমালী—তোমার ছায়া।
করালিনী কর কণ্ঠচ্ছেদ,
হোক মায়া ভেদ—
সুখ স্বপ্নে দেহ দয়া।

স্বামীজী সেদিন কাশ্মীরের ক্ষীরভবানী দেবী-বিগ্রহ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কি এক দৈবী আকর্ষণে এই প্রাচীন বিগ্রহের প্রতি তিনি খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। কয়েকদিন মায়ের মন্দিরে বসিয়া নিবিষ্ট হন পূজা ও ধ্যান-জপে।

একমনে সেদিন মন্দিরে বসিয়া জপ করিতেছেন। এক সময়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল ভগ্ন দেউলের উপর। বিধর্মীর আক্রমণ ও অত্যাচারে স্থানে স্থানে ইহা বিধ্বস্ত হইয়াছে। এক অব্যক্ত ব্যথায় সাধকের অন্তর বার বার গুমরিয়া উঠে। মনে খেলিয়া যায় চিন্তার ঝলক, "মায়ের ভক্তেরা মন্দির ও বিগ্রহের এই অত্যাচার অবমাননা কি ক'রে সহ্য করেছে? আমি নিজে সে সময়ে উপস্থিত থাকলে কিছুতেই এটা ঘটতে দিতুম না, নিজের প্রাণ আহুতি দিয়ে করতুম মায়ের মন্দির রক্ষা।

সহসা শোনা যায় এক অলৌকিক কণ্ঠস্বর।—"ওরে, আমার মন্দির ভেঙেছে, তোর তাতে কি। তুই কি আমায় সর্বত্র রক্ষা করিস,—না আমিই তোকে রক্ষা করি? আমার ইচ্ছায় কি এখানে সাত-তলা স্বর্ণখচিত মন্দির এখনি গড়ে উঠতে পারে না?'

বিবেকানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। এই দৈববাণীর আঘাত তাঁহার অন্তর-সত্তার ভুলিল

প্রচণ্ড আলোড়ন। সত্যই তো। আদ্যাশক্তি, জগজ্জননী যিনি, সর্বশক্তির উৎস যিনি, তাঁহার শক্তিকে এমন সীমিত বলিয়া তিনি ভাবিবেন কেন? কেন তাঁহার এই ধৃষ্টতা? মায়ের নিরাপত্তা বিধান তিনিই করিবেন, কেনই বা তাঁহার এই অহংবোধ? মায়ের সংসার মা-ই তো চালাইয়া থাকেন। পরাশক্তি তিনি—তাঁহার শক্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত। গ্রহ-তারা দল তাঁহারই প্রেমের সূত্রে গাঁথা। তাঁহারই জ্ঞানে সর্বসৃষ্টি চৈতন্যময়, স্পন্দিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক কোণে, ক্ষুদ্র অঙ্গনে ক্রীড়ারত শিশু এই বিবেকানন্দের শক্তি সত্যই কতটুকু?

ক্ষীরভবানী মন্দিরের অলৌকিক অভিজ্ঞতা স্বামীজীর জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। তাই শ্রীনগরে যখন ফিরিলেন, সঙ্গীরা তাঁহার চোখে মুখে দিব্য জ্যোতির আভা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

দেবী ভবানীর প্রসাদী ফুল সকলের মাথায় ঠেকাইয়া ভাব গদ্‌গদ স্বরে বিবেকানন্দ বলিলেন, "ওরে, এখন আর 'হরি ওঁ' নয়। এখন আমার শুধু—'মা' আর 'মা'। মা যে নিজে আমায় বৃহত্তম সত্যটি বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর সংসার তিনি নিজেই দেখছেন, আমার কেন একে রক্ষা করবার এমন স্পর্ধা? তবে স্বদেশের ভাবনা ভাব্‌বারই বা আমার কি দরকার? ব্রহ্মময়ী মায়ের কোলে আমি যে একটি ক্ষুদ্র শিশু মাত্র।"

তারপর বিস্ময়াবিষ্ট শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আর যা কিছু বলবার ব্যাপার আছে তা প্রকাশ করতে পারছিনে। বলার আদেশ নেই!'

সকল মায়িক আবরণের ঊর্ধ্বে নিজের অধ্যাত্মসত্তাকে প্রসারিত করিয়া দিতে বিবেকানন্দ এবার প্রয়াসী হইয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনের চারিদিকে বহুতর কর্মের তন্তু জড়ানো। ক্ষীরভবানীর দৈবী কল্যাণবাণী আজ সেগুলি শিথিল করিয়া দিল।

অন্তরের অন্তস্তলে স্বামীজী উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন, আর তিনি কোনো ধর্মান্দোলনের স্রষ্টা নহেন, জননেতা নহেন, তিনি এখন সর্ব মায়ামোহ-ছিন্ন সন্ন্যাসী—জগজ্জননীর কোলে উপবিষ্ট এক বৈরাগী সন্তান।

ধ্যানতন্ময় স্বামীজী এই সময়ে প্রায়ই একলা থাকিতে পছন্দ করিতেন। আবার ভাবাবেশে মাঝে মাঝে কোথায় কোন্ সুদূরে যেন অদৃশ্য হইয়া যাইতেন।

একদিন সঙ্গীরা বিস্মিত হইয়া দেখেন, কোথা হইতে মস্তক মুণ্ডন করিয়া এক দীন সন্ন্যাসীর বেশে তিনি আসিয়া উপস্থিত। মুখে স্বরচিত—'জননী মহাকালীর' শ্লোকগাথা। মায়ের প্রলয়ংকরী শক্তির বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'দ্যাখো, এর প্রতিটি কথা সত্য। আর আমি তা কাজেও প্রমাণ করেছি। দ্যাখো, আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি।"

মহামায়ার সূক্ষ্মতম আবরণ তিনি দূরে করিয়াছেন, সর্ব বন্ধনের জাল করিয়াছেন ছিন্ন,—এই কি তাঁর মৃত্যুবরণ?

বেলুড়ে সেদিন মঠ স্থাপনের উৎসব দিবস। গঙ্গাস্নান করার পর স্বামীজী ঠাকুরের ভস্মাস্থিপূর্ণ তাম্র আধারটি শিরে বহন করিয়া চলিলেন। নূতন মঠে করা হইল ইহার প্রতিষ্ঠা।

এই সময়ে তিনি এক সন্ন্যাসীকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে ক'রে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাবো, সেখানেই থাকবো—সে গাছতলাই কি আর কুঁড়েঘরই কি?' সেজন্যেই আজ আমি নিজেই এই আত্মারামের কৌটা মাথায় বয়ে নিয়ে এলাম।

মঠের ব্রহ্মচারী শিষ্যদের কাছে সন্ন্যাসজীবনের ত্যাগপূত মহিমা স্বামীজী সর্বদা কীর্তন করিতেন। এই সঙ্গে জীবসেবার মূল তত্ত্বটিও তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিতেন। তাঁহার তেজোগর্ভ বাণীতে তরুণ শিষ্যদের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিত ত্যাগ ও আত্মবিশ্বাসের অগ্নিশিখা।

উৎকর্ণ হইয়া তাহারা শুনিত স্বামী বিবেকানন্দের অভয় বাণী, "ওরে, ভয় পাস্‌নে। জগতের ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলো আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান্‌ লোকের ইতিহাস। প্রকৃত বিশ্বাসই ভেতরকার দৈবীশক্তিকে জাগ্রত ক'রে তোলে। মনে রাখিস, গুটিকয়েক শক্তিমান্‌ লোক জগৎ টলমল ক'রে ফেলতে পারে।"

স্বামীজীর দৃষ্টিতে তাঁহার গুরুর নামাঙ্কিত মঠ ও মিশন ছিল জীবসেবা ও ঈশ্বরোপলব্ধির পবিত্রভূমি। ইহাদের স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও গৌরবকে কোনো মতেই ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন না। এ বিষয়ে একদিন দৃপ্তভঙ্গীতে তিনি তাঁহার মতবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন—"দ্যাখো, মঠের ব্যাপারে কিন্তু গৃহস্থদের কোনো কর্তৃত্ব চলবে না। সন্ন্যাসীরাও টাকাওয়ালা লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখবে না। গরীবদের সাথেই তাদের কারবার। গরীবদেরই যত্ন করবে, ভালবাসবে ও যথাসাধ্য সেবা করবে। এ দেশের অধিকাংশ মঠ ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বড় মানুষের দাসত্ব করছে - তাদের দয়ার উপর নির্ভর করেছে, তাই তো তারা উচ্ছন্ন গেছে। প্রকৃত সন্ন্যাসী তাদের ত্রিসীমায় যাবে না। কাম-কাঞ্চনের দাস যারা, তারা কি ক'রে কাম-কাঞ্চনত্যাগীর প্রকৃত শিষ্য, প্রকৃত বান্ধব হতে পারে?"

তরুণ ব্রহ্মচারীদের সন্ন্যাসনিষ্ঠার প্রতি বিবেকানন্দের দৃষ্টি ছিল সদা জাগ্রত, শাসন ছিল অতি কঠোর। তিনি বলিতেন, "এ কথাটা যেন ভুলো না। যখন দেখবে সন্ন্যাস আদর্শ থেকে পিছিয়ে পড়ছো, এ কঠোর জীবনের পক্ষে তুমি অনুপযুক্ত, তখন গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করা বরং ভাল, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম কলুষিত করা অনুচিত। সকালে উঠবে, ধ্যানজপ করবে, আর খুব তপস্যা লাগাবে। স্বাস্থ্য আর সংযমতো খাওয়া-দাওয়ার উপর নজর রাখবে। আর কথাবার্তা কইবে শুধু ধর্ম সম্বন্ধে। সাধনাবস্থায় এমন কি খবরের কাগজ পড়া বা গৃহস্থদের সঙ্গে মেশাও সমীচীন নয়।'

সাধনার্থী তরুণ ব্রহ্মচারীদের জন্য এমন কঠোর বিধিনিষেধই এ সময়ে তিনি প্রবর্তন করিয়া যান।

সে-বার কাশ্মীরের তীর্থদর্শন হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজী দেখিতে পান একটি তরুণ ব্রহ্মচারী মা-সারদামণির আশ্রমে কাজকর্ম দেখাশুনা করিতেছে। ব্রহ্মচারীটি সৎ এবং শুদ্ধসত্ত্ব, কিন্তু স্বামীজী কাহারো কথায় নিবৃত্ত হইবার পাত্র নন। তৎক্ষণাৎ গর্জিয়া উঠিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীমায়ের আশ্রমে নারী ভক্তগণ বাস করিতেন, শ্রীমাকে দর্শনের জন্যও মহিলাদের সমাগম ছিল। ব্রহ্মচারী ভক্তদের পক্ষে এই নারী সান্নিধ্যকে স্বামীজী ক্ষতিকারক মনে করিতেন। একেই ছিল তরুণ

সাধকদের সম্পর্কে তাঁহার ব্রহ্মচর্যের নৈষ্ঠিক বিধান। এই ভর্ৎসনার পর অবিলম্বে মায়ের আশ্রমের কাজে একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীকেই নিযুক্ত করা হয়।

'শিববোধে জীবের সেবায়' মঠের কর্মীদের বিবেকানন্দ সদাই অনুপ্রাণিত করিতেন। ভাবময় উদাত্ত কণ্ঠে কহিতেন,—"ওরে, সর্বজীবের সমষ্টি যে ভগবান্, একমাত্র সেই ভগবানেই আমি বিশ্বাস করি। সকল জাতির যারা দুর্বৃত্ত, দরিদ্র ও নিপীড়িত তারাই যে আমার ভগবান্। এই ভগবানের জন্য আমি বারে বারে জন্মাতে চাই, এজন্য জন্ম জন্ম দুঃখ পেলেও আমার খেদ নাই।"

যুগ যুগ ধরিয়া এদেশের নরম মৃত্তিকায় ভাবালু ও কোমল মানুষের জন্ম হইয়াছে। কঠোর সংযম, নিষ্ঠা ও শক্তির অভাবে অনেক কিছু মহতী প্রচেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে। তাই নবীন সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ করিয়া স্বামীজী তাঁহার সতর্ক বাণী বার বার উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন।

আজীবন বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখিয়াছেন, সে স্বপ্ন সফল করার জন্য করিয়াছেন জীবনপণ। তিনি চাহিয়াছেন, আত্মত্যাগী সর্বস্ব-পণকারী শত শত তরুণ সন্ন্যাসী তাঁহাকে করিবে অনুসরণ। ভারতের আত্মিক উজ্জীবনে, তাঁহার ধ্যানের ভারত গঠনে তাঁহারা করিবেন জীবনপাত। সে স্বপ্ন তাঁহার সফল হয় নাই, ধ্যান কল্পনা রূপায়িত হয় নাই। কিন্তু বিবেকানন্দের অভ্যুদয় কি ব্যর্থ হইয়াছে। তাহা তো হয় নাই। তাঁহার বিপুল অধ্যাত্মশক্তি ও কর্মব্রতের মধ্য দিয়া ভারতাত্মা সেদিন জাগিয়া উঠে—ধর্ম ও সমাজে উঠে নূতনতর প্রাণ-স্পন্দন। আর সমাজের সংস্কার ও ধ্বংসের পরিবর্তে জাগিয়া উঠে সৃষ্টিধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী। সনাতন অধ্যাত্ম-জীবনের উৎস হইতে প্রাণশক্তির আহরণে জাতি প্রবৃত্ত হয়। এই জাগরণের পরোক্ষ ফলশ্রুতি বাংলার অগ্নিযুগের মুক্তিপ্রয়াস, তিলক ও গান্ধীজীর মুক্তিসংগ্রাম। স্বামী বিবেকানন্দের আন্দোলনের ফলে ভারতের অন্তর্নিহিত ঐক্যের বোধও সবার অলক্ষ্যে জাতীয় জীবনে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য নাগমশাই একদিন বেলুড়মঠে বিবেকানন্দকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। নাগমশাই ছিলেন ভক্তি ও দৈন্যের মূর্ত বিগ্রহ। এই সাধক সম্বন্ধে স্বামীজী বলিতেন, "দ্যাখো, সারা পৃথিবীটা ঘুরে এলাম কিন্তু নাগমশাইর মতো মহাপুরুষ চোখে পড়লো না।"

বিবেকানন্দ ও নাগমশায়ের এই সাক্ষাতের পটভূমিকায় স্বামীজীর অধ্যাত্ম-পরিচয়টি ভক্ত ও দর্শনার্থীদের কাছে সেদিন স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

নাগমশাই স্বামীজীর চরণ বন্দনার উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হইলেন। "ও কি করছেন, ও কি করছেন,"—বলিয়া স্বামীজী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নাগমহাশয় করজোড়ে বলিয়া উঠেন, "আমি যে দিব্যচক্ষে দেখছি—আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। আপনার দর্শনে আমার ভবচক্ষু একেবারে দূর হয়ে গেল। জয় জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ।"

বেদান্ত পাঠ নিরত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের স্বামীজী আহ্বান করিলেন। মুক্তপুরুষ নাগমশাই ঠাকুরের কথা আজ ইহাদের কিছু শুনাইবেন, ইহাই তাঁহার অভিলাষ। কিন্তু অহংবোধ বিরহিত সাধু নাগমশাইকে দিয়া এসব বলানো সুকঠিন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি আর কি বোলবো, আমি আর কি

বোলবো ? আমি এখানে শুধু দেখতে এসেছি, ঠাকুরের লীলার সহায়ক মহাবীরজীকে দেখতে এসেছি। জয় রামকৃষ্ণ।”

কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ট থাকার পর নাগমহাশয় আবার কহিলেন, “আপনাকে কে বুঝবে ? দিব্যদৃষ্টি না খুললে তো চেনবার যো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন ; আর সকলে, তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কিছুই বোঝে না।”

সিংহবিক্রম, ভুবনবিজয়ী যোদ্ধা-সন্ন্যাসী মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার মহিমার উন্নত শিখর হইতে নামিয়া আসেন। বালকের সরলতা ফুটিয়া উঠে চোখে মুখে। বিনয়নম্র বচনে প্রবীণ গুরুভাইকে বলেন, “নাগমশাই, কি যে করছি, কি না করছি—কিছুই বুঝতে পারছিনে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, আর সেই মতো কাজ ক'রে যাই। এতে ভাল কি মন্দ হচ্ছে—কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

নাগমশাই উত্তরে কহিলেন, “মনে নেই ? ঠাকুর যে বলেছিলেন, চাবি দেওয়া রইলো। তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বুঝা মাত্রই যে লীলা ফুরিয়ে যাবে।”

গুরুর চরণে নিবেদিত-প্রাণ নাগমশাই ছিলেন এক সিদ্ধপুরুষ। দৈন্য ও আত্ম-গোপনতার আড়ালে অবস্থিত এই মহাপুরুষকে বিবেকানন্দ ভালরূপেই চিনিতেন। তাই স্বীয় আরব্ধ কার্যে তাঁহার আশীর্বাদ সেদিন তিনি চাহিয়া নিলেন।

১৮৯৯ সালের মধ্যভাগে স্বামীজীকে আর একবার আমেরিকা ও ইউরোপে যাইতে হয়। পাশ্চাত্য-বিজয়ের সে পূর্বতন উৎসাহ উন্মাদনা এবার নাই। এবার শুধু কর্মকেন্দ্রসমূহ তত্ত্বাবধান ও সংগঠনের পালা। পাশ্চাত্যের দ্বারে আগের বার যে আশা পোষণ করিয়া তিনি আসিয়াছেন, অনেক দিন হয় সে আশাকে বিসর্জন দিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রকৃত স্বরূপ আজ তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত। ইহারই উল্লেখ করিয়া স্বামীজী একদিন বলিলেন,—

“পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রা যেন এক অট্টহাস্যের মতো—কিন্তু তাহার তলায় রয়েছে মর্মভেদী কান্না। এর পরিণতিও কান্নাতেই। হাসি ঠাট্টা তামাশা যা কিছু সব রয়েছে উপরিভাগে, কিন্তু ভিতরটা এর বড়ই করুণ। আর ভারতে উপরেই যত বিষাদ, যত কান্না ভিতরে আছে নির্বিকার এক পরম চেতনা, আর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ।

মহান্ কর্মযোগী বিবেকানন্দের ব্রত উদ্‌যাপনের সময় যেন নিকটতর হইয়া আসিয়াছে। রামকৃষ্ণের জ্যা-মুক্ত তীর কি এবার তাহার গতিবেগের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিতেছে ? স্বামীজীর ভক্ত শিষ্যা মিস্ ম্যাকলিয়ডের নিকট লিখিত পত্রে তাঁহার তৎকালীন মানসিকতা কিছুটা বুঝা যায়। তিনি লিখিতেছেন—“আমি ভালই আছি। লড়াই-এ হার জিত দুই-ই হলো, পুটলী-পোঁটলা বেঁধে সেই মহান্ 'মুক্তিদাতার' প্রতীক্ষায় বসে আছি। অব্ শিব পার কর মেরে নাইয়া—হে শিব, আমার তরী এবার পারে নিয়ে যাও, প্রভু। যতই হোক্, আমি যে এখনও পূর্বের সেই বালক বই আর কেউ নই—যে বালক দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী তলায় শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণী অবাক্ হয়ে শুনতো, আর বিভোর হয়ে যেতো। সেই তো আমার সত্যিকারের স্বভাব। কর্ম আর অপরের কল্যাণ, সেগুলো আমার বহিরাবরণ মাত্র। এবার আবার তাঁর ডাক শুনতে পাচ্ছি, সেই পরিচিত মধুর কণ্ঠস্বর—যা

স্মবণ হলেই মন আনন্দে নেচে ওঠে।—বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষেব মমতা উড়ে যাচ্ছে, কর্ম আজ বিস্বাদে ভবা। জীবনেব মোহ কেটেছে—বযেছে তাব স্থলে কেবল আমাব প্রভুব আহ্বান ধ্বনি। যাই প্রভু, যাই। ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতেব সৎকাব মৃতেব দলই করুকগে, তুই ও সব ছুঁড়ে ফেলে দিযে আমাব পিছু পিছু চলে আয।' যাই প্রভু যাই!"

"হ্যাঁ, এইবাব আমি ঠিক চলেছি। সম্মুখে অনন্ত শান্তিময নির্বাণ সমুদ্র। মাঝাব এতটুকু তবঙ্গভঙ্গ তাব শান্তি বিঘ্নিত কবছে না। সেই শিক্ষাদাতা, গুরু নেতা আচার্য বিবেকানন্দ কিন্তু আজ আব নেই। পড়ে আছে শুধু পূর্বেব সেই বালক, প্রভুব চিবশিষ্য, গুরুব চবণাশ্রিত চিব-ভৃত্য। একদিন আমাব কর্মেব মধ্যে মান যশেব ভাব উদ্‌গত হত, ভালবাসাব মধ্যে পাত্রাপাত্র বিচাব আসতো, পবিত্রতাব পশ্চাতে থাকতো ফলভোগেব সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা। আমাব নেতৃত্বেব ভেতব প্রভুত্বেব স্পৃহাও আসতো। এখন সে সব অন্তর্হিত হযেছে—আমি উদাস প্রাণে ভেসে চলেছি। যাই মা, যাই। তোমাব স্নেহ কোমল কোলে উঠে, তুমি যেখানে নিযে যেতে চাচ্ছো সেই চিব-নীবব অবূপ অজ্ঞাত বাজ্যে। অভিনেতাব ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিযে, কেবল-মাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীব মতো সবে যেতে আমাব আজ আব কোনো দ্বিধা নেই।"

বিশ্ববন্দিত মহা পবাক্রমশালী আচার্যেব, যোদ্ধা-সন্ন্যাসী বীব বিবেকানন্দেব এ কোন্ দুর্জ্ঞেয পথযাত্রাব সঙ্কেত। বামকৃষ্ণেব সেই প্রহেলিকাময 'চাবি' কি তবে পবাশান্তিব তোবণদ্বাব আজ উন্মুক্ত কবিতে চাহিতেছে?

স্বামীজী স্বদেশে বেলুড়মঠে এবাব ফিবিযা আসিলেন। কর্মমুখব জীবনেব গতি আজ স্বর্গীয আনন্দেব চিব প্রশান্তিব দ্বাবে আসিযা থমকিযা দাঁড়াইযাছে।

মঠেব হাঁস গরু ছাগলছানা 'মটরু' আজ তাঁহাব খেলাব সাথী, কুকুব 'বাঘা' তাঁহাব বিশ্বস্ত অনুচব। এ যেন দিব্যসত্তায মণ্ডিত এক মানব শিশু, অধ্যাত্ম-সিদ্ধিব পবিপক্বতাব ফলে যাহা পেলব, নিটোল ও বসমধুব। ব্রহ্মচাবীব দল ও গুরুভ্রাতাবা তাঁহাব আননেব স্বকীয আভা দেখিযা অবাক্ হইযা চাহিযা থাকেন।

ক্লান্ত দেহে বোগেব প্রকোপ বাড়িযাই চলিযাছে। শেষেব দিনটি সমাগত—তবঙ্গাযিত দুর্বাব নদী এবাব মহাসাগবে আত্মবিলুপ্তিব জন্য প্রতীক্ষমাণ। স্বামীজী যেন তাঁহাব পবম সত্তাব সহিত মুখোমুখি পবিচয সাধন কবিযাছেন, প্রশান্ত হৃদযে বসিযা আছেন মহা-মিলনেব প্রতীক্ষায। সেবাবত ভক্তেব সাহায্যে পঞ্জিকাব কি একটা বিশিষ্ট দিন তিনি দেখিযা বাখিলেন। অপবাহ্নে একদিন মঠেব মযদানে ধীবপদে বেড়াইতেছিলেন। সহসা থামিযা যান, গম্ভীব স্ববে সঙ্গী ভক্তকে একটি বিশেষ স্থান অঙ্গুলি দিযা দেখাইযা বলেন, "তোবা ঐখানেই আমাব দেহেব সৎকাব কবিস্।"

১৯০২ সালেব ৪ঠা জুলাই। বিবেকানন্দেব প্রতীক্ষিত দিবসটি আসিযা গিযাছে। এবাব তাঁহাব বিদাযেব পালা। ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষ ধীবে ধীবে নিমজ্জিত হইলেন মহাসমাধিতে।

মনীষী বম্যাঁ বল্যাঁ সেদিনকাব এই মহাপ্রযাণেব মধ্যে দেখিযাছেন এক নূতন সম্ভাবনা, নূতন কল্যাণেব ইঙ্গিত। অননুকবণীয ভাষায তিনি বলিযাছেন:

"বিবেকানন্দেব নিকট জীবন এবং সংগ্রাম ছিল একার্থ বাচক। তাঁহাব জীবনেব

দিনগুলিও ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। রামকৃষ্ণের ও তাঁহার এই মহান্ শিষ্যের মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ষোল বৎসর। কিন্তু এই অল্প সময়ের ব্যবধানেই বিবেকানন্দ প্রজ্বলিত করেন অগ্নিময় মহা উদ্দীপনা। তারপর চল্লিশ বৎসরেরও কম বয়সে এই মহান্ যোদ্ধা চিতাশয্যা গ্রহণ করেন।

কিন্তু সে চিতাগ্নি আজও নির্বাপিত হয় নাই। প্রাচীনকালের ফিনিক্স পক্ষীর মতোই তাঁহার চিতাভস্ম হইতে নূতন করিয়া উত্থিত হইয়াছে ভারতের বিবেক-এ যেন কিংবদন্তীর আর এক ইন্দ্রজালময় পক্ষী। এ বিবেকময় বাণী উত্থিত হইয়াছে ভারতের শাশ্বত, সাধনময় জীবন হইতে। মানুষের আশা ও প্রত্যয় নিহিত রহিয়াছে ইহাতে। এই বাণীর কথা ভারতের প্রাচীন ধ্যানী ও দ্রষ্টার দল বৈদিক যুগ হইতে চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন। এই বাণীর নিহিতার্থ আজ ভারতবাসীকে উদ্ঘাটন করিতে হইবে, ছড়াইয়া দিতে হইবে অবশিষ্ট মানবজাতির মধ্যে।"

— ——